বিভিন্ন দল, ইঁহাদের সদস্যগণ তো আছেনই ইহা ছাড়া স্বতন্ত্রভাবেও কেহ কেহ দাঁড়াইতেছেন। এরূপ অবস্থায় নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রনীতিক পরিস্থিতি যে কি আকার ধারণ করিবে, ইহা কিছুই বুঝিয়া উঠা সম্ভব হইতেছে না। তবে মোটামুটি এইটুকু বোঝা যাইতেছে যে, গণ-তান্ত্রিকতার পথে শাসন-নীতিকে সুষ্ঠু-ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার পক্ষে জন-চেতনার সহিত সংবেদনসম্পন্ন যেরূপ শক্তিশালী দল গঠিত হওয়া উচিত এখানে তাহা হইবে না। স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পরও যে দেশের দুঃখ-দুর্দশা দূর করিবার দিকে বৈপ্লবিক কোন নীতি বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিবার মত প্রতিবেশ লাভ করিবে, এমন সম্ভাবনা খুবই কম। অথচ বর্তমান পরিস্থিতিতে তাহাই প্রয়োজন ছিল। কারণ স্বাধীনতা লাভ করিলেও দেশের শাসন-ব্যবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন এখনও ঘটে নাই; সাবেকী আমলাতন্ত্র শাসনের কাঠামোর উপরই দেশের শাসনকার্য চলিতেছে এবং অর্থ-নীতিও সেই ধারাতেই প্রধানত নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনই দেশের লোক কামনা করে। বৈদেশিক শক্তির উচ্ছেদ-প্রচেষ্টার শোণিতসিক্ত পথে সাধারণত অন্যান্য দেশে রাষ্ট্র এবং সমাজ-জীবনে বৈপ্লবিক সৃষ্টির সাড়া জাগিয়া উঠে। কিন্তু এদেশে তাহা ঘটে নাই। সাধারণ নির্বাচনের ভিতর দিয়াও দেশের জন-জীবনের তেমন সর্বাঙ্গীণ জাগরণ যদি সম্ভব না হয়, তবে এদেশের ভবিষ্যৎ এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিতে হইবে। বাস্তবিক পক্ষে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পথেই জাতি আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে; পরন্তু অতিমাত্র সাবধানীর ভীতি ও চকিত গতির পাকের মধ্যে পড়িলে জাতিকে দীর্ঘদিন বিড়ম্বনাই ভোগ করিতে হয়।

উদ্বাস্তুদের দুর্দশা

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য সেদিন বেতারযোগে তাঁহার প্রথম বক্তৃতায় যে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সকলেরই মর্ম স্পর্শ করিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, কর্তৃপক্ষের শত রকমের সদিচ্ছা সত্ত্বেও উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজ ত্বরান্বিত হইতেছে না। পক্ষান্তরে সে প্রচেষ্টা উত্তরোত্তর যেন শিথিল হইয়াই পড়িতেছে। শিয়ালদহ রেল স্টেশনে উদ্বাস্তু নিঃস্ব এবং বুভুক্ষু নরনারীদের দুর্দশা যিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনিই এ সত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। কুপার্স ক্যাম্পের খবরে দেখিতেছি, উদ্বাস্তু নরনারীর শবদেহ ভক্ষণ করিয়া শিয়াল-কুকুরের দলের এতটা সাহস বাড়িয়া গিয়াছে যে, তাহারা মায়ের কোল হইতে জীবন্ত শিশুকে পর্যন্ত ছিনাইয়া লইয়া গ্রাস করিয়াছে। বাস্তবিক-পক্ষে বাঙলা দেশ বিভক্ত হইবার ফলে নিদারুণ যে দুর্দশার উদ্ভব হইয়াছে, জগতের ইতিহাসে তাহার দ্বিতীয় নজির মিলিবে না, এমনই তাহা ভয়াবহ, এতই সে ব্যাপার মর্মন্তুদ। কিন্তু সমস্যা যতই কঠিন হোক, ইহার সম্মুখীন হইতেই হইবে এবং ইহার যথোপযুক্ত সমাধান রাষ্ট্রনীতির যাঁহারা নিয়ামক, তাঁহাদিগকে করিতেই হইবে। বস্তুত মানবতার এ-দাবী যদি আমরা উপেক্ষা করি, তবে মানুষ হিসাবে আমাদের বাঁচিয়া থাকা বৃথা এবং আমাদের স্বাধীনতারও কোন মূল্য নাই। কিন্তু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজে আমরা কর্তৃপক্ষের তেমন আন্তরিকতার বিশেষ কোন পরিচয়ই পাইতেছি না। পরন্তু ইহাই দেখা যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সাহায্য এবং পুনর্বাসন বিভাগ হইতে শহর অঞ্চলের উদ্বাস্তুদিগকে এতদিন বাড়ি তৈয়ারী এবং কারবার করিবার জন্য যে ঋণ দেওয়া হইতেছিল, গত অক্টোবর মাস হইতে তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইহার ফল কি হইবে, সহজেই বুঝিতে পারা যায়, উদ্বাস্তুস্বরূপে যাঁহারা নিজেদের চেষ্টায় বাড়িঘর নির্মাণ করিয়া এবং স্বাধীনভাবে ব্যবসা অবলম্বনের দ্বারা স্বপ্রতিষ্ঠ হইবার চেষ্টায় ছিলেন, তাঁহাদের সে প্রচেষ্টা বন্ধ হইয়া যাইবে। প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুসারেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়া-ছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এতদর্থে যে টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন এবং প্রাদেশিক সরকারও তাহা আদায় করিতে পারিতে[illegible] না। ইহার ফলে উদ্বাস্তু নরনা[illegible]-সমাজ নিঃস্ব অবস্থায় দুর্গতির [illegible]ষ প্রান্তে গিয়া পড়িতেছে। প[illegible]ঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুদের সমাগম ব[illegible] কর[illegible]ার শক্তি ভারত সরকারের নাই; আবার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাস[illegible] উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতেও তাঁহারা সাম[illegible] হীন। দুর্গতির এই দারুণ চক্র কত মানবতাকে পিষ্ট করিবে, কে জা[illegible] বিপন্ন নরনারীর বিপুল বেদনা আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া এই সমা[illegible] সমাধান করিয়া দিবে, আমরা সেই দি[illegible] অপেক্ষায় আছি।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা

এদেশের সমাজ-জীবনে মধ্যবি[illegible] সম্প্রদায়ের গুরুত্ব কতখানি রহিয়াছে এ[illegible] তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তির বলে আমাদের সমা[illegible] সংস্থান কিভাবে সমুন্নতি লাভ করিয়া[illegible] এসব ঐতিহ্য অনেকেরই জানা আ[illegible] সুতরাং সেসব তত্ত্বকথা শুধু আলো[illegible] করিয়া বিশেষ কিছু লাভ নাই। কা[illegible] অর্থনীতিক দুর্দশার চাপে মধ্যা[illegible] সম্প্রদায় ধ্বংস হইতে বসিয়াছে, ইহা আ[illegible] দৈনন্দিন জীবনেই প্রত্যক্ষ করিতে[illegible] বাস্তবিক পক্ষে কৃষক, শ্রমিক শ্রেণীর চে[illegible] ইঁহাদের অবস্থা খারাপ। কিন্তু [illegible] অবস্থার প্রতিকার কোথায়? পশ্চিমবঙ্গে[illegible] প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সম্প্র[illegible] সাংবাদিকদের একটি সম্মেলনে প্রক[illegible] করিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরক[illegible] মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদিগকে সমা[illegible] জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার উপযোগী একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতেছেন এই পরিকল্পনা অনুসারে চার হইতে প[illegible] বৎসরের মধ্যে ইঁহাদের জীবিকা অর্জনে[illegible] জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা অবলম্বিত হই[illegible] পরিকল্পন[illegible] কিছুই নাই[illegible] জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব[illegible]ত যেস[illegible] স্থানে আছে, এমন এলাকায় মধ্যবি[illegible] সম্প্রদায়ের জন্য একএকটি উপনিবে[illegible] গঠন করা হই[illegible] প্রত্যেকটি উপনিবে[illegible] প্রায় দুই হাজার পরিবার থাকিবে[illegible] উপনিবেশের বাসিন্দাগণ যাহাতে জীব[illegible] ধারণের উপযোগী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদ[illegible] করিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা হইবে[illegible] ইঁহাদের কর্মসংস্থানের দায়িত্বও সরক[illegible] লইবেন ইত্যাদি। মধ্যবিত্ত সম্প্রদা[illegible] দুর্দশা প্রতিকারে পশ্চিমবঙ্গ সরকা[illegible] প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহ এই নূতন নয়। ই[illegible] পূর্বেও তিনি এই সম্প্রদায়ের দুর্দ[illegible] প্রতিকারের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরু[illegible] আরোপ করিয়াছেন এবং এই সম্প্রদা[illegible]

থার উন্নয়নের জন্য সদিচ্ছাও প্রকাশ াছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত এদিকে কাজ ষ কিছুই করা হয় নাই। ডাক্তার রায় ও সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। র কৈফিয়ৎ এই যে, গত তিন-চার রর ঘটনা-বিপর্যয়ে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ার উন্নয়নোপযোগী কোন পরিকল্পনা কাজে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নাই। অবস্থার সেই বিপর্যয়মূলক ঘটনার যে এখন রুদ্ধ হইয়াছে, আমরা তো কোন লক্ষণই দেখিতেছি না। বিশেষ- পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে তো নহেই। বঙ্গের বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দের উদ্বাস্তুস্বরূপে পশ্চিমবঙ্গে য় গ্রহণ, ঘটনা বিপর্যয় বলিতে প্রধানত মবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। সে সমস্যার ন হইয়াছে কি? ফলত পূর্ববঙ্গ উদ্বাস্তুস্বরূপে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও পূর্বের ন্যায় আশ্রয় লইতে বাধ্য ছেন। ইঁহাদের বাস্তুত্যাগের গতি মন্থর হইলেও ধারাটি সমানভাবেই তেছে। সুতরাং সমস্যা নূতন আকারে দেয় নাই। অবস্থার গুরুত্ব ধি করিয়া এ সম্বন্ধে পূর্বেই থায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত ছিল; কারণ ও যদি ব্যবস্থা করিতে হয়, তবে ঘটনার র্যয়মূলক গতির মধ্যেই তাহা করিতে ব। বস্তুত পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু দায় যতদিন বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন ত উদ্বাস্তু সমাগম বন্ধ হইবে এবং বঙ্গের সমাজ-জীবন স্বপ্রতিষ্ঠ ট স্থিতি লাভ করি[illegible] সুযোগ ব, আ[illegible] ইহা মনে হয় না। স্তুদের পুন[illegible]সন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ র যেভাবে অগ্র[illegible] হইতেছেন, তাহাতে নির্বাচনের এই মৌ[illegible] মুখে [illegible]ট- ী এই প্রস্তাবিত প[illegible]কল্পনা দের মনে বিশেষ আশার সঞ্চার [illegible] আমাদিগকে এই কথাই বলিতে ছে।

থানের রাজনীতির গতি

তের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল ী পুরুষ। তিনি সেদিনও বলিয়াছেন অবস্থাতেই ভারত এবং পাকিস্থান রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে না, এই সর্তে তিনি এখনও পাকিস্থানের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে প্রস্তুত আছেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার এই ইচ্ছা নূতন নয়, ইতঃপূর্বেও তিনি এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন এবং পাকিস্থানের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকত আলীর কাছে তদনুযায়ী প্রস্তাবও উপস্থিত করেন; কিন্তু জনাব লিয়াকত আলী তাহাতে রাজী হন নাই। সম্প্রতি খাজা নাজিমুদ্দীনও পণ্ডিতজীর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে কাশ্মীর সমস্যাই তাঁহার পক্ষে প্রধান অজুহাত; ফলে বর্তমানে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এই যে, কাশ্মীরকে কেন্দ্র করিয়া পাকিস্থানের পক্ষে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার পথ এখনও খোলা আছে। ফলত পাকিস্থানের রাষ্ট্রনিয়ামকগণ নিজেরা ইচ্ছা করিয়াই যে এই ব্যবস্থাটা বজায় রাখিয়াছেন, ইহা স্পষ্টই বোঝা যায়। এই উপায়ে ভারতের বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষ-বুদ্ধি জাগাইয়া রাখিয়া সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধতার প্রভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠার পক্ষে কিছুটা সুবিধা করিয়া লওয়াই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। কার্যতঃ সাম্প্রদায়িকতার জিগীরকে পাকিস্থানের শাসক সম্প্রদায় নিজেদের কূটনীতিক অবলম্বনস্বরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং যেভাবে যতটা সম্ভব, ধর্মান্ধতার সেই ধারাটিকে তাঁহারা জিয়াইয়া রাখিতেছেন। পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের লাহোরের বক্তৃতা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। খাজা সাহেব এই বক্তৃতায় তাঁহার সুর উচ্চগ্রামে চড়াইয়া বলিয়াছেন, ইসলাম এবং মোশ্লেম জগৎকে সেবা করিবার জন্যই পাকিস্থানের সৃষ্টি হইয়াছে। ইসলামের সেবা পাকিস্থান কিভাবে করিতেছে না করিতেছে সে প্রশ্নের অবতারণা আমাদের মতে অনাবশ্যক কিন্তু পাকিস্থান এ পর্যন্ত মোশ্লেম জগতের কি আন্দাজ সেবা করিয়াছে, এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠে। বৃটিশ এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বি[illegible] বর্তমানে মোশ্লেম জগতের এক [illegible] তুর্কী [illegible] সর্বত্র [illegible] উত্তেজনা এবং বিক্ষোভের সঞ্চা[illegible]ছে। মিশরের দেশপ্রেমিক সন্তানদের [illegible]ঙ্গে ইংরেজের রীতিমতো সংগ্রাম চা[illegible]তেছে বলা যায়। ইরানে ইঙ্গ-মার্কিণ বিরু[illegible] ততোধিক [illegible]য়ে [illegible] [illegible]রোগী বা যে[illegible]

প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। কার্যত পাকিস্থান ঐসব মোশ্লেম রাষ্ট্রকে সমর্থন করিতেছে কি? বলা বাহুল্য, কাশ্মীরের সমস্যার সমাধানে নিজেদের আনুকূল্য লাভ করিবার আশায় এখনও পাকিস্থান ইঙ্গ-মার্কিন-গোষ্ঠীর দিকে প্রত্যাশাভরে তাকাইয়া আছে। ঐ দুই শক্তির কৃপায় নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত তাঁহার অনুকূল হইবে, ইহাই তাঁহার আশা। এই সমস্যা মীমাংসার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ আরও ছয় সপ্তাহকাল ডক্টর গ্রাহামকে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে আলোচনা চালাইবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন; কিন্তু ইহাতেও যে কোন ফল হইবে, এমন আশা আমাদের নাই। কিন্তু ইহা সত্য যে, ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিগোষ্ঠীর সম্বন্ধে পাকিস্থানের মুখাপেক্ষিতার ভাব বিদ্যমান থাকিতে মিশর কিংবা ইরাণ কোন রাষ্ট্রই কার্যত পাকিস্থানের নিকট হইতে কোন ভরসা করিতে পারে না। বস্তুত মিশর এবং ইরাণের জাতীয়তাবাদী দল এই সত্য সম্যকভাবেই উপলব্ধি করিতেছেন। সেজন্য ভারতের সহানুভূতি লাভের দিকেই তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি। ভারত বৈদেশিক প্রভুত্ব এবং শোষণ-নীতির উচ্ছেদ সাধনে তাঁহাদিগকে রাষ্ট্র হিসাবে আগাগোড়া সমর্থন করিতেছে। ফলত ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শের মূলেই বিভিন্ন দেশ এবং জাতির আত্মাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বলিষ্ঠ অনুপ্রেরণা রহিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সমগ্র ঐতিহ্য এই আদর্শের প্রভাবে উজ্জ্বল। কিন্তু পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার মূলে নিছক মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধ উন্মাদনা এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের কূটনীতির আনুগত্য ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। এখনও পাকিস্থান যদি মধ্যযুগীয় সেই ধর্মান্ধতা এবং সাম্রাজ্যবাদীদের মনস্তুষ্টি সাধনের নীতি পরিত্যাগ না করে, তবে নবজাগ্রত মোশ্লেম জগতে কিছুতেই সে মর্যাদা লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। ইসলামের ঐক্য এবং সংহতির নামে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এশিয়ার নবজাগ্রত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ভেদ-বিভেদ দেখা দিলে মিশর, আরব, ইরাণ, আফগানিস্থান, এসব রাজ্যের সর্বনাশের পথই যে উন্মুক্ত হইবে, এটুকু বুঝিবার মত বুদ্ধি ঐসব রাষ্ট্রের নিশ্চয়ই আছে।

বৈদেশিকী

মিশরের সুয়েজ খাল অঞ্চলে বৃটিশ সামরিক প্রতাপের বহর বেড়েই চলেছে। ইংরেজের উদ্দেশ্য—কেবল মিশরকে নয়, অন্য আরব রাষ্ট্রগুলিকেও একটু ভয় দেখানো, যাতে তারা বৃটিশ, আমেরিকা, ফ্রান্স ও তুর্কী কর্তৃক প্রস্তাবিত মধ্য প্রাচ্য 'কমাণ্ড'এর আওতায় আসতে সহজে রাজী হয়ে যায়। সৈন্য-সামন্তের দিক দিয়ে মিশরের নিজের অবস্থা তত সুবিধার নয়। ইজরেলের সঙ্গে যুদ্ধে মিশরের সামরিক খ্যাতি বৃদ্ধি হয় নি, বরঞ্চ উল্টো হয়েছে। এখনও বোধহয় মিশরের অধিকাংশ সৈন্য ইজরেল সীমান্তে বসে আছে। তার অর্থ মিশরের ভিতরে মিশরের সৈন্য বেশী নেই, সৈন্য সব রয়েছে এমন জায়গায় যেখান থেকে তাদের মিশরের ভিতরে আসতে হলে সুয়েজ অঞ্চল দিয়ে অর্থাৎ তথাকার ক্রমবর্ধমান বৃটিশ বাহিনীর সামনে দিয়ে আসতে হবে। সামরিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে অবস্থাটা মিশরের পক্ষে মোটেই সুখপ্রদ নয়, তবে বৃটিশের সঙ্গে বর্তমান বিবাদে মিশরের পক্ষে সামরিক শক্তি প্রয়োগের প্রশ্নই উঠে না। মিশরকে প্রধানত রাজনৈতিক অস্ত্রই ব্যবহার করতে হবে। তবে সামরিক প্রতাপের বহর দেখিয়ে ইংরেজেরা যে মিশর গভর্নমেণ্টকে কিছুটা নরম করতে পারবে না সেটা বলা যায় না। তারপর, ওদিকে ইজরেল সীমান্তে যদি একটু আধটু গোলমাল চলতে থাকে তবে মিশরের পক্ষে আরো মুশকিল। ইতিমধ্যেই জানা যাচ্ছে যে, উক্ত সীমান্তে 'ঘটনা'র সংখ্যা সম্প্রতি বেড়েছে, ফলে মিশরের উপর যে চাপ পড়ছে তাতে ইংরেজের কিছু লাভ হবেই।

তবে কেবল গায়ের জোর না দেখিয়ে মিশরকে পথে আনা হোল—এই ধারণা জন্মাতে দিতেও ইংরেজ বা আমেরিকা চায় না, কারণ তাতে অন্যান্য দেশের, বিশেষ করে এশীয় দেশগুলির মন বিরূপ হবে। অথচ জোর দেখানো ইংরেজ নিজের পক্ষে প্রয়োজনীয় মনে করছে, তা না হলে আমেরিকাকে বাঁধা যাচ্ছে না।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এবং মধ্য প্রাচ্যেও এখন প্রধান শক্তি হয়ে উঠছে আমেরিকা, অর্থাৎ আমেরিকা এই সব অঞ্চলে বৃটেন ও ফ্রান্সের জায়গা নিচ্ছে অথবা বলা যায় যে, আমেরিকা 'বড়ো তরফ' এবং বৃটেন ও ফ্রান্স ছোট 'ছোটো তরফ' হয়ে উঠছে। কিন্তু বৃটেন ও ফ্রান্সের মুশকিল হচ্ছে এই যে, আমেরিকা আসলে বড়ো তরফ হয়েও বড়ো তরফের 'দায়িত্ব' নিতে কেমন যেন গড়িমসি করছে। তাই ছোটো তরফরা একটু এগিয়ে এমন জায়গায় গিয়ে পড়ছে যেখানে বড়ো তরফকে বাধ্য হয়ে তাদের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে, তা না হলে ইঙ্গ-মার্কিণ ব্লকের গোড়া নিয়েই টানাটানি পড়বে।

আমেরিকার সমর্থন না পাওয়াতে ইংরেজেরা ইরাণে বাড়াবাড়ি করতে পারে নি, কিন্তু মিশরে তারা এগিয়ে গেছে। বৃটেনে মিঃ চার্চিলের দল ক্ষমতা পাওয়ায় এ বিষয়ে ইংরেজের সাহস একটু বেড়েছে কারণ তারা ভাবছে যে মিঃ এ্যাটলী আমেরিকার কাছ থেকে যতটা সাহায্য ও সমর্থন আদায় করার আশা করতে পারতেন মিঃ চার্চিল তার চেয়ে বেশী করতে পারেন। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ও মধ্য প্রাচ্যে যাদের সঙ্গে বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিবাদ মার্কিনের নূতন সাম্রাজ্যবাদ তাদের সঙ্গে বনিয়ে চলার চেষ্টায় ছিল। সেই জন্যই আমেরিকা ইরাণে ডক্টর মোসাদেকের গায়ে হাত বুলিয়ে কেমন কাজ হাঁসিল করার এত চেষ্টা করল। একই কারণে মরক্কোতে আমেরিকা ফ্রান্সের চণ্ডনীতি পছন্দ করে নি। ফ্রান্স মরক্কোর জাতীয়তাবাদী দল 'ইস্তিকলাল'কে দমন করতে উঠে পড়ে লেগেছে যদিও মরক্কোর সুলতান পর্যন্ত ইস্তিকলালের সমর্থক। আমেরিকা ইস্তিকলালের সঙ্গে বনিবনাও করে চলতে ফ্রান্সকে পরামর্শ দিয়েছিল, কারণ মরোক্কোতে আমেরিকা যে সব সামরিক ঘাঁটি তৈরী করেছে সেগুলো থেকে ভালো কাজ পেতে হলে স্থানীয় লোকের সঙ্গে ভাব রাখা দরকার। কিন্তু পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্সের ও নূতন সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার স্বার্থ ও মেজাজ একরকম নয়; সুতরাং দুই পক্ষের মত ঠিক মিলছিল না। তবে ফ্রান্স আমেরিকার পরামর্শ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারে নি, সুলতানকে [illegible] গভর্নমেণ্টকে ইস্তিকলালের সম্পর্ক [illegible] করতে বাধ্য করেছিল বটে [illegible]। বর্তমানে গোলা বেশী [illegible] পারিনে [illegible] হয়েছে। কিছুদিন সে আবদার [illegible] নরম জাতীয়তাবাদীদের উপর থেকে মরোক্কোয় [illegible] আরম্ভ হয়েছে, বহু লোক ভীষণ অত্যা[illegible] হত্যা [illegible] করিয়েছে এবং ফরাসী কর্তৃপক্ষ শাসিয়েছেন যে, প্রয়োজন হলে আরো জব[illegible] দস্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে। মিশ[illegible] বর্তমান বৃটিশ হালচালের সঙ্গে মরোক্কো[illegible] ফরাসী হালচালের যেন একটা মিল আ[illegible] মনে হয় বৃটিশ ও ফরাসী গভর্ন[illegible] এমন একটা ধারায় চলেছেন যার উ[illegible] হচ্ছে অথবা ফল হবে এই যে অতি শী[illegible] আমেরিকাকে সাক্ষাৎভাবে এই সব অঞ্চ[illegible] 'দায়িত্ব' স্কন্ধে নিতে এগিয়ে আসতে [illegible]

বৃটিশ গভর্নমেণ্ট মিশরে যেমন সাম[illegible] প্রভাব দেখাচ্ছেন, সুদানে তেমনি [illegible] নীতির খেলা চলছে। সুদানে ইংরে[illegible] একটি দলকে সযত্নে লালন করে [illegible] করেছে, যারা মিশরের সঙ্গে সুদা[illegible] সম্পর্ক রাখতে চায় না, সুদানকে সম্প[illegible] স্বতন্ত্র করতে চায়। তার উপর আর এ[illegible] দলের কথা সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে, [illegible] নাকি সুদানে মিশরীয় ও বৃটিশ [illegible] কর্তৃত্বেরই বিরোধী, তারা সুদা[illegible] স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য ইউনো'র সা[illegible] প্রত্যাশী। অবশ্য সুদানকে মিশরের [illegible] থেকে সরিয়ে কোন রকমে ইউনো'র [illegible] এনে ফেলতে পারলেও ইংরেজের লাভ, [illegible] তাতে আপাতত সুদানে বৃটিশ প্রা[illegible] থাকবে।

* * *

প্যারিসে ইউনো'র মিটিং ও শা[illegible] লড়াই চলছে। জগতে শান্তি আনার [illegible] ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ থেকে একটি প্র[illegible] ঘোষিত হয় এবং তার পরে যথার[illegible] সোভিয়েট পক্ষ থেকে একটি পাল্টা প্র[illegible] ঘোষিত হয়েছে। এখন কিছুকাল [illegible] পক্ষের বাদানুবাদে আকাশ-ব[illegible] তরঙ্গায়িত হবে। মানুষের পক্ষে [illegible]দিন বিপদের [illegible] যে, [illegible] ওয়[illegible] রুশ ও ইঙ্গ-মার্কিনের [illegible] খেতে এখন [illegible] টানাপড়েনের ধাক্কা খে[illegible]তাবই স্বাভাবিক[illegible] কোন পক্ষের কোন [illegible] প্রবৃত্তি কারো হয় না [illegible] সাধারণ মানুষের বুদ্ধির [illegible] ফলে [illegible]ভাবই রাষ্ট্রপতিদের কার্য বা [illegible] উপর হয় না। পৃথিবীর পক্ষে, প্রকৃ[illegible] তান্ত্রিক জীবনধারার পক্ষে এর চেয়ে [illegible] মারাত্মক আর কিছু হতে পারে না[illegible]

* * *

ওদিকে কোরিয়ার যুদ্ধবিরতির [illegible] শেষ হয়ে কাজ কবে হবে বা কোনো[illegible] কি না, তা বুঝা যাচ্ছে না। [illegible] পালা শেষ হয়ে পান-মুন-জন-এর

কতদিন চলেছে, তার হিসাবও লোকে ভুলে যাচ্ছে। আগে বিতর্কের বিষয় ছিল, দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিরতির লাইন কোথায় হবে। চীনা ও উত্তর কোরিয়ানদের প্রস্তাব ছিল যে, উভয় পক্ষের সেনা সরে গিয়ে ৩৮ অক্ষরেখার দুদিকে থাকবে। মার্কিন সেনাধিনায়ক তাতে কিছুতেই রাজি নন, তাঁর দাবী যে, বর্তমানে যুদ্ধের লাইন যেখানে যেমন আছে, মোটামুটি সেইটাই যুদ্ধবিরতির লাইন হবে। ওপক্ষ এখন তাতেই রাজি, কিন্তু তবুও যুদ্ধবিরতি চুক্তি হচ্ছে না। যাঁরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাগজ পড়েন, তাঁদের, এমন কি, যাঁরা চীনা ও উত্তর কোরিয়ানদের বিরুদ্ধবাদী, তাঁদেরও ধারণা হচ্ছে যে, যে কারণেই হোক, মার্কিন কর্তৃপক্ষ কোরিয়ায় যুদ্ধ থামিয়ে দিতে ভরসা পাচ্ছেন না।

১২।১১।৫১

চক্রদত্ত

শরীরের ভিতরের কোনও রোগ ধরতে হলে আজকের দিনে এক্স রে'র সাহায্য গ্রহণ করা হয়। এই উপায়ে শরীরের অংশ-বিশেষের ছবি নেওয়াই সম্ভব হয়—একসঙ্গে সমস্ত শরীরের ছবি নেওয়া যায় না। সিকাগোর ডাঃ মরিস ফিন্ বীন্ এতদিনে এই অসুবিধা দূর করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি এক্স-রে ক্যামেরা নামে এক নতুন ধরণের ক্যামেরা বার করেছেন; এই ক্যামেরার সাহায্যে মানুষের দেহের ভিতরের সমস্ত ছবিটা একসঙ্গে তোলা যাবে। এক্স-রে ছবি তোলার সবচেয়ে বড় অসুবিধা এই যে, ছবি তোলার জন্য যে রশ্মি শরীরে ফেলা হয়, সেটা যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থাৎ অপরিমিত হয়ে যায় তাহলে শরীরে ঐ অংশটি পুড়ে যেতে পারে। ডাঃ ফিস্ বীনের আবিষ্কৃত নতুন এক্স-রে ক্যামেরাটিতে কিন্তু সে রকম কোনও অসুবিধা ঘটতে পারে না। কারণ এই ক্যামেরার লেন্সের সামনে একটা বিশেষ ধরণের ফিল্টার লাগান থাকায় ঐ রশ্মিটা শরীরের ওপর খুব তীব্রভাবে পড়তে পারে না। সাধারণভাবে একটা এক্স-রে প্লেটের সাহায্যে একটা [illegible] সমস্ত শরীরের ছবি [illegible] হলে অন্তত একটি দৈর্ঘ্যে সাত ফিট এবং [illegible] ২৯ ইঞ্চি বিশিষ্ট প্লেটের প্রয়োজন। অথচ এই নতুন ক্যামেরাতে মাত্র ১৪ ইঞ্চি লম্বা [illegible] সমস্ত মানুষের এক্স-রে ছবি তোলা সম্ভব হবে।

*

মানুষের সখের শেষ নেই। সখ করে আমরা কত কি করে থাকি। অনেকে সখ করে কাচের বাড়ি তৈরী করে তাতে বাস করে তা আমরা জানি। কিন্তু সখ করে যে কাচের তৈরী নৌকা করে বিহার করা যায় একথা আমরা অনেকেই শুনিনি। বর্তমানে একটি কোম্পানী কাচের নৌকা তৈরী করেছে। শুধু যে তৈরী করছে তা নয় লোকে এই সমস্ত নৌকা ব্যবহারের জন্য কিনছে। দেখা গেছে যে এই কাচের তৈরী নৌকাতে সাধারণ কাঠের তৈরী নৌকার চেয়ে অনেকগুলি সুবিধা আছে--যেমন নোনা জলে এর কোন ক্ষতি করতে পারে না। তাছাড়া উই অথবা রোদে এগুলো
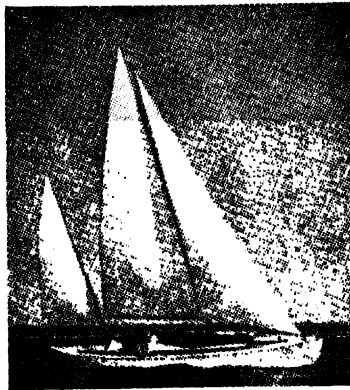
কাচের তৈরী নৌকা করে নৌকাবিহার করছে। লম্বায় এটা প্রায় ৪২ ফুট

মোটেই নষ্ট হয় না। সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে যে এই নৌকা কাঠের নৌকার চেয়ে অনেক বেশী হালকা হয়। এই ধরণের নৌকা 'ফাইবার গ্লাস' নামক এক বস্তু দিয়ে তৈরী করা [illegible]

*

আজকের [illegible] কোটিজোনের নাম আমাদের কাছে খু[illegible] অপরিচিত নয়। এই কোটিজোনের সাহা[illegible] বাত জাতীয় রোগের চিকিৎসা করা হয়ে [illegible]। কিন্তু মুশকিলের কথা এই যে, রোগী বা [illegible] অনুপাতে এই ওষুধ সরবরাহ হয় না। কারণ এই ওষুধ তৈরী করার প্রয়োজনীয় উপাদান বেশী পাওয়া যায় না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা কৃত্রিম উপায়ে কোটিজোন তৈরীর প্রচেষ্টার্থে বহু পরীক্ষা করছেন। মেক্সিকোর কয়েকজন বৈজ্ঞানিক এই অসুবিধা দূর করতে সক্ষম হয়েছেন। সবচেয়ে মজার কথা এই যে, এই বৈজ্ঞানিকের দলে যে সব বৈজ্ঞানিক আছেন, তাঁদের সকলেরই বয়স ২৭ বছরের মধ্যে। তাঁরা মেক্সিকোর জঙ্গল জাত 'ইয়ম' নামে একরকম বড় ধরণের আলু থেকে কৃত্রিম উপায়ে কোটিজোন তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রায় দু বছর ধরে এই পরীক্ষা করে তবে ইয়ম থেকে কোটিজোন পাওয়া গেছে। এর জন্য খুব কম করলেও ২২ বার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হয়েছিল। এই আবিষ্কারের ফলে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, ১৯৫৪ সালের মধ্যে বাজারে এত বেশী কোটিজোন পাওয়া যাবে যে লোকদের আর এই ওষুধ কেনবার জন্য কালোবাজারে দৌড়তে হবে না।

*

টেস্মেনিয়াতে এক ধরণের গাছ পাওয়া গেছে, যেগুলো এখানে প্রায় ৫ থেকে ১০ লক্ষ বছর আগেও দেখতে পাওয়া যেত। সবচেয়ে মজা যে, এই গাছের গুঁড়ি থেকে কাঠ কেটে নিয়ে যদি একটু ঘষে পরিষ্কার করা যায়, তাহলে সেটা ঠিক 'ওপেলের' মত দেখতে হয়। বৈজ্ঞানিকরা আন্দাজ করছেন যে এই গাছ এখানে সেই পুরা-কালের বরফের যুগ থেকে দেখতে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকরা এখন এই গাছের কাঠ কেটে কেটে পৃথিবীর বিভিন্ন যাদুঘরে রাখবার জন্য পাঠাচ্ছেন। তাছাড়া দু একটা চারাগাছও এখান থেকে এনে ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগান হচ্ছে, যাতে করে প্রয়োজন হলে এর ওপর বিভিন্ন ধরণের গবেষণা করা যায়।

সন্ধিপর্ব

হীরালাল দাশগুপ্ত

ডাকিনী যোগিনী মন্ত্র নয়
বেদ বেদান্ত তন্ত্র নয়
গত অমানিশা মধ্যকাল
ছিন্ন তমসা-ধূম্র-জাল
গতি ও প্রগতি যুক্তিময়
যন্ত্রের হাতে যন্ত্র ক্ষয়
ফ্যাকাশে আকাশে চক্র লাল।
আলো-তমিস্রা পর্বসন্ধি
সন্দেহ মনে জিজ্ঞাসা—
ভাষা-শৃঙ্খলে ভাবনা বন্দী?
পরমাণু-প্রেত প্রত্যাশা?
চল্‌তে চড়াই উতরাই পথ
অবিরাম চলা রাত্রি দিন
অগ্নি-গর্ভ কভু পর্বত
কভু প্রান্তর হিম তুহীন—
রাত্রি দিন
সীমানাহীন।
তবুও চলার বিরাম নাই,
চলার পথ এ-দুনিয়াটাই।
চল্‌তে চল্‌তে পথের প্রান্তে
পান্থশালায় কাটানো রাত
নিশীথে শান্তি পরিশ্রান্তে
সকালে পুরনো অশ্রুপাত—
কাটিয়ে রাত
অশ্রুপাত।

আকাশে আকাশে ওড়ে ঈগল
শকুনেরা করে ভাগাড়ে ভিড়
চারিদিকে তার অথৈ জল
শিকারী ধনুকে বাগিয়ে তীর।
মনের দেবতা মিথ্যা আজ
মাটির দেবতা পথে পথে
না-জানা-না-মানা প্রধান কাজ
অমিলের মিল মতে মতে।
হাটের সভায় হট্টগোল
হাজার কণ্ঠে অট্টরোল—
হট্টগোল
অট্টরোল।
সেই পুরাতন টানাটানি—
এই দুনিয়ার মালিক কে?
অস্ত্রে অস্ত্রে হানাহানি
কাড়াকাড়ি নিয়ে মানিক কে!
ওলট্‌ পালট্‌ দিক্‌ বিদিক্‌
মরণেই মন আসক্ত
পাগ্‌লা কুকুর [illegible]কে
পায়ে পায়ে সাপ [illegible]বাক্ত।
হৃদয় যাদের [illegible]শান্তিহীন
বাহিরে [illegible]দের সুখ কোথায়?
স[illegible]হীন
[illegible]দের [illegible]দিন
নগর তাদের নরকে যায়।

১৭

গোপালপুর থানা থেকে বেরিয়ে হাজিপুরে এসে পৌঁছতে লেগেছিল একটি দিন ও একটি রাত। পুলিশের হেপাজতে আছে হাসনু আর হিরণ, ছোট দারোগা ছিলেন সঙ্গে, আর ছিল তিনজন সশস্ত্র কনস্টেবল। হাসনু ছিল মক্ষীরাণী, সুতরাং সমস্ত পথটায় সহযাত্রীরা আনন্দ পেয়েছিল প্রচুর। অতখানি পথ,—মাঝখানে একবার রেলগাড়ি আর দুইবার নৌকা,—কিন্তু একটি কানাকড়িও রাহাখরচ লাগেনি,—হাসনুর মনে সে-আনন্দও ছিল। সমস্ত পথটায় সে গান গেয়েছে প্রাণের উল্লাসে, তাতিয়ে তুলেছে হিরণকে এবং মাতিয়ে তুলেছে আর সবাইকে। ছোট দারোগার চাকরি-জীবন সার্থক, সন্দেহ নেই। আর তাঁর সঙ্গী ওই [illegible]নজন কনস্টেবল,—ওদের তিন-দুগুণে ছয়টা [illegible] চক্ষু কী দেখেছিল, বলাই বাহুল্য। [illegible]সনু চিরকালের জন্য ওদের মাথা খেয়ে রাখলো।

হাজিপুরের ঘা[illegible] [illegible]মবার আ[illegible] হাসনু বলে ছিল—যেমন সে চি[illegible] বলে এসেছে —সংঘাত আর সংগ্রামে আমার [illegible]ত্য পরিচয় ফোটে। আমি মেয়ে, কিন্তু অব[illegible] নই, আমি জন্মযোদ্ধা। ফুলের মালা আ[illegible] হাতে দাও, কারো গলায় পরাতে গে[illegible] আমার হাত কাঁপবে; তরবারি দাও, হাতে মানাবে। বিরোধ আনো আমার সামনে, আনো ভয় আর বাধা, আনো কাপুরুষতা আর কপটতা,—আমি তাদের প্রতিকার জানি।

হিরণ প্রশ্ন করলো, গায়ের গয়নাগুলো খুলে জলে ফেলে দিয়ে এলি কেন?

হাসনু জবাব দিয়েছিল, ওগুলো বশ্যতা স্বীকারের চিহ্ন। হাতের চুড়ি হোলো স্নেহ-মোহ আর সেবার প্রতীক, গলার হার হোলো মালাবদলের সঙ্কেত, কানের ফুল হোলো লোভের হাতছানি, চোখের সুর্মা হোলো মায়া! আমার জীবনে এর কোনোটাই আমি স্বীকার করিনে।

তবে কিসের টানে তুই সংসারে বাঁধা?

সংসারের টান নয়, টান মনুষ্যত্বের। সংসারের টান হোলো ভালোবাসার,—যার ছোট আশ্রয়ে মানুষ বাসা বাঁধে। মনুষ্যত্বের টান হোলো অনেক বড়,—সে ঘুচিয়ে আসে মোহ-বন্ধন, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে আসে ঘর-গেরস্থালি।

সেই মনুষ্যত্বের চেহারাটা কেমন?

চেহারাটা যদি বাঙ্ময় হয়, ক্ষতি নেই। কীর্তি আর সাফল্য দিয়ে তার বিচার চলবে না,—আইডিয়া দিয়ে তার বিচার। তার বিচার সত্যপ্রকাশের দিক দিয়ে।—হাসনু বলেছিল, এপারে ওপারে এই যে লক্ষ লক্ষ নিরুপায় মেয়েপুরুষ কাঁদতে বসেছে,—এ কি শুধু সম্পদ্ হারাবার জন্যে? ঘটিবাটি খোয়াবার জন্যে? না, তার জন্য নয়। ওরা মনুষ্যত্বের আইডিয়াটা খুইয়েছে; যে আলোটা ওরা চোখের সামনে জ্বালিয়ে রেখেছিল যুগ-যুগান্তর, সেই আলোটা ওরা হারিয়েছে চারি দিকের ধু[illegible]য় আর ধোঁয়ায়। ওরা ঘর হারায়নি পথ [illegible]ছে; বিচার হারায়নি, বিশ্বাস হারিয়েছে!

সন্ধ্যার আগে[illegible] ওরা নেমেছিল হাজিপুরের ঘাটে। নাম[illegible] সঙ্গে সঙ্গে খবরটা চারি দিকে রটে যায়, দ[illegible]ল দ[illegible] লোক এসে দাঁড়ায় ঘাটের ধারে। [illegible]ওদেরকে অ[illegible]না করার জন্য হাটতলা থেকে বহুলোক আসে,—চাষী, মাঝি, ফড়ে, দোকানদার, ছাত্র ইত্যাদি বহুশ্রেণীর লোক। এ গ্রামের চলতি জীবনধারাটা যেন সহসা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। জমিদার থাকতেন সাধারণ লোকের নাগালের অনেকটা বাইরে, জমিদারের মেয়ে যাঁরা থাকতো লোকচক্ষুর অন্তরালে। কিন্তু ওরা দুজন,—হাসনু আর হিরণ,—ওদের বাসা ছিল গ্রামের হৃদয়ের মধ্যে। জমিদার ছিল আরাধ্য, ওরা ছিল বাঞ্ছিত। জমিদারের প্রতি ছিল শ্রদ্ধা, ওরা পেয়ে এসেছে ভালোবাসা। সেই ভালোবাসা আজ শত শত কণ্ঠে নদীর ঘাটে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল।

খবর পেয়ে হাজিপুর থানার দারোগা একা এসে দাঁড়ালেন। বুড়ো দারোগাকে দেখেই হাসনু আর হিরণ হেসে উঠলো। তিনি এবম্বিধ ব্যাপার দেখে একেবারে হতবুদ্ধি। গ্রামের জামাই আর দিদিমণি গ্রামে ফিরেছে পুলিশের হেপাজতে,—এ দৃশ্য তাঁর কাছে একেবারে অভিনব। হাসনু তাড়াতাড়ি এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললে, কেমন আছ, দাদু?

বুড়োর নাম হারু মিঞা। ওর ছেলে বাঁচাতে গিয়েছিল জীবেন্দ্রনারায়ণকে গেল বছরে,—কিন্তু আগুনে সে পুড়ে মরেছে। বুড়ো নিশ্বাস ফেলে বললে, এখনও মরি নাই, বুন। ওরে জামাই, মা-বইনরে ফেইলা পালাই ছিলি, পোড়ার মুখ লইয়া ফিরা আইলি ক্যান্? একটু শরম নাই?

এ প্রশ্নের কোনো জবাব নেই। হিরণ এসে দাঁড়ালো বুড়ো হারু মিঞার পাশে। হাসনুর দুই চোখে জল এসেছিল।

গোপালপুরের ছোট দারোগা এসে সমস্ত ব্যাপারটা হারু মিঞাকে বুঝিয়ে দিল। ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই, ওরা ছদ্মবেশ ধারণ করে ঘুরছিল গ্রাম-গ্রামান্তরে। ওরা কখনো হিন্দু, কখনো বা মুসলমান। ওদের অভিমত এবং বক্তব্য হলো পরস্পরবিরোধী, ওরা যে ডালে বসে সেই ডাল কাটে। ওরা কথার করাত দিয়ে কাটে পাকিস্থান, কাটে হিন্দুস্তান। ওদের সত্যকার পরিচয়টাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই ওদেরকে আনা হয়েছে হাজিপুরে, এখান থেকেই ওদের সম্বন্ধে তদন্ত হওয়া দরকার।

হারু মিঞা সমস্ত খবর শুনে সংশয় প্রকাশ করে বললেন, ঘরের ছেলেমেয়ে ঘরে

ফিরেছে, তদন্ত কিসের? মেয়েটা হোলো এমদাদ আলির বেটি, আর ছেলেটা হোলো হারাণ চক্কোত্তির বেটা,—গাঁয়ের পুরুত। পীরের দরগায় সিন্নি দিয়ে ছোটবেলা ওর বাপ ওর কালাজ্বর ছাড়িয়েছিল। ওর ঠাকুরদাদা ছিল আমার মাস্টার। আমার গাই-গরুর দুধ খেতো ওর মা আঁতুড়ে। আমার বাগানের আম-জাম চুরি করে খেয়ে এই ছেলেমেয়ে দুটো মানুষ,—এদের আবার তদন্ত কি বটে? পাকিস্থানের লাইগা বুঝি মাইয়া-পোলারে গারদে চালান দিমু? তোমাগো আর কোনো কাম নাই?

ইতিমধ্যে হামিদ সাহেবের কাছে খবর গিয়েছিল রাজবাড়িতে। বুড়ো হারু মিঞা ছোট দারোগার দিকে চেয়ে বললেন, আজ রাত্রে তোমরা থাকো এখানে, কাল সকালে উঠে চলে যেয়ো। হাসনু আর জামাইয়ের ভার আমি নিলুম। রাজার বাপের আমল থেকে আমি এখানে নোক্‌রি করি, আমি ওদের হাড়হদ্দ জানি। জামাই, মাইয়ারে লৈয়া যা তোর যেখানে খুশি।

বহুলোকজন জড়ো হয়েছিল হিরণ আর হাসনুকে ঘিরে। ওরা এলো বারোয়ারিতলায়, জনতা এলো পিছনে পিছনে। তারা বহুকাল পরে পেয়েছে কাম্যবস্তু, সুতরাং সহজে ছাড়তে রাজি নয়। গ্রাম ছিল অন্ধকার, হঠাৎ জ্বলে উঠেছে আলো। ওদের মধ্যে ছিল সেই জনতার একটা অংশ—যেটা একদা রাজবাড়িতে আগুন দিয়েছিল। ওরা জনসাধারণ। ওরা ক্ষণমর্জি। আদিম বৃত্তি নিয়ে ওরা ঘর করে। কালাপাহাড় এসে দাঁড়ালে ওরা ক্রোধে উন্মত্ত হয়, তাতার দস্যুর উস্কানিতে ওরা হয় হিংসায় অন্ধ, শ্রীচৈতন্যের অনুপ্রেরণায় ওরা হয় প্রেমে পাগল, রাজনীতিক নেতার প্রচারকার্যের গুণে ওরাই আবার ঘৃণাবিদ্বেষ অভিমানে মেতে ওঠে। ওরা জনসাধারণ,—ওরা শিশুর মতো সরল। শিশুর মতো মূঢ় আর অজ্ঞান।

কিন্তু এই বিশাল জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়েও হাসনুর মন ছিল অন্যমনস্ক। সুমিত্রার কথা সে ভোলেনি। কারো মুখে সে এখনও ছোটরাণীর উল্লেখ শোনেনি। হারু মিঞাকে সে মুখ ফুটে জিজ্ঞাসাও করেনি। রাজবাড়িতে এতক্ষণে তাদের আগমন-বার্তা অবশ্যই পৌঁচেছে, কিন্তু হাসনুর মনে এই প্রত্যাশা ছিল, ছোটখুড়ি সমস্ত বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলে তাদের দুজনকে আমন্ত্রণ করে ঘরে তুলবেন। যদি অন্ত্রি ছুটে আসে ভিড়ের ভিতর থেকে কিংবা অন্তত যদি আসে ফকিরের মা। এ-গ্রামের বাইরে হাসনু হোল নায়িকা, হোল সমাজনেত্রী—কিন্তু গ্রামের চৌহদ্দীর মধ্যে সে হলো শিশুকন্যা; তার কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। জননী জন্মভূমির কোলে এসে স্বকীয়তা সে হারিয়েছে।

হিরণের প্রতি জনতার সমাদর দেখবার মতো। বহু লোক তাকে নিয়ে লোফালুফি করছিল। রাজকন্যা হবে তার স্ত্রী, আর রাজার সম্পত্তির সে হবে কর্ণধার। কিন্তু তার এই পরিচয়টা একটা বিশেষ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর বাইরে হিরণের পরিচয় হোল, সে সর্বসাধারণের লোক। তার জাত্যাভিমান নেই, কোন একটা বিশেষ মনোবৃত্তির দাসত্ব সে করে না। তার লোভ নেই বলেই স্বার্থরক্ষার দায় নেই। এর মধ্যে পায়ের জুতো জোড়াটা খুলে কাকে যেন সে দান করেছে; পাঞ্জাবীটা খুলে দিয়েছে যেন কার হাতে, পুঁটলীর থেকে ফেজ টুপীটা বের করে কার মাথায় যেন যে পরিয়ে দিয়েছে।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে বহুলোকের অনুরোধে বারোয়ারিতলায় যখন গান-বাজনার আসর বসেছে; তখন হামিদ সাহেব এলেন তাঁর দলবল নিয়ে। তাঁর মনে যাই থাক্‌, মুখে ছিল হাসি। রাজার সম্পত্তির তিনি সরকারী অছিদার, তাঁর জিম্মায় আছে রাজ-বাড়ী আর মালখানা, তিনি এখন কাছারির হর্তাকর্তা,—সুতরাং তাঁর খাতির অন্য রকমের। তিনি এসে পেঁৗছতেই হাওয়াটা গেল বদলে, তাঁকে সম্মানের সঙ্গে বিশেষ জায়গায় এনে বসানো হোলো। অমায়িক মৃদুহাস্যে মুখখানা তাঁর প্রসন্ন; কেবল তাঁর জন কুড়ি অনুচর বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে আসরের একপাশে একটু আড়ালে গা বাঁচিয়ে দাঁড়ালো। তাদের মধ্যে দু'একজন পশ্চিমা লোক, কিন্তু বাদবাকী দেহরক্ষীদের প্রায় সকলেই পাঠান শ্রেণীর মুসলমান,—যাদের আকার প্রকার এবং চেহারার সঙ্গে এ গ্রামের কোনো [illegible] নেই। হাসনু গান গাইতে গইতে [illegible]বার সমস্তটা দেখে নিল, এবং অলক্ষ্যে হাসনুর মুখের দিকে তাকিয়ে হির[illegible] মনে কিছু দুর্ভাবনা দেখা দিল। [illegible]র ঈষৎ ভ্রূভঙ্গীর সঙ্গে ভা[illegible] হতে হতে প্রায় বেঁচে গেল, এবং এই ভ্রূভঙ্গীর অর্থ হিরণ জানে। হামিদের ওই অমায়িক প্রসন্ন মুখের ছবিতে হাসনু কপটতার রেখা লক্ষ্য করেছে,—এটা হিরণের চোখ এড়ায়নি। সশস্ত্র দেহরক্ষীদেরকে লক্ষ্য করেছে হাসনু তার গানের অন্তরাতে। হাসনুর প্রাণের দিগন্তে ঝঞ্ঝার রক্তিম নিশানা দেখা দিয়েছে,—এও চোখে পড়ে গেল হিরণের।

গানের তারিফ করতে গিয়ে মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিল শ্রোতা সাধারণ। হাসনুর সঙ্গীতচর্চার সঙ্গে তাদের পরিচয় অনেক দিনের, কিন্তু এমন গান তারা আগে শোনেনি। সঙ্গে তার কোনো যন্ত্র থাকে না, থাকে না কোনো আয়োজন,—যে কোনো সময়ে এবং যে কোনো অবস্থায় তার প্রাণের অফুরন্ত প্রাচুর্য কোনো একটা উপলক্ষ্য পাবামাত্র স্বতঃস্ফুরিত হয়ে ওঠে। তার গানের আসর হঠাৎ বসে যেতো হাটতলার বিবাদের মধ্যে, বসে যেতো নদীর ঘাটে, বসে যেতো ফসলকাটা মাঠের ধারে। দুঃখীর ঘরে ঢুকে দারিদ্র্যের মাঝখানে বসে যেতো হাসনু, বসে যেতো আর্তজনের শিয়রে, হয়ত বা বসে যেতো সন্তানহারা কোনো বিধবার পাশে। তাকে এড়াবার যো ছিল না। কিন্তু মীরা এ কাজ পারতো না। মীরার ছিল আড়ষ্টতা, ছিল আনম্র সংকোচ, ছিল মৃদু স্বভাবের স্বল্পভাষণ। যুদ্ধের সজ্জা নিয়ে মীরা কোথাও এগিয়ে যেতে পারতো না, আপন চিত্তের ওজস্বিতার গুণে কারোকে প্রভাবিত করার শক্তি ছিল না তার, বিধি-নিষেধের অবরোধকে প্রবল কণ্ঠে অস্বীকার করতে সে ভ[illegible] যে, [illegible]জন্য মীরা পিছিয়ে পড়ে থাকতো। হাসনু [illegible]ইতো তেজ, বিক্রম, সাহস, বীর্য, ব[illegible]তা; মীরা চাইতো সংস্কৃতি, সংশিক্ষা, সৌজন্য, শান্তি, আনন্দ। [illegible] চা[illegible]তো বিরোধের মীমাংসা, হাসনু চাই[illegible] অন্যায়ের প্রতিকার। মীরা চাইতো [illegible]রী সমাজের পরিবর্তন হাসনু চা[illegible]তো নারী জগতের বিপ্লব। মীরা চাইতো [illegible]দ্ধির সংস্কার, হাসনু চাইতো দুর্বুদ্ধির সংহার। মীরার মন ছিল বিন্যাসে, হাসনুর মন ছিল বিদ্রোহে। মীরা বলতো, বিশ্ব-সৃষ্টি আনন্দময় হোক: হাসনু বলতো, বসুন্ধরা হোক বীরভোগ্যা!

গান যখন থামলো, রাত তখন এগারোটা বেজে গেছে। কার্তিক মাসের হিম, তবু লোকের ভিড় এতক্ষণ ধরে বেড়েই চলেছিল,

বহু লোক মাথায় মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্থানীয় থানার লোকজন নিয়ে হারু মিঞা বসেছিলেন একপাশে। তাঁর সঙ্গে ছিল গোপালপুর থানার লোকেরা। এপাশে শান্তভাবে হামিদ সাহেব অপেক্ষা করছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল হিরণ আর হাসনুর প্রতি।

আসর ভাঙ্গার পর হামিদ সাহেব এগিয়ে এসে হারু মিঞাকে ডাকলেন। বুড়ো কাছে এসে দাঁড়াতেই হামিদ বললেন, ওদের কি বন্দোবস্ত করছেন আপনি?

হামিদের মনোভাব অনেকটা হারু মিঞার জানা ছিল, কেননা হামিদ গত কয়েক মাসের মধ্যে অনেকবার থানায় এসে হাসুবানুর সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করতেন। হারু মিঞা বললেন, কেমন বন্দোবস্ত হলে আপনি খুশী হন্?

ওরা কি এখানে ছাড়া থাকবে?

ওদের দেশে ওদেরকে বেঁধে রাখতে যাবো কেন?

হুঁ। —হামিদ কি যেন কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করলেন। পরে বললেন, কিন্তু ওদের কার্যকলাপে পাকিস্থানের লোসকান হতে পারে ত?

হারু মিঞা একবার হামিদ সাহেবের আপাদমস্তক লক্ষ্য করলেন। পরে বললেন, আপনি কি চ্যাংড়া চ্যাংড়ীরে থানায় বাইন্দা থুইতে কন্?

হামিদ সাহেব যুক্তি সহকারে বললেন, হাসুবানু চলুক রাজবাড়ীতে আর হিরণ না হয় থাক্ আপনার জিম্মায়?

ক্যা[illegible]

রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য!

হারু মিঞা [illegible]লেন, আর আমার নিজের নিরাপত্তাটা? 'পোলাডা[illegible]নায় ধইর্যা রাখবো, আর গাঁয়ের লোক আমাকে [illegible] পিটুনী দেবে না? থানা জ্বালিয়ে দেবে, হ[illegible] দাঙ্গা বাধাবে, আমার ঘরের মাইয়া-ছাওয়া[illegible]রে বেইজ্জত করবে,—এই আপনি চান্?, আমা[illegible] প্রাণডা যাইলে পাকিস্তানের লগে কোন্ কলা?

এবার হামিদ সাহেব হারু মিঞার দিকে আপাদমস্তক তাকালেন। কিন্তু ভিতরের রুদ্ধ আক্রোশ বাইরে তিনি প্রকাশ পেতে দিলেন না। শুধু মুখে বললেন, কিন্তু ওদের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আছে, আপনার নিশ্চয় জানা উচিৎ!

হারু মিঞা একবার গোপালপুরের দারোগার দিকে তাকালেন। দারোগা বললেন, আমাদের কাগজপত্র আপনাদের দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে যেতে পারলে আমাদের আর দায়িত্ব নেই!

হামিদ বললেন, ওরা তবে থাকবে কোথায়?

হারু মিঞা বললেন, ওই যে আসছে ওরা, আপনি জিগান্!

হাসনু আর হিরণ এসে সামনে দাঁড়ালো। হাসনু বললেন, দাদু, আমরা থাকবো কোথায় বললে না ত?

হারু মিঞার বদলে হামিদ সাহেব জবাব দিলেন। বললেন, বেয়াদপি মাফ করবেন। আমি আপনাকে রাজবাড়ীতে নিয়ে যেতে এসেছি।

হাসনু মুখ তুলে বললে, আপনি কে?

আমি ছোট রাণী সাহেবার প্রতিনিধি! তিনি আপনাকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছেন!

হাসিমুখে হাসনু বললে, আমাকে নিয়ে যাবার জন্য কি ওই সশস্ত্র পাঠানের দল তাঁরই পাঠানো?

হামিদ বললেন, ওরা রাজবাড়ীর পাহারাদার। আপনাকে সরকারীভাবে খাতির করার জন্যে ওরা এসেছেন!

হাসনু হঠাৎ হিরণের দিকে তাকালো। বললে, ব্যাপারটা যেন কেমন লাগছে, না রে জামাই?

হিরণ জবাব দিল, মন্দ কি, ভালোই লাগছে!

বেশ ঘোরালো, না?

রাজকীয়! হিরণ জবাব দিল।

হামিদের দিকে ফিরে হাসনু সহাস্যে প্রশ্ন করলো, ক্ষমা করবেন, আপনার নাম কি?

ঈষৎ আহত কণ্ঠে হামিদ বললেন, আমার নামটা কি আজো আপনার কানে ওঠেনি?

কই, শুনিনি ত?

হিরণ বললে, ওঁর নাম মিঃ হামিদ আলি। উনি এখন কাকাবাবুর জমীদারির অভিভাবক। উনি সমস্তই দেখাশোনা করেন[illegible]

হারু [illegible] বাকি কথাটা যুগিয়ে দিলেন, সেরেস্তা-কাছারি[illegible] তুই যা করতিস, উনি এখন তাই করেন।

হাসুবানু বললে, শু[illegible] খুশী হলুম। যোগ্য ব্যক্তি সন্দেহ নেই। [illegible]র বেত[illegible] কত, দাদু?

বুড়ো হারু মিঞা চটে উঠলো, বললে, তোর সে খবরের দরকার কি? ব্যাতন তুই জোগাবি? উনি যা ব্যাতন পান তা তোর বাপদাদায় শোনে নাই! নগদ আড়াই হাজার, তার ওপর পাঁচশো টাকা মাগ্গি ভাতা! শুনেছিস কখনো?

হাসনু বললে, এমন কিছু বেশী নয়, দাদু। কিন্তু টাকাটা দেয় কে?

জমীদার, না সরকার?

হিরণ বললে, তোর যত আজগুবী কথা! জমীদারের সম্পত্তি দেখাশোনা করবেন উনি, আর টাকা জোগাবে সরকার?

কঠিন মুখখানা হাসনু কিয়ৎক্ষণ নত ক'রে রাখলো। তারপর মুখ তু'লে বললে, আর ওই পাহারাদারদের খরচ?

হামিদ জবাব দিলেন, ওটাও জমীদারের খরচ!

এতে ছোট রাণীর সম্মতি আছে?

হামিদ এবার একটু হাসলেন। বললেন, আছে বৈ কি।

জনতার ভিড় তখনো সকলকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। সেই দিকে একবার তাকিয়ে হাসনু বললে, আচ্ছা, চলুন তবে?

ভিড়ের ভিতর থেকে কয়েকজন ডাকলো, দিদিমণি?

হাসনু মুখ ফিরিয়ে হাসলো। কী মধুর সুন্দর হাসি তা'র। বললে, ভয় নেই রে, এখন আর আমি কোথাও যাবো না!

লুকিয়ে চ'লে যাবা না ত?

ছি, নিজের দেশ ছেড়ে যাবো কোথায়? আমরা থাকতে এলুম এখানে। চলুন, হামিদ সাহেব।

পেট্রোম্যাক্স আলোটা নিয়ে কয়েকটি লোক পথ দেখিয়ে আগে আগে চলেছে। কিছু দূর গিয়ে হামিদ বললেন, আপনার বন্ধু হিরণবাবুকে ছোট রাণী সাহেবা যেতে বলেননি!

হাসনু ঘুরে দাঁড়ালো,—তা'র মানে?

উনি বাইরের লোক আছেন কিনা।

বিষধর সর্প এবার তা'র ফণা তুললো। বললে, মিঃ হামিদ, সত্যি বলতে কি, আপনি ছাড়া এ গ্রামে আর কোনো বাইরের লোক নেই! গোড়া থেকে আমি জানি, ছোট রাণীর জবানিতে আপনি নিজের কথাই বলছেন। মনে রাখবেন, আমি মেয়ে মানুষ —কিন্তু ছেলে মানুষ নই!

হাসনু ঠকঠক ক'রে রাগে কাঁপছিল। হামিদ বললেন, হিরণবাবু কোন্ সুবাদে রাজবাড়ীতে গিয়ে ঢুকবেন?

হাসনু আত্মসম্বরণ ক'রে বললে, আমি কোন্ সুবাদে সেখানে যাচ্ছি, মিঃ হামিদ? আপনি কি জানেন, আমার চেয়ে হিরণবাবু ছোট রাণীর বেশী আপন? আপনি কি জানেন, আমরা একই পরিবারের লোক? একই সংগে মানুষ?

হামিদ একটু থতমত খেয়ে চুপ ক'রে রইলেন। এই বাঙলা মুলুকটা নিয়ে পাকিস্থানরাজের যত ঝামেলা! এখানে হিন্দু আর মুসলমানকে চেনবার উপায় নেই! এমনভাবে এই বোকারা পরস্পর জড়িয়ে থাকে যে, তফাৎ করা যায় না। একজনের কান ধ'রে টানলে আরেকজনের মাথা স'রে আসে!

হিরণ বললে, কোনো সমস্যাই দেখা দিত না! আসবার সময় মীরার সংগে এক গাছা মালা বদল ক'রে এলেই ল্যাঠা চুকে যেতো! ছোট খুড়ির সংগে আমিও তোকে নেমন্তন্ন ক'রে পাঠাতে পারতুম!

হামিদের একেবারেই ইচ্ছা নয় যে, দ্বিতীয় কোনো পুরুষ রাজবাড়ীতে গিয়ে ঢোকে। তিনি বললেন, আপনার বাড়ি কোথায় হিরণবাবু?

বাড়ি! বাড়ি এই গাঁয়ে?

না, না—আপনার ঘর কোথায়?

হিরণ জবাব দিল, বছর কুড়ি আগে নদীর ধারে দু'খানা চালা কাৎ হয়ে ছিল, একটু একটু মনে পড়ে। এখন সেখান দিয়ে নদী বয়, বুঝলে সায়েব?

কথা বলতে বলতে বক্সিদের বাগান পেরিয়ে সবাই মিলে এসে পড়েছিল নদীতে যাবার কাঁচা রাস্তাটায়। সশস্ত্র পাঠানের দলটা আসছিল পিছনে পিছনে। হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে হিরণ ডাকলো, দাদি? জেগে আছ নাকি?

পাশেই ফকিরের মায়ের ঘর। ভিতর থেকে সাড়া এলো, কে গা?

আমি জামাই!

খটাং ক'রে দরজা খু'লে ফকির আর তা'র মা বেরিয়ে পড়লো। জামাই গিয়ে উঠলো সোজা দাওয়ার ওপর। তাকে দেখে ফকিরের মা হাঁকপাঁক ক'রে উঠলো আনন্দে। বললে, ওমা, চান্দমন যে? খবর আমি পাইছি! খাইছিস কিছু?

না, খাইনি! ভাত দেবে নাকি?

হাঁ, দিমু। তোদের ভাত তোরাই খাবি, আমি কোন্ কর্তা? আয়, ব'স ঘরে।

হিরণ বললে, হাসনুকে দেখেছ? ওই যে দাঁড়িয়ে!

অদূরে দাঁড়িয়ে হাসনু হাসছিল। ফকিরের মা ওকে দেখে আনন্দে কেঁদেই ফেললো। কাঁদতে কাঁদতে বললে, সব্বনাশি, আমাগো ভুইল্যা ছিলি এদ্দিন, তোর মায়াদয়া নাই—তুই ডাইনি—তুই—

ফকিরের মা আলুথালু হয়ে এসে হাসনুকে জড়িয়ে ধ'রে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। কান্না ছাড়া তা'র আর কোনো ভাষা ছিল না। হিরণ একধারে গিয়ে ফকিরের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইলো। হামিদ ভ্রূকুঞ্চন ক'রে নিজের হাত ঘড়ির দিকে একবার তাকালেন।

কান্নাকাটি থামবার পর ফকিরের মা বললে, চারটি খেয়ে যা তোরা আমার ঘর থেকে। আমার কথা শোন্—

বেশ, ভাত চাপিয়ে দাও। কতকাল তোমার ঘরে খাইনি, দাদি।

ফকিরের মা ছুটতে ছুটতে ভিতরে চ'লে গেল।

হামিদ এবার একটু আপত্তি জানিয়ে বললেন, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, বেগম-সাহেবা।

হাসনু বললে, আপনি যেতে পারেন, মিঃ হামিদ। আমার রাস্তা আমি ঠিক চিনে যাবো।

লেকিন্ রাণীজির ওখানে আপনার খাবারের বন্দোবস্ত ছিল! তিনি অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে! তা'ছাড়া রাতও হয়েছে।

হাসনু একটু হাসলো। বললে, মিঃ হামিদ; রাণীজি আমার জন্য একটুও ব্যস্ত নন্, আমি জানি। সে অনেক কথা। রাণীজিকে আপনি গিয়ে বলুন, রাজবাড়ির খাবারের চেয়ে এই ঘরামির ঘরের ভাত আমার কাছে অনেক দামী। তবুও যদি আপনি আমাকে সংগে নিয়ে যেতে চান তবে এখানে অপেক্ষা করুন, আমি খেয়ে-দেয়ে যাবো।

হামিদ বললেন, আর একটা কথা। আপনি কি জানেন, এই মাগি লোকটা পাকিস্তানের দুষমণ?

কে?

এইসব ফকিরের মা। এর শয়তানি আমি জানতে পেরেছি!

হাসনু একবার স্পষ্ট ক'রে হামিদের দিকে প্রসারিত দৃষ্টিতে তাকালো। পরে বললে, এই বিচারবুদ্ধি নিয়ে আপনি এদেশে এসেছেন চাকরি করতে? আপনাদের হাতে পাকিস্তান বাঁচলে হয়!

এক ঝলক হাসি হেসে হাসনু ভিতরে চ'লে গেল।

শিকারীরা জানে, রাত্রিকালে কোনো অরণ্যে বাঘের চোখের ওপর আলো পড়লে দেখা যায়, তা'র চোখ দুটো রক্তিম। চোখের এই বর্ণ অন্য কোনো জন্তুর নেই। হামিদের মুখের ওপর পেট্রোম্যাক্স থেকে যে আলোটা এসে পড়েছিল, তা'তে কেউ সামনে এসে দাঁড়ালে দেখতে পেতো দুটি চোখের তারা দিয়ে তাঁর যেন রক্ত ঝরে পড়ছিল। কিন্তু তিনি স্বভাব সংযত লোক, এটি সুমিত্রার সামনে অনেকবার প্রমাণিত হয়েছে। ভিতরে তাঁর যত প্রচণ্ড ঘৃণা অথবা ক্রোধ জ'মে উঠুক,—বাইরে তিনি সহজে তা প্রকাশ পেতে দেন না। তাঁর স্বভাবের পরিচয়টা হোলো কর্মকুশলতায়, কিন্তু বাক বহুলতায় নয়। মনে হচ্ছিল, তাঁর দলের লোকজনের সামনে তাঁর ন্যায় একজন সম্ভ্রান্ত কর্মচারীর কিছু অসম্ভ্রম ঘটেছে, সেই জন্য তিনি সেই অন্ধকারেই দাঁড়িয়ে ঠকঠক ক'রে কাঁপ-ছিলেন। এই মেয়েটার সম্বন্ধে যতখানি রিপোর্ট তাঁর দপ্তরে এসে অদ্যাবধি জমা হয়েছে, তা'তে কেবল এইটুকুই বোঝা যায় যে, এ মেয়েকে বলপ্রয়োগ দ্বারা বশ্যতা স্বীকার করানো চলবে না,—একে ছলে ও কৌশলে করায়ত্ব করা দরকার।

সুতরাং মিস্টার হামিদকে ওখানে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েই থাকতে হোলো এবং জনচারেক সশস্ত্র প্রহরীকে কাছে রেখে বাকিগুলোকে তিনি [illegible] দিলেন। এখানে এই কাঁচা রাস্তার ওপর মশার উৎপাত সহ্য ক'রে দাঁড়িয়ে থাকাটা তাঁর পক্ষে অসম্মানজনক, এ তিনি জানেন। যে ফকিরের মাকে তিনি রাজবাড়িতে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন, সে হোলো এক নিম্নশ্রেণীর নোংরা চাষী মুসলমানের মেয়ে,—তা'র দরজার সামনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকাটা যে সম্ভ্রমবোধ বিরোধী,—এও তিনি বেশ বোঝেন। কিন্তু হাসুবানুকে সংগে ক'রে না নিয়ে গেলে তাঁর চলবে না। এ অঞ্চলের মুসলমানের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা কম, এদের জাতিধর্মের কোনো নির্দিষ্ট নিরিখ নেই,

এদের চরিত্র নীতির কোনো আভিজাত্য নেই এবং হাসনুবানু এদেরই একজন। এরা হিন্দুর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, হিন্দুর কথায় ওঠে বসে, এরা হিন্দুদের পুতুল পুজোয় আর উৎসবে নিজেদের গা ঢেলে দেয়,—এবং আপদে বিপদে এরা মুসলমান সমাজকে কলা দেখিয়ে যে হিন্দুদের সঙ্গে গলাগলি করতে ছোটে, এর প্রমাণ অনেকবার পাওয়া গেছে। হামিদ সাহেব জানে, পাকিস্তানের সবচেয়ে দুর্বল অংশ হলো এই পূর্ববঙ্গ,—কেননা এটা বাঙালী মুসলমানের দেশ। আর বাঙালীরা যে বিশ্বাসঘাতকতা করবার জন্যই দুনিয়ায় বেঁচে থাকে,—দুনিয়ার তামাম মুসলমান জাতি একথা জানে।

ঘরের ভিতর থেকে উচ্চকণ্ঠের হাসি-তামাসা ও কলরবের ধ্বনি বাইরে এসে হামিদের কানে তীরের মতো বিঁধছিল। কিন্তু এখানে তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতেই হবে, কেননা মেয়েটাকে তিনি বিশ্বাস করেন না। তাঁর রিপোর্টে আছে, মেয়েটা বশীকরণ জানে, ধাপ্পা দিয়ে পালাতে জানে, বহুরূপ ধারণ করতেও নাকি তা'র জুড়ি নেই। কোনোমতে রাজবাড়িতে নিয়ে গিয়ে ঢোকাতে পারলে সুমিত্রার সাহায্যে তিনি একে বাগ মানাতে পারবেন বৈ কি। যে দলটা আজ এই মেয়েটাকে কেন্দ্র ক'রে নানা জেলায় রাষ্ট্র-বিরোধী চক্রান্ত গড়ে তুলেছে, সেই ষড়যন্ত্র-টাকে যদি সমূলে ধ্বংস করতে তিনি পারেন, যদি প্রত্যেকটি অপরাধী তাঁর জালে ধরা পড়ে, তবে অন্তত একটা জেলার কর্তৃত্ব তাঁর ভাগ্যে জুটবে বৈ কি। তখন একবার দেখে নেওয়া যাবে এই দেশী চাষী [illegible] জাতটাকে! দেখে নেওয়া যাবে বাঙালী মুসলমানের জাত-জন্মের চেহারাটা!

এমন সময় ছুটতে ছুটতে দু'টি সেপাই অন্ধকারে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকলো, হুজুর—

দুপা এগিয়ে হামিদ প্রশ্ন করলেন, [illegible]?

বহুৎ বুরা খবর হ্যায়, হুজুর!

হঠাৎ রুষ্ট কণ্ঠে হামিদ বললেন, কহো কেয়া?

রাণীজিকো মিলতি নেহি ঘরমে! পাতা নেহি কাঁহা গিয়া!

হামিদ উত্তেজিত হয়ে বললেন, ঝুটমুট্ ক্যা কয়তা তুম?

হুজুর, আল্লা-কসম!

তাজ্জব! ই কৈ ধোকেবাজি হ্যায়? হামিদ বললেন, দো আদমী হিঁয়া রহো, বাকি আও মেরে সাথ!

হামিদ সাহেব হন হন ক'রে রাজবাড়ীর তোরণের দিকে অগ্রসর হলেন। যারা সুমিত্রার অদৃশ্য হওয়ার সংবাদ এনেছিল, তারা তার সঙ্গে সঙ্গে চললো।

ঘণ্টাখানেক পরে হামিদ সাহেব আবার হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এলেন। উজ্জ্বল আলোটা সামনে রেখে এবার তিনি নিজেই ফকিরের দাওয়ায় উঠে দরজায় ধাক্কা দিলেন। ভিতর থেকে দরজা খুলে সামনে দাঁড়ালো হাসনুবানু।

হামিদ প্রশ্ন করলেন, আপনাদের খানা-পিনা হয়ে গেছে?

হাঁ। হাসনু জবাব দিল, আজ আমরা এই ঘরেই থাকবো, মিস্টার হামিদ।

হামিদ উত্তেজনা দমন ক'রে বললেন, সে আমি জানি। কিন্তু একটা খবর আছে, বেগম সাহেবা আপনাদের ভালোমন্দ সেই খবরের ওপর নির্ভর করে।

কি বলুন?

আমার সঙ্গে যারা দুষমনি করতে চায়, পাকিস্তানরাজ তাদেরকে সমস্ত শক্তি দিয়ে সায়েস্তা করবে, একথা আমি জানাতে এসেছি। আমি পাকিস্তানরাজের প্রতিনিধি!

হাসনু ঘরের ভিতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালো। তারপর বললে, এই চোখ লাল করার মানে কি, হামিদ?

তৎক্ষণাৎ হামিদও সম্ভাষণের ভাষাটা বদলে দিলেন। বললেন, আমি এর মধ্যে ষড়যন্ত্র দেখতে পাচ্ছি, বেগম।

হাসনু বললে, বড় বড় কথা তোমার মুখে বেমানান। আসল বক্তব্যটা শোনাও আমার ঘুম পেয়েছে!

হামিদ বললেন, ছোট রাণীজি এ ঘরে এসে উঠেছেন কিনা আমি জানতে চাই।

বেশ, ভেতরে ঢুকে ভালো করে দেখে নাও!

হিরণ মুখ তুলে হামিদের দিকে তাকালো। ফকিরের মা আতঙ্কিত চক্ষে হামিদকে একবার লক্ষ্য ক'রে এক পাশে স'রে গেল।

হামিদ [illegible] ভিতরে ঢুকে অবশ্য সুমিত্রাকে খোঁজাখুঁজি করবার চেষ্টা করলেন না, কিন্তু মুখে বললেন, ঠিক বলছো এখানে তিনি নেই?

হাসনু বললে, হামিদ, [illegible]দের ধৈর্যের সীমা আছে। তোমাকে এমন কিছু মস্ত লোক আমি মনে করিনে, যার জন্যে মিছে কথা বলবো!

এবার হিরণ এসে উভয়ের মধ্যে দাঁড়ালো। বললে, মিঃ হামিদ, ব্যাপার কি বলুন ত?

উত্তেজিত মুখখানা হিরণের দিকে ফিরিয়ে হামিদ বললেন, রাণীজিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!

নাই বা পাওয়া গেল! আপনার কী ক্ষতি?

তিনি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা,—তাঁর প্রতি আমাদের নৈতিক দায়িত্ব আছে, তা জানেন? যদি তাঁর কোনো বিপদ ঘটে তবে হিন্দু কাগজওলারা পাকিস্তানের বদনাম রটাবে—এ কি বোঝেন আপনারা? আমি সমস্ত রাত ধ'রে এই গ্রাম তোলপাড় করবো। তারপর হেড কোয়ার্টার্সে খবর পাঠাবো!

হাসিমুখে হিরণ বললে, মনে হচ্ছে তিনি আপনার বন্দী ছিলেন?

একেবারেই না। আমি তাঁর প্রজা, তিনি জমীদার।

হাসনু বললে, সিংহাসনখানা তিনি ফিরে পেয়েছিলেন কি?

হামিদ কোনো জবাব দিলেন না, উত্তেজনা আর দুর্ভাবনায় তাঁর মাথার ঠিক ছিল না। কেবল বললেন, আজ তুমি কেন যাবে না, জানতে পারি কি?

এবার হাসনুবানু নিজের ভাষাটাই প্রয়োগ করলো। প্রশ্ন করলো তুমি কি রাজবাড়ীতে সপরিবারে আছো, হামিদ?

না, আমি একা থাকি। লেকিন এ সব কৈফিয়ৎ আমি দিতে রাজি নই।

হাসনু হাসলো। বললে, অর্ধেক রাত্রে তুমি রাণী খুঁজতে বেরিয়েছ, তুমি একজন মান্যগণ্য অবিবাহিত,—এতে কি পাকিস্তানের বদনাম হবে না?

হামিদ বললেন, এটা তোমার বেয়াদপির কথা, বেগম।

তবে আরেকটু বেয়াদপি করি। এবার বোধ করি নাকের বদলে নরুন চাইতে এসেছ তুমি! ওই শূন্য রাজবাড়ীতে এই রাত্রে একটি মুসলমান যুবতীকে না নিয়ে গেলে তোমার আর চলছে না, কেমন?

হামিদ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন কতক্ষণ। তারপর একবার কঠোর দৃষ্টিতে অলক্ষ্যে তাকিয়ে বললেন, আচ্ছা, আমি চলে যাচ্ছি।

লেকিন আমি জানি, রাজবাড়ীতে ঢোকবার ভয় আছে তোমার!

সশস্ত্র লোকজন আশপাশে দাঁড়িয়েছিল। তাদেরকে ডেকে নিয়ে হামিদ সাহেব দু'পা অগ্রসর হ'তেই হাসনু এবার জবাবটা দিল,—বাঘের খাঁচায় ঢুকতে সবাই ভয় পায়, মিস্টার হামিদ। কিন্তু একজন ভয় পায় না, সে কে জানো?

হামিদ ফিরে তাকালেন।

তীক্ষ্ম হাসি হেসে হাসনু বললে, খাঁচায় ঢুকে সার্কাসের বাঘকে যে খেলিয়ে বেড়ায়! সেই খেলোয়াড়ের হাতে কি থাকে দেখেছ কখনো?

আগুনের ফুলকির মতো হামিদ একটু হাসলেন। বললেন, মাই ডিয়ার বেগম, এ বাঘ ভারতের অহিংস জানোয়ার নয়, এ বাঘ পাকিস্তানের,—মনে রেখো।

হাসনু বললে, হ্যাঁ, চোখে দেখছি বটে। তোমার আচরণেই তা'র প্রমাণ। একথা জানি, পাকিস্তানের বাঘ শুধু ভয় দেখাতেই জানে, জানে শুধু দাঁত দেখাতে—! কিন্তু মাথা তুলে যদি কেউ দাঁড়ায় তা'র সামনে, তবে হঠাৎ সেও অহিংস হয়ে ওঠে। শুধু কেবল তা'র ল্যাজের ঝাপটে ধুলো ওড়ে!

হাসনু এসে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিল। হিরণ বললে, চমৎকার! ছোট খুড়ি ধুলো দিয়েছে চোখে খুব!

হাসনু হেসে গড়িয়ে পড়লো। বললে, ভানুমতীর খেল!

হামিদ সাহেব আস্তে আস্তে দাওয়া থেকে নেমে লোকজন নিয়ে চ'লে গেলেন। সমস্ত অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস, ঘৃণা আর আক্রোশের মধ্যে এই অভিমতটি তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন, এ মেয়ে আর যাই করুক, ভয় পেয়ে পালাবে না! এর চেহারায়, চক্ষে, বাহুতে এবং সমগ্র স্বাস্থ্যশ্রীতে একটি কথা লুকনো আছে, বশ্যতা স্বীকারের জন্য এর জন্ম নয়। এ মেয়েকে সুমিত্রা মনে করা চলবে না।

ঝড়ের সূচনা রইলো সামনে এবং পিছনে, এ পাশে আর ওপাশে। হামিদ সাহেবের তীব্র তীক্ষ্ম দুই চক্ষু অন্ধকারকে যেন সূচীবিদ্ধ করতে করতে এগিয়ে চললো।

সুমিত্রার সমস্ত গল্পটা ফকিরের মায়ের মুখ থেকে হাসনু রাত জেগে শুনে নিয়েছিল। সুমিত্রার দারিদ্র্য, অনাহার, অসম্মান,—এমন কি হামিদকে স্বহস্তে সুমিত্রার রেঁধে খাওয়ানোর ইতিহাসটাও। তিনি শূন্য সিংহাসন দখল করতে এসেছিলেন, এসেছিলেন হৃতরাজ্য পুনরধিকার করতে,—এসেছিলেন কুলতিলক অত্রিকে মানুষ ক'রে তুলতে। হাসনু একে একে মন দিয়ে শুনে গিয়েছিল একটার পর একটি। হামিদ চরিত্রের নিখুঁৎ চিত্রটি মনের মধ্যে সে এ'কে নিয়েছিল।

যাবার সময় সুমিত্রা ফকিরের মায়ের হাতে যে চিঠিটি হামিদের নামে রেখে গিয়েছিলেন, সে চিঠিও এলো হাসনুর হাতে। ভাষাটা ইংরেজি। বক্তব্যটা হোলো এই, ক্ষমা করবেন, আপনাকে না জানিয়ে বিশেষ কারণে এখনই আমি চ'লে যাচ্ছি। তবে আপনার প্রস্তাবটিতে আমার কিছু নৈতিক আপত্তি থাকলেও আমার নিজের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই আমি একবার বিবেচনা ক'রে দেখবো। আপনাকে যথাসময়ে জানাবো। ইতি—সুমিত্রা।

হিরণ বললে, প্রস্তাবটা আবার কি রে? শুনলে ভাবনা হয় যে!

হাসনু কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। পরে বললে, তুই কিছু শুনেছিস দাদি?

ফকিরের মা বললে, কেমন ক'রে শুনবো? শেষের দিকে কি আমাকে রাজবাড়ীতে ঢুকতে দিত?

হাসনু আরো অনেক প্রকার প্রশ্নের অবতারণা করলো। কিন্তু অনেক কথার জবাব ফকিরের মাও দিতে পারলো না। এক সময় হিরণ বললে, তুই কি এখানে এলি ছোট-খুড়ির পেছনে গোয়েন্দাগিরি করতে?

না—হাসনু বললে, ওই লোকটাকে আমার জানা দরকার সব দিক থেকে। ছোট-খুড়িকে লোকটা উপোস করিয়ে রেখে কোন প্রস্তাবে রাজি করাতে চেয়েছিল, এটা জেনে রাখতে চাই বৈ কি। সম্পদ আর সিংহাসনের ওপর ছোটখুড়ির অন্ধ লোভ আমি ভুলিনি, জামাই। হামিদ এমন কী প্রস্তাব ধরেছিল তা'র সামনে? কী এমন প্রস্তাব যা'র জন্য নৈতিক আপত্তি ওঠে?

হিরণ বললে, তুই কি হামিদের নৈতিক চরিত্রের ওপর কটাক্ষ করতে চাস?

কটাক্ষ ত' করিনি, খোঁজখব[illegible]চ্ছি!

একজন অবিবাহিত সু[illegible]ন মুসলমানের চরিত্রতত্ত্বের খোঁজখবর নেওয়ার [illegible] মনস্তত্ত্বটা কি, [illegible] দেখেছিস?

হির[illegible] বাঁকা কথায় হাসনু হাসলো। [illegible]পর বললে, ছোটখুড়ি একদিন রাগ ক'রে আমার ওপর যে সন্দেহটা করেছিল, এবার কিন্তু সেই মতলবটা হাসিল করার সুযোগ!

ভ্রূকুঞ্চন ক'রে হিরণ বললে, অর্থাৎ?

হাসনু আবার হাসলো। বললে, জ্যাঠামশাইয়ের সম্পত্তিটা এবার যদি আমি দখল করি, বাধা দেয় কে?

হিরণ বললে, পাকিস্তানী আইনেই বাধা পাবি!

পাকিস্তানের আইন! হাসনু উচ্চকণ্ঠে পুনরায় এক চোট হেসে নিল। তারপর বললে, এ কি কাফেরের দেশ যে, কথায় কথায় আইন? আইন সৃষ্টি দুর্বলের জন্যে, যুক্তিবাদীদের জন্যে! ইসলামী রাষ্ট্রে ইচ্ছাই হোলো আইন! আমি যদি হামিদকে বিয়ে ক'রে সিংহাসনে বসি, আমাকে হটায় কে? মুসলমান গণতন্ত্রকে ডেকে বলবো যে, এটা ইসলামের নির্দেশ! বলবো যে, কোরানে এই আচরণের নির্ভুল সমর্থন আছে!

পবিত্র কোরান তুই পড়েছিস? হিরণ প্রশ্ন করলো।

হাসনু বললে, দাঙ্গা বাধলেই কোরান পড়বার ইচ্ছে হোতো। কিন্তু ভাগ্যি পড়িনি।

কেন?

কোরান পড়লেই মনে ভালোবাসা জাগে রে? আর ভালোবাসা জাগলেই ত' দুই রাষ্ট্রের ক্ষতি! ঘৃণা আছে ব'লেই ত' দুই রাষ্ট্র পৃথক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে! কোরান মানে মিলন, পাকিস্তান মানে বিচ্ছেদ!

হিরণ বললে, দাঁড়া, [illegible] খাটার থেকে স'রে যাসনে। দেখা যা[illegible], ছোটখুড়ি কেটে পড়েছে, মীরা ঝ[illegible] পড়েছে,—আর অত্রিটা হোলো না[illegible]। তুই এখন দিব্যি এই ঘোলা [illegible] মাছ ধ'রে নিতে পারিস।

হামি[illegible] সঙ্গে আমার মিলবে মনে ক[illegible]?

হিরণ বললে, একেবারে রাজযোটক!

হাসনু বললে, আগে কথা দে, তুই আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী হ'বি?

সেক্রেটারী হ'তে পারি, কিন্তু প্রাইভেট নয়!

শুধু কি কমরেড হয়ে থাকবি?

সর্বনাশ, পাকিস্থানে ও শব্দটা উচ্চারণ করিসনে!

হাসনু বললে, কিন্তু তোকে ছাড়লে হয়ত

মীরার চলবে, আমার ত' চলবে না, কমরেড!

হিরণ বললে, ছাড়তে হবে না, আমি চাইবো ছাড়া থাকতে। তোর গুলবাগিচার ভার নেবো, আমি। "দেবি, আমি তব মালঞ্চের হবো মালাকর!"

হাসনু বললে, "মালাকর?"

"ক্ষুদ্র মালাকর! অবসর লব সব কাজে!"

"ওরে তুই কর্মভীরু অলস কিংকর, কী কাজে লাগিবি?"

"অকাজের কাজ যত, আলস্যের সহস্র সঞ্চয়। শত শত আনন্দের আয়োজন।"

"কী লইবি পুরস্কার?"

হিরণ আবৃত্তি করলো, "প্রত্যহ প্রভাতে ফুলের কঙ্কন গড়ি কমলের পাতে আনিব যখন, পদ্মের কলিকাসম ক্ষুদ্র তব মুষ্টি-খানি করে ধরি মম আপনি পরায়ে দিব,—এই পুরস্কার!"

হাসনুর চোখ দুটো টসটসে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তৎক্ষণাৎ সে জবাব দিল, "ভৃত্য, আবেদন তব করিনু গ্রহণ।...তুই থাক চিরদিন স্বেচ্ছাবন্দী দাস, খ্যাতিহীন কর্মহীন; রাজসভা-বহিঃ-প্রান্তে রবে তোর ঘর, তুই মোর মালঞ্চের হ'বি মালাকর!"

পোঁটলা পুঁটলী সংগে নিয়ে ওরা ফকিরের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ফকিরের মা ভয়ে ভয়ে চললো ওদের সংগে সংগে। বলা বাহুল্য, নিজেদের ভাগ্যটা ওরা অনির্দিষ্টের হাতে ছেড়ে দিতে একটুও প্রস্তুত নয়। ওই গোলপাতার দরিদ্র গৃহ-সজ্জার মাঝখানে ব'সে ফকির আর ফকিরের মাকে নিয়ে তা'রা ভূরি ভোজন সেরে নিয়েছে। সম্পূর্ণ টাকার তোড়াটা রয়ে গেছে হিরণের কাছে এবং হাসুবানুর কাছে তা'র চেয়ে অনেক বেশী।

সকালের দিক থেকে খুব আরো বেশী রটনা হয়ে গেছে। এ অঞ্চলে হিরণ আর হাসুবানুর সশরীরে উপস্থিতিটা স্বচক্ষে না দেখে যারা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নয়—এমন অনেক মেয়ে পুরুষ এসেছে আশ-পাশের গ্রাম থেকে। অনেকে উৎসাহিত হয়ে ওদের জন্য এনেছে নমস্কারী টাকা, অনেকে বা এনেছে নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী। সুতরাং ওরা দুজন ফকিরের মাকে নিয়ে যখন রাজ-বাড়ীর দিকে অভিযান করলো, তখন ওদের পিছনে প্রায় শতাবধি মেয়ে পুরুষের ছোট-খাটো জনতা। ওদের দুজনের হাতে হাজি-পুরের নেতৃত্ব, এ অঞ্চলের ভালোমন্দর দায়িত্ব ওদের হাতে, ওরা দুঃখীর বন্ধু দীর্ঘকালের এ তা'রা জানে।

হাসুবানুর মুখে চোখে গাম্ভীর্য ফিরে এসেছে। সে চলেছে একা। হিরণ চলেছে সকলের মাঝখান দিয়ে হাসি তামাসায় মুখর ক'রে। কিন্তু ওরই মধ্যে তাকে আড়ালে নিয়ে ফকিরের মা বললে, জামাই, আসল কথা জানতে পারলে আমাকে ধ'রে কোতল করবে, তা জানিস?

তা'র ভীত মুখখানার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে হিরণ বললে, তুই যদি ঘটকালি করিস তাহ'লে বেঁচে যেতে পারিস, দাদি।

কিসের ঘটকালি?

তোর ওই গোমড়ামুখী নাৎনীটার সংগে হামিদের বিয়ে দিয়ে দে। চাঁদপারা নাৎজামাই পাবি।

ফকিরের মা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, ওর সংগে? কেন, মধুমতীতে জল নাই? হাটে রশি-কলসী নাই?

তবে তোর কপাল মন্দ। হিরণ সেখান থেকে স'রে গেল।

রাজবাড়ীর চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকলো হাসবানু আর হিরণ। তাদের পিছনে পিছনে জনতা। কাছারির লোকজন আগেই খবর পেয়েছিল। তা'রা জানতো আজ একটা হাংগামা বাধতে পারে। প্রহরীরা সকলেই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়েছিল। একথাটা সকলেরই মুখে চোখে সুস্পষ্ট যে, সুমিত্রাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

হামিদ সাহেবের লোক ছিল এখানে ওখানে। সুতরাং তিনি আগেই জানতেন যে, হাসবানু আসছে। এবার তিনি পোষাক আসাক চড়িয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন সকলের সামনে। অভিবাদন বিনিময়ের পর হাসনু আবার নতুন ক'রে ভদ্র সম্ভাষণ জানিয়ে হাসিমুখে বললে, মিঃ হামিদ, এবার দিনের আলোয় আমাদের দুজনের শুভ-দৃষ্টি হোক।

জনতার দিকে তাকিয়ে হামিদ বললেন, ওরা কারা?

এরা [illegible] অন্নদাতা! আপনি আর আমি ওদের দাসদাসী!

কী চায় ওরা?

কিছু না! ওরা এসেছে আমার সংগে। আজ রাজবাড়ীতে ওদের [illegible]!

কয়েক মুহূর্ত হামিদ কি যেন ভাবলেন। পরে বললেন, অবাঞ্ছিত জনতাকে আপনি সংগে এনেছেন দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমি ওদেরকে খাতির করবার জন্য প্রস্তুত নই! রাজবাড়ীটা সরাইখানা নয়।

হাসনু একবার তাকালো হিরণের দিকে, একবার তাকালো ভয়ার্ত ফকিরের মায়ের মুখের উপর দিয়ে বিক্ষুব্ধ জনতার দিকে। তারপর আবার চোখ দুটো ফিরিয়ে এনে হামিদের চোখের ওপর রেখে বললে, সাফ কথা বলুন, মিঃ হামিদ। আপনি কি আমাকে ভেতরে ঢুকতে দিতে চান না?

আপনি ঢুকলে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু—ওদের জন্য আমাকে অর্ডার আনাতে হবে। আপনি ভিতরে আসুন।

জনতার ভিতর থেকে কয়েকটি লোক গোলমাল ক'রে উঠলো। কাছারিতে দুজন নবনিযুক্ত শিক্ষিত ছোকরা কর্মচারী হঠাৎ ঠাস ক'রে হাটের দুটি লোককে চড় মেরে বসলো। দেখতে দেখতে এমন হৈ চৈ বেধে গেল যে, উভয় দলের মধ্যে মার ধর শুরু হোলো। হিরণ ঝাঁপিয়ে পড়লো ওদের মাঝখানে মিটমাটের জন্য। কিন্তু মিটবে কেমন ক'রে? পাকিস্তানের রক্তটা হোলো নতুন। তা'রা নিজের হাতেই নিজেদের বিচার করে সংগে সংগে। চিৎকার উঠলো জনতার থেকে। সেই প্রবল হাংগামার ডাক শুনে চারিদিক থেকে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বহু লোক এলো ছুটতে ছুটতে। দেখতে দেখতে রাজবাড়ীর প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য!

উৎকণ্ঠিত হামিদ দেখলেন তাঁর নিজের লোকের জন্যই ব্যাপারটা চরমে উঠলো। এতগুলো লোককে শত্রুতে পরিণত করলে তাঁর চলবে কি? এখন কিস্তির খাজনা আদায়ের সময়। দিনকাল ভালো নয়।

কয়েক পা এগিয়ে এসে হামিদ ডাকলেন, বেগম সাহেবা?

হাসুবানু সহাস্য মুখ ফিরিয়ে তাকালো। হামিদ বললেন, তিরিশ চল্লিশটা অস্ত্র আমার হেপাজতে আছে, আমি তা'র ব্যবহার জানি।

কিন্তু পাকিস্তানে এসে যা'রা মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দেয়, তা'রা পাকিস্তান আর মুসলমান—দুয়েরই দুশমন।

হাসুবানু বললে, আমিও তা'ই ভাবছি, মিস্টার হামিদ। পাকিস্তান বাঁচতে পারে, আপনার মতন লোক যদি এখানে না থাকে!

আপনি কী বলতে চান?

বলতে চাই আপনি শাসকও নয়, বিচারকও নয়। আপনি জমীদারের বেতনভোগী কর্মচারী মাত্র! কিন্তু আমি দেখছিলুম আপনার নবাবী জীবনযাত্রা। লোকলস্কর ঢাল-তরোয়াল নিয়ে আপনার এখানকার কায়েমী ব্যবস্থা! বেশ ত, এতই যদি শক্তিমান আপনি, তবে দাঙ্গাটা থামান? ওই ছেলে দুটোকে কান ধ'রে একবার শাসন করুন? বন্দুকের বারুদের চেয়েও বেশী শক্তি ওই জনতার, একথা মনে রাখবেন, মিঃ হামিদ।

হামিদ বললেন, এর ফলাফল কি জানেন?

জানি বৈ কি। এই ব'লে হাসনু সেইখানে দাঁড়িয়ে ডাক দিল জনসাধারণকে। ডাক দিল সবাইকে।

অনেকগুলি লোক ফিরে তাকালো হাসনুর দিকে। ভিড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো হিরণ আর ফকিরের মা। কাছারির লোকেরা স'রে দাঁড়ালো। গ্রামের লোকেরা মুখ ফিরালো।

হাসনু তা'রপর বললে, মিঃ হামিদ, এবার আমরা দেউড়ীর ভিতরে ঢুকবো! হয় আপনি আমাদেরকে বাধা দিন, আর নয়ত আপনার সেপাইদেরকে হুকুম দিন—ওরা বন্দুক-পিস্তল নিয়ে আমাদের সবাইকে আক্রমণ করুক।

বুড়ো দারোগা হারু মিঞা ইতিমধ্যে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পড়েছিলেন। এবার চেঁচিয়ে বললেন, ওরে হারামজাদারা, এখানে হুজ্জৎ করতে আইছিস, তোগো আর কোনো কাম নাই? বেরো, বেরো সব মামদোর দল! মাইরা এক্কেরে নিকেশ কইরা ফ্যালাইমু। যা, দূর হ, পাজি, ছুঁচো—সব বজ্জাৎ বদমাইস হারামির দল!

হাসনু বললে, দাদু, ওদের কোনো দোষ নেই!

হারু মিঞা থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, ওদের দোষ নেই? তবে কা'র দোষ? ওই হালারপো হামিদ বুঝি? সালাম আলেকম! বলি, ও হামিদ সাহেব,—তুমি বাপ্ হালচাল বোঝো নাই! আমাগো রাজবাড়ীর জামাই আইছে, পথ ছাইড়া দও! আর এই মাইয়াই ত' জমীদারের যা কিছু! এ মাইয়ারে তুমি রুকতে পারবা না, হামিদ! এ একেবারে কাল কেউটে! আয়, আয় তোরা,—হুজ্জত করিসনে! আমার সাথে আয়!

হামিদের মুখের উপর দিয়ে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে হারু মিঞা দেউড়ী পেরিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। জনতা ঢুকলো পিছনে পিছনে।

ক্রমশ

ভারতে মাউন্টব্যাটেন

অ্যালান ক্যাম্বেল-জনসন

[৬]

সীমানা নির্ধারণের ভার রাষ্ট্রপুঞ্জের হাতে দেবার প্রস্তাব। নেহরুর আপত্তি। চার জন করে হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়ে সীমানা কমিশনের গঠন।

বাহিনী বিভক্ত করার সূত্র। 'ভারতে অ-মুসলমানপ্রধান এবং পাকিস্থানে মুসলমানপ্রধান সৈন্যদল।' দুই পক্ষই দাবী করেন—সামরিক বিষয়ে পূর্ণ-স্বাধীনতা চাই। মাউণ্টব্যাটেনের প্রস্তাব অনুসারে 'যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদে'র প্রতিষ্ঠা। ১৫ই আগস্টের পরেও 'সুপ্রীম কম্যাণ্ডার' অকিনলেক থাকবেন। ঝড়ের ইংগিত। লাহোর ও অমৃতসর পুড়ছে আরম্ভ করেছে। অকিনলেকের কাছে শিখ শরণার্থীর চিঠি—'শিখেরা উৎপীড়িত হচ্ছে, আর শিখ রেজিমেণ্ট ব'সে আছে ভারতের বাইরে বসরাতে তেলের খনি পাহারা দেবার জন্য।'

ভাইসরয় ভবনের এক কক্ষে কংগ্রেস, অন্য কক্ষে লীগ। ভারতীয় স্বাধীনতা বিলের খসড়া পাঠ করছেন নেতারা। গবর্ণর জেনারেলের পদ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে জিন্নার বিচিত্র দীর্ঘসূত্রতা। শেষ মুহূর্তে জিন্নার স্পষ্টোক্তি—তিনিই পাকিস্থানের গবর্ণর জেনারেল হবেন। ইভনিং-স্ট্যাণ্ডার্ডের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে অভিযোগ—ভারতের দুই ডোমিনিয়ন সৃষ্টির চেষ্টা কেন? 'বিভারব্রুকগিরি'র নমুনা। 'ভারতকে বল্কানে পরিণত করা হচ্ছে।'

খণ্ডিত ভারতের গবর্ণরজেনারেল হলে কি মাউণ্টব্যাটেনের সম্মানহানি হবে? মাউণ্টব্যাটেনের অপবাদের আশংকা। দেশখণ্ডনের প্রসংগে 'কুকুরের ক্লাব' খণ্ডনের প্রসংগ। অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টের প্রবল অন্তর্বিরোধ। প্যাটেলের অভিযোগ—'আপনারা যদি দেশের শাসনকার্য চালাতে না চান, তবে অন্ততঃ আমাদের চালাতে দিন।' জিন্নার দাবী—লীগ পক্ষের একজন মন্ত্রীকেও সরানো হলে সকল লীগ-মন্ত্রী পদত্যাগ করবেন।

অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টের অন্তর্বিরোধ জটিল ও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। লীগ পক্ষের মন্ত্রীরা দপ্তরের ভার ছেড়ে দিতে রাজী নন। নেহরু পদত্যাগে উদ্যত। নেহরুর 'অপমানে'র প্রশ্ন। ১৯৩৫ সালের আইনের নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দেন জিন্না, ক্রুদ্ধ মাউণ্টব্যাটেন। ভারতের গবর্ণর জেনারেলের পদ গ্রহণে মাউণ্টব্যাটেনের আপত্তির কারণ—'পদমর্যাদার নিরপেক্ষতা' এবং 'হিন্দু-মুসলমানের আস্থা' হারাবার ভয়। লণ্ডনের পরামর্শ ও নির্দেশ চাইলেন মাউণ্টব্যাটেন। গোপন উপদেশ সংগ্রহের জন্য ইসমের লণ্ডন গমন। দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটের অভিমত—ভারতের গবর্ণর জেনারেলের পদ মাউণ্টব্যাটেনের গ্রহণ করাই উচিত।

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ২৭শে জুন, ১৯৪৭ সাল। দেশবিভাগ পরিষদের বৈঠকে সীমানা নির্ধারণের পন্থা ও ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রথমে এই প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল যে, সীমানা নির্ণয়ের সব সমস্যা ও ঝঞ্ঝাট রাষ্ট্রপুঞ্জের হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক। কিন্তু আপত্তি করেছেন নেহরু। নেহরুর মতে, রাষ্ট্রপুঞ্জ সীমানা নির্ণয়ের ভার গ্রহণ করলে সঙ্ঘগত নানারকম রীতি ও ব্যবস্থাক্রম অনুসারে তাদের অগ্রসর হতে হবে। তার ফলে সমস্ত উদ্যোগই কতগুলি জটিলতার ভারে বিড়ম্বিত হবে এবং অনর্থক বিলম্বের কারণও হয়ে উঠবে।

র‍্যাডক্লিফের সহকর্মী হিসাবে দুই সীমানা কমিশনের প্রত্যেক কমিশনে চারজন ক'রে সদস্য থাকবেন, যাঁরা হাই-কোর্টের বিচারপতি। কংগ্রেস এবং লীগ, উভয় পক্ষই দু'জন ক'রে সদস্য মনোনীত করবেন। দু'পক্ষেরই মনোনীত সদস্য নিয়ে যদিও কমিশন গঠিত হবে, তবুও এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, যদি কোন অপ্রিয় সিদ্ধান্ত করবার প্রয়োজন হয়, তবে সেটা করবার সব দায়িত্ব র‍্যাডক্লিফের ওপরই পড়বে। এই সরল সত্যটুকু অনুমান করবার জন্য ঋষিসুলভ ভবিষ্যদ্দৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। আমার ধারণা, এ ব্যাপারের মধ্যে নিজেকে না জড়িয়ে মাউণ্টব্যাটেন খুব ভাল করেছেন। সীমানা সম্বন্ধে বাঁটোয়ারার ব্যাপারে কোনভাবে সম্পৃক্ত থাকলে তাঁর বর্তমান এবং ভবিষ্যতেরও কাজে নানারকম বাধা ও অসুবিধা দেখা দেবার আশংকা আছে।

নয়াদিল্লী, শনিবার, ২৮শে জুন, ১৯৪৭ সাল। আজ আমাদের স্টাফের বৈঠকে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠলো ডন পত্রিকার একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। ৩রা জুন পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রীহট্টে জনমত গ্রহণের (রেফারেণ্ডাম) যে ব্যবস্থা হয়েছে, ডন সেই সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন। ভাইসরয়ের আচরণ এবং নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন ডন। শ্রীহট্টে যেভাবে রেফারেণ্ডম অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছে, তাতে ভাইসরয় নিরপেক্ষতার মর্যাদা রক্ষা করছেন না, এই হলো ডনের অভিযোগ। অভিযোগের সমর্থনে একটি প্রমাণও উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন ডন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে জনমত গ্রহণ বা রেফারেণ্ডামের সমগ্র ব্যবস্থা সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় রাখা হয়েছিল। কিন্তু শ্রীহট্টের রেফারেণ্ডামের ব্যবস্থা সামরিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিচালিত হবে না। ভাইসরয়ের এই ত্রুটির বিরুদ্ধে ডন মন্তব্য করেছেন।

ডন সম্পাদকের অভিযোগ শুনে মাউণ্টব্যাটেন প্রথমে সত্য-সত্যই অপ্রস্তুতের মত ব'লে উঠলেন—'কি আশ্চর্য, ভদ্রলোক ঠিকই বলেছেন।' মাউণ্টব্যাটেন বললেন, কাজের ভীড়ে ব্যস্ত থাকায় এদিকটা ভেবে দেখবার কথা তাঁর

মনে হয়নি। তিনি একটা বিষয় ভাল ক'রে বিবেচনা করতে ভুলে গেছেন যে, সীমান্ত প্রদেশের রেফারেণ্ডামের মতই শ্রীহট্টের রেফারেণ্ডামও বস্তুতঃ তাঁরই দায়িত্বে পরিচালিত অনুষ্ঠান।

কিন্তু ডন যেসব কারণ দেখিয়ে মাউণ্টব্যাটেনকে আক্রমণ করেছেন, সেগুলি সম্পূর্ণরূপেই ভ্রান্তকর। শ্রীহট্টের রেফরেণ্ডাম অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবস্থার দিক দিয়ে কোনই ত্রুটি হয়নি। ত্রুটি হোক্, এমন ইচ্ছাও কেউ করেনি।

আমার ওপর একটা কাজের ভার চাপানো হলো। ডনের সম্পাদক আলতাফ হুসেনকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে, অভিযোগের বিষয়টি সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। নিজের কথা এবং বক্তব্য প্রকাশে হুসেনের সবচেয়ে বড় গুণ এবং বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি প্রত্যেক কথায় আক্রমণ করতে এবং নিন্দা করতে পারেন। সম্পাদকীয় প্রবন্ধের উপসংহারে হুসেন এই ভয় দেখিয়েছেন যে,—"যদি আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আমরা এই অভিযোগের একটা সন্তোষজনক উত্তর না পাই, তবে আমরা পুনরায় এই প্রসঙ্গ আলোচনা করতে বাধ্য হব এবং সেই সঙ্গে কতগুলি সোজা কথা খোলাখুলিভাবেই জানিয়ে দেব।"

হুসেন খোলাখুলিভাবে সোজা কথা জানিয়ে দেবার যে ভয় দেখিয়েছেন, সেটা আমারই পক্ষে কথা বলার একটা সুবিধা ক'রে দিয়েছে। আমিও আর দেরি না ক'রে হুসেনকে কয়েকটি সোজা কথা খোলাখুলিভাবেই জানিয়ে দিয়ে এলাম।

হুসেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলাম এবং আমাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বের ভাবও ক্ষুন্ন হলো না। কিন্তু একথা স্বীকার না করে পারি না যে, হুসেন একটু বাড়াবাড়ি করছেন। হুসেনের নেতা জিন্নারও আচরণে একটা ঔদ্ধত্যের ভাব আছে এবং জিন্নাও একটুতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। কিন্তু হুসেন এ ব্যাপারে তাঁর নেতাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। আজই জিন্নার কাছ থেকে মাউণ্টব্যাটেন একটি চিঠি পেয়েছেন। এমন এক চিঠি, যা পড়ে ইসমের মত মানুষেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। ইসমে স্বভাবতঃ খুবই মার্জিত-রুচি এবং শান্ত মেজাজের মানুষ, কিন্তু জিন্নার চিঠি পড়ে ইসমে অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে মন্তব্য করলেন,—'এ চিঠি আমার রাজার হাত থেকেও নিতে অথবা কোন কুলির হাতে দিতে আমি রাজি হব না।'

নয়াদিল্লী, সোমবার, ৩০শে জুন, ১৯৪৭ সাল। বিশেষভাবে মাউণ্টব্যাটেনেরই তাগিদে দেশ বিভাগ পরিষদ্ অতি দ্রুত সৈন্যবাহিনী ভাগ করার ব্যবস্থা গ্রহণে সম্মত হয়েছেন। এ বিষয়ে পরিষদে কোন তর্ক ওঠেনি, মতভেদও দেখা দেয়নি। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, সৈন্য বিভাগের ব্যবস্থাবিধি সম্পর্কেও কোন মতবিরোধ দেখা দেয়নি।

সৈন্যবাহিনী ভাগ করার জন্য যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে, তার জন্য সবচেয়ে বেশী প্রশংসা দাবী করতে পারেন অকিনলেক এবং ইসমে। অকিনলেক নাম দিয়েছেন—'সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন'। এই কথাটার মধ্যেই অকিনলেকের বাস্তববুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন করার জন্য পরিকল্পিত এই পদ্ধতিকে মাউণ্টব্যাটেন অবশ্য একটা নিখুঁত পদ্ধতি ব'লে এখনো মনে করতে পারছেন না।

দেশবিভাগ পরিষদ এখন অতি দুরূহ একটি কাজে হাত দিয়েছেন। ভারতীয় বাহিনী দু'ভাগ করার কাজ। এই অতি বৃহৎ দায়িত্ব পালনের জন্য যে প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়েছে, তার গুরুত্ব সম্বন্ধে মাউণ্টব্যাটেন যথেষ্ট সচেতন আছেন এবং এটাও উপলব্ধি করেছেন যে, প্রচেষ্টার আরম্ভের দিকেই মুহূর্তের ভুলে সাধারণ একটা সমস্যা সহজেই সংকটে পরিণত হতে পারে। এই কারণেই, তিনি ঠিক সময় বুঝেই দেশবিভাগ পরিষদের আলোচনা-সভায় এমন এক ব্যক্তিকে আহ্বান ক'রে এনেছেন যাঁর প্রতিভা যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বর্তমানের প্রয়োজনে বিশেষভাবেই কাজে লাগবে। উড়িষ্যার গবর্ণর ত্রিবেদী। মহাযুদ্ধের সময় ত্রিবেদী দেশরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের মধ্যে ত্রিবেদীই একমাত্র ব্যক্তি, দেশরক্ষার ব্যবস্থাপনা ও সংগঠন-কার্যে যাঁর অভিজ্ঞতা আছে। ত্রিবেদী এরই মধ্যে নেহরু এবং প্যাটেলের আস্থা অর্জন করতে পেরেছেন [illegible] ছাড়া, ত্রিবেদীর আর একদিক [illegible]ও একটা বিশেষ সুবিধা আছে। ত্রিবেদী ব্যক্তিগতভাবে লিয়াকত আলি খাঁর দীর্ঘকালের বন্ধু। [illegible] এক সপ্তাহ ধ'রে ত্রিবেদীরই চেষ্টায় অনেকখানি কাজ [illegible]। দুই পক্ষেরই দাবীকে সত্যিকারের একটা আপোষের পথে আনতে পেরেছেন ত্রিবেদী। যাতে দুই পক্ষই তাঁদের দাবীর কিছু কিছু ছেড়ে দিতে পারেন, তারই পথ অনেকখানি সহজ ও সুগম হয়েছে, প্রধানতঃ ত্রিবেদীরই চেষ্টার ফলে।

সৈন্যবাহিনী ভাগ করার ব্যবস্থায় এই মূল নীতি গৃহীত হয়েছেঃ ভারতে অ-মুসলমানপ্রধান সৈন্যদল এবং পাকিস্থানে মুসলমানপ্রধান সৈন্যদল থাকবে। ১৫ই আগষ্টের পর থেকে নিজ নিজ রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর সামরিক পরিচালনার সকল দায়িত্ব ও সমস্যা দুই রাষ্ট্রই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এবং প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করবে। দুই পক্ষই অত্যন্ত জোরের সঙ্গে দাবী করেছেন যে, সামরিক বিষয়েও দুই রাষ্ট্রেরই পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকলে কোন নিষ্পত্তিই হতে পারে না। 'সামরিক স্বাধীনতাকে'ও দুই পক্ষই বস্তুতঃ একটা সর্ত ক'রে তুলেছেন। জিন্না এবং লিয়াকৎ দু'জনেই একেবারে খোলাখুলিভাবেই বলছেন যে তাঁরা তাঁদের নতুন গবর্ণমেণ্টের (পাকিস্থানের) পরিচালনার দায়িত্ব হাতে নিতে রাজী হবেন না, যদি তাঁদের রাষ্ট্রের জন্য সৈন্যবাহিনী ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে গঠিত না হয়ে যায়।

দুই পক্ষই আর একটি বিষয়ে জোর আপত্তি তুলেছেন। ১৫ই আগষ্টের পর দুই রাষ্ট্রেরই সৈন্যবাহিনীর সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতাযুক্ত একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের ব্যবস্থা স্বীকার করতে দু'পক্ষই আপত্তি জানিয়েছেন। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন এ আপত্তির বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেছেন। [illegible] চাইছেন, ১৫ই আগষ্টের পরেও দুই রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনার সকল বিষয় ও কাজে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব এবং ক্ষমতা অকিনলেকেরই থাকবে, যতদিন না দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সরকারী [illegible] এবং সম্পত্তি ভাগাভাগির কাজ সম্পূর্ণ হয়।

মাউণ্টব্যাটেনের প্রস্তাব অনুসারেই শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত হলো যে, 'যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদ' (Joint Defence Council) নামে একটি পরিষদ গঠিত হবে। তার মধ্যে থাকবেন, বর্তমান প্রধান সেনাপতি (অকিনলেক), দুই রাষ্ট্রের দুই (অথবা এক) গবর্ণর জেনারেল এবং দুই গবর্ণমেণ্টের দুই দেশরক্ষা মন্ত্রী। সাময়িকভাবে এবং কিছুকালের মত দুই রাষ্ট্রেরই সৈন্যবাহিনীর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সকল

কাজের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা এই যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদেরই থাকবে।

দুই ডোমিনিয়নে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দুই প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হবেন। সুতরাং, কার্যোপাধির সংজ্ঞা নিয়ে যেন কোন ভুলে বা গোলমালে না পড়তে হয়, তার জন্য অকিনলেকের পদের নাম করা হলো 'সুপ্রীম কম্যাণ্ডার'। ১৫ই আগষ্ট থেকে আরম্ভ ক'রে যতদিন না কাজ সম্পূর্ণ হয় ততদিন পর্যন্ত অকিনলেক সুপ্রীম কম্যাণ্ডার হয়ে থাকবেন। তাঁর কার্যকালের অবশ্য একটা সীমা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ১৯৪৮ সালের পয়লা এপ্রিলের পর থেকে সুপ্রীম কম্যাণ্ডারের আর কোন কাজ থাকবে না। কিন্তু এই সুনির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ কর্যকালের মধ্যে সুপ্রীম কম্যাণ্ডার অকিনলেক দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কোনই দায়িত্ব বহন করবেন না। কোন প্রত্যক্ষ সামরিক কার্যও পরিচালনার বা নিয়ন্ত্রণের কোন ক্ষমতা ও দায়িত্ব তাঁর নেই। বাহিনী বিভক্ত করায় যেসব সৈন্যদলকে এক ডোমিনিয়ন থেকে অন্য ডোমিনিয়নে প্রেরণ করার প্রয়োজন হবে, অকিনলেক শুধু সেই সব সৈন্যদলকে প্রেরণের ব্যবস্থাটুকু তাঁরই প্রত্যক্ষ পরিচালনায় সম্পন্ন করবেন।

ভারতীয় বাহিনী বিভক্ত করার কাজটাও ভারতের বৃহত্তর রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখেই বিবেচনা করতে হয়েছে। বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন অন্য কোন নীতি নিয়ে বাহিনী ভাগ করার বিষয়টি বিবেচনা করা একেবারেই সম্ভবপর হয়নি। সংস্পৃশ্য অনিশ্চেষ্টা এবং সাম্প্রদায়িক হানাহানির এই পরিবেশের মধ্যে উপায়ান্তর না দেখেই ভারতীয় বাহিনীকে ভাগ করার শোচনীয় প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই অবস্থায় বাহিনী বিভক্ত করার যে সাম্প্রদায়িক একটা সূত্র রচনা করা হয়েছে, কাজের দিক দিয়ে তার চেয়ে বেশী উপযোগী আর কোন সূত্র হতে পারে না। এই অবস্থায় মানুষের বুদ্ধিতে এর চেয়ে ভাল কোন পদ্ধতির আবিষ্কার সম্ভবপর নয় ব'লেই আমার ধারণা।

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, পয়লা জুলাই, ১৯৪৭ সাল। ১৫ই আগষ্ট যেমন এগিয়ে আসছে, পাঞ্জাবের উত্তেজনা তেমনি তীব্রতর হয়ে উঠছে। এরই মধ্যে ঝড়ের একটি ইঙ্গিত পেয়ে গেছেন অকিনলেক, উৎক্ষিপ্ত খড়ের টুকরো যেমন ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয় বাতাসের গতি কোন্ দিকে। দিল্লীর এক শিখ শরণার্থীর কাছ থেকে প্রাপ্ত একটি চিঠি অকিনলেক আজ মাউণ্টব্যাটেনের কাছে পাঠিয়েছেন। শিখ শরণার্থী অভিযোগ করেছেন—'সপ্তম শিখ রেজিমেণ্ট এখনো বসরাতে ব'সে আপনাদের তৈল-অঞ্চল পাহারা দিচ্ছে, এদিকে শিখের নিজের দেশ গত এক বছর ধ'রে নানা শোচনীয় ঘটনায় উৎপীড়িত হয়ে আসছে। ভারতের বাইরে যেসব বীর শিখ ভাই রয়েছেন, দেশের এই অবস্থার কথা শুনে তাঁদের মন অত্যন্ত অশান্ত হয়ে উঠেছে। ভারতকে যখন দু'ভাগ করাই হচ্ছে এবং আমাদেরও এই অবস্থায় পড়তে হচ্ছে, তখন বাইরের শিখ ভাইদের এখন ঘরে ফিরিয়েই আনা উচিত। শিখ সিপাহীকে এখন তার স্বজন ও সমাজের কাছেই রাখা কর্তব্য। আমার অনুরোধ, আগামী আগষ্টের নাটক আরম্ভ হবার আগেই ভারতের বাইরের শিখদের সত্বর দেশে ফিরে আসবার জন্য আপনি নির্দেশ দান করবেন।'

জেংকিন্‌সও জানিয়েছেন, লাহোর ও অমৃতসরের অবস্থা ভাল নয় উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তিত হবার যথেষ্ট কারণ ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। হাঙ্গামার রূপ বদলেছে। ঘরবাড়ী পোড়ান খুবই ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়ে গেছে এবং মারামারির ব্যাপারটা সাধারণতঃ চোরা আক্রমণ এবং ছুরিবাজির পর্যায়ে রয়েছে। সাধারণ পুলিশী অথবা মিলিটারী ব্যবস্থার দ্বারা এ ধরণের হাঙ্গামা দমন করা খুবই কঠিন। ভারতের কোন সহর পুড়িয়ে ফেলা কত সহজ কাজ, হাঙ্গামাকারীরা সেটা এখন বুঝে গেছে। সেইজন্য, আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করার অপকার্যে লিপ্ত লোকগুলিই বিশেষভাবে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। এরা ঘরের ভেতরে থেকে জানালা দিয়ে আগুনের বল ছুঁড়ছে। ঘরের স্কাই-লাইট দিয়েও অগ্নিনিক্ষেপের ব্যাপার সমানে চলছে। বাড়ীর ছাতে লুকিয়ে থেকে এবং সরু সরু গলির ভেতর গা-ঢাকা দিয়ে এরা অনবরত আগুন ছুঁড়ছে। আড়ালে লুকিয়ে কাজ করবার এই সব সুযোগ থাকাতেই এদের হাতে হাতে ধরে ফেলা প্রায় অসম্ভবপর হয়ে উঠেছে।

নয়াদিল্লী, বুধবার, ২রা জুলাই, ১৯৪৭ সাল। আজ ভাইসরয় ভবনে কংগ্রেসের এবং মুসলিম লীগের নেতারা এসেছেন। কংগ্রেস নেতারা রয়েছেন একটি কক্ষে এবং লীগ নেতারা অন্য একটি কক্ষে। দুই কক্ষেই 'খসড়া ডোমিনিয়ন বিলে'র ধারাগুলি পাঠ করার ব্যাপার চলছে। খসড়া ডোমিনিয়ন বিলের নামটা অবশ্য বদলে দিয়ে নতুন একটা জোরদার নাম দেওয়া হয়েছে—'ভারতীয় স্বাধীনতা বিল'।

কিছুদিন থেকে জিন্না একটা ছুতো করে তাঁর সিদ্ধান্ত স্পষ্টাস্পষ্টি জানাবার দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছিলেন যে, বিলটা একটু খুঁটিয়ে দেখবার সুযোগ না পাওয়া পর্যন্ত গবর্ণর জেনারেল পদের প্রশ্ন সম্বন্ধে তিনি পরিষ্কারভাবে কোন ধারণা লাভ করতে পারছেন না এবং কিছু বলতেও পারছেন না। আজ তিনি বিলটা পড়বার সুযোগ পেলেন। তবুও গবর্ণর জেনারেল নিয়োগের বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে যে আসল কথাটা এতদিন ধ'রে জানতে চাওয়া হচ্ছে, সে সম্বন্ধে কিছুই বললেন না। আরও কয়েক ঘণ্টার সময় নিলেন জিন্না। এবারও তিনি এই অজুহাত দেখালেন যে, তাঁর যে সব ঘনিষ্ঠ সহকর্মী নেতা এখন রেফারেণ্ডামের ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে এবিষয়ে একবার পরামর্শ করতে তিনি ইচ্ছা করছেন।

এতদিন ধরে দেরি করিয়ে দেবার পর জিন্না শেষ পর্যন্ত নিজেকে পরিষ্কার করতে পারলেন। এইবার স্পষ্ট করেই কথা বলতে পেরেছেন জিন্না। তিনি নিজের পক্ষেই রায় দিয়েছেন। জিন্না জানিয়েছেন, পাকিস্থানের গবর্ণর জেনারেলের পদে স্বয়ং তিনিই নিযুক্ত হতে চান।

জিন্না এখনো মনে মনে এই মোহ পোষণ করছেন যে, ১৫ই আগষ্টের পরেও মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে দুই ডোমিনিয়নের দুই গবর্ণর জেনারেলের ওপরে বিচিত্র রকমের একটা পদ গ্রহণ করে এবং বস্তুতঃ একটা বায়বীয় উর্ধ্বস্তরে থেকে দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে যাবতীয় বিষয় ও বস্তু সঙ্গতভাবে ভাগাভাগি করার কর্তব্য পালন করা সম্ভবপর। জিন্না একথাও জানিয়েছেন যে, তিনি অনেকখানি তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গের অনুরোধের চাপে পড়েই এ সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হয়েছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোন্ বন্ধুবর্গ? তাঁদের নাম কি? এই প্রশ্ন করতে গিয়ে একটা কৌতুক অনুভব না করে পারা যায় না, কারণ এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। জিন্না যা বলেছেন, তার বিপরীতটাই হলো আসল সত্য। আমরা জানি, জিন্নার প্রবীণ সহকর্মীদের

সকলেই এবং তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী যাঁরা আছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই একবাক্যে জিন্নাকে এই সনির্বন্ধ পরামর্শ দিয়েছেন যে, পাকিস্থানের গবর্ণর জেনারেলের পদ গ্রহণ করা জিন্নার উচিত হবে না। জিন্নার বন্ধুবর্গ বরং তাঁকে এই পরামর্শ দিয়েছেন যে, পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত থাকলেই জিন্নার পক্ষে সেটা বেশী ক্ষমতা নিজের হাতে রাখার ব্যাপার হবে। তাঁরা সকলেই এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন আছেন যে, সম্পত্তি ভাগাভাগির ব্যবস্থায় ভারতের পক্ষে প্রথম থেকেই এবং স্বাভাবিকভাবেই একটা সুবিধা থেকে যাচ্ছে। অধিকাংশ রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ভারতীয় অঞ্চলের মধ্যেই রয়েছে। সুতরাং মাউণ্টব্যাটেন যদি আগামী আট মাস (আগষ্ট থেকে এপ্রিল পর্যন্ত) দুই ডোমিনিয়নের যুক্ত গবর্ণর জেনারেল পদে নিযুক্ত থাকেন, তবে সেটা পাকিস্থানেরই পক্ষে অনেক সুবিধার ব্যাপার হবে। আমরা বুঝলাম, বন্ধুবর্গের এই প্রস্তাব ও পরামর্শ জিন্না মেনে নিতে পারলেন না।

মাউণ্টব্যাটেনও জিন্নাকে খোলাখুলি-ভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন, এ সিদ্ধান্তের ফলে কি ক্ষতি হতে পারে, তা কি জিন্না ভেবে দেখেছেন? জিন্না অত্যন্ত প্রসন্ন-ভাবেই স্বীকার করলেন, হ্যাঁ ক্ষতি হবে। পাকিস্থান সম্ভবতঃ তার প্রাপ্য কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হবে, এই ক্ষতি।

জিন্না স্পষ্ট করেই মাউণ্টব্যাটেনকে জানিয়ে দিলেন যে, ১৫ই আগষ্টের পরে পাকিস্থানের গবর্ণর জেনারেলের পদ ছাড়া অন্য কোন পদ তিনি গ্রহণ করতে পারবেন না। এ অভিমত শুনিয়ে দিয়েও জিন্না সঙ্গে সঙ্গে আবার এই কথাও বললেন যে, মাউণ্টব্যাটেন ভারতের গবর্ণর জেনারেলের পদে নিযুক্ত থাকবেন বলে তিনি আশা করছেন। জিন্নার ইচ্ছা, মাউণ্টব্যাটেনই যেন ভারত ডোমিনিয়নের গবর্ণর জেনারেল হন। কারণ, তা'তে দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক স্থাপনের ও রক্ষার কাজে বিশেষ সাহায্য হবে বলেই জিন্না মনে করছেন।

গবর্ণর জেনারেলের পদ, এই বিশেষ একটি বিষয় নিয়ে জিন্না তাঁর আচরণে একটা অনিশ্চয় ও অস্পষ্টতার ভাব শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বজায় রেখে এসেছেন এবং সব শেষে যা করলেন, সেটাও একটা অভাবিত ও বিস্ময়কর ব্যাপার। কেউ কল্পনাও করে নি যে, জিন্না সত্য সত্যই পাকিস্থানের গবর্ণর জেনারেল হবার ইচ্ছা পোষণ করছেন। আমরা সকলেই ধরে নিয়েছিলাম যে, নতুন ডোমিনিয়নের নিয়মতান্ত্রিক গবর্ণর জেনারেল না হয়ে জিন্না বরং প্রধান মন্ত্রী পদেরই মর্যাদা ও ক্ষমতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা পছন্দ করেন এবং করতে বাধ্যও হবেন। এই কল্পিত ধারণার ওপরেই নির্ভর করে আমরা এমনও অনুমান করে ফেলে-ছিলাম যে, দুই ডোমিনিয়নের যুক্ত গবর্ণর জেনারেল পদে মাউণ্টব্যাটেন নিযুক্ত থাকলে পাকিস্থানের পক্ষে সুবিধা লাভের যে সুযোগ আছে, সে সুযোগ গ্রহণ করতেই জিন্না চাইবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বস্তুতঃ যা দাঁড়ালো, তাতে দেখতে পাচ্ছি যে, জিন্না নিজেকেই মনোনীত করে বসে আছেন এবং মাউণ্টব্যাটেনকে মনোনীত করেছেন এক-মাত্র কংগ্রেস। এরকম সম্ভাবনা আমরা কল্পনা করতে পারি নি এবং কখনো অনুমানের মধ্যেও স্থান দিই নি।

আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো, এরকম অভাবিত অবস্থার মধ্যে এখন কি করা কর্তব্য? সব দিক বিবেচনা করে সকলেরই এই অভিমত হলো যে, মাউণ্টব্যাটেনকে যে সর্তহীন অনুরোধ জানিয়েছেন কংগ্রেস, সে অনুরোধ রক্ষা করাই মাউণ্টব্যাটেনের উচিত। আমরা স্থির করলাম যে, ১৫ই আগষ্টের পর ভারত ডোমিনিয়নের গবর্ণর জেনারেলের পদ গ্রহণে সম্মত হবার জন্য মাউণ্ট-ব্যাটেনকে আমরা বিশেষ জোর দিয়েই আমাদের অনুরোধ ও অভিমত জানাবো।

গবর্ণর জেনারেল পদের ব্যাপারে ব্যবস্থা করবার সম্ভাব্য সব উপায় এখন মাত্র তিনটি উপায়ে এসে ঠেকেছে। (ক) পাকিস্থানের গবর্ণর জেনারেল পদে জিন্নার এবং ভারতের গবর্ণর জেনারেল পদে মাউণ্টব্যাটেনের নিয়োগে সম্মত হওয়া। কিম্বা (খ) পাকিস্থানের গবর্ণর জেনারেল পদে জিন্না এবং ভারতের গবর্ণর জেনারেল পদে মাউণ্টব্যাটেন ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করার জন্য কংগ্রেসকে বলা। অথবা (গ) এমন একটি নতুন নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফরমুলা উদ্ভাবন করা, যার দ্বারা মাউণ্টব্যাটেন দুই ডোমিনিয়নেরই গবর্ণর জেনারেল হতে পারবেন, অথচ পাকিস্থান রাষ্ট্রের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে জিন্না যে ক্ষমতা নিজের হাতে রাখতে চাইছেন, জিন্নার সে ইচ্ছারও অনেকখানি পূরণ করা সম্ভবপর হয়।

এই মধ্যে আমি লণ্ডনে এক টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি। টেলিগ্রামে এই প্রস্তাব করে পাঠিয়েছি যে, ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধিকে ভারতে পাঠাবার জন্য পত্রিকার সম্পাদককে অনুরোধ করা হোক। পত্রিকার প্রতিনিধি যা'তে ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক সমস্যা ও অবস্থার কয়েকটা প্রাথমিক বিষয়ের বাস্তব তথ্য জেনে ও বুঝে যেতে পারেন, তারই জন্য এই অনুরোধ করা হয়েছে।

ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকা সম্প্রতি তাঁদের অভ্যস্ত 'বিভারব্রুকগিরি'র এক বেপরোয়া হঠকারিতার নমুনা দেখিয়েছেন। ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ড একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তাঁদের পাঠকসমাজের কাছে এই তত্ত্ব পরিবেষণ করেছেন: "ভারতে দুটি ডোমিনিয়ন স্থাপন করবার ব্যবস্থা হয়েছে। যদি দু'টি ডোমিনিয়নই স্থাপন সম্ভবপর হয়, তবে একটি ডোমিনিয়ন স্থাপন সম্ভবপর হবে না কেন? সোজা কথায় বলা যায়, যাঁরা এই উদ্যোগে নিযুক্ত রয়েছেন, তাঁদের যদি যথোপযুক্ত রাজনৈতিক প্রতিভার অভাব না হতো, তবে ভারতকে সহজেই ব্রিটিশ-নৃপতির প্রতি অখণ্ড আনুগত্যের সম্পর্কে আবদ্ধ একটি ডোমিনিয়নে পরিণত করা সম্ভবপর হতো।" সম্পাদকীয় প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে আরও নানারকমের মন্তব্যের খোঁচাও আছে, 'বল্কানীকরণ' (Balkanisation), 'নিতান্ত প্রতিক্রিয়াশীল উদ্যম' ইত্যাদি। ভারতের সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের সমগ্র প্রচেষ্টাকেই নিন্দা করে বলা হয়েছে যে, এটা একটা 'রাজনৈতিক নীলাম' মাত্র।

দুঃখের কথা এই যে, যে বিভারব্রুক 'উদার [illegible] আদর্শে আন্তরিকভাবে [illegible] আমাদের চেষ্টার তাৎপর্য কিছুমাত্র বুঝতে পারছেন না। পৃথিবীর পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগে তিনি উদার রাষ্ট্রসমবায় প্রতিষ্ঠার আদর্শ সফল করে তুলতে চান, আমরাও প্রাচ্য-খণ্ডেও তারই প্রতিষ্ঠার আয়োজন করবার জন্য একটা শুভ প্রেরণা নিয়েই কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, বিভারব্রুক এটুকুও উপলব্ধি করতে পারছেন না।

নয় দিল্লী, বৃহস্পতিবার, ৩রা জুলাই, ১৯৪৭ সাল। আজ বিকালে স্টাফের বৈঠকে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর টেবিলের চার দিকে উপবিষ্ট প্রত্যেককে এক এক করে জিজ্ঞাসা করলেন, গবর্ণর জেনারেলের পদ গ্রহণের বিষয়ে প্রত্যেকে কি অভিমত পোষণ করেন? একজন ছাড়া প্রত্যেকেই জানিয়ে দিলেন যে, ভারত, পাকিস্থান

এবং ব্রিটেনের স্বার্থ ক্ষুন্ন না করতে হলে মাউণ্টব্যাটেনকে অবশ্যই কংগ্রেসের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে ভারতের গবর্ণর জেনারেলের পদ গ্রহণ করতে হবে। এটা তাঁর কর্তব্য।

মাউণ্টব্যাটেন বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। কারণ, আমরাই এর আগে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে, কোন একটি ডোমিনিয়নের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের সংগে প্রত্যক্ষভাবে ও সরকারীভাবে যুক্ত হয়ে পড়া মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে উচিত হবে না। দুই পক্ষের মধ্যে মাউণ্টব্যাটেন যে নিরপেক্ষ বিচারকর্তার উপযোগী ভূমিকা গ্রহণ করে রয়েছেন, সে ভূমিকা বর্জন করা মাউণ্টব্যাটেনের উচিত হবে না। আমাদের এই অভিমতের কথা মাউণ্ট-ব্যাটেন জানতেন। তাই আমাদের নতুন অভিমত শুনে এবং আমাদের এরকম সম্মিলিতভাবে একমত হ'তে দেখে মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে বিস্মিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু অবস্থার স্বাভাবিক প্রয়োজনের তাগিদেই আমরা অভিমত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছি। জিন্নার সিদ্ধান্ত অবস্থার বাস্তব পটভূমিকাই রূঢ়ভাবে বদলে দিয়েছে। আমরা এখন এটা স্পষ্ট করে বুঝেছি যে, পাকিস্থানের গবর্ণর জেনারেলের পদে নিজেকেই প্রতিষ্ঠিত করবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে জিন্না সম্পূর্ণরূপে একটা নতুন অবস্থা সৃষ্টি করেছেন।

নয়াদিল্লী, বৃহস্পতিবার, ৩রা জুলাই, ১৯৪৭ সাল। বুঝতে পারছি, ভারতের গবর্ণর-জেনারেলের পদ গ্রহণ করতে মাউণ্টব্যাটেনের মনে নানা রকমের দ্বিধা ও কুণ্ঠা দেখা দিয়েছে।

এইবার আমার উত্তর দেবার পালা। আমাকেও জিজ্ঞাসা করলেন মাউণ্টব্যাটেন, এ বিষয়ে আমার মত কি?

আমার বক্তব্য আমি লিখেই নিয়ে এসেছিলাম। গবর্ণর-জেনারেলের পদ সম্পর্কে ব্যবস্থা করার বিষয়ে যে তিনটি সম্ভাব্য উপায় আমরা গতকালই বিবেচনা করেছিলাম, আমার বক্তব্যে প্রধানতঃ সেই তিনটি উপায়েরই কথা আমি উল্লেখ করেছি। এই তিন উপায়ের কোন একটি উপায়ে যদি সমস্যার সমাধান হয়, তাহলে বৃহত্তর জনমতের ওপর তার কি প্রতিক্রিয়া হবে, আমি বিশেষভাবে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমার বক্তব্য রচনা করেছি। আমার বক্তব্যঃ

"একটা বাজে কথা রাজনীতিক মহলে খুবই বেশি প্রচারিত হয়েছে যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের পর পাকিস্থান বস্তুতঃ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেষ ঘাঁটি হয়ে উঠবে এবং কংগ্রেসের বৃটিশবিরোধী মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী অতি দ্রুত আরও বেশি প্রবল হয়ে উঠবে। কিন্তু এটা নিতান্তই বাজে ধারণা। এরকম আশংকা যে নিতান্তই ভিত্তিহীন, সেটা ইতিমধ্যেই নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। মাউণ্টব্যাটেন, কর্নভিল এবং নাই, এই তিন বৃটিশকেই ভারতে অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত করবার ইচ্ছা কংগ্রেস ঘোষণা করেছেন। এর পর আর ওধরণের সমালোচনার কোন ভিত্তি থাকে না, বরং ভারত ডোমিনিয়নে এই তিন বৃটিশের নিয়োগে বস্তুতঃ বৃটিশেরই মর্যাদা বৃদ্ধি করবে। বৃটিশের বিরুদ্ধে সত্তর বৎসর ধরে সংগ্রাম করার পর আজ কংগ্রেস তার সাফল্য ও জয়লাভের মুহূর্তে স্বেচ্ছায় ও স্বতঃপ্রণোদিত আগ্রহে কয়েকজন ইংরাজকেই ভারতে এইভাবে দায়িত্বপূর্ণ কার্যভার দিয়ে ধরে রাখতে চাইছেন, এ ঘটনা বৃটিশেরই মর্যাদার দিক দিয়ে একটি বৃহৎ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

"কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই আমন্ত্রণে বস্তুতঃ বৃটিশ-ভারত সম্পর্কেরই একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছে। এর ফলে নতুন ভারতের সংগে আমরা আরম্ভেই এমন এক সম্পর্কের সূত্র রচনার সুযোগ পাচ্ছি, যার বাস্তব সুফল আমাদের আশার সীমাও ছাড়িয়ে যাবে। মাউণ্ট-ব্যাটেন ভারতের গবর্ণর-জেনারেল হলে লোকে ধারণা করবে যে, মাউণ্টব্যাটেন কংগ্রেসের কাছে নিজেকে বেচে দিয়েছেন, এমন আশংকাও কেউ কেউ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এ আশংকাও অমূলক। কারণ মাউণ্টব্যাটেন ভারতের গবর্ণর-জেনারেলের পদ গ্রহণ করলে শুধু কংগ্রেসেরই অনুরোধ রক্ষা করা হবে না, জিন্নারও অনুরোধ রক্ষা করা হবে। জিন্নাও ঠিক এই ব্যবস্থাই চাইছেন। নতুন ভারত রাষ্ট্রের উচ্চতম পদে মাউণ্টব্যাটেন নিযুক্ত থাকলে বরং জনমতে স্বাভাবিক-ভাবেই এই ধারণা দৃঢ়তর হবে যে, ভারত ও পাকিস্থানের পারস্পরিক সম্পর্ক বিরোধের পথে না গিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ সহ-যোগিতার পথেই চালিত হবার সুযোগ পাবে। বর্তমান অবস্থায় ভারতে মাউণ্ট-ব্যাটেনের অবস্থান বস্তুতঃ দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সুসম্পর্ক রক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। তাছাড়া বৃহত্তর জনমতের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাসও দেখা দেবে যে, সম্পত্তি-বিভাগের ব্যাপারে কোন বিষয়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যদি মাত্রা ছাড়া দাবী উত্থাপিত হয়, তবে মাউণ্টব্যাটেন স্বাভাবিকভাবেই সে দাবীর প্রতিবন্ধক হবেন।

"আর একটা কথা উঠেছে। জিন্না তাঁর বর্তমান মনোভাব এবং পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার নিয়ে পাকিস্থানের গবর্ণর-জেনারেল হবেন, আর মাউণ্ট-ব্যাটেন হবেন ভারতের নিয়মতান্ত্রিক গবর্ণর-জেনারেল। এই অবস্থায় মাউণ্ট-ব্যাটেন ভারত-পাকিস্থান সম্পর্কের ওপর এমন কিছুই প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন না। এ যুক্তির সারবত্তা অবশ্য কিছুটা স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু এটা হলো ভিন্ন সমস্যা, এর জন্য জনমতের দিক থেকে কোন সমস্যা দেখা দেবে না। কোন সন্দেহ নেই যে, নিয়মতান্ত্রিক বিধান অনুসারে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে মাউণ্ট-ব্যাটেন ভারতের গবর্ণর-জেনারেল হওয়ায় তাঁর পক্ষে ভারত-পাক সম্পর্ক প্রভাবিত করার সুযোগও সীমাবদ্ধ হবে। কিন্তু আমার মনে হয়, এ সত্যও ব্যাপকভাবেই স্বীকৃত হবে যে, ভারত-পাক সম্পর্ক প্রভাবিত ও উন্নত করার কিছুমাত্র যোগ্যতাও যদি কারও থেকে থাকে, তবে একমাত্র মাউণ্টব্যাটেনেরই আছে। এ বিষয়ে মাউণ্টব্যাটেন যা করতে পারবেন, তার চেয়ে বেশি কিছু করবার সাধ্য অন্য কারও নেই। কারণ এই সংকটের কালে জিন্নার সংগে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসবার সুযোগ মাউণ্টব্যাটেনের হয়েছে, সে অভিজ্ঞতা অন্য কারও নেই।

"সমালোচকের আর একটি প্রশ্ন হলো, মর্যাদার প্রশ্ন। এই যুক্তি দেখানো হচ্ছে যে, বৃটিশ নৃপতির প্রতিভূ হয়ে ভাইসরয়ের পদে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি ভারত ডোমিনিয়নের গবর্ণর-জেনারেল হচ্ছেন। সে ভারত আবার সমগ্র ও অখণ্ড ভারত নয়। পাকিস্থান নামে বিরাট একটা অংশ বাদ দিয়ে 'ভারত ডোমিনিয়ন' নামে পরিচিত একটা অংশের গবর্ণর-জেনারেল। এ ব্যাপার মাউণ্ট-ব্যাটেনের ব্যক্তিগত মর্যাদার দিক দিয়ে বস্তুতঃ নেমে যাওয়ার ব্যাপার। কিন্তু আমি মনে করি, এই যুক্তিও অর্থহীন। কিসের থেকে কোন অবস্থা থেকে নেমে যাচ্ছেন মাউণ্টব্যাটেন? দেখতে হবে, মাউণ্টব্যাটেন কি উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে এসেছেন। তিনি এসেছেন ক্ষমতা হস্তান্তর করতে এবং বৃটিশের সংগে ভারতের এক নতুন সম্পর্কের অধ্যায় আরম্ভ করে দিয়ে যেতে। 'শেষ ভাইসরয়ের' মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি এখানে আসেন নি। তাঁর কাজ

অতীতের কোন বস্তুকে সংরক্ষিত করা নয়, তিনি নতুন ভবিষ্যতের সূচনা করে দিতে এসেছেন। সুতরাং বিশেষ জোর দিয়েই বলতে পারা যায়, মর্যাদাপূর্ণ অবস্থা থেকে নেমে যাওয়ার কোন প্রশ্ন এক্ষেত্রে নেই।

"১৫ই আগস্ট তারিখে মাউণ্টব্যাটেন যদি ভারতে অন্য কোন ব্যক্তিকে গবর্ণর-জেনারেলের পদে দেখতে পান এবং তাঁর হাতে কার্যভার ছেড়ে দিয়ে চলে যান, তবেই বরং মাউণ্টব্যাটেনের আচরণ সমালোচনার বিষয় হয়ে উঠবে। সমস্ত সমস্যা যখন উদ্বেলিত হয়ে টেনা-তরঙ্গের চূড়ায় গিয়ে উঠেছে, ঠিক সেই সময় মাউণ্টব্যাটেনের চলে যাওয়ার অর্থ এই হবে যে, তিনি পরিণামের সব দায়িত্ব এড়িয়ে সরে পড়ছেন। লোকে জানবে যে, কংগ্রেস মাউণ্টব্যাটেনকে কোন সর্তেই আবদ্ধ না করে ভারতের গবর্ণর-জেনারেলের পদ গ্রহণে অনুরোধ করেছিলেন, অথচ মাউণ্টব্যাটেন সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে চলে গেলেন। এর ফলে নানা রকম বিরুদ্ধ সমালোচনা ক্রমেই পুঞ্জীভূত হতে থাকবে এবং যেমন বর্তমানে, তেমনি ভবিষ্যতেও এই সমালোচনার জেরও চলতে থাকবে। এর ফলে মাউণ্টব্যাটেনের ওপর এই অপবাদ আরোপিত হবে যে, তিনি সব কাজ অর্ধ-সমাপ্ত অবস্থায় পেছনে ফেলে রেখে সোজা পালিয়ে গেলেন।"

আমার বক্তব্য শেষ করলাম। এর পর বৈঠকে 'বিবিধ বিষয়' আলোচিত হলো। দেশ বিভক্ত করার প্রসঙ্গে এখন 'কুকুরের ক্লাব' বিভক্ত করার প্রসঙ্গও এসে পড়ছে। সত্য সত্যই এই রকম একটা প্রস্তাব দপ্তরে এসে পৌঁচেছে। সুতরাং এখন আমরা বস্তুতঃ এই প্রশ্নেরই সম্মুখীন হয়েছি—ভারতের রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ভাগ করতে গিয়ে কি একটা 'কুকুরের ক্লাব' পর্যন্ত ভাগ করতে হবে? সম্পত্তি ভাগ করার বিষয়ে মিলিটারী সেক্রেটারীর দপ্তরে ভারতের নানা রকমের 'নিখিল ভারতীয়' প্রতিষ্ঠান—এই প্রশ্ন করে এবং পরামর্শ চেয়ে পাঠাচ্ছেন যে, দেশ যখন খণ্ডিত হতে চলেছে, তখন তাঁরা তাঁদের সম্পত্তি সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করবেন? 'কুকুরের ক্লাব' ভাগ করার প্রস্তাব এই ধরণেরই মনোভাবের একটা নমুনা।

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ৪ঠা জুলাই, ১৯৪৭ সাল। আজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা হয়ে গেল। অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টের ভবিষ্যৎ সঙ্কট পরিহারের জন্য মাউণ্টব্যাটেন অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টেরই সকল সদস্যকে পদত্যাগ করবার জন্য নির্দেশ দান করেছেন। মন্ত্রিসভায় কংগ্রেস ও লীগ, উভয় পক্ষেরই সদস্যদের পদত্যাগ করতে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেন পদত্যাগী প্রত্যেক সদস্যকে পুনরায় আহ্বান করেছেন প্রত্যেকের নির্দিষ্ট দপ্তরের কাজ চালিয়ে যাবার জন্য, যতদিন না পার্লামেণ্টে ভারতীয় স্বাধীনতা বিল আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়।

মাউণ্টব্যাটেন যে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন, সেটা বস্তুতঃ কালক্ষেপ করবার একটা ব্যবস্থা মাত্র; এর দ্বারা অবশ্য সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হবে না। কিন্তু এ কাজ না করে মাউণ্টব্যাটেনের উপায় ছিল না, কারণ অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টের অন্তর্বিরোধ অত্যন্ত বিসদৃশ রূপ গ্রহণ করেছে। অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টের ভেতরে দুই পক্ষের বিরোধের ব্যাপার যেমন জটিল, তেমনি বিপজ্জনক অবস্থায় এসে পৌঁছেচে। ৩রা জুনের পরিকল্পনা গৃহীত ও সমর্থিত হবার পর থেকেই মাউণ্টব্যাটেনকে দুটি পরস্পরবিরোধী পক্ষের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের চাপে পড়তে হয়েছে। মুসলিম লীগকে লক্ষ্য করে প্যাটেল এই অভিযোগ করেছেন—"যদি আপনারা দেশের শাসনকার্য চালাতে না চান তবে অন্ততঃ আমাদের চালাতে দিন।" কংগ্রেস পক্ষ থেকে বার বার যেসব অভিযোগ করা হচ্ছে, তার মধ্যে প্যাটেলেরই এই মূল অভিযোগ আরও জোর দিয়ে সমর্থন করা হয়েছে। কংগ্রেসের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে জিন্নাও তাঁর মনের কথা বিশেষ জোর দিয়েই জানিয়েছেন—মুসলিম লীগ পক্ষের একজন মন্ত্রীকেও যদি অপসারিত করা হয়, তবে মুসলিম লীগ পক্ষের সকল মন্ত্রীই একসঙ্গে পদত্যাগ করবেন। এর দ্বারা মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে এই সত্যই স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া হবে যে, তাঁরা কোন ব্যাপারে আর সহযোগিতা করতে পারবেন না এবং দেশখণ্ডনের সমগ্র উদ্যোগের সকল ব্যবস্থার ও কাজের দায়িত্ব তাঁরা হাত থেকে ধুয়ে ফেলবেন। কোন বিষয়ে লীগকে দায়ী করবার আর কোন যুক্তি থাকবে না।

মাউণ্টব্যাটেন উপলব্ধি করতে পেরেছেন, লীগ যদি এরকম কোন ব্যাপার করে বসে, তাহলে ভারতের শান্তি এবং পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার ভরসা, উভয়ই বিনষ্ট হবে।

১৫ই আগস্ট আসতে আর ক'দিনই বা বাকী আছে। আর মাত্র এক মাস দশ দিন পরেই ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্রে ভারত ও পাকিস্থান নামে দুটি ডোমিনিয়ন দেখা দেবে। যাঁরা মাত্র আর চল্লিশ দিন পরে পাকিস্থান নামে নতুন ডোমিনিয়নের শাসনভার গ্রহণ করবেন, তাঁরা এখনও এখানে এক একটা দপ্তরের ভার নিয়ে এবং শাসনকার্যের দায়িত্বের

একটা অংশ নিয়ে ভারত মন্ত্রিসভার মধ্যেই রয়েছেন। কংগ্রেস অভিযোগ করছেন, লীগমন্ত্রীরা দপ্তর অধিকার করে রয়েছেন, অথচ দায়িত্ব পালন করছেন না। যাঁরা আর ক'দিন পরেই চলে যাবেন, ভারতের বর্তমান অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টের জন্য তাঁদের মনে কোন দরদ নেই, দরদ থাকতেও পারে না বরং মন্ত্রিসভার ভেতরে থেকে তাঁরা সব কাজে এখনো শুধু বাধা দিয়ে আর ক্ষতি করে চলেছেন। চল্লিশ দিন পরে যাঁদের একটা ভিন্ন রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ করতে হবে, তাঁদের এখন ভারত মন্ত্রিসভার মধ্যে দপ্তর আঁকড়ে পড়ে থাকার কি যুক্তি এবং কি প্রয়োজন আছে? এই হলো কংগ্রেস পক্ষের মনোভাব।

দেখতে পাচ্ছি, কংগ্রেস আর দেরী করতে রাজী নন। এই মুহূর্তেই নিজেকে নিজের ঘরের মালিক করে ফেলবার দাবী করছেন কংগ্রেস। দাবীর জোরও দিন দিন বাড়ছে এবং নেহরুও কংগ্রেসের এই দাবীর প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারছেন না। তিনিও কংগ্রেসের এই মনোভাব এবং দাবী সমর্থন করছেন। অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টের এই অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও হানাহানির প্রকোপে পড়ে নেহরু বস্তুতঃ হাঁপিয়ে উঠেছেন। অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে লীগ মন্ত্রীদের এখনো থাকবার কি যৌক্তিকতা আছে, এই প্রশ্নের দাবীতেই নেহরু গত সপ্তাহে পদত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।

লীগ মন্ত্রীরা দপ্তর ছাড়তে রাজী নন। যদি এমন কোন ব্যবস্থার সূত্র পরিকল্পিত হয় যে, লীগ মন্ত্রীদের হাত থেকে এখন দপ্তরের ভার ছাড়িয়ে নেওয়া হবে, তবে সে ব্যবস্থা জিন্না স্বীকার করবেন না। জিন্না প্রথমেই জানিয়ে রেখে দিয়েছেন যে, এ ধরণের কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হ'লে তিনি সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করবেন। জিন্নার মতে, এ ধরণের প্রস্তাব বস্তুতঃ লীগকে অপমান করারই প্রস্তাব।

জিন্নার এই মনোভাব লক্ষ্য করে মাউণ্টব্যাটেন অন্য ধরণের এমন একটি ব্যবস্থার প্রস্তাব রচনা করলেন, যার মধ্যে লীগ কোন অপমানের কারণ বা যুক্তি খুঁজে পাবেন না। এই ব্যবস্থার প্রস্তাব ঘোষণা করার জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশের উদ্দেশ্যে একটা বিবৃতিও রচনা করে ফেললেন মাউণ্টব্যাটেন। জিন্না যখন দেখলেন যে, 'লীগের অপমানের' প্রশ্ন তুলে আপত্তি করার কোন যুক্তি আর পাওয়া যাচ্ছে না; তখন জিন্না তাঁর আপত্তির যুক্তিও সংগে সংগে বদলে ফেললেন। জিন্না বললেন, মাউণ্টব্যাটেনের এই নতুন ব্যবস্থার প্রস্তাবে তিনি বাধা দেবেন, কারণ এ প্রস্তাব ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে বিধি-সংগত নয়।

এ যুক্তি শুনবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না মাউণ্টব্যাটেন এবং এরকম একটা যুক্তি যে থাকতে পারে সেটাও তিনি ভেবে দেখেননি। জিন্নার কথা নিতান্ত আকস্মিকভাবেই মাউণ্টব্যাটেনকে মনে পড়িয়ে দিল যে, আর একটা দিক ভেবে দেখবার প্রয়োজন এবং দায়িত্ব আছে, কারণ লণ্ডনে খোঁজ নিয়েও মাউণ্টব্যাটেন জানলেন যে, ১৯৩৫ সালের আইনের ওপর নির্ভর করে জিন্না যে আপত্তি ও অভিযোগ করছেন, তার যথেষ্ট যুক্তিগত ভিত্তি আছে। মাউণ্টব্যাটেন উপলব্ধি করলেন, ভারতীয় স্বাধীনতা বিল আইনে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান ভারত গবর্ণমেণ্টকে পুনর্গঠিত করবার কাজে হাত দেওয়া সম্ভবপর নয়।

আজকের ষ্টাফের বৈঠকেও আমরা গবর্ণর-জেনারেলের পদ সম্পর্কে আলোচনা করলাম। ১৫ই আগষ্টের পর শুধু ভারত ডোমিনিয়নেরই গবর্ণর-জেনারেলের পদে মাউণ্টব্যাটেন নিযুক্ত থাকতে পারেন কি না এবং থাকলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার কি ফল হতে পারে, এই বিষয়টিই আজকের বৈঠকে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হলো। মাউণ্টব্যাটেনের মনে এবিষয়ে ঘোর সংশয় এখনো রয়েছে এবং আমরা এখনো সে সংশয় দূর করতে পারছি না। মাউণ্টব্যাটেন এই ভয় করছেন যে, ভারতের গবর্ণর-জেনারেল হ'লে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টায় তাঁকে অনেক অসুবিধায় পড়তে হবে। তিনি এমন কোন পদ গ্রহণ করতে উৎসাহ বোধ করছেন না, যে পদে থাকলে তাঁর কাজ ও কর্মক্ষমতার নিরপেক্ষতা খর্বিত হবার সম্ভাবনা আছে, এবং যার ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের যে আস্থা ও শুভেচ্ছা তিনি এরই মধ্যে অর্জন করতে পেরেছেন, সেটা সম্পূর্ণরূপেই বিনষ্ট হবে।

মাউণ্টব্যাটেন এখন লণ্ডনের পরামর্শের আশায় রয়েছেন। তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্তৃস্থানীয় সকলেরই পরামর্শ চেয়ে পাঠিয়েছেন। ইংলণ্ডের নৃপতি এবং প্রধান মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে নীচের দিকের সকল কর্তাব্যক্তির পরামর্শ সরকারীভাবে পাওয়ার পর মাউণ্টব্যাটেন তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। মাউণ্টব্যাটেন এই ধারণাও করছেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁকে ভুল বুঝবেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট মনে করবেন যে, মাউণ্টব্যাটেন তাঁদের বিভ্রান্ত করেছেন। একথা অবশ্য তিনি স্বীকার করছেন যে, বর্তমান গবর্ণমেণ্ট তাঁর সম্পর্কে এরকম ধারণা যদি করেন, তবে সেটা অসংগত কিছু হবে না। ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এ ধারণা করা খুবই স্বাভাবিক এবং সংগত যে, যুক্ত গবর্ণর-জেনারেলের পদটিকেই একমাত্র কাম্য মনে করে এবং সে পদ লাভের সম্ভাবনা না দেখতে পেয়ে মাউণ্টব্যাটেন অন্য পদকে নিতান্ত মূল্যহীন বলে উপেক্ষা করলেন এবং গবর্ণমেণ্টকে এরকম একটা অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেললেন।

অগত্যা মাউণ্টব্যাটেন এই ব্যবস্থা করলেন যে, ইসমে অবিলম্বে লণ্ডন চলে যাবেন। পার্লামেণ্টে ভারতীয় স্বাধীনতা বিল গৃহীত হবার সময় ইসমেকে সেখানে থাকতে হবে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কোন বিষয়ে কিছু জানবার প্রয়োজন হলে সেটা ইসমের সংগে আলোচনা করে সরকারীভাবেই গবর্ণমেণ্ট জেনে নিতে পারবেন। কিন্তু এটাই ইসমের লণ্ডন যাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। আর একটি কাজের দায়িত্ব নিয়ে ইসমে যাচ্ছেন। ১৫ই আগষ্টের পর মাউণ্টব্যাটেনের ভারতে থাকা উচিত হবে অথবা ইংলণ্ডে ফিরে আসাই উচিত হবে, এ বিষয়ে 'সর্বোচ্চ' কর্তৃপক্ষের গোপন পরামর্শ ও নির্দেশ সংগ্রহ করবেন ইসমে। আমাকেও ইসমের সংগে যেতে হবে। আমার কাজ হবে, এই সুযোগে সংবাদপত্র এবং অন্যান্য মহলের মনোভাবের ওপর লক্ষ্য রাখা। গবর্ণর-জেনারেল নিয়োগের সমস্যায় যে 'নতুন অবস্থা' দেখা দিয়েছে, সে সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য প্রচার করে লণ্ডনের প্রতিক্রিয়া ও জল্পনাকে সংযত করার চেষ্টাই আমাকে করতে হবে।

লণ্ডন, সোমবার, ৭ই জুলাই, ১৯৪৭ সাল। ভাইসরয়ের ইয়র্ক বিমানের আরোহী হয়ে আমরা শনিবার অপরাহ্নেই পালাম ছেড়ে রওনা হলাম। আজ চায়ের সময় নর্থহল্টে একবার নামলাম এবং সন্ধ্যা ছটা বাজবার আগেই ইসমেকে দেখা গেল, দশ নম্বর ডাউনিং ষ্ট্রীটে প্রধান মন্ত্রী এটলীর সংগে বসে তিনি আলোচনা করছেন। সমস্যাটা বুঝতে এটলীর একটুও দেরী হয়নি। এটলী এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে, সমস্যায় যে নতুন ও দুরূহ অবস্থা দেখা দিয়েছে, তাতে মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে ভারতে থেকে যাবার প্রয়োজনীয়তা একটুও কমেনি, বরং আরও বেড়েই গেছে বলা যায়।

লণ্ডন, মঙ্গলবার, ৮ই জ্লাই, ১৯৪৭ সাল। গতকাল ডিনারের পর দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে এক বৈঠকে যোগদান করলেন ইস্মে এবং সারারাত্রি পার করে দিয়ে তবে বৈঠক শেষ হলো। ভারতের গবর্ণর-জেনারেলের পদ গ্রহণ করলে ব্যক্তিগতভাবে মাউণ্টব্যাটেনকে যে নতুন অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে, মন্ত্রীরা সেই বিষয়ে আলোচনা করলেন। বর্তমানে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর পদাধিকার অনুসারে যে ভূমিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন, সেটা হলো বস্তুতঃ নিরপেক্ষ সালিশকারীর ভূমিকা। কিন্তু ভারতের গবর্ণর-জেনারেল হলে মাউণ্টব্যাটেন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর এই নিরপেক্ষ সালিশকারীর ভূমিকা এবং যোগ্যতা থেকে বিচ্যুত হবেন, কারণ তখন তাঁকে একটি রাষ্ট্রের স্বার্থ ও দায়িত্বের সংগে নিজেকে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করে ফেলতে হবে। নিরপেক্ষতার ভূমিকা থেকে সরে গিয়ে তাঁকে একটা পক্ষভুক্ত অবস্থা স্বীকার করে নিতে হবে। এই অবস্থায় দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ ও মতভেদ দেখা দিলে নিরপেক্ষতার মর্যাদা নিয়ে মীমাংসার জন্য কোন চেষ্টা করাও মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠবে। এই ধরণের সংশয় মন্ত্রীদের কথায় এবং আলোচনায় ফুটে উঠলেও সকল মন্ত্রীই মোটামুটিভাবে মাউণ্টব্যাটেনের ভারতে থাকার পক্ষেই মত দিলেন। বৈঠকের সাধারণ অভিমত এই দাঁড়ালো যে, গবর্ণর-জেনারেলের পদ গ্রহণ করার জন্য মাউণ্টব্যাটেনকে কংগ্রেস যে অনুরোধ করেছেন, বর্তমান অবস্থায় সে অনুরোধ রক্ষা করাই মাউণ্টব্যাটেনের উচিত হবে। এটলী এমনও বললেন যে, অন্য কেউ নয়, একমাত্র মাউণ্টব্যাটেনই এই সমস্যার মধ্যেই কাজ করে যাবার ক্ষমতা রাখেন। ভারতের গবর্ণর-জেনারেলের পদে মাউণ্টব্যাটেনের নিয়োগ সমর্থন করে লিয়াকৎ লিখিতভাবে মুসলিম লীগের যে মনোভাব জানিয়ে দিয়েছেন, লিয়াকতের সেই পত্রও মন্ত্রিসভার এই বৈঠকে ইস্মে পেশ করলেন। মুসলিম লীগের এই মনোভাবের পরিচয় পেয়ে গবর্ণমেণ্ট খুবই খুশি এবং আশান্বিত হলেন। এখন অবস্থা বস্তুতঃ এই দাঁড়ালো যে, মাউণ্টব্যাটেনকে একটি রাষ্ট্রের পক্ষে থাকবার জন্য দুই পক্ষই অনুরোধ করেছেন।

এর পর ইস্মেকে আর এক পক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হতে হলো। আজ সকালে এটলী বিরোধী দলের নেতাদের এক বৈঠকে মিলিত হবার জন্য আহ্বান জানালেন—স্যালিসবেরি, ম্যাকমিলন, বাটলার, স্যামুয়েল এবং ক্লেম ডেভিস। বিরোধীদের এই বৈঠকে সমস্যার বিষয়টি বর্ণনা করলেন ইস্মে।

১৫ই আগস্টের পর একমাত্র ভারত ডোমিনিয়নের গবর্ণর-জেনারেলের পদে মাউণ্টব্যাটেনের নিয়োগের প্রশ্নকে বিরোধীরা কি চক্ষে দেখেছেন এবং কি বলবেন, কিছুই অনুমান করতে পারছি না।

(ক্রমশঃ)

প্রথম ক'দিন খুবই অসুবিধা হয়েছিল। মনে হয়েছিল, ফিরতি ট্রেনেই ফিরে যায়। কাজ নেই আর এগিয়ে—কম করে ধরলেও দু'শো সাইকেল-রিক্সা ভাগাড়ে শকুন পড়ার মত এদিক-ওদিক থেকে ডানা মেলে ছেঁকে ধরলে, হর্ন বাজানর নামে কানে তালা লাগিয়ে দিলে। বেশ কিছুক্ষণ লাগল দৃশ্যটার মর্ম্ম উপলব্ধি ক'রতে। এক-পা জলে, এক-পা স্থলের মত অবস্থা!

"কোথা যাবেন? হাসপাতাল? আসুন না এইটেতে—"

"টি-বি হাসপাতাল তো? উঠে বসুন, তবে আর কি!"

"সামনে পোল ভাঙা আছে! উঠে পড়ুন, ঠিক নিয়ে যাব।"

"রাস্তা খারাপ কিন্তু—চাঁদমারি দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাব। উঠুন—"

"যাবেন কোথায়? বুঝতে পেরেচি, চড়ে বসুন না!"

"নতুন গাড়ি দেখচেন না! এক ছুটে চলে যাব, বুঝতেই পারবেন না, চলে আসুন।"

হকচাকিয়ে মাধুরী ঠায় দাঁড়িয়ে। গন্তব্য গুলিয়ে যাবার মত। টোপ পেয়ে চার ঘুলানোর মত রিক্সাওয়ালারা যে যার গাড়ির নড়া ধরে, একবার এগিয়ে যায়, আবার পিছিয়ে আসে, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে টিপে টিপে হর্ন বাজায়। সামনেটা কিন্তু রোড-ক্লোজড'এর মত বন্ধ করে রাখে। শিকার যদি পালায় ছিটকে।

ইচ্ছে করলেও মাধবী কিছু বলতে পারেনি। মজাটা মন্দ লাগছিল না তার। আটাশ মাইল মুখবোজা অন্তর্মুখীনতার পর হঠাৎ সহস্র মুখে এই হট্টগোল বিরক্তির বদলে কৌতুক জাগায়। ডুব-সাঁতারে মাটি পায়ে লাগে। মাধবীর মনে থাকে না, তার এখানে আসবার কারণ কি। যাবেই-বা কোথায়? স্টেশনের নামটা মুছে গেছে যেন মন থেকে। চিত্রার্পিত মাধবী বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে—কে জানে জীবন সম্বন্ধে তার অন্য কোন ধারণা হয় কি না। এতদিন যা দেখেছে, যা বুঝেছে, যা ভেবেছে, এ বোধ হয় তা নয়।

তাই বলে বেশিক্ষণ নয়। সাহস করে একটাতে উঠে বসতেই যা দেরি, এ-ভাবটা আর থাকে না। মনে হয়, দুশো গাড়ির একটাও আর ধারে-কাছে নেই, সওয়ারি পেয়ে যে-যার চলে গেছে। পিছন না ফিরেও সারা রাস্তাটা মাধবীর মনে হবে, রিক্সা গাড়ির স্ট্যান্ডটা খাঁ-খাঁ করছে, অত গাড়ি সারবন্দী সাজানই আছে কেবল, চালক নেই। অদ্ভুত, আশ্চর্য ভাবনা কিন্তু!

স্টেশন কম্পাউন্ড ছাড়িয়ে একদা মিলিটারীর প্রয়োজনে তৈরি পাকা পিচের রাস্তাটা ভোজশেষের উচ্ছিষ্ট কলাপাতার মত চক্-চক্ করছে। আশপাশের জলা-জঙ্গল, ঝোপ-ঝাড়ের সঙ্গে একেবারে বেমানান। তোমার মনে নেই বুঝি, কাঁচরা-পাড়ায় মিলিটারী ক্যাম্প পড়েছিল যুদ্ধের সময়? রাস্তা পাকা না করলে সমরোপকরণ চলাচল করবে কি করে? এখন তো রাস্তাটা পড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনা! টি-বি হাস-পাতালে যাবার একমাত্র পথ। রাস্তার বাঁ দিকের ঝিলটা পানায় বুজে আসছে; ডান দিকে ছেঁড়া-আঁচলে ঘোমটা দেওয়ার মত জীর্ণ ক্যাম্পগুলোয় উদ্বাস্তুরা আশ্রয় নিয়েছে: ছিন্নমূল জীবনের বিক্ষিপ্ত গৃহস্থালী—এলোমেলো ছন্নছাড়া, মেঘলা আকাশের নীচে কেমন জবুথবু আড়ষ্ট হয়ে আছে। চাঁদমারি উদ্বাস্তু শিবিরে যাবার পথনির্দেশটা কিন্তু এখনো কাষ্ঠ-ফলকে জ্বল্ জ্বল্ করছে: To Chand-mari Camp.

ট্রেনে আটাশ মাইল মুখ বুজে আসতে তবু একরকম যা হয় লেগেছিল, এখন কিন্তু খুব খারাপ লাগছে—চোখের ওপর রিক্সাওয়ালার দড়ির মত পা দুটোর টানা-পোড়েনে সমস্ত দেহটা কুঁকড়ে উঠছে। হঠাৎ প্যাডেলটার বে-কায়দা শব্দে মনে হয়, পা দুটো তার বুঝি ছিঁড়েই গেল।

মাধবীর এমনি কেমন মনে হয়, এখান থেকে অবনীকে আর কোনদিন ফিরে যেতে হবে না। ঠিক মরার কথা নয়, না ফেরার কথা, আর দেখা না-হওয়ার কথা। রোগটার দুরারোগ্যতা সম্বন্ধে মাধবী যেন এক-রকম নিশ্চিন্ত হয়। সারা দেহটা অবশ হয়ে মাথা ঝিম ঝিম করে—দেখতে গিয়ে আর লাভ কি? মিছিমিছি দুঃখু বাড়ান! অবনীও যদি ভেবে থাকে, বুঝে থাকে, সে আর ভাল হবে না, তাহলে দুজনের এই দেখা-শোনায় খালি কি প্রতারণা থাকে না? মাধবী জানে, আর আশা নেই, অবনীও জানে, আর ভরসা নেই—তাহলে আর কি আছে, যার জন্যে এই—

রিক্সাটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো উচোট খেয়ে। মাধবী হুমড়ি খেতে খেতে সামলে নিলে। রিক্সাওয়ালা ততক্ষণে গাড়িটা বাগিয়ে নিয়েছে—পায়ের শিরগুলো তার দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলে উঠেছে।

কিছু বলবার আগেই রিক্সাওয়ালা বললে, রাস্তাটা এইখানেই যা একটু খারাপ—

সুতরাং মাধবীরও বলবার কিছু নেই। সামান্য একটু ঝাঁকুনি বইতো নয়! আগে থেকে জানা থাকলে বোধ হয় ওটুকুও হতো না। তাছাড়া দুর্ঘটনা তো কিছু ঘটেনি!

ঝাঁকুনি খেয়ে একটা কাজ হলো। মাধবী নিজের মনে খুব বেশি সচেতন হয়ে উঠলো। কি যা-তা ভাবছিল তার ঠিক নেই, কেমন যেন নিরুৎসাহ, হতাশা বোধ করছিল। গাড়িটা ঝাঁকুনি দিয়ে তবু কিছুটা সজাগ করে' দিলে তাকে।

ঠিক আগের উৎসাহ ফিরে না পেলেও একেবারে হতাশ হয়ে মুষড়ে পড়বারও কোন কারণ নেই। টি-বি দুরারোগ্য নয়। অবনী ভাল হবে, একদিন হাসপাতাল থেকে দুজনে মিলে এই সাইকেল-রিক্সা করেই ফিরে যাবে। জানা-শোনা অনেকের টি-বি হাসপাতাল থেকে ফিরে যাওয়ার নজির মাধবীর এখন মনে পড়ছে—এই তো সেদিন তাদের কলেজের প্রফেসর সেন

ফিরে এল কোন স্যানাটোরিয়াম থেকে। অবিবাহিত ছোকরা প্রফেসর। পড়ান আরম্ভ করেনি এখনো, পুরোন ছাত্রীদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল—মনে হবে না দেখলে, অমন একটা সাংঘাতিক রোগ তার ঐ শরীরে একদিন আশ্রয় করেছিল, কলেজে পড়াতে পড়াতেই মুখ দিয়ে বিষাক্ত রক্ত উঠেছিল! কি সুন্দর চেহারা হয়েছে এখন প্রফেসর সেনের, দেখবার মতন! পাঁচ-কানে মাধবী শুনেছে, প্রফেসর সেনের পথ চেয়ে যে মেয়েটি আজো অপেক্ষা করে আছে, তার আনন্দ নাকি অনির্বচনীয় হয়ে উঠেছে —সেন ফিরে আসতে সেই যে কাঁদতে আরম্ভ করেছে, আজো নাকি সে-কান্না থামেনি, কেঁদে কেঁদে চোখ-মুখ ফুলে গেছে। গল্পটা শোনা থেকে মাধবী নিজের মনে কোথায় যেন সহানুভূতি বোধ করেছে —প্রফেসর সেনের প্রণয়িনীর কেঁদে কেঁদে চোখ ফোলানর কারণ বুঝতে পেরেছে। একটা অব্যক্ত মমত্ববোধে নিজেকে সে-কান্নার পাত্রী হিসাবে কল্পনায় মানেটা যেন স্পষ্ট হয়ে গেছে—কত সহজ, সোজা মানে, তাই নিয়ে সহপাঠিনীরা কি না রহস্যালাপ করেছিল সেদিন! অবুঝ যত সব! অবনী কিন্তু তখনও সুস্থ ছিল—প্রফেসর সেনের প্রণয়িনীর গল্প মাধবী তার কাছে করেছিল। শুনে অবনী কোন কথা বলেনি, হয়তো সেও মাধবীর মত সে-কান্নার মানে ধরতে পেরেছিল, বুঝেছিল।

সহসা মাধবী এমনি-এমনি চমকে ওঠে। অবনী সেদিন কেন চুপ করেছিল, এই মাত্র যেন মাধবী বুঝতে পারলে। সেনের প্রণয়িনীর প্রতি সহানুভূতিতে নয়, নিজের রোগের কথা গোপন করবার জন্যে অবনী চুপ করেছিল। মাধবীরও তো ঐ অবস্থা হবে একদিন, অবনী বোধ হয় তাই সাবধান হয়েছিল। এখন তো মাধবীর স্পষ্ট মনে পড়ছে, প্রফেসর সেন ফিরে আসবার ক'দিন পরেই অবনীর রোগ ধরা পড়লো। কিভাবে মাধবী সে-সংবাদ গ্রহণ করেছিল, এখন যেন মনে করতে পারে না। শুনে অবনীর বাড়িতে দেখা করতে সে ছুটে যায়নি, অনেক ভেবেচিন্তে এক-পা এগিয়ে পাঁচ-পা পিছিয়ে তবে সে দেখা করতে গিয়েছিল। নিজের মধ্যেও ঐ রোগের বীজাণুর সংক্রামণ উপলব্ধি করেছিল। আশ্চর্য, সেদিন নিজের জন্যেই মাধবীর যত ভাবনা ধরে গিয়েছিল! —অবনীর জীবনটা যে মাটি হয়ে গেল, সে মরবে কি বাঁচবে, সে-ভাবনা তাকে দেখে না আসা পর্যন্ত মাধবী আদৌ ভাবতে পারেনি। আর তাদের ভালবাসা?

গলা খাকরি দিয়ে যেন এ-চিন্তাকে মাধবী তাড়াতে যায়। শুকনো গলায় কাশির শব্দ হয় না। অবনী নিশ্চয়ই মাধবীর এ স্বার্থ-পরতার কথা জানে না; জানলে মাধবী নিশ্চয়ই আজকে এত কষ্ট স্বীকার করে' এতদূর আসতে সঙ্কোচ বোধ করতো। ভাগ্যিস!

নিজেকে নিজের কাছে বড় ছোট মনে হয় মাধবীর। এত লুকোচুরির পরেও কিসের টানে সে চলেছে অবনীকে দেখতে? বাঁচা-মরা-সমান অবনীকে কি আর তার প্রয়োজন? সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছে সে? পারবে সে প্রফেসর সেনের প্রণয়িনীর মত বলতে, আজীবন তোমার রোগ-মুক্তির প্রতীক্ষায় থাকবো?

অনায়াসেই মাধবী বলতে পারে সে কথা, অবনীকে সে তো কম ভালবাসে না! তাদের ভালবাসার গভীরতা কি কম নাকি কারো চেয়ে?

কি রকম যেন একটা বোধ হয় মনের— অসাড় অঙ্গ থামচে কোন সাড়া পাওয়া যায় না। ভোঁতা হয়ে বসে থাকে মাধবী। রিক্সাটা হাসপাতালের গেটে এসে থামে কখন।

অনেকটা দূরত্ব রেখে অবনী বাইরে এসে বসে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে। অন্য-মনস্কের মত দু-একটা কথা বলে। মাধবী ঠায় চেয়ে থাকে মুখের দিকে, এ-অবনীকে যেন সে চিনতে পারছে না। ঘুম থেকে উঠে-আসা মানুষের মত অবনীর মুখ-চোখ থম্ থম্ করছে—কদিনে সে মোটা হয়েছে, না ফুলে গেছে?

জিগ্যেস না করলেও চলে, তবু যেন জিগ্যেস করতে হয়ঃ কেমন আছ?

উত্তর না দিলেও চলে, তবু যেন উত্তর দিতেই হয়ঃ ভালই! তুমি কেমন আছ?

মাধবীর মুখটা কাচুমাচু হয়ে ওঠে। ম্লান হেসে বলে, ভালই!

অবনীও হাসে। ভাল থাকাথাকির প্রশ্নটা বোধ হয় অবান্তর। মাধবী কথা কইতে চেষ্টা করে, কিন্তু কোন কথা যেন আর সে খুঁজে পায় না। এখানে আগের কথা সব অচল, তার জের টানাও এখন অপরাধ। স্থান-কাল কথার উপযোগী নয় বোধ হয়।

আবার চুপ করে থাকাও অস্বস্তিকর। শব্দ করে চেয়ারটা একটু কাছে সরিয়ে আনে মাধবী। অবনীও সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার টেনে কিছুটা সরে যায়। ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক, দুজনের মধ্যে ব্যবধানটা একই থাকে। অবনী যেভাবে বোঝে, মাধবী ঠিক সেভাবে হয়তো বোঝে না কারণটা।

মাধবী জিগ্যেস করেঃ কি একটা অপারেশন হবার কথা ছিল, হয়ে গেছে?

হ্যাঁ, ফ্রেনিক! রুমালটা অবনী মুখে চেপে ধরে জোর করে।

তাহলে তো—বক্তব্যটা সম্পূর্ণ করতে পারে না মাধবী।

কি? মুখ থেকে রুমালটা সরিয়ে নিয়ে অবনী জিগ্যেস করে।

না, তাই জিগ্যেস করছিলুম! উৎসাহটা সহসা মাধবীর নিভে যায়। অবনী রুমালটাকে মুখের ওপর চেপে ধরে জোর করে। নীরবতাটা বাঞ্ছিত নয়, তবু কিন্তু এড়ান যায় না। তবে কি অর্থহীন এই সাক্ষাৎকার? এত জ্যানাশোনায়, এত মেলা-মেশায় এ সঙ্কোচ কেন? এ দূরত্বের মানে কি? অপরাধ বোধের মত দুজনেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু বলছে না কেন?

মাধবী সচেষ্ট হয়ে প্রশ্ন করে, এর পর তো এ-পি হবে?

পি-এ-এস কোর্স এখনো শেষ হয়নি। কি ঠিক করে ওরা বলা যায় না। অবনী একভাবে জবাব দেয়।

এত দেরি করচে কেন? তাড়াতাড়ি করতে পারে না! আগ্রহাতিশয্যে মাধবীর কণ্ঠস্বর কর্কশ হয়ে ওঠে।

এ-রোগের ঐ ধারা, ধীরে ধীরে চিকিৎসা করতে হয়—বাঁচ আর মর! ম্লান হেসে শান্ত কণ্ঠে অবনী বলে।

তা বলে কদ্দিন লাগবে? কৈফিয়ৎ চায় যেন মাধবী।

যতদিন লাগে! এক বছর, দু বছর, পাঁচ বছর, সাত বছর—ক্লান্তস্বরে অবনী জবাব দেয়।

মাধবী আর কোন কথা বলে না, মুখ ফিরিয়ে সামনে চেয়ে থাকে শূন্য দৃষ্টিতে, একটা অদ্ভুত মানসিক আবর্তের সৃষ্টি করে এই কালের হিসাব—এক বছর, দু বছর, পাঁচ বছর, সাত বছর! আজ, কাল,

পরশুরে গণনায় দুরতিক্রম্য সে-কাল নিশ্চয়ই।

নিজের সঙ্গে মিলিয়ে হয়তো অবনী বুঝতে পারে মাধবীর মনোবেদনাটা। শূন্য দৃষ্টিকে সজাগ করতে বলে, অতদিন লাগবে কেন! এক বছরেই—

অবনী হঠাৎ থেমে যায়। লক্ষ্য করে, মাধবী ঠায় সামনে চেয়ে আছে। শূন্য নয়, মুগ্ধ সে-দৃষ্টি ঔৎসুক্যে আবিষ্ট।

নতুন করে' অবনীর দেখবার কিছু নেই। ইতিপূর্বে আরো কয়েকদিন সে দেখেছে একলা-একলাই এখানে বসে। আজ না-হয় মাধবী এসেছে, দুজনে পাশাপাশি বসেছে, ঐ দৃশ্যটার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করেছে! মাঝখানে খানিকটা ঘাসের লন পেরিয়ে ওদিকে ফিমেল ওয়ার্ডে একটি তরুণীর একজন তরুণ ভিজিটর এসেছে। দেখা করার নামে—দুটিতে এমনভাবে বসে আলাপ করছে যেন হাসপাতালটা বিশ্রম্ভালাপের উপযুক্ত জায়গা। দূর থেকে এতটুকু ব্যবধানও লক্ষ্য করা যায় না। মনে হয়, ওরা এই সাক্ষাৎকারের অবসরটুকুতে স্থান-কালের বিধিনিষেধ ভুলে গেছেঃ টি-বি রুগীর অত কাছ ঘেঁষে বসতে নেই, আর অত কথা বলাও উচিত নয় কোন পেসেণ্টের খোলা মুখে।

মেয়েটিকে দেখে যত না, ছেলেটির কথা ভেবেই মাধবী শিউরে ওঠে। কি দুঃসাহসিক! যদি প্রণয়িনীই হয়, তাতে কি, তা বলে এখানে এসেও অমন মুখোমুখি বসে আলাপ করতে হবে! অত যদি, তাহলে হাসপাতালে আসবার দরকার ছিল কি? মেয়েটির ওপরেই মাধবীর রাগ হয়, কি বেয়াক্কেলে, একটু সরে বসতে পারে না! নিজের রোগটা না দিয়ে ছাড়বে না! মুখের রুমালটা পর্যন্ত সরিয়ে ফেলেছে! ছেলেটিরও কি কিছু ভয় নেই? একটু সরে বসলে কি আলাপ জমবে না?

তবুও দৃশ্যটার মধ্যে কোথায় যেন একটা মাদকতা আছে। মুখ ফিরিয়ে নেওয়া দায় হয়ে পড়ে। ছবির মত দেখতে লাগছে ওদের দুজনকে। মাধবী বাজী রেখে বলতে পারে, ওদের সম্বন্ধ তার আর অবনীর সম্বন্ধের মত। খুব ভালবাসাবাসি, মাখামাখি আর কি!

অবনী স্তব্ধ হয়ে মাধবীর দৃষ্টি অনুসরণ করে বসে থাকে। হয়তো নিজের ফুরিয়ে যাওয়ার কথা ভাবে। মুখ ফেরাতে গিয়ে অবনীর সঙ্গে চোখাচোখি হয় মাধবীর। এমন নিষ্প্রভ চোখ-মুখ এর আগে যেন কখনো মাধবী দেখেনি অবনীর—এই কয়েক মিনিটেই মানুষটা যেন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। কি ভীষণ রোগপাণ্ডুর!

মাধবী নিঃশব্দে হাসবার চেষ্টা করে। দেখাদেখি অবনীও হাসে, ম্লান, নির্জীব। ওদিকে কিন্তু হাসি উচ্ছকিত হয়, সূর্যাস্তের সব আলোটুকু এখন ওদের মুখে-চোখে।

অবনীই বোধ হয় বলে, বেশ আছে!

মাধবী না বোঝার মত প্রশ্ন করেঃ কি বেশ?

ঐ ওরা! চোখ তুলে অবনী দেখায়।

মাধবী ক্ষুন্ন হয়, মুখটা তার গম্ভীর হয়ে ওঠে সহসা। ওদের সম্বন্ধে অবনী কৌতূহল প্রকাশ করে' তাকে যেন অপমান করেছে। 'ওরা বেশ!' মানে কি? তার মানে আমরা বেশ নেই! রাগ হবারই কথা মাধবীর।

এতক্ষণের উপভোগ্য দৃশ্যটা তেতো হয়ে যায়। মাধবী কটাক্ষ করে বলে, বাড়াবাড়ি!

কি ভেবে অবনী হাসে। অস্তগামী সূর্য এপারে টিনের চালের নীচে নেমে যায়। ছায়াদীর্ঘ সঙ্কীর্ণ পথটা ভৌতিক গাম্ভীর্যে থম থম করে। একে দুয়ে এদিক-ওদিক টিনের শেডগুলো থেকে ভিজিটার্সরা বেরিয়ে এসে পথের মাঝখানে দাঁড়ায়—জড়-করা দীর্ঘনিঃশ্বাসে হাসপাতাল কম্পাউণ্ড সিসের মত ভারি হয়। ফেরবার সময় অনেকক্ষণ উতরে যায়।

মাধবী উঠে দাঁড়ায়। মুখ দিয়ে কোন্ কথা বেরোয় না তার, বিদায় সম্ভাষণ, কি আবার আসার প্রতিশ্রুতি। অবনীও চুপ, বলবার তার কিছু নেই। আবার আসতে বলার অনুরোধ করবে? তাও কখনো হয়!

রাস্তায় নেমে মাধবী দেখে, ওরা দুটিতে এখনো মুখোমুখি হয়ে বসে আছে, মেয়েটি মুখে রুমাল চেপে মাথা নাড়ছে। ছেলেটি সকৌতুকে কি যেন বলছে। এত বিস্তৃত হাসপাতাল কম্পাউণ্ডের কোথাও আলো না থাকলেও ওখানে যেন এখনো প্রচুর আলো আছে। কি ভেবে মাধবী ঘুরে অবনীর কেবিনটার দিকে চেয়ে দেখে—না, কাউকে আর দেখা যাচ্ছে না ও চত্বরে! অবনী বোধ হয় এতক্ষণে শুয়ে পড়েছে।

হঠাৎ যেন মাধবীর খেয়াল হয়, অবনীর দৃষ্টিতে সে আজ কোন মাদকতাই জাগাতে পারেনি। কেন? তুলনায় ঐ মেয়েটি কত না মদিরাক্ষী, মদালসা!

হয়তো তারই দোষ। দেখা করতে এসে মাধবী ঐ ছেলেটির মত আগ্রহশীলা হতে পারেনি। সাক্ষাৎকারে আগাগোড়া দুজনের মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল, তা মাধবীর জন্যেই। কিন্তু অবনীও তো আগ্রহ প্রকাশ করতে পারতো!—ও-ই বা অমন মিইয়ে রইল কেন?

যে বেদনাটা **এতক্ষণ** মাধবী চেপে রেখেছিল, তা আর ধরে রাখতে পারে না। বুকের ভিতরটা কন কন করে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। যাবে নাকি ফিরে? অবনীকে বিছানা থেকে তুলে জিগ্যেস করবে—কেন আমরা আগের মত, ওদের মত সহজ হতে পারি না? আমাদের সাক্ষাৎকার এত বিষন্ন হলো কেন? কার দোষে?

মাসে একবারের জায়গায় চারবার মাধবী হাসপাতালে অবনীকে দেখতে আসে নিয়মিত। অবনী যেন ভুল না বোঝে, রোগের ভয়ে মাধবী তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। মিথ্যে কথা নয়, মাধবী তার রোগ-মুক্তির জন্যে দিন গুনছে। দিন ফুরোলেও দিনের আগমন প্রতীক্ষা সে করবে। অবনী ভাল হবে, আবার তাদের মধ্যে সহজভাবে ফিরে আসবে। সেদিনের যতই দেরি থাক, মাধবী ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবে অবিচলিত দীপ-শিখার মত অরুণ আলোর আশায় রাত্রির অন্ধকারে চেয়ে থাকবে নির্ণিমেষ। ক্লান্তি যদি আসে? না, তা আসবে কেন!

প্রায় প্রতিবারেই দেখে কেমন গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। তবু কেন একবার না দেখলে কেমন যেন অজানা আশঙ্কা হয় মাধবীর—মেয়েটির হলো কি, ছেলেটিই বা এল না কেন আজ!

অবশ্য অবনীকে মাধবী কোনদিন জিগ্যেস করে না ওদের খবর—নিজের মনেই খবরাখবর নেয়, নানা ভাঙা-গড়া, ভালমন্দ কত কি! এক-একদিন এমন হয়, মাধবী আশ্চর্য হয়ে ভাবে, ওদের দুটিকে একত্রে দেখবে বলেই যেন হাসপাতালে এসেছে অবনীকে দেখবার নাম করে। শুধু নিজের কাছে লজ্জা নয়, অবনীর সঙ্গে ভাল করে' কথা বলতে তার সঙ্কোচ বোধ হয়।

অবনী হয়তো কিছু মনে করে না, কিন্তু মাধবীর মনে করবার অন্ত থাকে না। ছি-ছি, কি লজ্জার! একি চিত্তবিক্ষেপ!

নিজেকে ধমক দিয়ে উল্টো কথাটাও মাধবী যে কোনদিন না ভাবে, তা নয়। অবনীর অন্যমনস্ক দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখে ফিমেল ওয়ার্ডের মেয়েটি ওখানে একলা না, সঙ্গে কেউ আছে। এপারে-ওপারে একটা দৃষ্টির লুকোচুরি যেন সে বোধ করতে পারে। অবনী এখানে আসা থেকে অনেক কিছুই তার কাছে গোপন করে যাচ্ছে তাহলে। হাসপাতালে মজায় আছে! আরো আশ্চর্য হয় মাধবী, এখানে আর আর রোগীর মত মেয়েটির জন্যে তার কোন সমবেদনা নেই। রুগ্ন ও মোটেই নয়, রোগের বিলাসিতা করবার জন্যে যেন এখানে এসেছে। ভাল খাবে-দাবে, আরাম করে এখানে থাকবে, আর ঐ ছেলেটি এসে দেখা করে যাবে। এখানের খরচপত্তর নিশ্চয়ই ঐ ছেলেটি যোগাচ্ছে! ওছাড়া আর তো কাউকে কোনদিন আসতে দেখা গেল না! রোগ না রোগের ভাণ! বলা যায় না, ওসব মেয়ের পক্ষে কোনদিন সামনে সবুজ ঘাসের নিষেধটুকু পেরিয়ে এখানে আসা বিচিত্র নয়। এতদিনে অবনীদের সঙ্গে কি আর না আলাপ হয়েছে ওর!

মাঝে একবার অবনী উঠে ঘরের ভিতর গেল। বোধ হয়, মাধবীরই কোন প্রশ্নের জবাব হিসেবে কোন চিঠিপত্রের নজির বার করতে। একটু আগে দুজনের মধ্যে চিঠি লেখালিখির ব্যাপার নিয়ে মান-অভিমানের কি একটা যেন হয়ে গেছে।

বাইরে চেয়ারে বসে কোলের ওপর রাখা ভ্যানিটি ব্যাগটায় সোহাগভরে হাত বুলোতে বুলোতে মাধবী মুহূর্ত কয়েক পূর্বে উপলব্ধ খুশীর আমেজটা ভোগ করছিল। এই মাত্র মান অভিমানের যে ব্যাপারটা হয়ে গেল তা যেন বিস্মৃত একটা সুখ স্মৃতির পুনরুল্লেখ—নতুন করে মাধবী আবার অবনীকে ফিরে পেলে। ব্যাগটা নাড়া-চাড়া করতে করতে একটু যেন আনমনা হয়ে পড়েছিল মাধবী—স্থানকালের কোন খেয়ালই তার ছিল না।

চোখের সামনে ফিমেল ওয়ার্ডের শেডটা পড়ন্ত রোদে খাঁ খাঁ করছে। ওদিকে এখনো কোন ভিজিটার আসে নি। জাহাজের কেবিনের মত খুপরি জানালায় নিষ্ক্রিয় স্তব্ধতা বিরাজ করছে। ঠায় চেয়ে থাকলে মনে হবে, অকূল সমুদ্রে বহু পুরান একটা গাধাবোট ভেসে চলেছে, গতিহীন, নিস্পন্দ! হঠাৎ নাড়াচাড়া হলো দৃশ্যটার। মাধবী সক্রিয় হয়ে উঠলো। ঐ তো মেয়েটি বেরিয়ে এসেছে, শেডের নীচে একটা খুঁটি ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে! এক মাথা রুক্ষ এলো চুল হাওয়ায় উড়ছে—ডুরে শাড়ির আঁচলা খসে গেছে। চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে ওকি ভাবছে? ছেলেটির কথা?

মনে মনে মাধবী চাইলে, যেন আজ ওর সেই ভিজিটারটি না-আসে। দাঁড়িয়ে থাকা সার হয়!

চোখ ফালা করে খুঁটিয়ে দেখে মাধবী, অনাড়ম্বর সাজে কি অপরূপ দেখাচ্ছে রুগ্না মেয়েটিকে—কে বলবে ওর কোন রোগ আছে। গায়ের রঙ-এর সঙ্গে ডুরে শাড়িটি কি মানিয়েছে!

কারো জন্যে প্রতীক্ষায় নারীর ঐরূপই যেন কল্পনীয়, কাম্য, নির্বাত দীপ শিখা। মাধবী স্বীকার না করে পারে না, সত্যিই মেয়েটি সুন্দরী। কুসুমে কীটের মত অদৃশ্য রোগের ছোঁয়ায় মাধুর্য বিকিরিত। মনে মনে মাধবী কেন জানি না, হায় হায় করে ওঠে।

বোধহয় মাধবী আজ একটু আগেই এসেছে তাই ছেলেটিকে এখনো দেখতে পাচ্ছে না। মেয়েটিই কেবল দাঁড়িয়ে আছে, বেলা-পড়া রোদের ছায়া দেখছে। অনুচিত, তবু মাধবীর মনে হয়, যত সুন্দরই হোক, এমন সাংঘাতিক রোগে ছেলেটির এভাবে মেলামেশা করা উচিত নয়! একটা মেয়েকে নিয়ে এতটা মাখামাখি শোভা পায় না। রোজই বা আসবার দরকার কি? কম দূর, কম পথ না কি কোলকাতা থেকে কাঁচড়াপাড়া টি বি হাসপাতাল? হ্যাঁ, রোজই তো আসে, তা না হলে যেদিনই মাধবী আসে সেদিনই বা দেখা হবে কেন! রোজ ছাড়া আর কি! অজান্তে কেমন হিংসেও হয় মাধবীর মেয়েটির ওপর। মেয়েটি যেন তাকে কিসের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হারিয়ে দিয়েছে। মাধবী হেরে গেছে।

চোখ ফেরাতেই মাধবী যেন কেমন হয়ে যায়। অপ্রস্তুতের মত চেয়ে দেখে, অবনী কখন এসে তারই পাশে দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে সাগ্রহ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে, শুধু দেখা নয় আরও কিছু যেন সে দৃষ্টিতে! তবে কি—চোখ নামিয়ে অবনী বললে, ফিমেল্ল ওয়ার্ডে আজ কোন ভিজিটার আসেনি!

মাধবী ভ্যানিটি ব্যাগটা কোলের ওপর চেপে ধরে কঠিন স্বরে বললে, তাই তো দেখছি। বাবুটি আসেনি!

সূর্যাস্ত ছায়ায় শেডের তলাটা আবছা হয়ে গেল। চিত্রার্পিত মেয়েটির প্রতিকৃতি কে যেন রবার দিয়ে ঘসে দিলে। অবনী কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। মাধবী প্রশ্ন করলে, লোকটা রোজ আসে, নয়?

অবনী নিরুৎসুক কণ্ঠে বললে, কি জানি!

কেন, দেখতে পাও না? চোখের ওপর তো, তোমার দেখার অসুবিধে কি! মাধবীর স্বরে শ্লেষ অনেকখানি।

ঐ করি আর কি, কার কে এল দেখে বেড়াই! অবনী এড়িয়ে যাবার মত উত্তর দেয়।

মাধবী তীক্ষ্ম শ্লেষ করলে, দেখতে তো দোষ নেই!

তার মানে! অবনী যেন আর্তনাদ করে উঠলো, অগ্নিদৃষ্টিতে মাধবীর মুখের ওপর চাইলে।

ওকি! মাধবীর চোখের কোণে কিসের হাসি যেন সন্দেহজনক?

মাধবী হেসে উড়িয়ে দেবার মত বললে, না, তাই জিগ্যেস করছি! সাজগোজের যে ঘটা! মরতে এসে তবু—

মাধবী সবটুকু বক্তব্য শেষ করতে পারে না। অবনীর মুখটা কালো হয়ে গেছে। ঠিক এতটা বাড়াবাড়ি করবার উদ্দেশ্য ছিল না মাধবীর। সে শুধু স্পষ্ট করে জানতে চায়, অবনীর কোন দুর্বলতা আছে নাকি ঐ মেয়েটির সম্বন্ধে। আজকাল মাধবীর এই ক্ষণিক সঙ্গর চেয়ে ঐ মেয়েটির সঙ্গে সারাক্ষণ দৃষ্টি বিনিময় অধিক প্রেয় কিনা অবনীর?

পাক্ আঘাত, তবু সন্দেহের নিরসন হবে। ছাড়বে না মাধবী আজ অবনীকে। চালাকি তো নয়! কেমন যেন ক্রুর সর্পিণীর মত ছোবল দিতে ইচ্ছে করে মাধবীর।

অবনী একেবারে চুপ করে যায়। মাধবী বৃথাই ফণা বিস্তার করে। পাথরে বিষ ঢেলে লাভ কি? অবনী তার সঙ্গে প্রতারণা করছে। কোন প্রয়োজন নেই আর তার মাধবীকে, যা খুশী, যেমন খুশী সে বলুক, ভাবুক—কিছু আসে-যাবে না তার! অবনী যদি অতঃপর ও মেয়েটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ও সত্যি মাধবীর অভিমান করবার কি আছে?

নিঃশব্দে বসে থেকে থেকে হাসপাতালের রোগী দেখার সময় বয়ে গেল, তবু মাধবী অন্য দিনের চেয়ে আগে উঠে যেতে পারলে না। সময় উত্তীর্ণ করে' দিয়ে সবার শেষে গেটে এসে দাঁড়াল।

যে রিক্সাতে করে ফিরে যাবার কথা সে গাড়িটাকে মাধবী ধারে-কাছে দেখতে পেলে না। একটি মাত্র রিক্সা তখন গেটের কাছে অপেক্ষা করছে। ভাড়া তার অন্যজন।

এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলে মাধবী বেঘোরে পড়ার মত। আচ্ছা আক্কেল তো রিক্সাওয়ালাটার, তাকে ফেলে রেখে অন্য ভাড়া ধরেছে! এখন উপায়, ফেরবার রিক্সা পাবে কোথায়? যেটা আছে, তাকে বললে রাজী হবে কেন, আর হলেও সওয়ারী ছেড়ে যেতে বলা অন্যায়! এখানে আসাটা যত সহজ ফেরাটা তত সহজ নয়! কি কুক্ষণে মাধবী আসবার ভাড়াটা না ফিরেই চুকিয়ে দিয়েছিল!

নিরুপায়। হে'টেই ফিরে যেতে হবে স্টেশন পর্যন্ত। রাত হবে। তা হোক, দেরী করে লাভ নেই।

অপেক্ষমান রিক্সাওয়ালাটা বোধহয় অবস্থাটা বুঝেছিল। পিছন থেকে বললে, আপনি একটু অপেক্ষা করুন না, দেখুন না ইনি যদি রাজী হোন!

আশার কথা হলেও মন দিয়ে শোনবার মত নয়। রিক্সাওয়ালা জাতটার ওপর মাধবী বিরূপ হয়ে উঠেছে। তার ওপর এ আবার বলে কি, ইনি যদি রাজী হন! ইনিটা আবার কে? বেটাদের বিবেচনা শক্তি একেবারেই নেই—কোথাকার কে তার সঙ্গে বলে কিনা যেতে! তাছাড়া বললেই অমনি মাধবী রাজী হবে কেন? কার রিক্সা কে জানে!

মাধবী গুটি গুটি সামনের দিকে এগিয়ে যায়। উপায় কি হে'টেই যেতে হবে। আবছা অন্ধকারে ঝোপঝাড় হাতড়ে স্টেশনে পে'ছিবে। আশ্চর্য অন্ধকার! অদ্ভুত অন্ধকার! গা-গুরু-গুরু-করা অন্ধকার নেমে এসেছে চারপাশে—এপারে হাসপাতাল ওপারে উদ্বাস্তু শিবির—নিঃশেষিত প্রাণরস রক্তহীন ফ্যাকাশে হয়ে দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করেছে—সরল মসৃণ রাস্তায় শঙ্কিত পা দুটো ঠিক মত পড়ে না। হাত ঘড়িতে সময় স্তব্ধ হয়ে আছে যেন। অবনীর ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝতে পারলেও নিজের ব্যাপারটা যেন মাধবী বুঝতে পারে নি, তাই সোজা রাস্তায় চলতে হোঁচট খাচ্ছে।

পিছন থেকে বার কতক হর্ন বাজিয়ে রিক্সাটা একেবারে পায়ের কাছে এসে থেমে গেল। মাধবী পাশ দিতে সরে দাঁড়াল।

বলবার জন্যেই যেন এতক্ষণ মনে মনে মহলা চলেছিল, রিক্সারূঢ় ব্যক্তিটি বললে, স্টেশনে যাবেন তো? আসুন না।

প্রস্তাবটা মনুষ্যোচিত হলেও মাধবী নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করতে পারে না, তার ওপর যে প্রস্তাব করেছে তার সম্বন্ধে ইতিপূর্বে মাধবীর যথেষ্ট কৌতূহল জেগেছে—হাসপাতালের সেই মেয়েটির তরুণ ভিজিটর!

নিস্তব্ধ পরিবেশে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মাধবী। নভপটে আলো অনেকখানি নিভে গেছে।

রিক্সারূঢ় ব্যক্তিটি আত্মীয়ের মত আহ্বান করলে, আসুন না, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ছটা দশের গাড়ি ধরতে পারব'খন।

মুখ ফুটে মাধবী প্রত্যাখ্যান করতে পারলে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ নজরে পড়ল, ডান দিকের ঝিলটার পানা-আঁটা ঘোমটা এখানে খসে গেছে—বাতাসে কালো জলে ঢেউ উঠেছে। যেন এ জায়গা দিয়ে মাধবী ইতিপূর্বে হাসপাতালে যায় নি—চাঁদ-উঠবো-উঠবো সময়ের বালিগঞ্জের লেকের পাড়।......

এরপর হাসপাতালে অবনীকে দেখতে আসতে-যেতে মাধবীর অসুবিধা হয় নি আর। শেয়ালদা স্টেশন থেকে দুজনে এক গাড়িতে উঠেছে, একই রিক্সায় হাসপাতালের গেট পর্যন্ত এসেছে—তার পর নেহাৎ অচেনা অপরিচিতের মত ছাড়াছাড়ি হয়ে যে যার রোগী দেখতে গেছে। প্রয়োজনের খাতিরে ব্যবস্থাটা ওরা মন্দ করে নি। এখন অবনী আর ঐ মেয়েটি অন্য কিছু সন্দেহ না করলেই হলো।

মাধবীর মুখে অবশ্য আর কোন বিরুদ্ধ মন্তব্য শোনা যায় না হাসপাতালের ঐ মেয়েটির সম্বন্ধে, যেন মাধবী ঠিক করেছে, ওকে নিয়ে আর কোন কৌতূহল প্রকাশ করবে না—ওর কথা জিগ্যেস করা মানে ওকে বড় করা। মরুক ও!

এদিকে হাসপাতালের সঙ্গীটির সঙ্গে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু আলাপ মাধবী করে না। অদ্ভুত অবিচলিত, নিরাসক্ত তার ব্যবহার। পাশাপাশি বসে গায়ে গা লাগলে একটু যা সঙ্কুচিত হয়, সরে বসবার চেষ্টা করে। অদ্ভুত এক খেয়াল বশে যেন এই ব্যবস্থাটাকে সে মেনে নিয়েছে। অভিপ্রেত কি অনভিপ্রেত বুঝতে পারে না সে, কিংবা বোঝবার চেষ্টা করে না।

সঙ্গী ছেলেটি কিন্তু মাঝে মাঝে চাঞ্চল্য প্রকাশ করে—কথাবার্তা, ব্যবহারে প্রায়ই নিজে থেকে মাধবীর ট্রেনের টিকিট কেটে ফেলে, রিক্সাভাড়াটা রোজই দিয়ে দেয়, আপত্তি করলে বলে, যে হোক একজন দিলেই হলো।

এড়াবার চেষ্টাও মাধবী করে না। ক'দিনে কেমন একটা আত্মীয়তার ভাব আয়ত্ত করেছে সঙ্গী ছেলেটি। একই পথের যাত্রী হলেও একই উদ্দেশ্য তার নয় বোধহয়।

ভয় অবশ্য মাধবী করে না, অহেতুক ভয় করবার বয়েস যেন তার পেরিয়ে গেছে কবে। সংকোচটা এখনো আছে। মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা লুকোচুরি সে টের পায়। কেন মাধবী একলা-একলা আর আসে না? নতুন ছেলেটির সম্বন্ধে সত্যিই যদি তার কোন চিত্তবিক্ষেপ না ঘটে থাকে তা হলে এই একটা অজুহাত করে, নিয়মিত সঙ্গদান করে কেন? এক গাড়িতে পাশাপাশি বসে যাবার তার দরকার কি! একি মাধবীর অবনীকে ভুলে যাবার আয়োজন নয়? মনের মধ্যে যদি কোন সংশয় না থাকবে হাসপাতালে আসবার এই অভিনব ব্যবস্থাটা এখনো অবনীকে জানায় নি কেন সে? হয়তো লাভ নেই, হয়তো অনাবশ্যক, অবান্তর। সত্যিই মাধবী তো কিছু মাথা ঘামায় নি এ নিয়ে! একসঙ্গে এলে-গেলেই বা, শেয়ালদা স্টেশন আর হাসপতালের গেট তার পরে তো আর দেখা সাক্ষাতের কোন অজুহাতই নেই! তাছাড়া নিজের মনে মাধবী ঠিকই আছে, অবনী অন্ত প্রাণ সে! বাড়ির সকলের নিষেধ সত্ত্বেও সে নিয়মিত অবনীকে দেখে যায়, আশ্বাস দেয়! না, না, অবনীকে ছাড়া সে নিজেকে কল্পনা করতে পারে না।

নতুন সঙ্গী ছেলেটি একদিন জিগ্যেস করলে, এই যে আমরা দু'জন মুখবুজে ওষুধ খাওয়ার মত একসঙ্গে এক গাড়িতে হাসপাতালে আসি এতে আপনার কিছু মনে হয় না? মানে কেউ কাউকে চিনি না আর কি!

গাড়িতে সেদিন কেউ ছিল না। প্রশ্নটায় মাধবী হঠাৎ চমকে ওঠে। অভাবিত না

হলেও আকস্মিক তো। ঠিক ভয় না পেলেও কি মনে করে মাধবী দেখে নেয় তাদের দুজনের মধ্যে বসবার জায়গাটার দূরত্বটা কতখানি। না, সে রকম কিছু নয়, সঙ্গীটির মনে কিছু নেই এমনিই প্রশ্ন করেছে বোধ হয়।

মাধবী সহজভাবে বলে, কি আবার মনে হবে!—দুজনের প্রয়োজনেই তো আমরা এভাবে যাতায়াত করি।

সঙ্গীটি হাসে, আপন প্রশ্নের গুরুত্বটা হাসি দিয়ে যেন ঢেকে দিতে চায়।

মাধবী একটু যেন গম্ভীর হয়ঃ কেন দোষের কিছু আছে না কি?

সঙ্গীটি বলে, না না, দোষ থাকবে কেন —এমনি জিগ্যেস করছি।

মাধবী জানালার বাইরে মুখ নিয়ে চুপ করে থাকে। সঙ্গীটি আপন মনে বলে, আমার কিন্তু ভারি আশ্চর্য লাগে একসঙ্গে এতবার আমরা এলুম-গেলুম, কেউ কারো পরিচয়টা পর্যন্ত জানলুম না আজো। প্রয়োজনটা শুধু আমাদের কাছে বড় হয়ে আছে! ভারি অদ্ভুত ব্যাপার নয়?

মাধবী মুখ ফিরিয়ে জবাব দেয়নি। ওর অদ্ভুত লাগলে তার বলবার কি আছে। অনেকক্ষণ পরে হাসপাতাল গেটের সামনে রিক্সা থেকে নেমে মাধবী বললে, যাতে আর আশ্চর্য না লাগে, অদ্ভুত মনে না হয়, তার ব্যবস্থা কিন্তু এরপর আমাদের করা উচিত। প্রয়োজনটা তো আর আপনার কাছে বড় নয়!

সঙ্গীটি কিছু বলবার আগেই মাধবী এগিয়ে 'মেল-ওয়ার্ডে' ঢুকে পড়ল। একটু যেন ছুটলোও সে। সঙ্গীটি বুঝলেও না-বোঝার হতচেতনায় পা তুলতে পারে না। সত্যি, দোষের সে কিছু বলেছে না কি?

ফেরবার পথে অবশ্য মনটাকে সহজ করে নেওয়া যেতো, সুযোগ মত ক্ষমা চেয়ে নিলে চলতো, বক্তব্যটাকে খোলাখুলিভাবে বুঝিয়ে দিত, কিন্তু কই একসঙ্গে বাড়ি ফেরবার জন্যে মাধবী তো গেটে এসে দাঁড়াল না! না, কথাটা মাধবী গুরুতরভাবেই নিয়েছে —একসঙ্গে যাওয়া-আসার দোষটা গ্রহণ করেছে।

বাইরে এসে সঙ্গীটি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলে। হাসপাতালের টিনের চালের রোদ ঝেটিয়ে গেটের সামনে জড় হলো—রাস্তার ওপারে উলুবোন জ্বলে উঠল। একে একে সব রিক্সাগুলো ফিরে গেল। একটা অস্বস্তি-কর নীরবতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সঙ্গীটি অপরাধীর মত বৃথাই অপেক্ষা করলে। আরক্ত পশ্চিম আকাশ পাণ্ডুর হয়ে এল, উলুবন নিভে গেল। কে জানে নিছক প্রয়োজন ছাড়া আর কোন সম্বন্ধে সঙ্গীটির মেয়েটির সঙ্গলাভের প্রত্যাশা অন্যায় কি না! কত সহজ জিনিসটা কত সামান্য কথায় দুরূহ, দুর্বোধ্য হয়ে গেল! কে জানে আর কোনদিন মেয়েটিকে এর সহজ মানে বোঝান যাবে কি না, আর গেলেও সে বুঝতে চাইবে কি না! ভুলটা কোথায় বুঝেও সঙ্গীটি বুঝতে চায় না—এতে দোষের কি আছে? এতে ভয়ের কি আছে? এতে লজ্জারই বা কি আছে? আশ্চর্য!

সপ্তাহ দুয়েক পরে আবার একদিন উভয়ের মিলনের সুযোগ হয়। মেল-ওয়ার্ড থেকে ত্রস্ত পায়ে মাধবী বেরিয়ে এসে সবুজ ঘাসের লন পেরিয়ে ফিমেল ওয়ার্ডের চালার মধ্যে উঠে আসে। মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে সামনে এগিয়ে যায় হন হন করে।

পরিচিত সঙ্গী ছেলেটির সামনে এসে দাঁড়ায়। হঠাৎ কি যেন করতে গিয়ে কি যেন করে ফেলেছে এমনিভাবে থমকে যায়। ওরা পাশাপাশি বসে তখন আলাপে অ্যামনস্ক। প্রথমে মাধবীকে এ অবস্থায় দেখল রুগ্ন মেয়েটি। দুজনে দুজনকে দেখে যেন বড় বিস্মিত, চকিত হয়েছে। হঠাৎ এভাবে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে কে এই মেয়েটি? চোখে ভয়, বিস্ময় আকুতি? সঙ্গীটি মুখ ফেরালে, যেন মাধবীকে সে চিনতে পারছে না—এর আগে কখনো দেখেছে বলে মনে করতে পারছে না! এক ক্রূর জিজ্ঞাসায় তার নাসাগ্র স্ফুরিত, চোখের কোণ বক্র। অভিমানে দুঃখে মাধবীর বাক্‌রোধ হয়ে যায়।

রোগিণী জিগ্যেস করলে, কিছু বলবেন! তখনো মাধবী বিহ্বলতায় উত্তেজনায় নীরব। এদের কি বলবে সে? সত্যি, কেন সে এখানে এদের মাঝখানে এমন রসভঙ্গের মত ছুটে এল? এরা তো তার কেউ নয়।

রোগিণী আবার জিগ্যেস করলে, কাকে চাই আপনার?

মাধবী নিজেকে সামলে নিলে। মেয়েটিকে গ্রাহ্য না করে বললে, আপনি একটু এদিকে আসবেন দয়া করে।

সঙ্গী ছেলেটি কিন্তু কিন্তু করলে, আমাকে?

মাধবী ভাঙা গলায় চীৎকারের মত বললে, হ্যাঁ, আপনি আসুন শীগ্‌গির।

সঙ্গী জিগ্যেস করলে, কি ব্যাপার! কি হলো?

মাধবী ভেঙে পড়লঃ আমার আত্মীয়টি কেমন করছেন—দয়া করে আর-এম-ও'কে যদি ডেকে দেন, আমি তাঁর কোয়ার্টার কোথায় জানি না। অবস্থা খুব খারাপ মনে হ'ল!

কৌতূহলী রোগিণী বললে, কার? ওঁদিকে তের নম্বর বেডের?

হ্যাঁ, বলে মাধবী এমনভাবে মেয়েটির মুখের ওপর চেয়ে রইল যা কোন সাহায্য-প্রার্থীর পক্ষে অমার্জনীয়। সন্দেহের কিছু মাধবী পেলে কি না কে জানে মেয়েটির নির্ভুল বেড নম্বরটা বলায়।

সঙ্গীটি নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরেই যেন উঠে দাঁড়াল, উপবিষ্টা সঙ্গিনীকে বললে, তুমি বস, আমি একবার দেখে আসি—যদি কিছু এ'র করতে পারি!

উপবিষ্টা রোগিণী বললে, হাঁ, হা তুমি যাও—দেখ আর-এম-ও কোয়ার্টারে আছেন না রাউণ্ডে বেরিয়েছেন!

সঙ্গী দায় সারার মত বললে, দেখি ভদ্রমহিলার যদি কোন উপকারে আসতে পারি।

এ বিষয়ে রোগিণীর আগ্রহ, উৎকণ্ঠাই যেন বেশী— উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, যাও যাও, আর দাঁড়িয়ে থেকো না—রাউণ্ডে বেরুলে ডাক্তারকে ধরতে পারবে না—সোজা চলে যাও, একেবারে এই শেডের শেষ সীমানায় বাঁ দিকের কোয়াটারটা তাঁর।

কে জানে, মেয়েটির আগ্রহ দেখে মাধবীর আর কোন সন্দেহ হয় কি না। নিজে রুগ্ন বলে বোধহয় আর একজন রোগীর প্রতি এতখানি দরদ দেখাচ্ছে।......

ফিরতি পথে দুজনে এক রিক্সাতে আবার ওঠে। অন্য দিনের চেয়ে আজ একটু দেরী হয়ে যায় ফিরতে। আলোছায়ায় অন্ধকার আসি-আসি করছে, ক্ষয়া চাঁদের মুখে আলো ফোটেনি—ঝিলের জল খাপে-ঢাকা-বাঁকা-তলোয়ার। আশপাশের বনবাদাড়ে অশরীরী একটা ভয় উঁকি-ঝুঁকি মারছে যেন।

সঙ্গী বললে, কি বিপদেই না আজ ফেলেছিলেন! আর একটু হলে—

মাধবী মুখ তুললে, সঙ্গীর মুখ স্পষ্ট দেখতে পেলে না, কিন্তু বুঝতে পারলে সে হাসছে নিজে নিজে নিঃশব্দে। কিন্তু কেন?

মাধবী জিগ্যেস করলে, কি?

এবার হাসিটা সশব্দে হলো, কি আবার! মীরা জানতে পারতো আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আচ্ছা মুশকিলে ফেলেছিলেন!

মাধবী বললে, ও। কিন্তু জানলে মুশকিলটা কি? জানাটা কি দোষের?

সঙ্গীর হাসি থামলো, বললে, না, তা নয়, তবে জানিয়ে লাভ কি! মনে কষ্ট করবে শুধু শুধু।

সহজ কণ্ঠে মাধবী বললে, কি করে আপনি জানলেন যে, সে কষ্ট করবে? আর কারো সঙ্গে পরিচয় হলেই বুঝি অমনি কষ্ট করতে হয় মেয়েদের!

সঙ্গী অপ্রস্তুতের মত বললে, না, তা নয় তবে—

শান্ত স্বরে মাধবীর জিগ্যেস করেঃ তবে কী? কষ্টটা এতই সহজ ভাবেন বুঝি!

হঠাৎ সঙ্গীটি অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে। পাশ থেকে বাহুবেষ্টনে মাধবীর দেহটা জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে গদ গদ কণ্ঠে বললে, সহজ না হোক, শক্ত কিছু নয়—সেদিনের কথা আমার মনে আছে।

মাধবী নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করলে না। আবার নিজেকে সম্পূর্ণে ছেড়ে দিতেও পারলে না, কাঠ হয়ে বিশুষ্ক কণ্ঠে বললে, ছাড়ুন, আঃ কি করছেন!

সঙ্গী বললে, যদি না ছাড়ি?

মাধবীর রুদ্ধকণ্ঠে প্রতিবাদ উচ্চারিত হলো না, ভয়ে ঘৃণায় আশঙ্কায় সে-পুরুষ বাহুবন্ধনের মধ্যে সঙ্কুচিত হলো, কাঁপতে লাগল থর থর করে।

সঙ্গীটি আর বেশীদূরে অগ্রসর হবার সাহস করলে না। সামনে চাঁদের মুখের হাসিটা চোর ধরা আলোর মত, নিঝুম গাছপালায় নিঃশব্দ ছি ছিকার। মাধবীর দু চোখ ভেঙে অশ্রু নেমেছে, পাথরের মূর্তির মত সে স্থির হয়ে বসে আছে। সঙ্গীটি অন্যমনস্ক হবার জন্যে সিগারেট ধরালে।......

কয়েক সপ্তা অবনীর শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ গেল। নতুন উপসর্গ দেখা দিল, কয়েকবার মুখ দিয়ে রক্তও উঠল। ব্যাধির দুরারোগ্যতা সম্বন্ধে মাধবীর আর কোন সংশয় রইল না। চুপি সাড়ে এসে জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে ক্ষয়িষ্ণু দেহটাকে দেখা ছাড়া তার আর কিছু করবার রইল না। সব আশাভরসা নিঃশেষ হবার প্রতীক্ষায় শুধু এই দিন গোনা, নির্দায় কর্তব্য করা। নিয়মিত আসা-যাওয়ায় কেমন অবসাদ বোধ করে মাধবী আজকাল। হঠাৎ এমন অনর্থক বোধহয় সব।

যেন ভুলে থাকতেই কয়েক দিন পরে মাধবী আবার হাসপাতালের সঙ্গীর সঙ্গে এক গাড়িতে চড়ে, একই রিক্সায় রুগী দেখতে আসে। যথাসম্ভব দুজনে চুপচাপ থাকে। হঠাৎ সঙ্গীটিকে বড় নিরুৎসুক, শান্ত মনে হয়। একসঙ্গে এসে যেন নেহাৎ একটা উপকার করছে দায়ে পড়ে সে। বড় নিরীহ শান্তশিষ্ট লোকটি! মাধবী একদিন উপযাচক হয়ে জিগ্যেস করলে, আপনার আত্মীয়াটির অবস্থা কেমন? ভাল তো!

সঙ্গী নিরুৎসুক কণ্ঠে জবাব দিলেঃ কেন, ভালই তো—ভালই আছেন।

এর পর আর কি জিগ্যেস করবে মাধবী ভেবে পায় না। এক যাত্রায় পৃথক ফল, ওর রোগী সেরে আসছে আর তার রোগী দিনে দিনে ক্ষয়ে যাচ্ছে। দুজনের রোগীই যদি খারাপ হতো, তাহ'লে যেন ভাল ছিল, বলবার কিছু থাকতো। তবু মাধবী জিগ্যেস করতে পারে না, হঠাৎ সঙ্গীর বিমর্ষ হবার কারণ কি, ভাল খবরে মন খারাপ করার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ মাধবী খুঁজে পায় না।

খানিকক্ষণ নীরব থাকার পর হঠাৎ অবান্তরভাবে সঙ্গীটি বললে, আর ভাল লাগে না—ভাল হলেই বা কি আর না হলেই বা কি!

মাধবী কোন প্রশ্ন করবার আগেই সঙ্গীটি আবার বললে, একঘেয়ে। মিছিমিছি—

মাধবীর বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। কি মিছিমিছি, কি একঘেয়ে, বুঝতে তার বাকি থাকে না। সঙ্গীটি বলে কি? মেয়েটির সঙ্গে তাহ'লে সম্পর্ক ওর তেমন ঘনিষ্ঠ নয়। অবনীর সম্বন্ধে মাধবী বোধ হয় অমন কথা বলতে পারবে না কখনো। ভালবাসার পাত্রকে কি এত সহজে ফেলে দেওয়া যায়? ছি, ছি।

সঙ্গী নিজের বক্তব্যটা আরো পরিষ্কার করতেই যেন আপন মনে বলে, ভেবে দেখলে মিছিমিছি ছাড়া আর কি! পূর্ব সম্বন্ধের জের টানা কেবল। ও অসুখ আর সেরেচে!

মাধবী কোন উত্তর করে না। সঙ্গীর মতঃনিজের সম্বন্ধটাও যে অমন নিরর্থক, সে ভেবে দেখে নি। অসুস্থ অবনী আজো তার কাছে সমান সত্যি।

সঙ্গী বললে, ইচ্ছে না করলেও তবু আসতে হবে—দেখে যেতে হবে, খবর নিতে হবে। কেন?

মাধবী চমকে ওঠে। এমন একটা হৃদয়হীনকে কি বলবে, সে ভেবে পায় না। এখনই তার সঙ্গ ত্যাগ করাই যেন উচিত। এমন একটা লোকের সঙ্গে এমন নিদারুণ সঙ্কটে কেউ মিতালী করে, পাশে বসে বন্ধুতা করে, ছি! সেদিনের সেই বাহুবেষ্টনের স্পর্শ হঠাৎ সমস্ত দেহটাকে অগ্নিশলাকার মত বিদ্ধ করে। মুখ-খোলা ফোসকার মত জ্বালা করে সারা অঙ্গ মাধবীর। তবে এই উদ্দেশ্য নিয়েই উনি তার দুঃখের সাথী হয়েছেন? না না, আর প্রশ্রয় দেবে না ওকে। সেদিনের পরে ওকে আবার বিশ্বাস করা উচিত হয় নি মাধবীর। ভাল-মন্দ কিছু ঘটলে নিজেকে রক্ষা করবার ক্ষমতা আছে কি তার? এই মৃত্যুর পটভূমিতে তাকে যদি লুট করে নেয় ও কোনদিন!

কয়েকদিন পরে ফিমেল ওয়ার্ডের পেসেণ্ট মীরার ঘরে ফেরবার খবর জানা গেল। এদিকে নিঝুমে মেল-ওয়ার্ডে বসে মাধবী বুঝতে পারে, দেখতে পায়, মীরার বাড়ি ফেরার আয়োজন—খুশীতে যেন ডগমগ করছে মেয়েটা—সাজগোজের ঘটাও বেড়েছে আজকাল। ঘর-বার করাটাও সেই সঙ্গে। যতক্ষণ মাধবী দেখতে পায়, সুস্থির হয়ে মীরা এক জায়গায় বসে থাকে না। হঠাৎ মুক্তি-পাওয়া বিহঙ্গের মত খাঁচার বাইরে এসে উদ্‌ভ্রান্তের মত ভুলে যাওয়া পক্ষবিধূনন আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করে। সঙ্গী ছেলেটি আজ কয়েকদিন হাসপাতালে আসছে না—তাতে কি, মীরার স্ফূর্তি অদমনীয়। ক'দিন পরে তো আসবার আর দরকারই করবে না—যখন খুশী, যেমন খুশী দুজনে মেলামেশা, হাসি-আমোদ করবে। ওদের বিয়ের কথাটা ভেবে মাধবী রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, কপালে স্বেদবিন্দু দেখা দেয়।

জানালার ভেতরে কেবিনে রোগশয্যায় অবনীর দেহটা অসাড়, নিষ্প্রভ, চোখ দুটো কেবল মাধবীর মুখের দিকে বাড়ান। মাধবী ওদিকে চেয়ে কি দেখছে?

মুখ ফিরিয়ে মাধবী জিগ্যেস্ করলে, আজ কেমন আছ?

অবনী ক্লান্তস্বরে জবাব দিলে, ভাল।

যেন অনেকদূর থেকে মাধবী জিগ্যেস করছে, আর জ্বর-টর হয় নি তো? প্লেট নেওয়া হয়েচে?

মধ্যবর্তী জানালার কাঠের গরাদে বোধ হয় অবনীর জবাবটা আটকে যায়, কিছুই শোনা যায় ন।

মাধবী আবার প্রশ্ন করে, জ্বর হয় না তো?

অবনীর উত্তরটা এবার বিরূপ শোনায়ঃ কি জানি!

মাধবী আর প্রশ্ন করতে সাহস করে না। হয়তো তারি দোষ—রোগীকে বিরক্ত করা তার উচিত হয় নি।

ঐ তো কেবিনের পার্টিসনের গায়ে জ্বরের চার্ট ঝোলান আছে। অত যদি আগ্রহ, ভেতরে এসে দেখতে পারে—কোন মানে হয় না অমন দূরে থেকে খবর নেওয়ার। যেন ভেতরের কথা ভেবেই ভেতরে আসতে সাহস পাচ্ছে না মাধবী। একটা অপরাধ বোধে অস্থির মনে মাধবী অপেক্ষা করে। কাঠের গরাদের ছায়ায় অবনীর নির্নিমেষ চোখ দুটো কেমন অমানুষিক দেখায়। মাধবী মুখ ফিরিয়ে নেয়। অবনীর চাহনিকে তার বড় ভয় করে।

ওদিকে ফিমেল ওয়ার্ডে এখনো পুরুষ ভিজিটারটি আসে নি। বাইরে দুখানা চেয়ারের একখানা খালি। মীরা ঘাড় গুঁজে কি বুনছে—বোধ হয় আসছে শীতের জন্যে প্রণয়ীর সোয়েটার। কি অভিনিবেশসহকারে বোনার কাজটা ও করছে। যেন আজ-কালের মধ্যে কাজটা শেষ করবে প্রতিজ্ঞা করেছে। অজান্তে মাধবীর বুক দিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে আসে, বিকেলের পড়ন্ত রোদের মত তাপহীন, জ্বলন্ত সে শ্বাস।

ভেতর থেকে অবনী অস্ফুটে বললে—এদিকে শুনবে, একটা কথা—

চকিত মাধবী তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে ধরা-গলায় বললে কিছু বলবে?—বল না!

অবনী বললে, তুমি আর এখানে এস না। মিছিমিছি কেন আর কষ্ট করবে।

মাধবী চুপ করে থাকে, একথার কি উত্তর দেবে সে ভেবে পায় না। অবনীকে আশ্বাস দেবার কথাটাও সে ভুলে যায়। যেন সত্যিই তার আর না আসাই উচিত এখানে এই রোগ-রাজ্যে। তার মনের কথাটাই অবনী বলে ফেলেছে।

হাঁপ নিয়ে অবনী বললে, তাছাড়া জায়গাটাও ভাল নয়—বলা যায় না, কখন কার কি হয়। রাগ করো না, তোমার ভালর জন্যেই বলচি। ভেবে দেখো, একটা মৃত্যুপথযাত্রীর জন্যে নিজের মন্দ ডেকে আনা উচিত নয়।

মাধবীর চোখ দুটো বাষ্পাকুল হয়ে ওঠে। অবনীকে থামাবার কোন ভাষা সে খুঁজে পায় না। সামনেটা ঘষা কাচের মত ধোঁয়াটে হয়ে যায়। অবনীর মুখটা অস্পষ্ট, তেড়াবেঁকা দেখায়। জানালার গরাদগুলো কালসিটে দাগের মত দাগড়া-দাগড়া হয়ে ফুলে ওঠে।

ভৌতিক কণ্ঠস্বরের মত অবনীর কথা শোনায়ঃ আমি তো মরেই গেচি। আমার জন্যে তুমি কেন মরতে যাবে? না না, এখানে তুমি আর এসো না, আমার অনুরোধ, আর এস না।

চুপ করে শুনে মাধবী নিঃশব্দে কাঁদে। সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারে না অবনীর নির্দেশ। এ শুধু অনুরোধ না, নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানঃ এতদিন পরে অবনীর মুখে ওকথা শোনবার জন্যে কি এত ধৈর্য ধরে আছে সে? ঘরে ঢোকবার হুকুম নেই, দেখতে আসবার সুযোগটাও অবনী কেড়ে নিচ্ছে? কিন্তু কেন? এ অবনীর অভিমান না, একান্ত আপনার জনের প্রতি অনুগ্রহ?

কিছুক্ষণ পরে অবনী জিগ্যেস করলে, আমার অনুরোধ রাখবে? কথা দাও।

চোখ মুছতে মুছতে মাধবী বললে, রাখবো,—তুমি ভেবো না। মিথ্যে ভয় করো না।

স্তিমিত চোখে খুশীর আভাষ দেখা গেল। অবনী বললে, না, আর আমার ভয় নেই।......

সোজা গেটে না এসে মাধবী হাসপাতালের অফিসে এল। অফিস তখন প্রায় বন্ধ। একজন প্রৌঢ় কেবল ওপরওয়ালার নজরে পড়বার বৃথা চেষ্টায় আসর জাগিয়ে বসে আছেন।

হঠাৎ এ সময় মাধবীকে দরজা ঠেলে ঢুকতে দেখে ভদ্রলোক চমকে উঠলেন। বোধ হয় ভাবলেন, হাসপাতালের নবনিযুক্তা কোন গণ্যমান্য লেডী ডাক্তার কি নার্স। ভদ্রলোক দেখিয়ে দেখিয়ে বাহ্যজ্ঞান শূন্যের অভিনয় করলেন।

মিনিট কয়েক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে মাধবী নীচু গলায় বললেন, দয়া করে একটা খবর দিতে পারবেন?

ভদ্রলোকের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল। মুখ তুলে আপাদমস্তক মাধবীকে দেখে নিয়ে ভদ্রলোক নির্ভয়ে বললেন, এখন তো অফিস বন্ধ হয়ে গেচে।

মাধবী অনুরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, তবু যদি দয়া করেন একবার।

ভদ্রলোক অফিসিয়ল কণ্ঠে বললেন, আজ হবে না, কাল আসবেন। এখন অফিস বন্ধ, কোথায় খবর খুঁজতে যাই এখন আপনার জন্যে।

মাধবী আর কোন কথা না বলে বেরিয়ে আসবার জন্যে পা বাড়ালে—বোধ হয় ইতস্তত করলে খানিকটা।

পিছন থেকে ভদ্রলোক বিরক্তির সঙ্গে বললেন, কই আসুন, কি খবর চান? কথা বললে আপনারা বোঝেন না।

মাধবী উত্তর না দিয়ে সোজা বেরিয়ে যায়। থাক্, কি হবে খবর নিয়ে। আর কার খবর সে নেবে? গেটের কাছে এসে মাধবী অবাক হয়ে গেল, হাসপাতাল অফিসে কি ভেবে সে মীরার খবর নিতে গিয়েছিল? মীরার বাড়ি ফেরা নিয়ে তার অত মাথা ব্যথা কেন? মীরার পুরো নাম-ধামটাও সে জানে না। কোন মানে হয় না, এ অহেতুক কৌতূহলের। আর কি খবর সে জানতে চায় এখন মীরার সম্বন্ধে—মীরা কে? কোথায় বাড়ি? তার গার্জেন কে? ঠিক কবে ফিরে যাচ্ছে? এতে তার লাভ কি? ছি, ছি, বড় অশোভনীয় কৌতূহল তার। মীরা রোগমুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরছে ব'লে কি মাধবীর হিংসে হচ্ছে? মীরার সুখ সে সহ্য করতে পারছে না? নিজের কাছে মীরা বড় লজ্জিত হয়ে পড়ে।

হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠস্বরে মাধবী চেয়ে দেখে, তার সম্বিত ফিরে আসে। হাসপাতালের সঙ্গী অভ্যর্থনা করে, আসুন না একসঙ্গে ফেরা যাক। ছ'টা দশের ট্রেন এখনো ধরতে পারা যাবে।

কেন জানি না, মাধবী না করতে পারে না, ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এসে একান্ত বাধ্যের মত সঙ্গীর সাহায্যে রিক্সায় উঠে বসে।

যেন এতক্ষণ সংগীর জন্যেই সে হাসপাতালের এখানে-ওখানে অপেক্ষা করছিল।

মাঝ-রাস্তায় এসে মাধবী জড়িত কণ্ঠে জিগ্যেস করলে, আপনার আত্মীয়া কবে ছাড়া পাচ্ছেন?

অন্যমনস্কের মত সংগী জবাব দিলে, আসচে রোব্‌বার। সার্টিফিকেটের জন্যে দেরী হচ্ছে।

আর কোন কথা হয় না খানিকটা পথ দুজনের মধ্যে। ধড়ফড় করে রিক্সাটা এগিয়ে চলে। শীতের শুরুর কুয়াশার আস্তরণ গাছপালার আগায় বেধে গেছে, যেন উত্তাপে আকাশের খানিকটা উপছে উঠে মাটিতে নেমে এসেছে।

গায়ে গা লাগার স্পর্শটা ভুলতে যেন মাধবী অবান্তর প্রশ্ন করে, উনি আপনার কি রকম আত্মীয়া হন?

সংগীর কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না, বোধ হয় কথাটা তার কানেই যায় নি। আশপাশের বন থেকে ঝিঁঝিঁর ডাকটা বিকট শোনাচ্ছে, আকাশের গায় তারা-গুলো জড়াজড়ি করে আছে।

মাধবী আবার প্রশ্ন করলে সাগ্রহেঃ আপনার খুব ঘনিষ্ঠ বুঝি! কদ্দিন এখানে ছিলেন?

সংগী আপন স্পর্শটা আরো ঘনীভূত করে মাধবীকে নিস্পিষ্ট করে বললে, হ্যাঁ, তোমার মতই ঘনিষ্ঠ।

আশ্চর্য! না মাধবী করলে কোন প্রতিবাদ, না নিজেকে মুক্ত করবার কোন চেষ্টা। একান্ত অনুগতার মত নিজেকে সংগীর উদগ্র আকর্ষণের মধ্যে ছেড়ে দিলে। কোন লজ্জা, কোন আশংকা, কোন ভয় মাধবীর আর রইল না। মজ্জায় মজ্জায় সংগী-দেহের বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গিয়ে মাধবীর সমস্ত অনুভূতি ভোঁতা করে দিলে। চোখ বুজিয়ে সংগীর বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে কি যেন এক ভুলে-যাওয়া আঘ্রাণে মাধবী বিভোর হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে এখন পুরুষ-দেহের এই আঘ্রাত গন্ধটাই বোধ হয় সবচেয়ে সত্যি মাধবীর জন্যে।

পরের রবিবার দুজনে একসংগে এক-গাড়ি থেকে কাঁচড়াপাড়ায় নামল। আজ এখান থেকেই ছাড়াছাড়ি হবার কথা। এবার যে যার রিক্‌সা করতে হবে। এক রিক্‌সায় যাওয়া সম্ভব হলেও এক রিক্‌সায় ফেরা আর চলবে না—মীরার আজ ঘরে ফেরবার কথা। সংগী যে রিক্‌সায় যাবে, সে রিক্‌সায় মীরাকে সংগে নিয়ে ফিরবে, কিন্তু মাধবীর রিক্‌সা আজ থেকে একলা মাধবীকে নিয়েই ফিরবে।

মনে হলো, দুজনের মনেই এ সমস্যার কথাটা জেগেছে। গাড়ি থেকে নামা থেকেই এর একটা সমাধান চিন্তা উভয়ের মনকে ভারাক্রান্ত করেছে। একসংগে গিয়ে তো আর একসংগে ফেরা যাবে না। তবুও একটা অনুচ্চারিত জিজ্ঞাসা উভয়কে অন্যমনস্ক করে দিয়েছে।

মাধবী গুটি গুটি এগিয়ে রিক্‌সা-স্ট্যাণ্ডের দিকে যায়। সংগীটি দাঁড়িয়ে ইতস্তত করে। আর মাধবীকে একসংগে ডাকবার তার মনের জোর বোধ হয় নেই। একটা অপ্রস্তুত মনোভাব নিয়ে সংগীটি নির্বোধ কৌতূহলে মাধবীর গতিপথ লক্ষ্য করে। যেন এই নতুন কাঁচড়াপাড়া স্টেশনে এসেছে সে।

মাধবী ওঠবার আগেই সংগীটি হঠাৎ ছুটে এসে রিক্‌সায় উঠে বসল। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, উঠে আসুন।

মাধবী কিন্তু কিন্তু করলে। সংগী ডাক দিলে, দাঁড়িয়ে আছেন কেন, উঠে পড়ুন!

তবু মাধবী কথা বলে না। নির্বাক বিস্ময়ে সংগীর কার্যকলাপ লক্ষ্য করে। সংগী তাড়া দেয়, কি, আজ যাবেন না?

মাধবীর পা দুটো কাঁপল, ঠোঁটটা নড়ল। তারপর আস্তে আস্তে উঠে এসে সংগীর পাশে নীরবে বসল।

রিক্‌সা ছাড়তে সংগী মুখ বাড়িয়ে পাশের একখানা অপেক্ষমান রিক্‌সাকে চেঁচিয়ে বললে, তুমি ঘণ্টা দুই পরে কাঁচড়াপাড়া হাসপাতালে এসো। যাবার-আসবার পুরো ভাড়াই পাবে। গেটে সওয়ারী অপেক্ষা করবে।

সংগীর প্রশ্নটা মাধবীর কানে বাজছে, 'কি, আজ যাবেন না?' সত্যি যেন এ পথে আর আসা-যাওয়া করবার ইচ্ছে নেই মাধবীর, কি হবে শুধু স্মৃতির আবর্তে ঘুরে। অনেক সহ্য করেছে মাধবী, আর সে সহ্য করতে পারছে না—আর দুঃখ নয়, বেদনা নয়, এখন একেবারে সে মুক্তি চায়। যদি জিগ্যেস কর 'কি মুক্তি? 'কার থেকে মুক্তি', মাধবী স্পষ্ট করে বলতে পারবে না। শুধু সে মুক্তি চায়, নতুন করে বাঁচতে, আবার আনন্দের নিঃশ্বেস নিতে। ভুলে গিয়েও যদি এখন বাঁচা যায়। সংগীর অংগ স্পর্শে বার বার মাধবী কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। এক চোখে কাঁদা, আর এক

চোখে হাসার মত তার আজ মনের অবস্থা। হয়তো এতদিনে পাশের লোকটিকে সে নিজের বলে মনে করেছে। আজ বাদে কাল আর দেখা-শোনার কোন সুযোগ হবে না। এই স্পর্শ বিচ্ছেদে তীব্র হয়ে উঠবে। তাকে শুধু অপরাধীই করবে। কে জানে এর পর আর নিয়মিত হাসপাতালে অবনীকে দেখতে আসা সম্ভব হবে কি না।

দুজনেই চুপ। সঙ্কোচটা যেন দুরতিক্রম্য। জোর করে একগাড়িতে ওঠার জন্যে সঙ্গীটির সঙ্কোচই যেন বেশী। মুখখোলা রিক্সায় খোলা রোদ্দুরে সঙ্গীটির মুখ যেন ঝলসে গেছে। মাধবী সামনেটা দেখতে পাচ্ছে না। ঝিলিমিলি রোদে খাঁ-খাঁ রাস্তাটা কিলবিল করছে, ঠায় চেয়ে থাকলে মনে হয়, মাটি সরে সরে যাচ্ছে।

সঙ্গী নীচু সুরে জিগ্যেস করলে, কি, খুব রাগ হলো? মাধবী অন্যমনস্কের মত বললে, কেন?

এই একসঙ্গে এলুম বলে! অপরাধ স্বীকারের মত সঙ্গী বললে।

না, রাগ হতে যাবে কেন। হঠাৎ বড় সপ্রতিভ শোনাল মাধবীর গলা।

তার পরের প্রশ্নটা উভয়েই এড়িয়ে চুপ করে থাকে, রিক্সা যথাগতিতে এগিয়ে চলে।

খানিকক্ষণ পরে সঙ্গী নিজে নিজে বলে, এবার বেশ একলা একলা আসবে। আর পথেঘাটে কেউ বিরক্ত করবে না।

মাধবী উত্তর করলে না। সঙ্গী অবাক হয়ে দেখলে মাধবীর দু'চোখে জল।

সঙ্গী ব্যস্ত হয়ে বলে, একি কাঁদচো তুমি!

মাধবী শান্তকণ্ঠে বললে, না।

সত্যিই তো, এতে শুধু শুধু কাঁদবার কি আছে? সঙ্গী সান্ত্বনা দেবার লোভ সংবরণ করে।

যথারীতি রিক্সাটা ঘুরে সোজা হাসপাতালের রাস্তায় পড়তেই হঠাৎ সুপ্তোত্থিতের মত মাধবীর কণ্ঠস্বর লাফিয়ে ওঠেঃ ওদিকে নয়, ওদিকে নয়! সিধে চল সামনে।

রিক্সাটা থেমে গেল ভ্যাবাচাকা খেয়ে। মাধবী তখনো রুদ্ধশ্বাসে বলছে, থামলে কেন? ঘুরিয়ে নাও—সামনে চল।

সঙ্গী ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলে, কোথায়?

পাগলের মত মাধবী বললে, যেখানে খুশী। চাঁদমারী।

কিন্তু এরা? বিস্মিত কণ্ঠে সঙ্গী জিগ্যেস করলে।

উন্মত্তের মত মাধবী বললে, ওরা মরুক, মরুক, মরুক! আমরা পালাই চল শীগ্‌গীর......চালাও না, থামলে কেন?

সঙ্গীর বিস্ময় কাটে না। বললে, কি বলচো এ সব!

মাধবীর কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে এল, ঠিক বলচি......ওকে তুমি চালাতে বল...আমাকে সঙ্গে নাও।

সঙ্গীর বুকের ওপর ঢলে পড়ে মাধবী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললে, আর পারি না... আমাকে তুমি আর কিছু জিগ্যেস করো না!

* * * * *

দুদিন পরে একা একা মাধবী হাসপাতালে এল। চোখ তুলে চেনা জায়গাটাকে দেখবার তার সাহস নেই—চোখ তুললেই যেন এখনি একটা বিশ্রী কাণ্ড হয়ে যাবে, তার পরিচয় নিয়ে নানারকম সন্দেহ গুঞ্জন উঠবে। এই সেই মেয়ে, যে দুদিন আগেও একজন পরপুরুষের গলাগলি হয়ে পালাতে চেয়েছিল—প্রিয়তমকে জীর্ণ বাসের মত ত্যাগ করতে চেয়েছিল। বিশ্বাসঘাতিনী এই নারী। রোগে-শোকে বিপদে কোন কাজেই লাগে না। বড় ক্ষুদ্রচেতা, আত্মসুখী এই মেয়ে।

মাথা নীচু করে পা টিপে টিপে মাধবী এগিয়ে আসে। চেনা যায় না, এই সেই মাধবী। দুদিনেই কি মূর্তি হয়েছে!—কলা-বনে ঝড় বয়ে যাওয়ার মত অঙ্গের সমস্ত লাবণ্য ছিঁড়ে বীভৎস হয়ে গেছে; উস্কখুস্ক চুল, আলুথালু বেশ—চোখের কোলে কালিরেখা। অসংবদ্ধ দেহভার।

অবনীর কেবিনের সামনে পাতা চেয়ার দুটোয় এক পুরু ধুলো জমে আছে। জানালায় মাকড়সা জাল বিস্তার করেছে। টিনের চালে বাতাসের শব্দ হচ্ছে দীর্ঘ-নিশ্বাসের মত। সবুজ ঘাসের ছায়ায় দিন মৃতপ্রায়। মাধবীর বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে—অমঙ্গলের আশঙ্কায় বুকটা দুরু দুরু করে ওঠে। কেন এল সে? আর কি দেখতেই বা এল?

কেবিনের ভেতরটা অন্ধকার। প্রথমটা কিছু যেন দেখা যায় না। লোহার খাটের ওপর ঘুমন্ত দেহটা প'ড়ে আছে। রোগীর মাথার কাছে গোটান মশারীতে রাত্রির ছায়া। বিবর্ণ জল-ছাপ টিপয়ে, খালি কাচের গ্লাসে, শুকনো ফলের খোলায় পরিত্যক্ত অব্যবহার্য সরাইখানার ছবি।

মুহূর্তের জন্যে মাধবী থমকে দাঁড়াল। মনে পড়ল অনেকদিন এ ঘরে ঢোকে নি সে—বাইরে থেকে কথা বলে চলে গেছে। কেন? ভয়েই বোধ হয়। মৃত্যুকে, রোগকে তার বড় ভয় করেছিল। আজ ভয় করছে না তার?

পড়ি-কি-মরি করে মাধবী ঘরে ঢুকে অবনীর পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। বহুদিনের স্তূপীকৃত পুষ্পার্ঘের মত মাধবীর দেহটা নিবেদিত। নীরব কান্নায় ফুলে ফুলে ব্যথিত কুসুম-স্তূপ কেঁপে উঠছে যেন।

অবনীর ঘুম ভাঙল। নিদ্রালস কণ্ঠে বললে, কে?

কোন সাড়া নেই। শব্দটার প্রতিধ্বনি হলো কেবল।

সজাগ কণ্ঠে অবনী বললে, কে? মাধবী?

কোন উত্তর নেই—মাধবী অবনীর পায়ের ওপর নিশব্দে মাথা ঘসছে কেবল।

ক্লান্তস্বরে অবনী বললে, আবার তুমি এলে? কথা রাখলে না মাধবী—তোমার ভয় নেই!

মাধবী মুখ গুঁজে কেঁদে কেঁদে বললে, আমায় তুমি ক্ষমা কর। আর কখনো এমন হবে না। বল আমায় ক্ষমা করলে?

কি ছেলেমানুষী করচো। উঠে পড়, ছি! কি হয়েচে কি তোমার আজ! ওঠ, ওঠ।

অনেকদূর থেকে যেন শব্দটা হলো, না, না, বল, আমায় তুমি ক্ষমা করলে?

অবনী বিরক্তির সঙ্গে বললে, কি মুশকিল, কি পাগলামী হচ্ছে—উঠে বস।

মাধবী উঠে বসল। শুয়ে শুয়ে অবনী বললে, আমার গায়ের চাদরটা টেনে দাও না, বড় শীত করছে।

পরম-যত্নে নিপুণ সেবাপরায়ণতায় মাধবী অবনীর শায়িত রুগ্ন দেহটার ওপর পায়ের তলায় জড়-করা কম্বলটা টেনে দিলে।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—
নির্বাসিতের আত্মকথা

কোনো কোনো বই পড়ে লেখকেরা আপন আপন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বড় নিরাশ হন। যাদের সত্যকার শক্তি আছে, তাদের কথা হচ্ছে না, আমি ভাবছি আমার আর আমার মত আর পাঁচজন কমজোর লেখকের কথা।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পর পুনরায় 'নির্বাসিতের আত্মকথা' পুস্তিকাখানি আদ্যন্ত পড়লুম। পাঠকমাত্রই জানেন, ছেলেবেলার পড়া বই পরিণত বয়সে পড়ে মানুষ সাধারণত হতাশ হয়। 'নির্বাসিতের' বেলা আমার হল বিপরীত অনুভূতি। বুঝতে পারলুম, কত সূক্ষ্ম অনুভূতি, কত মধুর বাক্যভঙ্গি, কত উজ্জ্বল রসবাক্য, কত করুণ ঘটনার ব্যঞ্জনা তখন চোখে পড়ে নি। সাধুভাষার মাধ্যমে যে এত ঝকঝকে বর্ণনা করা যায়, সে ভাষাকে যে এতখানি চটুল গতি দিতে পারা যায়, 'নির্বাসিত' যাঁরা পড়েন নি, তাঁরা কল্পনা-মাত্র করতে পারবেন না।

কিন্তু প্রশ্ন, এ বই পড়ে আপন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হলুম কেন?

হায়, এ রকম একখানা মণির খনির মত বইয়ের চারিটি সংস্করণ হল ত্রিশ বৎসরে! তাহলে আর আমাদের ভরসা রইল কোথায়?

* * *

১৯২১ (দু-চার বছর এদিক-ওদিক হতে পারে) ইংরেজিতে একদিন শান্তিনিকেতন লাইব্রেরিতে দেখি এক গাদা বই গুরুদেবের কাছ থেকে লাইব্রেরিতে ভর্তি হতে এসেছে। গুরুদেব প্রতি মেলে বহু ভাষায় বিস্তর পুস্তক পেতেন। তাঁর পড়া হয়ে গেলে তার অধিকাংশ বিশ্বভারতী পুস্তকাগারে স্থান পেত। সেই গাদার ভিতর দেখি, 'নির্বাসিতের আত্মকথা'।

বয়স অল্প ছিল, তাই উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় নাম জানা ছিল না। বইখানা ঘরে নিয়ে এসে এক নিশ্বাসে শেষ করলুম। কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলছিনে, এ বই সত্যসত্যই আহার-নিদ্রা ভোলাতে পারে। 'পৃথিবীর সব ভাষাতেই এ রকম বই বিরল; বাঙলাতে তো বটেই।'

পরদিন সকালবেলা গুরুদেবের ক্লাশে গিয়েছি। বই খোলার পূর্বে তিনি শুধালেন, "উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নির্বাসিতের আত্মকথা' কেউ পড়েছ?" বইখানা প্রকাশিত হওয়ামাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছে; তিনি সেখানা পড়ে লাইব্রেরিতে পাঠান, সেখান থেকে আমি সেটাকে কব্জা করে এনেছি, অন্যেরা পড়বার সুযোগ পাবেন কি করে? বয়স তখন অল্প, ভারী গর্ব অনুভব করলুম।

বললুম, 'পড়েছি।'

শুধালেন, 'কি রকম লাগল।'

আমি বললুম, 'খুব ভালো বই।'

রবীন্দ্রনাথ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আশ্চর্য বই হয়েছে। এ রকম বই বাঙলাতে কম পড়েছি।'

বহু বৎসর হয়ে গিয়েছে বলে আজ আর হুবহু মনে নেই রবীন্দ্রনাথ ঠিক কি প্রকারে তাঁর প্রশংসা ব্যক্ত করেছিলেন। আমার খাতাতে টোকা ছিল এবং সে খাতা কাবুল বিদ্রোহের সময় লোপ পায়। তবে একথা আমার পরিষ্কার মনে আছে যে, রবীন্দ্রনাথ বইখানার অতি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে-ছিলেন।

বিখ্যাত লেখককে দেখার সাধ সকলেরই হয়। আমি যে সে কারণে উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম তা নয়। আমার ইচ্ছা ছিল দেখবার যে বারো বৎসর নরক-যন্ত্রণার পর তিনি যে তাঁর নিদারুণ অভিজ্ঞতাটাকে হাসি-ঠাট্টার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করলেন তার কতখানি সত্যই তার চরিত্রবলের দরুণ এই বিশেষ রূপ নিল আর কতখানি নিছক সাহিত্য-শৈলী মাত্র। অর্থাৎ তিনি কি সত্যই এখনো সুরসিক ব্যক্তি, না অদৃষ্টের নিপীড়নে তিক্ত-স্বভাব হয়ে গিয়েছেন।

গিয়ে দেখি পিতা-পুত্র বসে আছেন।*

বেশ নাদুস-নুদুস চেহারা (পরবর্তী যুগে তিনি রোগা হয়ে গিয়েছিলেন), হাসিভরা মুখ আর আমার মত একটা আড়াই ফোঁটা ছোকরাকে যে আদর করে কাছে বসালেন, তার থেকে তৎক্ষণাৎ বুঝে গেলুম যে, তাঁর ভিতর মানুষকে কাছে টেনে আনবার কোন আকর্ষণী ক্ষমতা ছিল, যার জন্য বাঙলা দেশের তরুণ সম্প্রদায় তাঁর চতুর্দিকে জড় হয়েছিল।

ছেলেটিকেও বড় ভালো লাগলো। বড্ড লাজুক আর যে সামান্য দু'একটি কথা বলল, তার থেকে বুঝলুম, বাপকে যে শুধু সে ভক্তি-শ্রদ্ধাই করে তা নয়, গভীরভাবে ভালোও বাসে।

অটোগ্রাফ-শিকারের ব্যসন তখনো বাঙলা দেশে চালু হয় নি। তবে সামান্য যে দু'একজন তখনকার দিনে এ ব্যসনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা শুধু স্বাক্ষরেই সন্তুষ্ট হতেন না, তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কুটেসন বা আপন বক্তব্য লিখিয়ে নিতেন। আমার অটোগ্রাফে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-নাথ, শরৎচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, প্রফুল্ল রায়, লেভি, এ্যান্ড্রুজ ইত্যাদির লেখা তো ছিলই, তার উপর গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিত-কুমার, কারপেলেজের ছবিও ছিল।

উপেনবাবুকে বইখানা এগিয়ে দিলুম।

এর পিছনে আবার একটুখানি ইতিহাস আছে।

বাজে শিবপুরে শরৎচন্দ্রকে যখন তাঁর স্বাক্ষর এবং কিছু একটা লেখার জন্য চেপে ধরেছিলুম, তখন তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন বিশেষ করে তাঁর কাছেই এলুম কেন? আমি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলুম, 'আপনার লেখা পড়ে আপনার কাছে না আসাটাই তো আশ্চর্য!'

শরৎবাবু একটুখানি ভেবে লিখে দিলেন, 'দেশের কাজই যেন আমার সকল কাজের বড় হয়।'

আমি জানি শরৎচন্দ্র কেন ঐ কথাটি লিখেছিলেন। তখন তিনি কংগ্রেস নিয়ে মেতেছিলেন।

তারপর সেই বই যখন রবীন্দ্রনাথকে দিলুম, তখন তিনি শরৎচন্দ্রের বচন পড়ে লিখে দিলেন,—

'আমার দেশ যেন উপলব্ধি করে যে, সকল দেশের সঙ্গে সত্য সম্বন্ধ দ্বারাই তার সার্থকতা।'

এর ইতিহাস বাঙালীকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। জাতীয়তাবাদ ও বিশ্ব-মৈত্রী নিয়ে তখন রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের তর্ক আলোচনা হচ্ছিল।

উপেনবাবুকে অটোগ্রাফ দিতে তিনি দুটি লেখা পড়ে লিখে দিলেন,—

'সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।'

(ক্রমশ)

* নির্বাসিতের আত্মকথা—চতুর্থ সংস্করণ, পৃঃ ৭০ এবং ১৭২।

ভবদুলাল

খুব বেশি দিনের কথা নয়। এক বাঙালী যুবক কোন কার্য উপলক্ষে বোম্বাই শহরে গিয়েছিল। উদ্দেশ্য কি ছিল জানা নেই, তবে যুবক ছিল ধনীর সন্তান, সুপুরুষ, সুদর্শন ও সুসজ্জিত। কিছু পানাহারের উদ্দেশ্যে সেই যুবক একদিন সন্ধ্যায় বোম্বাইয়ের একটি আধুনিক হোটেলে গিয়েছিল। পানীয় ও খাদ্যের ফরমায়েস দিয়ে যুবক চুপচাপ বসে অর্কেস্ট্রার ঐক্যতান উপভোগ করছে, এমন সময়ে অদূরে একটি টেবলে আসন গ্রহণ করল এক অতীব সুন্দরী ও লাবণ্যবতী মহিলা। মহিলার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যদিও এক ক্ষণস্থায়ী চাপা গুঞ্জনের সৃষ্টি হল, আমাদের পরিচিত সেই যুবক কিন্তু অপলক নেত্রে বিস্মিত দৃষ্টিতে সেই রূপসীর দিকে চেয়ে রইল। কখন আহার ও পানীয় দিয়ে গেছে তার খেয়ালও নেই, ভ্রূক্ষেপও নেই, সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে সেই মহিলার দিকে।

কতক্ষণ কেটে গেছে কে জানে! মহিলা কিছু পান করে আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু যাবার আগে নীল রঙের একটি কাগজ ছোট্ট একটি দলা পাকিয়ে যুবকের টেবলে ফেলে দিয়ে গেলেন। যুবক সাগ্রহে কাগজটি কুড়িয়ে নিয়ে কি লেখা আছে পড়তে গেল, কিন্তু হায় যে-ভাষায় লিপি লিখিত, সে-ভাষা যুবকের কাছে অবোধ্য, কিন্তু মুখ তুলে মহিলাকে আর দেখা গেল না, বাইরেও না।

মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে যুবক বাড়িতে ফিরে এল। জানা গেল, সেই লিপি ফরাসী ভাষায় লিখিত। যুবকের এক পরিচিত ভদ্রলোক ছিল, তিনি ফরাসী ভাষা জানতেন। যুবক লিপিখানি সেই ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে গেল। ভদ্রলোক সেই লিপিখানির দিকে একবার চেয়েই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, লিপিখানি যুবকের মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অপমান করে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

নিতান্ত মনঃক্ষুণ্ণ হয়েই যুবক ফিরে এল, কিন্তু আশাভঙ্গ হল না। সে এক খাস ফরাসী মহিলার কাছে গিয়ে তার আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে লিপিখানি পড়তে দিলে। সমস্ত কাহিনীটি শুনে মহিলারও কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়েছিল, কিন্তু লিপিটি পাঠ করে তিনি এতদূর উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যে, তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। রক্তাক্ত নয়নে যুবকের দিকে চেয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। লিপিখানি আগেই তাঁর হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল, যাবার আগে ইচ্ছা করে জুতো দিয়ে সেটি মাড়িয়ে দিয়ে গেলেন।

যুবক বড়ই মুষড়ে পড়ল, যাকেই সেই লিপি পড়তে দেওয়া হয়, সেই রাগান্বিত হয়ে ওঠে, অথচ সেই নারী ও লিপির রহস্য উদ্ঘাটন করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠছে। অবশেষে আর এক যুবকের সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি ফরাসী ভাষা জানেন। আমাদের পরিচিত যুবকের কাছ থেকে সব শুনে তিনি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠলেন এবং বললেন যে, তিনি সেই লিপির পাঠোদ্ধার করে দেবেন, কিন্তু কিছুতেই ক্রোধান্বিত হবেন না।

যুবক সাগ্রহে পকেটে হাত দিলে সেই কাগজখানি বার করবার জন্য, কিন্তু কোন পকেটে অথবা কোথাও সেই কাগজখানি আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

* * * * *

অনেক দিন আগের কথা। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যাণ্ড প্রদেশে রেল লাইনের ওপর একটি ছোট সেতুকে কালো রং করা হবে। লোকজন আগেই রং, তেল, তুলি ইত্যাদি নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেছে। কার্যস্থলে পৌঁছুবার কিছু পরে বড় রং-মিস্ত্রি রং তৈর করে দিয়ে অন্য এক জায়গায় কাজে চলে গেল; যাবার আগে জানিয়ে গেল তিন ঘণ্টা পরে সে ঠিকাদারকে নিয়ে আসবে, ততক্ষণে যেন সেতুটি রং করা হয়ে যায়। এদিকে হল কি রং-মিস্ত্রী চলে যাবার মিনিট দশ পরে ধাক্কা লেগে রংয়ের বালতি উল্টে পড়ে গিয়ে সব রং নষ্ট হয়ে গেল। সকলের মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল, কারণ রং-মিস্ত্রী আর ঠিকাদার উভয়েই ছিল অত্যন্ত কড়া লোক। একজন প্রস্তাব করল পালিয়ে যাওয়া যাক, কিন্তু আর একজন হার স্বীকার করতে চাইল না। সে বলল; আমরা যে কোন সময়েই ত পালিয়ে যেতে পারি, কিন্তু একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? এই কথা বলে সে বাকি মাল-মশলা দিয়ে রং তৈরি করে সেতুতে লাগিয়ে দিলে, চমৎকার কালো রং হল। যথাসময়ে রং-মিস্ত্রী আর ঠিকাদার এসে সেতু দেখে গেল।

কিন্তু গল্প এখানেই শেষ হল না। তারপর কুড়ি বছর কেটে গেছে, সেতুতে আর রং লাগাবার প্রয়োজন হয়নি, আজও সে সেই প্রথম দিনের মতোই উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। কিন্তু আন্দাজে মিশিয়ে রং তৈরি করা হয়েছিল, তার ভাগ কারও জানা নেই বলে সে রং কেউ তৈরি করতে পারল না।

* * * * *

সিঙ্গাপুরের জাহাজঘাটায় একটি লোক ধরা পড়েছে। লোকটি চৈনিক, সে গুপ্ত-ভাবে সোনা পাচার করত। তাকে পরীক্ষা করবার সময় দেখা গেল যে, তার ওয়েস্ট-কোটে বাইশটি পকেট আছে। এক-একবারে কয়েক হাজার টাকার সোনা সে লুকিয়ে নিয়ে যেত।

কিছুদিন পূর্বে কলকাতায় দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংএ পরীক্ষার সময় একটি পরীক্ষার্থী ধরা পড়েছিল, তার কোটে অবশ্য বাইশটি পকেট ছিল না, কিন্তু আটটি পকেট ছিল; তবে দুঃখের বিষয় যে, ছেলেটি ভুল করে ফিজিক্স পরীক্ষার দিন কেমিস্ট্রি বইয়ের টুকরো-টাকরা পকেটে ভরে রেখেছিল। জাতও গেল, পেটও ভরল না।

* * * * *

পরেশ বাবুকে আপনারা নিশ্চয়ই চেনেন না, চিনলে গল্পটা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতেন। পরেশ বাবু এক সওদাগরী অফিসের ডেসপ্যাচার, অর্থাৎ পিওন ও ডাক মারফৎ চিঠিপত্তর পাঠিয়ে থাকেন। এখন সেদিন পরেশ বাবুর হাতে দুখানি চিঠি এসেছে, একখানি যাবে বোম্বাই, আর একখানি যাবে লণ্ডন। পরেশ বাবু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভুল করবার প্রবৃত্তিবশে বোম্বাইয়ের জন্য দেয় টিকিট বসালেন লণ্ডনের চিঠিতে, আর লণ্ডনের টিকিট বসালেন বোম্বাইয়ের চিঠিতে। কিন্তু পরেশ বাবুর পাশের ভদ্রলোক রায় মশায় যখন ভুলটা ধরে দিলেন, তখন পরেশ বাবু এক সময়ে চুপিসাড়ে চিঠি দুখানার ঠিকানা কেটে হাতে লিখে বদলাবদলি করে ডাকবাক্সে নিজেই ফেলে দিলেন পাছে ধরা পড়ে যান।

আর একবার পরেশ বাবু পোস্ট অফিসে নিজেই গেছেন রেজেস্টারি চিঠি লাগাতে। পোস্ট অফিসের ভদ্রলোক যখন বললেন যে, 'মশাই আপনার চিঠি ভারি হয়ে গেছে, আরও টিকিট বসাতে হবে', পরেশ বাবু জবাব দিলেন, 'চিঠিতো তাহলে আরও ভারি হয়ে যাবে।'

ভারত-শিল্প

বিমলকুমার দত্ত

(৩)

চতুর্থ ও পঞ্চম পর্ব

শুংগ ও কান্ববংশ

(১৮৫—৭৩ ও ৭২—২৯ খৃঃ পূঃ)

মৌর্যবংশের দশম ও শেষ নরপতি বৃহদ্রথ মৌর্যকে গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত করাইয়া তাঁহার সেনাপতি পুষ্যমিত্র সুংগ ১৮৫ খৃঃ পূর্বাব্দে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। সুংগেরা ছিলেন ব্রাহ্মণ সেকারণ সুংগ শক্তি প্রতিষ্ঠার সহিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং পুষ্যমিত্র তাঁহার রাজত্বকালে দুইবার অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। জানা যায় যে, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পাতঞ্জলী এইরূপ একটি অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। অশোকের মৃত্যুর পর একাধারে দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন, কলিংগের চেতরাজগণ এবং পশ্চিমে গান্ধার ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহে সিরিয়া ও ব্যাকট্রিয়ার গ্রীকরাজারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বিখ্যাত মিনাণ্ডার বা মিলিন্দ এই বংশের সন্তান হইয়াও নাগসেন নামক জনৈক ধর্মাচার্যের নিকট বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। সম্রাট পুষ্যমিত্র যবনদিগকে বিতাড়িত করিয়া তাঁহার রাজত্ব-সীমা পশ্চিমে জলন্ধর ও শিয়ালকোট এবং দক্ষিণে নর্মদা পর্যন্ত বিস্তার করিয়া-ছিলেন। কলিংগরাজ খরবেলের নিকট ১৬১ খৃঃ পূঃ তাঁহার পরাজয় ঘটে। তাঁহার পরবর্তী ৯ জন নৃপতির রাজত্ব-কালে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। আনুমানিক ৭৩ খৃঃ পূঃ শুংগবংশের শেষ নরপতি তাঁহার মন্ত্রী বাসুদেব কর্তৃক নিহত হন। বাসুদেবের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ কান্ববংশ নামে খ্যাত। এই বংশের চারিজন নৃপতি যথাক্রমে মাত্র ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। এই সময়ে মথুরা ও পাঞ্জাবের কিয়দংশ শকাধিকারে ছিল।

সুংগ ও কান্বসম্রাটগণ ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী হইলেও এই যুগে বৌদ্ধশিল্প প্রসার স্রোত অব্যাহত ছিল। একাধারে ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন হিসাবে ভারত ও
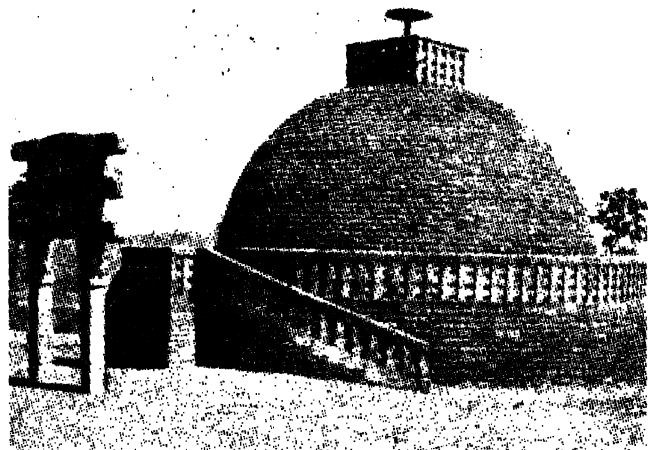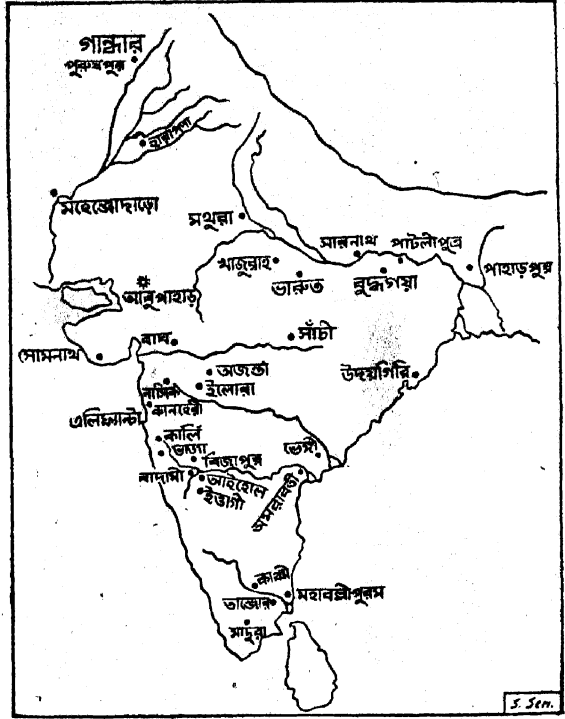
সাঁচী স্তূপ

সাঁচীস্তূপ এ যুগের সম্পূর্ণ শিল্প-নিদর্শন। তবে সাঁচীস্তূপগুলি এ যুগে সম্পূর্ণ হয় না কারণ ইহার তোরণদ্বারগুলি পরবর্তী অন্ধ্রযুগে নির্মিত হয়। বুদ্ধগয়ার মন্দিরের রেলিংও এই সময়ে গঠিত।

কাষ্ঠনির্মিত স্থাপত্যধারার সম্পূর্ণ অনুকরণে ভারুত, সাঁচী ও বুদ্ধগয়ার রেলিং ও তোরণদ্বারগুলি নির্মিত। উষ্ণীষ, বেদীকা ও সূচীগুলির সংযোগ পদ্ধতি পরিলক্ষণ করিলেই এ সত্য সহজেই অনুমেয়। কাষ্ঠের ন্যায় উভয় পার্শ্বের বেদীকার মধ্যে গর্ত করিয়া সূচিগুলি প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইত। অনুরূপ-ভাবেও উষ্ণীষ ও বেদীকার যোগ সংরক্ষণ করা হইত। ভারুত চতুর্দিকস্থ চারিটি তোরণদ্বার মধ্যে পূর্বদিকেরটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং ইহাতে খোদিত আছে যে, ইহা শুঙ্গরাজত্বকালে নির্মিত। ভারত ও সাঁচীর এই তোরণদ্বার নির্মাণধারাটি

উদয়গিরি
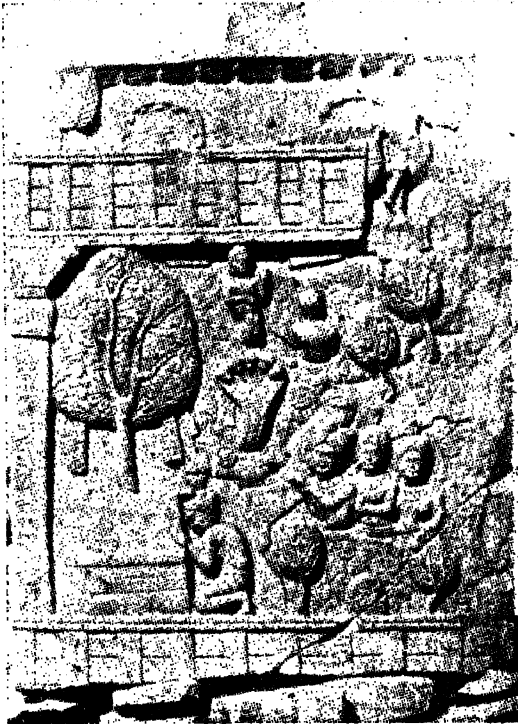
ভারুত ভাস্কর্য

পরবর্তীকালে বৃহত্তর ভারতে এবং সুদূর চীন ও জাপানের স্থাপত্যে বিশেষ স্থানলাভ করে। জাপানের অনুরূপ তোরণদ্বার "তোরি" নামে খ্যাত এবং অধুনাপি প্রচলিত। সাঁচী ও ভারুতের রেলিং (বেদীকা) ও দ্বারগুলির বহু অংশ স্থানীয় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ভিক্ষু ও ভিক্ষুণিগণের অর্থসাহায্যে গঠিত।

হাতীগুম্ফার (উড়িষ্যা) খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, কলিঙ্গাধিপতি খরবেল ১৬০ খৃঃ পূর্বাব্দে ইহা নির্মাণ করেন। মহারাজ খরবেল জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। উড়িষ্যার এই সকল প্রস্তরখোদিত জৈন আবাসগুলির মধ্যে রাণীগুম্ফা সর্বপ্রধান। রাণী ও গণেশগুম্ফার দুইটি দ্বিতলযুক্ত। এই গুম্ফা দুইটিতে প্রবেশ করিলেই প্রথমেই চতুষ্কোণ স্তম্ভযুক্ত বারান্দা পড়ে এবং বারান্দা অতিক্রম করিয়া পৃথক পৃথক দরজাযুক্ত গুহগুলির সম্মুখীন হওয়া যায়। এই গুহ-গুলির প্রবেশপথের উপরিভাগে সারি-ভাবে জৈন কাহিনী সকল প্রস্তরগাত্রে রূপায়িত। উক্ত গুহাগুলির মধ্যে বাঘ-গুহাটি অদ্ভুত আকারের। একটি বিরাট ব্যাঘ্রের ব্যাদিত মুখমণ্ডলের মধ্য দিয়া এই গুহাটির প্রবেশপথ সুন্দরভাবে খোদিত।

ভারুত স্তূপটি মূলত ইষ্টকনির্মিত কিন্তু বুদ্ধগয়া ও সাঁচীর ন্যায় ইহার বেদিকা (রেলিং) ও তোরণদ্বারগুলি প্রস্তর-

ভাজ চৈত্য

নির্মিত। ভারহুতস্তূপের বেদীকা ও তোরণ-দ্বারের অনেকাংশই কলিকাতাস্থ ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে রক্ষিত। ভারহুতের বেদীকা ও তোরণগাত্রের লিপিসহ খোদিত যক্ষযক্ষী, নাগ ও দেবতা মূর্তি, জাতক কাহিনী ও বুদ্ধের জীবনী চিত্রাবলী এবং বিভিন্ন পশুপক্ষী, লতাপাতা ও ফলফুলের চিত্রগুলি এ যুগের শিল্পধারার প্রতীক। মনুষ্য, যক্ষযক্ষীর ও নাগ বা দেবতামূর্তি-গুলি সম্পূর্ণ সুন্দর ভাস্কর্যনিদর্শন না হইলেও পশুপক্ষীর খোদিত চিত্রগুলি শিল্পের নিখুঁততত্ত্ব ও সজীবতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। এ যুগের শিল্পে বুদ্ধ-মূর্তির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না তবে প্রতীক চিহ্ন দ্বারা (যথা ছত্র, ত্রিরত্ন, সিংহাসন, চৈত্যবৃক্ষ, পাদুকা, ধর্মচক্র প্রভৃতি দ্বারা) বুদ্ধের জীবনী রূপায়িত হইয়াছে। ত্রিশূলাকৃতি ত্রিরত্ন চিহ্ন দ্বারা বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ এই তিনটিকে বুঝাইত। ভারহুত ও সাঁচীর বেদীকা গাত্রে খোদিত জাতক কাহিনীগুলির মধ্যে ছদন্ত, অলম্বুজা, মহাকপি, শ্যামা, জেতবন প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দোহদমূর্তির (স্ত্রী বা বৃক্ষমূর্তি একত্রে) বহুল প্রচলন ও মিথুন মূর্তির (স্ত্রী ও পুরুষের সকাম আলিঙ্গনাবদ্ধ মূর্তি) প্রচলন এ যুগের শিল্পে দৃষ্ট হয়। ভারহুত সাঁচী ও বৌদ্ধ-গয়ার বেদীকা গাত্রে কতকগুলি অদ্ভুত আকারের প্রাণীর (যথা মনুষ্যমুণ্ড বিশিষ্ট পশুমূর্তি, ডানা বিশিষ্ট মনুষ্যমূর্তি, এক মুণ্ডে যুক্ত দুইটি ও চারিটি পশুমূর্তি ইত্যাদি) সন্ধান পাওয়া যায়। কেবলমাত্র যে ইহারা আলঙ্কারিক চিহ্ন হিসাবে শিল্পীর অদ্ভুত পরিকল্পনা মাত্র তাহা নহে। সুপ্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতার ফলকগুলিতে এবং তদানীন্তন-কালের পশ্চিম এশীয় শিল্পেও অনুরূপ অদ্ভুত চিন্তাধারার প্রকাশ দেখা যায়। সুতরাং এগুলি যে কোন গূঢ় রহস্যাবৃত প্রাচীন শিল্পধারা যুগে যুগে ভারত শিল্পে স্থান পাইয়া আসিতেছে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

বুদ্ধমূর্তির সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি এ যুগের শিল্পের অন্যতম লক্ষণীয় বিষয়। বৌদ্ধধর্ম সর্বদুঃখের মূলে যে "তৃষ্ণা" বা তৃষ্ণাকে আবিষ্কার করিয়াছিল, উহার পরি-বর্ধক ইন্দ্রিয়গত সৌন্দর্যবিলাস ও পার্থিব ভোগলালসা বিশেষভাবে নিন্দনীয় ছিল, এবং ফলে দেহকান্তিময় শিল্পকলা সাধনাও বর্জিত হইয়াছিল। কিন্তু এ যুগের

সাঁচীর স্ত্রী মূর্তি

শিল্পে বোধিবৃক্ষ, বুদ্ধচরণ, ত্রিরত্ন প্রভৃতি ব্যঞ্জনায় এবং দেহকান্তিময় যক্ষযক্ষী, নাগ-দেবতা, দোহদ, মিথুন প্রভৃতি মূর্তি প্রকাশের মধ্যে উপরোক্ত কঠোর নীতির ব্যতিক্রম দেখা যায়।

ভারুত শিল্পের কতকগুলি মূর্তির বেশভূষা দেখিলে পশ্চিম এশিয়া ও গ্রীক ব্যাকট্রিয়ানদিগের প্রভাব সহজেই অনুমেয়। মিহির নামক সূর্যদেবতার দণ্ডায়মান মূর্তিটির বেশভূষা যে সর্বতোভাবে অ-ভারতীয় সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। মৌর্য ও সুঙ্গযুগে পশ্চিম এশীয় ও গ্রীক ব্যাকট্রিয়ানদিগের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক যোগাযোগই ইহার কারণ।

ভারুতের ভাস্কর্যে মূর্তিনিচয়ের পারিপ্রেক্ষিত রচনার অভাবে গভীরত্বহীনতা, কাল ও স্থানের অসঙ্গতি ও ভাবলেশহীন মুখাকৃতি ও মনুষ্যদেহের চ্যাপ্টাভাবের জন্য ইহা সাঁচীশিল্পের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে না; তবে ইহারা আদিম সৌন্দর্য, সজীবতা ও সারল্যের জন্য খ্যাত।

বুদ্ধগয়ার বেদীকা কোন স্তূপের আবেষ্টনী নহে। ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধত্ব-লাভের পর গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া বোধি-বৃক্ষতলে পায়চারী করিয়াছিলেন। উক্ত পবিত্র স্থানটির স্মারকচিহ্ন ও রক্ষা উদ্দেশ্যে এই বেদীকা নির্মিত হয়। ভারুত ও সাঁচীর ন্যায় এখানেও নানাপ্রকার মনুষ্য ও পশুমূর্তি, জাতক কাহিনী, আলঙ্কারিক ও নির্দেশিক মূর্তি-চিহ্ন ও বৃক্ষলতার চিত্র খোদিত আছে। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-শান্তির ও চতুরশ্বচালিত সূর্যমূর্তিটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানে পদ্মের উপর দণ্ডায়মানা ও হস্তে পদ্মধৃতা একটি স্ত্রীমূর্তির মস্তকের উভয় পার্শ্ব হইতে দুইটি হস্তী শুণ্ড দ্বারা ধৃত পাত্র হইতে জল নিক্ষেপ করিতেছে—এইরূপ একটি মূর্তির প্রকাশ দেখা যায়। ইহা "গজলক্ষ্মী" মূর্তি নামে খ্যাত। স্বর্গীয় রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের মতে এই মূর্তিটি পৌরাণিক লক্ষণাক্রান্ত স্ত্রীমূর্তি। শ্রী-"পদ্মস্থা পদ্মহস্তা গজোৎক্ষিপ্ত-ঘটপ্লুতা" আকারে প্রকাশিত। কিন্তু ডাঃ ফুসে প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীগণের মতে ইহা গৌতম বুদ্ধের জন্মের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। যদিও এ যুগের বৌদ্ধশিল্পে ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের মূর্তি রূপায়িত তথাপি তাহারা মনুষ্যাকৃতি বিশিষ্ট। তাহাদের মধ্যে কোনপ্রকার পৌরাণিক লক্ষণ প্রকাশ দেখা যায় না। সাঁচী ও ভারুতেও উপরোক্ত গজলক্ষ্মীর বহুল প্রচলন দেখা যায়। বুদ্ধগয়ার শিল্পে ভারুত হইতে অধিকতর আড়ষ্টতাবিমুক্ত ও লাস্যপূর্ণ হওয়ার জন্য শ্রেয়তর।

২নং সাঁচীস্তূপের বেদীকাগাত্রে খোদিত শিল্প যদিও এ যুগের তথাপি সাঁচী-শিল্পের অধিকতর বিকাশ (১ ও ২নং স্তূপের তোরণগাত্রস্থ শিল্পপ্রকাশ) অন্ধ্র-যুগের, সেকারণ উক্ত কাহিনী পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইবে। পাটনায় আবিষ্কৃত নন্দী ও বর্ধন নামক যক্ষমূর্তিদ্বয় এ যুগের শিল্পনিদর্শন হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

উড়িষ্যার উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি নামক পর্বতগাত্রে খোদিত হাতী, অনন্ত, রাণী ও গণেশগুম্ফা প্রভৃতি জৈনরাজ খরবেলের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত। রাণী ও গণেশ-গুম্ফার খোদিত ভাস্কর্যনিদর্শনগুলি জৈনকাহিনীগুলিকে একাধারে প্রস্তরগাত্রে সবল ও সচলরূপ দান করিয়াছে। এই স্থানের সবল শিল্পপ্রকাশের ভাব উড়িষ্যা-শিল্পের একান্ত নিজস্বতা। আজিও উক্ত জৈন কাহিনীগুলির বিষয়বস্তুর সঠিক বিবরণ জানা যায় না। কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে উক্ত শিল্পের একটি বিশিষ্টাংশের অনুকরণ সযত্নে রক্ষিত আছে।

যদিও কোনপ্রকার চিত্রশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায় না তথাপি তদানীন্তন জাতক (উম্মগ), বিনয়পিটক, মহাবংশ ও পাতঞ্জলী প্রভৃতি গ্রন্থে চিত্রিত রাজগৃহের ও চিত্র-শিল্পের নানাপ্রকার উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে, এ যুগেও চিত্রশিল্পের বহুল প্রচলন ছিল। (ক্রমশঃ)

সাহেব বিবির দেশে

নরেন্দ্র দেব

(সোয়েডেনের কথা)

পেন্‌শানেটে পৌঁছতে রাত্রি ন'টা হ'ল। স্টেশান থেকে বেশ কিছুটা দূরে। ট্যাক্সী ভাড়া নিলে সাড়ে তিন ক্রোন। সোয়েডেনের টাকাকেও ডেনমার্কের মতো ক্রোন বলে। একই তো রাজ্য ছিল একদিন। তবে ড্যানিশ ক্রোনের চেয়ে সুইডিশ ক্রোনের দাম বেশী। এক শিলিং পাঁচ পেন্স। একটি দিনেমার ক্রোনের দাম মাত্র এক শিলিঙ পেনশানেটটির নাম 'ফ্রেডরিকশোভেন পেনশানেট'। বড় রাস্তার উপর ভাল একখানি বাড়ি। একজন ইতালীয় যুবক ও তাঁর সুইডিশ পত্নী এই প্রতিষ্ঠানের মালিক। পরে জানা গিয়েছিল, স্বত্বাধিকারী এই সুইডিশ মেয়েটিই। ইতালীয় তরুণটি কোনও ভাগ্যান্বেষী ভাগ্যবান। এসেছিলেন একদিন এ বাড়ির রাঁধুনী হ'য়ে। কিন্তু নিজ গুণে মনিবানীর মনোজয় ক'রে কালক্রমে তাঁর হৃদয় ও বিষয়েরও মালিক হ'য়ে উঠেছেন। সদাহাস্যময় সুরসিক প্রিয়দর্শন যুবক। কোঁকড়া কালো মাথার চুল, ভ্রমর কালো দুটি চোখের তারা। ছোকরাটিকে কন্দর্পকান্তি বলা যেতে পারে। অপরিমিত প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর। চমৎকার ইংরাজী বলেন। নাম তাঁর ফ্রেডরিক। টেলিফোনে খবর পেয়ে এ'রা আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। বহুদিন পরে দূর বিদেশ থেকে কোনও পরমাত্মীয় ঘরে ফিরে এলে তাকে যেমন পরিবারের সকলে মিলে মহাসমাদরে গ্রহণ করে তেমনি ক'রেই এ'রা আমাদের আনন্দমুখর-অভ্যর্থনা জানালেন।

একটু ইতস্ততঃ করে ট্রেন লেটের কৈফিয়ৎ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—ডিনার টাইম তো উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আপনাদের এখানে বোধ হয় এখন আর কিছুই খেতে পাওয়া যাবে না? ফ্রেডরিক বললেন—নিশ্চয় পাওয়া যাবে। ফ্রেডরিক তার কোনও অতিথিকে অনাহারে থাকতে দেবে না। অর্ধ রাত্রেও এখানে ডিনার পাবেন। বলুন আপনারা কি খাবেন? পিল্লাউ? কুতুলেৎ? আমি সব রকম ইণ্ডিয়ান ডিশ রাঁধতে জানি। পনেরো মিনিটের মধ্যেই তৈরি করে এনে দেবো। একেবারে টাটকা গরম!' হোটেলকর্ত্রী হেসে বললেন 'ফ্রেডরিকের রান্না এত সুস্বাদু যে রসনা তার আস্বাদ কোনওদিনই ভুলতে পারে না। শ্রীমতী বললেন, ও দুটো কাল মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য অর্ডার দেওয়া রইল। আজ রাত হয়ে গেছে। তিনটে রাইস কারী পেলেই খুশী হবো।

ফ্রেডরিক 'ও-কে'! বলে চলে যাবার আগে বলে গেল 'আপনারা হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেশ হ'য়ে এক এক গ্লাশ ঠাণ্ডা সর্বৎ খান। পিপাসা পেয়েছে নিশ্চয়! আমার স্ত্রী ভারি চমৎকার 'ইণ্ডিয়ান ড্রিঙ্কস্' তৈরি করতে পারেন কাশ্মীরী সর্বৎ! চেখে তারিফ করতে হবে।

বেরিয়ে গেলেন ওঁরা দু'জনেই। বড় ভাল লাগলো দূর বিদেশে এই রকম আত্মীয়বৎ এক দম্পতিকে। বাড়ির সবচেয়ে বড় ঘরখানা ছেড়ে দিয়েছেন দেখলাম আমাদের জন্য। দ্বিতলের উপর রাস্তার দিকে সুসজ্জিত এই শয়ন ঘর। সামনের দালানে বৈঠকের জন্য ড্রয়িংরুম সাজানো। সেখানে ইতালীয় পুতুল, পোর্সিলেন ও ছবিই বেশি। দেখে মনে হল এগুলি সম্ভবতঃ তাঁর সুইডিশ প্রিয়াকে ফ্রেডরিকের প্রীতি উপহার।

সর্বৎ এল। সর্বৎ কিন্তু সেটি নয়। সুশীতল লেমন স্কোয়াশ। ফ্রেডরিক-পত্নীকে হেসে বললাম 'আপনি আমাদের ফাঁকি দিলেন কিন্তু! আপনার স্বামীর মুখে প্রশংসা শুনে আপনার হাতের তৈরি ভারতীয় সর্বতের আস্বাদ পাবার জন্য তৃষিত চাতকের মতো অপেক্ষা করছিলাম!' তিনি একটু লজ্জিত হয়ে বললেন 'আমার স্বামীর কথা আপনারা একটুও বিশ্বাস করবেন না। ও আমার কথা সকলের কাছেই বেজায় বাড়িয়ে বলে। ওর ধারণায় বা কল্পনায় যে আমি, সে সত্যকার আমির চেয়ে অনেক সুন্দর আর সর্বগুণান্বিত!'

আমার পত্নী বললেন, 'আপনার সৌভাগ্যে আমার ঈর্ষা হচ্ছে! আমার স্বামী কিন্তু কারুর কাছেই আমার প্রশংসা করেন না।
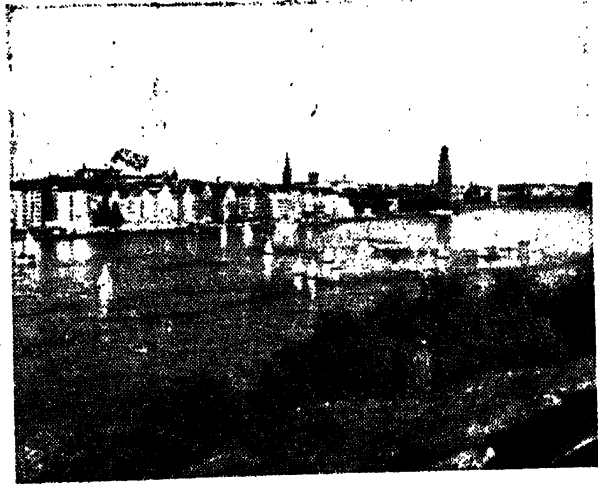
ম্যালার্ন লেকের তীরে স্টকহোম শহর

ও'র ধারণার 'আমি' সত্যকার 'আমি'র চেয়ে একটুও বড় নয়।'

আমি প্রতিবাদ করে বললাম, 'উনি যে আমার চেয়ে অনেক বড় কবি একথা আমি সকলের কাছে অকপটে স্বীকার করি।'

শ্রীমতী ফ্রেডরিক বললেন, 'আপনার ধারণার সত্যে ও বাস্তব সত্যে এখানে তফাৎ কিছু নাও থাকতে পারে তো?'

দুটি মিহি গলায় খুব একটা হাসির রোল উঠলো। আমার কণ্ঠের খাদে সুর হয়ত তার মধ্যে বেসুরোর মতই বাজলো।

শ্রীমতী ফ্রেডরিক বললেন, 'সর্বৎই ক'রে আনতে গেছলাম, কিন্তু গিয়ে দেখি ভাঁড়ারে তার সরঞ্জাম নেই। দোকানও সব এত রাত্রে বন্ধ। কাজেই আপনাদের আজ আর ভারতীয় সর্বতে পরিতৃপ্ত করতে পারলাম না। ক্ষমা করবেন। আর একদিন নিশ্চয় খাওয়াবো।'

জিজ্ঞাসা করলাম—'আপনি বুঝি ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন?' তিনি হেসে বললেন—'না, আমার একটি ভারতীয় বন্ধু আছেন। তিনিই আমাকে শিখিয়েছেন। আমাদের এখানেই দীর্ঘকাল ছিলেন। সম্প্রতি অন্য বাসা নিয়েছেন। বিবাহ করবেন কিনা। তিনিও বাঙালী। ফ্রেডরিক তো তাঁর কাছেই সব ইণ্ডিয়ান ডিশ রাঁধতে শিখেছে। আপনারা যদি তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চান আমি টেলিফোনে খবর দিয়ে তাঁকে এখানে আনাতে পারি। অনেকদিন পরে দেশের লোক দেখে তিনি খুব খুশী হবেন নিশ্চয়। বুঝলাম সেই ভারতীয় অতিথিটির উপর ভদ্রমহিলার বেশ একটু প্রভাব আছে। থাকা কিছু বিচিত্র নয়। কারণ ইনি বিদুষী এবং তরুণী। তার উপর মিষ্টহাসিনী ও মিষ্টভাষিণী। মানুষের হৃদয় জয় করবার সব ক'টি আয়ুধই এ'র সৃষ্টিকর্তা এ'কে দিয়েছেন।

খাবার এল। কিন্তু পনেরো মিনিটের মধ্যে নয়। আধঘণ্টা পরে। আর রাইস কারি নয়। সেই 'পিল্লাউ'-কুতুলেৎ'! 'পিল্লাউ' বা পোলাও দেখা গেল হলুদ রংয়ের শক্ত ভাত মাত্র! ঘি-মাখনের নাম গন্ধ নেই। এলাচ লবঙ্গ দারুচিনি তেজপাতা কিসমিস প্রভৃতি সকল আতিশয্য বর্জিত! আর 'কুতুলেৎ' হল 'ফাউল কাটলেট!' বললেন—'আমার বন্ধু ব্যানার্জির কাছে শুনেছি এটা তোমাদের প্রিয় খাদ্য!' কথাটা মিথ্যা নয়। ক্ষুধার মুখে ভালই লাগলো।

সব গুছিয়ে নিয়ে শুতে রাত্রি এগারোটা বেজে গেল। পরদিন সকালে প্রাতরাশের পর স্টকহোম শহরটি দেখতে বেরুলাম। এবার এক্সকার্শান বাসে নয়, নিজেরাই শহরের ম্যাপ নিয়ে পায়দালে যতটা ঘুরতে পারি। কারণ আমরা চলেছি উত্তর মেরু প্রদেশে 'নিশীথরাতের সূর্য' দেখতে। সেখান থেকে নরওয়ের রাজধানী ওস্‌লো যাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নার্ভিক থেকে 'ওস্‌লো' যাবার সরাসরি ট্রেন নেই। স্টকহোম থেকে 'ওস্‌লো' যাবার সরাসরি ট্রেন আছে। নার্ভিক থেকে যেতে হ'লে ট্রেন, স্টীমার,

স্টকহোম—টাউন হল

বাস, নৌকো, অনেক কিছু যানবাহনের সাহায্যে ঘুরে ঘুরে আসতে হবে। অগত্যা 'নিশীথরাতের সূর্য' সন্দর্শনের পর এখানেই যখন ফিরতে হবে তখন সেই সময় ভাল ক'রে সোয়েডেনে বেড়িয়ে তারপর 'ওস্‌লো' যাবো স্থির হয়েছিল।

সোয়েডেনে নাকি ভারতীয়েরা আগে কদাচ কখনও পদার্পণ করতেন। কিছুদিন থেকে এখানে তাঁদের আসা-যাওয়া একটু বেড়েছে। সুইডিশরা বড় ভদ্র। বিদেশী অতিথিদের তাঁরা কত যে যত্ন করেন, সে পরিচয় তো আমরা ট্রেন থেকেই পেয়েছি। এ'দের প্রকৃতি কেমন যেন একটু সলজ্জ ধরণের। এ'রা য়ুরোপের ঠিক চৌমাথার মানুষ নন বলেই বোধ করি তেমন চৌকোষ চটপটে হ'য়ে ওঠেননি। উত্তরাখণ্ডের শান্ত সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মতোই এদেশের মানুষগুলিও শান্ত সুন্দর। বিশাল মালার হ্রদের তীরে বাল্টিক সমুদ্রের এক বিস্তৃত বাহুর উপর প্রতিষ্ঠিত এই দ্বীপ-সংকুল সুন্দর শহরটি। স্টকহোম দেখে খুশী হওয়া গেল। যেমনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তেমনি সুসজ্জিত। বিশেষ করে এই শহরের পরিবেশটি আমাদের কাছে ভারি মনোরম মনে হল। সাগর বাহুর আলিঙ্গনের মধ্যে গিরি শৈলাশ্রিত দ্বীপ-মালার আবেষ্টনে এই সুদৃশ্য নগরটি গড়ে উঠেছে। দেশবাসীর সুকুমার শিল্প রুচি বোধের সঙ্গে তাঁদের হাতে বিজ্ঞানের ঐন্দ্রজালিক যাদুদণ্ডটি থাকায় তাঁরা স্টক-হোমকে একেবারে 'সুইটহোম' করে তুলেছেন।

প্রকৃতির হরিৎ শিবিরে যখন বসন্তের স্বর্ণ পতাকা প্রায় অবনমিত হয়ে এসেছে আমরা সেই মাধবী প্রদোষে সেখানে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। তখনও কিন্তু সে কি আশ্চর্য রূপ সোয়েডেনের! দুটি চোখ ভরে উঠেছিল সে সৌন্দর্যের আনন্দ পরশে। সারাদিন কাল ট্রেনে দু' পাশের যে অপূর্ব দৃশ্য দেখতে দেখতে এসেছি, জানি না পৃথিবীর আর কোথাও প্রকৃতির এত বেশী ঐশ্বর্যের অফুরন্ত প্রকাশ দেখতে পাবো কিনা!

লণ্ডনস্থ ভারতের হাই কমিশনার শ্রীযুক্ত মেনন আমাদের 'ইন্দো-সুইডিশ বান্ধব সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক শ্রীযুক্ত স্ট্রমগ্রেন সাহেবের পরিচয়পত্র দিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার এবং সোয়েডেনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত আর কে নেহরুর সঙ্গেও দেখা করবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। গেলাম সকালবেলা সেদিন নেহরুজীর কাছেই আগে। নগরের শোভা উপভোগ করতে করতে এবং ইণ্ডিয়ান লিগেশানের ঠিকানাটা হাতে নিয়ে পথিকদের জিজ্ঞাসা করতে করতে ৪৭নং 'স্ট্র্যাণ্ড ভেগেন' রোডে গিয়ে হাজির হওয়া গেল। বেলা তখন দশটা বেজে গেছে। এ অঞ্চলটা স্টকহোমের একটা প্রসিদ্ধ অঞ্চল। প্রাসাদ তুল্য একটি বাড়িতে এই ভারতীয় লিগেশানের অফিস। সেখানে গিয়ে শোনা গেল এই ভারতীয় বাদশাহটি দরিদ্র ভারতবাসীদের কষ্টার্জিত অর্থে এখানে দস্তুর মতো নবাবী করেন। স্টকহোমের সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বাপেক্ষা ব্যয় সাধ্য যে যাত্রী নিবাস সেই প্রসিদ্ধ গ্র্যাণ্ড-

রাজপ্রাসাদ—স্টকহোম
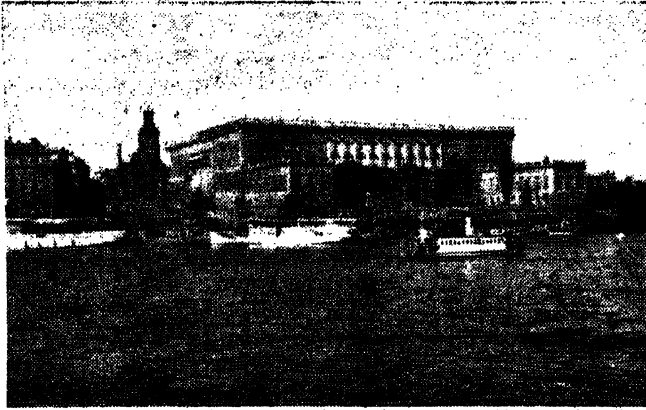
হোটেলের একটি ষোলো কামরা স্যুট নিয়ে তিনি মহারাজাধিরাজের মর্যাদায় মণ্ডিত হ'য়ে অধিষ্ঠিত। কোনো কোনোদিন অফিসে আসেন বেলা ১২টার পর। সবদিন পেরে ওঠেন না। এলে আধঘণ্টার বেশী থাকেন না। তাঁর সংগে দেখা করতে হলে গ্র্যান্ড হোটেলে যেতে হবে।

এ সব শুনে মেজাজ গেল চটে। যে কর্মচারীটি আমাদের অভ্যর্থনা করতে এসেছিলেন তাঁর হাতে আমাদের একখানা কার্ড বার ক'রে দিয়ে বলে এলাম আপনাদের বড় হুজুরকে এটি দেবেন আর আমাদের নাম করে বলবেন তাঁর কর্মস্থলের অফিসিয়াল ঠিকানা এইটে। আমরা তাঁকে এইখানেই পাবো আশা করেছিলাম। অফিস টাইমও বেলা দশটা থেকে। বারোটা থেকে নয়। গ্র্যান্ড হোটেলে তাঁর প্রাইভেট কোয়ার্টার। আমরা তাঁর আত্মীয় নই এবং তাঁর ফ্যামিলিকেও 'মিট' করতে আসিনি। সুতরাং সেখানে গিয়ে তাঁর সংগে দেখা করাটা রীতিসম্মত বলে মনে করি না। আমরা আবার কাল বেলা চারটের সময় আসবো। সে সময় তাঁকে অফিসেই দেখতে পেলে সুখী হবো। তিনি বোধ হয় ভুলে গেছেন যে, রিপাবলিক অফ ইণ্ডিয়ার তিনি একজন মোটা বেতনভোগী সরকারী কর্মচারী মাত্র, তার বেশী কিছু নয়।

উঠে বেরিয়ে আসছিলাম। দিলেন না তাঁরা আসতে। অফিসের চার পাঁচজন কর্মচারী আমাদের ভিজিটারর্স রুম থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে সুসজ্জিত ও প্রশস্ত রিসেপশান রুমে এনে বসালেন। বললেন—লিগেশানের অধিকর্তার বিরুদ্ধে এ রকম কঠিন মন্তব্য ইতিপূর্বে আর কোনও ভিজিটার করেননি। গ্র্যান্ড হোটেলে গিয়ে দেখা করবার অনুরোধ পেয়ে এ পর্যন্ত প্রায় সকলেই খুশি হয়েছেন। আপনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি তাঁর প্রাইভেট কোয়ার্টারে গিয়ে দেখা করতে বলায় আপত্তি করলেন। নিশ্চয়ই, দেশবাসীর সংগে দেখা করার স্থান তাঁর এইখানেই, এতো অতি সত্য। তবে একটা কথা আপনাকে বলা উচিত মনে করি যে, আপনি নেহরুজী সম্বন্ধে বড় ভুল ধারণা নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি অতি ভদ্র। পূর্বাহ্নে এনগেজমেণ্ট করলে তিনি সকলের সংগেই দেখা করেন।

কথায় কথায় আরও অনেক কথাই হল। যে চার পাঁচজন কর্মচারী ঘিরে দাঁড়িয়েছিলেন আমাদের, দুই চোখে তাঁদের বিস্ময় মিশ্রিত কৌতূহল। পরিচয় হল তাঁদের সকলের সংগে। দুটি তাঁদের মধ্যে পাঞ্জাবী ছেলে। শ্রীযুক্ত ও পি খান্না ও শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র নির্মল। এ'রা কিছুদিন থেকে সস্ত্রীক এখানে এসে রয়েছেন। আর একজন হ'লেন লিগেশানের সুইডিশ সাহেব কর্মচারী। কিন্তু দীর্ঘকাল নিয়ত ভারতীয় সহকর্মীদের সঙ্গ ও সাহচর্যের ফলে আপন স্বভাব ভ্রষ্ট হ'য়ে তিনি একেবারে ভারতীয় বনে গিয়েছেন। বড় ভাল মানুষ লোকটি। হিন্দী বাঙলা কিছু কিছু বোঝেন, কিন্তু বলতে পারেন না ভাল। আর একটি প্রিয়-দর্শন ছেলের সংগে আলাপ হল। ইনি শ্রীমান বিমল মিত্র। কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে বাড়ি। বিবাহ করেননি। উদার মন ও সংস্বভাবের ছেলে।

তাঁরা বললেন, আপনাদের সব কথা হয়ত আমরা তাঁকে বলতে পারবো না, কেননা তিনি হলেন এখানে আমাদের প্রধান। তবে এটা ঠিক, আমরা তাকে এমন কিছু বলবো যাতে সর্বকার্য ফেলে তিনি কাল বেলা চারটেয় এখানে এসে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করেন।' বললাম, কাল আমরা আসতেও পারি, নাও আসতে পারি। আপনাদের তাঁকে বিশেষ কিছু বলতে হবে না, শুধু বলবেন

নৃপতি দ্বাদশ কার্লের প্রতিমূর্তি—স্টকহোম

যে লণ্ডনের হাই-কমিশনার মেনন সাহেবের অনুরোধেই আমরা তাঁর সংগে দেখা করতে এসেছিলাম, কেবলমাত্র শিষ্টাচার ও সৌজন্যতা বশতঃ। নইলে তাঁর সংগে পরিচিত হবার আমাদের বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই। কারণ আমরা ব্যবসায়ী নই এবং রাজনীতিজ্ঞও নই। কোনও রকম ব্যক্তিগত বা জাতিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে এখানে আসিনি।'

ওঁরা আমাদের তিনজনকে চা কোকো আর অরেঞ্জ খাওয়ালেন। ভারতীয় এলাচ-লবঙ্গ সুপারি মশলাও খাওয়ালেন এবং আমাদের কাছ থেকেও নিয়ে খেলেন। শ্রীযুক্ত ওমপ্রকাশ একটু কাব্যরসিক। তিনি প্রায় আবুহোসেনের মতই বলে বসলেন, আজ রাত্রে আপনারা আমাদের ওখানেই নৈশ ভোজন করবেন। পাঞ্জাবী খাওয়া বাঙলা খাওয়ার চেয়ে খুব খারাপ নয়। বাড়িতে একজন দূত পাঠিয়ে দিলেন, তিনজন ভারতীয় অতিথি নিয়ে তিনি রাত্রে খাবেন। ছাড়লেন না কোন মতেই। খান্না ও নির্মল-ভাই এক সংগে একটি বাসা নিয়ে আছেন বটে, কিন্তু বাড়িটিই এক, আর সবই আলাদা। বিমল অবিবাহিত। সে পৃথক কোয়ার্টারে থাকে। আর সাহেব কর্মচারীটি স্টকহোমের উপকণ্ঠে বাস করেন, ঠিক শহরের মধ্যে থাকেন না। ইলেকট্রিক ট্রেনে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করেন।

লিগেশান থেকে বেরিয়ে লাঞ্চের এখনও যথেষ্ট দেরী আছে দেখে আমরা গেলাম 'ইণ্ডোসুইডিশ ফ্রেণ্ডস সোসাইটির' প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত স্ট্রমগ্রেন সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। ইণ্ডিয়ান লিগেশানের ছেলেরা এঁর ঠিকানাটা আমাদের এমন ক'রে কাগজে এঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, আমাদের বেশী ঘুরতে হল না। সহজেই তাঁর ঠিকানা আবিষ্কার করা গেল। রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করতেই শ্রীযুক্ত স্ট্রমগ্রেন সাহেব স্বয়ং দরজা খুলে আমাদের ত্রিমূর্তিকে দেখে বিস্মিত হ'লেন। কিছু প্রশ্ন করবার আগেই মেনন সাহেবের পরিচয়পত্র পেশ করা গেল। মহাসমাদরে তিনি আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। বার বার বলতে লাগলেন একটু খবর দিতে হয় আগে। কাল রাত্রে এসেছেন বলছেন, কোথায় উঠেছেন? স্টকহোমে এখন খুব 'রাশ'। কোনও কষ্ট বা অসুবিধা হ'চ্ছে না তো সেখানে?' ধন্যবাদ দিয়ে বললাম—না, আমরা বেশ আরামে আছি।

ফ্রেডারিক সাহেব সস্ত্রীক আমাদের খুব যত্ন করছেন।

হ্যাঁ, যথার্থই ভারতবন্ধু বটে! আমাদের ঘরে একখানা ভারতবর্ষের মানচিত্র নেই, কিন্তু এই সুদূর সোয়েডেন—য়ুরোপের উত্তরাখণ্ডের এক গোরা অধিবাসীর ঘরে ভারতের বিরাট এক মানচিত্র ঝুলচে। শুধু কি তাই? ঘরের চারিদিকের দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু

'কুজ্ঝটিকা' ও 'সূর্যোপাসক'

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি ভারতীয় চিন্তানায়ক এবং রাষ্ট্র ও ধর্মগুরুগণের সুন্দর সুন্দর চিত্র বিলম্বিত। হিমালয় পর্বতের দৃশ্য, নর্মদা জলপ্রপাত, জব্বলপুরের মর্মর শৈলের ছবি, কাবেরীর বাঁধ ইত্যাদির আলোকচিত্র রয়েছে। স্ট্রমগ্রেন বললেন, সুইডেন আমার গর্ভধারিণী এবং ভারতবর্ষ আমার স্তন্য-দায়িনী ধাত্রীমাতা। এই ফটোগ্রাফগুলি তাঁর নিজের হাতের তোলা। তিনি দীর্ঘকাল মান্দ্রাজে ছিলেন—জলশক্তি থেকে বিদ্যুৎ সঞ্চয়ের কাজে তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি একজন বিদ্যুৎবিশারদ ইঞ্জিনীয়ার। ভারতে এসে ভারতবর্ষকে তিনি ভালবেসে ফেলেছেন। আধাবয়সী মানুষটি, কিন্তু যৌবনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা এতটুকুও ম্লান হয়নি। দেখতেও সুপুরুষ। ঘরের মধ্যে যে সব আসবাবপত্র রয়েছে তা' অধিকাংশই ভারতীয়। হাতীর দাঁত, চন্দনকাঠ, আবলুশ, মেহগিনী মায় হরিণের শিং, নারিকেল, সুপারি ও পেপার-মেশ্যিয়ে তৈরী নানা ভারতীয় শিল্প সামগ্রী সংগৃহীত রয়েছে। এ ঘরে ঢুকে হঠাৎ মনে হ'ল যেন কোন এক ভারতবাসীর বৈঠকখানায় প্রবেশ করেছি। ঠিক এমনি ভাল লেগেছিল আমাদের, লণ্ডনে শ্রীমতী এলা রীডের ড্রয়িংরুমে ঢুকে। তিনি সেখানে এমনই একটি স্নিগ্ধ সুন্দর শান্তি-নিকেতনী পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে রেখেছেন। অবশ্য শ্রীমতী এলা বাঙলাদেশের মেয়ে। তাঁর পক্ষে এমনটি করা আশ্চর্য কিছু নয়। কিন্তু এই স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে একজন ইয়োরোপীয়ের ঘরে এ ব্যাপার অপ্রত্যাশিত। বেশ একটু আনন্দ বোধ হল।

গল্প করতে করতে বেলা বাড়লো। এই সুইডিশ ভদ্রলোক কিছুকাল ভারতে থেকে ভারত সম্বন্ধে কত জ্ঞানই সঞ্চয় ক'রে এসেছেন। আমরা সে দেশে জন্মে এবং সারাজীবন সেখানে কাটিয়েও ভারত সম্বন্ধে অনেক কথাই জানি না আজও। লজ্জানুভব হচ্ছিল। এই মাত্র ইণ্ডিয়ান লিগেশান থেকে আসছি শুনে তিনি বললেন, তাহ'লে স্টকহোমের কিছুই এখনো দেখা হয়নি বলুন? আমার সংগে আজ আপনারা লাঞ্চ খাবেন, তারপর আপনাদের আমি শহর ঘুরিয়ে আনবো। আজ আপনাদের সম্মানের জন্য আমার অফিসের ছুটি!

নিজের মোটরে আমাদের তুলে নিয়ে গিয়ে একটি সুন্দর রেস্তোঁরায় তিনজনকে বসালেন। বেছে বেছে ভাল সুইডিশ খাদ্য বা ভারতীয় রসনায় সুস্বাদু লাগতে পারে তাই অর্ডার দিলেন। খেতে খেতে গল্প হ'চ্ছিল। শ্রীযুক্ত আর কে নেহরুর কথা উঠলো। মিঃ স্ট্রমগ্রেন তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। বললেন, তিনি আমার বিশেষ বন্ধু। ওই অফিস পালানো রোগ ছাড়া আর কোনও দোষ নেই ভদ্রলোকের। একটু আর্টিস্টিক টেম্পারামেন্টের মানুষ কিনা, অফিশিয়াল রুটিনের বাঁধাবাঁধির মধ্যে হাঁপিয়ে ওঠেন। 'হি ইজ এ প্রিন্স এ্যামঙ্গ ইণ্ডিয়ান!' এই তো সেদিন সপরিবারে নরওয়ে থেকে 'মিড্‌নাইট সান' দেখে ফিরেছেন। স্পেশ্যাল ট্রেনে গেছলেন। আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম।' আমরাও মিডনাইট সান

দেখতে যাবো শুনে তিনি খুব উৎসাহিত হয়ে উঠে আমাদের যাবার সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবেন বললেন।

খেয়ে উঠে আমরা স্ট্রমগ্রেন সাহেবের গাড়ীতেই তাঁর সংগে শহর দেখতে বেরুলাম। গাড়ীতে উঠে তাঁকে বললাম—আমরা একবার সুইডিশ পি-ই-এন সেণ্টারের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ কার্ল বোয়েকর্ম্যানের সঙ্গে দেখা করতে চাই। স্ট্রমগ্রেন বললেন—'চলুন নিয়ে যাচ্ছি। আমার সংগে আলাপ আছে। কাছেই তাঁর অফিস। কিন্তু তাঁর সংগে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ক'রে রেখেছেন কি? নইলে তো দেখা হবে না। তিনি ভারি কর্মব্যস্ত মানুষ। আমার মতো 'ইন্‌ফরম্যাল্' নন। স্ট্রমগ্রেন আমাদের নিয়ে নিজের অফিসে ফিরলেন। ফোন তুলে নিয়ে ডাঃ বোয়েকর্-ম্যানের সেক্রেটারীকে ডাকলেন। তাঁর এনগেজমেণ্ট বইটা দেখে জানাতে বললেন, তিনি এ সময় ফ্রী আছেন কিনা। ভারতবর্ষ থেকে একটি কবি দম্পতী এসেছেন। তাঁরা পেন ক্লাবের সদস্য। তিনি কি এখন একবার তাঁদের সংগে দেখা করতে পারবেন? সেক্রেটারী ডাঃ বোয়েকর্ম্যানকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানালেন—আসতে পারেন।

ডাঃ কার্ল বোয়েকর্ম্যান মানুষটিকে দেখে এবং তাঁর সংগে আলাপ ক'রে আমাদের কেবলই শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু মহাশয়কে মনে পড়ছিল। যদিও চেহারায় উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যই। বোয়েকর্ম্যান বিরাট দেহ মানুষ। প্রকৃতিতে বাইরে থেকে মানুষটি বেশ গম্ভীর। খুব রাসভারি বলে মনে হয়। কিন্তু আলাপ করে ভারি খুশী ও তৃপ্ত হলেম। যেমন গভীর পণ্ডিত তেমনি অনবদ্য রসিক। আগে থেকে এন্‌গেজমেণ্ট ক'রে না যাওয়া সত্ত্বেও অনেকক্ষণ আমাদের সংগে কথা বললেন। কাল ও'র সংগে লাঞ্চ খাবার নিমন্ত্রণ করলেন। বেল দিয়ে সেক্রেটারীকে ডেকে বলে দিলেন এ'দের তুমি নরওয়ে যাবার সব ব্যবস্থা করে দাও। স্ট্রমগ্রেন সাহেব স্বয়ং সে ভার নিয়েছেন বলাতে পেনক্লাবের পক্ষ থেকে তিনি স্ট্রমগ্রেন সাহেবকে ধন্যবাদ জানালেন। নার্ভিক থেকে ফিরে এস ওস্‌লো যাবার আগে তাঁর সংগে যেন দেখা করি বললেন। এডিনবরার এবারকার ইণ্টারন্যাশনাল পেন কংগ্রেসে যেতে পারবেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন। বললেন, সোয়েডেন থেকে অনেক লেখকই যাবেন। তাদের সংগে যদি একদিন 'মিট' করতে চান ব্যবস্থা করতে পারি। তবে অধিকাংশই এ সময় শহরে নেই।' আমাদের অভিপ্রায় তাঁকে পরে জানাবো বলে উঠে এলাম।

এরপর স্ট্রমগ্রেন সাহেবের মোটরে স্টক-হোম চষে বেড়ানো হল। প্রাচীন ও নবীন সুইডিশ শিক্ষা ও সংস্কৃতির রূপ কি? তাদের পুরানো যুগের কাঠের বাড়ি আর হালের পাকা বাড়ি। বর্তমান স্থাপত্য কলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কোনগুলি? এগুলি সবই সুইডিশ স্থপতিদের মূলপরিকল্পনা। প্রাচীন বা আধুনিক কোনও যুগের কোন স্থাপত্যকলার অনুকরণ বা অনুসরণ নয়। বরং সুইডিশদের এই স্থাপত্যকলাই অধুনা জগতের বহু দেশে অনুসৃত হ'চ্ছে। তাই স্ট্রমগ্রেনের সে কি গর্ব! সমুদ্র স্নানের পক্ষে কোন সাগর সৈকত সবচেয়ে ভাল, কোন কোন পাহাড়ে বরফের উপর স্কী খেলা হয় এবং কোন্ কোন্ মাঠে কখন কি স্পোর্টস উপভোগ করা যায়। কোথায় কোন নিবিড় ঘন পাইন বনের মধ্যে বেশ নিরিবিলি নির্জনে চড়ুইভাতি করার আনন্দ পাওয়া যায়; বোটে করে এখানকার ক্যানেলের ভিতর দিয়ে কিছুদিন ঘুরে আসা স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে যতটা ভাল, মনের স্ফূর্তির দিক দিয়েও ততটা প্রয়োজনীয়। সোয়েডেনের সমাজ, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রতন্ত্র, সব কিছু বোঝাতে বোঝাতে চললেন তিনি। এদেশে রাজা থাকলেও প্রজারাই শাসনকার্য পরিচালনা করে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে এদেশের চাষবাসের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। ছোট্ট দেশ এই সোয়েডেন। লোকসংখ্যা মাত্র ৭০ লক্ষ! লণ্ডন বা নিউইয়র্কের মতো একটা শহরে এর চেয়ে বেশী লোক বাস করে! স্ট্রমগ্রেন সাহেব সোয়েডেনের প্রাচীন গৌরব সম্বন্ধে একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। এ'রা অকপট দেশ-প্রেমিক। মাতৃভূমির নিন্দা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করাটাকেও পাপ বলে মনে করেন।

স্ট্রমগ্রেন বলে চলেছেন—'মাত্র ত্রয়োদশ শতকে তো সোয়েডেন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। তার আগে আমরা তোমাদেরই মতো মন্দিরে দেবপূজা করতাম। সে একদিন ছিল যখন সোয়েডেনের রাজ্য পশ্চিমে নরওয়ে—পূবে ফিনল্যাণ্ড ও দক্ষিণ-পূবে রাশিয়ার কতক অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৯০৫ সাল পর্যন্ত একই রাজা নরওয়ে ও সোয়েডেন শাসন করতেন। সোয়েডেন এখন আর কৃষি প্রধান দেশ নয়। শিল্প বাণিজ্য প্রধান বলা যায়। নানাবিধ কাঠ, কাগজ, কাষ্ঠমণ্ড (উডপাল্‌প), লৌহপিণ্ড (আয়রণ ওর) উৎকৃষ্ট স্টীল বা ইস্পাত, জাহাজ ও জাহাজ

তৈরীর সরঞ্জাম, নানা যন্ত্রপাতি বিশেষ করে বৈদ্যুতিক কলকব্জা, সেফ্‌টি ম্যাচ এবং নোবেলের আবিষ্কৃত ডিনামাইটে সোয়েডেন পৃথিবীর রাজা।

থাক সোয়েডেন পৃথিবীর রাজা হয়ে।' নোবেলের নাম শুনে আমরা বললাম পৃথিবীর এক একদিকের এক এক বিষয়ের যিনি দিকপাল তাঁদের যে সুইডিশ এ্যাকাডেমি থেকে 'নোবেল প্রাইজ' দেওয়া হয় আমরা কি সেই এ্যাকাডেমি দেখতে যেতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ নিশ্চয় পারেন। কিন্তু আমি বলি কি নিতান্ত সাধারণ দর্শকের মতো না গিয়ে একটু ওঁদের আগে খবর দিয়ে ব্যবস্থা করে যাওয়া যাবে। 'নোবেল ল্যারিয়েট' টেগোরের দেশের কবি-দম্পতি অপরিচিতের মতো সুইডিশ এ্যাকাডেমী দেখে যাবেন এতে আমার অপরাধ হবে। অগত্যা নার্ভিক থেকে ফিরে এসে যাওয়া হবে স্থির হল।

য়ুরোপের মানুষগুলির একটা কেমন বদ্‌-অভ্যাস আছে। ওরা সব কিছুই তুলনা করে বলে। ব্রাশেলস ও কোপেনহেগেনে গিয়ে শুনলুম তাঁরা বলছেন নিজেদের—'ছোট প্যারিস।' আমস্টার্ডাম দাবী করছেন তিনি য়ুরোপের 'ভেনিস'! স্টকহোমের পরিচয় দিলেন স্ট্রমগ্রেন সাহেব 'ভেনিস অফ দি নর্থ!' বলে। প্রথম ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালীরাও এ দোষটা পেয়ে ছিল। স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষকে তারা 'গ্যারিক অফ বেঙ্গল' বলতেন। মাইকেল মধুসূদনের সঙ্গে 'মিলটনের' তুলনা শুনেছি। স্টকহোমের বিশেষত্ব হল এটি সাগরকূলে একটি দ্বীপময় নগর। সমুদ্র তার একাধিক প্রসারিত ভুজবেষ্টনে একে রমণীয় করে তুলেছে। 'ভেনিস' দেখিনি তখনও, সুতরাং সাদৃশ্য বুঝলাম না। স্টকহোমের 'টাউনহল' দর্শনীয় বটে। স্থাপত্যকলা এবং শিল্পকলা উভয় দিক থেকেই এটি সোয়েডেনের একটি গর্বের ধন। এর সাগর ভূধর সংযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশটিও চমৎকার। আকারে খুব বড় নয় বটে, কিন্তু বিরাট এর পরিকল্পনা! সোয়েডেনের রাজপ্রাসাদ দেখলাম। বিপুলাকারের মধ্যেই তার যা কিছু রাজকীয়তা। বিশেষ কোনও উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য শিল্প, কলাকারু বা বিচিত্র অলংকরণের বাহুল্য নেই, কিন্তু গঠন পারিপাট্যে একটা সুন্দর সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য থাকায় এই সুবৃহৎ ইস্টকস্তূপের মধ্যেও লক্ষণীয় রাজশ্রী ফুটে উঠেছে। দুটি রাজপ্রতিমূর্তির দিকেও তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। একজন হলেন নৃপতি দ্বাদশ কার্ল। রাজপ্রাসাদের সামনেই মুক্ত কৃপাণ হস্তে কি যেন নির্দেশ করছেন। আর একটি হল অশ্বারোহণে নৃপতি গুস্তাভ—শহরপ্রান্তে একটি সুদৃশ্য পার্কের মধ্যে স্থাপিত।

স্থাপত্যের ন্যায় ভাস্কর্য কলাতেও সোয়েডেন যে কত বেশী অগ্রসর তার পরিচয় পাওয়া গেল এই প্রতিমূর্তিগুলি থেকে। আরও দুটি তিনটি মূর্তির উল্লেখ করতে চাই এখানে। শিল্পী লিন্ডবার্গের পরিকল্পিত 'কুজ্ঝটিকা' এবং শিল্পী কার্ল মাইলসের পরিকল্পিত 'সূর্যোপাসক' মূর্তি দুটি স্টকহোমের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে মনে হল। স্ট্রমগ্রেন বললেন, এই শক্তিশালী অমিত প্রতিভাধর ভাস্কর কার্ল মাইলসের পরিকল্পিত একটি সুন্দর ফোয়ারা আছে হ্যামস্টাডে। সেটির নাম 'য়ুরোপ এণ্ড দি বুল'। আপনারা 'মিডনাইট সান' দেখে ফিরে এলে সেখানে নিয়ে যাবো। এখানে অনেক কিছুই দেখবার আছে, কিন্তু আর দেরী করবেন না। নইলে 'মিডনাইট সান' দেখতে পাবেন না, স্টকহোম পালাবে না, কিন্তু ওটি আর কয়েকদিনের মধ্যেই অদৃশ্য হবেন। আমি কালই বিকেলের গাড়ীতে আপনাদের যাবার সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি! কেমন? আমরা বললাম—'আর একটা দিন বিশ্রাম করতে চাই। পরশু যাবো। (ক্রমশ)

সুয়েজ খালের কথা

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

আমাদের এ পৃথিবীতে খালের অভাব নেই। তাদের গুরুত্বও কম নয়। কিন্তু অসাধারণ কিছু না ঘটলে সাধারণ মানুষ তাদের কথা সাধারণত মনে করে না। যেমন ভুলে যাচ্ছিল মানুষ সুয়েজ খালের কথা। একশ' মাইল দীর্ঘ এই জলপথ। সে-পথে নিত্য যাতায়াত করে বাণিজ্য জাহাজ। প্রতীচ্য থেকে পণ্য বহন করে আনে প্রাচ্যে। এতো নৈমিত্তিক ব্যাপার। সুতরাং সেই জলপথের কথা বিশেষ করে স্মরণ রাখার কোন কারণ নেই। কিন্তু সম্প্রতি সে কারণ দেখা দিয়েছে। সুয়েজ খাল আবার সাধারণ মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে। বিশ্বের শান্তি-প্রিয় জনসাধারণ উন্মুখ অধীর নেত্রে তাকিয়ে আছে সুয়েজ, সুদান, আর মিশরের দিকে। শঙ্কিত বক্ষে ভাবছে এখান থেকেই কি শুরু হবে তৃতীয় মহাসমর?

মধ্যপ্রাচ্যে আজ আগুন জ্বলছে। এতদিন যাদের চেপে রেখে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি করে যাচ্ছিল সুযোগ বুঝে তারা মাথা চাড়া দিচ্ছে। ইরাণে ঘায়েল হবার পর এবার ইংরেজ ঘা খাচ্ছে মিশরের কাছে। মিশর সোজা বলে দিয়েছে ইংরেজকে যে, সুয়েজ খাল এলাকা দখল করে থাকা 'ইউনাইটেড নেশনস চার্টার' বিরোধী। সুতরাং তোমাকে ঐ এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু ইংরেজ তাতে রাজী নয়। সে বলছেঃ খাল এলাকার যে সামরিক গুরুত্ব রয়েছে তাতে ঐ এলাকা মিশরের হাতে ছেড়ে দেওয়া সম্ভবপর নয়। সে যদি মধ্যপ্রাচ্য প্রতিরক্ষা সম্মেলনে যোগদান করে এবং জাতিপুঞ্জ পরিষদের বাহিনী যদি ঐ অঞ্চল রক্ষার ভার নেয় তবেই সে তাদের হাতে ঐ এলাকা ছেড়ে দেবে। অথচ মজা হচ্ছে এই, কায়রো বা আলেকজান্দ্রিয়া যেমন মিশরীয় অঞ্চল, খাল অঞ্চলও ঠিক তাই। সুতরাং ও অঞ্চল রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যে মিশরের তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। তা ছাড়া 'ইউনাইটেড নেশনস্ চার্টার' অনুযায়ী অন্য রাজ্যে সৈন্য মোতায়েন করার কোন অধিকার কোন দেশের নেই। কিন্তু ইংরেজের ছিল এককালে স্থল ও নৌ-শক্তি। সে ছিল পৃথিবীর প্রধান শক্তি। তাই পনের বছর আগে মিশরের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী নাহাশ পাশাকেই সে বাধ্য করতে পেরেছিল ইঙ্গ-মিশর চুক্তি করতে। চুক্তি করে নিজের কোলে ঝোলো আনা ঝোল টানতে। কিন্তু হাওয়া ঘুরে গেছে। সেই নাহাশ পাশাই আজ হুঙ্কার দিচ্ছে। মিশরের পররাষ্ট্র সচিব বলেছেন, যে কোন বিপদই আসুক না কেন, মিশর কিছুতেই তার ভূমিতে ইংরেজ সৈন্য থাকতে দেবে না। এ নিয়ে দু'পক্ষেরই তোড়জোড়ের অভাব নেই। এখানে সেখানে কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। প্রাণহানির সংবাদও পাওয়া যাচ্ছে। মিশরীয়দের সন্ত্রাসবাদমূলক কার্যপদ্ধতির খবর আসছে। অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে ইংরেজ নতুন নতুন সৈন্য, রণসম্ভার, যুদ্ধজাহাজ সমাবেশ করছে। তা ছাড়া চলছে যবনিকার অন্তরালে শলাপরামর্শ।
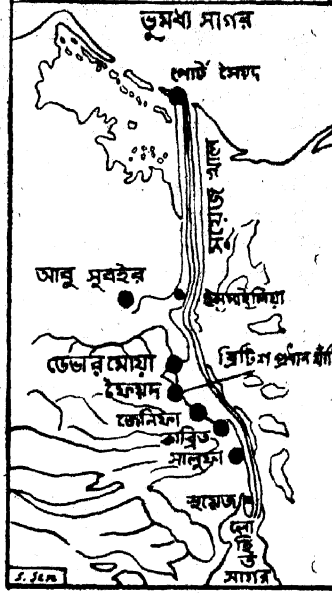
মিশরের পক্ষে একা ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভবপর নয়। আমেরিকা এখানে হয়ত ইংরেজকে ইরাণের মত একেবারে ডুবাবে না। সে হয়ত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে। রুশিয়ার রাষ্ট্রদূতের নড়াচড়ার সংবাদও আসছে। আরব লীগের সভ্যরা সময় বুঝে কীর্তন গাইতে অভ্যস্ত। তারা এখন পর্যন্ত পশ্চিমী শক্তির পক্ষেই কথা কইছেন। শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াবে বলা যায় না। যেমন বলা যায় না মিশরের এই দৃঢ়তার শেষ পরিণতি কি হবে। তবে যাই হোক না কেন, সুয়েজ খাল নিয়ে যখন একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে তখন ওর পুরাণো ইতিহাস জেনে রাখা মন্দ নয়। কারণ, তাতে নতুন ইতিহাসকে বোঝার পক্ষে সাহায্য হবে।

এটা বোধহয় অনেকেরই জানা আছে যে, সুয়েজ খাল প্রাকৃতিক খাল নয়। মানুষের প্রচেষ্টায় ও অধ্যবসায়ের গুণে ও যত্নে এই কৃত্রিম খালটি কর্তিত হয়েছে। ঐ খাল কর্তিত হবার ফলে বাণিজ্যিক সুবিধা যেমন হয়েছে তেমনি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরূপতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুয়েজ খাল স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে রাখার জন্যে বহু ঘটনা ঘটে গেছে। অর্থাৎ ভূমধ্যসাগরকে লোহিত সাগরের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা থেকে আরম্ভ করে আজকের দিন পর্যন্ত সুয়েজ খাল ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। তার ইতিহাসও কম চাঞ্চল্যকর নয়। সেই কাহিনীরই কিছুটা এখানে উদ্ঘাটনের চেষ্টা করব।

সুয়েজ খাল কর্তনের পরিকল্পনা অনেক-দিনের। তবে বর্তমানে যেভাবে খালটি কর্তন করা হয়েছে ফারাওদের আমলে তেমন পরিকল্পনা ছিল না। তাঁরা চেয়েছিলেন নীল নদ থেকে টিমসা হ্রদ পর্যন্ত খাল কাটতে। এবং তা কেটে ছিলেনও কিন্তু দেখা গেল কালক্রমে তা বুজে যাচ্ছে। অবশ্য দ্বিতীয় নেকাও, দ্বিতীয় টলেমি, সম্রাট আড্রিয়ান এবং আমুরো প্রভৃতি অনেকেই চেষ্টা করেছেন তা পরিষ্কার করে জলপথকে চালু রাখতে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে তাঁরা চেষ্টা করা ছেড়ে দেন। এটা হল ৬৪০ খৃষ্টাব্দের কথা।

অষ্টম শতাব্দীতে আবার চেষ্টা হয় খাল খনন করাবার। এবার পরিকল্পনা করা হয় ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরকে যুক্ত

করার। চেষ্টা করেন হারুণ-অল্-রসিদ। কিন্তু তাঁকে বোঝান হয় যে, অমন খাল খনন করা রাজ্যের পক্ষে বিপজ্জনক হবে। তাই ঐ পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। এর আট শ' বছর পরে উত্তমাশা অন্তরীপের পথে ভারতে যাওয়ার পথ আবিষ্কৃত হলে ভিনিসীয়নগণ মিশরীয়দের নিকট ঐ খাল খননের পরিকল্পনা উপস্থিত করে। কিন্তু তুর্কীরা তাতে আপত্তি করে। ১৬৭১ সালে লাইবনিজ ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুইয়ের নিকট মিশর অভিযানের যে পরিকল্পনা উপস্থিত করেন তাতে ঐ রকম খালের কথা সমর্থন করেন। কিন্তু তা-ও কার্যকর হয়নি। ১৮৯৮ সালে নেপোলিয়ন ব্রিটেনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করার জন্যে মিশর আসেন। তিনি এসে ঐরকম খাল খনন করা সম্বন্ধে সার্ভে করার হুকুম দেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ঐ জলপথে ফরাসী বাহিনীকে ভারতে প্রেরণ করা। অর্থাৎ সম্পূর্ণ সামরিক স্বার্থপ্রণোদিত হয়েই তিনি আদেশ জারী করেন। যাহোক জে এম লেপিয়ার নামক জনৈক ইঞ্জিনীয়ার সার্ভে করেন। তিনি রিপোর্ট করেন যে, লোহিত সাগর আর ভূমধ্যসাগরের সমতার পার্থক্য হচ্ছে প্রায় ২৯ ফিট। লাপ্লাস ও ফুরিয়ার এ অভিমত সমর্থন করতে পারলেন না। কিন্তু ১৮৪৬ সালে প্রস্পার ইফান্‌টিন্ নামক জনৈক সেণ্ট সিমনিস্ট Societe d'Etudes pour le Canal de Suez নামক যে সমিতি গঠন করেন সেই সমিতিও ১৮৪৬-৪৭ সালে ঐ অভিমত অগ্রাহ্য করেন। বিশ্বের উন্নয়নের জন্য সেণ্ট সিমনিস্টরা যে পরিকল্পনা রচনা করেন পানামা ও সুয়েজ খাল খনন তারই অন্তর্ভুক্ত। সমিতি যে বিশেষজ্ঞ কমিশন গঠন করেন তাঁদের অধিকাংশের অভিমত অনুসারে ঠিক হয় যে, কায়রোর পথে সুয়েজ হতে আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত খালটি খনন করা হবে।

প্রস্তাবিত খাল খনন করা হচ্ছে শুনে ইংরেজ কিন্তু চঞ্চল হয়ে ওঠে। কারণ, সুয়েজ খাল খনন করা হলে তার প্রাচ্যে যাতায়াতের পথ সহজ হবে কিন্তু ঐ জলপথে তার পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকা প্রয়োজন। তা পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহে সে ঐ পরিকল্পনায় নানা বাধা সৃষ্টি করতে থাকে। কারণ ঐ খাল কাটা না হলে তার বিশেষ কোন ক্ষতি নেই। উত্তমাশা অন্তরীপের পথে বেশ নিরাপদেই তার বাণিজ্য ও যুদ্ধ জাহাজ ভারত ও প্রাচ্যের অন্যান্য স্থানে যাতায়াত করতে পারে। সুতরাং সমস্ত পরিকল্পনা কার্যকর করার ব্যাপারে সে বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। কিন্তু ফরাসীরা এ ব্যাপারে এগিয়ে এল। কারণ, তারা দেখল যে ও ধরণের জলপথ সৃষ্টি করতে পারলে তাদের লোকসানের চেয়ে লাভ বেশী। তাঁরা তাই আরও তৎপর হল। ফার্ডিনাণ্ড ডি লেসেপস্ নামক জনৈক ফরাসী এ বিষয়ে বেশী উৎসাহী হয়ে উঠলেন। মিশরের ভাইসরয় আব্বাস পাশার মৃত্যুর পর লেসেপ্‌স্-এর ছোটকালের বন্ধু সৈয়দ পাশা ভাইসরয় হলেন। এতে তাঁর সুবিধা হয়ে গেল। সৈয়দ বন্ধুকে খাল খননের রেয়াত দিয়ে সনন্দ দিলেন। ১৮৫৪ সালে ঐ সনন্দ দেওয়া হল। তাতে বলা হল যে, 'প্রস্তাবিত খালপথে সমস্ত বাণিজ্যিক জাহাজ নির্বিবাদে যাতায়াত করতে পারবে। এতে কারো কোনো বিশেষ অধিকার বলে কিছু থাকবে না। ঐ সনন্দ বলে লেসেপ্‌স্ কাজ আরম্ভ করলেন। একটি কোম্পানী গঠন করে প্রস্তাবিত খালের পরিকল্পনা রচনা করলেন। পরবর্তী বৎসর ভাইসরয় কর্তৃক গঠিত একটি আন্তর্জাতিক কমিশন কিছু রদবদল করে ঐ পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। ১৮৫৬ সালের ৫ই জানুয়ারী লেসেপ্‌স্‌কে দ্বিতীয় এবং আরও বিস্তারিত 'কনসেশনস্' দেওয়া হল। ঠিক হল এই কনসেশন খাল চালু হবার পর থেকে ৯৯ বৎসর কার্যকর থাকবে। অতঃপর অন্য কোন বন্দোবস্ত না হলে প্রস্তাবিত খাল মিশর সরকারের হাতে চলে যাবে।

উপযুক্ত সনন্দ লাভ করে ডি লেসেপ্‌স্ রওনা হলেন কন্‌স্টাণ্টিনোপল্। কারণ, ঐ খাল কর্তন করতে হলে তুর্কীর সুলতানের অনুমোদন প্রয়োজন। পূর্বেই বলেছি, ইংরেজ ছিল এই খাল খননের বিরোধী। তাদেরই কূটনৈতিক চালের ফলে প্রয়োজনীয় অনুমোদন সংগ্রহ করা আর লেসেপ্‌স্-এর হল না। পরে তিনি যখন লণ্ডন যান তখন লর্ড পামারস্টোন তাঁকে জানান যে, ব্রিটিশ সরকার আলোচ্য খাল খনন একপ্রকার অসম্ভব বলে মনে করেন। তাছাড়া, ঐ খাল হলে ব্রিটিশের সামুদ্রিক সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হবে এবং প্রাচ্যে ফরাসীর প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ ইংরেজ ঐ খাল খননে সম্মতি দিতে পারে না। কিন্তু মজা এই যে পরবর্তী যুগে তারাই ঐ খাল জবরদখলে রেখে দিয়েছে।

সুলতানের অনুমোদন লাভ না করলেও ডি লেসেপ্‌স্ বসে রইলেন না। তিনি প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য য়ুরোপ পরিভ্রমণে বেরুলেন। এবং অতি সহজেই অর্থ সংগ্রহ করে ফেললেন। তাঁর কোম্পানীর মোট শেয়ারের সংখ্যা ছিল ৪০০,০০০ এবং প্রতি শেয়ারের মূল্য ৫০০ ফ্রাঙ্ক। এর মধ্যে সৈয়দ পাশা কিনলেন ১৭৬,০০০টি শেয়ার, ফ্রান্স ২০০,০০০টি, আর বাকী শেয়ার নিল তুর্কী। ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া, রুশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র শেয়ার কেনা হতে বিরত রইল। এখানে একথাও বলে রাখা ভাল যে, ইংরেজের শেয়ার না কেনার কারণ কোন অভিমান বা গোঁসা নয়। সে বুদ্ধিমান বেনে। তাই প্রথমে সে হাত গুটিয়ে থেকে দেখতে চাইল যে, তাতে পরিকল্পনা ভেস্তে যায় কি না। কিন্তু যখন বুঝল যে, পরিকল্পনা তো নষ্ট হবেই না, বরঞ্চ ঐ খালে তার উপযুক্ত অধিকার না থাকলে ভবিষ্যতে তাকে ঠকতে হবে তখনই সে কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ার হাত করার চেষ্টা করল। ১৮৭৫ সালে ব্রিটিশ সরকার দরিদ্র খেদিভ ইসমাইলকে ফাঁকি দিয়ে সুয়েজ খাল কোম্পানীর শতকরা ৪৪ ভাগ শেয়ার হস্তগত করে ফেলল। এই শেয়ার ক্রয় সম্পর্কে ডিসরেলী কমন্স সভায় যে বিবৃতি দেন তাতে বলেন, "অর্থ বিনিয়োগ হিসাবে আমি এই শেয়ার ক্রয় অনুমোদন করিনি......বাণিজ্যিক স্পেকুলেশন হিসাবেও আমি এটা অনুমোদন করিনি......আমি একে অনুমোদন করেছি রাজনৈতিক কাজ হিসাবে। আমি বিশ্বাস করি এতে সাম্রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি পাবে।......ইংরেজ জাতি চায় যে, তার সাম্রাজ্য রক্ষা পাক, শক্তিশালী হোক। সাম্রাজ্য বৃদ্ধি পেলে নিশ্চয় তারা শঙ্কিত হবে না। কারণ তারা দেখছে ঐ খালে অর্থ বিনিয়োগে আফ্রিকার গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল আমাদের প্রভাবাধীনে এসে যাচ্ছে, ভারত সাম্রাজ্য এবং অন্যান্য উপনিবেশে যাতায়াতের সুবিধা হয়ে যাচ্ছে।" উদ্ধৃত অংশ থেকেই ইংরেজের মনোভাব সঠিক অনুধাবন করা যায়। এই মনোভাব থেকেই সে সুয়েজ এলাকা চিরকাল স্বীয় প্রভাবাধীনে রাখতে চায়। কিন্তু ১৮৭৫ আর ১৯৫৮ সাল এক নয়! তাকে বিতাড়নের আয়োজন হয়েছে। এটা প্রকৃতিরই প্রতিশোধ!

সুয়েজ খাল কোম্পানী যার পুরো নাম হচ্ছে Compagnie Univer-

selle du Canal Maritime de Suez তার ষোল ভাগের ৭ ভাগ শেয়ারের মালিক এখন ইংরেজ। কোম্পানীটি মিশরে বিধিবদ্ধ এবং এর ৩২জন ডিরেক্টরের মধ্যে ২১ জন ফরাসী, ১০ জন ইংরেজ আর ১ জন ওলন্দাজ। কোম্পানীর পরিচালনায় ফরাসীর সংখ্যা অধিক হলেও ইংরেজের প্রভাবই বেশী। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে, ডিরেক্টর বোর্ডে একজনও মিশরীয় নেই। এরকম অবস্থা হবে ভেবেই বোধহয় ইসমাইল পাশা তাঁর পূর্বতন ভাইসরয় সৈয়দ পাশা কর্তৃক প্রদত্ত 'ফরমান' প্যালটে দিতে চেয়ে বলেছিলেনঃ "আমি চাই যে, খালটি মিশরের সম্পত্তি হোক, মিশর যেন খালের সম্পত্তি না হয়ে দাঁড়ায়।" শেষ পর্যন্ত তা-ই হয়েছে। অর্থাভাবই বিশেষ করে তাকে সে পর্যায়ে টেনে নামিয়েছে।

যাহোক, ১৮৫৯ সালের ২৫শে এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে খাল খননের কাজ আরম্ভ হল। খাল খননের কাজ সম্পূর্ণ হল ১৮৬৯ সালের নবেম্বর মাসে। এই মাসেই সৈয়দ বন্দরে খালের উদ্বোধন উৎসব হল। তারপর বিভিন্ন রাজ্যের ৬৮টি জাহাজ খালপথে যাত্রা করল। ঐ নৌবহরের নেতৃত্ব নিল Aigle নামক বাণিজ্যপোত। ১৬ই নবেম্বর বাণিজ্যপোতগুলি যাত্রা সুরু করে এবং ২০শে গিয়ে পৌঁছয় সুয়েজ বন্দরে। তারপরেই নিয়মিত জাহাজ চলাচল আরম্ভ হয়।

সৈয়দ বন্দর থেকে সুয়েজ বন্দর পর্যন্ত সুয়েজ খালের দূরত্ব হচ্ছে এক শ' মাইল। গড়ে খালের গভীরত্ব হচ্ছে ১৩½ মিটার (১ মিটার=৩৯·৩৭ ইঞ্চি)। উপরিভাগের প্রসার হচ্ছে ১০০ থেকে ২০০ মিটার আর তলদেশের প্রসার হচ্ছে ৪৫ থেকে ১০০ মিটার।

পূর্বে সুয়েজ খাল পথে দুটো জাহাজ পাশাপাশি চলতে পারত না। তাই কিছু দূরে দূরে একটি করে আশ্রয়স্থল ছিল। ওর দৈর্ঘ্য ছিল এক মাইলেরও কম। দুটো জাহাজ পাশাপাশি হলে একটি আশ্রয়স্থলে গিয়ে ঢুকলে অপরটি পাশ কাটিয়ে যেত। এখন অবশ্য আর তা দরকার হয় না। দুটো জাহাজ পাশাপাশি হলে একটি থেমে থাকে। অপরটি চলে গেলে সেও চলতে থাকে। ১৮৮৭ সালের মার্চ মাস থেকে রাত্রেও জাহাজ চলাচল যাতে করতে পারে তার জন্যে সার্চ লাইটের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এইসব অতি আধুনিক ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে আগে যেখানে একটি জাহাজের খাল অতিক্রম করতে লাগত ৩৬ ঘণ্টা এখন সেখানে লাগে ১৫ ঘণ্টা ৬ মিনিট। ঘণ্টায় ১২ কিলোমিটার-এর বেশী দ্রুত কোন জাহাজকে খাল পথে চলতে দেওয়া হয় না।

য়ুরোপ আর দূর প্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যেকার দূরত্ব হ্রাস করে সুয়েজ খাল বিশ্ব অর্থনীতিতে যুগান্তর সৃষ্টি করেছে। উত্তমাশা অন্তরীপের পথে লণ্ডন থেকে বোম্বাই যেতে পূর্বে ৪৫ দিন, এখন সেখানে সুয়েজ খালের পথে যাওয়া যায় প্রায় ১৫ দিনে। খালটি হচ্ছে বর্তমানে পৃথিবীর কর্মব্যস্ত জলপথ। প্রতি বছর প্রায় ৬০০০ বাণিজ্যপোত (শতকরা ৫৫টিই তার ব্রিটিশ) এই খালপথ অতিক্রম করে। জলকর হিসাবে কোম্পানীর আয় হয় বৎসরে প্রায় ২৫০ মিলিয়ন স্বর্ণ ফ্রাঙ্ক।

১৮৫৪ ও ১৮৫৬ সালের 'কনসেশন' অনুসারে সমস্ত জাতিকে সমান জলকর বা মাশুল দিতে হয়। কারুর বেলায় কোনপ্রকার পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন ওতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন নিষিদ্ধ করা হয়েছে কোন বিশেষ রাজ্যের জাহাজ চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। মিশরের চরম অবস্থার মুখে ১৮৮১-৮২ সালে আন্তর্জাতিক চুক্তিদ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে নিরপেক্ষতা নীতি নির্ধারণের প্রশ্ন ওঠে। পরবর্তী বৎসর আগস্ট মাসে তেল-এল-কেবির-এর যুদ্ধের কয়েক সপ্তাহ পূর্বে বৃটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ স্যার গার্নেট উলসুলির নির্দেশে চারদিনের জন্য খাল পথে জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। খেদিভের নামেই এ কাজটি চলে। এর পর ইংরেজের দিক থেকে চেষ্টা হয় সুয়েজ খালের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে একটা আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পন্ন করার। ১৮৮৩ সালে খেদিভের পক্ষ থেকে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রসচিব সার্কুলার হিসাবে একটি প্রস্তাব প্রচার করেন। প্রস্তাবে খাল অঞ্চলের নিরপেক্ষতার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বলা হয় যে, যুদ্ধ অথবা শান্তি সব সময়ই খালপথে সমস্ত দেশের জাহাজেরই চলাচলের অধিকার থাকবে, খালে কোন যুদ্ধবিগ্রহ হতে পারবে না, খালটি হবে মিশরের রক্ষাব্যূহ এবং ঐসব প্রস্তাব কার্যকর করার দায়িত্ব হবে মিশর সরকারের।

এই প্রস্তাবে বিশেষ সায় কোন শক্তির দিক থেকে এলো না। যা হোক, অনেক বিতর্কের পর ১৮৮৫ সালে ১৮৮৩ সালের সার্কুলারের উপর ভিত্তি করে একটি নিয়মপত্র গ্রহণ করা হল। অতঃপর ১৮৮৮ সালের ২৯শে অক্টোবর কন্সটাণ্টিনোপলে অষ্টশক্তি, যথা—গ্রেটব্রিটেন, জার্মানী, অস্ট্রিয়া, স্পেন, ফ্রান্স, ইতালী, রুশিয়া, তুর্কী সুয়েজ খাল নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করলেন। তাতে বলা হল, খালের জলপথে যে কোন রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক অথবা যুদ্ধজাহাজ, শান্তি অথবা যুদ্ধকালে বিনা প্রতিবন্ধকতায় চলাচল করতে পারবে।

এর পরেও সুয়েজ খাল নিয়ে বহু মনোমালিন্য, সালিশ, বৈঠক হয়েছে। গত দুইটি বিশ্বযুদ্ধে সুয়েজ খাল একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ কেন্দ্র থাকায় মিত্রশক্তি তথা ব্রিটিশ তাকে নিজের কব্জির ভিতর পুরোপুরি রেখে দিয়েছিল। কারণ সে জানত সুয়েজ খাল হারালে নাভিকেন্দ্রের সঙ্গে যোগ রাখা তার পক্ষে মুস্কিল হয়ে দাঁড়াবে। তাই সে তার নীতি অনুসারেই দখল ব্যবস্থা বজায় রেখে যাচ্ছে। কিন্তু এখন চাকা ঘুরেছে। মিশর আর সুয়েজ খালকে অপরের সম্পত্তি করে রাখতে রাজী নয়। তাই লড়াই চলছে—অবশ্য ঠাণ্ডা লড়াই। ইরাণের মত শেষ পর্যন্ত ইংরেজকে মিশর থেকেও পাততাড়ি গুটাতে হবে কিনা কে জানে?

লণ্ডন রঙ্গমঞ্চ

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

সমস্ত লণ্ডন শহরে রঙ্গালয়ের সংখ্যা কত, সেকথা মনে মনে হিসেব করে সহজে বলা হয়তো সম্ভব নয়। তবে ওয়েস্ট এণ্ডে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে রাস্তার এপাশে-ওপাশে অলিতে-গলিতে এত রঙ্গালয় চোখে পড়ে যে, বিদেশীর পক্ষে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ লম্বা 'কিউ'এর দিকে তাকিয়ে থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া অন্য পাড়ায় ছোটখাটো থিয়েটার তো আছেই। নতুন লেখকের ভালো নাটক কিম্বা পুরোনো লেখকের নতুন বই প্রথমে ওয়েস্ট এণ্ডের থিয়েটারেই দেখা যায়। সে-পাড়ায় অভিনয় দেখার আগ্রহ লণ্ডনের জনসাধারণের খুব বেশি। লোকে 'কিউ'এ দাঁড়ায় দু' শিলিংএর টিকিটের জন্য—সবচেয়ে কম দামী টিকিট। রোদ বৃষ্টি কুয়াশা তুষার—কিছুতেই উৎসাহ হারায় না তারা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। মুখে এতটুকু বিরক্তির চিহ্নমাত্র নেই। এই দু' শিলিংএর 'কিউ'এ যারা দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের প্রত্যেকেরই অবস্থা খুব ভালো নয়, সেকথা বললে ভুল হবে। ইচ্ছে করলে এদের অনেকেই পনেরো-কুড়ি টাকার টিকিট দু মাস আগে কিনে রাখতে পারতো। কিন্তু তা করেনি, কেননা, 'কিউ'এ দাঁড়াতে এদের ভালো লাগে আর যেখানে কম পয়সায় কাজ সারা যায়, সেখানে বেশি পয়সা ইংরেজ সহজে খরচ করে না। আজ ইচ্ছে করলেও ফল হবে না, কারণ অন্য টিকিট সব শেষ হয়ে গেছে। তাই যারা বিদেশী কিম্বা যাদের বয়স খুব বেশি অথবা খুব বড়লোক, তারা আগে থেকে দামী চেয়ারের বন্দোবস্ত করে রাখে।

যারা অশিক্ষিত, নাটকের ভালোমন্দ বিচার করবার ক্ষমতা যাদের নেই, যারা চায় শুধু বিশেষ পোষাকে বিশেষ নাচ আর আনন্দ, সেই 'পাবলিকে'র দোহাই দিয়ে ওয়েস্ট এণ্ড রঙ্গালয়ের কর্তারা বিশেষ নাটকের বন্দোবস্ত করবে না কিম্বা কোন নাট্যকার তাদের খুশি করবার জন্যে নিজের অক্ষমতা অস্বীকার করে কখনো বলবে না, 'পাবলিক' এই চায়। ইংরেজ নাট্যকারের কাজ হলো দেশের রুচিকে উন্নত করা—নাট্য-সাহিত্যে নতুন আলো ফেলে নানা-রকম পরীক্ষা করা। হীন রুচিকে সমর্থন করে শুধু পেটের দায়ে নাটক লেখা নয়। তাই লণ্ডনের রঙ্গালয়ে শিক্ষিত দর্শকের ভীড়—ছাত্রদের ঠেলাঠেলি। অভিনয় কেমন হলো, কোন্ অভিনেতা-অভিনেত্রী অভিনয় করলো, সেকথা দর্শক আলোচনা করে পরে

বার্নার্ড শ'

—সাধারণত থিয়েটার দেখতে দেখতে কিম্বা বাইরে বেরিয়ে প্রথম কথা হবে, নাট্যকারের দোষগুণ নিয়ে, নাটকের বিষয়বস্তু আর কলাকৌশল নিয়ে। তবু বিশেষ দর্শকের জন্য বিশেষ নাচ-গানের রঙ্গালয় আছে এবং ওয়েস্ট এণ্ডেই। আমি সেগুলির কথাই প্রথমে বলবো। সে-কর্তারা হাল্কাভাবে হাল্কা রস পরিবেশন করে। ওয়েস্ট এণ্ডের তিনটি প্রসিদ্ধ রঙ্গালয়—উইণ্ডমিল, ক্যাসিনো, হিপোড্রোম্। ভদ্রসমাজে যদি হঠাৎ কোনদিন আপনি এই রঙ্গালয়গুলির নাম উল্লেখ করেন, তাহলে শিক্ষিত শ্রোতা তখুনি বুঝে নেবে, আপনার রুচি কেমন এবং আপনি কোন্ শ্রেণীর লোক। এই রঙ্গালয়গুলিতে আনন্দ উপভোগ করতে যায় সকলেই, কিন্তু চুপে-চুপে, এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে খুব সাবধানে—চেনাশোনা কেউ দেখে ফেললেই মুশকিল। মনে করবে, কী জঘন্য রুচি উইণ্ডমিলে এসেছে।

এই জাতের থিয়েটারগুলির বড়ো বেশি মিল। একটি দেখলেই চলে—অন্যগুলিতে সেই একই ব্যাপার। কিন্তু ব্যাপারটা কি? যতটুকু কাপড় না হলেই চলে না, ঠিক ততটুকু কাপড় পরে মেয়েরা নাচ আর গানের মধ্যে দিয়ে আপনাকে আনন্দ দেয়। কিন্তু নাচের ভঙ্গী দেখে আর গানের ভাষা শুনে শিক্ষিতেরা ভুরু কোঁচকায়, অনেকেই উঠে যায়, আর যে সব বৃদ্ধেরা লোভ সামলাতে না পেরে এসে পড়েছে, তারা বিরক্তির রেখা মুখে ফুটিয়ে শেষ অবধি বসে থাকে। মেয়েরা এসব থিয়েটারে বড়ো একটা আসে না, আর দু-একজন কৌতূহল দমন করবার জন্যে এলেও দ্বিতীয়বার আর ভুলেও আসে না।

ইংরেজ বন্ধু-বান্ধবের মুখে এই সব থিয়েটারের যতখানি নিন্দে শুনেছিলুম—এগুলি বার বার দেখার পর আমি তাদের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। ইংরেজ কনজারভেটিভ—একটু এদিক-ওদিক হলে লজ্জায় তাদের কান লাল হয়ে ওঠে। সামান্য অশোভন হলে অশ্লীল মনে করে অস্বস্তি বোধ করে। উল্লিখিত রঙ্গালয়ে বসে আমার একবারও মনে হয়নি যে, এতো-টুকুও বাড়াবাড়ি হচ্ছে। আর মঞ্চের মেয়েদের পোষাক দেখে আমি অবাক হইনি, কারণ এমন সাজ যে কোন ব্যালেতে দেখা গেছে। তারপর তাদের গান ও রসিকতা। হয়তো এই নিয়ে শিক্ষিত ও মার্জিত দর্শকের আপত্তি। কিন্তু আমি বিদেশী, তাই ওদেশের রসিকতা ও হাস্য-রসের জাতবিচার করবার ক্ষমতা আমার নেই। আলোর বন্যা, মঞ্চের কলাকৌশল, মেয়েদের সমাবেশ, আর তাদের দ্রুত পদক্ষেপ এবং বিভিন্ন বাজনার আশ্চর্য সঙ্গতি আমাকে বিস্মিত করেছে। একথা বললে বেশি বলা হবে না যে, বাইরে বেরিয়ে আমার মনে হয়েছিলো, কী

দেখলাম। সুরুচি-কুরুচি, শোভন-অশোভন এসব কথা ভাববার আমার অবসর হয়নি, কারণ মঞ্চের বিচিত্র শিল্প-প্রকাশ আমাকে অন্য জগতে নিয়ে গিয়েছিলো।

এই সঙ্গে এই জাতের ফরাসী দলের নাম উল্লেখ করতে হয়, অর্থাৎ 'ফলিবেরজা'। সম্প্রতি লণ্ডনে তাদের শাখা খোলা হয়েছে এবং এই দল লণ্ডনের অন্য তিনটি থিয়েটারকে কাণা করে দিয়েছে। ফ্রান্সের রূপসীরা ম্লান করে দিয়েছে ইংরেজ সুন্দরীদের। আর ফরাসী স্টেজ—টেকনিক দেখে মনে হয়, ইংল্যাণ্ড কত পেছিয়ে আছে। এককথায় বলতে গেলে বলতে হয়, অপূর্ব। অল্প অল্প আলো যেন ম্লান জ্যোৎস্না

কবি এলিয়ট

উঠেছে, মঞ্চের ওপর জমেছে মেঘ, মৃদু মৃদু বাজনা বাজছে, আর সেই মেঘে মেঘে কতো রূপসীর ভীড়—কতো রকমের রূপ প্রকাশ। তারপর অন্য বাজনা বাজলো, আলোর প্লাবনে ভরে গেল মঞ্চ, আকাশ থেকে কেমন করে নেমে এলো হাজার সুন্দরী। কখনও সমুদ্রের গভীরে জলপরীদের নাচ, কখনও আকাশের রূপে, কখনও মঞ্চের ওপর রেলগাড়ি আপনাকে অবাক করে দেবে। এই ধরণের মঞ্চগুলির মধ্যে বর্তমান লণ্ডনে ফরাসী 'ফলি-বেরজা' সর্বশ্রেষ্ঠ, সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

যাদের রুচি উন্নত, যারা নাচ-গান ভালোবাসে, অথচ যারা এই সব রঙ্গালয়ে গিয়ে একেবারেই সন্তুষ্ট হয় না, তাদের জন্য রয়েছে কভেণ্ট গার্ডেন অপেরা কিম্বা স্যাড্‌লারস ওয়েলস ব্যালে। পুরাণ কিম্বা ইতিহাস নিয়ে এরা করে গানের নাটক কিম্বা নাচের অভিনয়। তাছাড়া সমগ্র ইউরোপ থেকে আসে নানা দল। স্পেন, রাশিয়া, ফ্রান্স, সুইডেন—এই সব অনেক দেশের ব্যালে লণ্ডন-রঙ্গমঞ্চ আচ্ছন্ন করে রাখে বহুদিন। কেনসিংটনের বিশ্ববিখ্যাত রয়েল অ্যালবার্ট হলে নানা দেশের কনসার্ট চলে রাতের পর রাত। নাচ নয়, গান নয় অভিনয় নয়, শুধু কনসার্ট—সেই বাজনা শুনতে সহস্র শ্রোতার ভীড়।

এবার লণ্ডন-রঙ্গমঞ্চের আধুনিক নাটক ও নাট্যকারের কথা বলা যাক। বর্তমান ইংল্যাণ্ডের তরুণতম শক্তিশালী নাট্যকার ক্রিস্টফার ফ্রাই। ফ্রাই-এর বয়স বেশি নয়, চল্লিশের নীচে। তাঁর নাম দর্শক টেনে আনে। তাঁর চেয়ে জনপ্রিয় নাট্যকার বর্তমান ইংল্যাণ্ডে নেই। অনেক ইংরেজ সমালোচক ক্রিস্টফার ফ্রাইকে বলে আধুনিক সেক্সপীয়র। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা, দি লেডী ইজ নট ফর্ বার্নিং। এই নাট্যকারের প্রত্যেকটি নাটক রাতের পর রাত লণ্ডন-রঙ্গমঞ্চে চলেছে এবং দর্শকসাধারণের মন জয় করে নিয়েছে। তার আরও কয়েকটি নাটকের নাম, দি ফার্স্ট বরণ্ ভিনাস্ অবজারভড্ এবং এ ফিনিক্স টু ফ্রিকোয়েণ্ট।

ক্রিস্টফার ফ্রাই-এর নাটক শুধু দর্শকের মন মাতায় না, পাঠককেও গভীর তৃপ্তি দেয়। তার ভাষা যেমনি ভারি, তেমনি অভিনব। ফ্রাই-এর লেখা পড়ে মনে হয়, তার প্রেরণা ইতিহাস আর বাইবেল থেকে। ছন্দের ঝঙ্কারে, উপমার নতুনত্বে, দৃষ্টির ব্যাপকতায় তাঁর নাট্য-সাহিত্য শিল্পের সর্বোচ্চ সোপানে পৌঁচেছে। তাই আজ অনেক সমালোচকের মতে তরুণ ক্রিস্টফার ফ্রাই আধুনিক ইংল্যাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত নাট্যকার।

এ বছরের প্রথমে কবি টি এস এলিয়টের তৃতীয় নাটক 'ককটেল পার্টি' লেস্টার স্কোয়ারের নিউ থিয়েটারে আরম্ভ হয়। কবি এ-নাটক শেষ করবার আগেই অনেকে এর কথা জানতো এবং কবে এটি শেষ হবে, সেকথা ভেবে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। নাটক লেখা শেষ হলো, কিন্তু লণ্ডনে অভিনীত হলো না—এডিনবরা উৎসবে হলো এ নাটকের প্রথম অভিনয় তারপর ব্রাইটনে এবং অবশেষে লণ্ডনে। অনেকের ককটেল পার্টি ভালো লাগেনি। তারা বলেছে, এ নাটকে নাকি কিছু নেই। আর কারুর কারুর মতে, অদ্ভুত নাটক। ককটেল পার্টি চললো অনেকদিন—এলিয়টের ভাব আর ভাষা আবার লোককে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিলো তার ক্ষমতার কথা। এ নাটকে অভিনেতা ও অভিনয়ের কথা কেউ উল্লেখ করলো না। ককটেল পার্টি সম্পর্কে একমাত্র আলোচনা হলো, এলিয়ট।

ফ্রাই ও এলিয়ট ছাড়া আলডুস হাক্সলি, জে বি প্রিস্টলি—এরাও রঙ্গমঞ্চের জন্যে কয়েক বছরের মধ্যে নতুন নাটক লিখে নানা রকম পরীক্ষা করেছে এবং তাদের নাটক হলেই দর্শক-সাধারণ বিনা দ্বিধায় টিকিট কাটে। কিন্তু এদের নাটক দেখে বাইরে এসে

মাইকেল রেডগ্রেভ

লোকে আগে অভিনয়ের আলোচনা করে—পরে নাটকের বিষয়বস্তুর কথা। বার্নার্ড শ'র মৃত্যুর পর তার বহু নাটক আবার নতুন করে লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে দেখানো হচ্ছে। ভীড় হচ্ছে খুব বেশী, টিকিট পাওয়া শক্ত। লোকে হাত তালি দিয়ে ম্যান এণ্ড সুপারম্যানের মতো দীর্ঘ নাটক পাঁচ ঘণ্টা ধরে ঠায় চেয়ারে বসে উপভোগ করছে।

আর ঘরে বাইরে শেক্সপীয়র। সারা বছরের যে কোন সময় লণ্ডনের কোন না কোন রঙ্গমঞ্চে আপনি শেক্সপীয়রের নাটক দেখতে পাবেন। ওল্ড ভিক্ কোম্পানী ছাড়াও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তার নাটক নানা-ভাবে অভিনীত হয়। স্ট্র্যাটফোর্ড অন্ এভনের কথা এখানে না হয় নাই উল্লেখ করলাম।

কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো খোলা মাঠে শেক্সপীয়র। প্রত্যেক বছর গ্রীষ্মকালে লণ্ডনে রিজেণ্টস্ পার্কে শেক্সপীয়রের নানা নাটক অভিনয় করা হয়। ওপেন্ এয়ার থিয়েটারের অভিনয় প্রত্যেকের ভালো লাগে —সকলে বারবার দেখেন। বছরে শুধু দু'মাসের জন্যে তাদের আবির্ভাব তাই দর্শকের সংখ্যা বাড়ে বই কমে না।

'যাত্রা' কথাটা শুনলে আজকাল আমরা সকলেই মনে মনে হাসি। আমাদের দেশে রঙ্গমঞ্চ ও ছায়াছবির যুগে যাত্রা বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা দেশবাসী করলো না, করতে পারলো না। ইংল্যান্ড পারলো। যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে হয়তো কিছু কিছু রীতি নীতি বদলাতে হলো; কিন্তু অভিনয় মালঞ্চের প্রথম ফুল তারা বাঁচিয়ে রাখলো সযত্নে। আমার এ উক্তিতে হয়তো পাঠক-সাধারণ অবাক হবেন। কিন্তু ওপেন এয়ার থিয়েটার আমাকে এবং আরও অনেককে নিয়ে যায় শেক্সপীয়রের যুগে। যেমনি অভিনয় তেমনি প্রকাশের ধারা। আর আশ্চর্য, যে কোন আধুনিক থিয়েটারের চেয়ে ওপেন এয়ারে ভীড় হয় অনেক বেশী।

আজও শেক্সপীয়রকে সাধারণের কাছে নানারূপে তুলে ধরবার জন্যে ইংল্যান্ড যতখানি চেষ্টা করছে আমার মনে হয় না পৃথিবীর আর কোনো দেশে তাদের জাতীয় কবিকে নিয়ে ততো মাতামাতি হয়।

কিন্তু সার্থক এ মাতামাতি। 'জুলিয়াস্ সিজার' স্ট্র্যাটফোর্ড অন্ এভনে দেখলাম একরকম, লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে দেখলাম আর এক-রকম, সেই একই নাটক ওপেন্ এয়ারে দেখলাম একেবারে অন্যরকম।

বন্ধু-বান্ধবরা ঠাট্টা করে বলে, শুনেছি ইংরেজের মুখে শেক্সপীয়র ছাড়া নাকি কথা নেই, তাই ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আমাদের দেশের লোকেরাও শেক্সপীয়র-শেক্সপীয়র করে ইংরেজ সাজে।

কথাটা খুব মিথ্যা নয়। ইংরেজ সাজে কিনা জানি না, তবে একথা ঠিক আমাদের দেশের লোকের ইংল্যান্ডে শেক্সপীয়র সম্বন্ধে হয় নতুন উপলব্ধি। আর এই মহাকবিকে এমন করে বিদেশীর মনে মেলে ধরবার কৃতিত্ব বোধ হয় অভিনেতা অভিনেত্রী আর রঙ্গ-জগতের অন্যান্য লোকের প্রাপ্য। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিলো।

শুধু ইংরেজী নাটক নয়, লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে ইংরেজীতে ইউরোপের আরও নানা দেশের নাটক প্রায়ই অভিনীত হয়। আর তা ছাড়া আমেরিকার নাটক তো থাকবেই। সব দেশের সব নাটক দেখবার সুযোগ আমার হয়নি, আমি শুধু ফ্রান্স ও আমেরিকার নাটকের কথাই বলবো কেন না এই দুই দেশের নাটকের মূলে আশ্চর্য প্রভেদ—অভিনয়েও।

ফরাসী নাট্যকার জাঁ পল সারত্রের (Jean Paul Sartre) নাম ইংল্যান্ডে শুধু সুপরিচিত নয়, প্রশংসিত। তার লেখা 'মেন

ইডিথ এভান্স

উইদাউট শ্যাডোজ', 'এ রেসপেকটেবল্ প্রসটিটিউট' এবং আরও অনেক নাটক লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে সগৌরবে চলেছে এবং তার নতুন রচনার আশায় জনসাধারণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। সারত্রের-দর্শন—একজিস্-টেন্সিয়েলিজম্ (কথাটার সঠিক বাঙলা প্রতিশব্দ আমার জানা নেই, কেউ কেউ বলেন, অস্তিত্ববাদ)। সারত্রের নাটক এই 'বাদে'র ওপর ভিত্তি করে লেখা। গতি, কৌতূহল, রস—সবই আছে তার নাটকে এবং শক্তিশালী নাট্যকারের যে গুণগুলি থাকা দরকার জাঁ পল সারত্রে সেগুলি থেকে বঞ্চিত নয়, তবু কোথায় যেন একে প্রশংসা করতে বেধে যায় আর মনে হয় প্রতিক্রিয়াশীল। আর একজন ফরাসী নাট্যকার জাঁ অ্যানুই ইংল্যান্ডে সারত্রের মতো পরিচিত না হলেও তার চেয়ে বেশী শক্তিশালী বলে স্বীকৃত। অ্যানুই-এর অনুভূতি ও সমবেদনা সারত্রের চেয়ে তীক্ষ্ণ আর গভীর। জনসাধারণ তাকে নিয়ে উন্মত্ত না হলেও ফরাসী ও ইংল্যান্ডের শিক্ষিত মহল সারত্রের চেয়ে অ্যানুই-এর প্রতিভা বেশী সেকথা স্বীকার করে।

কিছুদিন আগে অ্যানুই-এর 'অ্যান্টিগোনে' ডাচেস্ থিয়েটারে হয়ে গেল। ফ্রান্সে এই অসামান্য নাটক নাকি ঝড় বইয়ে দিয়েছিলো; কিন্তু লণ্ডনে চললো না। ক্রিস্টফার ফ্রাই-এর অনুবাদ করা অ্যানুই-এর নাটক 'রিং রাউণ্ড দি মুন' গ্লোব থিয়েটারে চলছে—খুব ভালো চলছে। নাটকের শেষের দিকে নাট্যকারের মতামত, সম্পদের অসারতা ইত্যাদি জোর করে উপদেশ শোনাবার মতো মনে হলেও নাটকের গঠন ও সুঅভিনয়ের জন্যে এসব কথা লোকের মনে হয়তো ওঠেনি। 'রিং রাউণ্ড দি মুন' সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই অভিনেত্রী মারগারেট রাদারফোর্ডের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। অ্যানুই-এর আর একটি প্রশংসিত নাটকের নাম, 'পয়েণ্ট অফ্ ডিপারচার'। লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে তিনখানি উচ্চপ্রশংসিত আমেরিকান নাটক—'হার্ভি', 'ডেথ্ অফ এ সেলসম্যান' আর 'স্ট্রীট কার নেমড্ ডিজায়ার্'।

ডেথ্ অফ এ সেলস্ম্যান প্রসিদ্ধ হয়েছে পল মুনির অভিনয়ের জন্যে। এ নাটকের বিষয়বস্তু হলো সেলসম্যানের জীবনের দৈনন্দিন সমস্যা। 'হার্ভি' মনস্তত্ত্বমূলক। 'স্ট্রীট কার্ নেমড্ ডিজায়ার'-এর লেখক বর্তমান আমেরিকার জনপ্রিয় নাট্যকার টেনেসি উইলিয়ামস্। যে তিনখানি আমেরিকান নাটকের নাম করলাম তার প্রত্যেকটি লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে বহুদিন চলেছে এবং অনেক ইংরেজ দর্শক এগুলি নিয়ে মেতে উঠলেও স্বীকার করেছেন যে তাদের মনে নাটকের বিষয়বস্তু ফরাসী নাটকের মতো গভীরভাবে রেখাপাত করেনি। 'স্ট্রীট কারে' ভিভিয়েন্ লি'র অভিনয় খুবই ভালো; কিন্তু টেনেসি উইলিয়ামস্-এর রচনা তাদের ভালো লাগেনি। 'ডেথ্ অফ্ এ সেলসম্যান' তবু কিছু রেখাপাত করেছে। পল মুনির অভিনয়

নৈপুণ্য না থাকলে এ নাটকের কি পরিণাম হতো বলা কঠিন। কেউ কেউ অবশ্য বলতে ছাড়েনি, পল্‌ মুনিই মাঝে মাঝে বড় মেলো-ড্রামাটিক অভিনয় করেছে, আমেরিকান অভিনেতা হলে যা হয়। আর কেউ কেউ (বিদেশী দর্শক) মরবিড্‌ বলতে ছাড়েনি। "হার্ভি" একটি খরগোসের নাম। নাটকের নায়ক অভিনেতা জো ব্রাউন সব সময় মনে করতো একটি খরগোস তার পাশে পাশে রয়েছে। অবশেষে নানা বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে নায়কের মনের এ অবস্থা দূর করা হলো। সাধারণের মতে এ নাটক গভীর কিছু না হলেও নাট্যকারের প্রচেষ্টা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করা যায়। এমনকি অভিনয়ের শেষে জো ব্রাউন দর্শক সাধারণকে উদ্দেশ করে বলেছিলো, আমেরিকায় হাজার হাজার রাত আমি এ নাটকে অভিনয় করেছি; কিন্তু লণ্ডনের দর্শকদের মতো এমন প্রাণময় অভ্যর্থনা সেখানে পাইনি।

ইংল্যাণ্ডে আমেরিকান নাটকের চেয়ে ফরাসী নাটক বেশী প্রিয়। যা স্বাভাবিক, যা সঙ্গত তাই নিয়ে ফরাসী নাটক এবং সেই কারণে অভিনয়ও সংযত। ফরাসী নাটকে দেখি সাধারণ মানুষের ভীড়, তারা আমাদের যেন একান্ত আপনার। তারা কথা বলে সাধারণ মানুষের মতো, তাদের সব কিছুই আমাদের বড়ো চেনা। আর আমেরিকান নটকে যেসব চরিত্র দেখি তাদের যেন ঠিক চিনতে পারি না। অনেক সময় রক্ত মাংসে গড়া মানুষ বলে তাদের মনে হয় না—তাদের চলা বলা যেন যন্ত্রের মতো। তাই অভিনয়ও হয় মেলোড্রামাটিক। যে ক'টি আধুনিক আমেরিকান নাটক দেখেছি তার মধ্যে কথনও কখনও স্পন্দন শুনতে পেলেও গোটা জীবনকে পাইনি। তাই মঞ্চের কলা কৌশল মনে রাখবার মতো হলেও বর্তমান আমেরিকান নাটকের চরিত্রগুলি হৃদয়ের খুব কাছে আসে না। ছেলেবেলা থেকে শুনি

জার্মান ব্যালেরিনা মেরিয়েটা হেনি

ফরাসীরা ভাবপ্রবণ, তাদের উচ্ছ্বাস বেশী, গতি চঞ্চল জীবনকে ঠিক পথে নিয়ে যেতে তারা অনভ্যস্ত। কিন্তু আধুনিক ফরাসী নাট্যকাররা রঙ্গমঞ্চের জন্যে বিশেষভাবে লেখা সাধারণ নাটকেও যে সংযমের পরিচয় দিয়েছে তার তুলনা নেই। তাই মঞ্চের কলাকৌশল সাধারণ হলেও ফরাসী নাটক মনের গভীরে ফুল ফোটায়।

ইংরেজী ফরাসী কিংবা আমেরিকান নাটকে যে অভিনেতা ও অভিনেত্রী রঙ্গমঞ্চে সমান অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দেয় তাদের মধ্যে ইডিথ এভান্স, সিবিল থর্নডাইক, ময়রা লিস্টার, উইণ্ডি হিলার, বেটি অ্যান ডেভিস, ভিভিয়েন লি এবং স্যার লরেন্স অলিভিয়ার, মাইকেল রেডগ্রেভ, হার্বার্ট মারশ্যাল অন্যতম।

ইডিথ এভান্স, সিবিল থর্নডাইক, স্যার লরেন্স ও মাইকেল রেডগ্রেভ—এদের জন্যে আধুনিক লণ্ডন রঙ্গমঞ্চ দিনে দিনে উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। শুধু অভিনয় নয়, জনসাধারণের সুপ্ত সুরুচিকে জাগিয়ে তোলবার জন্যে তারা নানাভাবে চেষ্টা করে এবং একথা বারবার সংরক্ষণশীল ইংরেজকে বোঝায় যে সমস্ত পৃথিবীর চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত না হলে আজ শুধু পিছিয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই।

কয়েক বছর আগে রবীন্দ্র জন্মোৎসবে সিবিল থর্নডাইক, তার অভিনেত্রী আত্মীয়া এলিজাবেথ ও হার্বার্ট মারশ্যালের আশ্চর্য উদ্যম মনে রাখবার মতো।

হবোর্নে কনওয়ে হলে এ সভার আয়োজন করেছিলো ইণ্ডিয়া লীগ। সিবিল থর্নডাইক, এলিজাবেথ ও হার্বার্ট মারশ্যাল রবীন্দ্রনাথের নানা রচনার ইংরেজী অনুবাদ থেকে অনেক আবৃত্তি করে আমাদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছিলো এবং তাদের উৎসাহ দেখে মনে হয়েছিলো অদূর ভবিষ্যতে লণ্ডন রঙ্গমঞ্চ হয়তো সমস্ত পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ হয়ে উঠবে।
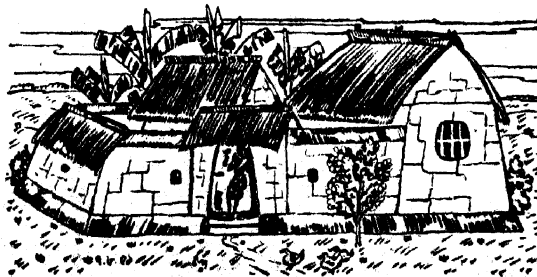
শারদীয় সংখ্যার ছোটগল্প

নারায়ণ চৌধুরী

বাঙলা পত্র-পত্রিকার শারদীয় সংখ্যাগুলি প্রতিবারেই অসংখ্য ছোট গল্পের সম্ভার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বলাই বাহুল্য, এবারেও সেই চিরাভ্যস্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। শারদীয় সংখ্যাগুলিতে ছোট গল্পের অতিরিক্ত সমাবেশের কতকগুলি বিশেষ কারণ বর্তমান। ছোট গল্প নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে কারণগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

প্রথমতঃ বাঙলা সাহিত্যে ছোট গল্পের বিভাগটি যত সমৃদ্ধ, এমন আর কোন বিভাগই নয়। বাঙলায় ছোট গল্পের ঐতিহ্য যদিও খুব বেশি দিনের নয় তবু এরি মধ্যে তার বিস্ময়কর পরিপুষ্টি সাধিত হয়েছে। শিল্পরূপ হিসাবে ছোট গল্পের উৎকর্ষসাধনের জন্য আমাদের সাহিত্যিকদের তৎপরতার অন্ত নেই। অনেক শক্তিশালী কথা-সাহিত্যিকের মনোযোগ শুদ্ধমাত্র সাহিত্যের এই বিভাগটিতে নিবদ্ধ রয়েছে। শক্তি যেখানে সমবেতভাবে তৎপর হয়, তার ফল সহজেই অনুমেয়। আমাদের দেশের কথা-সাহিত্যিকদের একমনস্কতা ও সঙ্ঘবদ্ধ তৎপরতার ফলে বাঙলা ছোট গল্প আজ বিশ্ব-সাহিত্যের যে কোন শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের সঙ্গে তুলনীয়। কি বিষয়বস্তুতে, কি আঙ্গিকের গঠনে, কি রসোত্তীর্ণতায়। কথাটা লোকের মুখে-মুখে-ফেরা ধরতাই বুলি নয়; তা বাস্তব প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই কারণে সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলিতে ছোট গল্পের সমাবেশ বরাবরই কিছু বেশি হয়ে থাকে; আর খুশির-দোল-দেওয়া অবকাশের-আমন্ত্রণ-মাখানো শারদীয় সংখ্যাগুলিতে যে সে সমাবেশ রীতিমতো চিত্তচমকপ্রদ হবে, তা না বললেও চলে। বাঙলা পত্র-পত্রিকার পাঠকদের মধ্যে ছোট গল্পের চাহিদা সব চাইতে বেশি। শারদীয় সংখ্যাগুলিতে এই চাহিদা খুব দরাজ হাতে পূরণ করা হয়। শারদীয় সংখ্যাগুলি জনপ্রিয়ও হয় সেই কারণে এত বেশি। ছোট গল্পের এত বিচিত্র সম্ভার নিয়ে আর কোন দেশের পত্র-পত্রিকা কোন উপলক্ষে আত্মপ্রকাশ করে কিনা জানি না। বলতে গেলে, বাঙলা শারদীয় সংখ্যাগুলি ছোট গল্পের ঐশ্বর্যপ্রসাদাৎ নিজেই ছোটখাটো একটা 'ইনস্টিটিউশন' হয়ে দাঁড়িয়েছে। শারদীয় সংখ্যাগুলির উৎকর্ষের মানবৃদ্ধির উত্তরোত্তর তাড়নায় এবং সুস্থ প্রতিযোগিতার অনুপ্রেরণায় এই ইনস্টিটিউশনকে ক্রমেই অধিক সুসম্পূর্ণ রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। যত দিন যাচ্ছে, তত শারদীয় সংখ্যাগুলি আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। শারদীয় সংখ্যার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছোট গল্প—সাহিত্যিক-সমালোচক মহলে রীতিমতো আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। সাধারণ পাঠকদের মধ্যেও যে আলোচনার উৎসাহ সংক্রামিত হয়েছে, নানা লক্ষণে তাও অত্যন্ত স্পষ্ট।

শারদীয় সংখ্যাগুলিতে ছোট গল্পের অনুপাত-অতিরিক্ত সমাবেশের দ্বিতীয় কারণ, পূজার আবহাওয়া। পূজার কিছুদিন আগে থেকেই বাঙলার আকাশে-বাতাসে একটা লঘু স্ফূর্তির রঙীন ছায়া দুলতে থাকে। শরতের স্বচ্ছ নীল আকাশ, সোনা-মাখানো রোদ আর এই রঙীন ছায়ার ইশারা বাঙালীমাত্রকেই এই সময়ে আমোদ-প্রয়াসী, আর সেই অনুপাতে চিন্তাবিমুখ করে তোলে। আমোদপ্রবণতার সঙ্গে রসের যোগ অতি নিবিড়, এই কারণে মনমাত্রই খানিকটা রসাপ্লুত হয়ে ওঠে। ভারি কাজের তাগিদ কিছুদিনের জন্য পিছনে পড়ে থাকে, দায়িত্ববোধ শিকায় ওঠে, পূজার আনন্দ-সম্ভাবনায় মন কেবলি রস আহরণ করে বেড়াতে চায়। মনের এই রসোন্মুখ প্রবণতা সৃজনধর্মী সাহিত্যের মাধ্যমে যত সহজে ও সুন্দরভাবে পরিতৃপ্ত হয়, এমন আর কিছুতে নয়। আর যেহেতু ছোট গল্প সৃজনধর্মী সাহিত্যের একটা প্রধান অঙ্গ, সেই হেতু এই সময়ে রসের যোগান দেওয়ার কাজে ছোট গল্প একটি মুখ্য ক্রিয়াশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ছোট গল্প লেখকেরা শারদীয় সংখ্যাগুলির জন্য দু হাতে গল্প লিখতে থাকেন; দেখতে দেখতে শারদীয় সংখ্যাগুলির ডালা ছোট গল্পের সম্ভারে ভরে ওঠে। বাঙালী পাঠকের দরবারে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ কিম্বা তথ্যমূলক আলোচনার সমাদর যে একেবারে নেই তা নয়, কিন্তু এই সমাদর-ক্রিয়া সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়। পাঠকদের ভাবখানা এই যে, ভেবে-চিন্তে, বিচার-বিবেচনা করে পড়বার জন্যে যে সকল রচনা, তার জন্যে তো গোটা বৎসরই পড়ে আছে, এখন আনন্দ আহরণের কাল, আনন্দটাই দু হাতে লুটে নেওয়া যাক, পরে অবকাশ মতো গুরুগম্ভীর সন্দর্ভাবলীর দিকে নজর দেওয়া যাবে। ভাবনাচিন্তার দায়িত্ব আজকের মতো তোলা থাকলে কোন ক্ষতি নেই, কেননা, ভাবনা-চিন্তার দায় থেকে মানুষকে অব্যাহতি দেবার জন্যেই ছুটি, আর রসের আনন্দে গা ঢেলে দেওয়াতেই ছুটির যথার্থ সার্থকতা। শারদীয় সংখ্যাগুলিতে অন্যান্য ধরণের রচনার তুলনায় ছোট গল্পের কেন এত সংখ্যাধিক্য, উপরের ব্যাখ্যার মধ্যে তার অন্যতম হেতু খুঁজে পাওয়া যাবে।

তৃতীয়তঃ, আজকের কাল ব্যস্ততার কাল, অস্বাভাবিক গতিবেগের কাল। এই কালে ছোট গল্পের ব্যাপক সমাদর না হয়ে যায় না। ছোট গল্পের আয়তন মোটামুটি সংক্ষিপ্ত, অথচ কবিতার মতো নিটোল-সম্পূর্ণ তার রূপ। ব্যস্ততার তাড়নায় তাড়িত আজকের দিনের পাঠক একই কালে ভালো জিনিস আর সংক্ষিপ্ত জিনিস চায়। শারদীয় অবকাশের অযুত সামাজিক ক্রিয়া-কর্মের মধ্যে পাঠক-মনের এই প্রবণতা বুঝি আরও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায়। খুব অল্প সময়ের মধ্যে পড়ে শেষ করার এবং তার থেকে পরিপূর্ণ একটি স্বাদ গ্রহণের যোগ্য রচনা বলতে কবিতার পরে ছোট গল্পকেই বোঝায়। কবিতার পাঠক-সংখ্যা নানা কারণে সীমাবদ্ধ, সুতরাং এ-যুগের পাঠকের মুখ্য ঝোঁক গিয়ে পড়েছে ছোট গল্পের উপরে। সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলি খণ্ড খণ্ড রচনা-সঙ্কলন বই কিছু নয়। শারদীয় সংখ্যা-

গুলিও তাই। সেই কারণে এখানে তাঁর আকার ও আয়তনের রচনার তুলনায় সংক্ষিপ্ত রচনার চাহিদাই বেশি। আর এই সংক্ষিপ্ত রচনাবলীর মধ্যে ছোট গল্পের দাবীই যে সর্বাগ্রগণ্য, সে কথা বোধ করি না বোঝালেও চলে। প্রকাশকদের তৎপরতা সম্বৎসরের পরিধিতে ব্যাপ্ত আর পূর্ণাঙ্গ এক-একটি গ্রন্থ নিয়ে তাঁদের কারবার। সেজন্যে প্রকাশক মহলে ছোট গল্পের চাহিদা কম। কিন্তু পত্র-পত্রিকার পরিচালক আর সম্পাদকদের ছোট গল্প সম্পর্কে উদাসীন থাকলে মোটেই চলে না। বলতে গেলে সাময়িক পত্র-পত্রিকার প্রধান নির্ভরই হলো ছোট গল্প। শারদীয় সংখ্যা সম্পাদন-কালে এই নির্ভরতা আরও একান্ত হয়ে ওঠে। যে শারদীয় সংখ্যায় ছোট গল্পের সব চাইতে বেশি সমাবেশ আর সব চাইতে উৎকর্ষ, পাঠক মহলে সে সংখ্যাগুলিরই কদর সব চাইতে বেশি।

চতুর্থতঃ এবং শেষতঃ, ছোট গল্প লেখকের শারদীয় সংখ্যাগুলির জন্য খুব যত্ন করে

টুকরো কথা...(১)

বাঙলা লোকশিল্পের ধারা শুকিয়ে গেছে। সমাজের কেন্দ্রবিন্দু যদি পল্লী না হয়, তাহলে কারুকর্মে লোকশিল্পের স্বভাবগত লাবণ্য ঘুচে যাবেই। তাহলেও প্রতিমা নির্মাণের মধ্যে এই ঘোর একালেও বাঙলার দেশজ-শিল্পরীতি কণ্টেসুন্টে বেঁচে ছিল। পুজোমত্ত কলকাতা শহর সুরুচির মুখে তুড়ি দিয়ে শিল্পশ্রীমণ্ডিত সেই দেবীমূর্তিকে মনে হয় চিরতরে বিসর্জন দিয়েছে। দেবীমূর্তিকে নারীমূর্তিতে পরিণত করার এই উৎকট প্রয়াস দেখে কোনো দেশপূজ্য শিল্পী এক ছাত্রদলকে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, 'ইনি যে দেখছি স্বৈরিণী! বাড়িতে পাঠিয়ে দিস।' এখন তো মনে হয় শিগগিরই প্ল্যাস্টিকে ঢালাই-করা রমণী প্রতিমার রূপযৌবন ভেদ করে নিঅন আলোর বিচ্ছুরণ দেখে চিত্ত চমৎকৃত হবে। সঙ্গে আছে হিন্দী 'ফিলিমের' গানা অর্থাৎ কিনা মিউজিক। হিন্দী ভাষার নামে বাঙালী গর্জমান, কিন্তু দেবীপুজোর প্রধান নৈবদ্য হচ্ছে বম্বেউলি-গানা। সানাইতে যারা পুজোর ভোরে একদিন আগমনী বাজাতো, লজ্জায় ধিক্কারে তারা হয়তো বিষ খেয়ে মরেছে।

তবু পুজো। বাঙালীর সমাজ-জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব। সে উপলক্ষ্যে প্রতি বছর প্রভূত পরিমাণে এ-ও-তা রচনা সংকলন প্রকাশ করা হয়। দেখতে প্রায় বিজ্ঞাপনের ক্যাটালগ, কিন্তু তাতে একটা জিনিস থাকে—বাঙলাসাহিত্যের একটি সমকালীন চিত্র। এবারের পুজো সংখ্যা-গুলি মোটামুটি সুখপাঠ্য হয়েছে। জ্ঞাতসারে কি না বলা যায় না, কিন্তু লেখকদের প্রাণমন সম্প্রতি আচ্ছন্ন করে আছে খাদ্যবস্ত্র আর তৎসংক্রান্ত নানা সমস্যা। দ্রষ্টব্য : প্রবন্ধে : খাদ্যজিজ্ঞাসা—চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, রসনা ও ও রসোগোল্লা—গোপাল হালদার, তেমনি আরো—সমুদ্রে মাছধরা, ভারতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ, চলতি বাজার, বাজার ভাও ও বহুবিবাহ ইত্যাদি। গল্প উপন্যাসেও খাদ্য আর স্বাস্থ্য-জিজ্ঞাসা বর্তমান : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের—সঞ্জীবন ফার্মেসী (উপন্যাস), প্রমথনাথ বিশীর—ধনে পাতা, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের—বিরাজিনের একটি পৃষ্ঠা এবং মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায়ের—ফেরিওলা, দ্রষ্টব্য। এবিষয়ের কবিতার মধ্যে যতীন্দ্র সেনগুপ্তের—দুবেলা দুমুঠো, আর—হাটের কবি, পাতা ওল্টাতেই পাওয়া গেল।

এই সঙ্গে বিশেষ করে নানা ধরনের ইতিহাস ঘেঁষা আলোচনা এবং গল্পগুলি উল্লেখ করতে হয়। যথা : লোকশিল্পের ধারা—মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, পুরাণে চন্দ্র—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, চাই আনন্দের সাহিত্য—বুদ্ধদেব বসু, বাঙলা সাময়িকপত্র—অজিত দত্ত, মুসলমান আমলে বৈদেশিক চিকিৎসক—সৌরীন্দ্র ঘোষ, সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ—সুধীর কর, জাহানারা—সুলতা কর, রামমোহন—সুশীলকুমার দে, মহেন-জো-দড়োর পতন—প্রমথনাথ বিশী। রাজনীতিতে নিরুৎসাহ চোখে পড়বার মতো।

পুজো সংখ্যার ঝুলি ঝাড়তেই আর দুটি রত্ন লাভ করা গেল, বহুদিন পরে পরশুরামের দুটি অপরূপ রসরচনা : ভরতের ঝুমঝুমি, আর—রেবতীর পতিলাভ। সত্তর উত্তীর্ণ হয়ে শ্রীরাজশেখর বসু প্রমাণ দিলেন হাস্যরস পুরানো মদের মতো, যত দিন যায় ততই তা আরো পরিপক্ক, ততই তার আরো সৌরভ, সুস্বাদ।

ইতিমধ্যে প্রচুর নতুন বই বেরিয়েছে। খণ্ডিত বাঙলায় বইয়ের যা কম-কাটতি সে কথা ভাবলে বই ছাপায় এই অপরিসীম উদ্যম দেখে আশ্চর্য লাগে। সবাই জানে খাদ্যের অভাবে কেউ বাঁচে না। বাঙালীর কিন্তু আরো একটু চাই—বই।

এবং কাব্যগ্রন্থই বা নয় কেন? পাঠক কম সেকথা স্বীকার্য। কিন্তু কবিতা এ যুগে অচল একথা যাঁরা মনে করেন তাঁদের বিব্রত করতেই বোধ করি নিয়মিত কবিতার বই ছাপা হচ্ছে এবং ফুরিয়েও যাচ্ছে। কবিতা যেদিন চলবে না সেদিন আর যা চলবে তা মেকির চাইতেও মেকি। নতুন কবিতার বই : (১) ছন্দ চতুর্দশী—মোহিতলাল মজুমদার (ছোটো বই, অনেকগুলি সনেট)· (২) হংস-মিথুন—প্রমথনাথ বিশী (১৯২৬ সাল থেকে একাল পর্যন্ত লেখা লিরিকের সুন্দর সংগ্রহ। বহু প্রতীক্ষিত।); (৩) মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়—মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৯৪২-৫১ এই দশ বছরের রচনা থেকে সংকলন)।

রবীন্দ্রনাথের স্বরবিতান ২১শ খণ্ড এখন পাওয়া যাচ্ছে। এতে আছে ভানুসিংহের পদাবলী থেকে ৯খানি গানের স্বরলিপি।

বহুকাল পরে শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্য' ছাপা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'শরৎচন্দ্র বক্তৃতার'-র জন্য এবার আমন্ত্রণ করেছেন ঔপন্যাসিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে। খুব সম্ভব তাঁর বক্তৃতার বিষয় হবে 'রবীন্দ্রনাথ'।

বাঙলা সাহিত্যে অনাদৃত দপ্তর হচ্ছে বিদেশী ভাষার অনুবাদ। সেদিকেও ধুলোবালি সাফ করার কাজ চলছে এটা আশার কথা। উল্লেখযোগ্য : (১) জওহরলালের—বিশ্বইতিহাস, প্রসঙ্গ। (২) রোমাঁ রলাঁর—জাঁ ক্রিস্তফ। ২য় খণ্ডের অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্ত, ৩য় খণ্ডের পুষ্পময়ী বসু অনুবাদ করেছেন। (৩) ভান্দা ভাসিলিয়েভস্কার—রেইনবো।

সুখলতা রাও লিখিত ছোটদের 'গল্পের বই' আর 'আরো গল্প' মনে হয় যেন একযুগ আগে নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। লেখিকার নিজের আঁকা ছবিসহ সেই বই দুখানি একত্রে এতকাল পরে 'গল্প আর গল্প' নামে প্রকাশ হয়েছে।

হালের লেখা উপন্যাসের মধ্যে কয়েকখানা : (১) উত্তরঙ্গ—সমরেশ বসু। লেখকের প্রথম উপন্যাস। (২) আর একদিন—গোপাল হালদার। পূর্ব প্রকাশিত 'একদা' আর 'অন্যদিন'-এর পরবর্তী খণ্ড। (৩) চলাচল—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। বিশ্ববিদ্যালয়-বিজ্ঞান ক্লাসের ছাত্রী এ উপন্যাসের নায়িকা। (৪) জলজঙ্গল—মনোজ বসু। বঙ্গোপসাগরের ধারঘেঁষা বাঙলাদেশের কাহিনী। (৫) কাদামাটির দুর্গ—প্রবোধকুমার সান্যাল। (৬) একটি সঙ্গীতের জন্মকাহিনী—অমরেন্দ্র ঘোষ এবং (৭) কালের মন্দিরা—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপন্যাসের নতুন সংস্করণ : (ক) সীতা দেবীর পরভৃতিকা। (খ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দর্পণ। (গ) বনফুলের জঙ্গম (৪র্থ ও ৫ম খণ্ড) এবং (ঘ) মনোজ বসুর সৈনিক।

হাসির গল্পের নতুন বই শিবরাম চক্রবর্তীর (১) হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ আর (২) আপনি কি হারাইতেছেন জানেন না। গল্পের বিষয় গুরুগম্ভীর। হাসির ধারে সব ভারই কেটে যায়, যদিও হাসতে গিয়ে ভাবতে হয় একবার।

'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসের শক্তিমান নবীন লেখক সমরেশ বসুকে অভিনন্দিত করে সিগনেট প্রেস পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।

লিখে থাকেন। ছোট গল্প লেখকদের সম্বৎসরের অনেক শ্রেষ্ঠ রচনা শারদীয় সংখ্যাগুলিতেই আত্মপ্রকাশ করে থাকে। সাধারণের মধ্যে একটা চলতি ধারণা আছে যে, পুজার সময় লেখকদের খুব বেশি পরিমাণে লিখতে হয় বলে এবং এই লিখন-প্রয়াসের পশ্চাতে আর্থিক মূল্যপ্রাপ্তির প্রণোদনা আছে বলে লেখকেরা নিতান্ত যাহোক-তাহোক করে তাঁদের কর্তব্য সমাপন করেন। কিন্তু ধারণাটি ঠিক নয়। লেখকদের এই সময়ে খুব বেশি পরিমাণে লিখতে হয় ঠিক, তবে তার ধাক্কাটা অতিরিক্ত পরিশ্রমের উপর দিয়েই যায়, লেখার গুণাপকর্ষের উপর দিয়ে নয়। সকলেই এ সময়ে তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনা প্রকাশ করতে চান; কারণ শারদীয় সংখ্যাগুলির এমনি একটি ঐতিহ্য দাঁড়িয়ে গেছে যে, সম্বৎসরের ছোট গল্পের একটা মূল্যোমাপ নির্ধারণ করতে হলে সমালোচকেরা মুখ্যতঃ এই বিশেষ সংখ্যাগুলিরই দ্বারস্থ হয়ে থাকেন। তাঁদের দ্বারস্থতা ক্বচিৎ নিষ্ফল হয়। গত পনেরো বৎসরের শারদীয় সংখ্যাগুলির যদি একটা হিসাব নেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে, লেখকদের অধিকাংশ প্রতিনিধিস্থমূলক ছোট গল্প—যেসব গল্পের জন্য তাঁদের প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর হয়েছে—এই বিশেষ সংখ্যাগুলিতেই বেরিয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার', প্রবোধ সান্যালের 'অংগার', তারাশঙ্করের 'মাটি', মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঘর ও ঘরামি', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'গার্ড সাহেব', সুবোধ ঘোষের 'শক্-থেরাপি'—এই শারদীয় সংখ্যারই গল্প। অপেক্ষাকৃত স্বল্প প্রবীণদের শ্রেষ্ঠ অনেকানেক ছোট গল্প শারদীয় সংখ্যার মাধ্যমেই প্রথম সাধারণ্যে প্রচার লাভ করে। অবশ্য লেখার ভালোমন্দ সব সময় লেখকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, ভালো গল্প লিখতে চাইলেই যে হাত দিয়ে ভালো গল্প বেরোবে আর সেটা ঠিক শারদীয় উৎসবের প্রাক্কালেই বেরোবে, এমন কোন কথা নেই। তবে লেখকেরা এই সময়ে যে পাঠকদের সামনে তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি ধরে দেবার সাধ্যমতো চেষ্টা করেন, তা সম্বৎসরের আর শারদীয় কালের তুলনামূলক হিসাব কষলেই ধরা পড়বে।

মোট কথা, ছোট গল্পই হলো বাঙলা শারদীয় সংখ্যাগুলির আসল সম্পদ। ছোট গল্পবিরহিত শারদীয় সংখ্যা কল্পনায়ও অভাবনীয়।

২

অন্যান্য বৎসরের মতো এবারও শারদীয় সংখ্যাগুলিতে বিস্তর ছোট গল্প বেরিয়েছে। একটি পত্রিকায় ছোট গল্পের সংখ্যা গুনে দেখলাম ২৯; অন্যান্য পত্রিকায় এত না হলেও দশ থেকে পনেরোটি গল্প প্রথম শ্রেণীর প্রায় প্রত্যেকটি পত্রিকাতেই আছে। এক নাগাড়ে যিনি সবগুলি গল্প পড়তে যাবেন, তাঁর প্রায় গল্পারণ্যে দিশা হারাবার দাখিল। তবু এরই মধ্যে দিয়ে পথ করে নেবার কৌশল জানা চাই। এই জ্ঞান অত্যাবশ্যক এজন্যে যে, অনেক ছোট গল্প একসঙ্গে পড়ার দ্বারা শুধু যে গল্প-পড়ার আনন্দই আমাদের অধিগত হয় তা নয়, বর্তমান বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন-কামনা, তার ব্যথা-বেদনা, সুখ-দুঃখের হদিসও এর মধ্য দিয়ে নির্ভুলভাবে পাওয়া যায়। ছোট গল্পগুলি যেন বাঙালী মানসের দিগ্দর্শনস্বরূপ। আমাদের মনের হাওয়া কোন্ দিকে বইছে, সাম্প্রতিক বাঙালী জীবন কী কী সমস্যার দ্বারা পীড়িত, বাঙালী লেখকদের রচিত ছোট গল্পের প্রকৃতি অনুধাবন করলে তা সহজেই ধরা পড়বে। কথাটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ হলেও এ প্রসংগে পুনরায় বলি, সাহিত্যের সর্ব-প্রধান উপকরণ হলো বাস্তব জীবন, সম-সাময়িক বাস্তব জীবন বললে বিবৃতিটুকু আরও নির্ভুল হয়। কল্পনার যত বড় স্ফূর্তিই সাহিত্যের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হোক না কেন, বাস্তব উপকরণ বাদ দিয়ে সাহিত্যের এক-পা চলবার উপায় নেই। ছোট গল্প সম্পর্কে এ কথা আবার বিশেষ করে সত্য। আমাদের চারপাশে যে বস্তুময় পৃথিবী ছড়িয়ে আছে, ছোট গল্পের কারবার তাই নিয়ে। আত্মগত ভাবনা, অর্থাৎ মনের জগতে যে ছোট গল্প বিচরণ করে না তা নয়, তবে সেটা মুখ্যতঃ হলো কবিতার এলাকা। রসানুভূতির দিক থেকে কবিতা আর ছোট গল্পের প্রকৃতি অনেকটা স্বগোত্র; কেবল উপকরণের বেলায় তাদের প্রভেদ। কবি প্রধানতঃ আত্মভাবনায় নিবিষ্ট; ছোট গল্পকারের কৌতূহল পরিদৃশ্যমান বহিপৃথিবীর বিচিত্র ঘটনার মধ্যে পরিব্যাপ্ত। কাজেই সমসাময়িক জীবনের সামাজিক চেহারা বোঝবার পক্ষে ছোট গল্প একটি প্রধান সহায়। বাঙালী সমাজের নাড়ীর গতি অনুধাবন করতে গিয়ে যে সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিত শুধু তথ্য আর স্ট্যাটিস্টিক্স ঘাটবেন, তাঁর সিদ্ধান্ত নির্ভরযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাঁকে আমরা বাঙলা ছোট গল্পের শরণাপন্ন হতে বলি। সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার এর চাইতে ভালো মাল-মশলা তিনি আর কোথাও খুঁজে পাবেন না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এবারকার শারদীয় সংখ্যার ছোট গল্পগুলির কথা ধরা যাক। যে পাঠক একটু মনোযোগের সংগে এই রচনাগুলি পড়বেন তিনি সহজেই ধরতে পারবেন আমাদের মানস একই কালে দুইটি বিপরীত ভাবনার দ্বারা আন্দোলিত হচ্ছে। একদিকে সমসাময়িক জীবনের আর্থিক অব্যবস্থা ও দৈন্য সম্বন্ধে অতিমাত্র সচেতনতা; অন্যদিকে বর্তমানের রূঢ় পরিবেশকে ভোলবার উপায় স্বরূপ অতীতের মধ্যে শান্তি অন্বেষণ। শেষোক্ত লক্ষণ দুজন প্রতিষ্ঠাবান লেখকের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকট দেখতে পাচ্ছি। একজন তারাশঙ্কর, অপরজন প্রমথনাথ বিশী। তারাশঙ্কর এবার যে কটি ছোট গল্প লিখেছেন তার সব কয়টির মধ্যেই সমসাময়িক কাল অনুপস্থিত। অন্ততঃ, প্রশ্ন ভাবনা সংশয় সন্দেহ ব্যর্থতা বেদনা নিয়ে যে সমসাময়িক কাল, তার সমস্যা তিনি এবারকার রচনাগুলিতে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন বললে বোধ করি খুব অন্যায় বলা হবে না। 'প্রহ্লাদের কালী' (দেশ) গল্পে তিনি যে কালীভক্ত ডাকাতের চিত্র অঙ্কন করেছেন সে এ যুগের প্রতীক নয়; বিগতকালের প্রতীক। 'শিলাসন' (যুগান্তর)-এর ঘটনা এ যুগের পটভূমিতে স্থাপিত হলেও বিষয়বস্তুর খাতিরে তার মধ্যে এমন একটা আদিমতার আবহাওয়া সঞ্চার করা হয়েছে যে, মনে হয় বর্তমানের ডামাডোল পেরিয়ে আমরা বহু দূরে অতীতে ফিরে গেছি। (প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, 'শিলাসনই' তারাশঙ্করের এবারকার শ্রেষ্ঠ রচনা। এ সম্বন্ধে যথা-স্থানে আরও আলোচনা করব।) 'বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা' (শনিবারের চিঠি) গল্পটি রোমান্টিসিজমের আবহাওয়ায় আগাগোড়া ভরপুর। গল্পটির পরিণতিতে যে বেদনার সুর লাগানো হয়েছে তা মূলতঃ কাব্যধর্মী এবং অতীতের স্মারক। তারাশঙ্করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা 'রাইকমলের' বিষয়বস্তু আর ভাবের সংগে এ গল্পের বিষয়বস্তু আর

ভাবের কোথায় যেন একটা অদৃশ্য মিল রয়েছে। 'রাইকমল' উপন্যাসে যেমন এখানেও তেমনি, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মানুষের প্রেমাকুলতাকে কাহিনীর প্রধান উপজীব্য-রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। গল্পটি নাটকীয়তা গুণে সমৃদ্ধ, তবে এই নাটকীয়তার প্রেরণা এসেছে কাব্য থেকে, সমসাময়িক জীবনের ঘটনাবৈচিত্র্য থেকে নয়—এইটেই আমাদের বলবার কথা। 'বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা' নাটকাকারে লিখিত; 'জন্মান্তর' (গণবার্তা) গল্পটিও তা-ই। এই গল্পে লেখক তিনটি ধারাবাহিক যুগ বা তিন পুরুষের ঘটনাকে একটি কাহিনীর আকারে সংগ্রথিত করেছেন এবং এর মধ্য দিয়ে একটি তত্ত্ব পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন। তত্ত্বটি এই যে, পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে পরিবেশের ভিন্নতা ঘটলেও ইতিহাসের বদল হয় না—একই ইতিহাস অর্থাৎ ভাবের সংঘাতজনিত একই আদর্শদ্বন্দ্ব ঘুরে ফিরে যুগ থেকে যুগে পুনরাবৃত্ত হতে থাকে। ধারণাটি আজকের দিনের সর্বসম্মত আদর্শ বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের আদর্শের বিরোধী হলেও লেখক গল্পটিতে তাকে অত্যন্ত মনোগ্রাহী রূপ দিয়েছেন। তবে এই মনোগ্রাহিতা সত্ত্বেও বলব, ঘটনা-বিন্যাসে এবং চরিত্রচিত্রণে তারাশঙ্কর এই গল্পে অতীতটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, দ্বিধাদ্বন্দ্ব-প্রশ্নকণ্টকিত বর্তমান জীবনের রূপ গল্পটিতে তেমন ফোটে নি। প্রসঙ্গতঃ, শারদীয় সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকার জন্য তারাশঙ্কর এবার যে উপন্যাস লিখেছেন—'সঞ্জীবন ফার্মেসী'—তাতেও অতীত স্মৃতিচারণটাই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে প্রমথনাথ বিশী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গকুশলতা ছেড়ে প্রাচীন ভারতের আর অতীত বাঙালী জীবনের মোহময় চিত্র পরিবেশনে ব্রতী হয়েছেন। 'মহেন-জো-দড়োর পতন' (আনন্দবাজার পত্রিকা), 'চিলা রায়ের গড়' (দেশ), 'ধ্বনে পাতা' (যুগান্তর), 'গুরুমারা চেলা' (বসুমতী) প্রভৃতি গল্প একথার নিদর্শন। শেষোক্ত গল্প দুটির ভিতর ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন রয়েছে সত্য, তবে অতীত-কালীন পরিবেশটাই তাদের মূল কথা। সমসাময়িক জীবন থেকে কাহিনীর উপকরণ সংগ্রহ করলে তাঁর ব্যঙ্গ আরও ক্ষুরধার হতে পারতো। অবিমিশ্র ব্যঙ্গ গল্পের উদাহরণ হিসাবে তাঁর 'তিমিঙ্গিলা' (শনিবারের চিঠি) রচনাটি উল্লেখযোগ্য। তাঁর ছোটগল্প উপন্যাস-সংবাদও' (কথাসাহিত্য) উপভোগ্য।

অপর পক্ষে সাম্প্রতিক যুগাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লিখিত লেখকদ্বয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা গ্রহণ করেছেন। তিনি সমসাময়িক জীবনের নগ্ন বাস্তব সত্যকে অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রকাশের কাজে ব্রতী হয়েছেন। বর্তমান বাঙালী সমাজের নিচু তলার জীবনের আর্থিক দৈন্যের চিত্র এবারকার শারদীয় সংখ্যাগুলিতে মাণিকবাবুর গল্পে যেমন মর্মান্তিকভাবে ফুটেছে এমন আর কারও লেখায় ফোটে নি। তাঁর 'ফেরিওলা' (যুগান্তর) নিঃসন্দেহে এ বৎসরের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা। নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনে অর্থকৃচ্ছ্রতা কতদূর গিয়ে পৌঁচেছে, এ গল্পটিতে সে সত্য অতি শিল্পোত্তীর্ণ রূপ লাভ করেছে। 'সতী' (পরিচয়) গল্পের বিষয়ও আর্থিক দৈন্য, তবে এ গল্পে নাটকীয়তার উপাদান যথেষ্ট থাকলেও গল্পটি 'ফেরিওলা'র মতো রসসমৃদ্ধ হতে পারে নি। অপেক্ষাকৃত উঁচু তলার সচ্ছল স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রতি আক্রোশ ও তিক্ততা লেখককে এই গল্পে স্বধর্মভ্রষ্ট করেছে। এ জাতীয় ব্যর্থতার গল্পে বেদনা ও কারুণ্যের অনুভূতি যেখানে সব ছাড়িয়ে বড়ো হয়ে ওঠবার কথা, সেখানে অন্তর্দাহ ও ক্ষোভ প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে গল্পটির সুর কেটে গেছে। পাঠসূচীতে গল্পটিকে 'ব্যঙ্গ-চিত্র' এই আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতেও উপরের মন্তব্যগুলির প্রযোজ্যতার কিছু কমে না। অন্য পক্ষে মাণিকবাবুর 'পাশ-ফেল' (আজকের ছোট গল্প) আর একটি সার্থক গল্প। একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আর পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির নির্মম সমালোচনা, অন্যদিকে নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের আর্থিক অসহায়তা এই গল্পে অতি সূক্ষ্ম শিল্পরূপ পেয়েছে। মাণিকবাবুর 'মহা-কর্কট বটিকা' (তরুণের স্বপ্ন)-ও নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের অসহায়তার আরেকটি মর্মান্তিক চিত্র। 'শারদীয়া' (বসুমতী) গল্পটি উদ্দেশ্যমূলক গল্পের নিদর্শন হিসাবে মন্দ নয়।

একটা জিনিস লক্ষ্য করে আশান্বিত হওয়া গেলো, মাণিকবাবু এবারকার গল্প-গুলিতে sexকে মোটেই আমল দেননি, যে লক্ষণ এক সময়ে তাঁর লেখায় অতি প্রবল ছিল। সুস্থতার অভিমুখে তাঁর এই মানসযাত্রা অব্যাহত হোক এই কামনা জানাই। প্রচারবাদী সুরটাও তাঁর গল্পে এবার অনুগ্র বলে মনে হলো। বর্তমান বাঙালী সমাজের যে সকল টুকরা টুকরা আলেখ্য মাণিকবাবু এবার আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন তা যেমনি উজ্জ্বল তেমনি নিদারুণ সত্য। গল্পগুলির ভিতর দিয়ে মাণিকবাবুর ক্রমবর্ধমান সমাজ-সচেতনতার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এই সচেতনতা তাঁর মতো লেখকেরই উপযুক্ত এবং অভিনন্দনীয়। লেখকের সমাজ সচেতনতার উৎস যাই হোক—বিশেষ কোন দলীয় বাম-পন্থী রাজনৈতিক ভাবাদর্শে বিশ্বাস অথবা লেখকের নিজস্ব শিল্পী মানসসঞ্জাত প্রেরণা—শিল্পের বিচারে সেটা ধর্তব্য নয়। শুধু দেখতে হবে যেটা তিনি সাধারণ্যে ধরে দিয়েছেন সেটা শিল্পসম্মত হয়েছে কিনা। এই মানদণ্ডে মাণিকবাবুর এবারকার গল্প-গুলি যে উৎরেছে সেটা অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করব। দলীয় রাজনীতির খানাখন্দ এড়িয়ে তিনি যদি তাঁর এই শিল্প-অভিযান অক্ষুন্ন রাখতে পারেন তবে তাঁর লেখার আর মার নেই।

অপর পক্ষে সুবোধ ঘোষ অতীতেও ফিরে যান নি, আবার নিষ্করুণ রূঢ় বাস্তবকে তার নগ্ন স্বরূপে চিত্রিত করবারও প্রয়োজন বোধ করেন নি। গল্পকে তিনি গল্পরূপেই দেখেছেন এবং এই ব্যাপারে তিনি তাঁর অসাধারণ লিপিকুশলতা, শিল্প রসবোধ ও আত্মপ্রত্যয়ের উপর মুখ্যতঃ নির্ভর করেছেন। এবারকার শারদীয় সংখ্যায় যে দুটি গল্প তিনি লিখেছেন—'চতুর্ভুজ ক্লাব' (আনন্দ-বাজার পত্রিকা), 'দুঃসহধর্মিণী' (দেশ)—তার কোনটাই পরিচিত জীবনের গণ্ডীবদ্ধ বৃত্ত থেকে নেওয়া কাহিনী নয়; এমন জায়গায় লেখক তাঁর কল্পনাকে প্রসারিত করেছেন যা সাধারণ অভিজ্ঞতার পরিধির বাইরে। সাধারণ জীবনের অভ্যস্ত অভিজ্ঞতার বর্ণনা যে গল্পে নেই সে গল্প সহসা unrealistic ব'লে ভ্রম হতে পারে, কিন্তু এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে। শিল্পীর চক্ষে শিল্প প্রেরণাটাই হলো সব চাইতে বড়ো বাস্তব। এই প্রেরণার উপকরণ তিনি যে সূত্র থেকেই আহরণ করুন না কেন, তিনি যদি তাকে শিল্পসম্মত রূপদানে সমর্থ হন, রসের বিচারে আমরা তাকে ভূয়সী

অভিনন্দন জানাতে বাধ্য। কারণ 'রসের বিচার করতে বসে আমাদের শুধু শিল্পীর প্রেরণার উৎস বিচার করলেই হবে না, প্রেরণার ফলটাকেও বিচার করতে হবে। এই মানদণ্ডে সুবোধবাবুর উল্লিখিত দুটি গল্প শ্রেষ্ঠ দুটি গল্পের মর্যাদা অনায়াসেই দাবী করতে পারে। বিশেষ করে 'চতুর্ভুজ ক্লাব' গল্পটির তুলনা হয় না। বর্ণনার সাবলীলতায়, ভাষার স্বচ্ছন্দ প্রবাহে, সৃষ্ট পরিবেশের অভিনবত্বে আর বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যে গল্পটি অনবদ্য রূপ লাভ করেছে। 'চতুর্ভুজ ক্লাব' নিঃসন্দেহে এবারকার একটি শ্রেষ্ঠ রচনা।

গল্পটির তলায় তলায় একটি রূপক প্রচ্ছন্ন রয়েছে। অথবা তাকে একটি তত্ত্বও বলা যায়। গল্পটি গল্প হিসাবেই অতি চমৎকার, তার উপর এই তত্ত্বের যোজনায় তার সার্থকতা আরও বেড়েছে। চারি সদস্যবিশিষ্ট চতুর্ভুজ ক্লাব যেন প্রাচীন গোষ্ঠীজীবনের প্রতীক। তাদের পরস্পরের মধ্যে একাত্মতা, এক সঙ্গে আহার-বিহার, সুখ-দুঃখ সবাই মিলে সমান ভাগে ভাগ করে নেওয়ার মনোভাব—সবই আদিম কৌম সমাজ-ব্যবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সদস্যচতুষ্টয়ের অন্যতম বিনু বিয়ে ক'রে বৌ ঘরে আনলে আর দেখতে দেখতে তাদের এত সাধের গড়া ক্লাবের সংহতিতে ভাঙন ধরল। সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাত্রার আদর্শের ভিতর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মনোভাব ঢুকে চতুর্ভুজ ক্লাবকে তছনচ করে দিল। গল্পের এই পরিণতি থেকে অনুমান করি, লেখক টুকু-বৌকে সম্পত্তিবোধের প্রতীকরূপে আঁকতে চেয়েছেন। প্রাচীন কৌম সমাজের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে বলতে গেলে কোন সমস্যা ছিল না, সহজ স্বচ্ছন্দ ছিল তাদের সম্মিলিত জীবনযাত্রা; কিন্তু যে মুহূর্তে তাদের মধ্যে সম্পত্তিবোধ অঙ্কুরিত হল অমনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মনোভাব এসে তাদের মধ্যে বাসা বাঁধলো। দেখা দিল ঈর্ষা, সন্দেহ, লোভ, বিদ্বেষ, হিংসা। দেখতে দেখতে আদিম সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামো ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ল। 'চতুর্ভুজ ক্লাব' গল্পে লেখক মার্ক্সীয় বিজ্ঞানের এই সর্বজনগ্রাহ্য তত্ত্বটিকেই শিল্পাকারে অভিব্যক্ত করতে চেয়েছেন বলে মনে হয়।

'দুঃসহধর্মিণী' গল্পটিও লিপিকুশলতা গুণে এবং বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যে যথার্থ রসোত্তীর্ণ হয়েছে। গল্পটিতে বর্ণনার সংযম লক্ষ্য করবার মতো। নির্বিবেক কমলেশ বৈষয়িক উন্নতির সোপানরূপে স্ত্রী ধীরাকে ব্যবহার করতে দ্বিধা করে না, কিন্তু সে দ্বিধাহীনতা নিরঙ্কুশ নয়; একটা নির্দিষ্ট সীমাচিহ্নের দ্বারা তা পরিবেষ্টিত ও সুরক্ষিত। স্ত্রীর কায়িক সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে যত দূর পর্যন্ত তাকে দিয়ে উদ্দেশ্য সাধন করিয়ে নেওয়া যায় মাত্র তত দূর কমলেশের বিবেকশূন্যতার সীমানা; কিন্তু যে মুহূর্তে স্ত্রীর জীবনে সত্যিকার ব্যভিচারের সমস্যা দেখা দিল, অমনি কমলেশ ঘুরে দাঁড়ালো। কমলেশের ভালোবাসা, স্বামিত্বের সংস্কার, অধিকারবোধ সবগুলি প্রবৃত্তি এক সঙ্গে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আর কমলেশের এই আকস্মিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে ধীরাও তার স্বামীকে এই প্রথম সত্যিকার ক'রে পেল।

লেখকের সংযমকে চিহ্নিত করছি এ জন্যে যে, অপেক্ষাকৃত স্বল্প শক্তিশালী লেখক হয়তো এরকম একটা সিচ্যুয়েশন পেলে গোড়াতেই কমলেশকে দিয়ে তার স্ত্রীকে নারীলুব্ধ ক্ষমতাবানদের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করিয়ে ছাড়তেন—আজকাল এ ধরণের আত্মসমর্পণের গল্প আখছার লেখা হচ্ছে; গল্পের খাতিরেই লেখকেরা এ রকম আত্মসমর্পণ ঘটান কিম্বা এ থেকে একপ্রকার 'সাদীয়' আনন্দ অনুভব করবার জন্যে এই প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করেন তা বলতে পারব না—; কিন্তু 'দুঃসহধর্মিণী' গল্পের লেখক সে স্থলে আশ্চর্য ধীরতার সঙ্গে আত্মসংবরণ করেছেন এবং গল্পকে নিজের গতিতে অগ্রসর হতে দিয়েছেন। তিনি কোথাও মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেননি। এ সংযম সুবোধবাবুর লেখনীর উপযুক্ত বটে।

তবে কমলেশের ভাবান্তর যেন একটু অধিক সহসা ঘটিয়ে ফেলা হয়েছে বলে মনে হয়। লেখক এ জন্যে আমাদের তৈরী হবার যথোচিত অবসর দেননি; ক্ষেত্র প্রস্তুত না ক'রেই তিনি যেন কমলেশকে নূতন ভূমিকায় সংস্থাপন করেছেন। এই কারণে গল্পের আদি আর মধ্য যেমন চিত্তগ্রাহী হয়েছে, সমাপ্তির অংশটুকু তেমন হয়নি বলে আমাদের ধারণা। সেখানে বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব ঘটেছে।

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্ন্যাল এবং মনোজ বসু দুইজনেই কুশলী গল্পকার। এবার তাঁদের গল্পে নৈপুণ্যের পরিচয় আছে, কিন্তু যত্নের পরিচয় নেই। শারদীয় সংখ্যার দাবী পূরণের জন্যে উভয়েই যাহোক-তাহোক ক'রে গল্প লিখেছেন ব'লে মনে হয়। প্রবন্ধের গোড়ায় শারদীয় সংখ্যার গল্পের জন্যে লেখকদের যে প্রযত্নের কথা বলেছি তা বিশেষ ক'রে অপেক্ষাকৃত স্বল্প প্রবীণদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য, কেন না তাঁদের উঠতি বয়স, উঠতি নাম, লেখার গুণাগুণের উপর তাঁদের ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠা বহুলাংশে নির্ভরশীল ব'লে তাঁদের অর্ধমনস্ক হবার যো নেই। কিন্তু যাঁরা প্রতিষ্ঠার শিখরে পূর্বাহ্নেই আরোহণ করে আছেন তাঁরা অনেক সময় শ্রমশীলতায় ঢিল দিয়ে থাকেন। আলস্য আর ঔদাসীন্যই এই মানসিক শ্লথতার কারণ বলে মনে হয়। প্রবোধ সান্ন্যাল এবার 'তুচ্ছ' পর্যায়ে যে কটি গল্প লিখেছেন (যুগান্তর, কথা সাহিত্য, তরুণের স্বপ্ন ইত্যাদি) তার বিষয়বস্তু সত্যই তুচ্ছ। গল্পে লিপিকুশলতার প্রমাণ আছে, কিন্তু বিষয়বস্তু নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

এ জাতীয় গল্প রচনার দ্বারা প্রবোধ সান্যাল তাঁর শক্তির অপব্যয় করেছেন ব'লে আমরা মনে করি। 'দেনা-পাওনা' (দেশ) গল্পটি একই রকমের তুচ্ছ বিষয় নিয়ে লেখা হলেও তার অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গ কাহিনীটিকে উপভোগ্য করে তুলেছে। প্রবোধ সান্যাল এবার যথার্থ সীরিয়স ভঙ্গীতে দুটি কি তিনটি গল্প লিখেছেন, তার মধ্যে 'জ্বর' (পূর্বাশা) আর 'নিশিগন্ধা' (আনন্দবাজার পত্রিকা) উল্লেখযোগ্য।

প্রবীণ লেখকদের মধ্যে আরেকজন প্রতিষ্ঠাবান শিল্পী হলেন 'বনফুল'। কিন্তু তিনিও এবার বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। তাঁর 'আদর্শ ও বাস্তব' (আনন্দবাজার পত্রিকা) এবং 'রাক্ষসী' (দেশ) এ দুয়ের কোনটাই আমাদের মনঃপূত হয়নি। 'রাক্ষসী' গল্পের বর্ণিত জিঘাংসা ও শোণিতলোলুপতা রীতিমতো বীভৎস রসের পর্যায়ে গিয়ে পড়েছে।

প্রবীণ ভাষাশিল্পী অন্নদাশঙ্কর রায় 'হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে' (দেশ) গল্পে একটি সন্দেহাতুর মানুষের অদ্ভুত মনন-ক্রিয়ার সফল চিত্র অংকন করেছেন। তবে প্রথম শ্রেণীর গল্প একে বলা যায় কি না সন্দেহ। অন্নদাশঙ্করের গল্পের ভাষার ঔজ্জ্বল্য বাদ দিলে অনেকখানিই বাদ পড়ে।

(৩)

এবারকার শারদীয় গল্পগুলিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আর একটি জিনিস চোখে পড়ল। —লেখকেরা মোটামুটি সকলেই ভালো লিখেছেন, লিপিকুশলতার পরিচয় প্রায় প্রতি রচনায় স্পষ্ট, কিন্তু খুব কম লেখক সম্বন্ধেই একথা বলা চলে যে, তাঁরা যথার্থ উদ্ভাবনী প্রতিভার নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তার অর্থ, অভ্যাসে অভ্যাসে লেখকদের লিখন-ক্ষমতা অদ্ভুত পরিমার্জিত হয়েছে, কিন্তু কল্পনাকুশলতা সেই অনুপাতে শাণিত হয়নি। দৃষ্টি-ভঙ্গীতেও ব্যাপকতর কোন পরিপ্রেক্ষিতের ইঙ্গিত পাওয়া গেল না। সেই মধ্য ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের ধারাবাহিক গতানু-গতিকতার বৈচিত্র্যহীন ইতিবৃত্ত। সাধারণ জীবনের অভাবের দৈন্যের ছবি গল্প-গুলিতে আছে, কিন্তু একমাত্র মাণিকবাবুর গল্প ছাড়া আর কারও গল্পে সে ছবি নাটকীয় রূপ লাভ করেনি। গত বছরের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করে বলতে হয়, এ বৎসর ভালো লেখার পরিমাণ বেড়েছে, কিন্তু খুব-ভালো লেখার নয়। একমাত্র তারাশঙ্করের 'শিলাসন', সুবোধ ঘোষের 'চতুর্ভুজ ক্লাব' আর 'দুঃসহধর্মিণী', মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফেরিওলা', জোতিরিন্দ্র নন্দীর 'একটিও না' (দেশ) এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'সঙ্গিনী' (দেশ) 'খুব-ভালো'র পর্যায়ে পড়ে; বাদ বাকী রচনাকে গল্পভেদে ভালোত্ব কিম্বা মামুলিত্ব নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

তারাশঙ্করের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তাঁর 'শিলাসন' গল্পটি সম্পর্কে আরও দু-চার কথা বলা দরকার। 'শিলাসন' সাঁওতাল পরগণার একটি আদি-বাসী সম্প্রদায়ের মানুষের সংস্কার, বিশ্বাস, ভালোবাসা ও হিংসার কাহিনী। কাহিনীটিকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে লেখকের লিপি-চাতুর্যের একটা নতুন দিকের পরিচয় পাওয়া গেল। লিপি-চাতুর্যগুণে গল্পে আদিম বন্য জীবনের atmosphereটিও বেশ জমেছে। গল্পের মূল প্রেরণা নৃতাত্ত্বিক, কিন্তু তার আবেদন মানবিক। মোড়ল-কন্যার সুগভীর স্বামী ও সংস্কার নিষ্ঠা এবং তার জীবনের করুণ পরিণতি মনকে বিচলিত করে। সর্বোপরি গল্পটিতে নিহিত আছে একটি তত্ত্ব, তাও মনকে উচ্চ ভাবের দ্বারা আবিষ্ট করতে কম সাহায্য করে না। কায়মনোবাক্যে অহিংস হওয়ার অদ্ভুত শুভকরতা এবং হিংসার ব্যর্থতার আদর্শ বেদনার রসে আপ্লুত করে এই গল্পে পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। গল্পটির নাটকীয় সমৃদ্ধিও কম নয়।

স্বর্গত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুটিকয়েক রচনা এবারকার শারদীয় সংখ্যাগুলিতে স্থান পেয়েছে। তার মধ্যে 'আমার ডাক্তারি' (কথা-সাহিত্য) গল্পটি আন্তরিকতার স্পর্শে যথার্থ সজীব। কাহিনীর বেদনাকরতা মনকে অভিভূত করে।

অপেক্ষাকৃত স্বল্প প্রবীণদের মধ্যে ছোট-গল্প লেখক হিসাবে শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্রের খ্যাতি সর্বাধিক। এবারও তাঁর সে-খ্যাতি অক্ষুন্ন রয়েছে। এবার পূজায় সব চাইতে বেশী সংখ্যক গল্প লিখেছেন তিনিই (গণবার্তায় প্রকাশিত 'অকথিতা' উপন্যাস-সমেত তাঁর এবারকার প্রকাশিত রচনার সংখ্যা আনুমানিক পনেরো হবে), কিন্তু লক্ষ্য করলাম—এবং লক্ষ্য করে চমৎকৃতও হলাম যে, তাঁর রচনায় এই পরিমাণ-আধিক্য তাঁর রচনার গুণের অপহ্নব ঘটাতে পারে নি। প্রায় সব গল্পে তিনি উৎকর্ষের একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁচেছেন। অবশ্য গত বৎসরের শারদীয়া দেশ-এ প্রকাশিত 'হেডমিস্ট্রেস'-এর মতো অপূর্ব ভাবরসান্বিত গল্প এবার তিনি একটিও লিখতে পারেন নি, কিন্তু এই এক বৎসরে তাঁর লিপি-নৈপুণ্য আরও বেশি মার্জিত আর ধারালো হয়েছে বলে মনে হল। বিষয়বস্তু নির্বাচনেও তিনি এবার সমধিক বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। সত্যিকার প্রেমের গল্প 'চাকুরি' (মন্দিরা) থেকে শুরু করে যৌন-সমস্যা-ঘটিত প্রেমের গল্প 'সঙ্গিনী' (দেশ) আর 'প্রেম' (বসুমতী), বস্তি-জীবনের প্রেমের গল্প 'বন্ধন' (প্রবাহ), কুচবিহারের ভুখ-মিছিলের গল্প 'অপঘাত' (আজকের ছোট গল্প), পল্লীর প্রেম আর বেদনার গল্প 'ভুবন ডাক্তার' (আনন্দবাজার পত্রিকা), ঘরোয়া জীবনের স্নিগ্ধ-বিষণ্ণ দুটি ছবি 'দুঃখের বই' (কথাসাহিত্য) আর 'ছবি' (তরুণের স্বপ্ন) পর্যন্ত মধ্য ও নিম্নমধ্য-বিত্ত জীবনের নানাবিধ ঘটনার স্তরে তাঁর কল্পনা প্রসারিত হয়েছে। তবে তাঁর অধিকাংশ গল্পেরই মূল উপজীব্য হলো প্রেম, এটা বিশেষভাবে চোখে পড়বার মতো। পূর্বরাগ, বিবাহজ প্রেম, পরকীয়া প্রেম—সব রকম প্রেমের আলেখ্যই তাঁর রচনায় চিত্রিত হয়েছে। মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম-লীলার উপর আলোকসম্পাতে আর সংলাপে তাঁর প্রতিটি গল্প উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

এর মধ্যে 'সঙ্গিণী' নিঃসন্দেহে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। গল্পটির বিষয়বস্তুর বলিষ্ঠতা আর সমাজ-সচেতনতা মনে দাগ রাখে। কাহিনীর লিপিভঙ্গীও অপূর্ব। তবে অন্য সব দিক দিয়ে ভালো হওয়া সত্ত্বেও এ গল্পটি সম্পর্কে একটি প্রধান আপত্তি এই যে, লেখক আলোচ্য কাহিনীতে নরনারীর প্রেমকে যৌন সম্বন্ধের স্তরেই মুখ্যতঃ আবদ্ধ রেখেছেন, তাকে ইন্দ্রিয়াতীত স্নিগ্ধ-গম্ভীর রূপ দিতে পারেন নি। অর্থাৎ গল্পটি আগাগোড়া physical plane-এ রয়ে গেছে, spiritual plane-এ ওঠে নি। এর পরেই তাঁর 'ভুবন ডাক্তার' আর 'প্রেম' নামধেয় গল্পদুটির নাম করতে হয়। 'ভুবন ডাক্তার'-এর বিষয়বস্তু নরেন-

বাবুর অত্যন্ত বিষয়বস্তু থেকে কিছু স্বাতন্ত্র্য কিন্তু রচনাকৌশলে সমান সার্থক। পরিবেশের দিক থেকে এ গল্পটির সঙ্গে নরেনবাবুর পূর্বতন অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প 'চাঁদমিঞা'র কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে বলে মনে হল। 'প্রেম' গল্পে অর্চনাদির ভালোবাসার ক্ষুধার চিত্র বেদনাকরুণ রূপ লাভে সার্থক হয়েছে।

শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ এবার মাত্র চারটি গল্প লিখেছেন—'মাটির পা' (দেশ), 'দিনপঞ্জী' (বসুমতী), 'নতুন গান' (আজকের ছোটগল্প) ও 'পশু' (গণবার্তা)। সন্তোষ ঘোষের লিখনভঙ্গি অপূর্ব, গল্প জমাবার ক্ষমতা অদ্ভুত, কিন্তু বিষয়বস্তুর অকিঞ্চিৎকরত্বের জন্য এবার তাঁর গল্পের উৎকর্ষ অনেকখানি খণ্ডিত হয়েছে। 'মাটির পা' ও 'পশু' দুইটিই যৌন আকর্ষণমূলক কাহিনী এবং দুটি কাহিনীতেই যৌন আকর্ষণের প্রশ্নকে অনুপাত-অতিরিক্ত সাহিত্যিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এবার তাঁর সব চাইতে ভালো গল্প হয়েছে 'দিনপঞ্জী'। গল্পটির ইংরিজিভাষা-ভঙ্গির-স্বাদ-মাখানো লিপিচাতুর্য ও বর্ণনাসমৃদ্ধি উপভোগ করবার মতো।

প্রতিষ্ঠাবান লেখক সুশীল রায় লিখেছেন তিনটি গল্প—'মাথা' (দেশ), 'লক্ষ্মণ পণ্ডিত' (আনন্দবাজার পত্রিকা) ও 'কিনারা' (যুগান্তর)। এর ভিতর প্রথম গল্প দুটিতে সুশীলবাবু সত্যিকার শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'মাথা' এবার শারদীয় দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। সংসারজ্ঞানহীন অসার মস্তিষ্কচর্চাকে তিনি এই গল্পে এক হাত নিয়েছেন। গল্পে বর্ণিত পরিবেশ আর কুন্তলাদির অ্যাবনর্মাল চরিত্র মিলে কাহিনীর ভিতর এমন একটা সংঘাতময় নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে যে, পাঠকের মনোযোগকে গল্পের শেষ পর্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত করে রাখে। 'লক্ষ্মণ পণ্ডিত' গল্পের সমাপ্তির অংশটুকু চমৎকার। যে পরিণতির জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না তেমন একটি আকস্মিক বিস্ময়ের চমক দিয়ে গল্পটিকে শেষ করা হয়েছে, আর সেখানেই গল্পের যথার্থ উৎকর্ষ প্রতিপাদিত হয়েছে। তবে সুবোধ ঘোষের 'দুঃসহধর্মিণী' গল্পের মতো এ গল্পেও বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব ঘটেছে। গ্রাম্য পাঠশালার পণ্ডিত লক্ষ্মণ থেকে ঠ্যাঙাড়ে আর খুনে লক্ষ্মণে গল্পের মূল চরিত্রের বিবর্তন যথেষ্ট প্রতীতির সঙ্গে দেখানো হয় নি। এই বাবদে আরও ক্ষেত্রপ্রস্তুতির অবকাশ ছিল। নিম্নমধ্যবিত্ত কোন অভাবগ্রস্ত সর্বরিক্ত মানুষের বেলায় যদি উল্লিখিত পরিবর্তন দেখানো হত তা হলে গল্পটি আরও বেশি ফলপ্রদ হত।

কুশলী কথাকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এবার মাত্র দুটি গল্প লিখেছেন—তার অন্যতম হল 'একটিও না' (দেশ)। কিন্তু এই একটি গল্পের দ্বারা তিনি অনেককে ছাড়িয়ে গেছেন। নিঃসংশয়ে 'একটিও না' এবারকার শারদীয় দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। কি লিপিচাতুর্যের দিক থেকে, কি উদ্দেশ্যমূলক গল্পের সফল দৃষ্টান্ত হিসাবে, 'একটিও না'-র তুলনা হয় না। একটি সচ্ছল সুখী পরিবারের পরিপূর্ণ হাস্যোচ্ছলতার পিঠে contrast হিসাবে একটি অভাবগ্রস্ত পরিবারের দৈন্য মর্মান্তিকভাবে এ গল্পে আঁকা হয়েছে। কিন্তু এখানেই গল্পের নাটকীয়তার পরিসমাপ্তি হয় নি। গল্পে লেখক বর্তমান সমাজব্যবস্থার অবিচার ও অন্যায়ের উপর নিদারুণ চাবুক হেনেছেন। রমার স্বামীর মাংসবিক্রির ব্যবসাটা ক্ষমতাবান কর্তৃক অসহায়ের শোষণের রূপক; সেই সঙ্গে লেখক সূক্ষ্মভাবে এই ইঙ্গিতও করেছেন যে, সৎভাবে জীবনযাপন করবার সাধু ইচ্ছা যাঁরা পোষণ করেন, এ সমাজের হাত থেকে তাঁরাই মার খান সব চাইতে বেশি। হাস্যকলমুখর সন্তানবাহিনী সমেত পরেশনাথ মন্দিরে সুখী-দম্পতীর প্রমোদ-ভ্রমণের বৃত্তান্তটি এ গল্পের একটি সম্পদ। লেখক কলকাতা সহরের ভৌগোলিক সংস্থান বর্ণনায় মারাত্মক একটি ভুল করেছেন। পরেশনাথ মন্দির থেকে কালীঘাটের দিকে যেতে হাজরা পার্ক 'জগুবাবুর বাজারের' আগে পড়ে না, পরে পড়ে। গল্পটিকে পুস্তকে সন্নিবেশকালে এই ভুল অবশ্যসংশোধনীয়।

সুপরিচিত কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবার অনেকগুলি পত্রপত্রিকার জন্য গল্প লিখেছেন—'বাইশে শ্রাবণ' (যুগান্তর), 'পুতুল' (বসুমতী), 'একটি অমর রাত্রি' (তরুণের স্বপ্ন), 'রায়, সিং ও ঘাটে (এবং আজিজুল)' (গণবার্তা), 'নির্বাপিত' (গল্পভারতী), 'হাসি' (শনিবারের চিঠি) ইত্যাদি। এর ভিতর প্রথম নামীয় গল্পটিই সব চাইতে উৎকর্ষসম্পন্ন হয়েছে। কবিগুরুর তিরোভাব-তিথি বাইশে শ্রাবণের পূত-পবিত্রতা আর স্বপ্নসুন্দরতার পশ্চাদপটে একটি দরিদ্র পরিবারের রূঢ় অভাবগ্রস্ততা নগ্ন বাস্তবের কালিমা মাখিয়ে এই গল্পে সমুপস্থিত করা হয়েছে। নগ্ন বাস্তবের চিত্রণে কিঞ্চিৎ আতিশয্যের আশ্রয় নেওয়া হলেও প্রগতিশীল উদ্দেশ্যমূলক গল্পের উদাহরণ হিসাবে 'বাইশে শ্রাবণ' সার্থক সৃষ্টি হয়ে রইল। 'পুতুল' গল্পেও লেখক সবিশেষ লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন।

কুশলী কথাশিল্পী বিমল মিত্র দুটি গল্প লিখেছেন—'জেনানা সংবাদ' (দেশ) ও 'মনের গহনে' (আনন্দবাজার পত্রিকা)। তন্মধ্যে 'জেনানা সংবাদ' সমধিক রসোত্তীর্ণ হয়েছে। 'জেনানা-সংবাদ'-এর পরিসমাপ্তিতে যে অপ্রত্যাশিত surprise আছে তাতে গল্পটিকে সাধারণ দাম্পত্য প্রেমের গল্পের অনেক উপরের স্তরে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাছাড়া গল্পের সর্বভারতীয় পরিবেশটিও চমৎকার।

প্রভাত দেবসরকার রচিত দুটি গল্পের—'একটি দায়' (আনন্দবাজার পত্রিকা) ও 'সৈরিন্ধ্রী' (দেশ)—মধ্যে আমাদের প্রথমোক্ত গল্প অধিক ভালো লেগেছে। 'একটি দায়' গল্পে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের অভাব ও ব্যর্থতার চিত্র অতি সুনিপুণ শিল্পরূপ লাভ করেছে। গল্পের শেষটি বড়ো সুন্দর।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'অনুলোম' (দেশ) ও 'ভয়' (আজকের ছোটগল্প)

উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে শেষোক্ত গল্পটি লেখকের হাতে চমৎকার খুলেছে। পাকিস্থান থেকে আগতা একটি যুবতী বিধবার অসহায়তার বেদনা-করুণ চিত্র এ গল্পে আঁকা হয়েছে। উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে যাঁরা ভাবছেন তাঁদের গল্পটি পড়া উচিত।

এ ছাড়া অন্যান্য যে সকল গল্প আমাদের ভালো লেগেছে তার থেকে বেছে কয়েকটির নাম নীচে দিচ্ছিঃ—তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'অবিনাশ মিত্তির' (দেশ), সুশীল জানার 'জনক' (আজকের ছোটগল্প), সমরেশ বসুর 'প্রত্যাবর্তন' (আজকের ছোট গল্প), গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'মিছে কথা' (শনিবারের চিঠি), শ্রীমতী প্রতিভা বসুর 'মিসেস পালিতের গার্ডেনপার্টি' (পূর্বাশা) ইত্যাদি।

৪

ব্যঙ্গ গল্পের ক্ষেত্রে 'পরশুরাম' এবার সার্থক দুটি গল্প সৃষ্টি করেছেন।—'ভরতের ঝুমঝুমি' (আনন্দবাজার পত্রিকা) ও 'রেবতীর পতিলাভ' (দেশ)। দুটি গল্পই অনবদ্য হয়েছে। 'পরশুরামের' রসরচনার কলম যে আজও আগেকার মতো ধারালো রয়েছে, তাতে মর্চে ধরে নি, বর্তমান গল্পদ্বয়ের সাহায্যে তিনি আবার সে কথার নতুন করে প্রমাণ দিলেন। এই একাধারে বৈয়াকরণ-পণ্ডিত-রসিক সুধীর নিকট আমরা যে কতভাবে ঋণী তা আর ব'লে শেষ করা যায় না।

ব্যঙ্গরসিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের রসরচনা এবার তেমন জমে নি।

প্র-না-বি-র কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

নিদারুণ অভিজ্ঞতা

শ্রীবিরূপাক্ষ

শোকসভা

কলকাতা শহরের হুজুগ, বাজী, সার্বজনীন পুজো আর অ্যাম্‌প্লিফায়ারের ঠেলায় প্রায় পাগল হব হব অবস্থায় হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে নিজের দেশে অর্থাৎ ভজগোবিন্দপুরে দৌড় মেরেছিলুম, ভেবেছিলুম যাক, পল্লীগ্রামে গিয়ে এক মশার আওয়াজ আর গভীর রাতে শেয়ালের ডাক ছাড়া আর কিছু কানে আসবে না, প্রাণে একটু পুলক জাগবে, মাথাটা ঠাণ্ডা হবে। কিন্তু ও হরি, দেখলুম শহরের যা কিছু উৎপাত সবগুলি এমেচারি ঢংয়ে সেখানেও ঢুকেছে। নিশ্চিন্দি হওয়ার ব্যাপারটা আমার বরাতে বিধাতা কোথাও লিখে রাখেন নি বেশ বোঝা গেল।

পাড়ার কে এক গাঙ্গুলী মশাই, গভীর রাত্রে তাড়ি খেয়ে নিজের বাড়ির ছাদ থেকে আলটপ্‌কা পড়ে গিয়ে মারা গেছেন, তাঁর জন্যে সমব্যথীরা ও মরমীয়ারা এক বিরাট শোকসভার আয়োজন করেছেন—পাড়ায় হৈ হৈ পড়ে গেছে। যিনি সভাপতি তিনি বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ শোনার পর ভবিষ্যতে আর ও জিনিস এক বিন্দু পান করবো না ব'লে বর্তমান কালটাকে তাড়াতাড়ি মুছে ফেলতে সপ্ত সিন্ধু মন্থন করে যেরূপ গণ্ডূষ ভরে পীযূষ পান করেছেন শোনা গেল তাতে আর তাঁর হুঁস নেই। তিনি আসতে পারবেন না বলে এক বাণী পাঠিয়েছেন, অতএব আমাকে নিয়ে পাড়ার লোক টানাটানি শুরু করলেন। সকলের নাকি সমবেত ইচ্ছা—আমি সভাপতি হই।

আমি করযোড়ে উদ্যোক্তাদের কাছে নিবেদন করলুম, রক্ষে করুন মশাই, এ বাজারে সংসারের একপতিত্ব করতেই হাঁপিয়ে উঠছি, এখন গোটা একটা সভার পতিত্ব করা আমার পক্ষে অসম্ভব—ও আমি পারবো না, অভ্যেস নেই, মারা পড়বো!

তা কে শোনে সে সব কথা। পুরোনো খবরের কাগজের ওপর কলমের উল্টো পিঠ দিয়ে ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া করে কালিতে নাম

পতিত্বে আপত্তি

লিখে সারা গাঁয়ের চারধারে—মায় স্টেশনে পর্যন্ত নোটিশ টাঙিয়ে দিয়ে এল।

বিরাট ব্যাপার! অভূতপূর্ব কাণ্ড! অদ্য বৈকাল সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় মনসাতলার হাটে পল্লীর সর্বজনপ্রিয় স্বর্গীয় কালাচাঁদ গাঙ্গুলীর শোকসভা। দলে দলে যোগদান করুন। অমুক সভাপতিত্ব করিবেন, অমুক প্রধান অতিথি হইবেন, অমুক উদ্বোধন করিবেন, তমুক পরিচালনা করিবেন ইত্যাদি।

জিজ্ঞাসা করলুম, ভাই কতক্ষণ আমায় আটকে রাখবে? বললে, ঘণ্টা তিন চার।

আমি তো হাঁ! শোকসভা ঘণ্টা তিন চার ধরে চলবে, বল কি? গাঙ্গুলী মশায়ের বাড়ির লোকও বোধ হয় এতক্ষণ ধরে শোক করেনি।

তারা বললে, বাড়ির লোকের চেয়ে দেশের লোকের দরদ তো বেশীই হয়ে থাকে—ও আপনি কিছু ভাববেন না। ওর সঙ্গে একটু ভ্যারাইটি করার চেষ্টা হচ্ছে কিনা—কলকাতায় লোক বেরিয়ে গেছে।

কি যে মাথা মুণ্ডু আরও সব বললে বুঝলুম না। বিকেলে নিয়ে যাবার কথা, বেলা দুটোয় দলবল এসে আমায় নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে দিলে, পাছে আমি পালাই। তখন কোথায় লোকজন আর কোথায় কি! আমি সভা বসার আগে ভ্যাবা গঙ্গারামের মত হা পিত্যেস করে বসে। শুনলুম লোক ডাকতে গেছে। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে একেবারে নাকি লোক গিজগিজ করবে। নোটিশ পড়ে গেছে—দেখুন না।

কিসের নোটিশ? কেউ কিছু জবাব দিলে না। যাক, লোক না এলেই বাঁচি, তাড়াতাড়ি সভা ভেঙে পালানো যাবে, কিন্তু শোকসভা যে কি বস্তু সে তো পূর্বে জানা ছিল না—এবার জানলুম।

মশাই, আশ্চর্য! বেলা ৪টের পর থেকে দেখি দলে দলে লোক আসতে শুরু করলে। শোকসভায় এত লোক, ব্যাপার কি? আমাদের ওদিকে তো লোক ভাড়া করে আনতে হয়।

আমাদের পাড়ার চাটুজ্যে মশাই মারা যেতে একবার সভা করেছিলুম, তাতে মনে করুন দুশো মুটে ডেকে ঘণ্টায় দু আনা করে ভাড়া দিয়ে বসিয়ে রাখতে হয়েছিল, কিন্তু এখানে আকস্মিক এত লোক শোক করতে আসছে দেখে তো আমি অবাক! ভাবলুম হয় এরা সব কটা ভণ্ড, নয় স্বর্গীয় গাঙ্গুলী মশায়ের সমধর্মী। কিন্তু তাও তো নয়—মেয়েরাও আসে যে।

পরে সভা বসতে বুঝলুম জনাধিক্যের কারণটা কি! প্রথমেই, বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত—দশ মিনিট সবাই দাঁড়িয়ে। পৃথিবীর কোথাও জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে ঠায় এতক্ষণ লোকের ভোগান্তি বাড়ানো হয় বলে তো শুনিও নি। যাক, পা ধরে এলেও বসবার তো জো নেই। সেটা শেষ হল।

তারপর সভাপতি বরণ। একটি তোৎলা ভদ্রলোক আমার নাম প্রস্তাব করতে উঠলেন। আমার নাম, পদবী সমস্ত ঘুলিয়ে ফেলে তিনি এমন কাণ্ড করে বসলেন যে, লোকে হো হো করে হেসে অস্থির, শেষে আবার সংশোধন করতে গিয়ে আরও কেলেঙ্কারী করে বসলেন—একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারেন না, শেষে আমি ক্ষেপে উঠে নিজের নাম ধাম বলে সটান চেয়ারে বসে পড়লুম।

যে ভদ্রলোক তাঁকে সমর্থন করতে যাচ্ছিলেন তিনি মুখটি হাঁ করতে দর্শকরাই বলে উঠলো, থাক হয়েছে। ভদ্রলোক অপ্রস্তুত হয়ে পালাবার পথ পেলেন না। প্রধান অতিথিকে অতঃপর আমি নিজে হাত ধরে টেনে তাঁর নামটা জিজ্ঞেস ক'রে, নিজেই প্রস্তাব সমর্থন ইত্যাদি যাবতীয় কার্য সম্পন্ন ক'রে পাশে বসিয়ে দিলুম।

এরপর মাল্যদান। একটি খুকীকে কোথা থেকে নড়া ধরে শূন্যে তুলে তার মারফৎ আমার গলায় একটি তারের মালা ঝুলিয়ে দেওয়া হতেই আমি উঃ করে উঠলুম। কারণ ফুলের চেয়ে তারের খোঁচা বেশী অনুভূত হ'ল। খুকীটি ইতিমধ্যে ভড়কে গিয়ে আর প্রধান অতিথির গলায় মালা দিতে বোধ হয় ভরসা পেলে না। তিনি হাঁড়িকাঠে মাথা গলানোর ভঙ্গীতে ঘাড়টা এগিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, কিন্তু গলায় আর মালা ঝোলে না—শেষে তাড়াতাড়ি আর একজন তার হাতটা হেঁচকে গলার দিকে এগিয়ে দিতেই সে মলাটা উল্টো পরিয়ে দিয়ে দুড়দুড় করে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। লোকের তাতে কী হাসি আর হাততালি! বুঝলুম শোক একেবারে গোড়াতেই কুলপী বরফের মত জমে গেল।

যাক, প্রচলিত পর্ব শেষ হতেই আরম্ভ হল, ভ্যারাইটি। তখন বুঝলুম এত লোক আসার কারণ। কলকাতার গাড়ী থেকে আর্টিস্টরা নামতেই দাবানলের মত ব্যাপারটা গাঁয়ে ছড়িয়ে গেছে, তাই অত ভীড়। কিন্তু শোক সভাটা শেষ ক'রে সেগুলো আরম্ভ করলে ভাল হয় বলে

পাত্রিত্ব গ্রহণ

প্রস্তাব করতে যাচ্ছি, কিন্তু তার আগেই খেল শুরু হয়ে গেল। পরিচালক ঘোষণা করে দিলেন, কলকাতা ক্যানেস্তারা ফিলু হারমোনিক অর্কেস্ট্রার ঐক্যতান। শুরু হল—বাজনা। ঐক্যতান ঘোষিত হলেও যন্ত্রগুলির এরূপ বিদকুটে অনৈক্য জীবনে দেখিনি। অর্থাৎ যে কটা যন্তর বাজছে, তাদের প্রত্যেকটা চোখ বুজে শুনলেও নিজের নিজের স্বতন্ত্র সত্তা বেশ ভালভাবে বুঝিয়ে দেয়। তিনটে বেহালা তিনদিকে, হারমোনিয়াম উল্টোদিকে আর অন্যগুলি দিকে দিকে ছুটছে। দশ মিনিট গর্ভ-যন্ত্রণা দিয়ে ঐক্যতান থামলেন।

তারপর ছিঁচকেমণি পালিতের আধুনিক গান—প্রিয় আসিবে বলিয়া সারাদিনরাত বাঁশবনে বসে আছি, আর কত খাব মশার কামড়, কত বা তাড়াবো মাছি। ইনিও দশ মিনিট ধরে ফোঁপালেন। ভাবলুম, যাক, এতেই বোধ হয় লোক দমেছে, কিন্তু ঠিক উল্টো—আর একখানা, আর একখানা, ক'রে দুর্দম চীৎকার। কড়া চাপানোই ছিল, তিনিও আর একখানা ছাড়লেন।

তাঁর গানের পরই কুমারী দীর্ঘাঙ্গী চট্টোপাধ্যায়ের আবাহন নৃত্য। একে সরু লিকলিকে হাত পা, তার ওপর মনে করুন আবার কাগজের ঠুঙি পরে লম্বা লম্বা লোক তৈরী হয়েছে, একেবারে প্রাণ আনচান করে উঠলো। তাঁর আবাহন নৃত্য দেখে মনে হল, স্বর্গীয় গাঙ্গুলী মশাই নিশ্চয় স্বর্গ থেকে তরতর করে নেমে এসেছেন এবং সম্ভবতঃ খুব শিগ্গিরই বল্‌ডান্সের পার্টনার করে বেচারীকে নিয়ে যাবেন। ওঃ অসহ্য!

দশ মিনিট গেল দীর্ঘাঙ্গীর, তারপর নানারকম বিতিকিচ্ছিরি অঙ্গভঙ্গী করে নোস্তামুকুজো কমিক দেখালেন। সেও একবারে শেষ হল না—আবার আবার করে চাবরবার। ভাবলুম এরা এই রকম করেই রাত কাবার করবে বোধ হয়, আমি পালাই, কিন্তু উঠতে দিলে তো! ঘোষণা চলেইছে—এইবার শুনুন ফোঁপরা দত্তের ফিল্ম
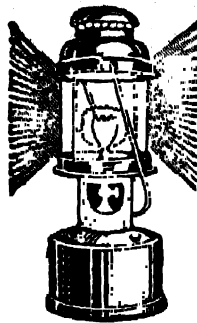
সঙ্গীত, গোঁসা মিত্তিরের কালোয়াতি গান, ফোকলা ভট্টচায্যির রবীন্দ্র সঙ্গীত, চাকলা দেবীর কেত্তন ইত্যাদি।

আমি একে ডায়েবিটিস রুগী, দু ঘণ্টার মধ্যে বার তিনেক চক্ষু লজ্জার মাথা খেয়ে বাইরে গেছি, কিন্তু আর কতবার যাব, লোকে ভাববে কি, বলে বসে রইলুম। ওদিকে পেট টন্‌টন্‌ ক'রে শরীর কেমন কেমন করতে লাগলো। সভাপতি হওয়ার এত জ্বালা আগে টের পেলে কোন্‌ ইয়ে এ কার্য করতে আসতো! শেষে উদ্যোক্তাদের ডেকে বললুম, ভাই, গাঙ্গুলী মশায়ের শোকসভায় তোমরা এ কি কচ্ছ?

সেক্রেটারী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, তা না হলে যে লোক আসে না স্যার, এটা বোঝেন না?

আমি বিনীতভাবে বললুম, তা বুঝিছি ভাই, তা এর ফাঁকে ফাঁকে বক্তৃতাগুলো ঢুকিয়ে দাও না কেন?

তাতেই তারা রাজী হয়ে গেল—প্রধান অতিথি এসেছেন কলকাতা থেকে, তাঁকেই আগে ওঠানো হল। তিনি উঠেই স-চীৎকারে সুর করে টেনে টেনে বক্তৃতা শুরু করলেন—

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত মহিলা ও ভদ্রলোকবৃন্দ, আজ এই শোক-সভায় প্রধান অতিথিরূপে আপনারা আমায় বরণ করলেন যে কেন, তা জানি না, কারণ আমার মত অযোগ্য, অক্ষম ও অবিজ্ঞ ব্যক্তি এ সম্মান পাবার পক্ষে অনুপযুক্ত আমি জানি। (চড় চড় করে এতেই হাততালি পড়ে গেল; আমিও শ্রোতাদের বিদ্যেবুদ্ধির দৌড় এতেই খানিকটা বুঝলুম, কিন্তু অতিথি মহাশয় তাতে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন)। আজ স্বর্গীয় হারাধন গাঙ্গুলী মশায়ের শোকসভায় এসে (ঠিক এই সময় একজন দর্শক পেছন থেকে নামটা শুধরে দিতে চীৎকার করে উঠলো, হারাধন নয় কালাচাঁদ। তিনি তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বলে উঠলেন) আজ্ঞে হ্যাঁ, কালাচাঁদ গাঙ্গুলী মশায়ের সভায় এসে যে কি বলবো, কিছু ভেবে পাচ্ছি না—কারণ আমি তাঁর সম্বন্ধে কিস্সু জানি না। (এই সময়ে অস্ফুট স্বরে কে একজন রসিক দর্শক বলে উঠলো, মরেছে! বে-জায়গায় এ রকম একটা মন্তব্য শুনে দু চারজন কুঁক কুঁক করে হেসে ফেললে। বলা বাহুল্য বক্তার কানে সবই পৌঁছতে তিনি ক্ষেপে উঠে হঠাৎ গলার স্বরটা আরও চড়িয়ে বলে উঠলেন) না জানলেও এটুকু আমি জানি একজন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন কালাচাঁদবাবু। তা না হলে তাঁর শোকসভায় এত লোক শ্রাদ্ধ করতে ছুটে আসবে কেন? এত লোক আনন্দ করতে আসবে কেন? বাঙালীর মনে যত দুঃখই থাক, তার আনন্দটুকু এখনও যায়নি বলেই সে আজও বেঁচে আছে। আজ আনন্দ কর ভাই, আনন্দ কর। গাঙ্গুলী মশাই উচ্চমার্গের লোক ছিলেন, তাই উচ্চ-স্থান থেকে ভাবাবেগে লাফিয়ে পড়ে তিনি উর্ধ্বগতি পেয়ে গেছেন। এমন কজন পায়? এত সাহস আছে কজনের? তাঁর সাহসিকতা অদ্ভুত, তিনি ভেতো বাঙালীর আদর্শ স্বরূপ। আমরা একটা থানা ডোবা পেরুতে কাৎ হয়ে পড়ি, তিনি ছাদ থেকে পড়েন এর তুলনা নেই। আমাদেরও প্রত্যেককে তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে হবে, তবে মুক্তি পাব, তবে জাতি জাগবে, তিনি বিংশ শতাব্দীর শেষ শহীদ—তাঁকে যেন আমরা না ভুলি (যেই শহীদ বলা আর হাততালির ধুম কী। কতগুলো ছোকরা আবার এর ওপর পাঁচটা আঙুল মুখে পুরে সিটি দিতে শুরু করলে, অতিথি ভারী খুশী। তিনি আরও উৎসাহ সহকারে শুরু করলেন) কিন্তু ভাই সব, এই সদানন্দ পুরুষের শোকসভায় এসে আজ যে আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন আপনারা করেছেন তার তুলনা নেই। আজ তো কাঁদবার দিন নয়, আজ তাই কাঁদবো না—চুপি চুপি অন্যদিন কাঁদবো, আজ হাসবো সকলে—প্রাণভরে হাসবো, আপনারাও হাসুন। (সকলের হো হো করে হাসি, আর করতালি ধ্বনি আর সিটি, সমানে এক মিনিট ধরে চললো। ভাবলুম এই জমার মুখে তিনি বোধ হয় আসন গ্রহণ করবেন, কিন্তু উল্টো হল। তিনি ফের শুরু করলেন।) আর এক মিনিট আমি আপনাদের নেব, একটা কথা শুধু বলবো, বলে অনর্গল আজে বাজে বকে যেতে লাগলেন। ভদ্রলোক যেটুকু জমিয়ে এনে-ছিলেন তা আরও চল্লিশ মিনিট পেরুতে গলতে শুরু করলো। লোকে প্রথমে হাই তুলতে লাগলো, পরস্পরের সুখ দুঃখের কথা শুরু করে দিলে, তারপর মাটিতে পা ঘসতে লাগলো, তারপর অবিরত হাততালি দিতে লাগলো, তাতেও তাঁর চৈতন্য হল না। অবশেষে পেছন থেকে আমি তাঁর পাঞ্জাবীর দুটো খুঁটো ধরে টেনে চেয়ারে বসিয়ে দিলুম।

ঘোষণা করে দিলুম। আমার যা বলবার ছিল তা পূর্ববর্তী বক্তা সবই বলে ফেলেছেন, আর যা বাকী আছে, সেইটুকু বলে দিয়ে যাই। আজকের সভার বক্তৃতার পালা এইখানেই শেষ। কমিক আইটেম সবই তো হয়ে গেল, আপনারা এইবার পুরো দমে নৃত্যগীত উপভোগ করুন, আমার ট্রেনের সময় হল, আমি বিদায় নিচ্ছি। এখন দ্বৈতনাচ হবে। নাচবেন—ল্যাক্‌প্যাক্‌ তালুকদার ও ধুমসোমনি হালদার! নমস্কার!

দিল্লী টেস্টে প্রথমদিনের খেলায় এম-সি-সি'র বিপর্যয়ের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া জনৈক ক্রীড়া-সাংবাদিক ডানকার্ক হইতে আরম্ভ করিয়া ইরাণের তেল পর্যন্ত ইংলণ্ডের বিপর্যয়ের উল্লেখ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। বিশুখুড়ো বলিলেন,—"লারউড ক্রীড়াজগতে নেই, কিন্তু তার বডিলাইন বোলিং ঠিক আছে"!!

* * * * *

রোভার্স কাপ খেলার বিবরণে জানা গেল, "ইণ্ডিয়া কাল্চার" নাকি "দিল্লী হিরোস"কে পরাজিত করিয়াছে। খুড়ো বলিলেন—"খবরটা অবশ্যি বম্বের, অনেকে বলেন, দিল্লীর খেলাতে নাকি "ইণ্ডিয়া কালচারই বরাবর মার খাচ্ছে!"

* * * * *

আগামী নির্বাচনে শ্রীযুক্ত কে চ্যাটার্জী নেহরুজীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন। তিনি বলেন—"স্বাধীন ভারতে জনগণের কণ্ঠ অশ্রুত রাখা চলিবে না। শ্যাম বলে—"নিশ্চয়ই নয়; দুর্গাপুজো থেকে শুরু করে কালীপুজো পর্যন্ত আমরা জনগণের কণ্ঠে পাড়া-মাৎ করেছি, এবারেই কি পেছ-পা হবো। লাউড্স্পীকার জিন্দাবাদ"!

* * * * *

আচার্য কৃপালনী বলিয়াছেন, তিনি নিজে ভোটের প্রার্থী নহেন। "ওহো, কিমহং তেন কুর্যাম যেনাং—কথাটা

শেষ না করিয়াই জনৈক সহযাত্রী ট্রাম হইতে নামিয়া গেলেন।
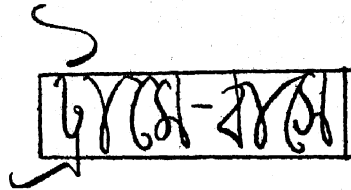
মিশরের মন্ত্রী বলিয়াছেন—এই দুর্দিনে আমরা প্রেরণার জন্য ভারতের দিকেই তাকাইয়া আছি। সহযাত্রীদের মধ্যে জনৈক

চা-রসিক বলিলেন—"ভারত তাদের নিরাশ করবে না, আমরা বিজ্ঞাপনে পড়েছি—প্রেরণার উৎস ভারতীয় চা!"

* * * * *

একটি সংবাদে প্রকাশ, ইতালী নাকি ভারতকে চাউল দিয়া সাহায্য করিবে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"এর পর ভারতের নিশ্চয়ই উচিত ইতালীকে "ধনে-ধান্যে পুষ্পে ভরা" গানটি শিখিয়ে সাহায্য করা।"

* * * * *

অন্য এক সংবাদে প্রকাশ, বিশ্ব-ব্যাঙ্ক প্রতিনিধিগণ নাকি ঋণদান সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার জন্য শীঘ্রই ভারতে আসিতেছেন। শ্যামলাল বলিল—"ব্যক্তিগত ঋণদান সম্বন্ধে ব্যবস্থা থাক্লে তাঁরা যেন কোলকাতা রেসের আগেই আসেন, এই আমাদের বিনীত নিবেদন।"

* * * * *

শিশুরা খাইতে না চাহিলে পিতামাতার কি কর্তব্য, সে সম্বন্ধে শুনিলাম জনৈক শিশুস্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্ নাকি তাঁর মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"এ সংবাদে আমাদের কৌতূহল নেই, কারণ আমাদের সমস্যা অন্যরূপ। শিশুরা খেতে না পেলে পিতামাতার কী কর্তব্য, সেই কথাটা জানতে পারলে আমাদের কাজে আসে।"

* * * * *

ষাটজন জাপানী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নাকি বিশ্বের শান্তি-কামনায় উপবাস করিতেছেন। তাঁরা বলেন—"তোমরা চার্চিলের ওপর নজর রাখ।" এই প্রসঙ্গেই জানা গেল—ভারত জাপানকে যে হাতী উপহার দিয়াছেন, তাদের পরিচারকরাও নাকি এই উপবাসে যোগ দিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"সন্ন্যাসীদের উপোসের মানে বুঝি, কিন্তু হাতীর পরিচারকদের,...... জানিনে, হয়ত এর মানেটা চার্চিলই বুঝছেন।"

* * * * *

একটি সাম্প্রতিক আবিষ্কার সংবাদে জানা গেল, ব্লাড্প্রেশারের রোগীর পক্ষে নাকি নুন কম খাওয়া ভালো। আমাদের জনৈক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"কথাটা বিশ্বাস করা শক্ত, শুনেছি পাকিস্তানে নুন দুর্লভ, কিন্তু রক্তের চাপের উপশম হয়েছে, এমন সংবাদ তো পাই নি!!"

* * * * *

সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশের পরিষদ-কর্মচারী-দের মধ্যে নাকি একটি বুদ্ধির পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, শতকরা সত্তরজন আমাদের জাতীয়-সংগীত যে কি, তা বলিতে পারেন নাই। বিশু-খুড়ো বলিলেন—"আমাদের পাড়ার ছেলেদের
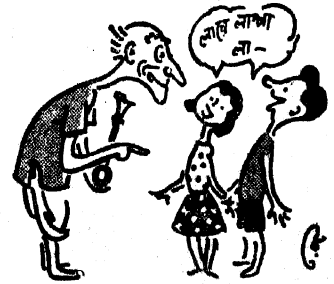
এই প্রশ্ন করেছিলাম। তারা কোনরকম দ্বিধা না করে বলে দিল—আমাদের জাতীয় সংগীত—সারে-লাপ্পা!!"

গোকুলচন্দ্র মিত্র ও সেকালের কলিকাতা (প্রথম ভাগ)—রাজেন্দ্রকুমার মিত্র। আর-কে-পাবলিশিং কোং, ১৯এ, গোকুল মিত্র লেন, কলিকাতা। দাম—২॥০।

গোকুল মিত্র কলিকাতার একজন নামজাদা ধনী। তাঁর সম্বন্ধে নানারূপ গল্প আজো জনশ্রুতির মত প্রচারিত। আলোচ্য পুস্তকে রাজেন্দ্রবাবু সেই সকল জনশ্রুতির একটি সত্য রূপ প্রকাশ করিয়াছেন। আরো সেকালের বহু খ্যাতনামা ধনী, মানী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থকারের শ্রম সার্থক হইয়াছে—ইতিহাস গল্পের মতই সুখপাঠ্য হইয়াছে। আমরা দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশের অপেক্ষায় রহিলাম। ২৩৯।৫১

অডিসির গল্প—নবকৃষ্ণ ঘোষ, বি এ। প্রিয়নাথ গ্রন্থ মন্দির, ২০ অবিনাশ ঘোষ লেন, কলিকাতা। দাম—১॥০।

আলোচ্য পঞ্চম সংস্করণই বইখানির জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে। প্রধানতঃ সুকুমারমতি বালক বালিকাদের জন্য হোমরের 'অডিসি' বাঙলায় লিখিত হইলেও অনেক বয়স্কদের ইহা নিঃসন্দেহে ভাল লাগিবে। আমাদের শিশু সাহিত্যে প্রকৃত 'এ্যাডভেঞ্চারের' কাহিনী নাই, আর যাহা আছে তাহা 'অভিযান (?)' নামে খ্যাত, অবান্তরের অপলাপ; সেই দিক দিয়া আলোচ্য গ্রন্থটি অনেকখানি অভাব পূরণ করিতে পারিবে। প্রসংগত এখানে একটি কথা বলিতে চাই, নবকৃষ্ণবাবু 'অডিসির' নিছক গল্পটিই বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেই গল্পের প্রকৃত এ্যাডভেঞ্চারের রূপটি কোথাও বর্ণনা করেন নাই—ইউলিসিসের বিপদ আপদ কোথাও বেদনার রূপে জীবন্ত হইয়া ওঠে নাই, আর বাক্য বিন্যাসে গ্রন্থকারের আরো বেশী সচেতন হওয়া উচিত ছিল। অনেক স্থলে তাঁহার ভাষা প্রয়োগ জড়তা দোষে দুষ্ট। যথা,..."সে দেশে রাত্রি এত ছোট যে সকালে যাহারা মেষ চরাইতে যায় সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াই তাহারা আর এক দলকে ডাকিয়া তুলিয়া পরদিন সকালে মেষ চরাইবার জন্য মাঠে পাঠাইয়া দেয়..." ইহাতে কি রাত্রি দিন অপেক্ষা ছোট বোঝা যায়? ২৩৮।৫১

পুস্তক পরিচয়

আবর্ত—শ্রীইন্দুভূষণ দাস। গণ-দীপায়ন পাবলিশার্স, ১৭০এ, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। দাম—২৲।

আলোচ্য উপন্যাস সম্বন্ধে এইটুকু বললে যথেষ্ট হ'বে যে, কাগজ, কলম আর ছাপাবার রেস্ত থাকলে গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হ'লেও গ্রন্থকার হওয়া সম্ভব নয়। তার জন্য বিশেষ শিক্ষাদীক্ষা এবং পরিশ্রমের প্রয়োজন। এই অপরূপ কাহিনী যে লেখক কি অবস্থায় রচনা করেছেন আমরা ভেবে পাই না। একমাত্র ছাপা ও বাঁধাই প্রশংসনীয়। ২৩৭।৫১

একটি রঙকরা মুখ—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বুকমার্ক, ৩২এ, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—২৲।

কয়েকটি ছোট গল্পের সমষ্টি। বিষয়বস্তু নির্বাচনে লেখকের স্বকীয়তা আছে। তাঁহার ভাষা স্বচ্ছ, সাবলীল এবং তীক্ষ্ণ। নূতন হইলেও তিনি আলোচ্য পুস্তকে যথেষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়। ছাপা, বাঁধাই এবং প্রচ্ছদপট সুন্দর। ২৩৫।৫১

ব্রহ্ম ও আদ্যাশক্তি—প্রথম ভাগ—পূর্বার্ধ। যতীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—সুরেশ স্মৃতিমন্দির, ৬, তারিণীচরণ ঘোষ লেন, পাইকপাড়া, কলিকাতা। মূল্য—৪॥০ টাকা।

অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনামূলক গ্রন্থ। হিন্দুর অধ্যাত্ম-সাধনা এবং দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহের বিস্তারিতভাবে এই গ্রন্থে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। ব্রহ্মতত্ত্বে বা ভাগবততত্ত্বে কোন ভেদ নাই। যিনি কালী, তিনিই কৃষ্ণ—গ্রন্থকারের ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়। এই একখানা গ্রন্থ পড়িলে হিন্দুর অধ্যাত্ম-সাধনার সম্বন্ধে মোটামুটি সব কথাই জানা যাইবে। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব, ঠাকুর রামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীসারদা দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ—ইঁহাদের অমৃতময় উপদেশ-রাজি সন্নিবিষ্ট হওয়াতে গ্রন্থের সমৃদ্ধি বর্ধিত হইয়াছে। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর।

সংগ্রহ ও সঞ্চয়—(প্রথম খণ্ড)—শ্রীললিতমোহন ভট্টাচার্য প্রণীত; ৭৬নং লালাবাবুর সায়ার রোড, বেলুড়, হাওড়া হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত।

অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের উপযোগী। ১২টি রচনা আছে। এই রচনাগুলি ছাত্রছাত্রীরা রচনা-শিক্ষার আদর্শস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারে।

স্মৃতিকথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

৬৬

১৯১১ সালের ১১ই নবেম্বর আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। যে বিশেষ কারণে ঐ দিনটি স্মরণীয়, সে-কাহিনী পরে বলছি; আপাতত পাঠক-বর্গকে খেয়াল করিয়ে দিতে চাই, একটি বিশেষ কারণে ঐ দিনের তারিখটিও অবিস্মরণীয়।

১১ই নবেম্বর, ১৯১১ সংক্ষেপে লিখতে হলে আমরা লিখি ১১-১১-১১। ছ'টি একই সংখ্যার যোগে গঠিত এই ধরণের তারিখ মানুষের জীবনে কদাচিৎ দেখা দেয়। জীবনের বিস্তৃতি নিরানব্বই বৎসর হলেও সে-জীবনে একবার যে দেখা দেবেই, তার কোন কথা নেই; অথচ মাত্র একদিনের স্বল্পায়ু জীবনেও অনায়াসে একবার দেখা দিতে পারে। মোট কথা, একমাত্র সুদূর-ভবিষ্যতের ইংরেজি ২২২২ সাল ব্যতীত, প্রত্যেক শতাব্দীর মাত্র ১১ সালের ১১ই নবেম্বরে এই বিচিত্র তারিখটি উপস্থিত হবে। সুতরাং কোন ব্যক্তিকে এমন তারিখ জীবনে দুবার দেখতে হলে ন্যূনপক্ষে কোন এক শতাব্দীর ১১ সালের ১১ই নবেম্বর থেকে পরবর্তী শতাব্দীর ১১ সালের ১১ই নবেম্বর পর্যন্ত বাঁচা দরকার। বাঙলা তারিখ সম্বন্ধেও ঠিক এই নিয়মই খাটে; তবে বাঙলা তারিখের ক্ষেত্রে নবেম্বর মাস হবে ফাল্গুন মাস। তারিখ সম্বন্ধে গবেষণা এই পর্যন্ত থাক, এবার মূল কাহিনীতে প্রবেশ করি।

Will force অথবা ইচ্ছাশক্তি সংক্রান্ত একটা মতবাদ শুনতে পাওয়া যায়। অত্যুগ্র ইচ্ছাশক্তির দ্বারা কোন দুর্লভ বস্তুকে যদি একান্তভাবে কামনা করা যায়, তাহলে শেষ পর্যন্ত সে-বস্তু হাতে এসে ধরা দেয়, এই ধরণের মতবাদ।

মানুষের মনের ওপর অপর এক মানুষ ইচ্ছাশক্তির প্রভাব বিস্তার করে প্রথমোক্ত মানুষের মনকে নিজের করতলগত করতে পারে, সে কথা স্বীকার করি। ভারতবর্ষীয় যোগবল এবং পাশ্চাত্ত্য দেশে মেসমেরিজম্ ও হিপ্‌নটিজম্ প্রভৃতির দ্বারা এ হয়ত সম্ভব। কিন্তু মানুষের ইচ্ছাশক্তি নৈসর্গিক ক্রিয়াশীলতার উপরও প্রভাব বিস্তার করে তার রূপ অথবা গতি পরিবর্তিত করতে পারে, এমন কথা বিশ্বাস করতে সাহস হয় না। অথচ ১৯১১ সালের ১১ই নবেম্বর আমার জীবনে এমন একটি ঘটনাই ঘটেছিল। এরূপ ব্যাপার ঘটতে পারে, একমাত্র ভগবানের হস্তক্ষেপের ফলে। অবশ্য, ভগবান একান্তই যদি থাকেন এবং মানুষের আকুল প্রার্থনায় কর্ণপাত করবার অভ্যাস যদি তাঁর থাকে।

১৯১১ সালের অক্টোবর মাসে আমি শিমলা পাহাড়ে অবস্থান করছিলাম। শিমলায় ইম্পিরিয়াল সেক্রেটারিয়েটে হোম ডিপার্টমেণ্টে আমার মেজদাদা শ্রীযুক্ত রমণীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় চাকরি করতেন। সেই সুযোগে আমি কয়েকবারই শিমলায় বেড়াতে গিয়েছিলাম।

অক্টোবর মাসের একেবারে শেষের দিক থেকে শীতটা চেপে নাম্‌তে আরম্ভ করল। মেঘলা দিন; মাঝে মাঝে এক-আধ পশলা হাল্কা বৃষ্টিও হ'য়ে যায়; বায়ু আর্দ্র শীতল; অভ্রভেদী জ্যাকো পাহাড়ের দিকে দৃষ্টিপাত করলে মনে হয় মাথায় যেন সে কুজ্‌ঝটিকার পাগড়ি বেঁধে ব'সে আছে। আমার সর্বপ্রধান কাজ হ'ল, দিনের মধ্যে বার পাঁচ-সাত কাঠের দেওয়ালে বিলম্বিত থার্মোমিটারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, এবং গভীর আকুতির সহিত প্রার্থনা করা, হে ভগবান, তোমার যে-লীলা দেখে এ পর্যন্ত চক্ষু সার্থক হয়নি, দয়া করে তা একবার প্রকট কর! থার্মোমিটারের অধো-গতিশীল পারদরেখার শীর্ষদেশকে হিড় হিড়িয়ে ৩২ ডিগ্রির হিমাঙ্কে (freezing point) অবনত করিয়ে প্রকৃতির অঞ্চল খসিয়ে একবার তুষারপাত করাও!

নবেম্বর মাসের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে পারদরেখার অধোগতি দ্রুততর হ'তে আরম্ভ করে, তার সহিত সমান লয়ে আমার অন্তরের প্রার্থনাও প্রবলতর হ'তে থাকে। বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয়-স্বজন আমার মনের দুরাকাঙ্ক্ষার কথা শুনে হাসে; বলে, তোমার প্রার্থনায় বিগলিত হয়ে নবেম্বর মাসে তুষারপাত করাবেন, ঈশ্বরকে এত ভাল-মানুষ পাওনি। এক ভদ্রলোক বললেন, "আবহাওয়া অফিসের রেকর্ড থেকে দেখা যায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে নবেম্বর মাসে একবার তুষারপাত হয়েছিল; কিন্তু এই সুদীর্ঘ ব্যবধানের মধ্যে আর কোনোদিন হয়নি।"

তা না হোক, যা একদিন হয়েছিল, তা আর একদিন হবার পথে আটক নেই। মনের মধ্যে আশার দীপ উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠল। ইচ্ছাশক্তির মাত্রা দিলাম বাড়িয়ে। রাত্রে শয্যা গ্রহণ করে মনে মনে বলি, হে ভগবান! প্রত্যুষে চক্ষুরুন্মীলন ক'রে ডাকি, হে ঈশ্বর!

ঈশ্বর শেষপর্যন্ত কর্ণপাত না করে থাকতে পারলেন না।

১১ই নবেম্বর, অর্থাৎ ১১-১১-১১ তারিখের অপরাহ্ন। কন্‌কনে ছুঁচ ফোটানো শীত পড়েছে। শয্যার উপর অর্ধদেহে লেপ ঢাকা দিয়ে শুয়ে একখানা বই পড়ছি, ক্ষণকাল পরে চা ও খাবারের দ্বারা দেহ-এঞ্জিনে কয়লা ও জল পুরে নিয়ে বৈকালিক ভ্রমণে নির্গত হওয়া যাবে, এমন সময়ে মেজদাদাকে টিফিন খাইয়ে ঝিল্লু চাকর এসে বললে, "বাবুজী, উপর শড়কমে বরফ গির রহা হৈ।" আমি যে বরফের জন্য আগ্রহ-পীড়িত মনে অবস্থান করছি, আমার অন্তরের এটুকু সন্ধান সে রাখ্‌ত।

ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে লেপের নরম ও গরম আবেষ্টন থেকে মুক্ত হয়ে উপর শড়কে উপনীত হবার জন্য তৎপর হলাম। শিমলার নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ম্যালকে সাধারণতঃ উপর শড়ক বলে। আমরা সেবার থাকতাম কার্ট রোডেরও নিম্নে এগ্‌ল্যান্টাইন কটেজে। ম্যালে পৌঁছতে হ'লে রিপন হাসপাতালের রাস্তা ধ'রে অনেকখানি চড়াই ভাঙতে হয়।

বাহিরে যেতে আমি উদ্যত হয়েছি দেখে ব্যস্ত হয়ে মেজবউদিদি বললেন, "ঠাকুরপো, ঝিল্লু এসে গেছে, মিনিট দশেকের মধ্যে চা হয়ে যাবে, চা-খাবার খেয়ে তারপর যেয়ো।"

আমি তখন বাইরের দিকে পা চালিয়েছি; যেতে যেতে ফিরে না চেয়েই বললাম, "তোমার চা-খাবার অপেক্ষা করবে, কিন্তু শ্রীমান্ তুষার হয়ত অপেক্ষা করবে না। অতএব দশ মিনিটও বিলম্ব করা নয়।"

ম্যালে উপস্থিত হয়ে দেখি, সকলেই বিস্মিত, পুলকিত, সকলেরই মুখে হাসি। ঝির ঝির ক'রে নিঃশব্দে তুষারপাত হচ্ছে, চিনির মতো গুঁড়ো-গুঁড়ো। গায়ের কাপড়ের খাঁজে পড়লে আটকে থাকে; ঝেড়ে ফেললে নিঃশেষে ঝরে যায়, পশ্চাতে গাত্রবস্ত্রের উপর কিছুমাত্র আর্দ্রতা রেখে যায় না,—একেবারে ঝরঝরে শুকনো তুষার।

তুষারপাত অবশ্য হচ্ছিল, কিন্তু নিতান্তই পিত্তরক্ষার মাত্রায়। প্লেনে চ'ড়ে একটা শহরের উপর দিয়ে উড়ে গেলে যেমন সে শহরটা দেখেছি বলাও চলে না, দেখিনি বলাও যায় না, কতকটা সেই ধরণের। অবশ্য, তুষারপাত দেখেছি এর দ্বারা সে গল্প করা চল্‌বে, কিন্তু তা নিয়ে দর্প করা চলবে না।

কিন্তু এ সকল কথা গৌণ,—আসল কথা হচ্ছে, নবেম্বর মাসে তুষারপাত হয়েছে। এর সম্ভাব্যতা নিয়ে অপরপক্ষের নিকট আমাকে এত ঠাট্টা-পরিহাস পরিপাক করতে হয়েছিল যে, এখন যদি আমি দাবী করি, এ ঘটনা আমার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই ঘটেছে, তাহ'লে অপর পক্ষকে নিশ্চয়ই একটু বিপন্ন হ'তে হয়। ইচ্ছা হ'ল, বিশেষ ক'রে যে দু-চার-জন বন্ধু আমার প্রদীপ্ত কামনার উত্তপ্ত দেহে পরিহাসের শীতল জল ছিটিয়েছিল, তাদের আড্‌ডায় একটু গিয়ে বসি; কিন্তু তুষার দেখার লোভে যে চা এবং খাবারকে অবহেলার সহিত পিছনে ফেলে এসেছিলাম, তারই আকর্ষণে বাড়ির দিকেই অগ্রসর হলাম।

রাত্রে ঝিন্নুর মুখে শুনলাম, জ্যাকো পাহাড়ের উপর জোর বরফ পড়েছে। এত ঘন হয়ে পড়েছে যে, সাতদিনেও বোধহয় তা বিগলিত হয়ে নিঃশেষ হবে না। জ্যাকোর শীর্ষদেশ সিমলা শহরের সাধারণ স্তর হ'তে অনেক উচ্চ,—যতদূর মনে পড়ছে ৮০০ ফুট।

পরদিন প্রত্যূষে তাড়াতাড়ি চা-পান শেষ ক'রে জ্যাকোর উপর উঠে দুটি ব্যাপার দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম;—প্রথমতঃ সুবিস্তৃত এবং সুগভীর তুষারপাত; এবং দ্বিতীয়তঃ আলগা তুষার দু-হাতে তুলে নিয়ে নিয়ে তাল পাকিয়ে সাহেব-মেমদের তুষারকন্দুক (snowball) খেলা। এই খেলাটি তাদের নিজ দেশের অতিশয় প্রিয় খেলা, এবং এ খেলার সুযোগও তথায় প্রচুর।

ভারতবর্ষের সমতলভূমিতে এ খেলার প্রশ্নই ওঠে না; একমাত্র সু-উচ্চ শৈলনিবাস-গুলিতে এর সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণত যে সময়ে তুষারপাত হয়, তার পূর্বেই নিম্নভূমিতে বহু সাহেব-মেমকে নেমে আসতে হয় ব'লে অনেকের ভাগ্যেই সে সুযোগ দেখা দেয় না। নবেম্বর মাসের প্রথম দিকে অধিকাংশ সাহেব-মেম শিমলা শহরে অবস্থান করে ব'লে আজ জ্যাকো পাহাড়ের উপর ইয়োরোপীয় স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকার, এমন প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধার আমদানী ভাল রকমই হয়েছে। যে অংশে আমি উপস্থিত হয়েছিলাম, সেখানে অন্তত শ'-দেড়েক ইয়োরোপীয় তুষার-বল খেলায় মত্ত।

রাশি রাশি তুষার হাতের কাছে প'ড়ে আছে, দু'হাত দিয়ে তার খানিকটা তুলে নিয়ে একটু চাপ দিয়ে বলের মত ক'রে পরস্পর পরস্পরকে ছুঁড়ে মারছে, আর সঙ্গে সঙ্গে উগ্র কৌতুকের একটা উচ্ছল হাস্যধ্বনিতে পর্বতের চতুর্দিক চকিত হয়ে উঠ্‌ছে। আঘাত করার স্থান-অস্থানের কোন বিচার নেই,—বুক, পিঠ, মাথা, মুখ, কান, গাল,—যেখানে যে সুবিধা পাচ্ছে, সেখানেই মারছে। ক্ষণকাল দেখতে দেখতে এইটুকু কিন্তু লক্ষ্য করলাম, পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের মুখে বল ছুঁড়ে আঘাত করছে না,—আর স্ত্রীলোকেরা আঘাত করছে সুবিধা-মাফিক একমাত্র পুরুষদের মুখেই; পুরুষেরা নিজেরাই এই সুবিধার যোগান দিচ্ছে স্ত্রীলোকদের মুখপদ্মের প্রতি নিজেদের সাগ্রহ দৃষ্টি নিয়োজিত ক'রে। যে পুরুষ যত কঠিন বলের দ্বারা স্ত্রীলোক কর্তৃক আহত হচ্ছে, সে নিজেকে তত অনুগৃহীত মনে ক'রে তত উচ্ছ্বসিত হাস্যের দ্বারা সে কথার প্রমাণ দিচ্ছে। অবশ্য এক-আধবার পুরুষকেও স্ত্রীলোকের মুখে তুষার-বল ছুঁড়ে মারতে যে দেখলাম না তা নয়; কিন্তু মনে হয়, সে সকল স্থলে পরস্পরের প্রতি ঘনিষ্ঠতার মাত্রা কিছু বেশি এবং আলগা চাপের সাহায্যে প্রস্তুত স্নো-বলের কাঠিন্য কিছু কম।

নিশ্চিন্ত চিত্তে পুলকিত মনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই অদৃষ্টপূর্ব অপরূপ তুষার-ক্রীড়া দেখছিলাম, এমন সময়ে অকস্মাৎ অতর্কিতে পিছন দিক থেকে সজোরে একটা স্নো-বল এসে আমার ঘাড়ে লেগে চূর্ণ হয়ে গেল। বলটি আলগা চাপের নয়, বেশ কঠিন। এই অনাশঙ্কিত আঘাতের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না, সুতরাং দেহে না হলেও মনে মনে বেশ একটু চম্‌কে উঠলাম। ভয় হ'ল, অনধিকার প্রবেশের জন্য এ হয়ত অপরাধীর প্রতি বহির্গমনের নোটিস। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে মন কিন্তু খুশিতে ভ'রে উঠ্‌ল। আঘাতকারী একটি পনের-ষোল বৎসর বয়সের সুশ্রী ইংরেজ-বালক হাস্যকুঞ্চিত চক্ষে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে। ঢিল মেরে পাটকেলটি খাবার প্রত্যাশায় অর্থপূর্ণভাবে তার পিঠখানার অপরূপ ভঙ্গী। আঘাত খাবার জন্যে এমন সুস্পষ্ট আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলাম না,—মুহূর্তের মধ্যে দু'হাত দিয়ে একরাশ শুকনো তুষার তুলে নিয়ে চাপ দিয়ে বল প্রস্তুত ক'রে বালকটির পিঠ লক্ষ্য ক'রে সবেগে ছুঁড়লাম। আঘাত থেকে পরিত্রাণ পাবার ভাণ ক'রে বালকটি একটু স'রে যাবার ভাব দেখালে,—কিন্তু আমার বলটি দ্রুতবেগে তার পাঁজরায় লেগে চূর্ণ হয়ে

গেল। আহত বালক এবং তার আশপাশের কয়েক ব্যক্তি এমন উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল যে, আমার মনের মধ্যে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না, একজন বিজাতীয় কালা-আদমিকে শ্বেতাঙ্গেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাদের জাতীয় খেলায় যোগ দিতে আমন্ত্রিত করেছে। এবং সে কালা-আদমি তাদের আঘাতের পাল্টা দেওয়াতে খুশিই হয়েছে। এ উদারতা তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নয়,—শুধু একটা অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের অত্যুগ্র আনন্দে সাময়িকভাবে তাদের হৃদয়ের লোহ-দরজা উন্মুক্ত হওয়ার ফলে এমন হতে পেরেছে।

সে যাই হোক, সোৎসাহে আমি তুষার-কন্দুক ক্রীড়ায় ব্যাপৃত হলাম এবং আমার দেখাদেখি আরও কয়েকজন কালা-আদমি সে খেলায় যোগ দিলে। এক সময়ে আমরা চার-পাঁচজন ভারতবর্ষীয় একপক্ষে এবং অপরপক্ষে চার-পাঁচজন ইয়োরোপীয় মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে দুর্দান্ত তুষারগোলা রণে প্রবৃত্ত হলাম।

এ বিষয়ে একটা কথা বলবার আছে। আমাদের সহিত স্নো-বল খেলায় ইয়োরোপীয় মেয়েদের কোন অংশ ছিল না। তাদের মধ্যে একজনও বল ছুঁড়ে আমাদিগকে আঘাত করে নি; পক্ষান্তরে আমরা ত নিঃসন্দেহ করি নি। অত অবারিত আনন্দের মুখেও এ দুটি দলের মধ্যবর্তী পাষাণ-প্রাচীর অভগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল।

বাড়ি যখন ফিরলাম, তখন বেলা বারোটা বেজে গেছে। আমার ঐকান্তিক কামনার প্রতি কর্ণপাত করে ভগবান যে প্রচুর অনুগ্রহ দেখিয়েছেন, তার জন্য মনের মধ্যে কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। দেনা-পাওনার কারবার শেষ করে মনে মনে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম।

কিন্তু তখনো বিধাতা-পুরুষের অনুগ্রহ-শালায় আমার জন্য যে ব্যবস্থাটুকু বাকি ছিল, এবার তার কাহিনী বলি।

(ক্রমশঃ)

রঙ্গজগৎ

সম্পদ—(ন্যাশনাল ইন্ডিয়া পিকচার্স—রূপশ্রী স্টুডিও) কাহিনী : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়; আলোকচিত্র : অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারক দাস; শব্দযোজনা : সমর বসু; শিল্প-নির্দেশ : দেবু মুখোপাধ্যায়; সুরযোজনা : গিরীন চক্রবর্তী; ভূমিকায়—সমীরকুমার, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, জীবন গঙ্গোপাধ্যায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, রিচার্ড ব্রুকস্, প্রণতি ঘোষ, শোভা সেন, রমলা চৌধুরী প্রভৃতি।

মল্লিক ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর্সের পরিবেশনে মিনার, বিজলী, ছবিঘরে মুক্তিলাভ করেছে।

নেহাৎই দুর্ভাগ্য পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের! যতবার ছবি তিনি তুলছেন, ততবারই নতুন কিছু দিতে চাইছেন, আর যত নতুন কিছু করতে চাইছেন, ততই তিনি নীচের ধাপে নেমে পড়ছেন। নীচের দিক হাঁটার এই হিসেব অনুযায়ী 'সম্পদ' তার সবচেয়ে অভিনব অবদান। অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর আর একটা বৈশিষ্ট্যও ক্রমশঃই স্পষ্টতর করে তুলছেন, সেটা হচ্ছে, নিজের সঙ্গে ছবি তৈরির আর সব বিভাগকেও অনুৎকর্ষের দিকে প্রতিযোগিতা করে টেনে নিয়ে যাওয়া—কে কতদূর নিকৃষ্টতা প্রকাশ করতে পারে, তারই প্রতিযোগিতা। 'সম্পদ' এমনিই একটা অভিজ্ঞতার কথা মনে করিয়ে দেয়। কোনো দিকে কারুরই শিল্পচাতুর্য প্রকাশের এতটুকুও চেষ্টার পরিচয় নেই ছবিখানিতে।

ছবি আরম্ভ আসামের জঙ্গলে এক গোরস্থানে এক যুবকের প্রার্থনা দৃশ্য থেকে। যুবক জয়ন্ত, চা-বাগানের কুলীদের কাছে পাগলা সাহেব বলে খ্যাত। প্রার্থনা অন্তে ফিরবার পথে শুনলে চা-বাগানের জাকসন সাহেব সর্দারের মেয়ে লছমীকে প্রলোভন দেখিয়ে সর্বনাশ করে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। জয়ন্ত লছমীকে নিয়ে জাকসনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গেল; জাকসন লছমীকে গ্রহণ করলে না। লছমীকে ওর লোকেরা ত্যাগ করাতে জয়ন্ত তাকে নিয়ে এলো নিজের বাড়িতে। বাড়িতে ওর বাপ বুড়ো ম্যাকার্টনী, মা পাহাড়ী মেয়ে দেবী, আর বোন সোনালি। ভোরেই কিন্তু লছমী পালালো সেখান থেকে। বুড়ো ম্যাকার্টনী গিয়েছিলো শহরের ডাকঘর থেকে টাকা তুলতে; ফেরবার পথে ভাল্লুকের হাতে পড়লো। মরবার আগে সে সোনালিকে জানিয়ে গেল যে, জয়ন্ত তার সত্যিকারের ছেলে নয়, তাকে সে শিশু অবস্থায় কুড়িয়ে পেয়েছিলো এবং জয়ন্তর আসল পরিচয় একটা নীল খাতায় লেখা আছে—দেবী লুকিয়ে রেখেছে। এর পর এখানে বেড়াতে এলো বাগানের মালিক দত্ত সাহেবের ভাইপো অজয় আর ভাইঝি নমিতা। ওরা শিকারে বেরিয়ে জয়ন্তর হাতে একটা ভাল্লুককে নিহত হতে দেখে। সেই থেকে জয়ন্তর ওপর নমিতার টান। ওদিকে জয়ন্ত নিজের ভাই নয় জেনে সোনালিরও আকর্ষণ ওর ওপর পড়লো। কুলীরা এই সময় দীর্ঘ-

'মহাপ্রস্থানের পথে'-র পথচারিকা রাণী ও পরিব্রাজক প্রবোধ সান্যালের ভূমিকায় অরুন্ধতী গুহঠাকুরতা ও বসন্ত চৌধুরী

দিনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। সর্দার গেল দত্ত সাহেবের কাছে অভিযোগ নিয়ে। মালিক ক্ষিপ্ত হয়ে এমন পদাঘাত করলেন, যাতে সর্দার গড়িয়ে পড়ে মারা গেলো। জয়ন্ত তখন সেখানে উপস্থিত, নমিতা দাঁড়িয়ে তার পিছনে। কুলীরা দল বেঁধে এলো মালিককে আক্রমণ করতে। দত্ত সাহেব বললেন, সর্দার পিছলে পড়ে গিয়েছে, তিনি তাকে মারেননি এবং তিনি জয়ন্তকে সাক্ষী মানলেন। জয়ন্ত নমিতার কথায় মিথ্যে করে বললে যে, সর্দার পিছলেই পড়ে গিয়েছে। এর পর তার অনুশোচনা এলো। রাত্রে সে লছমীর কাছে তার মিথ্যার কথা স্বীকার করলে। কুলীরা সেকথা শুনে তাকে কৌশলে বন্দী করে নিয়ে তাকে হত্যার উদ্যোগী হলো। সেকথা শুনে তার মা দেবী বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লো এবং সেই সময়েই দেবী এক অদ্ভুত স্বীকারোক্তি করলে—পাছে জয়ন্ত তাকে ফেলে যায়, এই জন্যে এতদিন সে মিথ্যে করে অন্ধ সেজেছিলো। আজ সেই জয়ন্তই বিপদে পড়ায় আর ভাণ করে থাকা গেল না। দেবী গিয়ে জয়ন্তকে মৃত্যু থেকে বাঁচালে। জয়ন্তর প্রতি নমিতারও টান দেখে সোনালি তার মাকে এসে জয়ন্তের আসল পরিচয় জানিয়ে তাকে তার স্বজাতির কাছে ফিরিয়ে দেবার জন্যে উপরোধ করলে। আর কোন উপায় না দেখে দেবী প্রায় রাজি হলো। সোনালি সেকথা নমিতাকে জানাতে গেল, কিন্তু পথ রুখে দাঁড়ালেন দত্ত সাহেব। তিনি জয়ন্তর পরিচয় শুনলেন এবং জানা গেল যে, তিনি বাগান দখল করার জন্যে জয়ন্তর পিতাকে হত্যা করেছেন। জয়ন্তর পরিচয়-পত্র হস্তগত করার জন্যে তিনি সোনালিকে বন্দী করে দেবীর কাছে গেলেন। দেবীকে লোভ দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে কোন লাভ হলো না, দেখে দত্ত সাহেব বাড়িটাই জ্বালিয়ে দিলেন। ইতোমধ্যে জয়ন্ত সোনালি বন্দী হয়েছে শুনে তাকে উদ্ধার করতে যায় এবং তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এলে 'মা'-কে আগুন থেকে বাঁচিয়ে আনে। এই সময়েই সে তার পরিচয় জানতে পারে, কিন্তু দেবীকেই সে তার আসল মা বলে স্বীকার করে তার পরিচয় প্রমাণ-পত্র সেই লাল খাতাটি আগুনে ফেলে দেয়। কুলী দত্ত সাহেবকে ধরে হত্যা করতে উদ্যত হয়; দত্ত সাহেব সর্বস্বের বিনিময়ে তাকে ছেড়ে দিবার জন্যে জয়ন্তর কাছে কাতর প্রার্থনা করে। জয়ন্ত তাকে ছেড়ে দেয় এই সর্তে যে, তার মিল ও বাগান কুলীদের যৌথ সম্পত্তি হবে, এবং দত্ত সাহেবের বিচার করবে দেশের আইন।

কাহিনীর মধ্যে উদ্ভটত্ব নেই এবং তার অভিনবত্বও স্বীকার করতে হবে। কিন্তু কাহিনীর বিন্যাস বা কলাকৌশলে এমন কোন শিল্পচাতুর্য দেখানো হয়নি, যাতে ছবিখানির কোথাও মন আবিষ্ট হতে পারে। ছবির প্রায় বারো আনা ভাগই আসামের বহির্দৃশ্যে তোলা। কিন্তু যে আসাম প্রাকৃতিক শোভায় পৃথিবীর অন্যতম শোভাময় অঞ্চল বলে প্রখ্যাত, তাকে অবহেলাই শুধু নয়, আলোকচিত্রের দোষে বিকৃত করেই বরং দেখানো হয়েছে।

গল্পটা প্রকাশ করার মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে এবং বনের জন্তু-জানোয়ার ও 'বাহাদুর' রূপী জয়ন্তর সঙ্গে দুর্বৃত্ত জাকসনের ঘুষোঘুষির মধ্যে খানিকটা রোমাঞ্চকর মুহূর্ত দাঁড় করাবারও চেষ্টা হয়েছে; কিন্তু সবটাই অতি স্থূল ব্যাপার। চিন্তা নামক শক্তিটির অস্তিত্বের

আভাসও নেই কোন ব্যাপারে। ছবিখানি সম্পর্কে আর কিছু বলতে যাওয়াও অত্যন্ত বিরক্তিকর।

মিনতি—(ন্যাশনাল ইণ্ডিয়া থিয়েটার্স—ইন্দ্রপুরী) কাহিনী : চারু মুখোপাধ্যায়; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়; আলোকচিত্র : রমেন পাল; শব্দযোজনা : জে ডি ইরানী; সুরযোজনা : রামচন্দ্র পাল; শিল্পনির্দেশ : মণি মজুমদার; ভূমিকায়—পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মিত্র, হরিধন, গোকুল মুখোপাধ্যায়, আশু বসু, সুলোচনা চট্টোপাধ্যায়, স্মৃতিরেখা, ছায়া দেবী, রেবা বসু প্রভৃতি।

[illegible] ৯ই নবেম্বর চিত্রা, প্রাচী ও ইন্দিরায় মুক্তিলাভ করেছে।

বাঙলার সাহিত্য-সম্পদ সম্পর্কে বাইরের লোকের কাছ থেকেই স্তুতি শুনতে হয়, বাঙলা দেশের কেউ এবং বিশেষ করে চলচ্চিত্র-প্রযোজকরা তা মোটেই মানতে রাজী নন। যদি তাঁরা এ-খবর রাখতেন, তাহলে যাকে-তাকে দিয়ে যেমন-তেমন কিছু সামনে তুলে ধরতে সাহস করতেন না, যেমন করা হয়েছে 'মিনতি'তে।

গল্পটি অবাস্তব নয়, চরিত্রগুলির সঙ্গেও অমিল নেই এখনকার দিনের; কিন্তু এমনি সঙ্গতিহীন সব ঘটনা এবং বিন্যাস, এমনি অসংলগ্ন, সর্বোপরি এমনি দুর্বল ভাষা যে, অনেক কিছু থাকলেও রস জমতে পারেনি কোথাও।

প্রথম ধর্তাটাই হয়েছে গোলমেলে। গল্পের প্রথম দৃশ্য হলো রেখা নাম্নী এক কেরানির মেয়েকে নিয়ে যে তার কাজে ইস্তফা দিলে অফিস-মালিক শেখরের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে। কিন্তু বাড়িতে ফিরে মায়ের অবস্থা দেখে শেখরের কামাগ্নিতেই আত্মাহুতি দেবার জন্যে গেল। শেখরের কাছ থেকে টাকা নিয়ে মার জন্যে ওষুধ নিয়ে এলো, কিন্তু মা ততক্ষণে পরলোকে। এর পরই দেখা গেল গ্রামে মিনতি নাম্নী একটি মেয়েকে যে ছুটে এলো তার বৃদ্ধ পিতার কাছে কোন বদ্-লোকের কুপ্রস্তাবের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে। বৃদ্ধ বাপকে নিয়ে মিনতি সে-জায়গা ছেড়ে অন্য এক গ্রামে একটা পোড়ো বাড়িতে গিয়ে বাসা বাঁধলে। গল্প মিনতিকে নিয়েই এগিয়ে চললো। গোড়াকার সেই রেখা ও শেখরের দেখা অবশ্য মাঝে মাঝে পাওয়া যেতে লাগলো, কিন্তু মিনতিদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ঘটলো প্রায় শেষ দৃশ্যেই বলা যায়। ততক্ষণ পর্যন্ত দর্শক পাশাপাশি অসংলগ্ন ঘটনাযুক্ত দুটি পৃথক কাহিনী দেখে যেতে থাকে। একটা কাহিনী চলছে, হঠাৎ আর একটা এসে তাকে হঠিয়ে দেয় বেমালুম—দুটোর কোনটারই যেন খেই থাকে না আর। এই-ভাবে শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়ায়, তা হচ্ছে মিনতি ছেলের বেশ ধারণ করে সাধন নাম নিয়ে ফুল বিক্রী করতে বের হয়, আর সেই ফাঁকে ডাকাতে ধরে নিয়ে যাওয়া তার মা আর ভাইয়ের খোঁজ করতে থাকে। এই ধান্ধায় তার সঙ্গে চানাচুরওয়ালা রতনের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। কিছুদিন পর সাধনের স্বরূপ রতনের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়লো—রতন মিনতিকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চাইলে। কিন্তু বাধ সাধলে শেখর; মিনতিকে সে তার ভোগ-লালসার আর একটি ইন্ধন-রূপে ব্যবহার করার জন্যে তাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে বন্দিনী করলে। রেখা মিনতিকে বাঁচাবার জন্যে রতনকে খবর দিলে। রতন মিনতিকে নিয়ে পালালো, কিন্তু শেখর ছুটলো ওদের পিছনে; শেষে রেখার পিস্তলের গুলীতে শেখর নিহত হলো। পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণ করার আগে রেখা নিজের জীবন কাহিনী বলে সতর্ক করে দিলে, কোন নারী যেন শত অন্নকষ্টেও নিজের সম্মান নষ্ট না করে।

গোঁজামিল দিয়েও যদি ঘটনার মধ্যে মিল রেখে দেওয়ার চেষ্টা থাকতো, তাহলেও কথা ছিল, কিন্তু এখানে কোন কিনারা না পেয়ে স্রেফ উহ্য রেখে দেওয়া হয়েছে। লেখা যেমন কাঁচা হাতের, কাহিনীর পরিচর্যাও হয়েছে তেমনি কল্পনাবিবর্জিত অসঙ্গত। গোড়া থেকেই বাঁকা পথ ধরে কাহিনী চলতে গিয়ে শেষে ডিঙিয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় থাকেনি।

ছবিখানির মধ্যে সবচেয়ে বিরক্ত জাগিয়েছে গান। সংখ্যায় আটখানি, কিন্তু হয় বেসুরো, আর নয় দরদহীন গাওয়া। অন্যান্য কোন বিষয়েও প্রশংসারযোগ্য শিল্পচাতুর্য দেখা গেল না। অভিনয়ে সুলোচনা, স্মৃতিরেখা ও পরেশ যথাক্রমে রেখা, মিনতি ও রতনের ভূমিকায় ছাড়া প্রধানদের মধ্যে আর কারুর কথা উল্লেখ করা যায় না। ডাকাতের হাতে পড়ার পর পাগলিনী মিনতির মার ভূমিকায় ছায়া দেবী এবং বাবার ভূমিকায় গোকুল মুখোপাধ্যায় চরিত্র দুটির ওপরে দৃষ্টি টানেন। হরিধন, আশু বসু প্রভৃতির রসিকতা অত্যন্ত মোটা এবং একঘেয়ে। ছবিখানির মধ্যে শেখরের লাম্পট্য এবং তার বিরুদ্ধে রেখার তেজস্বিতা স্পষ্টবাদিতা, এবং মিনতির 'সাধন' বেশে রতনের সঙ্গে আলাপ—ছবিখানির মধ্যে কিছু যদি উপভোগ্য হয়ে থাকে তো এই দুটো অংশ। কলাকৌশলের দিক মামুলি।

ভারতে নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা

অমরেন্দ্রকুমার সেন

"মুরা সোসাইটি" বললে হয়ত চিনতে পারবেন না কিন্তু যাদুঘর অথবা মিউজিয়ম বললে ঠিক চিনবেন; চৌরঙ্গীর ওপর ময়দানের ধারে সেই বিরাট তিনতলা বাড়িখানা। এই বাড়িখানায় কি যে নেই তা বলা বড়ই শক্ত; প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি, মহেঞ্জোদড়োর অধিবাসীর মাথার খুলি, মিশরের মমি, উটপাখীর ডিম অথবা আসামের আবর রমণীর হাতে তৈরী নরম কম্বল; দর্শনীয় এবং শিক্ষণীয় অনেক কিছুই এখানে পাবেন।

সমস্ত মিউজিয়মটির বিরাটত্বের কথা ছেড়ে দিলেও শুধু একটি মাত্র বিভাগেই যা আছে এবং সে বিভাগে কি কাজ হয়েছে অথবা হচ্ছে তার বিবরণ সংগ্রহ করতে হলে আপনার অনেকগুলি দিনই ব্যয় করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ অ্যানথ্রপলজি অথবা নৃতত্ত্ব বিভাগের কথাই ধরা যাক্‌। নৃতত্ত্ব হল বিজ্ঞানের সেই বিভাগ, যে বিভাগ পাঠ করলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর অধিবাসী, জাতি ও গোষ্ঠীর আচার, ব্যবহার, বিচার, রীতি, নীতি, ধর্মানুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক্‌ জ্ঞান অর্জন করা যায়।

পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে ভারত হল অন্যতম প্রথম দেশ, যে দেশ মানুষের আচার ব্যবহারাদির তথ্যসংগ্রহে মনোনিবেশ করেছিল। এ হল লর্ড কার্জনের সময়ের কথা, কিন্তু তদানীন্তন বিভাগীয় অধ্যক্ষ স্যার হারবার্ট রিসলি অন্যত্র বদলী হয়ে যাওয়ায় বিভাগের সমুদয় কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে যখন পুরাতন নৃতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব বিভাগটি পুনর্গঠিত হল, তখন তদানীন্তন অধ্যক্ষ ডক্টর নেলসন অ্যানাণ্ডেল এফ, আর, এস একটি পৃথক নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এর পর ১৯২৪ সালে অধ্যক্ষ হলেন ডক্টর আর বি সেমুর সিউয়েল। তাঁর বিভাগের নাম ছিল ভারতীয় জীবতাত্ত্বিক সমীক্ষা। ডক্টর সেমুর সিউয়েল ১৯৩২ সালে যখন অবসর গ্রহণ করেন, তখন পৃথক একটি নৃতত্ত্ব বিভাগ স্থাপন করার ওপর তিনিও বিশেষ জোর দেন, কিন্তু তখন সরকারের অর্থাভাবের জন্য পৃথক বিভাগ স্থাপন করা সম্ভব হয় নি। নৃতত্ত্ব বিভাগ তখন ভারতীয় জীবতাত্ত্বিক সমীক্ষার অধীনে একটি উপবিভাগ ছিল মাত্র এবং একমাত্র কর্মচারী ছিলেন ডক্টর বিজয়শঙ্কর গুহ।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের আমন্ত্রণে ডক্টর গুহ এবং সেমুর সিউয়েল নৃতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য এক পরিকল্পনা পেশ করেন এবং ১৯৪৬ সালেই এই পরিকল্পনা রূপ পরিগ্রহ করে। ডক্টর বিরজাশঙ্কর গুহ অধ্যক্ষ এবং ডক্টর ভেরিয়ার এলুইন উপ-অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। বর্তমানে বিভাগটি নৃতত্ত্ব বিভাগরূপে পরিচিত। প্রথম দু' বৎসর বিভাগটি কাশীতে অবস্থিত ছিল এবং ১৯৪৮ সালে কলকাতায় বর্তমান আবাসে স্থানান্তরিত করা হয়।

ভারত সরকারের এই শিশু বিভাগটি ইতিমধ্যেই যে শুধু গবেষণাগার, গ্রন্থাগার এবং সংগ্রহশালা স্থাপন করেছেন শুধু তাই নয়, বিভাগটি মানবজীবনের নানা সমস্যা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা সুরু করে দিয়েছেন।

পূর্ব পাকিস্থান থেকে দলে দলে বাস্তুহারা এদেশে এসেছেন এবং তাঁদের নিয়ে সরকার ও রাজনীতিকদের চিন্তার অন্ত নেই কিন্তু এখন বাস্তুহারারা বিজ্ঞানীদেরও মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। নৃতত্ত্ব বিভাগ বাস্তুহারাদের মধ্যে কিছুদিন থেকেই কাজ আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু ১৯৫০ সালে ইউনেস্কোর পরামর্শানুযায়ী এবং ভারত সরকারের অনুরোধে বাস্তুহারাদের মধ্যে এক সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করেছেন। কি পন্থা অবলম্বন করলে বাস্তুহারারা শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারবে সেই উদ্দেশ্যে কালনার কাছে জিরাট এবং যাদবপুরে আজাদগড় কলোনীতে বাস্তুহারাদের মধ্যে কাজ চালানো হচ্ছে। তাদের জীবনের নানা দি কনানা পরিবেশ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষা করা হচ্ছে যাতে এই সকল ব্যক্তিগণকে নতুন দেশে নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে দেওয়া যায়, ভবিষ্যতে অযথা তাদের কোনও অসুবিধা যাতে তাদের না হয়। সুষ্ঠুভাবে এই সকল পরীক্ষা কাজ চালাবার জন্য বিভাগ কতকগুলি বিদেশী পরীক্ষার নিয়মকে দেশী করে নিয়েছে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে নকল আসলকে অতিক্রম করে গেছে। এখন এই সকল পরীক্ষার ফলাফল উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করা হচ্ছে।

তবে একটা ব্যাপার ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা হল এই যে বাস্তুহারাগণ বাধ্য হয়ে গৃহচ্যুত হয়ে আসার ফলে এদেশে এসে স্থানীয় লোকদের সুনজরে দেখতে পারছে না এবং সরকারের প্রতিও একটা বৈরীভাব পোষণ করে, অর্থাৎ সরকার যেন তাঁদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন নন; এবং মনের এই ভাব পুরুষ বাস্তুহারাগণ অপেক্ষা নারী বাস্তুহারাগণদের মধ্যে তীব্র।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে আদিবাসীদের মধ্যে অনুরূপ এক পরীক্ষা চালাবার উদ্দেশ্যে সেখানে ইতিমধ্যেই একটি পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে। কয়েকটি উপজাতি আগন্তুকগণকে এখনও শত্রু মনে করে তাদের মাঝে মাঝে আক্রমণ করে। তাদের আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য সেখানে পুলিশের একটি বিশেষ বিভাগ সর্বদা প্রস্তুত রাখতে হয়। উক্ত পরীক্ষাগারে একদল বিশেষজ্ঞ নৃতাত্ত্বিক রাখা হয়েছে যাদের কাজ হল ঐ সকল আদিবাসীদের ভাষা শিক্ষা করে এবং তাদের স্বভাবাদি আয়ত্ত করে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা। এই তাদের জীবনের নানা দিক নানা পরিবেশ অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে।

দেশী সংবাদ

৫ই নবেম্বর—অদ্য বোম্বাইয়ে ভারতের রেলওয়ে মন্ত্রী শ্রী এন গোপালস্বামী আয়েঙ্গার দুইটি নূতন রেলওয়ে—মধ্য ও পশ্চিম রেলওয়ের উদ্বোধন করেন।

ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু অদ্য কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি স্বরাষ্ট্র ও আইন দপ্তরের ভার গ্রহণ করিবেন।

কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী ও জাতীয় সম্মেলনের নেতা শেখ আবদুল্লা অদ্য কাশ্মীর গণপরিষদ তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় ভারতের সহিত কাশ্মীরের বন্ধুত্বের কথা উল্লেখ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ গবর্নমেন্টের পুনর্বাসন দপ্তর হইতে এতদ্রাজ্যে সহর ও মিউনিসিপ্যাল এলাকাসমূহে উদ্বাস্তুদের মধ্যে যে গৃহ নির্মাণ ও ব্যবসায় ঋণ দেওয়া হইত, রাজ্যের সর্বত্র অনির্দিষ্টকালের জন্য তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

৬ই নবেম্বর—রাণাঘাটের সংবাদে প্রকাশ, গত দুই সপ্তাহ যাবৎ কুপার্স ও রূপশ্রী উদ্বাস্তু-শিবিরের চতুর্দিকস্থ শৃগাল ও বেওয়ারিশ কুকুরগুলি শিশু ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। এ পর্যন্ত ১৫টি শিশু আক্রান্ত হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে দুইজন মারা গিয়াছে।

শ্রীনগরে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, কাশ্মীরের পাক-অধিকৃত কারণা অঞ্চলে টাইফাস মহামারীতে এ পর্যন্ত চারি হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

সৌরাষ্ট্র, গুজরাট ও মহারাষ্ট্র হইতে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে যে সব কংগ্রেসপ্রার্থী দাঁড়াইবেন, অদ্য কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নির্বাচন কমিটি তাঁহাদের নামের তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার হরিলাল জয়কিষণদাস কানিয়া অদ্য রাত্রে নয়াদিল্লীতে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন।

৭ই নবেম্বর—ভারত সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রী বি কে আচার্য ঢাকায় ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন।

ভারতের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মাননীয় শ্রীপতঞ্জলি শাস্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ভারতের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

অদ্য কাশ্মীর গণপরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়। পরিষদের অদ্যকার অধিবেশনে একটি মূলনীতি নির্ধারণ কমিটি এবং মৌলিক অধিকার ও নাগরিকাধিকার নির্বাচনের জন্য অপর একটি উপদেষ্টা কমিটি নিয়োগ করা হয়।

৮ই নবেম্বর—কলিকাতায় এই মর্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বরিশাল জেলার কর্তৃপক্ষ বরিশাল সদর মহকুমা, বাবুগঞ্জ থানা ও অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলে বিগত দাঙ্গায় প্রপীড়িত অনেক হিন্দুর গৃহ পূর্ববঙ্গ ত্যাগকারী হিন্দু উদ্বাস্তুদের সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়া ঐগুলি বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান উদ্বাস্তুদের বাসের জন্য বণ্টন করিয়া দিয়াছেন।

হিমাচল প্রদেশ বিধানসভার নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চিনি নির্বাচনকেন্দ্রে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইয়াছেন। কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীবাহাদুর সিং নেগী অপেক্ষা ২৩৪টি অধিক ভোট পাইয়া স্বতন্ত্র প্রার্থী শ্রীগোপালচাঁদ জয়লাভ করেন।

৯ই নবেম্বর—পশ্চিমবঙ্গে আগামী সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে রাজ্য বিধানসভা এবং সংসদের লোকসভার বিভিন্ন আসনের জন্য আগামীকল্য, ১০ই নবেম্বর হইতে প্রার্থিগণের মনোনয়নপত্র দাখিলের কাজ আরম্ভ হইবে। আগামী ১৯শে নবেম্বর পর্যন্ত ইহা চলিবে। পশ্চিমবঙ্গে এক কোটি পঁচিশ লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী ভোটদানের অধিকার লাভ করিয়াছে।

ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক মিঃ বি টি রণদিভে প্রমুখ পাঁচজন বিশিষ্ট নেতা পার্টি হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। মিঃ রণদিভে ও তাঁহার সহকর্মীদের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন মিঃ অজয় কুমার ঘোষ ও মিঃ এস এ ডাঙ্গে এম এল এ-র নেতৃত্বে আর একদল কর্মী।

১০ই নবেম্বর—রেল কর্মচারিগণের অভাব-অভিযোগ দূরীকরণের কার্যকরী পন্থা হিসাবে অদ্য নয়াদিল্লীতে রেল কর্মচারী সংঘ ও রেলওয়ে মন্ত্রীর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। উক্ত চুক্তি অনুযায়ী রেলওয়ে শ্রমিক-বিরোধ মীমাংসার জন্য রেলওয়ে দপ্তর কর্তৃক একটি স্থায়ী সংস্থা গঠিত হইবে।

১১ই নবেম্বর—নেপালের অন্তর্বর্তিকালীন কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার কংগ্রেসী সদস্যগণ অদ্য পদত্যাগ করিয়াছেন।

কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীদৌলতরাম পাঙ্গী তপশীল হইতে হিমাচল প্রদেশ বিধান সভার সদস্য মনোনীত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

৬ই নবেম্বর—অদ্য প্যারিসে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের ষষ্ঠ অধিবেশন আরম্ভ হয়। ডাঃ নার্ভো (মেক্সিকো) সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

৭ই নবেম্বর—বৃটিশ ডেস্ট্রয়ার 'করোন' ও 'এজিনকোর্ট' অদ্য সৈয়দ বন্দর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। ৫ই নবেম্বর ভূমধ্যসাগরে বৃটিশের শক্তিবৃদ্ধিকল্পে যে নৌ-বহর আসে, এই দুইটি ডেস্ট্রয়ার তাহার অন্তর্ভুক্ত।

সোভিয়েট পররাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী ও রুশিয়ার গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান মিঃ লরেনটিন বেরিয়া অদ্য ঘোষণা করেন যে, ইঙ্গ-মার্কিণ যুদ্ধ-বাজরা যদি আর একটি পৃথিবীব্যাপী নূতন মহাযুদ্ধ বাধাইতে সফলকাম হয়, তবে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ চূর্ণবিচূর্ণ হইতে বাধ্য।

৮ই নবেম্বর—সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ আঁদ্রেই ভিসিনস্কি অদ্য ত্রিশক্তির নূতন শান্তি-প্রয়াসের প্রত্যুত্তরে আগামী জুন মাসের মধ্যে চীন সহ বৃহৎ পঞ্চশক্তির এক বৈঠক এবং একটি আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান অদ্য 'আন্তর্জাতিক অস্ত্র হ্রাস' সম্পর্কে এক বেতার বক্তৃতায় এক ব্যাপক ও বিস্তৃত নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আবেদন জানান। শেষ পর্যন্ত আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ-করণের ব্যবস্থাও এই পরিকল্পনার অঙ্গীভূত হইয়াছে।

৯ই নবেম্বর—অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড ত্রিশক্তির নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনা সমর্থন করে।

১০ই নবেম্বর—অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জ নিরাপত্তা পরিষদে ইঙ্গ-মার্কিন যৌথ প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানকল্পে আরও আলাপ-আলোচনা চালাইবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

১১ই নবেম্বর—অদ্য পান-মুন-জনে কম্যুনিষ্ট ও রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিনিধিগণের মধ্যে পুনরায় আলোচনা চলে। কিন্তু যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখা ও নিরস্ত্রীকৃত এলাকা নির্ধারণের কাজ মোটেই অগ্রসর হয় নাই।

গতকল্য সুদানে যে নূতন 'সম্মিলিত দল' গঠিত হইয়াছে, উহারা ঘোষণা করিয়াছে যে, তাহারা অবিলম্বে সুদান হইতে মিশরী ও বৃটিশ সেনা বাহিনীর সম্পূর্ণ অপসারণ দাবী করিবে।

ভারতীয় মূল্যঃ প্রতি সংখ্যা—।৵৹ আনা, বার্ষিক—২০৲ ষান্মাসিক—১০৲
পাকিস্থান মূল্যঃ প্রতি সংখ্যা (পাক) ।৵৹ আনা, বার্ষিক—২০৲ ষন্মাসিক—১০৲ (পাক)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালকঃ আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নির্ভীক জাতীয় সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা	... ...	।৵০
শহরে বার্ষিক	... ...	১৯৲
ষান্মাসিক	... ...	৯৷৷০
ত্রৈমাসিক	... ...	৪৸০
ভারতের মফঃস্বলে (সডাক) বার্ষিক		২০৲
ষান্মাসিক	... ...	১০৲
ত্রৈমাসিক	... ...	৫৲
ব্রহ্মদেশে (সডাক) বার্ষিক	...	২২৲
ষান্মাসিক	... ...	১১৲
পাকিস্তানে (সডাক) বার্ষিক	...	২৮৸০
ষান্মাসিক	... ...	১৪।৵০
অন্যান্য দেশে (সডাক) বার্ষিক	...	২৪৲
ষান্মাসিক	... ...	১২৲

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার

সাময়িক বিজ্ঞাপন	৬৷৷০ টাকা প্রতি ইঞ্চি প্রতিবার
চুক্তিবন্ধ বিজ্ঞাপন	৫৲ টাকা প্রতি ইঞ্চি প্রতিবার

(এক বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ ৫০" স্থান ব্যবহার করিতে হইবে)

নোটিশ বিজ্ঞাপন যথা—সরকারী, রেলওয়ে, ষ্টিমার সার্ভিস, মিউনিসিপ্যালিটি, আইন, কোম্পানী প্রস্পেক্টাস অথবা সাধারণ নোটিশ ইত্যাদি ১২৲ টাকা প্রতি ইঞ্চি প্রতিবার। মলাট এবং অন্যান্য স্থানের বিজ্ঞাপনের হারের জন্য বিজ্ঞাপন বিভাগের ম্যানেজারের নিকট লিখুন।

প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে নিয়ম

পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপযুক্ত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালিতে লিখিবেন। কোন প্রবন্ধের সহিত ছবি দিতে হইলে অনুগ্রহপূর্বক ছবি সঙ্গে পাঠাইবেন অথবা ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে জানাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ লইতে হইলে সঙ্গে উপযুক্ত ডাকটিকিট দিবেন। লেখা পাঠাইবার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে যদি তাহা "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে লেখাটি অমনোনীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অমনোনীত লেখা ছয় মাসের পর নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। অমনোনীত কবিতা টিকিট দেওয়া না থাকিলে এক মাসের মধ্যেই নষ্ট করা হয়।

সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক দিতে হয়।

ঠিকানা—আনন্দবাজার পত্রিকা
১৪৮নং আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

উনবিংশ বর্ষ] শনিবার, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮ সাল। Saturday, 1st December, 1951. [৫ম সংখ্যা

নালন্দা ও মিথিলার নবরূপ

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ সম্প্রতি মিথিলা ও নালন্দার নব অভ্যুদয়ের সূচনা এবং নূতন সম্ভাবনার উদ্বোধন করিয়াছেন। দ্বারভাঙ্গায় এবং প্রাচীন নালন্দার সন্নিহিত স্থানে যথাক্রমে একটি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় এবং নব নালন্দা বিহারের ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। ভারতের ইতিহাসে ইহাকে এক যুগান্তকারী ঘটনা বলা যাইতে পারে; কারণ, বাণীর যে পীঠস্থান দুইটিকে ভিত্তি করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি বিগত যুগে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, সেই দুইটির সাধনা এতদ্দ্বারা সংযুক্তভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, ভারতের নব রাষ্ট্রে এমন আশারই আজ অরুণোদয় ঘটিল। রাষ্ট্র-বিপর্যয়ের অভিশাপে নালন্দার চৈত্য-বিহার ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়। সংস্কৃত ভাষাই নালন্দার বিদ্যাপীঠে মুখ্য মাধ্যম ছিল। পরে মিথিলার সংস্কৃত-সাধনা ভারতের সেই বিশ্বতোব্যাপ্ত উদার আত্মভাবনাকে অন্ততঃ আংশিকভাবে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিল। কালক্রমে মিথিলার সাধন-দীপ যখন নির্বাপিতপ্রায়, বাঙলা সেই সময় তাহার সেই স্তিমিত দীপ-শিখায় জ্ঞানের আলোকে প্রাণের বর্তিকা জ্বলাইয়া লয় এবং নবদ্বীপ ভারতীয় সংস্কৃতির নূতন সাধন-তীর্থে পরিণতি লাভ করে। এইভাবে সেই অন্ধতম যুগে ভারতের আত্মার বাণী-মূর্তিকে বিকশিত রাখে বাঙলার নবদ্বীপ। পরাধীনতার বহু বিপর্যয়ের ঝড় এদেশের বুকের উপর দিয়া পরবর্তী যুগে বহিয়া গিয়াছে এবং সে নবদ্বীপও এখন আর নাই। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির যে প্রাণময় এবং মনোময় আলো এখান হইতে একদিন ছড়াইয়াছিল, তাহা আজও একেবারে নির্বাপিত হইয়া যায় নাই। বস্তুতঃ অখণ্ড ভারতের আত্মভাবনা এবং বিশ্বমৈত্রীর উদার প্রেরণা বাঙলার সংস্কৃতির ভিতর দিয়া বরাবর ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হইতেই ছিল। রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের সাধনায় তাহা বৈচিত্র্যের পথে বাহিরেও প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। বিশ্বের সঙ্গে মানবতাময় সংস্কৃতির সূত্রে সংযোগ স্থাপন করিতে বাঙলা নূতন প্রাণের বলে, নবীন তপস্যার পথে অগ্রসর হয়। বাঙলার জাতীয় জীবনের বিকাশের মূলে ভারতীয় সংস্কৃতির এই উদার অবদান বিশেষভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙলার গৌরবময় ঐতিহ্য বাহিরের রাজনীতিক দিকটাই শুধু উন্মুক্ত হইয়াছে; কিন্তু সংস্কৃতির এই গতি আরও তীব্র এবং গভীরভাবে অন্তঃস্তল-প্রসারী এবং মূলে আছে মানবতার প্রেরণা। রবীন্দ্রনাথের সাধনায় বিশ্বভারতীর ভিতর দিয়া বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে ইহার স্বরূপ উন্মুক্ত হয়। নালন্দায় ভারতীয় সংস্কৃতির যে বাণী সমগ্র এশিয়ায় শ্রুতি মূলে একদিন বাজিয়া উঠিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী হইতে তাহারই সুর পুনরায় দিকে দিকে সঞ্চারিত হইতে থাকে। ভারত স্বাধীনতা লাভের পর কবির সেই সাধনা বিশ্বভারতীর ভিতর দিয়া সম্প্রসারিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। এখন মিথিলা ও নালন্দা এবং বিশ্বভারতী এই ত্রয়ী সাধনার সমন্বয় সর্বাধিক শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। তাহার ফলে হিংসা ও বিদ্বেষ জর্জরিত জগৎ প্রেম এবং মৈত্রীর মানবতার সংস্কৃতির প্রভাবে পশুত্ব এবং বর্বরতার বিভীষিকা হইতে মুক্ত হইবে, আমরা ইহাই আশা করি। ফলতঃ নালন্দা এবং মিথিলার সাধনাকে যদি সম্প্রসারিত করিতে হয়, তবে নবদ্বীপকে বিস্মৃত হইলে চলিবে না। পরন্তু সেক্ষেত্রে আধুনিক বাঙলার অবদানকেই অতীত এবং বর্তমানের যোগসূত্রস্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে এবং বিশ্বকবিকে সেই পবিত্র ব্রতের ব্রতপতির পদে বরণ করিতে হইবে। প্রাদেশিকতার বশে আমরা এমন দাবী করিতেছি না; প্রকৃত পরম উদার বিশ্বমানবতার অনুভূতির উপরই এই সত্যের প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে।

নিদারুণ দুর্ঘটনা

গত ২১শে নবেম্বর বুধবার সকাল বেলা দমদমের বিমান ঘাটির কাছে যে নিদারুণ দুর্ঘটনা ঘটে, তাহাতে ভারতের সর্বত্র শোকের ছায়া পতিত হয়। মর্মান্তিক এই ব্যাপার হইতে আমরা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছি। নাগপুর হইতে ডাকবাহী একখানা উড়োজাহাজ ভাঙিয়া পড়িয়া এই দুর্ঘটনায় ষোলজন মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইঁহাদের মধ্যে

নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্মেলনের সভাপতি লালা দেশবন্ধু গুপ্ত, উক্ত সম্মেলনের সহকারী সম্পাদক লাজপত রায়, বোম্বাইয়ের ফ্রী প্রেস জর্নাল পত্রের সর্বাধ্যক্ষ মিঃ স্যামুয়েল এবং বোম্বাইয়ের সিস্টোজ লিমিটেড নামক বিজ্ঞাপন-প্রচারক প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী ভি সিস্টো; এই কয়েকজন সাংবাদিক ছিলেন। শ্রীযুক্ত দেশবন্ধু গুপ্ত ভারতের সর্বত্র সুপরিচিত। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য কয়েক মাস পূর্বেও ভারতীয় সংসদে তিনি যেভাবে সংগ্রাম পরিচালনা করেন, তাহাতে তিনি জনগণের বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। বস্তুতঃ সংবাদপত্র-সেবার ক্ষেত্রে দেশবন্ধু গুপ্তের অবদান সামান্য নয়। সর্বজনমান্য জননায়ক স্বামী শ্রদ্ধানন্দের আনুগত্যে তাঁহার কর্মজীবন আরম্ভ হয় এবং অচিরকাল মধ্যেই তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে দিল্লী প্রদেশের অন্যতম নেতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হন। শ্রীযুক্ত গুপ্ত তাঁহার পঞ্চাশৎ বর্ষ কাল জীবনের মধ্যে ৬ বৎসর কাল কারাগারে কাটাইয়াছেন। দেশ-সেবার কাজে তাঁহার একান্তিকতা সর্বজনবিদিত ছিল। সংগঠনমূলক কাজ, বিশেষভাবে সঙ্ঘ-পরিচালনায় তাঁহার কৃতিত্ব ভারতের সর্বত্র খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। বাস্তবিকপক্ষে দেশসেবার প্রেরণা এবং সংবাদপত্র-সেবার পবিত্র ব্রতেই শ্রীযুত গুপ্ত আত্মদান করিয়াছেন। ভারতের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভারত ও পাকিস্থানের সংবাদপত্র-সেবা ও সাধনার ক্ষেত্রে যাহাতে পারস্পরিক সৌহার্দ্য এবং প্রীতির ভাব সুদৃঢ় হইয়া উঠে শ্রীযুত গুপ্ত কিছুদিন হইতে সেই দিকেই বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। যে দিন এই শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে, সেদিন কলিকাতায় আহূত নিখিল ভারত সংবাদপত্রসেবী সম্মেলনে তাঁহার নেতৃত্বে সংবাদপত্র সেবার ক্ষেত্রে উক্ত উদ্দেশ্য সাধনে প্রশস্ততর পথ উন্মুক্ত হইবে, অনেকে এই আশাই করিতেছিলেন; কিন্তু আকস্মিক মর্মান্তিক দুর্ঘটনার ফলে সে আশা অপূর্ণই থাকিয়া গেল। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম নির্ভীক সৈনিক তাঁহার জীবনের ব্রত অসম্পন্ন রাখিয়াই মহাপ্রয়াণ করিলেন। এ অভাব সহজে পূর্ণ হইবার নয়। তাঁহার অবদান দেশবাসীর স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত থাকিবে; ইহা ব্যতীত এক্ষেত্রে আমাদের বলিবার আর কিছুই নাই। আমরা শ্রীযুক্ত গুপ্ত এবং অন্যান্য নিহত ব্যক্তিদের পরিজনবর্গের গভীর শোকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। এই গভীর বেদনা ও আঘাত সহ্য করিবার শক্তি ভগবান তাঁহাদিগকে দান করুন, ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

নির্বাচন সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল

ভারতের প্রধানমন্ত্রীস্বরূপে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সম্প্রতি একটি বেতার বক্তৃতায় আসন্ন নির্বাচনের গুরুত্ব এবং তৎসম্পর্কিত ইতিকর্তব্যের প্রতি জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার নির্দেশ এই যে, নির্বাচনের ব্যাপারে, আমাদের সকলকে মনে রাখিতে হইবে, সদস্যপদ-প্রার্থীরা যে কোন দলভুক্তই হোন্ না কেন, তাঁহাদের কোন কাজ যেন শালীনতাকে অতিক্রম না করে। এই সম্পর্কে লেখাতে অথবা বক্তৃতায় যেন ব্যক্তিগতভাবে কাহাকেও আক্রমণ না করা হয়। বাস্তবিকপক্ষে কেবল নীতি ও কর্মপদ্ধতির সম্বন্ধেই আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। নির্বাচনপর্ব সবে আরম্ভ হইয়াছে। প্রচারকার্যের আবর্ত এখনো পাকিয়া উঠে নাই এবং উত্তেজনা এখনও আগ্নেয় স্তরে উপনীত হয় নাই, কিন্তু অশুভ লক্ষণ ইহার মধ্যেই দেখা দিয়াছে। ফলতঃ দলগত ভেদবুদ্ধি যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আশা কতটা পূর্ণ হইবে এবং যোগ্য ব্যক্তিদিগকে প্রতিনিধিস্বরূপে আইন-সভায় পাঠাইবার সুবিধা জনসাধারণ কতটা লাভ করিবে, এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ বৃহৎ আদর্শের ভিত্তি যেখানে নাই, সেখানে দলগত নীতি বা কর্মপদ্ধতির সুষ্ঠুভাবে পরিচয় লাভের সুযোগই বা কোথায়? বাস্তবিকপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের দলের হিসাব রাখিতেই জনসাধারণ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। কোন দলের কি যে কর্মনীতি, সদস্যদের তাহা বিচার করিয়া দেখিবার মত আগ্রহও লোকের মনে জাগিতেছে না; অধিকন্তু সে আগ্রহ দেখাইতে গেলে অন্ত পাওয়াও দুষ্কর হইয়া পড়ে। কারণ, অন্ততঃ বারোটি দল নির্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কংগ্রেস দলের অবশ্য মোটামুটি একটা নীতি আছে; কিন্তু কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ যেভাবে তাঁহাদের সদস্যদের দাঁড় করাইয়াছেন, তাহাতে জনসাধারণের মনে তাঁহাদের নীতিগত আদর্শের ঐকান্তিকতা পরিস্ফুট হইবার সুযোগ ঘটে নাই। সব মতের লোকই ইঁহাদের মধ্যে আছেন। অধিকন্তু যাঁহারা দীর্ঘদিনের কংগ্রেসকর্মী, তাঁহাদের মধ্যে এই ব্যাপারে বিক্ষোভের ভাব ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং লোকের মনে সন্দেহ-সংশয় দেখা দিবে ইহা বিচিত্র নয়। প্রকৃতপক্ষে নির্বাচনের গতি যে ধারা ধরিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহাতে কোন দলের নীতি বা কর্মপদ্ধতি যে জনসাধারণের চিত্তকে আকর্ষণ করিবে, ইহা মনে হয় না; পক্ষান্তরে ব্যক্তিগত প্রভাবই আসন্ন নির্বাচনের ক্ষেত্রে বড় হইয়া উঠিবে, আমাদের ইহাই বিশ্বাস। এইরূপ অবস্থায় নির্বাচন সম্পর্কিত প্রচারকার্য পরিশেষে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়াই বিস্তার লাভ করিবে এবং তাহাতে শালীনতার মাত্রা অতিক্রান্ত না-ও হয় এবং সংযম যদি বজায় রাখা সম্ভবও হয়, তথাপি গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ যে প্রশস্ততর হইবে, ইহা মনে হয় না। কারণ, একদিকে সমগ্রের স্বার্থগত বৃহত্তর চেতনার ভিত্তিতে সুসংহত কর্তৃত্ব এবং অন্যদিকে সেই কর্তৃত্বের বিরুদ্ধতার জন্য সুগঠিত ও সঙ্ঘবদ্ধ দলের সাহায্যেই গণতান্ত্রিকতা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ব্যাধিতের বেদনা

পশ্চিমবঙ্গে যক্ষ্মারোগ উত্তরোত্তর ভয়াবহ আকার ধারণ করিতেছে। শহর অঞ্চলে এই রোগের আক্রমণ সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী; কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই নিদারুণ ব্যাধি গ্রাম অঞ্চলেও সম্প্রসারিত হইতেছে। পূর্ববঙ্গ হইতে নিঃস্ব এবং দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় বহু উদ্বাস্তুর সমাগমে পশ্চিমবঙ্গে এই সমস্যা জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষজ্ঞগণের হিসাব অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে এই রোগ আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা দেড় লক্ষেরও অধিক। এই আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক সংখ্যক এমন অবস্থায় আছে, যাহাতে তাহাদের দেহ হইতে রোগ-বীজাণু অন্যের শরীরে সহজেই সংক্রমিত হইতে পারে। অথচ আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে ক্ষয়রোগ

দুরারোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। প্রাথমিক অবস্থায় যথাযোগ্যভাবে রোগ-নির্ণয় এবং তাহার চিকিৎসা-বিধান করা হইলে এই ব্যাধি নিরাময় হইতে পারে। পাশ্চাত্য দেশসমূহের অনেক স্থানেই এই রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া ইহার প্রকোপ অপ্রত্যাশিতরূপে হ্রাস করা সম্ভব হইয়াছে। ইউরোপ প্রভৃতি দেশে যাহা সম্ভব হইয়াছে, ভারতেও নিশ্চয়ই তাহা অসম্ভব নয়; কিন্তু এজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা দরকার এবং সেজন্য জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি আবশ্যক। বেঙ্গল টিউবারকিউলিসিস এসোসিয়েশন এই উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও সীল বিক্রয় প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। গত ২রা অক্টোবর হইতে সীল বিক্রয়ের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ২৬শে জানুয়ারী পর্যন্ত বিক্রয়ের কাজ চলিবে। আমরা প্রত্যেক দেশবাসীকে তাঁহাদের এই পবিত্র ব্রতে আনুকূল্য করিবার জন্য আবেদন করিতেছি। প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে সভার আফিস হইতে সীল ক্রয় করিতে পারেন এবং বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তৃগণ সীল বিক্রয়ের দায়িত্ব নিজেরা গ্রহণ করিয়া এই কাজে সাহায্য করিতে পারেন। নির্বাচনের এই হুল্লোড়ের মধ্যেও মানবতার এই আবেদন উপেক্ষিত হইবে না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস; আমরা জানি, বিপন্ন মানবের প্রতি বেদনাসম্পন্ন নর-নারীর অভাব পশ্চিমবঙ্গে এখনও ঘটে নাই। ব্যাধিত এবং পীড়িত মানব-সমাজের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের এই মহান্ ব্রত সফল করিবার জন্য আমরা সকলেই অনুরোধ করিতেছি। এস সর্বাধিকারী, অবৈতনিক সম্পাদক, বেঙ্গল টিউবার-কিউলোসিস এসোসিয়েশন, ৬০।৩, ধর্মতলা স্ট্রীট এই ঠিকানায় চিঠি লিখিলে সীল পাওয়া যাইবে এবং এতৎসম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয় যত্নের সঙ্গে জানানো হইবে।

জমিদারী প্রথা

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি প্রধানত কৃষির উপর নির্ভর করে এবং অন্ন-সমস্যার প্রকৃত প্রতিকার শুধু জমির উৎপাদন বৃদ্ধির সাহায্যেই সম্ভব। এ জন্য জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন করাই দেশের লোকে একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে করে। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জনগণের এই দাবীকে, দেখা যাইতেছে, সোজাসুজি স্বীকার করিয়া লইতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি কলিকাতার সাংবাদিকদের একটি বৈঠকে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, জমিদারী-প্রথার উচ্ছেদ হইলেই যে কৃষকদের অবস্থার উন্নতি ঘটিবে কিংবা শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, তিনি এরূপ মনে করেন না। অথচ কি উপায়ে যে ঐ উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব, ডাক্তার রায় তাঁহার আলোচনায় কার্যকর তেমন কোন প্রস্তাবও উপস্থিত করিতে পারেন নাই। শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে জমির মালিকানা স্বত্ব যে চাষীদের হস্তে অর্পণ করা প্রয়োজন কিন্তু ডাঃ রায় একথা স্বীকার করেন। কৃষকেরা যদি বুঝিতে পারে যে, জমি তাহাদেরই, তবে তাহারা ভূমির উৎকর্ষ সাধনে অধিক শক্তি নিয়োগ করিবে, তিনি এ যুক্তিও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। জমিদারী-প্রথার কোন শুভফলের সম্বন্ধে বিবেচনায় কৃষকদের কাজে উৎসাহ জাগাইতে অন্তরায় ঘটায়, প্রকৃতপক্ষে ডাক্তার রায়ের আলোচনায় এ প্রশ্ন থাকিয়াই যায়। জমিদারী-প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়া কৃষকদিগকে ষোল আনা মালিকানা স্বত্ব দিলে যেটুকু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহাদের মধ্যে জমির উৎকর্ষ সাধনের জন্য যে আগ্রহ জাগে সে সুযোগই বা কেন গ্রহণ করা হইবে না? ভূমির বণ্টনের নূতন ব্যবস্থার অপেক্ষাকৃত দুরূহ প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কমিশন্ সে প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা বর্তমানে অসম্ভব বলিয়া ইতঃপূর্বেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং সে প্রশ্ন তুলিয়া বর্তমানে লাভ নাই। সোজা কথা এই যে, জমিদারী-প্রথা পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির পক্ষে কোন হিসাবেই সাহায্য করিতেছে না। অধিকন্তু ইহাতে জমিদারদেরও বিশেষ কিছু লাভ হইতেছে না। ডাক্তার রায়ের নিজরই অভিমত এই যে, জমিদারগণ জমিদারী ছাড়িয়া দিতে পারিলেই বাঁচিয়া যান। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জমিদারী প্রথায় জমিদারদেরও লাভ নাই, ইহাতে রায়তেরও লাভ নাই। উভয়ের এই ক্ষতিতে সমগ্রভাবে জাতিরই ক্ষতি হইতেছে। জমিদারেরা শহরবাসী হইয়া পড়িয়াছেন এবং কৃষকেরা জমির সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া যাইতেছে; সত্যই উৎকট এই অবস্থা। এই অবস্থার প্রতিকার সাধন অবিলম্বে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহা করিতে হইলে গভর্নমেন্ট জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদ সাধনের বিরোধী নহেন, শুধু এই ধরণের দ্বিধাপূর্ণ উক্তিতে কোন কাজ হইবে না। বস্তুত তদ্দ্বারা সমস্যাটিকে সুকৌশলে এড়াইয়া যাওয়া হইল বলিয়াই দেশের লোকে মনে করিবে। ফলত জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়া রায়তকে জমির ষোল আনা মালিকানা স্বত্ব দিতে হইবে। ইহার ফলে জমিতে নিজ স্বত্ব বোধ জাগার জন্য যদি তাহাদের শক্তি জমির কাজে সমধিক প্রযুক্ত হয় এবং তাহার ফলে শস্যের উৎপাদন বাড়ে, অন্ন সমস্যায় নিত্যপীড়িত দেশবাসীর পক্ষে সে লাভই বা কম কি? প্রত্যুত আমাদের বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গের পল্লী অঞ্চলের অবস্থা তাহাতেই অনেকখানি ফিরিয়া যাইবে এবং কুটীরশিল্পসমূহও পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিবে।

আমাদের প্রেম

শিবদাস চট্টোপাধ্যায়

আলোর বেড়ায় ঘেরা
এই গোল অন্ধকারে
বাঁধানো আকাশশ্লেট পুকুরের পাড়ে
আমার পাশেতে তুমি ঘন হোয়ে বোসো
ঘাসেরা যেমন ঘন।
কথা বলো—কথা অন্য কোনো—
যত কথা ঘাসে ঘাসে আছে
মাটির তিমিরে নাচে—
আমাদের প্রেম বাদ দিয়ে।

অনেক রাত্রির চেয়ে আজ রাত্রি বড়ো
ছায়াপথ দীর্ঘতর
কি হবে ঠোঁটের স্পর্শ নিয়ে।

ওপারে জমাট কালো মৃত্যুর প্রাসাদ কোণে
মাকড়সা জাল বোনে
একমনে
প্রাগৈতিহাসিক কোনো গণ্ডার-কঙ্কালে।

তুমি কোনকালে
ভালবেসেছিলে হরিৎ সকালে
আদিম নিষ্পাপ
আজ তা' গিয়েছি ভুলে। অবশেষ গায়ের উত্তাপ।

ধার্মিক গির্জার শীর্ষে
ছিন্ন ঘুড়ির মতো অনন্ত সময় ওড়ে।
ভয় করে, চলো উঠি, চারিদিকে শুধু সাপ
সাপ।

ঘরের কেচ্ছা

গোমূখ্যু না হলে কেউ ঘরের কথা বাইরে আলোচনা করে না জানি—কিন্তু যদি কোন ভদ্রলোকের প্রায় রাঁচির মানসিক আগারে যাবার অবস্থা হয়ে আসে তখন সে কি করে? আমার অবস্থা প্রায় সেই রকমই হয়ে এসেছে বলেই ঘরের কেচ্ছা আচ্ছা করে লোক সমাজে বলতে হচ্ছে।

সেজ কর্তার এই সাত দিন আগে একটি পুত্র সন্তান হয়েছে, কাল তাঁর আটকড়াই হবে, অতএব একটু ধুম ধড়াক্কা কর। মানুষের আক্কেল বলে একটা জিনিস থাকে ত সেটা ক্রমশঃ জগৎ থেকে উপে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। আটকড়াইয়ের জন্যে সবাই ব্যস্ত কারণ তাঁর সাত সাতটি মেয়ের পর সবেধন এই নীলমণিটি এসেছেন, অতএব একটু ঘটাঘুটি হবে না?

এই বাজারে একটা ছেলে হলে ভাবনায় হাত-পা মেলে কোথায় বিছনায় লোকের শুয়ে পড়া উচিত, কিন্তু তার পরিবর্তে এদের আনন্দ একেবারে বুক ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল। বলবার জো নেই—তাহলেই আমি মন্দ, আমার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখাই নাকি পাপ!

এই বাজারে লোকে কি ক্যালকুলেশনে যে ছেলেমেয়ে আমদানি কর্চ্ছে, আমার তো মাথায় ঢোকে না। খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, আশ্রয় নেই অথচ পিলপিল করে ছেলেমেয়ে এসে বাড়িতে কিলবিল করছে। খিল বন্ধ করে তো আর এদের আগমন বন্ধ করা যায় না, অতএব কিল খেয়ে চুপ মেরে বসে থাক!

আসল কথা, আমি দেখছি যে দেশে আর একবার গুটি কতক বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্কর চট করে না জন্মালে আমাদের মুক্তির অপর কোন উপায় নেই। সংসারের শতকরা আশি-জনকে যদি না সন্ন্যাসী বানানো যায়, তাহলেই মুশকিল! লোকের সংখ্যা না কমাতে পারলে বাঁচা অসম্ভব!

ভারতবর্ষ এক সময় বৌদ্ধমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে তাই বেঁচে গেছলো, বহুদিন বহুলোক সংসার পাতে নি, অন্যান্য মহাপুরুষরাও এ বিষয়ে বহু হেল্প করে গেছেন, কিন্তু ইদানিং এই বিজ্ঞানের যুগেও কী

কেলেঙ্কারী হচ্ছে স্বচক্ষে দেখছেন তো? চ্যাঁ ভ্যাঁর ঠেলায় তো অন্ত নেই। খাট, তক্তপোষ সবে ভরে গেছে, বাকি ছিল ভাঁড়ারের তাক, তাতেই লোকে থাক্ থাক্ করে ভাবী বংশধরদের শুইয়ে রাখছে, তাও দেখে এলুম। মশাই, পৃথিবীতে পঞ্চাশ কোটি লোক বেড়েছে গত কয়েক বছরের ভেতর, এর ওপর সেজবাবুর কাণ্ডটা দেখলেন? ছেলের আটকড়াই হচ্ছে—উঃ! ধন্যি লোক সব।

বাড়ির পাশে এক ভদ্রলোকের আবার কাণ্ড দেখছি। ছেলে হয় নি বলে তাঁর আর

হামাগুড়ি

তাঁর পরিবারের দুঃখের অন্ত নেই। নানা রকম চেষ্টা চরিত্র করেও কিছু হয় নি, ডাক্তার, বদ্যি হার মেনে গেছে, এখন দৈব নিয়ে পড়েছেন, যদি সেখান থেকে দেবতারা দয়া করে এইবার কাউকে পাঠান তবেই রক্ষে, নইলে এঁরা যে কি করবেন জানি না! কত-দিন বলেছি, মশাই, আমাকে পুষ্যি নিন। একটু বয়েস হয়ে গেলেও সংসারের চাপে পড়ে হামাগুড়ি দিতেও শিখেছি, বৈঠক-খানায় শুইয়ে রাখবেন—তা তিনি শুনবেন না। এই তো আশপাশেরও অবস্থা!

এর ওপর আবার ব্যাপার জানেন? বাড়িতে ধুমসোটার বিয়ে দেবার জন্যে সবাই মাথা ফাটাফাটি কর্চ্ছে, কিন্তু আমি স্রেফ ন-বাবুকে বলে দিয়েছি যে ছেলের যদি বিয়ে দিতে চাও তো আগে তার জন্যে একটা ফ্ল্যাট দেখ, কারণ বাড়িতে আর জায়গা নেই—তোমাদের জ্বালায় রাত্তিরে কলঘরে চৌকি পেতে শুতে হচ্ছে, আর বেশি এগোতে পারবো না। ন-বৌমা তাই শুনে নাকি বলেছেন, তাই বলে কি লোকে একটু সাধ আহ্লাদ করবে না?

আমি বলেছি, আমাকে ঘোড়া করে তোমাদের মনোরথ ছোটালে ভাল হয় তা জানি, কিন্তু এ ভাবে ছুটে যে আমার সুরত বদলে এল, এখন পুষ্পকরথে চেপে আগে পালাই, তারপর যা-খুশী কোরো।

আমার কথা শুনে সব রেগে খার, অন্যেরা দু চারবার গজ গজ করে চুপ করে গেলেন, শুধু পরিবার এসে রেগে বলে উঠলেন, তোমার সব কথায় থাকবার দরকার কি? যাদের ছেলে তারা বুঝবে।

কিন্তু সংসারে যে কেউ কোন ভাল কথা বুঝছে না বলে জগতে এত অশান্তি সেটা আমি তাঁকে কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না। ঠেলা পোয়াবার সময় তুমি আর গভর্ন-মেণ্ট—আমরা যা-খুশী নির্বিবাদে করে যাই, এই আর কি! এতে দেশের উন্নতি হবে—হায়রে!

তার ফল হচ্ছেও তেমনি। নিরঙ্কুশভাবে ফাঁকি আর চুরি বেড়ে চলেছে। যে-যা পাচ্ছে চুরি করছে, ধেড়ে, নেংটে, ছিঁচকে কেউ বাদ নেই। কারণ সংসার চালাতে হবে তো—এতগুলি হাঁ কে বন্ধ করাতে হবে, লোক লৌকিকতা ভদ্রতা, সমাজ বাঁচাতে হবে তো? অতএব চক্ষুলজ্জা, ধর্মবোধ, বিবেকের দংশন, স্বজাতিপ্রীতি সব বাদ দাও!

সমাজ, বংশ, জাতকে রক্ষা করা খুব বড় জিনিস মানি কিন্তু এযুগে বেকার একটা ছেলেকে যে সংসারের ঘানিতে যুতে দেব তা কোন ভরসায়, আপনারাই বলুন! তারপর যখন বংশ, বংশাবতংস, কর্তার ছোটখাট অংশ বাড়ীর চারধার থেকে খোঁচাতে শুরু করবেন, তখন কোথায় পালাব বলুন? তা না হলে সাধে বিয়ে আর আটকড়াইয়ের বিরুদ্ধে চেল্লাচ্ছি আর বলছি যে কারুর আক্কেল বলে জিনিস নেই!

বলে, যে কটা ছেলে আছে তাদেরই কেউ মানুষ করতে পারছে না—এর ওপর

আবার? যদি বলেন, তোমার দোষ। এত লোকের ছেলে মানুষ হচ্ছে কি করে? কি করে যে সবাই ম্যানেজ করছে বুঝতে পারি না। এক একটা ছেলে আর মেয়ের পেছনে গড়পড়তা, মানুষ করা ছেড়ে দিন, শুধু ফানুসের মত ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রাখতে গেলে কত পড়ে, একবার ভেবে দেখুন ত দয়া করে। আমার ছেলেদের তো লক্ষ্মী-ছাড়া বলে আপনারা সবাই গাল দেন, কিন্তু মা লক্ষ্মী যে আমার ঘরের চুপড়ির মধ্যে থেকে কবে সরে পড়েছেন তা তো জানেন না। যেখানে মা ষষ্ঠীর দৌরাত্ম্য সেখানেই দেখেছি ঠাকরুণ মাথায় যষ্ঠি মেরে কাহিল করে দিয়ে বেরিয়ে গেছেন। অন্ততঃ আমার বেলায় ত তাই করেছেন। কি করে ছেলে-পুলেদের সামলাই?

ধুমসোটার কথাই ধরুন। তার সকাল বেলায় চা, জলখাবার, ডিম টোস্ট ইত্যাদি আছেই। তিনি আবার শরীরের তাকত করতেন বারবেল, আর মুগুর ভেঁজে। আমি সেদিন টের পেয়ে সেগুলো দূর করে দিয়েছি, বলেছি ও-সব এ বাড়িতে হবে না। তোমার স্বাস্থ্য বজায় বাবদ যে ব্যয় হচ্ছে, তা সামলানো আমার বাবা বেঁচে থাকলে তাঁরও পক্ষে সম্ভব হত না। প্রত্যেকের চেয়ে দু তিন সের বেশি খোরাক যোগানো এ বাজারে অচিন্ত্যনীয়—তুমি ক্ষিদে মার, জ্যাঠার কথা শোন, আর ল্যাঠা বাড়িও না। বাবু রেগে গুম হয়ে রইলেন, কিন্তু বজ্জাতি যাবে কোথায়! সেদিন পটকার মুখে শুনলুম যে ধুমসো দা' এখন রোজ ছাতে ভোর বেলায় উঠে একশো চল্লিশটা করে নাকি ডন বৈঠক দেয়। দেখলেন পেজোমী!

যাক, এইবার আসুন ন্যাংচার দিকে। স্কুলের মাইনে পাঁচ টাকা উপরি আরও পাঁচ অর্থাৎ পাংখা ফি, স্পোর্টিং ফি, পিকনিক

ধুমসোর শরীরচর্চা

ফি ইত্যাদি লেগেই আছে। পেছনে পঁচিশ টাকার পঁচিশ দিন কামাই-করা একটি মাস্টার আছেন। পৃথিবীতে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের যাবতীয় জ্ঞান তিনি সব এক ঘণ্টার মধ্যে শিখিয়ে যাচ্ছেন তার ফলে এই বার নিয়ে তিনবার সে ম্যাট্রিকে ফেল মারলে।

এ ছাড়া মনে করুন, বাড়িতে হোঁৎকা, কেঁচো, ফচকে, পটকা ও আরও গুটি বার বর্তমান। এরপর আছেন মেয়ের দল। তাদের খাওয়া-পরা ছাড়া ইস্কুল আছে, কলেজ আছে, নাচ আছে, গান আছে, সিনেমা আছে, বন্ধুদের বাৎসরিক জয়ন্তী আছে, তার জন্যে অশান্তি বড় কম পেতে হয় না। অতএব আমি কি করে বিয়ে, আটকড়াই, বংশরক্ষাকে সমর্থন করি, বলুন।

যদি বলেন, নাচের খরচটা বাদ দাও না কেন? খেপেছেন,? তাহলে বিয়ে হবে? নাচুনে মেয়ে ছাড়া এখনকার খুব কম ছেলেই বিয়ে করতে চায়। বল, আমাদের পাড়ায় চাটুজ্যে মশায়ের মেয়ে গুড়গুড়িটার পাকা দেখার পর ঐ জন্যে তিন মাস বিয়েই বন্ধ রইল। তারপর কোনরকমে ধপড়ধাই শিখে নাচতে নাচতে পেরিয়ে গেল। যাক্, এ একটা অনিবার্য আইটেম, ও নিয়ে তর্ক চলে না, ছেড়ে দিন—এ ছাড়া আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে লোক লৌকিকতা, বাজার, ডাক্তার, সত্যনারায়ণ ইত্যাদি পাঁচফোড়ন বাবদ কত পড়ে, একবার কাগজ কলম নিয়ে খতিয়ে দেখুন।

আমাদের ছটি ভাইয়ের কুড়িয়ে বাড়িয়ে কেরাণীগিরি করে রোজগার তিনশো থেকে চারশো অথচ বাইরে ভদ্রতার ঠাট বজায় রাখতে হচ্ছে প্রায় লাটবেলাটের মত। না রাখলে চলে না কারণ একেবারে নো হোয়্যার হয়ে যাবেন সকলের কাছে। এখনও কংগ্রেস বা কম্যুনিস্ট কেউই তো আর শ্রেণী বিভাগ বরবাদ করে দিতে পারেন নি। করলেও চাপ কমবে না—কারণ ভাবপ্রবণ জাত তো আমরা। এক প্যাকেট সিগারেট কিনতে দাঁত ছরকুটে যায় তবু পাঁচজন বসে থাকলে দাঁত বার করে তাঁদের হাতে কচি ছেলে সঁপে দেওয়ার দুঃখু বুকে নিয়ে এক একটি গুঁজে দিতে হয়। তখনও তাই হবে।

একটি চিতাবাঘের গল্প

শ্রীদুর্গাদাস সরকার

চিতার পায়ের চিহ্ন দেখা গেলে পশ্চিম আকাশে
দেখেছি ডুবেছে সূর্য অকস্মাৎ। কেঁপেছে শরীর
চিতার গায়ের গন্ধে আমাদের। নেশায় নিবিড়
সে-চিতা এসেছে নেমে অন্ধকারে এখানের ঘাসে।

সকালে দেখেছি জেগে তারপর—কিছু যেন নেই
ক্ষেতে ও খামারে; আছে লুণ্ঠনের শেষ-চিহ্ন ঘরে;
পাশব বৃত্তিতে গেছে জীবনকে খণ্ড খণ্ড করে;
স্বপ্নের শলাকাগুলি তবুতো নেবেনি নিমেষেই।

লুণ্ঠিত ভারতবর্ষ। ছিল কিন্তু তখনো অম্লান
হৃদয়ে হৃদয়ে রবি ঠাকুরের গান, আজো আছে;
হৃদয় মানেনি তাই পরাজয় সে-চিতার কাছে;
ধানের আঘ্রাণ নিয়ে আসবে তাই আবার অঘ্রাণ।
কোথায় সে-চিতা আজ ডেকে উঠে বিষন্ন বিকালে?
মিশরে সুদানে ডাকে? হাঁফ ছাড়ে সুয়েজের খালে?

বিপ্লবী অরবিন্দ

শ্রীহীরালাল দাশগুপ্ত

ইংরেজকে তাড়িয়ে দেশ স্বাধীন করবার কল্পনা করতাম যাদের সঙ্গে তাদের একজন এখন স্বাধীন ভারতের রাজধানীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর। আর একজন দুর্গতের দুঃখের ভারী ঝোলাটা কাঁধে বয়ে বেড়ায় পাকিস্থানের দুর্গম পথে। আমরা তখন কিশোর। আমাদের প্রাণে দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলতেন আমার দুই মামা—তাঁদের মধুর কণ্ঠের সঙ্গীতে। গানগুলির লেখক রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি।

সেদিন আমার বিস্ময় আর আনন্দের সীমা ছিল না। মাটির হাঁড়িতে করে মামারা কলিকাতা থেকে আমার জন্য একটি জিনিস এনেছেন। হাঁড়ির মুখের কাপড়টা অল্প ফাঁক করে দেখালেন জিনিসটা মেঠাই নয়। একটা জলজ্যান্ত বোমা। ইংরেজদের তাড়িয়ে দেবার ব্রহ্মাস্ত্র। এর আগে অরবিন্দ পরিচালিত যুগান্তর আর সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব সম্পাদিত সন্ধ্যা কাগজ মাঝে মাঝে পেতাম বিভিন্ন রাস্তায়। অরবিন্দ তখন 'বন্দে মাতরম' সংবাদপত্রযোগে ছড়াচ্ছেন অভয়মন্ত্র। অরবিন্দ আর বন্দে মাতরম এই দুটি শব্দই কাণে পৌঁছত মহামন্ত্রের শক্তি নিয়ে। আরও আগে আনন্দমঠ পড়েছিলাম। স্বপ্ন দেখতাম আনন্দমঠের সন্ন্যাসীদের। সুরেন বাঁড়ুজ্যে, বিপিন পালের কথা পড়তাম খবরের কাগজে, বিস্ময়ে অভিভূত হতাম—এঁরা আমাদের ভবিষ্য সংগ্রামের বড় বড় ধনুর্ধর, মহারথী। অরবিন্দ নামের মোহছিল স্বতন্ত্র। আমার মনে উনি ছিলেন স্বয়ং পার্থসারথী। আমরা অশ্বিনীবাবুর স্কুলের ছাত্র। অশ্বিনীবাবু আমাদের চোখে জাগ্রত মহাপুরুষ। আর এক মহারথী ঐ মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা। বরিশালে ভুঁইঞা রামচন্দ্র রায় ছিলেন রাজা প্রতাপাদিত্যের ভগিনীপতি। এর রাজধানী চন্দ্রদ্বীপের পশ্চিমে হলদপুরের মাঠ জনমানবহীন অরণ্যে সমাকীর্ণ। কতকালের কোন পুরানো স্মৃতি লুকিয়ে রেখেছে ঐ পথহারা প্রান্তর, কেউ তার খবর রাখে না। অশ্বিনীবাবু মনোরঞ্জনবাবু বলতেন, এই আমাদের আনন্দমঠ। ঐ হলুদপুরের জঙ্গলে আনন্দমঠের কল্পনা করতাম। আর গভীর রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুনতাম 'বরিশাল-গানে'র বজ্রনির্ঘোষ। কেউ বলত শব্দটা সমুদ্রের ঢেউয়ের, কেউ বলত, আওয়াজটা কামানের। সুন্দরবনের কোন সুড়ঙ্গের ভিতরে কামান গড়ছে সন্ন্যাসীর দল! কিসের আওয়াজ ঐ 'বরিশাল গান' আজও তার সন্ধান হয় নি, কিন্তু যখন বর্ষামুখর পল্লী রজনীর ঝড়-বাদলের হাহাকার ছাপিয়ে দিয়ে দিগন্ত জোড়া গম্ভীর আওয়াজ নিনাদিত হত একটার পর আর একটা, তারপর আবার এবং বারংবার, তখন আমাদের কিশোর মনের কল্পনা উড়ে চলত মেঘভরা আকাশের নীচে আকাশ ছোঁয়া সমুদ্র তরঙ্গের নীচেকার পাতালপুরীতে। ওখানে অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হচ্ছে কাতারে কাতারে সন্তান সেনা।
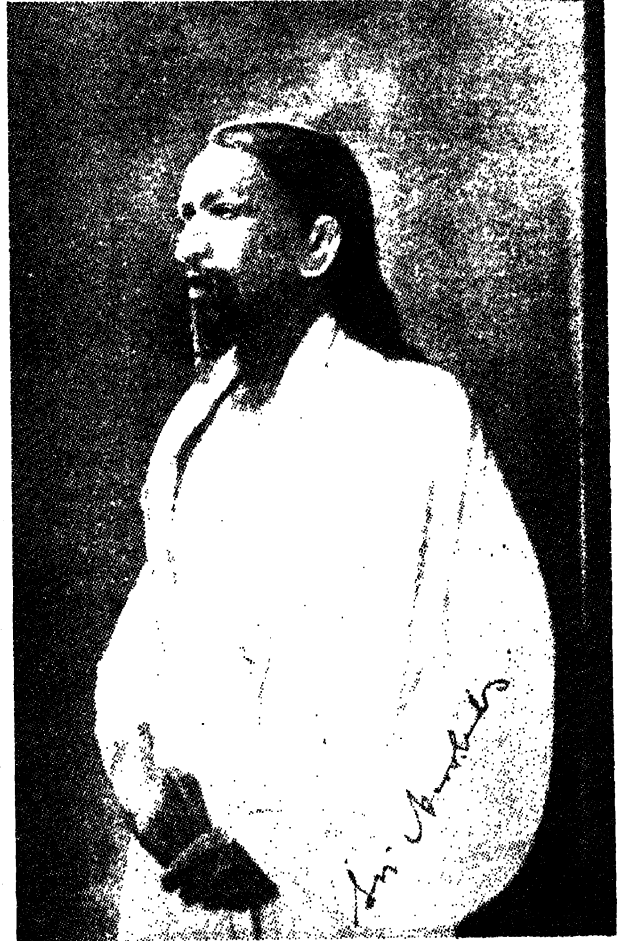
'গেরুয়া' পরা সত্যানন্দের স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক। ঐ অরবিন্দ সত্যানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, আনন্দমঠ, হলুদপুরের মাঠ, বরিশাল গান সব মিলেমিশে কিশোর মনে অপূর্ব ভাবাবেশের সৃষ্টি করত।

এ দিকে আমাদেরও আয়োজনের ত্রুটি ছিল না। লাঠি খেলা, অসি খেলা, গুলেলে লক্ষ্যভেদ, তরবারি সংগ্রহ, পিস্তল সংগ্রহ চলত পরমোৎসাহে। ঐ বোমাটা কিন্তু ছিল আমাদের মোক্ষম অস্ত্র। ওটা এসেছিল বারীণ ঘোষের কারখানা থেকে। সন্তান সেনা যে সত্যি তৈরী হচ্ছে ঐ বোমাটা তার সাক্ষী আর অগ্রদূত। ওর এক একটা বোমাতে উড়িয়ে দেওয়া যায় থানাকে থানা।

তারপর একদিন অকস্মাৎ বোমা ফাটল মজঃফরপুরে। ক্ষুদীরাম ধরা পড়ল। প্রফুল্ল চাকী ধরা দিলে না। কোমরে গোঁজা পিস্তল তুলে গুলী ছুঁড়লে নিজের বুকে, মোকামাতে। কলিকাতার খবরও রোমাঞ্চকর। বারীণ ঘোষ গ্রেপ্তার হয়েছে দলবল সহ মুরারীপুকুরে, মাণিকতলার বাগানে। সেখানে আবিষ্কার হয়েছে প্রকাণ্ড বোমা আর ডিনামাইটের কারখানা! উদ্যত রিভলবার হাতে বাগিয়ে সশস্ত্র পুলিশ অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করেছে স্কট লেনে ভোরে ঘুম থেকে ওঠার আগে। ওখানে অরবিন্দ বাস করতেন সস্ত্রীক।

আরও আগে। অরবিন্দ তখন বরোদাতে। যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে অরবিন্দ ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন গাইকোয়ারের সৈন্যবাহিনীতে। উদ্দেশ্য ছিল যতীনবাবু যুদ্ধ-কৌশল শিখে নিয়ে গেরিলা বাহিনী গড়বেন শহরে, নগরে, গ্রামে গ্রামে। পদাতিক বাহিনী থেকে যতীনবাবু উন্নীত হ'লেন অশ্বারোহী সৈন্যদলে। কানে কানে মন্ত্র জপেদিলেন অরবিন্দ। তিনি নিজে দীক্ষা নিয়েছিলেন পশ্চিম ভারতীয় এক গুপ্তদলে। বাঙলার ব্যারিস্টার পি মিত্রকে দীক্ষিত করালেন সেই মন্ত্রে। প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে প্রত্যেক জিলায়, নগরে, উপনগরে, গ্রামে গ্রামে। পুরানো প্রতিষ্ঠানকে হাতে করে নিতে হবে। লাঠিখেলা, অসিখেলা, অস্ত্র ব্যবহার, অস্ত্রচালনা শেখাতে হবে। অরবিন্দ নিজে রাজকর্মচারী। প্রকাশ্যে দল গ'ড়ে তোলা অসম্ভব। মিত্র সাহেব ও যতীনবাবু লেগে গেলেন সেই কাজে। মন্ত্রদাতা ছিলেন অরবিন্দ। পরিকল্পনা ছিল, যখন ডাক আসবে, এক সঙ্গে সাড়া দেবে সুদূর প্রসারিত অগণিত শক্তিসেনা। কোথাও প্রকাশ্য সংঘর্ষে, কোথাও বা গেরিলা প্রথায় ইংরেজের হাত থেকে কেড়ে নেবে শাসনরশ্মি। দেশী সৈন্যরাও হাত মেলাবে—তাদের মধ্যেও চলেছিল প্রচারকার্য। প্রকাশ্য কাজেরও প্রোগ্রাম ছিল—সে কথা পরে বলছি। মিত্র সাহেবের অক্লান্ত ও ঐকান্তিক চেষ্টায় গ'ড়ে উঠেছে অগণিত শক্তিকেন্দ্র। গ'ড়ে উঠ্‌ছে সঙ্ঘ-শক্তি। এরই ঢেউ কি ক'রে ছড়িয়ে পড়েছিল আমাদের গ্রামে—যেখানে মিত্র সাহেব কখনো আসেননি—যতীনবাবুও পদার্পণ করেননি গেরিলা যুদ্ধ শিখিয়ে দিতে।

অরবিন্দ তখনও বরোদাতে। একদিকে তৈরী করছেন মুক্তিসংগ্রামের বিবিধ প্ল্যান ও প্রোগ্রাম—গুপ্ত সমিতির ও প্রকাশ্য কাজের, অপরদিকে নিজেকে তৈরী করছেন ভারতীয় ভাষা শিক্ষার। ইউরোপীয় ভাষায় পাণ্ডিত্যলাভ করেছিলেন চৌদ্দ বছর বিলাত প্রবাসে। সংস্কৃত, বাঙলা, মারাঠী, হিন্দী। বাঙলা ভাষা ও আলাপ-আলোচনার শিক্ষক হ'লেন দীনেন্দ্রকুমার রায়। অসামান্য প্রতিভার বলে অরবিন্দ ভাষা শিক্ষায় কোথায় যে এগিয়ে গেছেন তা একদিন ধরা প'ড়ল রায় মহাশয়ের কাছে। কালিদাস আর বঙ্কিমচন্দ্রের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা দেখে দীনেন্দ্রবাবু বললেন, তাঁর কাছে অরবিন্দের শেখার মত আর কিছু নাই!

আরও পূর্বের ইতিহাস। গাইকোয়ার ফিরে এসেছেন দীর্ঘ ইউরোপবাসের পরে বরোদায়। এর আগে তাঁর মন্ত্রীকে লিখেছিলেন, মাত্র দু'শো টাকা মাসিক বেতনে একজন আই সি এস পেয়েছেন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে। রাজধানীতে উৎসব আর সমারোহের অন্ত নাই। চতুর্দিকে জয়ধ্বনি। গাড়ি রাজাকে নিয়ে এগিয়ে এসেছে প্রাসাদ ফটকে। দেউড়ীর পাশে হাসিমুখে দাঁড়িয়েছেন রাজমাতা। বুকে তুলে নেবেন দীর্ঘপ্রবাসের পরে পুত্রকে। রাজা নামলেন গাড়ি থেকে—আর একজন নামলেন সাধারণ বেশে—ক্ষীণ দেহ তার। গাড়িতে ছিলেন তাঁরই পাশে। যুবকটিকে ধরে রাজা ছুটে গেলেন মার কাছে—বললেন, "মা মা দেখ, বিলাত থেকে কি রত্ন আমি কুড়িয়ে এনেছি—এর জুড়ি পাবে না সমস্ত দেশে। এই আমাদের অরবিন্দ—একুশ বছরের তরুণ। যখন ইংরেজীর অধ্যাপক হলেন কলেজে, কলেজের ইংরেজ প্রিন্সিপাল ওর দিকে তাকিয়ে থাকত বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে। কি আশ্চর্য চোখ দুটি ঐ অরবিন্দের—কি যে ঐ চোখ দুটির লক্ষ্য সে এক বিস্ময়।

আরও আগের কথা। অরবিন্দের পিতা তাঁকে বিলেত পাঠিয়েছিলেন যখন তাঁর বয়স সাত বছর। মনোমোহন আর বিনয়ভূষণ দুই অগ্রজ ছিলেন সঙ্গে। বিলাতে তিনি পড়লেন ল্যাটিন, গ্রীক, ফ্রেঞ্চ, ইংলিশ, ইটালিয়ান, স্পেনিস ও জার্মানি। কিংস কলেজে গ্রীক ও ল্যাটিনের সমস্ত প্রাইজগুলোই তিনি পেলেন। তারপর ক্যাম্ব্রিজ ট্রাইপোস্, সিভিল সার্ভিসের পাঠ, ওগুলি আমার বক্তব্য নয়।

এগার বৎসর বয়সে বালক অরবিন্দ অনুভব করলেন সমস্ত পৃথিবীতে একটা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান আসন্ন হয়ে আস্‌ছে এবং অরবিন্দের তাতে এক প্রধান এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে। ও'র পিতা ভারতবর্ষ থেকে ও'কে পাঠাতেন খবরের কাগজের কাটিং। তাতে থাকত ভারতবর্ষে বিদেশী শাসকের অবর্ণনীয় অত্যাচারের কাহিনী আর চিঠিতে তর পিতার মর্মদাহ ও তীব্র মন্তব্য। ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটাতে হবে এই সংকল্প তিনি গ্রহণ করেন কয়েক বছর পরে। কেম্ব্রিজে ইণ্ডিয়ান মজলিসে ভারতে ইংরেজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি বক্তৃতা দিতেন। ঐ মজলিসে পরে তিনি সেক্রেটারী মনোনীত হয়েছিলেন। ও'র দাদা মনোমোহন ও বিনয় ঘোষও ছিলেন মজলিসের সভ্য। এই মজলিসে অরবিন্দের আচরণ ও ক্রিয়াকলাপ অরবিন্দের সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের পথে কাঁটা পড়ল। অরবিন্দের তাতে কিছু এসে যায় না। অশ্বারোহণ পরীক্ষায় অনুপস্থিতি তাঁর ইচ্ছাকৃত। তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের চিত্র ভেসে আসছিল অরবিন্দের সুপ্ত চেতনায়। কিন্তু সে প্রসঙ্গও এখানে অনাবশ্যক।

বিলাত থেকে ফিরে এলেন চৌদ্দ বছর পরে। বিলাত বাসের শেষের দিকটায় তিনি লোটাস এণ্ড ড্যাগার, নামে এক গুপ্ত সমিতির সভ্য হয়েছিলেন। আরও কয়েকজন ভারতীয়ের সঙ্গে সংকল্প নিয়েছিলেন ভারতে ফিরে এসে ইংরেজের গ্রাস থেকে দেশকে মুক্ত করতে যথাশক্তি প্রয়াস করবেন। কেউ কেউ সংকল্পটা ভুলে গেল। ভুললেন না অরবিন্দ। বরোদায় চলেছিল তাঁর সেই কার্য পরোক্ষে।

বরোদায় ছিলেন তের বছর ১৮৯৩ থেকে ১৯০৬। শেষের দিকটায় বাঙলায় যে ঘটনা ঘটল তাতে তিনি বিধাতার অদৃশ্য হস্ত প্রত্যক্ষ করলেন। বাঙলা দেশটা দুভাগ করে দিলেন লর্ড কার্জন। ভাগ ভাগ করে দিয়ে পরস্পরে ঈর্ষা বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলে দেশ শাসন ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পলিসি। ইজিপ্টে, আয়ারল্যান্ডে মধ্য এশিয়ায়, পূর্ব দক্ষিণ ইউরোপে ছিল ঐ একই নীতি। লুণ্ঠনকারী দস্যুর দল হাজার হাজার রক্তাক্ত তরবারি হাতে ঢুকেছিল ভারতবর্ষে। দেশ ভাগ করে, সেই মর্মন্তুদ স্মৃতি খুঁচিয়ে তুলে রোষ কষায়িত নেত্র দুইটি প্রধান জাতিকে নিয়ে খেল দেখানো সুরু করলেন ইংরেজ বাজীকর।

সুরেন বাঁড়ুজ্যে প্রমুখ দুর্ধর্ষ নেতৃগণের পরিচালনায় বাঙলাদেশ মরিয়া হয়ে উঠল। ইংরেজের নূতন সুযোগ। মুসলমানদের, বিশেষত পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের গা টিপে সোহাগ জানালেন ফুলার প্রমুখ ইংরেজ শাসক।

অরবিন্দের কাণে ডাক পৌঁচেছে। এই শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় ছিলেন তিনি তের বছর। এরই আভাষ বুঝি পেয়েছিলেন—বিলাতে এগার বছর বয়সে। বাঙলায় তিনি ছুটে এলেন—প্রথমে বিনা বেতনে ছুটি নিয়ে। এর পরে চাকুরী দিলেন ছেড়ে। সঙ্গে নিয়ে এলেন কাজের প্রোগ্রাম।

(১) প্রকাশ্য কাজ হল প্রচারকার্য। কোন আবেদন নিবেদন নয়। শাসন সংস্কার নয়। বন্ধন হীন পূর্ণ স্বরাজ্য হল লক্ষ্য। মিথ্যা ভূতের ভয় সবলে বিদূরিত করে আত্মশক্তি আর আত্মার শক্তিতে পরিপূর্ণ নির্ভর।

(২) অসহযোগ আর সর্বত্র নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (passive resistance), স্বদেশী বস্ত্র গ্রহণ বিলাতী দ্রব্য বয়কট, পল্লীতে পল্লীতে আর প্রত্যেক শহরে সালিশী বোর্ড গঠন করে আপোষে মামলা নিষ্পত্তি।

(৩) জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তন করে জাতীয় চরিত্র গঠন।

গুপ্ত কাজ হল গেরিলা বাহিনীর প্রসারণ। অস্ত্র সংগ্রহ, অর্থ সংগ্রহ। আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণের কারখানা সংস্থাপন। সর্বোপরি হাল ধরলেন স্থির, ধীর অচঞ্চল আত্মসমাহিত অরবিন্দ।

বিপিন পাল অদ্বিতীয় বাগ্মী পণ্ডিত। তিনি হাতে নিলেন দেশে দেশে ঘুরে প্রচারকার্য। প্রত্যেক সভায় মন্ত্র জপালেন ত্রিশ কোটি দু লাখ্। আমরা ত্রিশ কোটি ওরা মাত্র দু লাখ্। ভূতের ভয়টা মিলিয়ে গেল যাদুকরের হাতের তাসের মত।

সখারাম গণেশ দেউস্কর লিখলেন 'দেশের কথা' তাতে প্রকাশিত হল দেশের দুর্দশা। ইংরেজ বণিকের ভারত লুণ্ঠন কাহিনীর ইতিবৃত্ত।

সংবাদপত্র পরিচালনায় এল বিস্ময়কর নবযুগ। ভাষা ও ভাব-সম্পদে অনবদ্য। সে এক অনির্বচনীয় আবির্ভাব। তার চেতনায় স্পন্দিত হল বাঙলার তরুণ—হাওয়া বয়ে গেল দেশে দেশে। বিপিন পালের গড়া বন্দে মাতরম সংবাদপত্র নবযুগের ঋত্বিক অরবিন্দের মন্ত্র পরিবেশনে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। কবির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশ সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল—

"আজ বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী—

* *

ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে
বাঁ হাত করে শংকা হরণ
দুই নয়নে স্নেহের হাসি ললাট নেত্র
আগুন বরণ।

শ্যামসুন্দর আয়ত্ত করেছিলেন অরবিন্দের ছন্দ, বিজয় চাটুজ্যের ছিল লেখনীর প্রতিভা। বিপিন পাল ত বরাবরই সিদ্ধহস্ত। অর্থ এল চতুর্দিক থেকে। সুবোধ মল্লিক জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দিলেন এক লাখ টাকা। সে প্রতিষ্ঠানে অরবিন্দ হলেন প্রথম প্রিন্সিপাল। বর্তমান যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অরবিন্দেরই স্মৃতিপূত আশীর্বাদ প্রাপ্ত।

কংগ্রেসের প্রকাশ্য কর্মধারায়ও এল নূতন ছন্দ। কংগ্রেস বিভক্ত হল। গরম দলের নেতৃত্ব করছেন অরবিন্দ। তিলক মুখপাত্র। অরবিন্দের সঙ্গে তিনি হলেন একই পন্থী। কংগ্রেসের ভিক্ষার ঝুলি বর্জন করে স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষা হল—আত্মশক্তির উদ্বোধন ও সাধনায়। মেটার দল গেল নিভে। সুরেন ব্যানার্জির সঙ্গে কাজ চলল আপোষ রফায়। এ সব কাজ হল প্রকাশ্য সমিতিগত, সর্বজনীন। অরবিন্দের নিজের প্রোগ্রাম ছিল অন্তরালে। সে প্রোগ্রাম যেমন পূর্বেই বলেছি আয়ারল্যান্ডের সিনফিন আন্দোলনের সমধর্মী। সিনফিন আন্দোলনের জন্মের বহুপূর্বে ছিল অরবিন্দের এই প্রোগ্রাম।

আগেই বলা হয়েছে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের তীব্রতায় স্বদেশী আন্দোলন পেয়েছিল বর্ধিত গতি বেগ। অরবিন্দের অভয় মন্ত্রে বিপিন পালের কণ্ঠে বেজে উঠল শঙ্খনাদ। মাতৃপূজার বাদ্য বাজল দিকে দিকে। ওদিকে পূর্ববঙ্গের অন্যান্য নেতৃগণের সহযোগিতায় অশ্বিনী দত্ত ঘাটি আগলে রইলেন পূর্ববঙ্গের। তাঁরই অনুপ্রেরণায় মুকুন্দ দাসের উদাত্ত আহ্বান ছুটল জেলায় জেলায়—

"দশ হাজার প্রাণ যদি আমি পেতাম।"

এই শুভক্ষণে গুপ্ত কার্যে অরবিন্দের অনুজ ও দক্ষিণ হস্ত বারীন্দ্রকুমার বললেন বাঙলা কাগজ বার করতে হবে, নাম হবে তার যুগান্তর। অরবিন্দ এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। যুগান্তরে প্রচারিত হবে খোলাখুলি বিদ্রোহ। অস্বীকার করা হবে বৃটিশ রাজকে সমগ্রভাবে। গেরিলা যুদ্ধের কায়দা, কানুন, রণনীতি শেখানো হবে এই পত্রের প্রবন্ধে—অরবিন্দ সুরুতে নিজেই লিখলেন কয়েকটা প্রবন্ধ। এবং নিজ হস্তে গ্রহণ করলেন যুগান্তরের কনট্রোল। পত্রিকার রাজদ্রোহকর, বিপ্লবাত্মক প্রবন্ধ উপলক্ষ করে এল পুলিশ। খানাতল্লাসী হবে—গ্রেপ্তারও হবে। তখন পুলিসের সামনে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলেন ভূপেন দত্ত। স্বামী বিবেকানন্দের সহোদর। ইনি ছিলেন একজন সাব এডিটার। নিজের পরিচয় দিলেন এডিটার বলে। অরবিন্দের আদেশ যুগান্তর আত্মপক্ষ সমর্থন করবে না। ভূপেন দত্ত নির্ভয়ে মুক্ত কণ্ঠে আদালতে বললেন, "দেশের মুক্তির জন্য, দুঃখিনী মার কল্যাণের জন্য যা ভাল বুঝেছি তাই করেছি। তোমার যা' খুশী দণ্ড দিতে পার।"

বাঙলায় কি আবার নবযুগ এল?
"এসেছে সে একদিন
লক্ষ পরাণে শংকা না জানে
না রাখে কাহারো ঋণ
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন।

অরবিন্দ ছিলেন নিস্তরঙ্গ জলধি। সেই জলধি থেকে নেমে এসেছিল শক্তি-তরঙ্গ বাঙলার যুবক চিত্তে। সেই শক্তি প্রথম

স্পর্শ করলে নূতন সমাজের ভাব বিগ্রহ বাঙলার বিবেকানন্দের সহোদর অনুজকে।

সন্ধ্যা পত্রিকা লিখতেন সন্ন্যাসী ব্রহ্ম-বান্ধব। বিবেকানন্দের বন্ধু ও সহপাঠী। সন্ধ্যার প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে ছিল বিদ্রূপ ভঙ্গীতে অগ্নিবাণী। ইংরেজ রাজ ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁর উপরে। রাজদ্রোহকর প্রবন্ধের জন্য রাজদ্রোহীকে যখন আদালতে বিচারের জন্য হাজির করা হল, সেই বৈদান্তিক সন্ন্যাসী অকুণ্ঠভাষায় বললেন, "ঐ সন্ধ্যা পত্রিকার প্রকাশ, পরিচালনা এবং সম্পাদনের সমস্ত দায়িত্ব আমার। ঐ রাজদ্রোহকর প্রবন্ধ দুটো এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে আর—ফিরিঙ্গি পরমদয়ালু, ফিরিঙ্গির কৃপায় গজায় দাড়ি, শীতকালে খাই শাঁক আলুও আমারই লেখা। কিন্তু তোমার মামলায় আমি কোন ধার ধারি না। বিধাতৃ নিযুক্ত আমার স্বরাজ সাধনায় তোমার মত ঐ হঠাৎ কর্তা বিদেশীর কাছে আমার কিছুই কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। তোমার স্বার্থ আর দেশের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী। ঢাক, ঢোল বাজল আদালতের প্রাঙ্গণে। ওটা ব্রহ্মবান্ধবেরই ব্যবস্থা।

সেদিন অপরাহ্নে সন্ধ্যার সম্পাদকীয় শিরোনামা হল—

"ভুপেনের বেলায় জোড়া রম্ভা
সন্ধ্যার বেলায় ব্যাম্বু লম্বা।"

বললেন, "আমাকে কারাগারে রাখার সাধ্যি নাই ফিরিঙ্গির।"

সেটা সত্যি হল অক্ষরে অক্ষরে। ব্রহ্ম-বান্ধব গেলেন ক্যাম্পেবল হাসপাতালে। হঠাৎ দেখা দিল ক্যানসার রোগ। বিচার শেষ হওয়ার আগেই বিদায় নিলেন পৃথিবী থেকে।

একদিন ঐ ঋজু দেহ, গৈরিক পরিহিত সন্ন্যাসীর সঙ্গে পায়ে চলার সৌভাগ্য হয়েছিল রাজপথের রৌদ্রালোকে। একদিন স্থির বিদ্যুৎ সম অচপল আঁখির পানে চেয়েছিলাম শ্রীঅরবিন্দের। আজ দেশের ব্যাধিগ্রস্ত মানবতার দৃশ্যে মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বুকের মধ্যে ছল ছল করে অশ্রু সাগর। ঐ মহান বিরাট পৌরুষ কি নিঃশেষ হয়ে গেছে দেশের বুক থেকে!

মাণিকতলা বোমার কারখানায় ধৃত ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরা সব তরুণ কিশোর। একের পর একে ওরা নির্ভয়ে বলে গেল ওদের রোমাঞ্চকর কার্যাবলী। রিভলবার, বোমা, চিংড়িপোতা দুঃসাহসের রহস্য। খড়্গপুরে লাট সাহেবের ট্রেণ উড়িয়ে দেওয়ার জন্য ডিনামাইট রাখা এমনি বিচিত্র সে কাহিনী। এই ডিনামাইট রেখেছে বলে সাজা হয়েছিল কয়েকজন রেলের কুলীর, দশ বছর সশ্রম কারাবাস। আদালতে বারীণের স্বীকারোক্তিতে বজ্রপতন হল পুলিসের মাথায়। ওরা জানত ঐ রাজদ্রোহকর আর হিংসাত্মক কাজের দন্ড, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, ফাঁসি।

কারাগারে অচঞ্চল "আপূর্যমানম্—অচল প্রতিষ্ঠম্।" শ্রীঅরবিন্দ। অপলক আঁখির দৃষ্টিতে ফোটে "বাসুদেব সর্বম" —বারীণ ঘোষ আর উল্লাস করের ফাঁসির গুজব শুনে বারীণ বললে, "বাঁচলাম দুর্গা বলে ঝুলে পড়ব।" অরবিন্দের কাছে গিয়ে বললেন, "সেজদা আমার আর উল্লাসের ফাঁসীর হুকুম হয়েছে।"

অরবিন্দ বললেন—"তোদের ফাঁসী হবে না।"

বারীণ আশ্চর্য হয়ে বললে—"সেজদা তোমার কি হবে?"

অরবিন্দ বলেন—"আমি ছাড়া পাব।"

কি বৈদ্যুতিক প্রবাহ ছুঁইয়ে দিয়েছিলেন অরবিন্দ এই—কিশোরদের মনে। এরা হাসে, খেলে, গান করে আদালতে, রঙ্গ করে বেড়াল ডাকে, পাখী ডাকে। জীবন আর মৃত্যু এরা অতিক্রম করে গেছে—অবহেলে। শুধু এরাই নয়। দেশে দেশে নূতন চেতনার দ্যুতি নেমে আসে তরুণের বুকে। একটা জীবনদীপ নিভে যায়—এগিয়ে আসে একশত। এরা দলকে নয়, দেশকে ভাল বেসেছে, এদের কণ্ঠে কণ্ঠে গান ওঠে—

ও আমার সোণার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি

*

বাহুতে তুমি মা শক্তি হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

এদের আরাধ্যা বিশ্বজননী আর দেশ-মাতৃকা মিলিয়ে গিয়েছিল একই অভিন্ন জ্যোতি রূপে।

আজ চারিদিকে দলগত স্লোগান শুনি—গগনভেদী কর্কশ কণ্ঠে। কোথাও শুনি না মধুর কণ্ঠে, "ও আমার সোণার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।"

ঝালকাঠী কনফারেন্সে এলেন অরবিন্দ। এর আগে চিত্তরঞ্জন দাশের মুখোস পরে স্বয়ং বাসুদেব অরবিন্দকে ষড়যন্ত্রের মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। অরবিন্দ যেমন ছিলেন কারাগৃহে মুক্তির পরে বাহিরেও তেমনি। অপলক আঁখি, নির্বিকার, অচল প্রতিষ্ঠ। "নির্দ্বন্দ্ব, ন স্বেষ্টি, ন কাঙ্ক্ষ্যতি" —বরিশালের ভলান্টিয়াররা পালাক্রমে জেগে আছেন অরবিন্দের কক্ষের দরজায়। পরদিন এই পাল্লা করে রাত জাগা সব ক'টা দল বলাবলি করছে—"অরবিন্দ কি সমস্ত রাতে একবারও ঘুমোন না? কোচের উপরে বসে আছেন—চোখের পাতা একবারও বোজেনি!"

ঐ নিস্পলক আঁখি দুটির সামনে পরম স্নেহে ধরা দিয়েছিলেন, তাঁর ইষ্টদেব—বাসুদেব। ভক্ত চেয়েছিলেন দেখা ঐরূপে। অনন্ত শক্তিমান তিনি। ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করা কি তাঁর শক্তির অতীত? কেউ মানে প্রেমময় ভগবানকে, কেউ বা বলদৃপ্ত অসুরকে। তাই কারোর দৃষ্টিতে ফোটে প্রেম, আর কেউ বা চলে শাসিয়ে আর চোখ রাঙিয়ে। আর কারোর চোখের সামনে খোলা আছে দর্পণ তাতে জেগে থাকে নিজেরই প্রতিবিম্ব—নিছক "অহং"। যাদৃশীর্ভাবনার্যস্য—

অরবিন্দ চেয়েছিলেন ভগবানের সাক্ষাতকার। তাঁর স্ত্রীর কাছে লিখিত চিঠিতে জানিয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুপণ সংকল্প—"দেশজননীর শৃঙ্খল মোচন, আর বিশ্ব-দেবতার সাক্ষাতকার।" যখন শৃঙ্খলিত অরবিন্দকে নিয়ে গেল কারাপ্রাচীরের আড়ালে—আশ্চর্য এই, দারুণ দুঃখ হয়নি আমাদের। ঐ সুউচ্চ প্রাচীরের ওপার থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছিল একটা অবুঝ বিশ্বাস। হয়ত আমাদের অন্তরবাসী আত্মা জেনেছিল—ইংরেজের কারগারে বা ফাঁসী মঞ্চে অরবিন্দ মুছে যাবে না—ফুটে উঠবে সে সহস্র দলে। মুক্তি সাধনা তাঁর শেষ হয়নি। শুধু ভারতের মুক্তি নয়। মুক্তি সাধনা হবে নিখিল মানবের। এবারে শুধু দেহ শক্তিতে নয় অধ্যাত্ম প্রভায়।

সেই কারাবাসী বিদ্রোহীর সাধনা-মূর্তি ধরা পড়েছিল ঋষি রবীন্দ্রনাথের চোখে। রবীন্দ্রনাথের বন্দনা গানে ধ্বনিত হয়েছিল

দেশের বাণী। মূর্ত হয়েছিল দেবতার আশীর্বাদ।

"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার
বাণীমূর্তি তুমি—"

* * * * *

দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্র দূতে, বলো কোন রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে? বন্ধন শৃঙ্খল তাঁর
চরণ বন্দনা করি, করে নমস্কার।
কারাগার করে অভ্যর্থনা।

* * * * *

অন্যত্র—

বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্তি, কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান
মহাতীর্থ যাত্রীর সঙ্গীত—

* * * * *

আবার অন্যত্র—

তার পরে তাঁরে নমে যিনি ক্রীড়াচ্ছলে
গড়েন নূতন সৃষ্টি প্রলয় অনলে
মৃত্যু হতে দেন প্রাণ। বিপদের বুকে
সম্পদেরে করেন লালন।
হাসি মুখে ভক্তেরে পাঠায়ে দেন—
কণ্টক কান্তারে, রিক্তহস্তে,
শত্রু মাঝে রাত্রি অন্ধকারে।

'বন্দে মাতরম্' পত্রে, কর্মযোগীনে, যুগান্তরে, ধর্মে প্রত্যেক পত্রে যে সত্য প্রচার করেছিল জ্বলন্ত বিশ্বাস আর অকুণ্ঠ ভাষায়, সেই সত্যকে তিনি দীপ্ত করেছিলেন স্বীয় আচরণে—জীবনের চরমতম সংকটে নির্ভীক আর নিশ্চিন্ত ঔদাসীন্যে।

উত্তরপাড়ার বক্তৃতায় আভাস এল তাঁর ভবিষ্য জীবনের। তখন দেশের যুবচিত্তে দেশপ্রেম স্থায়ী আসন লাভ করেছে। তাদের বুকে এসেছে সেই অতি দুর্লভ ক্বচিৎ লব্ধ দেবাশীর্বাদ এক কথায় যার নাম বিশ্বাস—যে জ্যোতির ক্ষণপ্রভায়

"মূকং করোতি বাচালং
পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং"

তখন ছুটে এসেছে মরণজয়ী তরুণের দল—এসেছে বৃদ্ধ, এসেছে বালক, এসেছে বনিতা। অরবিন্দের হৃৎপদ্মের সুরভি সহস্র দল প্রস্ফুটিত হয়ে ছড়িয়ে আছে আশ্রমে আশ্রমে, আখড়ায়, বিদ্যালয়ে, পল্লীতে পল্লীতে। সবাই এগিয়ে এসেছে—এসেছে যতীন্দ্রনাথ—এসেছে যাদুগোপাল—স্বামীজী প্রজ্ঞানন্দ, মনোরঞ্জন আরও কত। তার পরে এলেন গান্ধীজী, চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন, সুভাষ, স্থূলদেহে কর্মক্ষেত্রে এলেন না অরবিন্দ—সেই স্থির জ্যোতি। কেউ নিরাশ হল—কেউ দিল গাল! সমস্ত দেশের হৃদয় আকর্ষণ করে তিনি চলে গেলেন আড়ালে। নেতারা ছুটে যায় সাগর পারে পণ্ডিচেরীতে। এক কণ্ঠে বলে—সমগ্র দেশের হৃদয়াসনে তোমার আসন। তুমি এসে বস। রাশ তুলে নাও রাষ্ট্ররথের। অরবিন্দ বলেন—এ আদেশ আমার পরে নয়—আদেশ এসেছে গান্ধীজীর পরে। কেউ রোধ করতে পারবে না তাঁকে।

* * * * *

১৯১০ সাল—১০ই এপ্রিল। ডুপ্লে জাহাজে শ্রীঅরবিন্দ পৌঁছুলেন পণ্ডিচেরীতে। এর আগে কিছুদিন কাটিয়েছেন চন্দননগরে। সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে আর সংস্রব নাই। সিসটার নিবেদিতাকে চিঠি দিয়ে এসেছেন কর্মযোগীনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে।

এবারে নির্জন বাস আর তপস্যা। দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের বনিয়াদ পাকা হয়েছে। অরবিন্দের প্রজ্বলিত হোমানল থেকে আগুনের কণা ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। প্রতি রক্তবিন্দু থেকে উদ্ভূত রক্তবীজের ন্যায় সেই অগ্নিকণা থেকে জন্ম নিয়েছে বিপ্লবী সেনা। তারা চিনেছে তাদের দেশমাতৃকাকে, তাদের কাণে পৌঁচেছে মৃত্যুঞ্জয়ী অমর আত্মার বাণী।

শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ

আমি না হলে আন্দোলন চলে না এই অহমিকা অরবিন্দের আগেও ছিল না। এবারে হলেন সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। প্রয়োজন ছিল না তাঁর শারীরিক উপস্থিতির। বিদেশীর কবল থেকে ভারতের মুক্তি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন মানসনেত্রে। স্থূলে মানসে নয়; নিজের অহমিকা আর সংস্কারে আচ্ছন্ন বাহিরের মানসে নয়। মুক্তি দেখেছিলেন তিনি অনিমানসনেত্রে যে নেত্রে স্বপ্ন দেখে যোগী, স্বপ্ন দেখে কবি, দার্শনিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক। কোথা থেকে সেই মানসে নেমে আসে সংকেত, ইসারা, ইনটুইসন। যুক্তি তর্কের আবছা আলো আঁধার নয়—সংশয় হীন প্রদীপ্ত সত্য।

প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়ে কি সাধনা গ্রহণ করলেন অরবিন্দ? মুক্তি? নিজের ব্যক্তিগত মুক্তি? ব্যক্তির বন্ধন ত কবেই খসে গিয়েছিল তাঁর। সিভিল সার্ভিসের লোভ ছেড়ে দিয়ে অশ্বারোহ পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকলেন। বরোদার রাজকণ্ঠের মালা নামিয়ে দিলেন অবহেলে। বিলাতে দারুণ শীতে যৎসামান্য আচ্ছাদন নিয়ে দু টুকরো রুটি আর দু এক কাপ চা খেয়ে কাটিয়ে দিলেন কত দিন। বাঙলায় এসে সেই দারিদ্র্যই তিনি বরণ করেছিলেন স্বেচ্ছায় ও সানন্দে। এই অরবিন্দের আপন বলে কিছু ছিল না। না ঐহিক, না পারত্রিক। পণ্ডিচেরীতে মুক্তি খুঁজে ছিলেন তিনি বিশ্ব মানবের।

মানুষের জন্য তিনি খুঁজেছেন "দেব দেহে দিব্যমন।" কবে সৃষ্টির কোন আদিম উষায়, প্রলয়পয়োধিজলে বিবর্তন ধারায় আপাত অচেতন দেহে জন্ম নিয়েছিল প্রথম জীবাণু। তারপর পর্যায়ে পর্যায়ে জীবজানোয়ারের ধারা অতিক্রম করে শুধমাত্র প্রাণময় জীবদেহ পরিবর্তিত হয়ে এল মনুষ্যদেহ! শুধু প্রাণবন্ত নয় সে, তাতে ফুটেছে মনস। প্রত্যেক পরিবর্তনে বিবর্তনের নূতন পর্যায়ে বদল হয়েছে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তার অবয়ব। অবোধ আদিম মানুষ আবার এগিয়ে চলেছে ধীশক্তিসম্পন্ন মনুষ্যত্বে। চেহারাও বদলেছে তার সঙ্গে সঙ্গে। আজ মনস শক্তিতে মানুষ এনেছে নবযুগ, এনেছে জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন। আবার বিবর্তন বেগে মানুষের দেহ বদলে হবে দেবদেহ। মনের বিবর্তনে ফুটবে দিব্যমন। এক জগৎ এক রাষ্ট্র অভিমুখে ছুটেছে নূতন সমাজ। প্রাচ্য করেছিল মুখ্যত অধ্যাত্মের অনুশীলন—প্রতীচ্য করেছে মুখ্যত জড় বিজ্ঞানের অনুশীলন। স্বতন্ত্রভাবে এই উভয়ই আংশিক সত্য। এই দুয়ের সমন্বয় হবে নূতনতর সমাজে। জড়ও যে এক চৈতন্যেরই আপেক্ষিক প্রকাশ। একই অখণ্ড চৈতন্যের অভিব্যক্তি এই নিখিল জন্মান্তর। একমেবাদ্বিতীয়ম্ সেই সত্য উপলব্ধি করে মানব সমাজকে তুলতে হবে নূতন পদবীতে। প্রথমে একজন এগোবে তারপরে কতিপয় আরও পরে গোষ্ঠী, বৃহত্তর গোষ্ঠী বৃহত্তর মানবসমাজ। শ্রীযুত নলিনী গুপ্তের ভাষায় বলা চলে সিদ্ধ পুরুষেরা চিরকাল তাই করেছেন। তারা মানব বাহিনীর Spear head বা বর্শাফলক। অজ্ঞানতার বাধা বিঘ্ন জঙ্গল কেটে ঊর্ধ্বতর চেতনার মধ্যে উঠবার রাস্তা তৈরী করেছেন তাঁরা। শ্রীঅরবিন্দের সাধনা ছিল সেই দিব্য মনকে নামিয়ে আনা দিব্য দেহে।

নাগিনীকন্যার কাহিনীঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ডি এম লাইব্রেরী; ৪২, কর্ন-ওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬ ঃ চার টাকা।

সাহিত্যের শিল্পশৈলী নিয়ে এযাবৎ অনেক পরীক্ষানিরীক্ষাই এদেশে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। ফলে অত্যল্পকালের মধ্যেই আঙ্গিকের ক্ষেত্রে যে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, সাবেকী আঙ্গিকের সঙ্গে তফাৎটা তার প্রায় আশমান-জমিন।

এ-পরিবর্তন সর্বথা সুফলপ্রসূ হয়নি। তার কারণ আঙ্গিক কদাচ স্বয়ংনির্ভর নয়। বস্তুত বস্তুনির্ভর। সাহিত্যিকরা অনেক ক্ষেত্রেই সে কথা মনে রাখেন না। মনে রাখেন না যে, পরিবর্তন যদি ঘটাতেই হয়, বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ঘটাতে হবে।

তারাশঙ্কর পরিবর্তনধর্মী শিল্পী। বৈচিত্র্য-বিধান এ কারণে তাঁর স্বভাবধর্ম। তা সত্ত্বেও তাঁর আঙ্গিকবৈচিত্র্য যে কখনও পাঠকের পক্ষে পীড়াদায়ক হয়নি, তার কারণ—পূর্বোল্লিখিত সঙ্গতিবোধ তাঁর সাহিত্যসাধনার সর্বত্র একটি সুমীতিসহজ সামঞ্জস্য আনয়নে সক্ষম হয়েছে। রচনারীতি একমাত্র তখনই সার্থক হয়ে ওঠে, রচনার থেকে রীতিটিকে যখন আর আলাদা করে চেনা যায় না। তারাশঙ্করের ক্ষেত্রেও যায় না। তাঁর রচনা এবং রীতি ওতঃপ্রোত, অঙ্গাঙ্গ-নিবদ্ধ। তাঁর শিল্পকর্মের মহত্ত্ব সর্বজনস্বীকৃত; রচনাশৈলী সম্পর্কে যদি বা কিছু প্রশ্ন থেকে থাকে, আলোচ্য উপন্যাস পাঠের পরে তার অবসান হবে।

'নাগিনীকন্যার কাহিনী'র মধ্যে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের একটি নূতন দিগ্‌দর্শন সূচিত হয়েছে। অত্যন্ত সাধারণ বিষয়বস্তুকেও ইতি-পূর্বে তাঁর সংবেদনশীল লেখনীতে আমরা অসাধারণত্বের মহিমা অর্জন করতে দেখেছি। বর্তমান গ্রন্থের বিষয়বস্তু আপনাতেই অসাধারণ। লৌকিক সমাজসীমানার বহির্ভূত এমন কয়েকটি চরিত্র এখানে তিনি সৃষ্টি করেছেন, প্রাগৈতিহাসিক-যুগীয় নির্বাধ প্রাণ-তাড়নায় সর্বক্ষণ যারা উন্মত্ত, উদ্দাম। এক অলৌকিকপ্রায় পরিবেশের মধ্যে এই চরিত্রগুলির যথাযথ সংস্থাপনে তারাশঙ্কর এখানে একটি বলিষ্ঠ বর্ণনাভঙ্গীর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। ভঙ্গীটি বলিষ্ঠ, তবু কাব্যগন্ধী। কাঠিন্যের সঙ্গে মাধুর্যের এই সফল সংমিশ্রণ ইতিপূর্বে ক্বচিৎ-কখনো আমাদের চোখে পড়েছে। পড়তে পড়তে এক এক সময় ভয় লাগে, তবু—সেইটেই বড় কথা—ভয় পেতে ভালোও লাগে।

'নাগিনীকন্যার কাহিনী'র সব-কটি চরিত্রই সার্থক। সবথেকে বেশি সার্থক শবলা এবং পিঙ্গলা। এদুটি চরিত্র প্রায় অবিস্মরণীয়।

এবং সর্বোপরি এই কথাটাই উল্লেখযোগ্য যে, ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের শিল্পমানসের একটি অনাবিষ্কৃত রূপ এখানে উন্মোচিত হয়েছে। সে রূপের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' অবশ্যপাঠ্য।

সীমারেখা—শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রকাশক—হাউস অব বুকস্; ৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা।

মাত্র দশ বছরের মধ্যে একটা দেশের অবস্থা যে কতদূর পরিবর্তিত হইতে পারে, বাঙলাদেশ তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। শুধু ভৌগোলিক পরিবর্তনই নয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক এমন কি দেশের লোকগুলোর মানসিক পরিবর্তনও যে কিভাবে এত দ্রুত সাধিত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। এই পরিবর্তন সর্বাপেক্ষা বেশী স্পর্শ করিয়াছে মধ্যবিত্ত সমাজকে। এই সমাজ চিরকালই বাঙলার এক বিশিষ্ট সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। কিন্তু অন্ন ও বাসস্থানের চিন্তায় তাহারা আজ এতদূর ক্লিষ্ট যে, অন্য কিছুর দিকে তাকাইবার তাহাদের আর অবকাশ নাই। জীবনধারণের সমস্যা সমাধান করিতে গিয়া তাহারা এমন সমস্ত নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতেছে, যাহা হইতে নিস্তার পাইবার পথ পাওয়া যাইতেছে না। এই সমাজের লোকেরা অত্যন্ত অনুভূতিশীল। তাই রাজনীতি হইতে আরম্ভ করিয়া চোরাকারবার পর্যন্ত সব কিছুই তাহাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। আলোচ্য উপন্যাসে এই বুদ্ধিজীবী সমাজের মানসিক বিবর্তনের দিকটা ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

উপন্যাসের নায়ক অজয় তার সমাজের আরও লক্ষ লক্ষ লোকের মতই কলিকাতার এক গলিতে মাথা গুঁজিয়া থাকে। জীবিকার জন্য তাহাকে এক অর্থগৃধ্নু চোরাকারবারীর দয়ার উপর নির্ভর করিতে হয়। এই চতুর জালিয়াৎ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই অজয়কে খানিকটা খাতির করে। অজয়ের সংস্কৃতিসম্পন্ন মন প্রতি মুহূর্তে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, কিন্তু অনাহারক্লিষ্ট মা, ভাই-বোনদের মুখের ছবি তাকে নিরস্ত করে। কিছুকাল পরে পেটের দায়ে সুমিত্রা নাম্নী এক শিক্ষিতা তরুণীও অজয়ের অফিসে আসিয়া জোটে। তার অসামান্য রূপের জন্যই মালিক তাহাকে চাকুরী দেয়। অল্পদিনের মধ্যেই বুদ্ধি-মতী সুমিত্রা বুঝিতে পারে যে, মালিক আরও অর্থ আহরণের জন্য তার রূপকে কাজে লাগাইতে চায়। সুমিত্রার মনও বিদ্রোহী হইয়া উঠে। সে অত্যন্ত কৌশলে মালিকের চক্রান্ত ব্যর্থ করে। ইহাই মোটামুটি উপন্যাসের কাহিনী।

অত্যন্ত কৌশলে ঘটনা বিন্যাস করিয়া লেখক আগাগোড়া পাঠকের ঔৎসুক্য বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। স্থানে স্থানে তার বর্ণনা খুব মনোজ্ঞ হইয়াছে। বিশেষ করিয়া প্রথম পরিচ্ছেদ ও মেয়েদের চাকুরীজীবনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা যে কোন পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করিবে। তবে কিছু কিছু ত্রুটিও পরিলক্ষিত হইল। চোরা-কারবারীদের কলাকৌশল তিনি অত্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। ফলে পাঠকের মনে এ সম্পর্কে কোন সুষ্ঠু রূপ পরিগ্রহ করিতে অসুবিধা হইবে। এ বিষয়ে লেখকের আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। ২৭৮।৫১

সেকাল ও একাল—শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত ও চিত্রিত। প্রকাশক—এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোম্পানি লিমিটেড, ২, কলেজ স্কোয়ার। মূল্য আড়াই টাকা।

"এই বইখানিতে 'সেকাল'এর যে কথাগুলি রয়েচে তা' পরমভাগবত স্বর্গত রাধাবিনোদ গোস্বামী মহাশয়ের কাছেই পাওয়া। তিনি ভাগবত পাঠ এবং ব্যাখ্যার মাঝে মাঝে এইরকম অনেক গল্পই করতেন।"

একালের গল্পগুলি গ্রন্থকারের জানা শোনা কাহিনী বা কল্পনা।

প্রমোদবাবুর শিল্পী হিসাবে সারা ভারতবর্ষে আর সুলেখক বলে সারাবাঙলায় খ্যাতি আছে। কিশোর-কিশোরীদের পাঠ্য অন্য বই তিনি ইতিপূর্বে লিখেছেন কিনা জানি না; কিন্তু এ বই লেখা সার্থক হয়েছে। বইখানি আদ্যন্ত যেমন সরস তেমনি শিক্ষাপ্রদ, লেখকের নিজের আঁকা ছবিগুলি তাঁর বক্তব্যকে সুন্দরভাবে উদ্ভাসিত করেছে। সুকুমার-মতি বালক-বালিকারা এ বই থেকে যেমন আনন্দ পাবে তেমনি সুশিক্ষাও পাবে, গন্ধর্ব রাজার কাহিনীই হোক আর এক আনার পুঁজিতে শ্রম ও সততার গুণে লাখপতি হওয়ার বিবরণই হোক, তাদের চিত্তকে আকর্ষণ ও কল্পনাকে উদ্দীপিত করবে।

এই সুলিখিত ও সুচিত্রিত গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

বিংশতি মহামানব—লেখক—শ্রীকনক বন্দ্যো-পাধ্যায় এম এ। প্রকাশক—শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখো-পাধ্যায় বা স্ট্যাণ্ডার্ড ক্যাবিনেট কোম্পানি লিমিটেড, ৩২-এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা (ডবল ডিমাই ১৬ পৃষ্ঠার) ৷৷৵০+ ২৭৮। মূল্য ৫্ টাকা।

এই গ্রন্থে রাজা রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ করে সুভাষচন্দ্র বসু পর্যন্ত কুড়ি জন প্রাতঃ-স্মরণীয় (এবং তন্মধ্যে অনেকেই ভুবনবিদিত) আধুনিক বাঙালীর জীবনচরিত গল্পচ্ছলে অতি সুন্দর সুললিত গদ্যে বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। কেশবচন্দ্র, রামতনু, ভূদেব, রাজনারায়ণ, ব্রজেন্দ্র-নাথ শীল, রাসবিহারী বসু, যতীন্দ্র মুখো-পাধ্যায়, সূর্য সেন, নন্দলাল বসু প্রভৃতি আরও কতকগুলি আখ্যায়িকা যোজনা করলে কুড়িকে তিরিশ করা যেত না তাও বলা যায় না। হয়তো এই গ্রন্থের পরবর্তী কোনো খণ্ডে বা সংস্করণে তা করা সম্ভব হবে; নানা কারণে এই গ্রন্থের আয়তন অনির্দিষ্টভাবে বাড়ানো যায় নি, এমন

হতে পারে; অতএব এ বিষয়ে আমাদের অনু-যোগের কিছু নেই। জীবনচরিতগুলি সুন্দর গল্পচ্ছলে ব্যাখ্যাত হয়েছে, একথা পূর্বেই বলা গেছে। এমন কোনো ঘটনার বিবরণ দিয়ে প্রায় প্রত্যেকটি আখ্যায়িকার সূচনা করা হয়েছে যে, সঙ্গে সঙ্গেই আলোচ্য মহাপুরুষের বা মনীষীর জীবনের গভীর মর্মকথা উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে পাঠকের একাগ্র অভিনিবেশ দেখা দেয়। রচনা কৌশলের দিক দিয়ে অবিমিশ্র প্রশংসাই লেখকের একমাত্র পাওনা। কিন্তু মনে হয়, অতি অল্প সময়ে এই গ্রন্থখানি প্রস্তুত করতে হয়েছে। বালক-বালিকাদের মনে আনন্দ ও মহত্ত্বের উদ্দীপনা সঞ্চার যে গ্রন্থের প্রধান লক্ষ্য তাতে তথ্যভার অল্প হলেও বলবার কিছু নেই, কিন্তু কিছু ভুল তথ্যও আছে। যেমন মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের কথায় ২৩ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, "তিনি তখন ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়ের সহিত যোগ দিয়া ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন।" পাঠকের এমন ধারণা হওয়া বিচিত্র নয় যে, দেবেন্দ্রনাথ যখন ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনে যোগ দেন, বা সেটি নূতন করে সৃষ্টি করেন, তখন বুঝি রামমোহন রায় জীবিত। ঘটনা অন্যরূপ। (এই পৃষ্ঠাতেই আছে, "একই শব্দ বারংবার ব্যবহার করিয়া একটা চমক লাগানোর চেষ্টা। ইহাকে বলা হয় অনু-প্রাসবহুল রচনা।" লেখক সতর্ক হ'লে 'শব্দ' কথাটি ব্যবহার করতেন না), ২৬ পৃষ্ঠায় আছে, দেবেন্দ্রনাথই বালক রবীন্দ্রনাথকে ইংরেজি, সংস্কৃত ও পার্শী ভাষা ও সাহিত্যে অনুরাগী করিয়া তুলিয়াছিলেন।" রবীন্দ্রনাথ পার্শী বা ফার্শি ভাষা শিখে ছিলেন, এরূপ আমাদের জানা ছিল না। ১৪৯ পৃষ্ঠায় আছে নোবেল "পুরস্কার পাওয়ার ফলে গীতাঞ্জলি বিশ্ব-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া স্বীকৃত হইল, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের শ্রেষ্ঠকবি বলিয়া গণ্য হইলেন।" এটুকুও অসতর্ক রচনার দৃষ্টান্ত; গীতাঞ্জলি বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর অন্যতম আর রবীন্দ্রনাথ যুগ-যুগান্তরের শ্রেষ্ঠ কবিদের সমশ্রেণীভুক্ত গণ্য হলেন—একথা বললেই ঠিক বলা হত। বইখানি ছাপা, বাঁধাই, কাগজ, কুড়িটি রঙীণ প্রতিকৃতি—প্রায় সবই উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয়। তবে কোনো কোনো প্রতিকৃতি একটু অধিক মাত্রায় রঙীণ। তা ছাড়া প্রত্যেক ক্ষেত্রেই "দি স্ট্যাণ্ডার্ড ক্যাবিনেট কোং লিঃ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত" এই বিজ্ঞাপন-টুকু রুচিবিগর্হিত বলে মনে হয়। সার্বজনীন দেবীপূজায় সাবান, এসেন্স বা কালীর ব্যবসাদাররা তোরণ নির্মাণ করে দেন, রঙীণ কাগজে বা কাপড়ে, নিজেদের ভক্তি নিবেদন করতে না ব্যবসার বিজ্ঞাপন দিতে? এই মহদুদ্দেশ্য প্রণোদিত গ্রন্থপ্রকাশে সেরূপ সংশয়ের অবকাশ থাকা অনুচিত বলে মনে হয়।

বিংশতি মহামানবের এই জীবনকথা বাঙালীর ঘরে ঘরে পঠিত হোক, এই প্রার্থনা করি।

মেঘমুক্তি—গিরিজাভূষণ সাধু। ঠাকুরদাস লাইব্রেরী, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—দু' টাকা।

সিনেমার কাহিনী উপন্যাস আকারে অনু-লিখিত। কাহিনীকার এবং লিপিকার দুই-ই ভিন্ন ব্যক্তি। চিরাচরিত ছায়াছবির গল্প যা হওয়া উচিত এ-ও তাই; প্রেম, অপঘাত, ভালবাসা, মৃত্যু, পুনর্মিলন ইত্যাদি, সব বোঝা গেল, কিন্তু ছবির ক্ষেত্র থেকে এ কাহিনীকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে টেনে আনার প্রয়োজনটা বোঝা গেল না। ২৫০।৫১

শান্তি ও শ্রীর পথে পল্লী—শক্তিকিঙ্কর পাল। বিভূতিভূষণ পাল, শাঁকরুল, ইন্দাস, বাঁকুড়া। মূল্য—দেড় টাকা।

পল্লী সংস্কারের উদ্দেশ্য লইয়া রচিত উপন্যাস। গল্পচ্ছলে আলোচ্য পুস্তকে পল্লীসংস্কার সম্বন্ধে নানা বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। নানা সমস্যা এবং তাহার সমাধান নির্দেশ করা হইয়াছে। লেখকের উদ্দেশ্য সাধু। যাঁহারা পল্লীসংস্কার কার্যে ব্রতী, বইখানি তাঁহাদের কাজে লাগিবে। ২৪৭।৫১

পূর্ণচ্ছেদ—লিলি দেবী। ভারতী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, ১৪১, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা—৬। মূল্য—দু' টাকা।

ইহা লেখিকার দ্বিতীয় উপন্যাস। কিন্তু প্রথম হ'লেও আপত্তির কিছু ছিল না। লেখা অত্যন্ত কাঁচা, গল্পও তদ্রূপ; একটি তুচ্ছ ঘটনার সূত্র ধরে সস্তা হৃদয়াবেগের মাধ্যমে আবোল- তাবোল কথায় যা বলতে যাওয়া হ'য়েছে তা এই—সন্ধ্যা নাম্নী একটি সুন্দরী পিতৃমাতৃহীনা তরুণী মামীর আশ্রয়ে বিশেষ নির্যাতিতা। উক্ত নিষ্ঠুরা মামীর সরোজ নামে দূরসম্পর্কীয় একটি তরুণ হৃদয়বান ভ্রাতুষ্পুত্র কলিকাতাবাসী। হঠাৎ একদিন সেই সরোজ পিসির বাড়ী বেড়াতে আসে এবং সন্ধ্যাকে দেখে। তার পরই সন্ধ্যাকে নিয়ে সে কলকাতায় পালিয়ে আসে। (এই পালানর কাহিনী দিয়েই গল্পের আরম্ভ—ঝড়-জল-কাদা নানা বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে দু'টি তরুণ এগিয়ে আসে। রেল গাড়ীতে না-ওঠা পর্যন্ত কিছুতে বোঝা যাবে না যে, ঐ পলাতকদ্বয়ের মধ্যেই একজন ছদ্মবেশধারিণী সন্ধ্যা! পলায়নের দৃশ্যটি চমকপ্রদ এবং লেখিকার মৌলিক সৃষ্টি!) অতঃপর সরোজ সন্ধ্যাকে বোর্ডিং-এ রেখে লেখাপড়া শেখায়। শেখাতে কোন বাধা নেই, কেননা সরোজ বড়লোকের বাপমরা ছেলে। এর পর দুজনের বিয়ে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু না, এদিকে যে সরোজের ছোট ভাই সলিলের সঙ্গে সন্ধ্যার হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে (অর্থাৎ প্রেম হ'য়েছে), এক সঙ্গে ডাক্তারী পড়ার অজুহাতে। এখন উপায়? সমস্যা,—স্বামী হিসাবে সরোজ না সলিল সন্ধ্যার গ্রাহ্য? শেষ পর্যন্ত সমাধান অবশ্য একটা করা হ'য়েছে—সরোজের হাতে সন্ধ্যাকে তুলে দিয়ে সলিলকে বিরাগী করে' লেখিকা উপসংহার টেনেছেন। চমৎকার! আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ২৪৬।৫১

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ-প্রসঙ্গ—স্বামী জগদীশ্বরা-নন্দ সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬; মূল্য দুই টাকা চারি আনা মাত্র।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ শিষ্য এবং পার্ষদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জীবনের কতকগুলি ঘটনার বিবরণ এবং বাণী এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। ইতিপূর্বে এ সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ রচিত এবং প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সংগৃহীত এবং সংকলিত বিষয় ও বাণীসমূহ অপ্রকাশিত-পূর্ব। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে চিত্ত উদারভাবে অনুপ্রাণিত হয় এবং ভগবদ্ভক্তি রসে মণ-প্রাণ আপ্লুত হইয়া পড়ে। আলোচনা আগাগোড়া অধ্যাত্ম রসানুপ্রবেশে অন্তরে আগ্রহের উদ্দীপক। ভাষা সহজ এবং সুমধুর। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

চক্রদত্ত

বিজ্ঞান আজকাল চিকিৎসাবিদ্যার বহু সহায়তা করছে একথা আমরা সকলেই জানি এবং চিকিৎসা শাস্ত্র বিজ্ঞানের সাহায্যেই যে দিনে দিনে উন্নত হতে উন্নততর হচ্ছে একথাও অনস্বীকার্য। বিমানবহরের একজন ক্যাপ্টেন একটা নতুন ধরণের ৩৫ মিলিমিটারের একটি লেন্সওয়ালা রিফ্লেক্স ক্যামেরা বার করেছেন। এই ক্যামেরা দিয়ে চোখ, নাক, কান ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের ভিতরের এবং মুখ ও গলার ভিতরের ছবি তোলা যায়।

এই নতুন ধরণের ক্যামেরাটির নাম পেরিস্কোপ।

ক্যামেরাটির সামনের দিকে একটি লোহার পাত লাগান থাকে সেই পাতের এক প্রান্তে একটি আয়না লাগান থাকে অপর প্রান্তে ক্যামেরাটি থাকে। ক্যামেরাটিতে একটি ফ্লাশ বালব থাকে। যেখানকার ছবি নিতে হবে আয়নাটি তার সামনে ধরতে হয় আর আয়নার উপরের প্রতিচ্ছবিটি ক্যামেরার লেন্সে প্রতিফলিত হওয়া মাত্র 'ফ্লাশ বালবটি' জেলে দিতে হয় ফলে ছবিটি উঠে যায়।

*

ঘ্রাণশক্তির প্রখরতা সম্বন্ধে সারমেয় জাতীয় জীবই এপর্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এরা কোনও গন্ধের সাহায্যেই বহুদিন পরেও তাদের পুরণ আস্তানা খুঁজে বার করতে পারে। বর্তমানে গবেষণাকারিগণ পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং প্রমাণ করেছেন, এইরকম তীব্র ঘ্রাণশক্তি মাছেদের মধ্যেও আছে। স্যামন মাছেদের গতিবিধিই এই পরীক্ষার উৎসস্বরূপ বলা যায়। এই মাছগুলি বহুকাল সমুদ্রে বাস করার পরও ডিম পাড়ার সময় আবার তাদের জন্মস্থান নদী কিংবা খালে ফিরে আসে। এই বৈশিষ্ট্যটুকু সম্বন্ধে কোনও মৎস্যবিদই সঠিক কোনও উত্তর দিতে পারেননি। অনেক মৎস্যবিদের মতে এদের জন্মস্থানের জলের কোনও বিশেষ গন্ধ এদের নাকে লেগে থাকার দরুণ তারা আবার সেই স্থানে ফিরে আসতে পারে। মৎস্যবিদেরা পরীক্ষার জন্য কতকগুলি ছোট ছোট স্যামন মাছ নিয়ে তাঁদের 'এ্যাকোয়ারিয়মে' রেখে দেন। একটা একোয়ারিয়ামে তারা মাছগুলোকে বিরক্ত না করে শুধু মাত্র জলের গন্ধটা নানাভাবে বদল করতে থাকেন এবং প্রথমে কোনও একরকম গন্ধ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাবার দিতে থাকেন, পরে আবার অন্য একরকম গন্ধ দেওয়ার সঙ্গে খাবারের জায়গায় বৈদ্যুতিক শক্তি চালনা করেন। ফলে মাছগুলির ধারণা হয় যে, প্রথম ধরণের গন্ধ থাকলে জলে খাবার থাকে এবং দ্বিতীয় ধরণের গন্ধযুক্ত জলে ইলেকট্রিক শক পাওয়া যায়।

এখন মৎস্যবিদেরা এই জলকে সাধারণভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন। যে সমস্ত নদী এবং খালে স্যামন মাছ ডিম ছাড়ে সেই সব জলে একটা কোন তীব্র গন্ধ মিশিয়ে দেওয়া হবে এবং এইখানকার জলে বাচ্চা স্যামন মাছগুলো কিছু বড় হয়ে গিয়ে সমুদ্রে চলে যাবে। তারপর তিন চার বছর বাদে যখন আবার তারা ডিম পাড়বার জন্য নিজেদের জন্মস্থানে ফিরে আসবে তখন তারা যদি সেখানকার জলে আগেকার পুরোন গন্ধ না পায় তাহলে সেই গন্ধের খোঁজে ঘুরে বেড়াবে। মৎস্যবিদরা তখন যদি সেই আগেকার তীব্র গন্ধ অন্য কোন নদীর জলে মিশিয়ে দেন তাহলে মাছেরা এই নতুন নদীর জলে ডিম ছাড়বে। আশা করা যাচ্ছে যে, অন্য মাছেদের বেলাও এটা সম্ভব হবে। তবে বর্তমানে যদি শুধু স্যামন মাছেদের ওপর দিয়ে পরীক্ষা সফল করা যায় তাহলে ভবিষ্যতে স্যামন মাছের চাষের ইতিহাসে অনেক ওলট-পালট দেখা যাবে।

*

আমরা সবাই জানি যে, প্রাণীমাত্রই শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের জন্য বাতাস বা জল থেকে অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ত্যাগ করে। এইজনাই যখন কোনও কারণে মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট হয়, তখন কৃত্রিম উপায়ে অক্সিজেন গ্যাস দেওয়া হয়। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, অক্সিজেন প্রয়োগের পরিবর্তে যদি মুখের মধ্য দিয়ে জোর করে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস প্রবেশ করান যায়, তাহলে একই রকম ফল পাওয়া যায়।

*

কৃত্রিম উপায়ে মানুষ কিনা তৈরী করেছে। আর এই সব জিনিস এমন সব বস্তু থেকে পাওয়া যায় যে, অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বাসই করা যায় না। আমেরিকার একটি কম্পানী এক নতুন ধরণের যন্ত্র বার করেছেন যার সাহায্যে খোসা থেকে পেট্রল তৈরী করা হচ্ছে। এই যন্ত্রের মধ্যে খোসাগুলো দিয়ে গরম করবার পর এর থেকে এক রকম গ্যাস পাওয়া যাবে এবং পরে তার থেকে পেট্রল তৈরী হবে। এই যন্ত্রের থেকে তেল বার করবার জন্য আলাদাভাবে জল অথবা হাওয়ার প্রয়োজন হবে না শুধু গ্যাসটা যন্ত্র থেকে বের হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার সঙ্গে তেল পাওয়া যাবে। এখন এই যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে, এতে কিরকম খরচ পড়বে।

অ্যালান ক্যাম্বেল-জনসন

(৮)

"ঐশ্বরিক রাজাধিকারবাদ"। করাচীর স্বাধীনতার অনুষ্ঠানে মাউণ্টব্যাটেনের মর্যাদার প্রশ্ন। পাঞ্জাবের গোয়েন্দা রিপোর্ট। গোপন বৈঠকে মাউণ্টব্যাটেন, প্যাটেল, জিন্না ও লিয়াকৎ। জিন্নাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের সংবাদ।

প্যাটেল-চরিত্রের রোমান্স গুণাবলী। নেহরু ও প্যাটেল, ভারতের একই রাজনৈতিক শক্তির 'দ্বিমূর্তি'। 'জেণ্টল্ হিন্দু' প্যাটেল। রাষ্ট্র ও রাজনীতির নেতৃত্বক্ষেত্রে ভারতীয় নারীর স্থান। জেংকিন্সের জরুরী অনুরোধ—আরও সৈন্য ও পুলিশের সাহায্য চাই। বাঁটোয়ারা ঘোষণায় মাউণ্টব্যাটেনের দ্বিধা—এখন ঘোষণা করলে ১৫ই আগস্টের আনন্দ মাটি হয়ে যাবে। জেংকিন্স্ জানিয়েছেন—শিখ-নেতাদের গ্রেপ্তার করা উচিত হবে না।

শোভাযাত্রায় জিন্না ও মাউণ্টব্যাটেন একই গাড়িতে। "থ্যাংক গড, আপনাকে জীবন্ত ফিরিয়ে আনতে পেরেছি।" একটি অকল্যাণের ইঙ্গিত—পাঞ্জাব সীমানা অঞ্চলে আগুনের শিখা জ্বলছে। দিল্লীতে ভাইসরয়তন্ত্রের অন্তিম অনুষ্ঠান। একটি শূন্য খামের কাহিনী। আনন্দ-মত্ত দিল্লী জনতা। প্রিন্সেস পার্কে জাতীয় পতাকার উত্তোলন অনুষ্ঠান। পতাকার রঙে রঙ মিলিয়ে দেয় দিল্লীর আকাশের রামধনু।

র‍্যাডক্লিফের বাঁটোয়ারা ঘোষিত হয়েছে। নেতারা বিষণ্ন। পাঞ্জাবের দুঃসংবাদ। "ওয়ার অব সাকসেশন"। গান্ধীর স্বাধীনতা দিবস—রাজধানী ছেড়ে দিয়ে কলকাতার এক পল্লীতে বসে উপবাস। পূর্ব-পাঞ্জাবে নেহরু ও লিয়াকৎ। বৃটিশ ফৌজের অপসারণ আরম্ভ। পাঞ্জাবের সীমানা ফৌজের বিরুদ্ধে অভিযোগ।

নিজামের জন্য ভারত সরকারের কাছ থেকে 'বিশেষ ব্যবস্থা ও সুযোগ' আদায় করেন মাউণ্টব্যাটেন। মংকটনের ভরসা—ভারতের সঙ্গে সন্ধি করার প্রস্তাবে নিজামকে তিনি রাজী করাবেন। ভোপালের রাষ্ট্রভুক্তি। হায়দরাবাদের সঙ্গে ভিন্ন রকমের সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাবে প্যাটেলের দৃঢ় আপত্তি। তারা সিং ও জ্ঞানী কর্তার সিং-এর পরিকল্পনা। এক কোটি লোক ঘর ছেড়ে পথে বের হয়েছে দেশান্তরে যাবার জন্য।

'মৃতের সহর' জলন্ধর ও অমৃতসর। পাঞ্জাবের উপদ্রুত অঞ্চলে লেডি মাউণ্টব্যাটেন ও রাজকুমারী অমৃত কাউর। মাস্টার তারা সিং শঙ্কিত—ঘটনার স্বরূপ দেখে কাঁপছেন। সীমানা ফৌজের ওপর সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব। সীমানা ফৌজ ভেঙ্গে দেওয়া হলো। সিমলায় মাউণ্ট-ব্যাটেনের বিশ্রাম। প্যাটেলের জরুরী আহ্বান। গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখে ভারত গবর্ণমেণ্ট। দিল্লী থেকে কি রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে? যুদ্ধাবস্থার চেয়েও বেশী কঠিন অবস্থা। পাঞ্জাবে মনুষ্যজীবনের ক্ষয়-ক্ষতি—যুদ্ধেও এরকম হয় না। প্রতিকার-ব্যবস্থার জন্য মাউণ্টব্যাটেনের ওপর দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পণ। যুদ্ধকালীন ব্যবস্থার অনুরূপে 'জরুরী কমিটি' গঠন করেন মাউণ্টব্যাটেন।

নয়াদিল্লী, রবিবার, ৩রা আগস্ট, ১৯৪৭ সাল। রাজন্যদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছেন, যাঁরা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কারণে রাষ্ট্রভুক্তির ব্যবস্থায় সম্মত হতে পারছেন না। এই ধরণের যাঁরা বিশেষ সমস্যা ও অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন, তদের ব্যক্তিগতভাবে যথাসাধ্য পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবার জন্য মাউণ্টব্যাটেন ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। চরম দিবসটি যতই এগিয়ে আসছে, কাজ, কর্তব্য ও সিদ্ধান্ত-গুলিও আকারে প্রকারে এবং সংখ্যায় ততই অতিমাত্রায় প্রচণ্ড হয়ে উঠছে। একটা নতুন রকমের কাজ আমার ওপর চাপিয়ে দিলেন মাউণ্টব্যাটেন। ঢোলপুরের রাণার সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের যোগাযোগ রক্ষার কাজ। এটা সম্পূর্ণভাবেই বে-সরকারী কাজ। ভাইসরয়ের ষ্টাফের লোক হিসাবে নয়, ঢোলপুরের রাণার পুরানো বন্ধু মাউণ্টব্যাটেনের লোক হিসাবে রাণার কাছ থেকে তাঁর বাধা ও অসুবিধার বিষয়-গুলি জেনে নিয়ে মাউণ্টব্যাটেনকে জানাতে হবে। ১৯২১ সালে ইংলণ্ডের যুবরাজ (প্রিন্স অব ওয়েলস) যখন ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন, তখন মাউণ্টব্যাটেন ও ঢোল-পুরের রাণা উভয়েই যুবরাজের পার্শ্বচর অফিসার (এ ডি সি) হিসাবে কাজ করেছিলেন।

রাণার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করেছি। আলাপ করেই বুঝেছি যে, তিনি পণ্ডিত মানুষ, প্রায় গোঁড়া পণ্ডিতই বলা যায়। যথেষ্ট সুরুচিসম্পন্ন এবং প্রকৃতিতেও একটা সন্ন্যাসী গোছের ভাব আছে। রাজার অধিকার হলো ঈশ্বরদত্ত অধিকার, এই তত্ত্বকে তিনি মতবাদ ও কর্মবাদ হিসাবে বিশুদ্ধ তত্ত্ব বলেই আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন। তিনি ষ্টুয়ার্ট রাজবংশের রাজধর্ম ও রাজনীতির ইতিহাস থেকে অনেক উদাহরণ উল্লেখ করে তাঁর বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করলেন। রাজা হিসাবে তাঁর ব্যক্তিগত মর্যাদা এবং প্রজার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্বন্ধে রাণা যে ধারণা পোষণ করেন, সেটা প্রায় একটা অবাস্তব ও অস্পষ্ট ভাবলোকের ধারণা। নিজের রাজকীয় মহিমা ও অধিকার সম্বন্ধে এত সচেতন হলেও রাণার বেশভূষা ও ব্যবহারে কোন রাজকীয় চাকচিক্য নেই। এদিক দিয়ে তিনি অত্যন্ত সাদাসিধা মানুষ। ছোটখাট চেহারা মানুষটি, দেখতে গান্ধীজীর চেয়ে সামান্য একটু লম্বা, মাথায় বেগুনী রঙের একটি পাগড়ী এবং চোখের দৃষ্টিতে একটা আগ্রহ ও কৌতু-হলের ভাব।

আস্তে আস্তে ও নিবিড় ভাবাবেগে বিচলিতস্বরে রাণা বললেন, ব্রিটিশের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে স্থাপিত এত বড় একটা সম্পর্ক আজ শেষ হতে চলেছে। রাণার কণ্ঠস্বরে উষ্মার কোন পরিচয় পেলাম না। একজন অসহায়ের কণ্ঠস্বর, অদৃষ্টের হাতেই নিজেকে ছেড়ে না দিয়ে যার আর উপায় নেই। অদৃষ্টবাদীর মত ভাব নিয়ে গভীর বিষাদে ডুবে রয়েছেন রাণা। স্বার্থ রক্ষা করতে হলে নূতন অবস্থায় নূতন পন্থা গ্রহণ করতে হয়, এ কৌশলসূত্র এমন মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে

বিশেষ কোন ফল হবে না। ঢোলপুরের রাণা যেটা পেতে চাইছেন, সেটা হলো সহানুভূতি। তিনি যে পন্থাই গ্রহণ করুন না কেন, তাতে ঢোলপুরের কোন দোষ ধরা হবে না, এই প্রতিশ্রুতি তিনি খুঁজেছেন। নতুন ভারত ডোমিনিয়ন টিকে থাকবে কি না, এ বিষয়ে তাঁর মনের গভীরে ঘোর সন্দেহ রয়েছে। ভারত ডোমিনিয়ন এবং ঢোলপুরের একটা তুলনামূলক বিচার করলেন রাণা। ভারত ডোমিনিয়ন এই তো সেদিনের কতগুলি রাজদ্রোহকর বিপ্লবের সৃষ্টি। আর ঢোলপুরের সঙ্গে অধিরাজক সন্ধিসূত্রে বৃটিশের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে সেই ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে। বৃটিশ-রাজের প্রতি অবিচ্ছিন্ন আনুগত্যের ঐতিহ্য কত দীর্ঘকাল ধরে রক্ষা করে ও বহন করে আসছেন ঢোলপুরের রাণাবংশ। রাণার এই সব উক্তি ও আক্ষেপ শুনে বুঝতে পারছি কোথায় তাঁর দুঃখ। শুনে দুঃখিত না হয়েও পারা যায় না। কত দুর্বল-কোমল ও নিজের প্রতি কত খাঁটি একটি মানুষ আজ কি সংকটেই না পড়েছেন! ভারতীয় স্বাধীনতা নামে যে ঘটনা পাহাড়-ধসানো প্রপাতের মত দুর্বার ও দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে, তার প্রকোপ থেকে সরে দাঁড়াবার মত শক্তি পাচ্ছেন না রাণা। যদি নিজের মনের সংস্কারগুলির ওপর তাঁর এতটা আন্তরিক নিষ্ঠা না থাকতো, তবে আত্মরক্ষার জন্য এই প্রপাতের পথ থেকে একটু পাশে সরে যাওয়ার কাজটা তাঁর পক্ষে বেশি সহজ হতো, অন্যান্য অনেক রাজন্য যেমন সহজেই এ কাজ করতে পেরেছেন। ঐশ্বরিক রাজাধিকারবাদে বিশ্বাসী ঢোলপুর এ কাজ সহজে করতে পারছেন না।

এগিয়ে আসছে ১৫ই আগষ্ট এবং এখন থেকেই দিল্লী ও করাচীর স্বাধীনতা অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা ও আয়োজনের কথা চিন্তা করতে হয়েছে।

করাচীতে ১৩ই আগষ্ট তারিখে ক্ষমতা হস্তান্তর তথা 'স্বাধীনতা'র অনুষ্ঠান হবে। মাউণ্টব্যাটেনকে করাচীর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে হবে। কিন্তু এ ব্যাপারেও জিন্না একটি সমস্যা সৃষ্টি করে ফেলেছেন। পাকিস্থানের স্বাধীনতার অনুষ্ঠানে যখন মাউণ্টব্যাটেন সেখানে উপস্থিত থাকবেন, তখন তাঁকে কি ধরণের মর্যাদা দেওয়া হবে? জিন্নার ওপরে, না নীচে? পাকিস্থানের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাউণ্টব্যাটেনকে মর্যাদায় অগ্রবর্তিতা দান করার বিষয়ে জিন্নার যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে, সেটা স্বীকার করে নিয়ে মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে করাচী যাওয়া সম্ভবপর হতে পারে না। কাজেই অত্যন্ত সৌজন্যের সঙ্গে অথচ দৃঢ়ভাবেই পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হলো যে, হিজ এক্সেলেন্সি করাচীতে ভাইসরয়ের মর্যাদা নিয়েই স্বাধীনতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। সুতরাং, পাকিস্থানের আইনসভার বিশেষ অধিবেশনে মাউণ্টব্যাটেন জিন্নার ওপরের আসনেই উপবেশন করবেন, জিন্নার নীচের আসনে নয়। মাউণ্টব্যাটেনকে জিন্নার নীচের আসনে বসবার জন্য কোন প্রস্তাব ও অনুরোধ করার কোন অর্থ হয় না, প্রয়োজনও নেই। এ প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবেই বিবেচনার অযোগ্য।

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল। দেশ-বিভাগ পরিষদ এবং যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদ, দুই পরিষদেরই আজকের বৈঠক শেষ হবার পর প্যাটেল, জিন্না ও লিয়াকতকে মাউণ্টব্যাটেন এক গোপন বৈঠকে আহ্বান করলেন। পাঞ্জাবের গোয়েন্দা বিভাগের (সি আই ডি) জনৈক অফিসারকে জেংকিনস্ পাঠিয়েছেন। নেতাদের সঙ্গে এই অফিসারের পরিচয় করিয়ে দেবেন মাউণ্টব্যাটেন এবং নেতারা অফিসারের মুখ থেকেই কতগুলি গুপ্ত তথ্যের বিবরণ শুনবেন।

অফিসার বললেন, পাঞ্জাবের হাঙ্গামা আরম্ভ হবার পর হাঙ্গামার প্ররোচনাকারী যে সব লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের নানারকম বিবৃতি থেকে অনেক তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। ধৃত ব্যক্তিদের প্রশ্ন করে এবং গোপনভাবে অন্যান্য সূত্রে সংবাদ সংগ্রহ করে জানতে পারা গেছে যে, শিখ নেতারা ষড়যন্ত্র করে নানারকম অন্তর্ঘাতী কাজ ও আক্রমণের কতগুলি পরিকল্পনা করেছেন। এর মধ্যে একটি হলো জিন্নাকে হত্যা করার পরিকল্পনা। আগামী সপ্তাহে করাচীতে স্বাধীনতার রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের সময় জিন্না যখন শোভাযাত্রা করে আইনসভার দিকে অগ্রসর হবেন, সেই সময় তাঁকে হত্যা করার চক্রান্ত করা হয়েছে।

জিন্না এবং লিয়াকৎ দাবী করলেন, অবিলম্বে মাষ্টার তারা সিং ও অন্যান্য শিখ নেতাদের গ্রেপ্তার করা হোক্। প্যাটেল এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জ্ঞাপন করলেন। প্যাটেল বললেন, হাঙ্গামা তো এমনিতেই আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে, তার ওপর যদি শিখ নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়, তবে সংকট আরও জটিল এবং কঠিন হয়ে উঠবে।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, শিখ নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রস্তাবে তিনি সম্মতি দিতে প্রস্তুত আছেন, যদি পাঞ্জাব কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, এখন এরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই বিজ্ঞোচিত কাজ করা হবে। সুতরাং, এ বিষয়ে পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের অভিমত ও পরামর্শ আগে গ্রহণ করা কর্তব্য, কারণ পাঞ্জাবের শান্তিরক্ষার জন্য কি করা উচিত, সেটা সেই গবর্ণমেণ্টই বেশী বুঝতে পারবেন, যে গবর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষভাবে পাঞ্জাবের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কার্যে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন।

মাউণ্টব্যাটেন জানিয়ে দিলেন, তিনি জেংকিনস্‌কে এক চিঠি দিয়েছেন। ত্রিবেদী এবং মুডি'র (পূর্ব পাঞ্জাব এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের দুই নির্বাচিত গবর্ণর) সঙ্গে পরামর্শ করে জেংকিনস্‌কে বিবেচনা করতে বলেছেন মাউণ্টব্যাটেন, জরুরী ব্যবস্থা হিসাবে মাষ্টার তারা সিং এবং অন্যান্য মাথা-গরম শিখ নেতাদের এখন গ্রেপ্তার করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে কি না?

জেংকিনসের সম্বন্ধে অতি উঁচু ও ভাল ধারণা পোষণ করেন মাউণ্টব্যাটেন। দুঃসহ অপবাদ এবং উদ্বেগের মধ্যেও তিনি পাঞ্জাবকে আগলে রাখার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। ক্ষুব্ধ ও উন্মত্ত এই প্রদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলার অবশেষটুকুই রক্ষা করার জন্য জেংকিনস্ যা করেছেন, তার চেয়ে বেশি কেউ করতে পারতো না। শান্তিরক্ষার জন্য তাঁর এই বিরামহীন পরিশ্রম সত্ত্বেও তিনি দুই পক্ষের (ভারত ও পাকিস্থান) কোন পক্ষেরই কৃতজ্ঞতা বা প্রশংসা পাচ্ছেন না, যদিও পাওয়া খুবই উচিত ছিল।

নয়াদিল্লী, বৃহস্পতিবার ৭ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল। দুরূহ কাজের বিস্তীর্ণ তালিকার মধ্যে এমন একটা কাজের উল্লেখ দেখলাম, যে কাজের চাপ নেই বরং মনের চাপ হাল্‌কা করে দেয়। ভাইসরয়ের ষ্টাফের ৬৮তম বৈঠকের কার্যবিবরণীতে আজ লিখতে হয়েছে—'প্রথম আলোচিত বিষয়, জ্যোতিষী গণনা।' ভাইসরয় বললেন, মধ্য প্রদেশের নির্বাচিত গবর্ণর মিঃ মঙ্গলদাস পাকবাস এই কিছুক্ষণ আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। স্যার ফেডরিক বোর্ণের কাছ থেকে ১৪ই আগষ্ট তারিখে কার্যভার গ্রহণ করবার জন্য মিঃ মঙ্গলদাস পাকবাস রওনা হবেন, যাতে স্যার ফেডরিকও ১৫ই আগষ্টের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে গবর্ণরের কার্যভার গ্রহণ করতে পারেন, এই ব্যবস্থা আগের থেকেই হয়ে রয়েছে। কিন্তু পাকবাস বললেন,

১৪ই তারিখে তিনি রওনা হবেন না। তিনি ১৩ই তারিখে রওনা হতে চান। কারণ, জ্যোতিষী-গণনা অনুসারে ১৪ই তারিখটা ভাল দিন নয়। পাকবাসকে মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, তাঁর ষ্টাফে জ্যোতিষী-গণনা সম্বন্ধে পরামর্শ দেবার মত উচ্চযোগ্যতাসম্পন্ন লোকের খুবই অভাব আছে।

এই অভাব আজ এখুনি দূর করা হলো। কার্য-বিবরণীতে লেখা হলো—হিজ্ এক্সেলেন্সি ভাইসরয় আজ তাঁর প্রচার-কর্মচারীকে গবর্ণর জেনারেলের জ্যোতিষী গণকের অবৈতনিক ও অতিরিক্ত পদে নিযুক্ত করলেন'।

আজ বল্লভভাই প্যাটেলের বাড়ীতে মধ্যাহ্নভোজনে নিমন্ত্রিত হয়েছি আমরা দু'জন—আমি ও ফে। এটা একটা ঘরোয়া নিমন্ত্রণ মাত্র, কোন উপলক্ষ্য ছিল না। প্যাটেলের বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, সেখানে রয়েছেন মঙ্গলদাস পাকবাস, যিনি আমার এই বিচিত্র জ্যোতিষী-পদে নিয়োগের মূলে কারণ। পাকবাস ছাড়া মাত্র আর একজন অতিথিকে সেখানে দেখলাম, জনৈক আমেরিকান আগন্তুক। আর দেখলাম আমার অক্সফোর্ডের ছাত্রজীবনের সতীর্থ দল-শংকরকে, যিনি এখন প্যাটেলের প্রাইভেট সেক্রেটারী। এ ছাড়া রয়েছেন সর্দারের পিতৃসেবাপরায়ণা কন্যা মণিবেন। পিতার সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ কন্যা বললেই বরং মণিবেনের যথার্থ পরিচয় দেওয়া হয়।

নেহরুর বাড়ীর খুবই কাছাকাছি একটি বাড়ীতে থাকেন প্যাটেল। প্রায় পাশাপাশি দুই বাড়ী বলা যায়, কারণ উভয়ের মধ্যে সামান্য মাত্র ব্যবধান। নেহরুর বাড়ীর তুলনায় প্যাটেলের বাড়ীটি আকারে ছোট। তা ছাড়া, প্রধান মন্ত্রীর বাড়ীর তুলনায় প্যাটেলের বাড়ীতে কেতাদুরস্ত ব্যবস্থা ও উপকরণের আড়ম্বর অনেক কম।

নেহরু এবং প্যাটেলের মধ্যে রাজনৈতিক পার্থক্যের তুলনা ও আলোচনা করা লোকের একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের পর নেহরু এবং প্যাটেল ভারত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে দু'টি পৃথক শক্তির প্রতীক হয়ে উঠবেন বলে মনে হয় না। বরং, অনুমান করা যায় যে, তাঁরা দু'জনে একত্রে বস্তুতঃ একই রাজনৈতিক শক্তির দ্বিমূর্তিরূপে নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন। তবুও, ব্যক্তিত্বে এবং চেহারায় দু'জনের পার্থক্য বেশ ভালভাবেই চোখে পড়ে। ধুতিপরিহিত প্যাটেলকে দেখলেই টোগা-পরিহিত রোমক সম্রাটের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। সত্যসত্যই এই মানুষটির মধ্যে ঐতিহাসিক রোম্যান চরিত্রের বিশেষ কতগুলি গুণ নিহিত আছে। যথা—শাসনকার্য পরিচালনার প্রতিভা, দুরূহ বিষয়ে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং সে সিদ্ধান্তকে বলিষ্ঠভাবেই রক্ষা করার যোগ্যতা। তা ছাড়া, সকল কাজের ব্যাপারে তাঁর মধ্যে একটা অবিচল শান্ত ও নির্বিকার ভাব দেখা যায়, যেটা সত্যিকারের চারিত্রিক দৃঢ়তার একটা বড় লক্ষণ।

নেহরুর যে বিশ্বখ্যাতি এবং বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গী আছে, প্যাটেলের তা নেই। প্যাটেল ইচ্ছে করেই নিজের জন্য এমন একটি কর্মক্ষেত্র বেছে নিয়েছেন, যেখানে বস্তুতঃ দেশের ঘরোয়া রাজনীতিকেই সামলানো এবং চালনা করাই প্রধান কাজ। এক্ষেত্রে কিন্তু তাঁর ক্ষমতা ও দায়িত্ব আদৌ ক্ষুদ্র নয়। বরং বলা যায়, এক্ষেত্রে ক্ষমতা ও দায়িত্ব অতি-বেশী পরিমাণেই প্যাটেল তাঁর নিজের হাতে রেখেছেন। সরকারী সংবাদ ও তথ্য প্রচারের সকল ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং পুলিশ, এ সবেরই পরিচালনার দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্যাটেলের হাতে। তা ছাড়া, আর একটি দায়িত্বও পালনের ক্ষমতা প্যাটেল গ্রহণ করেছেন, যেটা গুরুত্বে কোন দায়িত্বের চেয়ে কম নয়। ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব, যেটা ভারতের রাষ্ট্রীয় সংহতির পক্ষে বস্তুতঃ একটি জীবন-মরণের প্রশ্ন।

দেশীয় রাজ্যগুলিকে রাষ্ট্রভুক্ত করার জন্য যে নীতি গ্রহণ করেছেন প্যাটেল, সে নীতি অনুযায়ী কাজ সম্পূর্ণ হ'লে ভারত ডোমিনিয়নেরই রূপ বদলে যাবে। পাকিস্থান হওয়ায় যতসংখ্যক অধিবাসী ভারত ডোমিনিয়নের সীমার বাইরে চলে গেছে, তার চেয়ে বেশী সংখ্যক অধিবাসী ভারত ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হবে। বর্তমানে হায়দরাবাদ ও কাশ্মীর মিলিয়ে দুই কোটি অধিবাসীকে বাদ দিলেও দেখা যায় যে, দেশীয় রাজ্যগুলির রাষ্ট্রভুক্তিতে প্রায় নয় কোটি অধিবাসী ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে। পাকিস্থানের সমগ্র অধিবাসীর সংখ্যা নয় কোটিরও কম।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানেরও ওপর প্রভুত্বের প্রায় সকল ক্ষমতা প্যাটেলই নিজের হাতে রেখেছেন। কোন সময়ে কোন রাষ্ট্রের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে একজনের হাতে এত-গুলি ক্ষমতা থাকার ব্যাপারকে বস্তুতঃ ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা প্রচণ্ডভাবে কেন্দ্রী-ভূত করারই একটি উদাহরণ বলা যেতে পারে। এই সব বহু এবং বিভিন্ন রকমের ঘরোয়া দায়িত্ব নিয়ে বিশেষভাবে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও বিশ্বরাজনীতির বৃহত্তর ক্ষেত্রে ভারতের গুরুত্ব সম্বন্ধে প্যাটেল সচেতন আছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের যে সব বিশেষ সুবিধা আছে, সেটা বুঝবার মত একটা সহজ গূঢ়বুদ্ধি প্যাটেলের আছে।

যখন কাজের মধ্যে প্যাটেল থাকেন তখন তাঁর মন আচরণ ও চেহারা এক-রকম এবং যখন কাজের বাইরে থাকেন, তখন সম্পূর্ণ আর একরকম। আজ প্যাটেলকে তাঁর কাজের বাইরে স্বাভাবিক ও সহজ মূর্তিতে দেখবার সুযোগ পেলাম। দেখলাম, কঠিন ও উদ্ধত কোন মূর্তি নয়, একজন নম্রস্বভাব 'জেণ্টল হিন্দু'র মূর্তি। সদয় প্রীতি ও হাস্যে পরিপূর্ণ একটি মুখ। পার্লামেণ্টে ভারতীয় স্বাধীনতা বিল গ্রহণের অনু-ষ্ঠান সম্বন্ধে আমার কাছ থেকে প্রত্যক্ষ-দর্শীর বিবরণ বেশ খুশী হয়েই শুনলেন প্যাটেল। কথায় কথায় বক্তৃতার কথা উঠলো। বক্তৃতা করতে প্যাটেলের ভালো লাগে কি না, আমি এই প্রশ্ন করতেই প্যাটেল এবং মণিবেন দু-জনেই হেসে উঠলেন। মণিবেন বললেন যে, তাঁর পিতা গুজরাটি ভাষায় একজন বড় বক্তা।

সর্দারের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক ও সরকারী ক্রিয়াকলাপের সকল বিষয়ের সবচেয়ে গোপনীয় ব্যাপারগুলিও মণি-বেনের অজানা থাকে না, যতক্ষণ আমাদের খাওয়ার ব্যাপার চললো, ততক্ষণ মণিবেন শুধু নিঃশব্দে কর্তব্যশীলা কর্মচারিকার মত কাজ করে গেলেন। পরিধানে সাদা খদ্দরের শাড়ি, ভোগবিমুখ জীবনের একটা অনাড়ম্বর সরলতা তাঁর এই সজ্জার মধ্যে ফুটে রয়েছে। কোমরে কতকগুলি চাবির মস্ত বড় একটা থোকা ঝুলছে। সাধারণ গৃহস্থালীর কাজে সর্বদা ব্যস্ত এক নিপুণা কর্মকর্ত্রীর মতই তাঁকে দেখতে লাগছিল।

ভারতীয় নেতাদের মধ্যে প্রায় সকলেই তাঁদের কাজের ব্যাপারে বাড়ীর মেয়েদের আলাদা করে রাখেন না। সম্পর্কে পত্নী, ভগ্নী অথবা কন্যা, যাই হোন না কেন তিনি, নেতাদের কাজের ব্যাপারেও তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে আছেন এবং নেতাদের ক্রিয়া-কলাপের ওপরেও তাঁদের ব্যক্তিত্বের প্রভাব

ও শক্তি বড় কম নয়। আমি যখন ভারতে প্রথম এলাম, তখন এই ধারণাই নিয়ে এসেছিলাম যে, ভারতে রাষ্ট্র এবং রাজনীতির ব্যাপারে মেয়েদের কোন উৎসাহ ও আগ্রহ নেই, এবং মতামতেরও কোন বালাই নেই। বরং, আমার এই ধারণাই ছিল যে, ভারতে পুরুষরাই সব, মেয়েদের ব্যক্তিত্ব পুরুষের আধিপত্যে চাপা পড়ে একেবারে তলিয়ে গেছে। কিন্তু এসে দেখলাম যে, রাষ্ট্র ও রাজনীতির বড় বড় ব্যাপার যেখানে চল্‌ছে, সেখানে ভারতীয় নারীর ব্যক্তিত্ব বেশ সক্রিয়। মিস্ ফতিমা জিন্না, মিসেস বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, বেগম লিয়াকৎ আলি খাঁ, এবং মিসেস কৃপালনী, এ'রা এক একজন অতি প্রবল ও শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব, যাঁরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহের দিক দিয়ে তাঁদের পুরুষ আত্মীয়ের প্রায় সমান সমান যান। কিন্তু এ'রা সকলেই মণিবেনের মত নন, যিনি প্রকাশ্য নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নিজেকে না টেনে নিয়ে এসে আড়ালে থেকেই তাঁর পুরুষ আত্মীয়ের রাজনৈতিক কর্তব্যের সাহায্যকারিণী হয়ে কাজ করতে ভালবাসেন। বাইরের রাজনীতির ক্ষেত্রে মণিবেনকে দেখতে পাওয়া যায় না, পিতার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপেও তাঁকে প্রকাশ্যে সহকর্মিণীরূপে দেখা যায় না। কিন্তু যদি ব্যক্তিগত প্রভাবের কথা ধরা যায়, তবে সেদিক দিয়ে কোন মহিলা-নেতাই মণিবেনকে অতিক্রম করে যেতে পারেননি। পিতা প্যাটেলের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওপর মণিবেনের যে প্রভাব, অন্য কোন মহিলা-নেতাই তাঁর পুরুষ-আত্মীয়ের নেতৃত্ব ও ক্রিয়াকলাপের ওপর সে প্রভাব প্রয়োগের শক্তি লাভ করতে পারেননি।

আমি জানি, লেডি মাউণ্টব্যাটেনও ভারতের সকল সমাজকল্যাণের প্রচেষ্টার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভারতীয় নারীদের সংস্পর্শে এসে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তাতে তিনি বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছেন। কর্মশক্তিতে ও যোগ্যতায় ভারতীয় নারী অসাধারণ কৃতিত্বের প্রমাণ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, যে সকল সংস্কারের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সমাজের মধ্যে একটা হীনদশার স্তরে ভারতীয় নারীরা পড়েছিলেন, সে বন্ধনও তাঁরা দ্রুত ছিন্ন করে ফেলছেন। ভারতের স্বাধীনতা যে সকল ঘটনা ও আন্দোলনের ভেতর দিয়ে এসেছে, তারই সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার সামাজিক পরিবর্তনও স্বাভাবিকভাবেই নিষ্পন্ন হয়ে এসেছে। এই সব সামাজিক পরিবর্তনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো ভারতীয় নারী সমাজের মুক্তি।

নয়াদিল্লী, শনিবার, ৯ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল। জেংকিন্‌স্ রিপোর্ট পাঠিয়েছেন, দুই পাঞ্জাবের মধ্যবর্তী সীমানা অঞ্চলের অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠেছে। আরও সৈন্য, আরও বিমান এবং আরও পুলিশ পাঠাবার জন্য জরুরী অনুরোধ জানিয়েছেন জেংকিন্‌স্। এদিকে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে যে, আজই সন্ধ্যার সময় পাঞ্জাব সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত (বাঁটোয়ারা) ভাইসরয়ের হাতে সঁপে দেবেন র‍্যাডক্লিফ। যা ধারণা করা গিয়েছিল, তাই হয়েছে। সীমানা কমিশনের হিন্দু ও মুসলিম সদস্যদের মধ্যে একবিন্দুও মতের মিল হয়নি। এই অবস্থায়, নিয়ম অনুযায়ী র‍্যাডক্লিফের যা করবার ছিল, তিনি তাই করেছেন। তিনি নিজেরই সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর বাঁটোয়ারা রচনা করে ফেলেছেন। এই বাঁটোয়ারা ঘোষণা করার দায়িত্ব অবশ্য ভাইসরয়ের।

আমাদের ষ্টাফের বৈঠকে আজ এই বিষয়টিই আলোচিত হলো, বাঁটোয়ারা এখন ঘোষণা করা হবে কি না? মাউণ্টব্যাটেন বললেন, তিনি এ বিষয়ে একটু বুঝে ও সতর্ক হয়ে কাজ করতে চান। তাঁর ইচ্ছা, স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হবার পর এই বাঁটোয়ারা ঘোষণা করা উচিত। তিনি জনসাধারণের মনের অবস্থার কথা চিন্তা করেই ঘোষণার সময় সম্বন্ধে চিন্তা করছিলেন। বাঁটোয়ারা ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যে সব ক্ষোভ ও আলোচনা দু'পক্ষের মধ্যেই তীব্রভাবে দেখা দেবে বলে তিনি অনুমান করেছেন, সেগুলিকে স্বাধীনতা অনুষ্ঠানের আগেই জাগিয়ে তুলতে চাইছেন না মাউণ্টব্যাটেন। স্বাধীনতা দিবসের সব আনুষ্ঠানিক আনন্দ মাটি হয়ে যাবে, যদি এই বাঁটোয়ারা ১৫ই আগষ্টের আগেই ঘোষিত হয়। বৈঠকে এ বিষয়ে আজ আর চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো না।

১৫ই আগষ্টের পূর্বেই শিখ নেতাদের গ্রেপ্তার করে ফেলার প্রস্তাব দৃঢ়ভাবেই প্রত্যাখ্যান করেছেন জেংকিন্‌স্। জেংকিন্‌স্ মাউণ্টব্যাটেনকে জানিয়েছেন যে, তিনি ত্রিবেদী এবং মুডির সঙ্গে সমস্ত বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করেছেন এবং ত্রিবেদী ও মুডি উভয়েই তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে বলেছেন যে, এভাবে শিখ নেতাদের গ্রেপ্তার করলে বর্তমানের অনিশ্চিত অবস্থার তো কোন উন্নতিই হবে না, বরং তাতে অবস্থা আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠবারই সম্ভাবনা আছে। তাঁরা তিনজনেই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, শিখ নেতাদের এখন গ্রেপ্তার করা হবে না।

জেংকিনসের অভিমতই গ্রহণ করলেন মাউণ্টব্যাটেন। তিনি জানেন, তাঁর এই সিদ্ধান্তের জন্য ব্যক্তিগতভাবে তাঁর ওপর কোন পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ বা অন্য কোন অপবাদ আরোপ করা কারও পক্ষে সম্ভবপর হবে না। মাউণ্টব্যাটেনের এই ধারণার বিশেষ একটা কারণ আছে। তিনি এরই মধ্যে ব্যবস্থা করে ফেলেছেন যে, করাচীতে ১৪ই আগষ্ট তারিখে স্বাধীনতা অনুষ্ঠান উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় শোভাযাত্রার সময় তিনি স্বয়ং গবর্ণর জেনারেল জিন্নার সঙ্গে একই গাড়ীতে বসবেন। গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়েছে, ষড়যন্ত্রকারীরা এই শোভাযাত্রার সময়েই জিন্নার প্রাণনাশের চেষ্টা করবে। কিন্তু এই সময়ে মাউণ্টব্যাটেন জিন্নার সঙ্গেই থাকবেন, সুতরাং কোন সমালোচক মাউণ্টব্যাটেনের বিরুদ্ধে এই অপবাদ দিতে পারবে না যে, তিনি সব জেনে-শুনেও জিন্নার প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন।

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ১২ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল। শুনেছিলাম, র‍্যাডক্লিফ তাঁর বাঁটোয়ারা প্রস্তুত ক'রে ফেলেছেন। কিন্তু তিনটি দিন পার হয়ে গেছে, আজ পর্যন্ত র‍্যাডক্লিফের কাছ থেকে এ বিষয়ে কোন কাগজপত্র এল না। মাউণ্টব্যাটেনের নির্দেশে জন ক্রাইস্ট ও আমি র‍্যাডক্লিফের সঙ্গে দেখা ক'রে জানতে পারলাম যে, পাঞ্জাব ও বাংলা সম্বন্ধে তাঁর বাঁটোয়ারা তৈরী হয়ে গেছে, কিন্তু শ্রীহট্ট সম্বন্ধে তাঁর বাঁটোয়ারা রচনার কাজ এখনো সম্পূর্ণ হয়নি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অন্ততঃ ১৪ই আগষ্টের আগে মাউণ্টব্যাটেনের কাছে বাঁটোয়ারার কাগজপত্র এসে পৌঁছবে না এবং খুব তাড়াতাড়ি করে ছাপিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করলেও ১৬ই আগষ্টের আগে কখনই বাঁটোয়ারা প্রচার ও ঘোষণা করা সম্ভবপর হবে না। যাক, সমস্যার সমাধান এক রকম আপনা হতেই হয়ে গেল। স্বাধীনতার অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়ে যাবার পর কোন একটি দিনে বাঁটোয়ারা ঘোষিত হবে।

করাচী, বুধবার, ১৩ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল। আজ মাউণ্টব্যাটেন সপরিবারে করাচী এসে পৌঁছেছেন,

পাকিস্থানের স্বাধীনতা অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য। অখণ্ড ব্রিটিশ-ভারতের ভাইসরয় হিসাবে মাউণ্টব্যাটেনের এই হলো শেষ কাজ। নতুন ডোমিনিয়ন পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠার সূচনাক্ষণে ইংলণ্ড-নৃপতির শুভেচ্ছার বাণী মাউণ্ট-ব্যাটেন সরকারীভাবে নিবেদন করবেন।

মাউণ্টব্যাটেনকে অভ্যর্থনা করার জন্য বিমান ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন সিন্ধুর নির্বাচিত গবর্ণর হেদায়েতুল্লা। বিমান ষ্টেশন থেকে গবর্ণমেণ্ট হাউসে যাবার পথে জিন্নার মিলিটারী সেক্রেটারী কর্ণেল বির্নি মাউণ্টব্যাটেনকে বললেন যে, আগামীকাল শোভাযাত্রার সময় জিন্নার ওপর বোমা নিক্ষেপ করবার যে ষড়যন্ত্র হয়েছে, সে সম্বন্ধে সব খবর তিনি পেয়েছেন। শোভাযাত্রার অনুষ্ঠানটিই বাদ দেওয়া হবে কি না, অথবা অন্যপথে শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করা হবে কি না, এ বিষয়ে আলোচনা চলছে। কর্ণেল বির্নি বললেন—'জিন্না এই মত প্রকাশ করেছেন যে, যদি এই শোভাযাত্রায় মাউণ্ট-ব্যাটেন তাঁর সঙ্গে থাকেন তবে তিনি পূর্ব নির্দিষ্ট পথেই শোভাযাত্রা করে যেতে রাজি আছেন।' মাউণ্টব্যাটেনও সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে বললেন যে, শোভাযাত্রার পথ বদল করার কোন প্রয়োজন নেই। যে পথে শোভাযাত্রা করার ব্যবস্থা হয়েছে সেই পথেই শোভাযাত্রার মধ্যে তিনি জিন্নার পাশেই থাকবেন।

গবর্ণমেণ্ট হাউসের হল ঘরের প্রবেশ-পথে দাঁড়িয়েছিলেন জিন্না ও মিস জিন্না মাউণ্টব্যাটেন পরিবারকে স্বাগত জানাবার জন্য। স্বাধীনতা অনুষ্ঠানের জন্য গবর্ণমেণ্ট হাউসের পরিসজ্জার কাজ তখনো চলছে। হল ঘরটাকে দেখে মনে হচ্ছিল, যেন হলিউডের ফিল্মের জন্য তৈরী দৃশ্যবস্তুর সেট। চোখ ধাঁধানো আলো আর তপ্ত কড়াইয়ের মত আর্ক-ল্যাম্পের ভাজা ভাজা উত্তাপের মধ্যে জিন্না, মিস জিন্না ও মাউণ্টব্যাটেন দম্পতিকে দাঁড় করিয়ে ফটো তোলা হলো। ঠিকমত তোলা হয়নি সন্দেহ করে আর একবার এবং বার বার ফটো তোলা হলো।

করাচীতে উপস্থিত কয়েকজন বৈদেশিক সংবাদদাতার সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করলাম। করাচীর স্বাধীনতা অনুষ্ঠানের আয়োজন আর ব্যবস্থা যথাসময়ে সম্পূর্ণ হবে কি না, সে বিষয়ে এ'দের মনে বেশ সন্দেহ রয়েছে বুঝতে পারলাম। এ'দের মধ্যে কেউ কেউ একথাও বললেন যে, বিমান ষ্টেশনে স্বয়ং উপস্থিত না থেকে জিন্না মাউণ্টব্যাটেনকে অপমান করেছেন। আমি বললাম, মাউণ্টব্যাটেন অবশ্য এ রকম ধারণা করেননি। ভাইসরয় দম্পতিকে অভ্যর্থনার জন্য বিমান ষ্টেশনে জিন্না উপস্থিত না থাকায় আনুষ্ঠানিক সৌজন্যের দিক দিয়ে কোন ত্রুটি হয়েছে বলে মাউণ্টব্যাটেন মনে করেন না। সংবাদ-দাতাদের কাছ থেকে গতকালের একটা ঘটনার কথাও শুনতে পেলাম। পাকিস্থান গণপরিষদের অধিবেশনে গতকাল বিরাট একটা মোসাহেবীর মহড়া হয়ে গেছে। কায়েদে আজমের কাছে ভাষায় ও ভঙ্গীতে কুর্নিশ করে কে কত বেশী ঝু'কে পড়তে পারেন, সদস্যদের মধ্যে যেন তারই একটা প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে।

ডিনারের আয়োজন। জিন্না ও মাউণ্টব্যাটেন দম্পতি ডিনারকক্ষে উপস্থিত হলেন। অতিথিরাও এসে বসলেন। কিন্তু দেখা গেল যে, তিনটি চেয়ার খালি পড়ে আছে, তিনজন বিশিষ্ট অতিথি আসেননি। কর্ণেল বির্নি এবং এ-ডি-সির দল ঠিক করলেন যে, সব টেবিল আবার নতুন করে সাজাতে হবে, তিনটি টেবিল মাঝখানে শূন্য পড়ে থাকায় বড়ই খারাপ দেখাচ্ছে। জিন্না ও মাউণ্টব্যাটেন দম্পতি এক পাশে স'রে দাঁড়িয়ে ছুট্‌কো আলাপে নিযুক্ত রইলেন এবং প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে চললো টেবিল সাজাবার পালা।

ডিনার শেষ হবার পর দেখলাম, এ অনুষ্ঠানের যিনি হলেন প্রধান 'হোষ্ট এবং হিরো', সেই জিন্নাই বেশ একটু দূরে, যেন এই অভ্যাগত জনতার সংস্পর্শ এড়িয়ে একলা দাঁড়িয়ে আছেন। সম্ভবতঃ জিন্নার এই আভিজাতিক গাম্ভীর্যের জন্যই অনুষ্ঠানের আনন্দ স্বচ্ছন্দ ও স্ফূর্ত হয়ে উঠতে পারছিল না। মাথায় রূপোর মত সাদা চুল এবং গায়ে ধবধবে সাদা একটি আচকান, দীর্ঘদেহ জিন্না যেন সমবেত অতিথিপুঞ্জের উর্ধ্বে উঠে রয়েছেন। খুব কম লোকেরই সঙ্গে কথা বলছিলেন জিন্না।

করাচী, বৃহস্পতিবার, ১৪ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল। গবর্ণমেণ্ট হাউস থেকে আইন সভার ভবন, আরম্ভ হলো পাকিস্থানের গবর্ণর জেনারেল জিন্নার আনুষ্ঠানিক শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রার পথের দু'পাশে জনতা। কিন্তু যে রকম আশা করেছিলাম, সে রকম কিছুই দেখলাম না। জনতার মধ্যে উৎসাহ ও উল্লাসের তেমন কিছু আধিক্য দেখলাম না, লোকের ভিড়ও খুব বেশী নয়। আইন সভার সাধারণ একটা বাৎসরিক উদ্বোধনের দিনে জনসাধারণের মধ্যে যতটা উদ্দীপনা দেখা যায়, তার চেয়ে বেশী কিছু লক্ষ্য করলাম না।

আইনসভার ভবনদ্বারে প্রথমে পৌঁছালেন মাউণ্টব্যাটেন দম্পতি। তারপর এলেন জিন্না ভিন্ন গাড়ীতে। যেমন জিন্নাকে, তেমনি মাউণ্টব্যাটেনকেও সমান আন্তরিকতার সঙ্গে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হলো। মাউণ্টব্যাটেন ও জিন্না উভয়েরই বক্তৃতার সকল কথার মধ্যে সৌহার্দ্যের সুরই সব চেয়ে বেশী করে এবং বড় হয়ে বেজে উঠলো। এই সৌহার্দ্য-পূর্ণ পরিবেশের মধ্যে মাউণ্টব্যাটেনের মর্যাদার অগ্রবর্তিতার সমস্যাও আপনা-আপনি চুকে গেল। জিন্নার বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে লেডি মাউণ্টব্যাটেন সস্নেহে মিস জিন্নার হাত ধরলেন।

জিন্না অবশ্য তাঁর কঠিন ও হিম-শীতল ব্যক্তিত্ব নিয়ে সকলের সঙ্গ ছাড়া হয়ে একটু দূরে দূরেই সরে থাকেন। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বে একটা আকর্ষণী শক্তিও আছে। নিজের নেতৃত্বশক্তি সম্বন্ধে তিনি সর্বদা সচেতন এবং তাঁর এই সদাজাগ্রত প্রভুভাবের দ্বারাই তিনি অপরকে অভিভূত করেন। নিয়মতান্ত্রিক গবর্ণর জেনারেলের পদ তাঁর কাছে নামে মাত্র একটা পদ ছাড়া আর কিছুই নয়। নিয়মতান্ত্রিক বশ্যতার প্রমাণ তাঁর মনোভাবে ও আচরণে দেখা যায় না। যেটুকু দেখা যায়, সেটুকু হলো একটা লোক দেখানো ফাঁকা আচরণ। গবর্ণর-জেনারেল পদের জন্য নিজের নাম প্রস্তাব করার পরেই তিনি প্রথম যে কাজটি করেছেন সেটা হলো অতিরিক্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নেবার কাজ। ১৯৩৫ সালের আইনের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নবম তপশীল অনুসারে তিনি বিশেষ ক্ষমতার জন্য (ইংলণ্ড নৃপতির কাছে) আবেদন করে-ছিলেন এবং সে ক্ষমতা পেয়েও গেছেন। জিন্না এখন যে ডিক্টেটরী ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন, আজ পর্যন্ত কোন ডোমিনিয়নের নিয়মতান্ত্রিক গবর্ণর-জেনারেল কখনো সে রকম ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন বলে শোনা যায়নি। চোখের সামনে আজ পাকিস্থানের গবর্ণর জেনারেলরূপে যে জিন্নাকে দেখতে পাচ্ছি, তিনি বস্তুতঃ হলেন একই আধারে কেন্দ্রীভূত পাকিস্থানের সম্রাট, আর্কবিশপ অব ক্যাণ্টারবেরি, স্পীকার এবং প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা দিয়ে তৈরী প্রচণ্ড এক কায়েদে আজম।

আইনসভা ভবনের অনুষ্ঠান এক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। এইবার

শোভাযাত্রা করে জিন্না গবর্ণমেণ্ট হাউসে ফিরে যাবেন। একই গাড়ীতে জিন্নার সঙ্গে বসলেন মাউণ্টব্যাটেন। আবার পথের দু'পাশের জনতার উৎসাহ লক্ষ্য করলাম। কয়েকটি লরীতে একদল পাকিস্থানী নাবিকের এবং ছোট ছোট ছেলেপিলেদের কয়েকটি দলের চীৎকার ছাড়া জনতার মধ্যে আনন্দমত্ত উল্লাসের কোন সাড়া পেলাম না।

শোভাযাত্রার সঙ্গে জিন্নার গাড়ী যেই গবর্ণমেণ্ট হাউসের ফটকে এসে পৌঁছলো জিন্না অমনি মাউণ্টব্যাটেনের হাঁটুর ওপর একটি হাত রেখে আবেগবিগলিত স্বরে বললেন—"থ্যাঙ্ক গড, আমি আপনাকে জীবন্ত ফিরিয়ে আনতে পেরেছি।"

মধ্যাহ্ন হতেই আমরা দিল্লী ফিরে চললাম। করাচী হতে দিল্লী আমাদের বিমান আকাশে সাঁতার দিয়ে চলেছে। নীচের দিকে একবার তাকালাম, আমাদের বিমান তখন পাঞ্জাবের সীমানা অঞ্চলের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে। দেখলাম, এখানে ওখানে যেন বিরাট এক একটা অগ্নিকুণ্ড শিখা বিস্তার করে জ্বলছে। মাইলের পর মাইল, মাটির সৌন্দর্য বীভৎসভাবে জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাচ্ছে। এ আগুনের শিখার মধ্যে ভয়ানক এক অমঙ্গলেরই ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি।

দিল্লী এসেই অতি প্রবল কাজের আবর্তের মধ্যে ডুবে গেলাম। মধ্য রাত্রিতে ১৪ই আগষ্টের শেষ মুহূর্তটি ক্ষয় হয়ে যাবার আগেই ক্ষয় করে দিতে হবে ভারতে ভাইসরয়তন্ত্রের শেষ চিহ্ন। আর এখানে ভাইসরয়ের কাজ নেই, ভাইসরয়তন্ত্রের সব ব্যবস্থার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। এখন এই শিবির ভাঙার কাজটুকুই আমাদের তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে হবে।

সন্ধ্যেও পার হয়ে গেল। সংবাদদাতার দল একে একে আসতে আরম্ভ করেছেন ভারতের এই গবর্ণমেণ্ট হাউসে, এ ভবন এখন আর ভাইসরয় ভবন নয়। সংবাদদাতাদের কাছ থেকে শুনলাম, আইনসভার ভবনে যে অনুষ্ঠান হয়েছে, তাতে প্রচণ্ড ভীড় হয়েছিল। আর একটু রাত্রি হতেই প্রসাদ এবং নেহরু উপস্থিত হলেন, মাউণ্টব্যাটেনকে আনুষ্ঠানিকভাবে গবর্ণর জেনারেলের পদ গ্রহণের প্রস্তাব জ্ঞাপন করার জন্য। সংবাদদাতা ও ফটোগ্রাফারের দল এসে ঘর ভরে ফেললেন। উৎসাহী ফটোগ্রাফারেরা সেই গোলাকার টেবিলটির ওপরে উঠে দাঁড়িয়ে ক্যামেরা ঘোরাতে লাগলেন, যে টেবিল ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বহু আলোচনা ও সিদ্ধান্তের নীরব সাক্ষী।

'আমি আপনাদের প্রদত্ত এ সম্মানে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। নিয়মতান্ত্রিক বিধান অনুসারে আপনাদের উপদেশ পালনে আমি আমার সাধ্যমত সব চেষ্টাই করবো।' আনুষ্ঠানিকভাবেই ভারতের গবর্ণর জেনারেলের পদ গ্রহণ করলেন মাউণ্টব্যাটেন।

প্রসাদ ও নেহরু চলে যাবার আগে, আর একটি ব্যাপার হলো। নেহরু আনুষ্ঠানিক গাম্ভীর্যের সঙ্গেই একটি বড় খাম হাতে নিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাষায় গবর্ণর জেনারেল মাউণ্টব্যাটেনের উদ্দেশে বললেন—'ভারতের নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের ও তাঁদের দপ্তরের নামের তালিকা আমি আপনার হাতে অর্পণ করছি।'

চলে গেলেন প্রসাদ ও নেহরু। নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যপদে যাঁরা মনোনীত হয়েছেন ব'লে মাউণ্টব্যাটেন পূর্বে শুনেছিলেন, ঠিক তাঁদেরই নাম এ তালিকায় আছে কি না, সেটা মিলিয়ে দেখবার ইচ্ছে হ'তেই কৌতূহলী হয়ে এবং সাগ্রহে তিনি খামটি খুললেন। কিন্তু, খাম শূন্য। খামের ভেতরে নূতন মন্ত্রিসভার সদস্যদের নামের কোন তালিকা ছিল না।

নয়াদিল্লী, ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল। দামামার ধ্বনি বেজে উঠলো সকাল সাড়ে আটটায়। লাল ও সোণালী মখমলের উর্দিতে ভূষিত যে বডিগার্ডের দল দামামা ধ্বনির সঙ্গে ও বর্শাফলকের ঝলক তুলে ভারত ইতিহাসের বিশজন ভাইসরয়কে দরবার কক্ষে নিয়ে গেছে, তারাই আজ স্বাধীন ভারতের প্রথম গবর্ণর জেনারেলকে দরবার কক্ষে নিয়ে এল। ভারতের প্রধান বিচারপতি ডাঃ কানিয়ার পৌরোহিত্যে মাউণ্ডব্যাটেনের শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানও সমাপ্ত হলো। সেই লাল মখমলের চন্দ্রাতপের নীচে সোণার সিংহাসনের ওপর আলোর ছটা ছড়িয়ে পড়লো। সেই বিরাট সোণালী কার্পেট, যেন সোণা দিয়ে ঢাকা এক টুকরো ময়দান। লেডি মাউণ্টব্যাটেনের পরিচ্ছদের স্বর্ণঝালর দরবারকক্ষের এই বর্ণবহুল শোভা আরও উদ্দীপ্ত ক'রে তুললো।

এর পর কাউন্সিল হাউসের অনুষ্ঠান। আড়াই লক্ষ উৎসাহমত্ত লোক কাউন্সিল হাউসের কাছে এসে ভিড় করেছে। প্রবেশের পথ পাচ্ছিলেন না মাউণ্টব্যাটেন। নেহরু এবং নেতৃবৃন্দ জনতার চাঞ্চল্য শান্ত করার জন্য এগিয়ে এলেন, ফলে জনতা আরও উল্লাসে বিপুল 'জয় হিন্দ' রবে বাতাস মুখরিত ক'রে আরও চঞ্চল হয়ে উঠলো। যাই হোক্, কাউন্সিল হাউসের অনুষ্ঠানও হলো। বিভিন্ন দেশের অভিনন্দন বাণী এক এক ক'রে পড়ে শোনালেন প্রসাদ। এখানেও গত রাত্রের 'শূন্য খামে'র ঘটনার মত একটা ভুলের ঘটনা ঘটে গেল। সব দেশের অভিনন্দনবাণী পাঠ করলেন প্রসাদ, শুধু ট্রুম্যানের প্রেরিত বাণীটিই পড়তে ভুলে গেলেন। মার্কিণ রাষ্ট্রদূত ডাঃ গ্রেডি চাপা-গলায় চেঁচিয়ে স্মরণ করিয়ে দেবার পর প্রসাদ ট্রুম্যানের বাণী প'ড়ে শোনালেন।

কাউন্সিল হাউসের পর রোশেনারা বাগ। বিভিন্ন স্কুলের প্রায় পাঁচ হাজার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভীড় প্রখর রোদ্রের মধ্যে মাউণ্টব্যাটেনের অপেক্ষায় এখানে বসেছিল। ছেলেমেয়েদের ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন মাউণ্টব্যাটেন। একজন সাপুড়ে খেলা দেখালো। সাপুড়ে তার মুখ এগিয়ে দিয়ে একটা সাপের মাথা কামড়ে ধরতেই বেচারা প্যামেলা ভয়ে শিউরে উঠে প্রায় পালিয়ে যাচ্ছিলেন। প্যামেলার বাবা ও মা অবশ্য এই রোদ ধুলো চীৎকার আর সাপ-খাওয়ার দৃশ্য খুশি মনেই সহ্য করলেন এবং ছেলেমেয়েদের কাছে তাঁদের প্রীতির পরিচয় দিলেন।

রোশেনারা বাগের পর প্রিন্সেস পার্কে পতাকা উত্তোলনের অনুষ্ঠান। পতাকাদণ্ডের চারদিকে তিন লক্ষ লোকের সমাবেশ। হর্ষে উল্লাসে ও আনন্দে চঞ্চল এই জনসমুদ্রে সব জাত শ্রেণী ও ভাষা মিলে একাকার হয়ে গেছে। পতাকাদণ্ডের দিকে মাউণ্টব্যাটেনের গাড়ী অনেক কষ্টে এবং আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে। নেহরু বার বার চীৎকার ক'রে জনতার কাছে আবেদন করছিলেন, মাউণ্টব্যাটেনকে একটু রাস্তা ছেড়ে দেবার জন্য। পতাকাদণ্ড থেকে পঁচিশ গজ দূরে পর্যন্ত এসে মাউণ্টব্যাটেন আর এগুতে পারলেন না। সেখানেই গাড়ীর ওপর দাঁড়িয়ে পতাকা উত্তোলনের অনুষ্ঠান লক্ষ্য করলেন এবং অভিবাদন গ্রহণ করলেন।

পতাকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক হাল্কা বৃষ্টি ঝরে পড়লো এবং আকাশ জুড়ে ফুটে উঠলো একটি রামধনু। পতাকার শ্বেত সবুজ ও গাঢ় গৈরিকের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে দিল স্বাধীন ভারতের প্রথম দিনের আকাশে অভ্যুদিত এই রামধনু। যদি হলিউডের কোন ফিল্মকাহিনীর একটি দৃশ্যে এভাবে নিসর্গের রঙীন ইঙ্গিত মিশিয়ে ছবি

তোলা হতো, তবে আমরা এ অভিযোগ না ক'রে পারতাম না যে, কল্পনার বেশি বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। কিন্তু দিল্লীর আকাশের বাস্তবতা সে কল্পনাকেও ভাবব্যঞ্জনায় ছাড়িয়ে গেছে। যাঁরা বিষন্ন গণকের মত শুধু ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে অন্ধকার দেখতে পাচ্ছেন, স্নিগ্ধ রামধনুর এই নাটকীয় আবির্ভাব প্রমাণ ক'রে দিচ্ছে যে, তাঁরা ভুল করছেন, তাঁদের আশঙ্কা অমূলক। আমার স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই যে, যাঁদের মনের অবিশ্বাসটাই একেবারে লোহার মত কঠিন হয়ে গেছে, তাঁরা ছাড়া আর সকলেই ভারতের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে প্রকৃতির এমন একটি ইঙ্গিতকে ভবিষ্যতেরই একটি কল্যাণের ইঙ্গিত বলে মনে করবেন।

নয়াদিল্লী, শনিবার, ১৬ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল। আজ সকালে পুরানো দিল্লীর লালকেল্লার ওপর কংগ্রেস পতাকা উড়ছে। কেল্লা থেকে আরম্ভ করে মোগল-গরিমার ঐতিহাসিক সাক্ষী বিরাট জুম্মা মসজিদ পর্যন্ত সকল স্থান প্লাবিত করে পাঁচ লক্ষ লোকের জনতা নেহরুর বক্তৃতা শুনলো। কিন্তু সকাল বেলার এই আনন্দের রেশ বিকাল হতেই ফুরিয়ে গেল। আনন্দের বদলে দেখা দিল বিষাদ। র‍্যাডক্লিফের বাঁটোয়ারার ঘোষণা-পত্র নেতাদের হাতে আজই বিকালে সঁপে দিয়েছেন মাউণ্টব্যাটেন।

নেতাদের ছ' ঘণ্টা সময় দিয়েছেন মাউণ্টব্যাটেন, তারই মধ্যে র‍্যাডক্লিফের বাঁটোয়ারার সকল বিষয়, বৃত্তান্ত ও নির্দেশ পাঠ করে ফেলতে হবে নেতাদের। তার পরেই গবর্ণমেণ্ট হাউসের কাউন্সিল কক্ষে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে এক বৈঠকে সম্মিলিত হতে হবে।

লিয়াকৎ দিল্লীতেই রয়েছেন এবং বাঁটোয়ারার ঘোষণা-পত্র তাঁর হাতেও দেওয়া হয়েছে। লিয়াকৎকে এই সময় দিল্লীতে আনতে পেরেছেন, এটাও মাউণ্টব্যাটেনের কম কৃতিত্বের কথা নয়। সদ্য-প্রতিষ্ঠিত পাকিস্থান রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীকে চব্বিশ ঘণ্টাও পার না হতেই ভারতের রাজধানীতে হাজির হতে দিতে জিন্নার আপত্তি ছিল। মাউণ্টব্যাটেনের অনুরোধে জিন্না শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা-কুণ্ঠিতভাবেই রাজী হয়েছেন।

এই বৈঠকে আমিও উপস্থিত ছিলাম। গম্ভীর ও বিষন্ন, একটি বৈঠক। দু পক্ষেরই নেতাদের অভিমতের মধ্যে একটি বিষয়ে শুধু ঐক্য লক্ষ্য করলাম। দু পক্ষই এই বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে নিন্দা ও অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। প্রত্যেক নেতারই মতে এই বাঁটোয়ারায় তাঁর সম্প্রদায়ের সম্পর্কে সুবিচার করা হয়নি।

কিন্তু সকল দলের এই অসন্তোষ ও ক্ষোভের দ্বারাই মাউণ্টব্যাটেনের কাছে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেল। সব নেতাই অসন্তুষ্ট হয়েছেন, এতেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, বাঁটোয়ারা ন্যায়সঙ্গত ও সুবিচারসম্মত হয়েছে। আর একটি নৈতিক সত্যেরও অক্ষুণ্ণতার প্রমাণ পেয়ে গেলেন মাউণ্টব্যাটেন। দু পক্ষই সমান-ভাবে অসন্তুষ্ট হয়েছেন, সুতরাং আরও বেশি করে প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে যে, বাঁটোয়ারায় দু পক্ষেরই প্রতি সুবিচার করা হয়েছে।

বাঁটোয়ারার বিষয় নিয়ে যে সমালোচনা ও বিতণ্ডা শীঘ্রই তুমুল হয়ে উঠবে, আজকের বৈঠকেই তার প্রথম পরিচয় পেয়ে গেলাম। লিয়াকৎ ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হয়েছেন, গুরুদাসপুর জেলাকে কেন পূর্ব-পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত করা হলো? অপর দিকে প্যাটেল ক্রুদ্ধ হয়েছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামকে কোন্ যুক্তিতে পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হলো? আর শিখভূমির বিভক্ত অবস্থা লক্ষ্য করে বলদেব একেবারে নির্বাক ও হতভম্ব হয়ে বসে রইলেন। কিন্তু এই ক্ষোভ সত্ত্বেও কোন নেতাই তাঁদের সমালোচনার তীব্রতাকে এমন স্তরে নিয়ে এলেন না, যার অর্থ এই হতে পারে যে, তাঁরা বাঁটোয়ারাকেই অস্বীকার করছেন। তাঁরা পূর্বেই এই সর্তহীন প্রতিশ্রুতি দিয়ে-ছিলেন যে, বাঁটোয়ারা যেরকমই হোক না কেন, তাঁরা সেটা মেনে নেবেন। এই প্রতিশ্রুতির অন্যথা হবে, নেতাদের মন্তব্যের মধ্যে এমন কোন ইঙ্গিত পেলাম না।

এই বৈঠকেই নেতারা যখন বাঁটোয়ারার প্রসঙ্গ নিয়ে বিব্রতভাবে আলোচনা করছেন, তখনই পাঞ্জাবের এক-একটি সংবাদ এসে পৌঁছতে লাগলো। অত্যন্ত শোচনীয় এক-একটি ঘটনার সংবাদ। পাঞ্জাবের জনসাধারণই এখন আইন-কানুন ও রাষ্ট্রীয় নিয়মতন্ত্রের সব নির্দেশ তুচ্ছ করে নিজের হাতেই ব্যবস্থা করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। এ সংবাদ এই বাস্তব সত্যই রূঢ়ভাবে স্মরণ করিয়ে দিল যে, এখন বিশেষভাবেই সতর্ক হতে হবে এবং এ অবস্থায় সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো বলিষ্ঠ নেতৃত্বের।

জেংকিনস্ ঠিকই বলেছেন, পঞ্চনদীর দেশে পূর্ণ উদ্যমে এবং প্রচণ্ডভাবেই 'ওয়ার অব সাকসেশন' আরম্ভ হয়ে গেছে। অকিনলেক আজ পাঞ্জাবের সাংঘাতিক অবস্থা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নেতাদের দিয়েছেন। রিপোর্ট পেয়ে নেতারা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পাঞ্জাবের সীমানা ফৌজের সৈন্যবল অবিলম্বে বৃদ্ধি করা কর্তব্য।

ওদিকে কলকাতার অবস্থাও কম উদ্বেগপূর্ণ নয়। সেখানেও এই ধরণের 'ওয়ার অব সাকসেশন' যে কোন মুহূর্তে দেখা দেবার বিপজ্জনক সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে ওখানে অতর্কিতভাবে আক্রমণের বিক্ষিপ্ত কতগুলি ছোট ছোট ঘটনা ছাড়া কলকাতায় এখন বড় রকমের কোন অশান্তির ব্যাপার নেই। এদিকের তুলনায় কলকাতাকে সম্পূর্ণভাবে শান্ত বলা যায়। গান্ধী রয়েছেন কলকাতায় এবং তাঁর উপস্থিতির প্রভাবও কলকাতা উপলব্ধি করতে পেরেছে। কলকাতাকে সুস্থ হতে সাহায্য করেছে গান্ধীর উপস্থিতি।

অবস্থাবিশেষে কোন্ কাজ আগে এবং কোন্ কাজ পরে করতে হয়, সে সম্বন্ধে গান্ধীর নিজের একটা প্রখর ঔচিত্যবোধ আছে। অবস্থাবিশেষে কোন্ আচরণ নিতান্তই বিসদৃশ হবে, সে সম্বন্ধেও তাঁর নিজের নীতি অনুযায়ী ধারণা আছে। তাই স্বাধীনতা অনুষ্ঠানের আগেই তিনি রাজধানী দিল্লী ছেড়ে চলে গেছেন। তিনি জানেন, এই সব সরকারী উৎসব ও আনন্দমত্ততার সঙ্গে তিনি নিজেকে খাপ খাইয়ে এ-অনুষ্ঠানকে সাহায্য করার মত কোন কাজের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবেন না। তিনি অনুভব করেছেন, ভারতের পূর্বাঞ্চলেই এখন তাঁর অনেক প্রয়োজনীয় কর্তব্য অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে আছে। কলকাতায় গিয়ে ১৩ই আগষ্ট তারিখেই গান্ধী অখণ্ড বঙ্গের শেষ প্রধান মন্ত্রী শাহিদ সুরাবর্দিকে নিজের কাছে আহ্বান করেছেন, সহযোগী হয়ে কাজ করার জন্য। সুরাবর্দি হলেন বেশ সৌখীন ও সুখের জীবনে অভ্যস্ত মানুষ। কিন্তু গান্ধী তাঁকে ডেকেছেন, অস্পৃশ্যদের একটি পাড়ার মধ্যে ক্ষুদ্র একটি ঘরে থেকে গান্ধীর সঙ্গে এক-যোগে সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করার জন্য। সেই রাত্রেই একদল হিন্দু যুবক গান্ধীর ঘরে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে চলে গেল।

১৩ই তারিখের এই ঘটনার পর গান্ধীও ঠিক করে ফেলেছিলেন যে, ১৫ই আগষ্টের স্বাধীনতার দিনটিকে তিনি কিভাবে যাপন করবেন। গতকাল যখন সারা ভারত উৎসব করেছে, তখন গান্ধী উপবাস করে দিন কাটিয়েছেন।

পাঞ্জাবের সাংঘাতিক অবস্থা লক্ষ্য করে নেহর ও লিয়াকৎ এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, তাঁরা দুজনেই একসঙ্গে প্রথমে আম্বালা যাবেন. তার পর যাবেন অমৃতসরে। অবস্থা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করে তাঁরা সমগ্র সমস্যা বিবেচনা করবেন এবং কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, সে সম্বন্ধেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সেখানেই করে ফেলবেন।

বোম্বাই, রবিবার, ১৭ই আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল। গবর্ণর-জেনারেল মাউণ্ট-ব্যাটেন বোম্বাইয়ে এসেছেন। ভারত হতে বৃটিশ বাহিনী সরে যাচ্ছে। তাদেরই প্রথম দলকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে এসেছেন মাউণ্টব্যাটেন। জেটিতে সৈন্য-বাহী জাহাজ 'জর্জিক' অপেক্ষা করছিল এবং নরফোক রেজিমেণ্টের একটি দল দাঁড়িয়েছিল বিদায় নেবার জন্য। অল্প অল্প বৃষ্টির মধ্যে ভারতে নরফোক রেজিমেণ্টের শেষ প্যারেডও হয়ে গেল। ছোট একটি কাঠের বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে মাউণ্টব্যাটেন বক্তৃতা দিলেন। নেহরুর প্রেরিত একটি আন্তরিক বিদায়-বাণী পাঠ করলেন কারিয়াপ্পা।

নরফোক রেজিমেণ্ট তাঁদের পতাকা নামিয়ে এবং গুটিয়ে নিয়ে দেশে ফিরে চললেন। সৈনিকের খাকি পরিচ্ছদে ভূষিত মাউণ্টব্যাটেন বক্তৃতার সময় বৃষ্টিতে ভিজছিলেন। কিন্তু তাঁর বক্তৃতার মধ্যে উৎসাহপূর্ণ উদ্দীপনার কোন অভাব হলো না। পতাকা গুটিয়ে ভারত হতে চলে যাবার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সে প্রতিশ্রুতি পালন করা হচ্ছে। মাউণ্টব্যাটেন চাইছেন, যাবার সময় সম্মান, শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা অটুট রেখেই আমরা যেন বিদায় নিতে পারি। কারিয়াপ্পা যখন নেহরুর বাণী পাঠ করছিলেন, তখন মনে হচ্ছিল, ভারতের মনোভাব ও ধারণার কত বড় পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে, এ-বাণীতে যেন তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।

নয়াদিল্লী, বুধবার, ২০শে আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল। নেহরু এবং লিয়াকৎ আম্বালা থেকে অমৃতসর পেঁছে শান্তি স্থাপনের জন্য একটি সনির্বন্ধ আবেদন প্রচার করেছেন। এক বেতার-বক্তৃতায় নেহরু বলেছেন যে, দুই পাঞ্জাব গবর্ণ-মেণ্টই শান্তি স্থাপনের জন্য ভারত ও পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টদ্বয়ের সাহায্য গ্রহণ করে এই 'নিদারুণ উন্মত্ততার' অবসান ঘটাবার সংকল্প করেছেন। নেহরু আরও বলেছেন—'ভারত সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র নয়, ভারত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার। নাগরিকের এই অধিকার রক্ষায় গবর্ণমেণ্ট দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবেই কাজ করে যাবেন।'

শরণার্থীর সমস্যা এরই মধ্যে প্রবল রূপ ধারণ করেছে। আনুমানিক হিসাব অনুসারে প্রায় দু' লক্ষ নরনারী কতগুলি বে-বন্দোবস্ত আস্তানায় গাদাগাদি হয়ে পড়ে আছে এবং শিবির আখ্যাত এই সব আস্তানায় থাকবার ব্যবস্থা এমনই শোচনীয় যে, অতি ব্যাপক ও ভয়ানক-ভাবে কলেরার আক্রমণ যে কোন মুহূর্তে দেখা দিতে পারে।

নয়াদিল্লী, সোমবার, ২৫শে আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল। আজকের যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের বৈঠকে মাউণ্টব্যাটেনকে একটা কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সীমানা ফৌজের সম্পর্কে দুই গবর্ণ-মেণ্টের মনে যে সব আপত্তি প্রবল হয়ে উঠেছে, সে খবর জানতেন মাউণ্টব্যাটেন। দুই গবর্ণ-মেণ্টের ইচ্ছা, সীমানা ফৌজ অবি-লম্বে ভেঙে দেওয়া হউক। দুই গবর্ণ-মেণ্টই নিজের নিজের এলাকায় স্বতন্ত্র-ভাবে নিজেরই প্রধান সেনাপতির প্রত্যক্ষ দায়িত্বে পরিচালিত দুই ফৌজ নিয়ে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করতে চান। তাঁদের মতে, দুই রাষ্ট্রের সৈন্য নিয়ে এরকম একটা সম্মিলিত কম্যাণ্ডের এখন আর কোন অর্থ হয় না। দুই পক্ষই স্বতন্ত্র-ভাবে নিজ নিজ এলাকায় নিজেদের কম্যাণ্ড স্থাপন করতে ইচ্ছুক। মাউণ্ট-ব্যাটেন এ বৈঠকে আসবার পূর্বেই জানতেন যে, সীমানা ফৌজ ভেঙে দেবার প্রস্তাব অকিনলেক এবং রীস, দু'জনের কেউই সমর্থন করবেন না। সামরিক অধি-নায়ক ও নায়কের অভিমত যাই হোক, এ ধরণের প্রস্তাব স্বয়ং মাউণ্টব্যাটেনেরও মতের বিরোধী। সুতরাং, পরিষদের বৈঠকে এসে তিনি সমস্ত আলোচনাকে এই প্রসঙ্গ থেকে দূরে রাখতেই চেষ্টা করলেন। আলোচনাও অন্য প্রসঙ্গের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু পাকিস্থানের প্রতি-নিধিরূপে উপস্থিত চুন্দ্রিগড়কে ঠেকাতে পারলেন না মাউণ্টব্যাটেন। চুন্দ্রিগড় হঠাৎ সীমানা ফৌজ সম্পর্কে কতগুলি অত্যন্ত আপত্তিজনক মন্তব্য করে বসলেন।

চুন্দ্রিগড়ের এ আচরণ মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে সহ্য করা খুবই কঠিন হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ আগেই মাউণ্টব্যাটেন উপস্থিত সদস্যদের উদ্দেশ করে এই অনুরোধ করেছিলেন যে, বর্তমান অবস্থায় নেতা-দের পক্ষ থেকে সীমানা ফৌজের অফিসার ও সৈনিকদের সম্পর্কে একটু প্রশংসাবাণী ঘোষিত হওয়া দরকার। সীমানা ফৌজের ওপর দুরূহ কাজের ভার পড়েছে এবং পাঞ্জাবের যে ধরণের অশান্তি দমনের জন্য তাদের চেষ্টা করতে হচ্ছে, সেটা তাদের মনোবল, নিষ্ঠা ও উৎসাহের একটা কঠিন পরীক্ষার ব্যাপার। এই অবস্থায় তাদের উৎসাহ ও মনোবল অটুট রাখবার জন্য একটু প্রশংসাসূচক উৎসাহ-বাক্যেরই প্রয়োজন। যদি সীমানা ফৌজের পেছনে গবর্ণমেণ্টের যথোপযুক্ত সমর্থন না থাকে, তবে অবশ্য ফৌজকে সরিয়ে দেওয়াই কর্তব্য হবে। কিন্তু এর ফলে যে রক্তারক্তি ব্যাপার আরম্ভ হবে, তার জন্য দোষের ভাগী হতে হবে তাঁদেরই, যাঁদের দাবীতে ফৌজ ভেঙে দেওয়া হবে। মাউণ্টব্যাটেন তাঁর বক্তব্য বলতে বলতে হঠাৎ চুন্দ্রিগড়ের দিকে তাকিয়ে অভিভাবকের মতই ভঙ্গীতে ধমক দিলেন—'আপনার এ ধরণের কথা-গুলি যদি আপনার গবর্ণর-জেনারেলের কাণে যায়, তবে তিনি আপনাকে কি বলবেন, সেটা ভাবতেও আমার ঘেন্না হচ্ছে।'

বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে, সীমানা ফৌজ সম্বন্ধে একটা বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হবে। বিজ্ঞপ্তি রচনার ভার পড়লো ভের্নন ও আমার ওপর। সমস্ত বিকালটাই হার্ডিঞ্জ এভেনুয়ে পাক-হাই-কমিশনারের অফিসে এবং সেক্রেটারিয়েটে নেহরুর অফিসে দৌড়া-দৌড়ি করেই কেটে গেল। বিজ্ঞপ্তির মধ্যে একটা কথা উল্লেখ করবার জন্য খুব জেদ ধরলেন চুন্দ্রিগড়। সীমানা ফৌজ যদি ভবিষ্যতে কর্তব্যের ত্রুটি করে, তবে ফৌজের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে—এই ধরণের একটি মন্তব্য বিজ্ঞপ্তির মধ্যে রাখতে চাইছিলেন চুন্দ্রিগড়। আমরা বিজ্ঞপ্তির মধ্যে কঠোর উক্তি বর্জন করে একটু মৃদুভাবেই অবশ্য একটি মন্তব্য করে রেখেছিলাম—'বিশেষ বিশেষ এবং অল্পসংখ্যক কয়েকটি ঘটনার কথা বাদ দিয়ে অবশ্যই বলা যায় যে, সীমানা ফৌজ তাঁদের কর্তব্য ভাল-ভাবেই করে যাচ্ছেন।'

যাই হোক, আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত চুন্দ্রিগড়ের প্রস্তাবিত কঠোর মন্তব্যটি বাদ দিয়েই বিজ্ঞপ্তি রচনা করতে সক্ষম হলাম। সমস্ত ঘটনা থেকে এই শিক্ষাই পাওয়া যাচ্ছে যে, দুই গবর্ণমেণ্টকেই দুরূহ কর্তব্য পালনে নিযুক্ত সৈন্যবাহিনী সম্বন্ধে তাঁদের মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে, যদি

দেশের মধ্যে সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহ দেখবার ইচ্ছা তাঁদের না থাকে। রাষ্ট্রের শান্তি ও শৃঙ্খলার কাজে নিযুক্ত লোকের বিরুদ্ধে নিন্দা ও লোষ্ট্র নিক্ষেপ করার দিন আর নেই।

নয়াদিল্লী, ২৫শে আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল। গবর্ণমেণ্ট হাউসে ফিরে আসতেই মাউণ্টব্যাটেন একখানি চিঠি দেখালেন। মঙ্কটন জানিয়েছেন, তিনি নিজামের উপদেষ্টার পদে ইস্তফা দিয়েছেন, যদিও তিনি এখনও নিজামের আস্থাভাজন হয়েই আছেন। মঙ্কটন লিখেছেন, তিনি এখন আর গবর্ণমেণ্ট হাউসে থাকতে ইচ্ছা করেন না। কারণ, ইস্তফা দেবার পরেও এখানে থাকলে ব্যাপারটা লোকের চোখে ভাল ঠেকবে না এবং অনেকে তাঁকে ভুল বুঝতেও পারে। সংবাদটা মাউণ্টব্যাটেনের ওপর একটা আঘাতের মতই এসে পড়েছে। মাউণ্টব্যাটেন বললেন—আমরা ডুবলাম!

গত জুলাই মাস থেকেই হায়দরাবাদ ও ভারত গবর্ণমেণ্টের মধ্যে আলোচনা চলে আসছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর হায়দরাবাদের সঙ্গে ভারতের কি ধরণের সম্পর্ক স্থাপিত হবে, এই দুরূহ বিষয়টি নিয়ে যাবতীয় আলোচনার ব্যাপার এতদিন ধরে যে চলেছে, তার মূলে রয়েছে মঙ্কটনের প্রতিভা। নিজামের প্রতিনিধি দলের মধ্যে মঙ্কটন এতকাল ছিলেন বলেই এবং তাঁর পরামর্শের সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল বলেই আলোচনাও এতখানি অগ্রসর হতে পেরেছে। ১২ই আগষ্টে পৌঁছেও মাউণ্টব্যাটেন যখন দেখলেন যে, মীমাংসার সম্ভাবনার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, তখন তিনি হায়দরাবাদের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থার সুযোগ করে দিলেন। নিজামকে আরও দু'মাস সময় দিলেন মাউণ্টব্যাটেন। পনরই আগষ্টের পরেও দু'মাসের মধ্যে যে কোন দিন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবার প্রস্তাব করতে পারবেন নিজাম এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট সে প্রস্তাব গ্রহণ করবার জন্য দু'মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। মাউণ্টব্যাটেন আমাদের বললেন যে, যদিও তিনি এখন আর ইংলণ্ড-রাজের প্রতিভূ নন, তবুও ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁকে নিজামের সঙ্গে আলোচনা করবার অধিকার দিয়েছেন। বেরার অঞ্চল সম্পর্কেও একটি ব্যবস্থায় ভারত গবর্ণমেণ্টকে রাজী করাতে পেরেছেন মাউণ্টব্যাটেন। বেরার এখন যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থাতেই থাকবে, এখন বেরারের রাজনৈতিক ভিত্তির কোন নড়চড় করা হবে না। বেরার যদিও আইনতঃ নিজামেরই রাজ্যের অংশ, কিন্তু বেরার এতকাল মধ্যপ্রদেশের গবর্ণরের দ্বারাই শাসিত হয়ে এসেছে। আপাততঃ এই ব্যবস্থাই অক্ষুণ্ণ থাকবে। এ ছাড়া ভি পি মেননের সঙ্গে পরামর্শ করার পর মাউণ্টব্যাটেন আর একটি বিষয় স্পষ্ট করে নিয়েছেন। বর্তমান অবস্থায় রাষ্ট্রভুক্তির সিদ্ধান্ত না করে হায়দরাবাদ ভারত ডোমিনিয়নের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক আচরণের প্রমাণ দিয়েছে, ভারত গবর্ণমেণ্ট এরকম কোন ধারণা করবেন না, এই আশ্বাস নিজামকে এখন দিতে পারবেন মাউণ্টব্যাটেন। কারণ একটা বিষয় নিঃসংশয়ভাবেই তিনি জেনে নিয়েছেন যে, হায়দরাবাদকে অর্থনৈতিক অবরোধের দ্বারা কূটনৈতিক চাপ দেবার কোন ইচ্ছাই ভারতীয় নেতাদের নেই।

কথা ছিল, আজকেই হায়দরাবাদ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে নতুন করে আলোচনা আরম্ভ হবে। মঙ্কটনের চিঠি পেয়ে ভি পি মেননকে ডেকে পাঠালেন মাউণ্টব্যাটেন এবং এই 'নতুন অবস্থা' সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করলেন। এই সময় সীমানা ফৌজের সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি তৈরীর বাকী কাজটুকুর জন্য আমরা বেরিয়ে গেলাম। যখন ফিরে এলাম, তখন দেখি নিজামের কাছ থেকেই মাউণ্টব্যাটেনের কাছে একটি টেলিগ্রাম পৌঁছেছে। নিজাম মাউণ্টব্যাটেনকে অনুরোধ করেছেন যে, মঙ্কটনের সঙ্গে দেখা করে মাউণ্টব্যাটেন যেন তাঁকে বুঝিয়ে বলেন যে, এসময় পদত্যাগ করা তাঁর উচিত হচ্ছে না। নিজাম একথাও জানিয়েছেন যে, মঙ্কটন যদি এসময় চলে যান তবে তাঁর স্থানে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা এখন তাঁর পক্ষে খুবই দুরূহ হবে।

এই সময় উপস্থিত হলেন স্বয়ং মঙ্কটন। মঙ্কটন বললেন, হায়দরাবাদের চরমপন্থী মুসলিম সঙ্ঘ ইত্তেহাদ-উল-মুসলিমিন তাঁর বিরুদ্ধে হায়দরাবাদের সংবাদপত্রগুলিতে অত্যন্ত হিংস্র ধরণের যে প্রচারকার্য চালাতে আরম্ভ করেছেন, তারই জন্যে তিনি পদত্যাগ করেছেন। মঙ্কটন বললেন, ঠিক এই একই কারণে প্রতিনিধিদলের অন্যান্য দু'জন সদস্যও (নিজামের প্রধান মন্ত্রী ছত্তারির নবাব এবং নিজামের নিয়মতন্ত্র বিষয়ক মন্ত্রী) প্রতিনিধিদল তথা ডেলিগেশনের সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন। ছত্তারির নবাবের পদত্যাগপত্র নিজাম গ্রহণ করেননি। মঙ্কটন বললেন, তিনি পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করতে রাজী আছেন, যদি তার আগে ইত্তেহাদ প্রকাশ্যভাবে তাঁদের বিবৃতি প্রত্যাহার করেন।

মঙ্কটন মাউণ্টব্যাটেনকে জানালেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে তিনি নিজামকে অন্ততঃ এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর করিয়ে আনতে পেরেছিলেন যে, নিজাম ভারত গবর্ণমেণ্টের কাছে বিশেষ ধরণের একটি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হবার প্রস্তাব করতে রাজী হয়েছিলেন। দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা, এই তিনটি বিষয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অধিকার স্বীকার করে নিতে নিজাম রাজী হয়েছিলেন। তাৎপর্যের দিক দিয়ে বস্তুতঃ রাষ্ট্রভুক্তিরই সমান, অথচ নামের দিক দিয়ে ভিন্নতর একটা সম্পর্ক স্থাপনে নিজামকে রাজী করাতে তিনি পারতেন। 'রাষ্ট্রভুক্তির চুক্তিপত্র' নামটার বদলে 'সম্পর্কের ঘোষণাপত্র' নাম দিয়ে একটা শ্রুতিমধুর ব্যবস্থা করলেই কাজ হয়ে যাবে ব'লে মঙ্কটন ধারণা করেছিলেন।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন, কিন্তু এখানেই অসুবিধা আছে। নিজামের বেলায় একটা নতুন ধরণের কোন সম্পর্ক অথবা সম্পর্কের চুক্তিপত্র মেনে নিতে রাজী হলে অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের বিরুদ্ধে অবিচার ও অমর্যাদা করা হবে, প্যাটেল অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে এই অভিমত পোষণ করেন। প্যাটেল মনে করেন, নিজামের সঙ্গে ভিন্ন ধরণের একটা সম্পর্ক স্থাপন করলে রাষ্ট্রভুক্তির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরকারী অন্যান্য রাজন্যদের প্রতি বস্তুতঃ বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করা হবে।

মাউণ্টব্যাটেন মঙ্কটনকে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, মঙ্কটন যদি নিজামকে রাজী করাবার ব্যাপারে সাহায্য করেন, তবে তিনি নিজামের জন্য একটা নতুন ধরণের সম্পর্কের ব্যবস্থা অনুমোদন করবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টকেও রাজী করাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। নতুন সম্পর্ক বলতে সম্পূর্ণভাবেই নতুন একটা সম্পর্ক অবশ্য বুঝাবে না, এ সম্পর্ক মূলতঃ এবং মোটামুটিভাবে রাষ্ট্রভুক্তিরই অনুরূপ সম্পর্ক হবে।

আজই খবর পেলাম, ভোপাল রাষ্ট্রভুক্তির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দান করেছেন। সিদ্ধান্ত করার জন্য ভোপালকে অতিরিক্ত দশ দিন সময় দেওয়া হয়েছিল। মাউণ্টব্যাটেন মন্তব্য করলেন—দেখতে পাচ্ছি, ১৫ই আগষ্টের আগে যে তাড়াহুড়োর মধ্যে উদ্ব্যস্ত হতে হয়েছিল, আবার সেই ধরণেরই অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়তে হচ্ছে।

নয়াদিল্লী, বুধবার, ২৭শে আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল। মাউণ্টব্যাটেন তাঁর শয়ন-কক্ষে ব'সেই ভি পি ও আমার সংগে একটা অতি জরুরী বিষয়ে আলোচনা করলেন। পাঞ্জাব সীমানা ফৌজের বিরুদ্ধে ভারতীয় সংবাদপত্রে অভিযোগের তুফান চলছে। হিন্দুস্থান টাইমসের দেবদাস গান্ধী এবং নিউজ ক্রনিকেলের সাহানিকে ডেকে পাঠালেন মাউণ্টব্যাটেন।

বিকাল চারটার সময় সম্পাদকদ্বয় এলেন। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, দেশের সৈনিকদের বিরুদ্ধে সোজাসুজি কোনরূপ আক্রমণমূলক সমালোচনা করা উচিত নয়, কারণ সৈনিকেরা এসব সমালোচনার উত্তর দিতে পারে না। যদি সৈনিকেরা প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভ করে, তা'হলে দেশে মেক্সিকোর দশা দেখা দেবে, যেখানে প্রতিবাদকারী সৈনিক সম্পাদকদের শেষ ক'রে দিয়ে থাকে। মাউণ্টব্যাটেন প্যালেস্টাইনের উদাহরণ উল্লেখ ক'রে বললেন যে, প্রত্যেক দেশে সাধারণতঃ প্রত্যক্ষভাবে সৈনিকদের অথবা সামরিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন না ক'রে সমর বিভাগেরই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মন্ত্রিসভার অথবা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিদপ্তরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও সমালোচনা করা হয়ে থাকে। প্যালেস্টাইনে জেনারেল বার্কার যা করছেন, তার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের যা বলবার সেটা সামরিক মন্ত্রিদপ্তরের সেক্রেটারী এবং মন্ত্রীর বিরুদ্ধেই বলা হচ্ছে, প্রত্যক্ষভাবে জেনারেল বার্কারকে আক্রমণ ক'রে কোন সমালোচনা করা হচ্ছে না।

এর পর মাউণ্টব্যাটেন পাঞ্জাবের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করলেন। পাঞ্জাবে কি ব্যাপার চলছে, তারই বর্ণনা ক'রে মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, ৩রা জুনের আগেই জ্ঞানী কর্তার সিং এবং তারা সিং তাঁকে বলেছিলেন যে, শিখেরা সময় উপস্থিত হলেই আক্রমণ আরম্ভ করবেন। সেই পরিকল্পিত আক্রমণ এখন শিখেরা আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। তারা সিং ও কর্তার সিংকে মাউণ্টব্যাটেন বুঝিয়েছিলেন যে, তাঁরা যে সময় আক্রমণ আরম্ভের পরিকল্পনা করেছেন, সে সময়ে ব্রিটিশেরা ভারতে থাকবে না। সুতরাং এ ধরণের আক্রমণ বস্তুতঃ ভারতীয় বনাম ভারতীয়ের সংঘর্ষেরই ব্যাপার হয়ে উঠবে। কিন্তু শিখ নেতারা মত বদলান নি এবং তাঁরা বলেছিলেন যে, ব্রিটিশ যতদিন না চলে যায় ততদিন তাঁরা শুধু প্রতীক্ষা করবেন এবং একবার চলে গেলেই হয়।

পাঞ্জাবের অবস্থা এখন আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। আড়াই শত মাইল দীর্ঘ এবং দুইশত মাইল বিস্তৃত একটি অঞ্চল, আকারে ওয়েল্‌সের সমান, এরই মধ্যে এক কোটি মানুষ ঘর ছেড়ে পথে বের হয়ে পড়েছে দেশান্তরে যাবার জন্য। পূর্ব পাঞ্জাবের পুলিশের শক্তিও বর্তমানে শোচনীয়ভাবে দুর্বল হয়ে রয়েছে। মুসলমান পুলিশেরা সকলেই পাকিস্থানে চলে যাওয়ায় পূর্ব পাঞ্জাবে এখন পুলিশের সংখ্যা মাত্র সাত হাজারে দাঁড়িয়েছে। শান্তিরক্ষার সরকারী ব্যবস্থার এই আকস্মিক হ্রাসপ্রাপ্তি পূর্ব পাঞ্জাবের বিপদকেই অবাধ হয়ে উঠবার সুযোগ দিয়েছে।

নয়াদিল্লী, বৃহস্পতিবার, ২৮শে আগষ্ট, ১৯৪৭। ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউর এবং লেডি মাউণ্টব্যাটেন সাম্প্রদায়িক হিংসায় উন্মত্ত অঞ্চলের অভ্যন্তরভাগ পরিভ্রমণ করে ফিরে এসেছেন। শরণার্থীদের বারটি শিবির ও কেন্দ্র, সাতটি হাসপাতাল এবং অন্যান্য চিকিৎসা কেন্দ্র তাঁরা পরিদর্শন করেছেন। পূর্ব পাঞ্জাব এবং পশ্চিম পাঞ্জাব, দুই প্রদেশেরই দুই গবর্ণর এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক সরকারী কর্মচারীর সংগে তাঁরা আলোচনাও করেছেন। বিপদ তুচ্ছ করে, অশান্তি ও হাংগামার এক ভয়ানক মুহূর্তেই তাঁরা বস্তুতঃ এক আর্তনাদমুখর ও যন্ত্রণাকাতর অঞ্চলে সেবা ও মমতার বাণী নিয়ে তাঁদের নির্ভীক অভিযাত্রা সমাপন করে ফিরে এসেছেন।

রাজকুমারী অমৃত কাউর হলেন কাপুরথলার রাজ-পরিবারের মেয়ে। ধর্মে খৃস্টান এবং মহাত্মার অন্তরংগ শিষ্য সমাজের অন্যতমা। অত্যন্ত কোমল প্রকৃতির মানুষ এই রাজকুমারীর মুখের ওপর একটা বিষাদমেদুর অবসাদের ভাব দেখা যায়, কিন্তু এটা বিষণ্ণ মুখোসের মত বাইরের একটা আবরণ মাত্র। ঐ আবরণের আড়ালে কঠিন ও দুর্দম্য একটি প্রতিজ্ঞা লুকিয়ে রয়েছে। স্বাধীন ভারতের প্রথম মহিলা মন্ত্রিরূপে কার্যভার গ্রহণের পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁকে নিপীড়িত মানুষের সেবাব্রতের যে দায়িত্ব নিতে হয়েছে তার তুলনা হয় না। যুদ্ধ-নিপীড়িত পৃথিবীতে শত শত অবরোধ শিবিরে নির্বাসিত এবং লক্ষ লক্ষ দেশচ্যুত মানুষকে বিরাট এক দুর্দশার অভিশাপ বহন করতে হয়েছে। কিন্তু মানুষের এই দুর্দশার যুগেও রাজকুমারীকে আজ সরকারী কর্তব্য হিসাবে পাঞ্জাবভূমির মানুষের যে দুর্দশার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, আকারে প্রকারে ও ভয়ঙ্করতায় তার তুলনা নেই।

লেডি মাউণ্টব্যাটেনের প্রাইভেট সেক্রেটারী মুরিয়েল ওয়াটসনও পাঞ্জাব পর্যটনে এ'দের সংগেই ছিলেন। গত পরশু দিন তাঁরা জলন্ধর ও অমৃতসরে ছিলেন। মুরিয়েল বললেন, এই দুটি সহরকেই নিস্তব্ধ মৃতের সহর বলে মনে হলো। লেডি মাউণ্টব্যাটেন এবং রাজ-কুমারী যখন হাসপাতাল ও শরণার্থীদের শিবিরগুলি পরিদর্শন করে ফিরছিলেন তখনই তাঁরা একটা বর্বরোচিত আক্রমণের সংবাদ শুনতে পেলেন। শিয়ালকোট থেকে অমুসলমান শরণার্থীদের নিয়ে একটি লরী আসছিল। আসবার পথে শরণার্থীদের অতি হিংস্রভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হাসপাতালে গিয়ে আক্রান্ত ও আহত শরণার্থীদের অবস্থা দেখলেন লেডি মাউণ্টব্যাটেন। বীভৎসভাবে জখম করা দেহ নিয়ে শরণার্থীরা পড়ে রয়েছে।

সকাল সাড়ে দশটার সময়ে মাষ্টার তারা সিংকে ডেকে এনে নিভৃতে আলোচনা করলেন লেডি মাউণ্টব্যাটেন। শঙ্কিত তারা সিং কাঁপছিলেন। যে ক্রোধোন্মত্ততাকে তিনিই প্ররোচিত করে এবং বল্‌গা খুলে ছেড়ে দিয়েছেন, তারই প্রতিক্রিয়া ও পরিণামের রূপ দেখে তিনি আজ আতঙ্কে কাঁপছেন।

শিয়ালকোট, রাওয়ালপিণ্ডি এবং গুজরাঁওয়ালা পরিভ্রমণ করে আজ দিল্লী ফিরেছেন লেডি মাউণ্টব্যাটেন।

সিমলা, ৩০শে আগষ্ট, ১৯৪৭ সাল। এবার যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের বৈঠক হয়েছে লাহোরে। সভাপতি হিসাবে মাউণ্টব্যাটেনও বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলেন। এ বৈঠকে জিন্নার যোগদানের কোন কথা ছিল না, কিন্তু সকলকে আশ্চর্য করে দিয়ে জিন্নাও এই বৈঠকে যোগদান করলেন।

আলোচনাও অনেকক্ষণ ধরে চললো। তারপর পরিষ্কার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গেল যে, সীমানা ফৌজ ভেংগে দেওয়াই হবে।

দুই গবর্ণমেণ্ট এবং দুই রাষ্ট্রেরই সংবাদপত্র যখন আর সীমানা ফৌজ রাখবার ব্যবস্থা আন্তরিকভাবে সমর্থন করতে পারছেন না, তখন এ ব্যবস্থা রাখবার আর কোন যৌক্তিকতা নেই। আর একটা কারণ ছিল। সীমানা ফৌজের সৈনিকেরা অবশ্যই যথেষ্ট অভিজ্ঞ কর্ম-

দক্ষ এবং সামরিক নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি নিষ্ঠাশীলও ছিল। কিন্তু এটা বুঝতে পারা গেছে যে, সামরিক নিয়মানুগত্যের চেয়ে সাম্প্রদায়িক আনুগত্যের দিকেই সৈনিকেরা এখন বেশী টান অনুভব করতে আরম্ভ করেছে। অতি দুরূহ ও অসাধারণ রকমের দায়িত্ব পালনে রীস তাঁর সাধ্যমত যে চেষ্টা করেছেন, তার জন্য দু'পক্ষের কোন পক্ষ থেকেই রীসের কপালে বিশেষ কিছু ধন্যবাদ জুটলো না।

পাঞ্জাব সীমানা ফৌজ ভেঙে দেওয়া হলো, সুতরাং সীমানা ফৌজের ওপর যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের কর্তৃত্ব এখানেই শেষ হয়ে গেল। এই সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনেরও শেষ 'এক্‌জিকিউটিভ' দায়িত্ব এখানেই শেষ হলো। শাসনিক বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে কার্যপরিচালনার এই একটিমাত্র দায়িত্ব-ভারই তিনি গ্রহণ করেছিলেন, সে দায়িত্বের অবসান হয়ে গেল।

মাউণ্টব্যাটেন এখন একটি বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট করে নিয়েছেন। নিয়মতন্ত্র অনুসারে তার যে সব দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা রয়েছে, তার বাইরে তিনি যাবেন না। গবর্ণমেণ্ট তাঁদের বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করে যাবেন। অবস্থা বুঝে যে ব্যবস্থা সব চেয়ে আগে করণীয় বলে গবর্ণমেণ্টের মনে হবে, প্রশাসনিক দায়িত্ব হিসাবে গবর্ণমেণ্ট সেটা অবশ্যই করবেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এই সব দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ এবং সাময়িক প্রয়োজনের নানারকমের ব্যবস্থাপক উদ্যোগের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে চান না মাউণ্টব্যাটেন। তিনি ঠিক করেছেন, গবর্ণর জেনারেল হিসাবে বিশুদ্ধ নিয়মতান্ত্রিক দায়িত্ব পালনের যে পরিকল্পনা তিনি পূর্বেই করে রেখেছেন, এবার থেকে মাত্র সেই দায়িত্বক্ষেত্রেই তাঁর পালনীয় কাজটুকু করে যাবেন। তার আগে একবার সিমলা গিয়ে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসবেন। তাই সিমলাতে এসেছেন, একটু বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন মাউণ্টব্যাটেন।

ইস্‌মেও বিশ্রামের জন্য কাশ্মীর গিয়েছেন। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন একটা কাজের ভার চাপিয়ে দিয়েছেন ইস্‌মের ওপর। কাশ্মীর মহারাজের সঙ্গে ইস্‌মেকে দেখা করতে বলেছেন মাউণ্ট-ব্যাটেন। মহারাজাকে বলতে হবে যে, আর এদিক ওদিক না করে এইবার মহারাজাকে মন স্থির করে ফেলতে হবে। মহারাজা ও কাশ্মীরের জনসাধারণ যে ডোমিনিয়নে যোগদান করতে ইচ্ছা করেন, অবিলম্বে সে ডোমিনিয়নে যোগদান করে ফেলতে হবে। কাশ্মীরকে এইভাবে আর বিপজ্জনক সম্ভাবনা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝুলিয়ে রাখা উচিত হবে না। অতি দ্রুত এই অনিশ্চিত অবস্থার অবসান বাঞ্ছনীয়।

সিমলা, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল। সিমলা এসে আমাদের বিশ্রামের একটি সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। কিন্তু এই বিশ্রামের মধ্যেই বিচলিত হবার মত কতকগুলি সংবাদ পেয়ে যাচ্ছি এবং তাই নিয়েই চিন্তিত হয়ে রয়েছি। একদিকে ভারত গবর্ণমেণ্ট ও তাঁদের অফিসারবর্গ, অপরদিকে বৈদেশিক সংবাদদাতার দল—এই দু'য়ের মধ্যে একটা মতভেদ ও মন কষাকষির ভাব প্রবল হয়ে উঠেছে। না ভেবে-চিন্তে প্রসঙ্গের মধ্যে হঠাৎ যে-ধরণের এক একটা কথা বলে বসেন নেহরু, সেই ধরণেরই একটি উক্তির ফলে এই কাণ্ডটা আরও জোর বেধে উঠেছে। জনৈক বৈদেশিক সংবাদদাতার প্রেরিত এমন একটি রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, সেটা নেহরু খুবই আপত্তিজনক মনে করেছেন। রিপোর্টের সঙ্গে সংবাদ-দাতার নামেরও কোন উল্লেখ নেই। এই বিশেষ একটি রিপোর্টকে উপলক্ষ্য করে নেহরু সকল বৈদেশিক সংবাদদাতাকেই সাধারণভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন। এর ফলে বৈদেশিক সংবাদদাতাদের মনে এই সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে, ভারত গবর্ণ-মেণ্ট সংবাদ সেন্সর করবার ব্যবস্থা করবেন। আর, সরকারী কর্মচারীদের মনে যে বৈদেশিকাতঙ্ক আগের থেকেই ছিল, সেটা এবার তাঁদের আচরণে ভাল-ভাবেই ফুটে উঠেছে। অনেক বৈদেশিক সংবাদদাতা এই অভিযোগ করেছেন যে, যদিও তাঁদের ওপর প্রতিশোধ তুলবার মত কোন কাজ ভারত গবর্ণমেণ্ট করছেন না, কিন্তু যেটা করছেন সেটা ভয় দেখাবার একটা ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়।

মাউণ্টব্যাটেন আজ বিকালে বললেন, ভি পি মেনন একটা জরুরী বার্তা জানিয়ে টেলিফোন করেছেন। মাউণ্ট-ব্যাটেনকে অবিলম্বে দিল্লীতে ফিরে যাবার জন্য প্যাটেল জরুরী অনুরোধ জানিয়েছেন। ভি পি জানিয়েছেন, অত্যন্ত গুরুতর একটা অবস্থা দেখা দিয়েছে। নেহরু, প্যাটেল এবং অন্যান্য দায়িত্বশীল মন্ত্রীর সকলেই এই অভি-মত প্রকাশ করেছেন যে, অবস্থা এখন এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যেখানে একমাত্র মাউণ্টব্যাটেনের উপস্থিতির দ্বারাই সংকট সামলানো সম্ভবপর হতে পারে।

নয়াদিল্লী, শনিবার, ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সাল। গবর্ণমেণ্ট হাউসে এসেই দেখলাম, প্যাটেলের একটি চিঠি নিয়ে ভি পি আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। প্যাটেল এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে, মাউণ্টব্যাটেন অবিলম্বে এই অবস্থার সম্মুখীন হবার মত সকল ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে গ্রহণের জন্যই প্রস্তুত হবেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই নেহরু উপস্থিত হলেন। এই জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্য যে ব্যবস্থা করতে হবে, সে ব্যবস্থা উদ্ভাবনের, প্রয়োগের এবং পরিচালনার পূর্ণ কর্তৃত্ব মাউণ্টব্যাটেনকে গ্রহণ করবার জন্য অনু-রোধ করলেন নেহরু।

স্বাধীনতা লাভের পর তিন সপ্তাহের মধ্যেই ভারতের প্রধান মন্ত্রী এবং সহকারী প্রধান মন্ত্রী উভয়েই মাউণ্ট-ব্যাটেনকে সিমলার বিশ্রাম-নিবাস থেকে ডেকে নিয়ে এসে তাঁর ওপর এই যে দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের ভার অকুণ্ঠভাবে অর্পণ ক'রে দিলেন, এ'তে দুই ভারতীয় নেতারই চরিত্রের ঔদার্য এবং নেতৃত্বেরও মহত্ত্বের প্রমাণ পাচ্ছি। কারণ, এই অনুরোধের দ্বারা তাঁরা অকপটভাবেই স্বীকার করলেন যে, উচ্চতরের প্রশাসনিক কাজের ব্যাপারে মাউণ্টব্যাটেনের যে অভিজ্ঞতা আছে সে অভিজ্ঞতা তাঁরা এখনো অর্জন করতে পারেননি।

দু'তিন ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত তথ্য ও বিবরণ অনুধাবন ক'রে মাউণ্টব্যাটেন সংকটের স্বরূপটুকু বুঝে নিলেন। তার পরেই প্রস্তাব করলেন—একটি 'জরুরী কমিটি' গঠন ক'রে ফেলতে হবে। নেহরু ও প্যাটেল এ প্রস্তাবে তখনই সম্মত হলেন এবং তাঁদেরই অনুরোধে মাউণ্ট-ব্যাটেন এই কমিটির চেয়ারম্যান হতে রাজী হলেন।

যে ভয়ানক বিপদসঙ্কুল অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে, সেটা যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার চেয়ে কোন দিক দিয়েই কম নয়। অবস্থাটা যুদ্ধজনিত অবস্থার মতই, কিন্তু অবস্থার প্রতিকারের জন্য যে ধরণের সরকারী ব্যবস্থা রয়েছে সেটা আদৌ যুদ্ধকালীন জরুরী আয়োজনের মত নয় এবং প্রয়োজনের পক্ষে আদৌ যথেষ্ট নয়। সাম্প্রদায়িক হানাহানির হিংস্র মত্ততা, বিদ্বেষ, ভয় ও আতঙ্ক পাঞ্জাব থেকে ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে হত্যাকাণ্ডও ক্রমেই আরও ব্যাপক এবং আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

জন্য সঙ্গে আবার দেশান্তরের উদ্দেশ্যে ধাবমান হাজার হাজার ও লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু নরনারীর মর্মান্তিক মিছিল। যুদ্ধে দুই বিবদমান পক্ষের সৈন্য-বাহিনীর বিরাট সংঘর্ষেও মানুষের এরকম প্রাণনাশ ও নিপীড়ন ঘটতে দেখা যায় না। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত নিজ বাসভূমি থেকে উৎসাদিত হয়ে দেশান্তরে চলে যাবার প্রত্যেকটি বড় বড় ঘটনায় দেখা গেছে যে, দেশান্তরগামী নরনারীর দল এমন অবস্থা সৃষ্টি ক'রে তুলেছে যে, অবস্থার সুযোগ গ্রহণ ক'রে অনেকেই নিজের স্বার্থ সিদ্ধ ক'রে নিয়েছে, কিন্তু অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে কেউ পারেনি, পাঞ্জাবের ঘটনার মধ্যেও সেই ধরণের শোচনীয় ব্যাপার লক্ষ্য করছি।

পাঞ্জাবের ঘটনার সব আঘাত দিল্লীর ওপরে এসে পড়ছে। ভারতের রাজধানী দিল্লী। সুতরাং এ সংকট প্রাদেশিক গন্ডি বিদীর্ণ ক'রে একেবারে সারা-জাতির সংকটে পরিণত হতে চলেছে। এই দিক দিয়ে পাঞ্জাবের সংকট ভারতের পক্ষে যতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে, পাকিস্থানের পক্ষে ততটা নয়, কারণ পাক-রাজধানী করাচী পাঞ্জাব হতে অনেক দূরে।

রাজধানী দিল্লী ভারতের উত্তরে অবস্থিত। কিন্তু কতদূরে উত্তরে? অনেকেই এই দূরত্বের পরিমাণটুকু মনে রাখতে ভুলে যান। দূর দিল্লী বলতে অনেকেই এমন ধারণা ক'রে বসে থাকেন যে, দিল্লী যেন মাউণ্ট এভারেস্টেরও উত্তরে অবস্থিত একটি জনপদ। ভারতের অন্যান্য অংশের জীবনযাত্রার সংগে তার কোন নিকট-সম্পর্কের যোগ নেই। দেশ খণ্ডনের পর এই মনোভাব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান অবস্থায় দূরে দিল্লী থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যাবার যৌক্তিকতা অনেকেই আলোচনা করছেন। কিন্তু একটা দিক অনেকেই ভেবে দেখছেন না। স্বাভাবিক প্রয়োজনের তাগিদে দেশের প্রান্তভাগ থেকে রাজধানীকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে দেশের অভ্যান্তরে কোন স্থানে স্থাপন করা এক ব্যাপার এবং স্বাধীনতা লাভের মাত্র এক মাসের মধ্যেই অবস্থার আঘাতে ও চাপে পড়ে দিল্লী বর্জন ক'রে রাজধানী অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া আর এক ব্যাপার। ঘটনার আক্রমণে বিব্রত হয়ে রাজধানী অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া বস্তুতঃ রাষ্ট্রশক্তির মর্যাদাকেই সমূহভাবে বিনষ্ট করা। সত্যি কথা বলতে গেলে, এটাই এখন একটা বিরাট প্রশ্ন হয়ে আজ আমাদের সম্মুখে দেখা দিয়েছে। প্রায় পাঁচ লক্ষ শরণার্থী এই ঘনবসতিবহুল জনপদের দিকে এগিয়ে আসছে, যেখানে এমনিতেই সব লোকের থাকবার জায়গা হয় না। পাঁচ লক্ষ শরণার্থীর সংগে সংগে যে বিশৃংখলা জনস্বাস্থ্যের সমস্যা দিল্লীর দিকে এগিয়ে আসছে, তার প্রতিকার করার মত সরকারী ব্যবস্থা ও শক্তি দিল্লীর নেই।

(ক্রমশঃ)
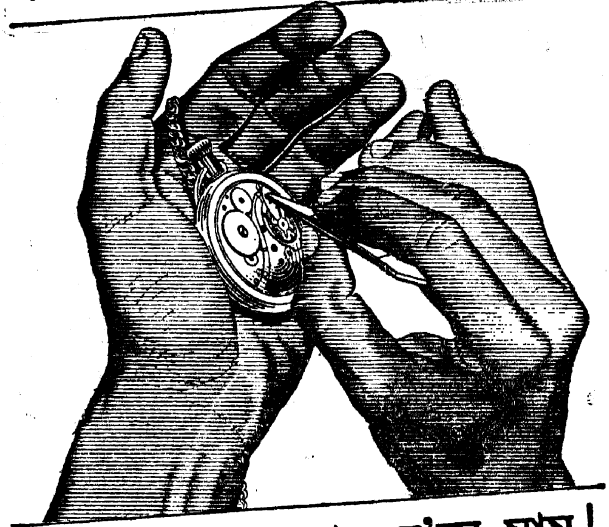
ভারত-শিল্প

বিমলকুমার দত্ত

(৫)

গুপ্ত যুগ

বা

—মগধের পুনরুত্থান

(৩২০ খৃষ্টাব্দ—৬০০)

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথমভাগে এক নূতন রাজবংশ অভ্যুদয়ের ফলে মগধ আবার পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। এই রাজবংশ ভারত ইতিহাসে গুপ্তবংশ নামে বিশেষ খ্যাত। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের (গুপ্ত-বংশের তৃতীয় নরপতি) সহিত শক্তিশালী লিচ্ছবি বংশের রাজকন্যা কুমারদেবীর বিবাহই গুপ্তদিগের প্রভাব প্রতিপত্তির সূত্রপাত। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত (৩৩০—৩৭৫ খৃঃ) ও পৌত্র দ্বিতীয় চন্দ্র-গুপ্তের (৩৭৫—৪১৪ খৃঃ) রাজত্বকালে গুপ্ত সাম্রাজ্য উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে নর্মদা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও পশ্চিমে যমুনা ও চম্বলনদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই সময় মালব ও সুরাষ্ট্র অঞ্চলে শক রাজারা "ক্ষত্রপ" ও "মহাক্ষত্রপ" উপাধি ধারণ করিয়া রাজত্ব করিতেন। ২য় চন্দ্রগুপ্ত শকশক্তি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া "শকারি" নামে খ্যাত হন। তাঁহার প্রচলিত মুদ্রায় তিনি "বিক্রমাদিত্য" নামে অভিহিত। এই সময়ে বিখ্যাত চৈনিক তীর্থযাত্রী ফা-হিয়েন ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। কুমারগুপ্ত (৪১৪—৪৫৫), স্কন্ধগুপ্ত (৪৫৫—৪৬৭) প্রভৃতি পরবর্তী গুপ্ত নৃপতিগণের রাজত্ব-কালে হূণ আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়া গুপ্ত সাম্রাজ্য ক্রমশঃ ভাঙিতে শুরু করে। মূলতঃ ভানুগুপ্ত (৪৯৫—৫১০) এই বংশের শেষ নরপতি। হূণ আক্রমণে জর্জরিত হইয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ঘটিলেও তাহাদের বংশের কেহ কেহ মগধে বহুকালাবধি শাসন-কার্য চালাইতেন। ঐতিহাসিকগণের নিকট তাঁহারা "পরবর্তী গুপ্তবংশ" নামে খ্যাত।

নর্মদার দক্ষিণে বিদর্ভ অঞ্চলে বাকাটক রাজবংশ তখন বিশেষ পরাক্রান্ত ছিল।

গুপ্তযুগ ভারত ইতিহাসে এক বিশেষ স্মরণীয় অধ্যায়। এ যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কৃত সাহিত্য, বিজ্ঞান ও চারুকলার এক অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছিল। গুপ্তরাজ-গণের সভাকবি হরিসেন বীরসেন ও কালিদাসের সমকক্ষ কবিপ্রতিভা খুব কম দেখা যায়। ইহা ব্যতীত "মৃচ্ছকটিক" নাটকের রচয়িতা শূদ্রক ও "মুদ্রারাক্ষস" নাটকের প্রণেতা বিশাখদত্ত প্রভৃতির নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ গর্গ, আর্যভট্ট ও বরাহমিহির এই সময়েই
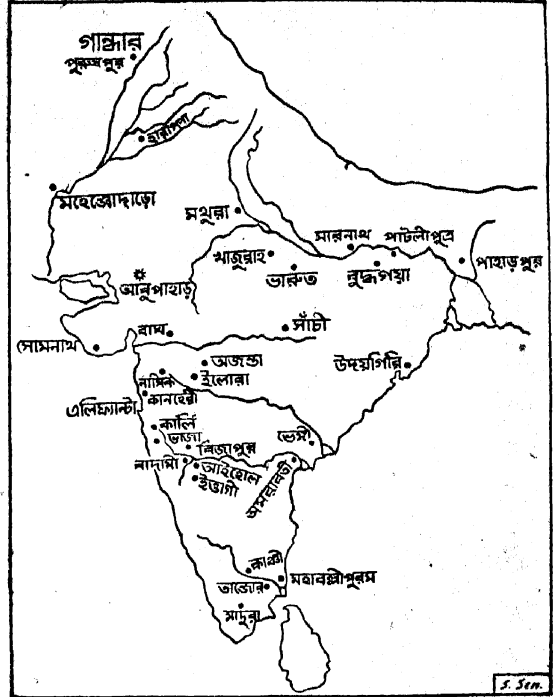
সাঁচীর মন্দির
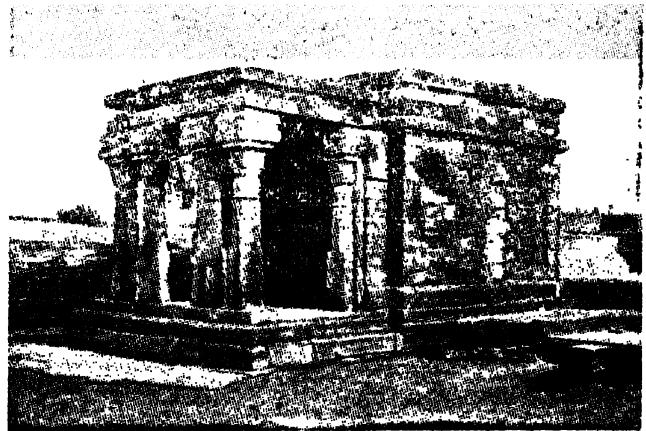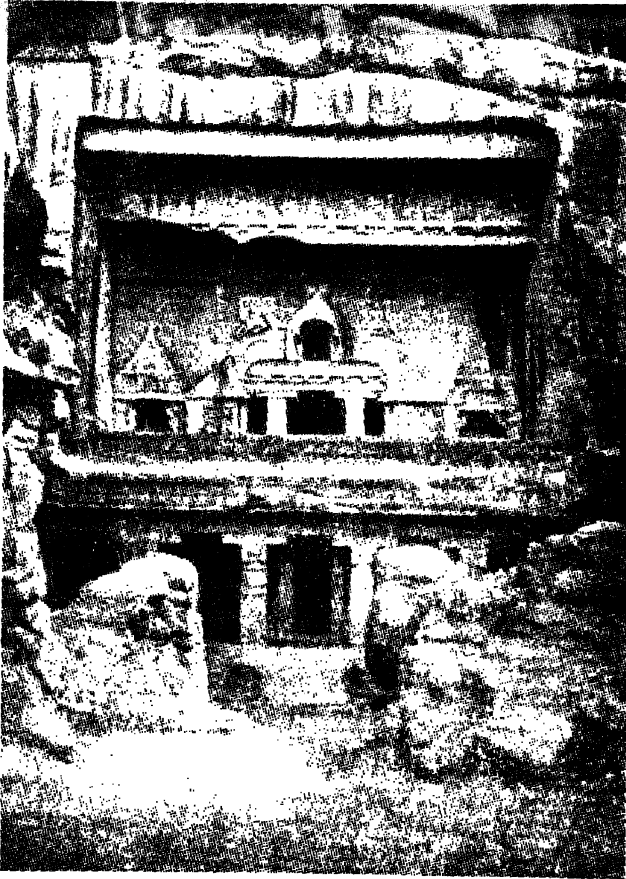
ইলোরার চৈত্যগৃহ

আবির্ভূত হন। চীন ও ভারতের মধ্যে ধর্ম, শিল্পকলা ও সাহিত্যের আদান-প্রদান দ্বারা এক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এই যুগে স্থাপিত হয় এবং ইন্দোচীন, মালয় ও পূর্ব উপদ্বীপে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বহু হিন্দু উপনিবেশ ঐ সকল সুদূর দেশসমূহে প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বোল্লিখিত স্থানসমূহের সহিত ভারতের সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠতা এত গভীর যে, ঐ সকল স্থানের সভ্যতাকে—বৃহত্তর ভারতীয় সভ্যতা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভারত তখন ছিল এসিয়ার সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিষ্ঠা শুরু হইলেও বৌদ্ধধর্মের প্রবল স্রোত তখনও অব্যাহত। সেকারণ পূর্ব যুগের ন্যায় স্তূপ, চৈত্য ও বিহারের সন্ধান এ যুগে প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মন্দির স্থাপত্যের প্রারম্ভিক কার্য শুরু হওয়ার জন্য গুপ্ত-স্থাপত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এ যুগের বৌদ্ধ-স্থাপত্য নিদর্শনগুলির মধ্যে সারনাথের ধামেক স্তূপ, বুদ্ধগয়ার মহাবোধি মন্দির ও অজন্তা ইলোরার চৈত্যগৃহগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ধামেক স্তূপটির গঠনপ্রণালী অন্যান্য স্তূপগুলি হইতে স্বতন্ত্র ধরণের। এই স্তূপ একটি গোলাকৃতি উচ্চ সৌধ। স্তূপটির নিম্নাংশের ব্যাসের পরিধি ৯৩ ফুট এবং সমতলভূমি হইতে ইহার মোট উচ্চতা ১২৮ ফুট। স্তূপের নিম্নাংশ ৪৩ ফুট পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রস্তর দ্বারা গঠিত এবং প্রস্তর খণ্ডগুলি পরস্পর লৌহকিলক দ্বারা সংযুক্ত। উপরাংশ বড় বড় ইষ্টক দ্বারা নির্মিত। বহির্ভাগে বোধ হয় পাথর বা চুণের পলস্তারা দ্বারা আবৃত ছিল। স্তূপের নিম্নাংশ আটটি পলে বিভক্ত, প্রত্যেকটি ২১′—৬″ প্রস্থ এবং কিঞ্চিৎ বহিরাগত। প্রতিটি পল ২৪ ফুট উচ্চ ও উপরিভাগে অর্ধগোলাকার খিলানের মত একটি করিয়া কুলঙ্গী আছে ও সম্ভবতঃ উহাদের মধ্যে বুদ্ধের মূর্তি রাখা হইত। এই অংশের পাথরগুলির উপর সুন্দর ও সূক্ষ্ম লতাপাতার কারুকার্য খোদিত আছে।

বুদ্ধগয়ার মন্দিরটি "মহাবোধি" অথবা "গন্ধকুটী" নামে খ্যাত। ইহা নয়তালা বিশিষ্ট এবং উচ্চ পিরামিডের আকারে ক্রমশঃ সরু হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপরিভাগে একটি প্রকাণ্ড আমলকশিলা ও তদুপরি ছত্রাবলী স্থাপিত। মন্দিরটির চারি কোণে অনুরূপ চারিটি ক্ষুদ্রাকার মন্দির দৃষ্ট হয়। পাটনার কুমরাহার ও মথুরায় প্রাপ্ত "মহাবোধি" মন্দিরের অনুরূপ গঠনবিশিষ্ট দুইটি ক্ষুদ্রাকার পোড়ামাটীর ছাঁচ হইতে প্রতীয়মান যে, ঐরূপ মন্দির দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দেও নির্মিত হইত। সম্ভবতঃ মহাবোধি মন্দিরটি দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে বর্তমান রূপ পায়। জানা যায় যে, ১১০৫ ও ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশাধিপতি কর্তৃক মন্দিরটির সংস্কারকার্য সমাধা হয়।

অজন্তা ও ইলোরার চৈত্যগৃহগুলির প্রবেশদ্বারের যে সকল পরিবর্তন বা পরিবর্ধন এ যুগে প্রবর্তিত হয় তাহা বিশেষ লক্ষণীয়। অজন্তা চৈত্যগৃহটির সম্মুখে একটি অল্প পরিসরযুক্ত মণ্ডপের প্রবর্তন দেখা যায়। মণ্ডপটি চারিটি আলঙ্কারিক কারুকার্য পরিপূর্ণ স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইলোরার বিশ্বকর্মা চৈত্যগৃহটি দ্বিতল এবং আকারে প্রকারে বিশেষ নূতনত্বের সূচনা করে। ইহার অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা অজন্তার ১৯নং গুহামন্দিরের ন্যায়। প্রথম তলাটি পুষ্পলতা ও পাত্র সমন্বিত স্তম্ভযুক্ত বারাণ্ডা। দ্বিতলের জানালার উভয় পার্শ্বস্থিত দুইটি বৃহদাকার কুলঙ্গীতে বুদ্ধের দণ্ডায়মান মূর্তি খোদিত। কুলঙ্গীদ্বয়ের বাহ্যরচনা আমলক-শিলা ও কীর্তিমুখ দ্বারা শোভিত।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও মূর্তিপূজা খৃষ্টাব্দের প্রথম হইতে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও পঞ্চম খৃষ্টাব্দের পূর্বে বিশেষ কোন হিন্দু-মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায় না। পূর্বোল্লিখিত চিতোরের নাগরী নামক স্থানের মন্দির (৩৫০—২৫০ খৃঃ পূঃ) খুব সম্ভবতঃ কাষ্ঠনির্মিত হওয়ার জন্য ধ্বংসীভূত। ইহা ব্যতীত পাঠানকোট ও কাংড়ায় আবিষ্কৃত প্রথম খৃঃ পূর্বাব্দের ওদুম্বারা মুদ্রায় বাঙলা দেশের চালাঘরের আকারে গঠিত এবং কুষাণ সম্রাট (১ম খৃঃ) হুবিষ্কের মুদ্রায়ও ঐরূপ দেবগৃহের সন্ধান পাওয়া যায়। মাটীতেই সর্বপ্রথম সমচতুষ্কোণী ও সমতলছাদযুক্ত এবং গর্ভগৃহ ও মণ্ডপ-বিশিষ্ট প্রস্তর নির্মিত হিন্দুমন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায়। মণ্ডপটি চারিটি স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান। মধ্যপ্রদেশের তিগুয়াতে, নাগোধ স্টেটের ভুমারায় এবং বুন্দেলখণ্ডের নাচনাকুঠার নামক স্থানে সমতলছাদযুক্ত অনুরূপ মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়। মন্দিরগুলির প্রবেশদ্বারের শেষ শাখায় লতাপাতাযুক্ত আলঙ্কারিক খোদাই অথবা মনুষ্যমিথুন মূর্তির দ্বারা শোভিত।

বিজাপুরের আইহোল মন্দিরে সর্বপ্রথম শিখর সন্নিবেশ দেখা যায়। ইহাই হাচি-মল্লীগুড়ী মন্দির এবং ৬ষ্ঠ খৃষ্টাব্দে গঠিত। ইহার সমতলছাদ হইতে ঠিক গর্ভগৃহের উপরেই শিখরটি সংস্থাপিত। ইহার সম্মুখে একটি বারাণ্ডা আছে। দক্ষিণ ভারতের লাতখান মন্দিরটিরও ছাদ সমতল এবং ছাদের উপরে একটি মুদ্রাকার চতুষ্কোণ মণ্ডপযুক্ত ঘর দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ ভারতের সু গা জিলার কেরালা নামক স্থানের মানব তম্বর মন্দিরটি চৈত্যগৃহগুলির ন্যায় অজন্তার ঠবিশিষ্ট। ভিটারগাঁওয়ের চতুষ্কোণ শিল্পের যুক্ত ইষ্টকনির্মিত মন্দিরটি ইহার নিদর্শন ও উন্নত শিখরের জন্য বিশিষ্ট। অন স্সীর নিকটস্থ দেবগড়ের দশাবতার মন্দিরটি শিখরযুক্ত মন্দিরের অন্যতম নিদর্শন। ইহার প্রবেশদ্বারের দুই পার্শ্বে গঙ্গার মূর্তি এবং অপর তিনদিকের দেওয়ালে গজেন্দ্রমোক্ষ, অনন্তশায়ী বিষ্ণু ও সন্ন্যাসবেশী শিবের মূর্তি খোদিত।

৬ষ্ঠ খৃষ্টাব্দের নাগর, দ্রাবিড় ও বেশর এই তিনপ্রকার শিখরের উদ্ভব দেখা যায়। নাগর ও দ্রাবিড় মন্দিরের গর্ভগৃহের উপর হইতে উন্নত শিখরটি উত্থিত কিন্তু বেশর মন্দিরগুলি হস্তীপৃষ্ঠ বা কুব্জপৃষ্ঠ বিশিষ্ট। বেশর মন্দিরের স্থাপত্যধারা বৌদ্ধযুগের প্রস্তরখোদিত চৈত্যমন্দিরের অনুকরণ। হায়দ্রাবাদের টের নামক স্থানের বৌদ্ধ চৈত্য-মন্দির বর্তমানে বেশর মন্দিরে রূপান্তরিত। ভুবনেশ্বরের বৈতাল দেউল বেশর স্থাপত্যের বিশিষ্ট নিদর্শন। নাগর মন্দিরকে রেখ মন্দির বলা যায়, কারণ ইহারা প্রলম্বিত ক্রম-সংকুচিত সরলরেখা বিশিষ্ট শিখরযুক্ত এবং ইহার শীর্ষদেশে একটি আমলক ফলের ন্যায় আকারবিশিষ্ট বৃহদাকার শিলাখণ্ড ও তদুপরি একটি কলস সন্নিবেশিত থাকে। আমলক ফলের ন্যায় শিলাখণ্ড মন্দির-স্থাপত্যে আমলকশিলা নামে খ্যাত। নাগর মন্দিরের শিখরের অপর নাম "শুকনাস শিখর" কারণ ইহার শিখরটি শুকপক্ষীর ঠোঁটের আকারে গঠিত। দ্রাবিড় মন্দিরের শীর্ষদেশ একটি স্তূপীকাকারের গঠনে নির্মিত। বিখ্যাত শিল্পবিদ্ হ্যাভেল সাহেবের মতে শিখর ও দ্রাবিড় মন্দির যথাক্রমে বিষ্ণু ও শিবের মন্দির হিসাবে ব্যবহৃত হইত।

মন্দির ব্যতীত স্বয়ংপূর্ণ স্তম্ভগুলিকে এ যুগের স্থাপত্য নিদর্শনের অঙ্গ হিসাবে ধরা যায়। স্তম্ভগুলির মধ্যে এরানের প্রস্তরস্তম্ভ ও দিল্লীর লৌহস্তম্ভ সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রথমটি ৪৮৪—৪৮৫ খৃষ্টাব্দে বুধগুপ্ত এবং দ্বিতীয়টি ৪১৫ খৃঃ ১ম কুমারগুপ্ত কর্তৃক নির্মিত হয়। দিল্লীর স্তম্ভটি প্রথমে মথুরায় ছিল এবং মধ্যযুগে ইহা দিল্লীতে আনীত হয়। ইহার উচ্চতা ২৩ ফুট ৮ ইঞ্চি এবং ইহা উজ্জ্বল মসৃণ পালিশের জন্য বিশেষ খ্যাত। সুলতানগঞ্জে প্রাপ্ত অষ্টধাতুর বুদ্ধমূর্তি এবং দিল্লীর লৌহস্তম্ভটি হইতে সে যুগের ধাতু ব্যবহার

বুদ্ধগয়ার মন্দির
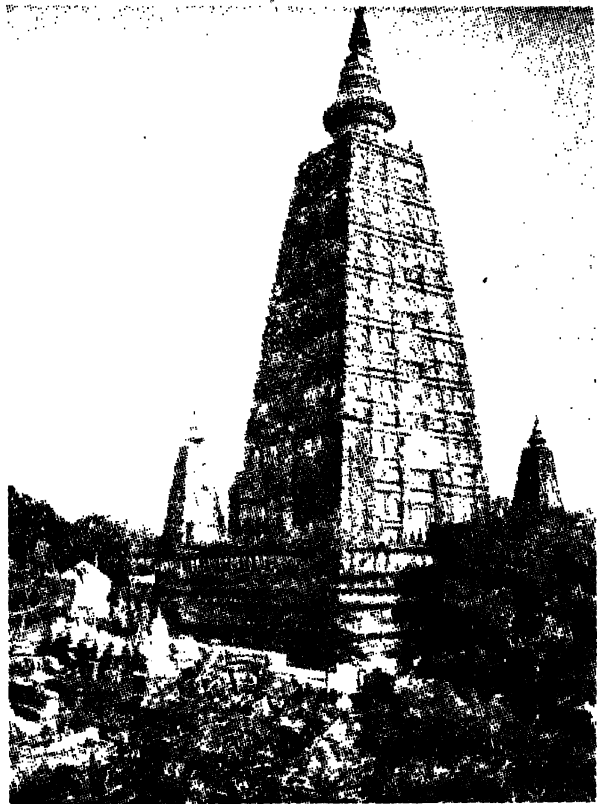
। ছদ্দন্ত জাতক । —অজন্তা

শাস্ত্রের পারদর্শিতার বিষয় বিশেষভাবে জানা যায়।

বৈদেশিক আক্রমণে ভারতের রাজশক্তি বার বার ছিন্ন ভিন্ন হইলেও বিদেশী সভ্যতার সংঘর্ষ ও সংস্পর্শে ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা এক নব উদ্দীপনা ও প্রেরণা পাইয়া বার বার নূতন নূতনরূপে ও ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ভারতের শিল্প ইতিহাস উপরোক্ত সত্যের সাক্ষাৎ প্রমাণ। গ্রীক ও পারসিক প্রভাবে মৌর্য-শিল্পের মধ্যে যে উদ্দীপনা দেখা গিয়াছিল; ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে শুঙ্গ ও কান্ববংশে ম্লেচ্ছশিল্প হিসাবে উহা বর্জিত হওয়ায় শিল্পদীপশিখা কত নিষ্প্রভ ও ম্লান হইয়া গেল তাহা আলোচিত হইয়াছে। ইহার পর শক, হূণ ও পহ্লব আক্রমণের ফলে মথুরা ও গান্ধারের তীব্র শিল্পবিকাশস্রোত সমস্ত ভারতকে পুনরায় ভাসাইয়া লইয়া চলিল। মথুরা, অমরাবতী, ভাজা, কার্লি ও কানহেরী প্রভৃতি স্থানে বিশেষ করিয়া উক্ত স্রোতের প্রভাব দৃশ্যমান। গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনর্জাগরণ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা বৈদেশিকগণের অফুরন্ত জীবনীশক্তি ও দুর্দমনীয় ভোগ-লালসার প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন না করিয়া পরিবর্তিত আকারে উহা গ্রহণ করেন এবং উহার সহিত ভারতের আধ্যাত্মিক সত্তা ও সাধনা যোগ করিয়া এক নূতন রূপ প্রকাশ করিলেন—সারনাথের শিল্প। সেকারণ সারনাথের শিল্প প্রকৃত ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের সারবত্তা।

মথুরা বুদ্ধ

ইহা ব্যতীত কুষাণ গুপ্তযুগে ভক্তির প্রচার শিক্ষাদীক্ষা সমন্বয়ের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। যখন প্রাচীন জ্ঞানমার্গ ও বৌদ্ধ নীতিমার্গ প্রবল ছিল তখন সাধকগণের মধ্যে যাঁহারা নিম্নঅধিকারী তাঁহারাই কেবল ধর্মতৃষ্ণার তৃপ্তিসাধনের জন্য শিল্পের আশ্রয় লইত। কিন্তু ভক্তি সাকার ধ্যানকে সাধক-সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাইয়া উচ্চাঙ্গের শিল্পের অভ্যুদয় সাধিত করিয়াছিল। এ যুগের শিল্পই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বিভিন্ন যুগে শিল্পে যে সকল অসম্পূর্ণতা ছিল, তাহা গুপ্তযুগের ভক্তি-স্রোতের প্রাবল্যে, ধ্যানের গম্ভীর রসে ও বীর্যবত্তায় এবং সংযমের সুস্থির বন্ধন-ডোরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এযুগের শিল্পে মথুরার সজীবতা থাকিলেও লাল[illegible] উগ্রতা নাই, ভারহুতের সরল [illegible]শেষ থাকিলেও উহার শিল্পজ্ঞানের দুর্বল[illegible]ম্মুখে [illegible]র্ন এবং গান্ধারের সৌকুমার্যের অভাব[illegible]ক হইলেও উহার বাহিরের পারিপা[illegible] কোলাহল নাই।

কুষাণযুগের শিল্পকেন্দ্র মথুরার শিল্পি-গণ প্রস্তরগাত্রে মানবীয় ভাব ও গঠন নৈপুণ্যের চরম উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতীয় ভাবধারায় ইহাই শিল্পের সম্পূর্ণতা নহে। সুন্দর ও সম্পূর্ণ মানবদেহের মধ্য দিয়া দেহাতিরিক্ত ভাব প্রকাশই ভারতীয় শিল্পের আদর্শ। গুপ্ত-যুগের ভাস্কর্যনিদর্শনাদির মধ্যে মথুরা-কেন্দ্রের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইলেও,

সুলতানগঞ্জের অষ্টধাতু নির্মিত বুদ্ধমূর্তি

দেহাতিরিক্ত ভাব প্রকাশ জন্য অধিকতর সম্পূর্ণ। সারনাথবুদ্ধ উক্তরূপ সম্পূর্ণতার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

মথুরায় প্রাপ্ত বৃহদাকার দণ্ডায়মান বুদ্ধ, সুলতানগঞ্জে প্রাপ্ত অষ্টধাতুর বুদ্ধমূর্তি, মানমন্দিরা এবং কার্লি, কানহেরী ও অজন্তার বুদ্ধমূর্তিগুলি এযুগের ভাস্কর্য-শিল্পের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এই সকল নিদর্শনের প্রভাব পরবর্তীকালে ভারতের অন্যান্য স্থানের ও বৃহত্তর ভারতের বুদ্ধ-মূর্তি সকলের মধ্যে দেখা যায়। গুপ্তযুগের প্রথম সনাঙ্কিত বৌদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত বুদ্ধ-মূর্তিটি মথুরার লাল পাথরে তৈয়ারী সেকারণ ইহা স্বীকার্য যে মথুরার শিল্পীর দ্বারা ইহা নির্মিত। সুন্দর সুঠাম দেহ; কপালের মধ্যস্থলে ঊর্ণরোম। মাথার চুল-গুলি চক্রাকারে গঠিত, মাথার পশ্চাতে বৃহদাকার জ্যোতিঃচক্র এবং দেহবস্ত্রের স্বচ্ছ ও অতি সংযত ইঙ্গিত কেবলমাত্র কতক-গুলি রেখার দ্বারা প্রকাশিত......এই চিহ্ন-গুলিকে এযুগের বুদ্ধমূর্তির বৈশিষ্ট্য হিসাবে ধরা যায়। পাশ্চাত্য ধরণের প্রলম্ব-পাদ আসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তির প্রথম সন্ধান পাওয়া যায় অজন্তার ১৬ ও ১৭নং গুহায়।

উদয়গিরির বরাহ অবতার, দেওগড়ের অনন্তশয্যায় বিষ্ণু ও সন্ন্যাসবেশী শিবের মূর্তি দুইটি, ভূমারা, ইলোরা, আইহোল, বাদামী ও পাহাড়পুরের মূর্তিগুলি এযুগের ব্রাহ্মণ্যশিল্পের বিশিষ্ট প্রকাশ। মূর্তি-গুলির সুগঠিত দেহভঙ্গিমার সহিত মনের সংযম ও আত্মস্থ ভাবের প্রকাশ সুন্দররূপে লীলায়িত। পশ্চিমবাঙলার ২৪ পরগণা জেলার কাশীনগর গ্রামের ও বগুড়া জেলার দেওড়া নামক স্থানে প্রাপ্ত সূর্যমূর্তিদ্বয়ের বলিষ্ঠ দেহ গঠন, তেজস্বী প্রকাশভঙ্গী, চতুষ্কোণ মস্তকাবরণ ও আলঙ্কারিক খোদাইবিহীন সম্পূর্ণ গোলাকার জ্যোতিঃ-চক্র হইতে বুঝা যায় যে, মূর্তি দুইটি গুপ্তযুগের প্রারম্ভে গঠিত। ক্রমে এই জ্যোতিঃচক্রটি আলঙ্কারিক খোদাই-কার্যে পূর্ণ ও ডিম্বের আকার গ্রহণ করে এবং মস্তকাবরণটি ক্রমশ উপরিভাগে সরু এবং সূচাগ্র হইতে থাকে। এযুগের মূর্তির আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নে বর্ণিত হইল যথাঃ—

(১) সম্পূর্ণ গোলাকার মুখাবয়ব, (২) গলায় ত্রিবলীর চিহ্ন এবং (৩) নিম্নের ঠোঁটটি ঈষৎ পুরু এবং ভারী।

পাহাড়পুর, ভিটারগাঁও, শ্রাবস্তী প্রভৃতি স্থানের মৃত্তিকা নির্মিত মূর্তি ও আলঙ্কারিক খোদাইকার্যে সজ্জিত ইষ্টক সকল এযুগের ভাস্কর্যশিল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় পূর্ব-ভারতে গুপ্তপ্রভাব সুস্পষ্ট হইলেও রাগাত্মক ভাব প্রকাশ ক্ষমতায় এ অঞ্চল অধিকতর সার্থকতা ও সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। সুলতানগঞ্জের বুদ্ধ, পাহাড়-পুরের রাধাকৃষ্ণ (?) ও রাজগৃহের মনিয়ার মঠে প্রাপ্ত স্ত্রীমূর্তির সুক্ষ্ম সহনশীল অঙ্গগঠন সুন্দরভাবে রাগাত্মক ভাব প্রকাশ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে।

হায়দরাবাদ রাজ্যস্থিত অজন্তার বৌদ্ধ-চিত্রশিল্প একাধারে অন্তরের ও বাহিরের সৌন্দর্যে চিরউজ্জ্বল ও ঐশ্বর্যময়। অজন্তার সর্বশুদ্ধ ৩২টি গুহার মধ্যে ১।২।৯।১০।১৬।১৭ এবং ১৯নং গুহা-গুলি প্রাচীর চিত্রের জন্য খ্যাত। ৯ ও ১০নং গুহার চিত্রাবলী ১ম খৃষ্টাব্দে অন্ধ্র-রাজাদের সময়; ১৬, ১৭ ও ১৯নং গুহার চিত্র সকল ৫ম ও ৬ষ্ঠ খৃষ্টাব্দে বাকাটক রাজত্বকালীন ও গুপ্তদের সমসাময়িক এবং ১ ও ২নং গুহার চিত্রাবলী পরবর্তী ৭ম খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত। অজন্তার গুহাগুলি যে কেবলমাত্র রাজানুগ্রহে নির্মিত তাহা নহে। খোদিত লিপিপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বৌদ্ধভক্ত ও ভিক্ষুকদের অর্থসাহায্যেও কয়েকটি বিহার নির্মিত হয়। ২৬নং গুহা নির্মাণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন শ্রমণ বুদ্ধভদ্র এবং এই কার্যে তাহার দুই শিষ্য ভদ্রবন্ধু প্রতিভূ ও ধর্মদত্ত তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করেন।

অজন্তার চিত্রগুলির বিষয়বস্তু সাধারণত জাতক ও বুদ্ধজীবনী, বৌদ্ধ রাজন্যবর্গের কীর্তি এবং বৌদ্ধভিক্ষু ও শ্রমণদিগের জীবনযাত্রা সংক্রান্ত কিন্তু ধর্মবিষয় ব্যতীত ও তৎকালীন সামাজিক দৃশ্যাবলীর রূপ চিত্রগুলির মধ্যে সন্ধান করা যায়। সাঁচী ও ভারুতের ধারার মত এখানেও গল্পচ্ছলে ঘটনাবলী ব্যক্ত করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। অজন্তার প্রাচীর চিত্রাবলীর বিষয়বস্তু সুসংযোজিত ও প্রাচীরগাত্রে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে চিত্রিত। অজন্তার খ্যাতি মুখ্যতঃ উহার চিত্রাবলীর বলিষ্ঠ ও সুললিত রেখা বিন্যাসের জন্য।

ইটালীর চিত্র ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোথাও মনুষ্যচিত্রের এইরূপ সুললিত রূপ, স্বচ্ছন্দগতি ও ভাবপ্রকাশের অপূর্ব ক্ষমতা দেখা যায় না। ১৬নং গুহার আসন্ন মৃত্যুশয্যায় শায়িতা রাজকুমারীর ও তাহার পার্শ্বস্থ শোকে মুহ্যমানা পরিচারিকা ও আত্মীয়াদের সমস্ত দেহভঙ্গী ও মুখমণ্ডলের মধ্যে যে আবেগ, বিষাদ ও কারুণ্যের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে; তাহা যেমন মর্মস্পর্শী তেমনি প্রাণবন্ত। তুলিকার সাহায্যে মানব মনের ভাব প্রকাশের ইহা এক অপূর্ব নিদর্শন। এই প্রসঙ্গে মিঃ গ্রিফিথ সাহেব বলেন,—

"The Florentines could have put better drawing and Venitians better colour but neither could have thrown greater expression into it."

মনুষ্য ও পশুচিত্র ব্যতীত আলঙ্কারিক নক্সাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুহামধ্যস্থিত ছাদের নিম্নের দেওয়ালের (ceiling) নক্সাগুলি বাঙলাদেশের শুভকার্যে অঙ্কিত আলপনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সুষ্ঠু ঠাস-রচনায় (composition), বলিষ্ঠ গতিভঙ্গীতে, বর্ণনৈপুণ্যে এবং সুললিত ছন্দে অজন্তার চিত্র আজিও বিশ্বের বিস্ময়। অজন্তার চিত্র শিল্পধারা পরবর্তীযুগে ভারতের ও বৃহত্তর ভারতের চিত্রশিল্পে বিশেষ প্রেরণা ও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

অজন্তার গুহাগুলির মধ্যে রীতিমত অন্ধকার। কৃত্রিম আলোকের সাহায্য ব্যতীরেকে চিত্রগুলি আঁকা ও দেখা দুঃসাধ্য। এই অন্ধকারের মধ্যে কিরূপে অজন্তার চিত্রকরেরা অত সুনিপুণ চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন তাহা বিশেষ আলোচ্য। অনেকের মতে, কোন প্রকার উজ্জ্বল ধাতুর তৈয়ারী দর্পণ গুহার বাহিরে রাখিয়া সূর্যরশ্মিকে গুহাভ্যন্তরে প্রতিফলিত করিয়া চিত্রগুলি আঁকা হইয়াছিল।

গোয়ালিয়র স্টেটের বাগগুহার চিত্রাবলীও বিশেষ প্রসিদ্ধ। নিকটস্থ ওয়াগ বা বাগ নামক নদীর নাম হইতে গুহাটির 'বাগগুহা' নামের উৎপত্তি। ইহা অজন্তার ধারা বহন করিয়া স্বীয় পুণ্যে ও যশ লাভ করিয়াছে। ধর্মসংক্রান্ত চিত্র ব্যতীত সামাজিক ঘটনাবলীর প্রাধান্য এখানে দৃষ্ট হয়। উৎসবের চিত্রটি হইতে সেযুগের শিল্পীদের অবাধ স্বাধীনতা ও অপূর্ব অঙ্কন চাতুর্যের বিষয় সহজেই প্রতীয়মান।

সিংহল দ্বীপের সিগিরিয়া পাহাড়ের গায়ে অঙ্কিত চিত্রাবলীর সহিত অজন্তা ও বাগের নিকট-সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে চীন, জাপান ও কোরিয়ায় ভারতীয় শিল্পের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। চীনের সানসি প্রদেশের, হোনানের ও সহস্র বুদ্ধের গুহাবলীর ও জাপানের হোরিওজি মন্দিরের ভিত্তিচিত্রে ভারতীয় বৌদ্ধচিত্রশিল্পের সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

এ ক্ষেত্রে ভারতীয় ভিত্তিচিত্রের জমি তৈয়ারী ও রং ব্যবহারের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

প্রস্তরগাত্র যথাসম্ভব মসৃণ করিবার পর গোবরমাটি, তুষ, পচাপাট বা কাঠের আঁশ একত্রে করিয়া সেই মসৃণ প্রস্তরগাত্রে ২।৩ ইঞ্চি পুরু আস্তর লাগান হইত। ইহার পর ২।৩ বার শাদা রংয়ের (একটির পর একটি) পাতলা আস্তর লাগাইবার রীতি ছিল। পুনরায় এই আস্তর লাগান স্তরটিকে মসৃণ করিবার উদ্দেশ্যে শঙ্খ দ্বারা মার্জনা করা হইত। ইউরোপে যেমন তৈয়ারী জমি ভিজাইয়া তাহার উপর চিত্রাঙ্কনের রীতি ছিল ভারতে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়।

ভিত্তিচিত্রে কখনই জীবজ বা উদ্ভিজ্জ কোন রং ব্যবহার করা হয় না। পাথুরে, খনিজ অথবা মেটে রংই কেবলমাত্র ব্যবহৃত হইত। জমি তৈয়ারীর উদ্দেশ্যে যে শাদা রং ব্যবহার করা হইত উহা শঙ্খ বা খড়ির গুঁড়া—চূর্ণ নহে। এদেশীয় ভিত্তিচিত্রে এলামাটি, খড়িমাটি, গেরীমাটি ও অন্যান্য নানান রংয়ের মাটি, নীল পাথরের অথবা লাক্ষা প্রভৃতি রং প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইত। যদিও উদ্ভিজ্জ রংএর ব্যবহার ছিল না, তবে যোগীমারা গুহার মৌর্য চিত্রাবলীর কাল রং হরিতকী ভস্ম হইতে তৈয়ারী বলিয়া জানা গিয়াছে।

বিষ্ণুধর্মোত্তরম্ ও কামসূত্রে চিত্রের অঙ্গবর্ণনার ও বিষয়বস্তুর প্রয়োগ ব্যবহৃত ও বিভিন্ন অর্থ সকল সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে। (ক্রমশ)

১৯

পূর্ববঙ্গের পদাঘাতে ফুটবলটা আবার ছিটকে এসে পড়লো পশ্চিমবঙ্গে। ওলোটপালট খেয়ে ধুলোবালি ঝেড়ে হিরণ আবার উঠে দাঁড়ালো। মন্দ কি, হাসনুর সঙ্গে কিছুকালের জন্য জমিদার বাড়িতে থেকে রাজ্যপাট ভোগ ক'রে আসা গেল। চোরের পক্ষে রাত্রিবাসই লাভ! বিস্ময়ের কথা এই, তা'র সেই সনাতন পুঁটলিটাও এসেছে সঙ্গে। ওটায় জড়ানো আছে দারিদ্র্যের মালিন্য, জীর্ণতার ছিন্নভিন্নতা। পথের খানাতল্লাসীতে ওটা পড়ে না,—গরীব আনসার-দল ওর মধ্যে সৌভাগ্যের সঙ্কেত খুঁজে পায়নি। কিন্তু ওটাও যেন ফুটবলের মতো গোলাকার। সুতরাং ওটাকে প্ল্যাটফরমের ওপর ফেলে পা দিয়ে গড়াতে-গড়াতে হিরণ এনে ফেললো শিয়ালদা স্টেশনের বাইরে। ত্রিভুবনে ওইটিই হোলো হিরণের পুঁজি, ভাগ্যের সম্বল ওইটিই—ওটাকে নিয়ে নিজের সঙ্গে পরিহাস করা চলে বৈ কি। এককালে তা'র পাবার কথা ছিল হাজিপুরের রাজত্ব এবং প্রাসাদশিখরবাসিনী রাজকন্যা,—সেই সৌভাগ্যের শেষ পরিণতি এখন ওই পুঁটলিটি। জীবনটা হোলো কোনো এক জুয়াড়ীর যাদুবিদ্যা।

দৃশ্যটা দেখে আশপাশের সকলেই অবাক। ডেলি-প্যাসেঞ্জার মহলে কৌতুকের সাড়া প'ড়ে গেল। স্টেশনের কুলীরা হেসে লুটোপুটি। সরকারী লোকেরা বাঁ হাতে সিগারেটটা নিয়ে ডান হাতের রুমালে করুণ চোখ মুছলো। ভাবলো,—রেফুজী কিনা, সমস্ত হারিয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে!

কথাটা সত্য নয়। রেফুজী বলো ক্ষতি নেই,—কিন্তু সর্বহারা বলা চলবে না। বাইরে এসে হিরণ পুঁটলিটার ধুলোবালি ঝেড়ে কুক্ষির মধ্যে তুলে নিল। ওর মধ্যে মোটা টাকা আছে। বুড়ো হারু মিঞার কাছে উপহার পাওয়া একখানা আধময়লা ছেঁড়া লুঙ্গি, আর উজিরপুরের হাট থেকে হাসুবানু তাকে আদর ক'রে কিনে দিয়েছিল সবুজ ডোরাকাটা একটি হাফ শার্ট,—এগুলো আছে ওর মধ্যে। ময়লা একখানা রুমালে বাঁধা আছে ছাগলের ল্যাজের চারটি লোম। ওগুলি দিয়েছিল হাসনু। বলেছিল, 'আবার যদি তোকে কোথাও 'আবদুল' সেজে নাচগান করতে হয়, তবে এগুলো দিয়ে ছোট্ট দাড়ি বানিয়ে নিস। রুমালে বেঁধে যত্ন ক'রে রেখে দে।'—সুতরাং সমস্ত পথ পুঁটলিটা মাথায় দিয়ে হিরণ ঘুমিয়েছিল এবং সেই লোমগুলির বোটকা গন্ধে স্বপ্ন দেখেছিল, ছাগলেরা যুদ্ধ যাত্রা করেছে ব্রহ্মার বিরুদ্ধে! হিরণের পায়ে জুতো নেই, ছেঁড়া কাপড় গেরো দিয়ে পরা, হাতকাটা ফতুয়াটার বোতামও নেই। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ। ওকে মানুষ ব'লে পথে ঘাটে কেউ স্বীকারই করেনি। আগুনের আঁচে সোনার ডেলাটায় লোহার রং ধ'রে গেছে। সুতরাং ওই সনাতন পুঁটলিটা নিরাপদেই যে সঙ্গে আসবে, এতে সন্দেহ কি!

হিরণ খুশী হয়ে কোনো একটা পথ ধ'রে চললো। ধর্মরাষ্ট্র থেকে আবার সে এসে পড়েছে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে। সুতরাং তা'র ধর্মভয় কম। পরের টাকা আছে সঙ্গে, —এ টাকায় জুয়া খেললে ক্ষতি নেই। সঙ্গে টাকা থাকলে ক্ষুধাবোধ থাকে না। রাস্তার কলের জলে তৃষ্ণা মিটলেই হোলো। এ টাকার সাহায্যে চোরাকারবার করতে পারলে সে স্টেশনের রেফুজীদেরকে দিন দুই খিচুরী খাওয়াতে পারতো। তবে কিনা টাকাটার পরিমাণ নেহাৎ কম নয়। এ টাকায় যদি সে গিয়ে উজ্জয়িনীর বিজনপ্রান্তে একখানা কাননঘেরা বাড়ি কিনে বাকি জীবন কবিতা লিখে কাটিয়ে দেয়, তবে আটকায় কে? কিন্তু কবিতা রচনা করবে কা'কে নিয়ে? মীরা তা'কে স্বামী ব'লে স্বীকার করেনি, তাকে নিয়ে কবিতা লিখতে গেলে অনুপ্রেরণা আসবে কি?

যাক্ হাসনুটা এ যাত্রা বেঁচে গেল। পুলিশের হাতে পড়েছে,—আর তা'র ভয় কি? বাইরে থাকলে নেতৃত্ব করার সুযোগ খুঁজতে হয়, আন্দোলন চালাতে হয়। তাতে আছে পরিশ্রম, ব্যর্থতা, হতাশা, অবসাদ। জেলে যেতে পারলে মান বাঁচে, স্বাস্থ্য বাঁচে এবং নিশ্চিন্ত অন্নবস্ত্র জোটে। এককালে বার দুই চেঁচিয়ে বন্দে মাতরম্ বলতে পারলে জেল্ হোতো; বার বার জেল্-এর ছাপ পড়লে নেতা হোতো; এবং নেতা হ'লেই দাদা-দিদি হয়ে উঠতো। হাসনু বেরিয়ে এলে হবে হাসনুদি। তখন আর হাসনুর ভাবনা কি? চারিদিক থেকে ছুটে আসবে ভাই-ভগ্নীরা। স্বাস্থ্যশ্রী স্থায়ী হ'লে ভক্তের সংখ্যা বেড়েই চলবে! কিন্তু দুর্ভাগ্য হিরণের, পূর্ববঙ্গের পুলিশ তা'কে কম্যুনিস্ট ব'লে সন্দেহ করা ত' দূরের কথা, কামনিষ্ঠ যুবক ব'লেও মনে করলো না; গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিল! যাই হোক, দুঃখের কিছু নেই। হাসনু অবশেষে অকুল সমুদ্রে পুলিশের কূল পেয়ে গেল। জেলে গিয়ে সে সুখে থাক্, বাইরে এসে আর যেন সে ধুলো আর ধোঁয়া না ওড়ায়!

সামনে এক চায়ের দোকানে হিরণ উঠতে গেল। কিন্তু দোকানদার হাঁ হাঁ ক'রে এগিয়ে এসে বাধা দিয়ে বললে, যাও যাও, স'রে পড়ো, ভিক্ষে টিক্ষে হবে না!

হিরণ বললে, ভিক্ষে! চা খেতে এলুম যে!

এক পেয়ালার দাম ছ' পয়সা! আছে পয়সা?

পুঁটলীর টাকায় এ দোকানখানা এখনই কিনে ফেলা যায়। কিন্তু চা পানের দরকার ছিল হিরণের। সে বললে, আছে!

তা'র চেহারা আর পুঁটলীর দিকে তাকিয়ে দোকানদার বললে, আলগোছে আগে পয়সা দাও! গেলাস-টেলাস আছে তোমার পুঁটলিতে?

না।—হিরণ জানালো।

তবে স'রে পড়ো, মিঞা। পেয়ালায় চা

দিতে পারবো না।—দোকানদার নিজের জায়গায় গিয়ে বসলো।

হাজিপুর রাজবাড়ির একমাত্র জামাই শ্রীমান্ হিরণচন্দ্র একটু হেসে আবার অন্য পথ ধ'রে এগিয়ে চললো। জীবনটা জুয়া!

অবশেষে কোনো এক ফুটপাথের ধারে সরকারি জলের পাইপের চাক্তি তুলে হিরণ স্নানের আয়োজন করলো। জলটা ঘোলা,—বর্ষাশেষের মধুমতীর বর্ণ। পুঁটলি থেকে হারু মিঞার লুঙ্গি বেরোলো। খাটো লালপাড় ধুতিখানা কেচে শুকোতে দিল ফুটপাথের এক গাছের ডালে। তারপর হেমন্তের মধুর রৌদ্রে কলকাতার রাজপথের ওপর ব'সে সংস্কারমুক্ত স্নান। বছর পাঁচেক আগেও এই পথ দিয়ে সে যেতো ট্যাক্সিতে। হাজিপুরের ভাবী জামাই,—অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা! বনভোজনে যেতো বন্ধুর দল নিয়ে,—খরচটা একা তা'র। মোটর ছুটে যাবার পর তা'র হাওয়াটায় থাকতো শুক্নো গোলাপের মৃদু গন্ধ। তার বিলাস ছিল, কিন্তু ব্যসন ছিল না। পোস্ট-গ্রাজুয়েট্ ক্লাসের বাইরে করিডরে দাঁড়িয়ে অনেক দুরাশাবতী তাকে নিয়ে কানাকানি করেছে, কিন্তু হিরণ কখনও মুখ ফিরিয়ে তাদেরকে ধন্য করেনি! আশে-পাশে অনেক চক্রান্ত হয় গেছে, কিন্তু কখনই তা'কে পুরুষ ক'রে তোলা যায়নি!

খাটো ধুতিখানা শুকিয়ে আবার সে প'রে নিল। এবার সে স্বচ্ছন্দ, ঝরঝরে। স্বাধীন হাত দুখানা দুলিয়ে সে আবার অগ্রসর হয়ে চললো। কিছুদূরে গিয়ে হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল পুঁটলিটা। তৎক্ষণাৎ সে ফিরে এলো—এসে দেখলো একটা কাক সেই পুঁটলিটা ঠোকরাচ্ছে! ছাগলের লোমের গন্ধ ওকে টেনে এনেছে!

পুঁটলিটা তুলে নিয়ে হিরণ আবার হাঁটতে লাগলো। কোথায় সে যেন শুনেছিল, কলকাতার মধ্যে এক হাজার মাইল পথ আছে। এই পুঁটলি যদি সঙ্গে থাকে, আর যদি থাকে ওই হাজার মাইল পথ,—তাহলেও কোনো অসুবিধে নেই। অনন্ত ফুটপাথ আছে, আছে অনেক বাড়ির বারান্দা, কার্জন পার্কের শেড, গঙ্গার ঘাটের ঘর, স্টেশনের মেঝে, হাট-বাজারের আনাচ কানাচ। নিজের অতীত জীবনটা সে যদি তোলাপাড়া করে, তবে আপন আনন্দে মশগুল হয়ে সপ্তাহখানেক কেটে যায়। লোকে তাকে বলবে রেফুজী,—কিন্তু কথাটা মিথ্যে। তা'র জ্ঞাতিগোষ্ঠীর ভিটে যা ছিল তা' মধুমতীর ভাঙনে তলিয়ে গেছে অনেকদিন,—ভালোই হয়েছে। জমিদারি সম্পত্তির একটা অংশ তা'র ভাগ্যে বরপণ হিসাবে জুটে যেতো,—কিন্তু সে-ঝামেলাও কেটে গেছে। পোড়া-কপালে একটা মনের মতন বউ প্রায় মিলে গিয়েছিল আর কি, কিন্তু বিধি বাম। শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বিয়ে তা'র হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বাকি পঞ্চাশভাগ হয়ে গেলে বাকি জীবনটা পান চিবিয়ে, কবিতা লিখে মীরার সঙ্গে দুটো মনের কথা ব'লে একরকম ক'রে কাটিয়ে দেওয়া যেতো! কিন্তু বিধি বাম। পুরুত বামুনের ছেলের কপালে অত সুখ সইবে কেন?

হাজার মাইল পথ আপাতত থাক্, হিরণ হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে পৌঁছলো তালতলার সেই বাড়িতে। এখানে সে ছিল অনেক-দিন, আশপাশের লোকেরা তা'কে চিনতো বৈ কি। সুতরাং দু'চারজন পল্লীবাসী তা'র দিকে সবিস্ময়ে ফিরে তাকালো। হিরণ বাইরে থেকে কড়া নাড়লো। এক মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে এলো এক স্থূল-কায় প্রৌঢ় ব্যক্তি।

কা'কে চাই?

মীরা রায় চৌধুরীকে। আছেন তিনি?

এ বাড়িতে তিনি থাকেন না!

ও, তাঁর ঠিকানাটা—?

ভদ্রলোক হিরণের দিকে আপাদমস্তক একবার তাকালেন। বললেন, ঠিকানা আছে, কিন্তু তিনি কারুকে ঠিকানা দিতে মানা ক'রে গেছেন! তুমি তাঁর কে হও?

হিরণ একটু থতিয়ে গেল। পরে বললে, আমাকে নিয়ে চলুন তাঁর ঠিকানায়, তিনিই এ প্রশ্নের জবাব দেবেন।

ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, কোত্থেকে আসছো তুমি?

তাঁদের গ্রাম থেকে।

চাষবাস করো বুঝি? নাকি সেখানকার ধোপা নাপিত?—ভদ্রলোক এবার একটা সিগারেট ধরালেন।

হিরণ হাসিমুখে হাত কচ্লে বললে, ঠিকানাটা দয়া ক'রে দিন না?

অকিঞ্চনের ভঙ্গীটি দেখে ভদ্রলোকের মনে একটু করুণার উদ্রেক হোলো। তিনি গলা বাড়িয়ে ডাকলেন, ঠাকুর—?

ভিতর থেকে সাড়া এলো,—আজ্ঞে যাই—

এই ছোকরাকে বৌবাজারের ঠিকানাটা বলে দাও ত?

একটু পরেই ঠাকুর বেরিয়ে এলো। কিন্তু হিরণকে সামনে দেখেই সে ছটফটিয়ে উঠলো,—এ কি, জামাইবাবু যে? আসুন, আসুন,—কবে এলেন? ছোড়দি কই? কেমন আছেন?

ভদ্রলোক অবাক। হিরণ বললে, ঠাকুর, ইনি বুঝি তোমার নতুন মনিব?

ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, ইনি কে, ঠাকুর?

উনি রাজবাড়ির জামাই। মস্ত পণ্ডিত লোক।—দাঁড়ান্ জামাইবাবু, আমি ঠিকানা এনে দিচ্ছি!

ঠাকুর চট্ করে গিয়ে একটি পাটকরা কাগজের টুকরো আনলো। মীরা নিজের হাতেই ঠিকানাটা লিখে রেখে চলে গেছে। এখানে চার মাসের বাড়িভাড়া বাকি। হোসেন সাহেব চাটগাঁ থেকে বাড়িভাড়ার তাগাদা দিয়ে চিঠি দিয়েছেন। হাসুবানু টাকার কোনো ব্যবস্থা করে যান নি। দিদিমণি বড্ড খামখেয়ালী,—তাছাড়া আরো অনেক কথা। আপনি এসে পড়েছেন, এবার সব দিক রক্ষে হবে।—ঠাকুরের কাছে একে একে সমস্ত কাহিনী হিরণ মন দিয়ে শুনে গেল।

এক সময়ে হিরণ প্রশ্ন করলো, তোমার দিদিমণির আর কি কি দেনা এখানে আছে?

ঠাকুর বললে, এখানে অনেক দোকানে ধার আছে। তাছাড়া আমাদের তিন মাসের মাইনে-পত্রও দিয়ে যান নি। তা প্রায় সব মিলিয়ে শ' দুই টাকা হবে!

পুঁটলিটা ওই ভদ্রলোকের সামনেই হিরণ খুললো। ভিতর থেকে একগোছা নোট বার করে বললে, তোমাদের দেনা এতেই শোধ হবে ঠাকুর,—তবে এগুলো পাকি-স্থানী নোট, বদলে নিয়ো। আর হোসেন সাহেবের হাজার টাকা আসছে-কালই আমি পাঠিয়ে দেবো! আচ্ছা, আমি এখন চললুম—

ঠিকানাটা সঙ্গে নিয়ে বিমূঢ় ভদ্র-লোকটিকে নমস্কার জানিয়ে হিরণ পুঁটলিটা ঝুলিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লো। ঠাকুর দূরের থেকেই নমস্কার জানালো। তারপর ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে সে বললে, এরা সব বিশ তিরিশ লাখ্ টাকার মালিক, বুঝলেন বড়বাবু! নজরটা একবার দেখলেন? সব ছাই চাপা আগুন!

ভদ্রলোক হঠাৎ চটে উঠলেন। বললেন,

খাটো লালপেড়ে ধুতি আর ছেঁড়া ফতুয়ায় রাজবাড়ির জামাই এলে চিনবে কে?

ঠাকুর বললে, দেব-দেবতারা ভিখিরীর বেশেই এসে দেখা দেয়, বড়বাবু! আমাদের পোড়া চোখ তাদের চিনতে পারে না।

ঠাকুর ভিতরে চলে গেল। হিরণ ততক্ষণ অনেকদূরে চলে গেছে।

বৌবাজারের এ পল্লীর নৈতিক চেহারাটা এককালে ভালো ছিল না। সন্ধ্যার পর টিপ-টিপ করে গ্যাসের আলো জ্বলতো, বস্তির আশেপাশে শোনা যেতো চাপা কথাবার্তা, মানুষের আনাগোনা ছিল রহস্যময়, কোনো কোনো দোতালার থেকে হারমোনিয়ামের আওয়াজ শোনা যেতো, উট্‌কো লোক হঠাৎ এসে ঢুকে পড়তো কোনো কোনো বাড়িতে গা ঢাকা দিয়ে, আবার হঠাৎ কোনো বস্তির থেকে চট্ করে বেরিয়ে কোনো লোক আর পিছনে না তাকিয়ে হন হন করে চলে যেতো। মুখে চোখে নির্বিকার ঔদাসীন্যটি বজায় থাকতো।

এ পল্লীতে এখন এসেছে প্রকাশ্য আভিজাত্য। কর্তৃপক্ষের তাড়নায় বহির্মুখী স্বরূপটি এখন অনেকটা হয়েছে অন্তর্মুখী। উপরের দিকটায় পোষাক চড়িয়ে পালিশ করে দেওয়া হয়েছে। এই অঞ্চলেরই কোনো একটা গলিতে ঢুকে হিরণ বাড়ি খুঁজে বার করলো। নীচে তার অনেকগুলি দোকান,—কয়লা থেকে মশলা, স্যাকরা থেকে শর্করা সবই খুঁজে পাওয়া যায়। ছোট দরজাটায় ঢুকতে গেলেই প্রথমেই নরককুণ্ড চোখে পড়ে। পাশ দিয়ে সিঁড়ি। তেতলার থেকে কারা যেন নেমে আসছে। হিরণ উঠতে উঠতে এক পাশে সরে দাঁড়ালো। ওই নরককুণ্ডের কোল দিয়ে আসছে ময়লা জল, তার সঙ্গে ময়রার দোকানের উচ্ছিষ্ট আর শালপাতার ঠোঙ্গা। অর্থাৎ এ বাড়ির আর একটা অংশে আছে খাবারের দোকান এবং পাইস হোটেল। বারো আনায় ডাল-ভাত-চচ্চরি, শেষকালে আমড়ার টক্। হঠাৎ ক্ষুধায় হিরণ জ্বলে উঠলো, কিন্তু মোটা টাকা সঙ্গে থাকলে ক্ষুধা অসহ্য মনে হয় না। তাছাড়া রাজ-কন্যার দর্শনে এলে ক্ষুধার কথা ভুলতে হয়।

মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। দোতলায় উঠে এলেও সেই সমানই আবছা অন্ধকার। পাশেই সরু আনাগোনার পথ, সেখানে দুপা এগিয়ে মুখ বাড়িয়ে হিরণ দেখলো তিনটি লোক বসে রয়েছে। নীচের থেকে এদেরই সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল। সেই ঘর ছেড়ে আর দুপা এগিয়ে যেতেই এ ঘর থেকে একটি লোক বল্লে, কোথা যাচ্ছ হে, ওদিকটা যে অন্দরমহল,—দেখতে পাচ্ছ না?

হিরণ থমকে দাঁড়ালো। দ্বিতীয় লোকটি প্রশ্ন করলো, এখানে কি চাই? মতলবটা কি?

হিরণ ওদের দিকে সটান্ তাকালো। তার-পর বললে, আপনারা কে?

ওরা এ লোকটার স্পর্ধা দেখে অবাক। একজন বললে, আমরা সরকারী লোক। কিন্তু আমরা যেই হই, তোমার এখানে কি দরকার? দেখতে পাচ্ছ না ওপাশে মেয়েরা থাকেন? এই জন্যেই মীরা দেবীকে বলি, আপনি দরজা কখনও খুলে রাখবেন না। এ পাড়াটায় দিনে হয় চুরি, রাত্রে হয় বদ্-মায়েসী। কিন্তু উনি সরল মানুষ, এ সব বোঝেন না। যাও, এক্ষুনি নীচে নেমে যাও, নৈলে—

হিরণ একবার ওদের দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হেসে দিল। ওরা দৃষ্টিমান হলে বুঝতো, এ হাসির মধ্যে ছিল সমস্ত জীবন যৌবনের মধুরতম আনন্দ। কিন্তু সে পলকমাত্র, তারপরেই হিরণ চট্ করে, গিয়ে ঢুকলো পাশের ঘরে।

বাইরের থেকে ওরা হাঁ হাঁ করে কোলাহল করে উঠলো। একটা হৈচৈ লেগে গেল এক মুহূর্তে। পর্দা সরিয়ে ভিতরে গিয়ে ঢোক-বার সাহস কারো হোলো না, কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পরেই মীরা এগিয়ে এসে ঝোলানো পর্দাটাই নিজের গায়ে জড়িয়ে শুধু মুখ-খানা বাড়িয়ে বললে, আপনাদের অপেক্ষা করতে বলেছি, কিন্তু চেঁচাতে বলি নি!

ওরা চেঁচিয়ে উঠলো—আপনার ঘরে একজন উট্‌কো লোক এইমাত্র ঢুকে পড়েছে!

ঢুকলে ক্ষতি নেই! বড় জোর আমার সম্ভ্রম নষ্ট হবে, তার বেশী কিছু হবে না আপনারা যান—গিয়ে বসুন গে।—এই বলে মীরা ওদের মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করে দিল।

মীরার আচরণ পূর্বাপর এইরূপ। এ অভিজ্ঞতা ওদের আছে। ওরা ভোঁতা মুখ নিয়ে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসলো।

ভাঙা তক্তাখানার পাশে গিয়ে হিরণ লুকিয়েছিল। দুজন গুণ্ডায় ভয় কম, কিন্তু তিনজনে হয় জনতা। জনতার মনোবৃত্তি তার জানা আছে, আক্রোশের মাথায় দু'ঘা বসিয়ে দিলে তাদের বাধা দেয় কে?

দরজাটা বন্ধ করে মীরা দাঁড়ালো হিরণের মুখোমুখি। কিন্তু বাইরের দিকে গোলমাল শুনে ভিতর থেকে একটা বুড়ি এসে দাঁড়ালো। সম্ভবত ঝি আর রাঁধুনি মিলিয়ে এক। বললে, ওমা, আমি বলি আবার কি হোলো! তোমাকে নিয়ে গোলমাল একটা লেগেই আছে কিনা। এত বেলা অবধি ঘুমোচ্ছিলে আজ, ভাবলুম শরীরটা বুঝি ভালো নেই! ইনি কে গা, দিদি?

বুড়ি একটু হাসলো। মীরা বললে, থামলে কেন, মানদা? আরেকটু বলো? কেচ্ছাটা কানে তুলে দাও?

বুড়ি আবার হাসলো। বললে, ছি, এ কি একটা কথা? মানুষ হোলো লক্ষ্মী, তা সে যেই আসুক না কেন? হোক না ধোপা-নাপ্তে,—সোনার আংটি ব্যাঁকা হলে কি তার দাম কমে?

হিরণের দিকে একবার আড়চক্ষে তাকিয়ে বুড়ি বেরিয়ে গেল।

মীরা জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। হিরণ তক্তাখানার ওপর বসলো। দুই পায়ে তার এক হাঁটু ধুলো। ঘরখানার বাঁধুনি শক্ত, কিন্তু বাড়িটা পুরানো কালের। হিরণ এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। এক সময়ে শান্ত কণ্ঠে সে বললে, কপালে কাটার দাগ দেখলুম কেন?

মীরা পিছন ফিরলো না। সেইখানেই দাঁড়িয়ে বললে, পা টলতে-টলতে পড়ে গিয়েছিলুম।

সে কি, কোথায়?

গ্র্যাণ্ড হোটেলের ফুটপাথে!

হিরণ চুপ করে গেল। ঠোঁটের আগায় প্রশ্নটা এসেছিল, সেই ফুটপাথের ওপর কপালের থেকে যে-রক্ত ঝরেছিল, সেই রক্ত বিমলাক্ষ ডাক্তার মাড়িয়েছিল কিনা! কিন্তু প্রশ্নটা সে গিলে ফেললো। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলো, ঘরের মধ্যে কোনো আসবাবপত্র নেই। ভাঙা তক্তার ওপর শতছিন্ন বিছানা, মেঝের উপর গোটা তিনচার এলুমিনিয়ম আর কলাইয়ের বাসন, ছোট্ট একটা কাঠের ফ্রেমে আঁটা ময়লা একখানা আয়নার সঙ্গে একটি দাড়ভাঙা চিরুণী লট্‌কানো। কুলুঙ্গীর

শিশিতে একটু তেল। এক কোণে একখানা আধময়লা শাড়ি ছিন্নভিন্ন করা রয়েছে। একপাশে টিনের একটা তোরঙ্গ। ঘরের দেওয়ালে উড-পেন্সিলে লেখা নানা আজগুবি বাক্য, আর দুই চারিটা উদ্ভট নাম-ঠিকানা। এ পাশে ফুটো জলের কলসীর থেকে আধখানা ঘরে জল গড়িয়ে গেছে। কেমন একটা বুকচাপা দারিদ্র্য আর মালিন্যে সমস্তটাই যেন রুদ্ধশ্বাসে চুপ করে রয়েছে। হিরণের গলার মধ্যে অনেক-দিন আগের হাসনুর কণ্ঠস্বরটা যেন ঠেলে উঠে আসছে! মীরার চোখের জল দেখে হাসনু একদিন তাকে বলেছিল, তুই না পুরুষ, চুলের ঝুঁটি ধরে চোখের জল মুছিয়ে দিতে পারিসনে?

অনেকক্ষণ পরে গলাটা পরিষ্কার করে হিরণ প্রশ্ন করলো, বাইরের ভদ্রলোকরা কি বসেই থাকবেন?

মীরা এবারেও এদিকে ফিরলো না। শুধু মৃদুকণ্ঠে বললে, ওরা বসে থেকেই আনন্দ পায়!

কে ওরা?

ওরা ভক্ত!

হিরণ বললে, কিছু প্রার্থনা আছে কি?

মীরার গলাটা একটু কাঁপলো। বললে, আমি পরিহাস করার জন্যে এখানে কাউকে ডাকিনি!

হিরণ হাসিমুখে বললে, কিন্তু আমি এখানে পরিতাপ করবার জন্যেও আসিনি?—কই, বুড়ি গেল কোথায়?

কেন?—মীরা এবার মুখ ফিরালো।

হিরণ বললে, দিন দুই আগে গোটা-আষ্টেক পাকিস্থানী রসগোল্লা খেয়েছিলুম। বুড়ি কিছু খেতে দিলে খুশী হই!

মীরা বললে, পাকিস্থানী রসগোল্লা খেয়ে যদি দুদিন চুপ করে থাকা যায় তবে পাকি-স্থানে ফিরে গিয়ে খেতে চাওয়াই ভালো? এক মাসের জন্যে পশ্চিমে বেড়াতে গিয়ে ছ' মাস পরে কোত্থেকে আসা হোলো শুনি?

হিরণ বললে, হাসনুকে নিয়ে শ্বশুর-বাড়িতে বাস করতে গিয়েছিলুম। চমৎকার ঘরকন্না পেতেছিলুম। রাজবাড়ির ধন-দৌলতের মধ্যে ডুবে দুজনের সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটছিল,—

মীরা বললে, সে ত চেহারাতেই প্রমাণ, পোষাকেই পরিচয়! ধোপা-নাপতেরও পয়সা জোটেনি!

হিরণ একটু দমে গেল। গল্পটা আর জমতে পারলো না। পুঁটলির থেকে টাকা নিয়ে চকচকে কাপড়জামা কিনে পরে এলেই ভালো হোতো! চেহারার উন্নতি না হোক শ্বশুর বাড়ির মান বাঁচতো!

মীরা এক সময় প্রশ্ন করলো, হাসনু এলো না কেন?

হিরণ জবাব দিল, তাকেও শ্বশুর বাড়িতে যেতে হোলো!

মানে?

মানে, পুলিশ এখন থেকে তার ভাত-কাপড় জোগাবে! আমার কপালে সে-সৌভাগ্য নেই, তাড়া খেয়ে ছিটকে এলুম।

ছোটখুড়ি কোথায়?

আমরা যেদিন হাজিপুরে গিয়ে পৌঁছলুম, সেই দিন থেকে তিনি নিরুদ্দেশ। তাঁকে আর অত্রিকে ফকিরের মা পাচার করে দিয়েছে!

কেন?

হিরণ বললে, ছোটখুড়ি প্রায় সিংহাসনে বসেছিল, কিন্তু স্টেটের বর্তমান ম্যানেজার আকুমার ব্রহ্মচারী হামিদ সাহেবের কোনো এক প্রস্তাবে আপাতত রাজী হতে না পেরে ছোটখুড়ি পালিয়ে বাঁচে!

মীরা জিজ্ঞাসা করলো, প্রস্তাবটা কি?

কী প্রকার প্রস্তাব জানা যায় নি, তবে সেটা গ্রহণ করার পক্ষে নাকি নৈতিক বাধা ছিল!

মীরা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। পরে বললে, আপাতত রাজী হতে পারেন নি মানে? পরে রাজী হবেন?

হিরণ বললে, নিরবধি কাল এবং বিপুলা পৃথিবী সেকথা জানে। তবে কিনা মেয়ে-ছেলে যে-প্রস্তাবটা পরবর্তী কালে মেনে নেয়, প্রথম দিকে সেটাতে ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে থাকে।

কে যেন মীরার ঝুঁটি ধরে নেড়ে দিল। হঠাৎ থতিয়ে সে চুপ করে গেল। হিরণ একবার তাকালো তার দিকে, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ভিতরের দিকে। সেখানে গিয়ে দেখলো, একখানা কালিঝুলি মাখা ঘরের সামনে বসে বুড়ি একমুঠো ডাল বাছছে। অতি সবিনয়ে হিরণ বললে, এখানে বসে কি হচ্ছে,—আমি আলাপ করতে এলুম, বুড়িদিদি!

মানদা বিরক্ত হয়ে মুখ তুললো। বললে, বুড়িদিদি কি গো, আমার নাম মানদা। বৌবাজারের মেয়ে কখনো বুড়ি হয় না।

হিরণ তৎক্ষণাৎ বললে, বড্ড যে ক্ষিধে পেয়েছে, মানদা?

তা আর পাবে না, বেলা যে গাড়িয়ে গেল!—গলা নামিয়ে মানদা বললে, রান্না-বান্নার নামগন্ধও নেই! হবে কোত্থেকে? আমি বলি বাছা অত বাছ-বিচার কেন? পয়সা সকলের আগে, তারপর অন্য কথা! পেটের কথা পেটেই থাক্,—কিন্তু পেটটা ত চলা চাই? কাপড়-চোপড় গয়না-গাঁটি কিছুর অভাব থাকবে না,—মানুষ ঘরে এলেই হোলো! মানুষই লক্ষ্মী!

হিরণ বললে, মানদা, তোমার মতন আপন আর ওর কে আছে বলো?

উৎসাহিত হয়ে মানদা বললে, কা'র কথা কে শোনে, বাপু। ঘর না হয় ভেঙেগেছে, তা অত মন খারাপ কেন,—নতুন ঘর বানিয়ে নিতে কতক্ষণ? আর তাও বলি, তোমার বাছা অভাব কি? মেয়েমানুষের চে'হারার জৌলুস যদ্দিন, তদ্দিন দুঃখু কিসের?

হিরণ বললে, ঠিকই ত'! জজেও মানবে একথা!

মানদা আরো গলা নামালো। বললে, লোকজনের ত' আর অভাব নেই! নিত্যিই আসছে দলে দলে! দরজার গোড়ায় কাঁড়ি-কাঁড়ি জিনিসপত্তর রেখে যায়,—কিন্তু মেয়ের আর কিছুতেই মন ওঠে না!

কেন বলো দিকি, মানদা?

আমি বলি কি জানো?—মানদা বললে, ওর মনে কেউ একজন ছুঁয়ে আছে! সেই কাঁটা না তুলতে পারলে ওর সুখ নেই, বাছা!

হিরণ বললে, কে বলো দিকি, মানদা? কোনো ডাক্তার-বদ্যি?

উহুঁ, না,—এদেশে সে থাকে না! সে থাকে দেশ গাঁয়ে!

তুমি জানলে কেমন ক'রে, মানদা?

ওমা, তা আর জানবো না? নেশা করলে ছুঁড়ির জ্ঞান-গম্যি থাকে নাকি?

নেশা!

হ্যাঁ গো, ভাত না জুটুকু—ওটা চাই! এই ত' আজ দুদিন হোলো, খেয়েছে কিছু? এক একদিন পেটের ব্যথায় ছট্‌ফট্ করে!

হঠাৎ পিছন দিকে এসে দাঁড়ালো মীরা। কঠোরকণ্ঠে বললে, এখানে ব'সে-ব'সে বুঝি গোয়েন্দাগিরি হচ্ছে?

আর বাছা!—মানদা ব'লে উঠলো, গোয়েন্দাগিরিই ত' বটে! সেকাল কি আর

আছে? তাই বলছিলুম, এই দ্যাখোনা কাঁচামগের ডাঁস, পাঁচ পোর দাম এক টাকা! সরষের তেল আড়াই টাকার কমে নেই! ঘি ত' দেশ ছাড়া! গোয়েন্দাগিরির নয়ত কি বাছা? কোম্পানীর রাজত্ব গিয়েই ত' এই দুর্গতি! বলতে বলতে মানদা উঠে পড়লো।

হিরণ বললে, আসবার সময় অমনি একটা নাপতে ডেকে এনো, মানদা!

এক্ষুণি যাচ্ছি—এই ব'লে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

মীরা বললে, ঘোলা জলে মাছ ধরতে আসা হয়েছে বুঝি?

মানদা একবার দুজনের দিকে তাকালো, তারপর চাপা খুশী চেপে রেখেই সটান বেরিয়ে চ'লে গেল!

হিরণ উঠে দাঁড়ালো। বললে, মাছ ধরতে পারলে দুটি মাছের ঝোল-ভাত এখনি খেতে পেতুম।. পেটে আগুন জবলছে।

মীরা মুখ ফিরিয়ে চলে এলো, হিরণ এলো পিছু পিছু। মীরা বললে, খেতে চাইলে পয়সা লাগে, অমনি খাওয়া যায় না!

হিরণ বললে, ঘরে কি কিছু নেই?

আর্তকণ্ঠে মীরা বললে, না!

ও, অতিথিরা বুঝি সবই খেয়ে গেছে! হাঁড়ির মধ্যে খুঁজে দেখলে হয় না? অন্তর্যামী নারায়ণ বড়ই ক্ষুধার্ত! সত্যিই নেই কিছু? অন্তত এক কণা শাকান্নের অবশেষ?

হঠাৎ আগুন হয়ে উঠলো মীরা। বললে, না, কিছু নেই। এখানে এসে আমাকে অপমান করার কোনো দরকার ছিল না!

হিরণ থমকে দাঁড়ালো। তারপর বললে, এতদিনের চাকরি, মাসে মাসে আড়াইশো টাকা,—কিছু জমেনি?

তিন মাস হোলো সে-চাকরি নেই! টাকার দরকার যদি হয়, ওঘরে ভক্তরা আছে,—চাইলে দশ বিশ টাকা এখনই দেবে!—মীরা মুখ ফিরিয়ে নিল।

স্তব্ধ বিস্ময়ে হিরণ দাঁড়ালো। মীরার গলার ভিতর থেকে আসছে একটা ভাঙ্গা আওয়াজ। মাথার চুল রুক্ষ, জটপড়া। কপালে সেই অদ্ভুত নতুন ক্ষতচিহ্ন, তার নীচে চোখের কোলে কালির ছাপ। স্বাস্থ্যের দিকে তাকালে আজো গা ছম ছম করে, কিন্তু তা'র পেলব চিক্কণতা যেন ছয়মাসের মধ্যেই নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। সমস্ত চেহারাটায় পড়েছে একটা ধূলিধূসর আবরণ; মনে হচ্ছে নিজের শারীরিক পরিচ্ছন্নতার দিকেও মীরার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। বুঝতে পারা যায়, এ-মেয়ে হাসনু নয়, এ অন্য। আপন ওজঃশক্তির দ্বারা জীবনের উপরে দাঁড়িয়ে অধিনায়কত্ব করে না,—এ মেয়ে মর্মে-মর্মে দগ্ধ হয়, একদিন জীবনের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিয়ে চ'লে যায়। এ মেয়ে লোভ আর লালসা নিয়ে জন্মায়নি, জন্মেছিল প্রবল একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে—কিন্তু কালচক্রের কুটিল সংঘাতে সে প্রতিমা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। এ হাসনু নয় যে, ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহ ঘোষণা করবে; এ হোলো মীরা—অন্তরে অশ্রুমুখী, বাহিরে রুদ্ধরোষের রক্তাভা! এ মেয়ে আত্মনাশ করে, কিন্তু আত্মপ্রকাশ করতে চায় না।

বাইরে থেকে দরজায় টোকা পড়লো। মীরা গায়ের কাপড় টেনে এগিয়ে এসে দরজাটা এবার খুললো। পাশের ঘরের ছোকরাদের একজন বললে, আমরা কি আর অপেক্ষা করবো?

মীরা বললে, অনেক ধন্যবাদ আপনাদের। কিন্তু ওই চাকরিতে আমি আর ফিরে যাবো না।

তা হ'লে আপনার চলবে কেমন ক'রে? এত অভাব-অনটনের মধ্যে আপনি থাকবেন, —এ আমাদের সকলের পক্ষেই লজ্জার বিষয়।

মীরা বললে, আমাকে আর কিছুদিন ভাববার সময় দিন্!

বেশ ত, সময় নিন্ না? তবে যদি বলেন, আমরা এখন কিছু টাকাও আপনাকে দিয়ে যেতে পারি। নিন্ না গোটা পঞ্চাশেক টাকা—

অত্যন্ত বিব্রতকণ্ঠে মীরা বললে, আপনাদের কাছে ঋণ আমি মনে রাখবো। কিন্তু এখন আর টাকা চাইনে। দরকার হ'লে টেলিফোনে আপনাদের খবর দেবো।

অত্যন্ত বিমর্ষভাবে নমস্কার জানিয়ে তা'রা চ'লে যাচ্ছিল; হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে আবার একজন জিজ্ঞাসা করলো, যে-লোকটি তখন এলো, সে কে জানতে পারি কি?

পারেন বৈ কি—মীরা জবাব দিল, ও হোলো রাতদিনের লোক।

আপনার এখানে থাকতে এলো বুঝি?

সহসা হাসুবানু যেন এসে মীরার কণ্ঠের মধ্যে জায়গা নিল। বিরক্তি চেপে সে বললে, হ্যাঁ, লোকটি তেমন ভালো নয়, সব জায়গায় তাড়া খেয়ে আমার এখানে এসে উঠেছে!

সবিস্ময়ে তা'রা বললে, অমন লোককে জায়গা দিলেন?

জায়গা ত' দিইনি, জায়গা নিয়েছে!—আচ্ছা নমস্কার!—মীরা আবার দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এদিকে স'রে এলো।

তা'র কণ্ঠের মধ্যে রুগ্নতাটা যেন চিঁ চিঁ করছিল। সুতরাং পরিহাসটার মধ্যে সরসতা থাকলেও হিরণ হাসতে পারলো না।

মীরা এখানে-ওখানে-সেখানে কী যেন খুঁজলো, তারপর টিনের তোরঙ্গটা খুলে ভিতরটা খানিকক্ষণ হাঁটকালো। শেষে নিরুপায় হ'য়ে ভিতরের দরজার চৌকাঠে গিয়ে পিছন ফিরে ব'সে পড়লো। হিরণ তা'র দিকে তাকিয়ে সমস্তটা লক্ষ্য করছিল, —কিন্তু এমন সাহস তা'র ছিল না, গত পাঁচ ছয়মাসের কাহিনীর সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করে। অবশ্য আভাসে-আন্দাজে-আলাপে মোট কথাটা জানতেও তা'র কিছু বাকি নেই। হঠাৎ ঝড়ে বানচাল হয়ে দিশাহারা জাহাজখানা ঘুরছিল অন্ধকার সমুদ্রে, এবার ধীরে ধীরে অতল তলে তলিয়ে যেতে বসেছে।

সাধারণ লোক মনে করতো, মেয়েটা উদ্‌ভ্রান্ত, দুর্বলচিত্ত,—নিজের একটা যুক্তি-হীন জিদের জন্য নিজের দুর্ভাগ্য টেনে এনেছে। রেফুজী মেয়ে,—হোক না কেন জমীদারের মেয়ে—যখন আশা-ভরসা আর কিছু নেই, তখন এমন হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা কেন? ছেলেটাকে স্বামী ব'লে মেনে নিয়ে কোথাও গিয়ে ঘর বেঁধে দুঃখের ভাত সুখে খেতে ত' পারতিস? এইপ্রকার প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসানোর মধ্যে চরিত্রের শৈথিল্য নেই কি? তোর মধ্যে আছে কদর্য লোভ, কুৎসিত কামুকতা, বীভৎস বাসনার ক্ষুধা,—এটা চাপা ছিল তোর মধ্যে, অবস্থার গুণে সেগুলো প্রকাশ পাচ্ছে! তুই জীবেন্দ্রনারায়ণের মেয়ে হয়ে এই নোংরায় স্বেচ্ছায় ডুব দিলি! মুখে বলছিস প্রতিশোধ, আর ভিতরে ভিতরে লোভের আর বাসনার পরিতৃপ্তি! বিমলাক্ষর মতো দুশ্চরিত্র লোকও তোর দুষ্প্রবৃত্তির চেহারা দেখে ভয়ে পালিয়ে গেছে!

এটা সাধারণ লোকের কথা, হিরণের কথা নয়। হিরণ জানে, এর সবগুলোই মিথ্যে! সে জানে এগুলো অপমৃত্যুর আয়োজন মাত্র, কিন্তু এর মধ্যে মহিমার বিলুপ্তি নেই!

উষ্ককণ্ঠে হঠাৎ মীরা বললে, মানদা গেল কোথায়?

হিরণ বললে, নাপতের খোঁজে গেছে, আসবে এক্ষুণি।

মীরা বিরক্ত বিব্রত হয়ে উঠেছিল। এবার বললে, আমাকে এমন বিপদে ফেলা কেন? আমার নিজেরই চলে না, অতিথি সংকার আমি করবো কোত্থেকে? আগে থেকে জানলে না হয় তৈরী হয়ে থাকতুম!

হিরণ এবার হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালো। বললে, থাক্ ব্যস্ত হ'তে হবে না! অতিথি হ'লে ভাবনার কথা ছিল বৈ কি। কিন্তু আমি যে রাত দিনের লোক, মনিবের বাড়ি কি আর শুধু হাতে এসেছি?—এই ব'লে সে ঘরের কাজে লেগে গেল।

বিছানাটা ঝাড়লো, ছাড়া কাপড় সরিয়ে এক পাশে রাখলো, বাসনগুলো গুছিয়ে এক কোণে সরালো, ছেঁড়া কাপড় একত্র ক'রে পুঁটলি বাঁধলো। কাপড়ের টুকরোর সাহায্যে জলে-ভাসা মেঝেটা পরিষ্কার করলো। দশ মিনিটের মধ্যে ঘরের চেহারাটা ফিরিয়ে দিল। ঘরকন্না গোছাবার কাজ হিরণ ভালোই জানে।

মীরা বললে, এসব আচরণের মানে কি? আমি কিন্তু এক্ষুণি বাড়ি ছেড়ে চ'লে যাবো!

হিরণ বললে, গেলে খুশী হই, আমিও পিছনে পিছনে গিয়ে একটা ভদ্রপল্লীতে বাসা নিই।

মীরা তৎক্ষণাৎ জ্ব'লে উঠলো। তপ্তকণ্ঠে বললে, ভদ্রপল্লীতে বাসা আমি নিতে পারতুম না? আমি জানিনে ভদ্রজীবন কা'কে বলে? জানিনে কা'কে বলে ভদ্র মন?—বলতে বলতে অগ্নিশিখার মতো মীরা দাঁড়িয়ে উঠলো।

খোঁচাটা কোথায় লেগেছে হিরণ জানে। শান্ত দৃষ্টিতে সে তাকালো। দারিদ্র্যে দুরবস্থায় আর অপমানে চেতনাটা তা'র হয়ে উঠেছে ধারালো; সুতরাং আহত সর্প উঠে দাঁড়ালো ফণা তুলে। মীরা চেঁচিয়ে উঠলো, কেন এ দুর্দশা, কেন এ অপমান? কোথায় আমার দোষ? কেন বরদাস্ত করবো এ অনাচার? কা'দের অন্যায়ের জন্যে এই নোংরায় ডুবতে হয়েছে? আমি চললুম—

বাতাস পেয়ে দাবানল জ্ব'লে উঠেছিল। আলুথালু অবস্থায় মীরা ছুটে গেল সিঁড়ির দিকে। চীৎকার কতদূর অবধি পৌঁছলো ঠিক জানা গেল না, কিন্তু পলকমাত্র। তারপরই হিরণ দ্রুত এগিয়ে গিয়ে তা'র হাতখানা ধ'রে ফেললো। চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে মীরা বললে, না, না, আমি চ'লে যেতে চাই, আমি মুক্তি চাই—

মৃত্যুর আগে মুক্তি নেই!—ব'লে হিরণ তা'কে টেনে নিয়ে এলো। কিন্তু ঘরের দিকে নয়, সোজা তা'কে ধ'রে নিয়ে গেল ভিতর দিকের কলতলায়। সেখানে গিয়ে তা'র আশৈশবের সহচারিনীকে ধ'রে জল-ধারার নীচে বসিয়ে দিল। মীরা প্রতিবাদ করতে গেল, হিরণ বললে, চুপ,—আর কিছু শুনতে চাইনে।

জল পড়তে লাগলো মাথার চাঁদিতে; মীরা চোখ বুজে রইলো, হিরণ ধীরে ধীরে মাথার উপর হাত চাপড়ে দিতে লাগলো। গায়ে-মাখা সাবান ছিল হাতের কাছে, সেখানা সামনে এগিয়ে দিয়ে হিরণ গিয়ে ঘর থেকে আনলো তেলের শিশি আর তোরঙ্গ থেকে একখানা যেমন তেমন শাড়ী। অস্ফুট শৈশবকালের সেই নিত্য সহচরী,—মাঝখানে শুধু ঘ'টে গেছে যুগান্তর। সেই মানুষ হয়ত আজ হারিয়ে গেছে, কিন্তু সেই মন হারায়নি।

পিছনে দাঁড়িয়ে মীরার মাথার চুলের জট ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে তেল আর সাবান দিয়ে হিরণ পরিষ্কার ক'রে দিল। এতটুকু আড়ষ্টতা নেই দুজনের, কেননা এতটুকু অস্পষ্টতা নেই দু'জনের সম্পর্কের মধ্যে। এখানে তাদের সত্য পরিচয়,—বাকি পরিচয়টা হোলো লৌকিক, যেটা লোক-সমাজের মুখ-চাওয়া। এক সময় হিরণ প্রশ্ন করলো, ঠাণ্ডা জল ভালো লাগছে?

মীরা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। পিছন দিকে ফিরলে সে দেখতে পেতো স্বভাবকবির একজোড়া আশ্চর্য চোখ। সেই চোখ দুটোও রাঙা, কিন্তু তা'তে আছে একপ্রকার বিচিত্র কোমলতা; উৎপীড়িত মানবাত্মার জন্য যুগে যুগে যাদের চোখে বেদনার অশ্রু জমা হয়,—এ চোখ সেই মানুষের। হিরণ ওকে স্নান করিয়ে দিল।

স্নানের পর শাড়ীখানা হাতে দিয়ে হিরণ বেরিয়ে এসে পুঁটলীর থেকে টাকা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। মিনিট পনেরো পরে সে যখন আবার ফিরে এলো, তখন তা'র সঙ্গে নীচের হোটেলের এক ছোকরা দু'জনের জন্য রান্না খাদ্যসামগ্রী নিয়ে উঠে এসেছে। হিরণের হাতে ছিল দই, মিষ্টান্ন আর কয়েক টুকরো পাতি লেবু। ছেলেটা ঘরের মধ্যে এসে দুখানা থালায় প্রচুর ভোজ্য বস্তু সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে গেল।

মীরার হাত ধ'রে হিরণ পাশে বসিয়ে দিল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে মানদা জানালো নাপতে পাওয়া গেল না। কিন্তু মুখ বাড়িয়ে দু'জনের ভোজনপর্বটা দেখে সে হাসিমুখে স'রে গেল।

জানলাগুলি খোলা। ভরা রৌদ্র ছিল হেমন্তের নীল আকাশে। দেখতে জানলে সমস্তটাই বিস্ময়কর লাগে। মীরার ক্লান্ত চোখ দুটো ছিল নিমীলিত, এতকাল পরে যেন সেই দৃষ্টিতে এসে স্পর্শ করেছে মধুরের আবেশ। শিয়রে ব'সে হিরণ তা'র মাথার চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

মৃদু কণ্ঠে এক সময়ে মীরা বললে, তালতলার বাড়িতে আমার দেনা আছে, ওটা তুমি শোধ ক'রে দিয়ো।

হিরণ প্রশ্ন করলো, আর কোথায় কে টাকা পাবে?

এ বাড়িটা হোলো মানদার এক বোনপোর, তা'র কাছেও দু'মাসের বাড়িভাড়া বাকি,—তা'ছাড়া বাইরের কিছু দেনা আছে!

হিরণ বললে, হাসনু যাবার আগে তোমাকে অনেক কাপড়-চোপড় কিনে দিয়েছিল,—আরো নানা জিনিসপত্তর,—সে সব গেল কোথায়?

মীরা বললে, মানদাই সব বিক্রি করেছে, নৈলে এতদিন চললো কেমন ক'রে?

হাতের চুড়ি দু'গাছা?

মানদার ভাইঝিকে দিয়েছি!

হিরণ বললে, মাঝে মাঝে দান-খয়রাৎ করা মন্দ নয়,—কিন্তু দেহটার ওপর অত্যাচার করলে যে সন্ন্যাসী হওয়াও যায় না, তা জানো?

মীরা চুপ ক'রে রইলো। হিরণ তা'র মাথার সামান্য ভিজা চুলের রাশির মধ্যে হাত বুলিয়ে চললো। এক সময়ে পুনরায় সে প্রশ্ন করলো, হাসনু যে কয়েক হাজার টাকা তোমার কাছে রেখে গিয়েছিল, সেগুলোও কি খরচ হয়ে গেছে?

মীরা কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইলো। দেখতে দেখতেই আবার তা'র কণ্ঠে এলো উত্তেজনা। বললে, পাঁচ সাত দশজনে মিলে বিলিতি হোটেলে চাক বাঁধলে সে-টাকা কতক্ষণ থাকে?

পাঁচ সাতজন!—হাসিমুখে হিরণ বললে, মানে?

মানে একটুও অস্পষ্ট নয়! সব যখন গেছে তখন দেহটাই বা থাকে কেন? কাক, চিল, শকুনি—দেশে অনেক আছে!—মীরা যেন ডুকরে উঠলো।

জানলা খোলা থাকলেও ঘরে বোধ হয় গুমোট ছিল। মীরার কপালে ও মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা

দিয়েছিল। আঁচলটা টেনে নিয়ে হিরণ হাসিমুখে মীরার মুখখানা সযত্নে মুছিয়ে দিল। পরে বললে, চাকরিটা ছাড়লে কেন?

মীরা বললে, বিমলাক্ষ ডাক্তার কলকাঠি নেড়ে দিয়েছিল।

সবিস্ময়ে হিরণ বললে, সে কি, বন্ধু শত্রু হোলো কেন?

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে বন্ধুও শত্রু হয়! একদিন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম, সম্ভবত সেইদিনই সে আমার বাক্স-ডেস্ক হাঁটকে চিঠির তাড়াটা হাত সাফাই করে!

হিরণ বললে, শুধু চিঠির তাড়াটা নিয়েই সে তোমাকে রেহাই দিল? বিমলাক্ষর বন্ধুত্ব ত এ ধরণের নয়!

ঘাড় বাঁকিয়ে মীরা বললে, আমার কাছে কি তুমি স্বীকারোক্তি আদায় করতে চাও?

হিরণ আবার হেসে উঠলো। সেই মধুর স্বচ্ছ হাসি মীরার অজানা নয়। সেই সস্নেহ নম্র হাস্যে হিরণ বললে, মানুষ আজও সভ্য হয় নি, তাই আদিম বৃত্তি ছাড়িয়ে আজও সে ওপরে ওঠে নি! এতকাল আমি যাঁকে শ্বশুর মনে করে এসেছি, যাঁর হাতে আমি মানুষ—তিনি এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন যে, মুক্তি যদি নিতে হয়, তবে ভালোবাসার শাসন-বাঁধনকেও স্বীকার করা চলবে না। কেননা ওর মধ্যেও আছে মানবিক হিংসা বিদ্বেষ ইতরতা, কাম ক্রোধ লোভ! তোমার কাছে স্বীকারোক্তি চাইনে, কিন্তু চেয়েছিলুম বিমলাক্ষকে জানতে। কাক-চিল-শকুনির দলে বিমলাক্ষও পড়ে, সুতরাং তারা মানুষ নয়। মানুষ হলে জানতো তোমাকে বিশ্বাস করে কেউ কোনো-দিন ঠকে নি!

মীরার চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল। কিন্তু আহত আতুর কণ্ঠে সে বলে উঠলো, তুমি বুঝি এবার আমাকে বিশ্বাসের বাঁধনে বাঁধতে চাইছ? এবার বুঝি আমাকে স্নান করিয়ে ঘরে তুলতে চাও? আমি অশুচি বলেই বুঝি আমাকে সান্ত্বনা দিতে এলে? নীচে নেমে গিয়েছি বলেই বুঝি তুলে ধরতে চাইছ?

মীরার মাথার চুলের মধ্যে হিরণের হাত-খানা হঠাৎ একবার থেমে গেল। কিন্তু সে অল্প কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপরে আবার তার আঙ্গুলগুলি চুলের রাশির মধ্যে বিচরণ করতে লাগলো। এতটুকু উত্তেজনা তার মধ্যে নেই। গলাটা একবার সে পরিষ্কার করে নিল, তারপর বললে, আজ আমার অভিমত শুনে তোমার কী হবে? আমাকে কি কখনো মানুষ বলে মেনেছ? পুরুষ বলে জেনেছ?—থাক্ থাক্, জবাব আমি চাইনে!

মীরা জবাব দিল না, শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। হিরণ বলতে লাগলো, আমি আজো রূপকথার ভক্ত, আজো কবিতা লিখি মনে মনে। তোমাকে তুলে আনতুম মধুমতীর কোল থেকে, তুলে আনতুম তোমাকে গোলাপের বাগান থেকে, —যেখানে তুমি ঘুমিয়ে পড়তে চাঁদের আলোয়! তুমি পালিয়ে যেতে লোচনবিল পেরিয়ে বদন মিঞার বাড়িতে জুলেখার ঘরে,—আমি তোমাকে টেনে আনতুম আন্দ-কানের ভিতর থেকে। এক সংসারে মানুষ হয়েছি, একই থালায় খেয়েছি দুজনে, এক ঘরে ঘুমিয়েছি বাল্যকাল থেকে। সেই তুমি আমার কাছে মিথ্যে নয়, এই তুমি আমার কাছে সত্যি নয়! মধুমতীর বুকের বিস্তার অনেক বড়, এপার ওপার দেখা যায় না,— আজ যদি তার ওপর দিয়ে নোংরা কিছু ভেসেই যায়, তবে তাকে অপবিত্র বলে মনে করবো,—আমি কি এমনই ছেলেমানুষ?

মীরার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এলো। হিরণ বললে, থাক্ এখন এ আলোচনা! তোমাকে শুধু জানিয়ে রাখি, তালতলার বাড়ির সমস্ত দেনা আজ সকালে আমি শোধ করে দিয়েছি, এখানকার দেনাও দিয়ে দেবো। হাসনু যা টাকা দিয়েছে তাতে আপাতত চলে যাবে।

মীরা পাশ ফিরলো বললে, পুলিশের চোখ এড়িয়ে কেমন করে টাকা আনলে?

হিরণ গুছিয়ে বসে একে একে আনু-পূর্বিক হাজিপুরের কাহিনী বলে গেল। তারপর বললে, নতুন দারোগা যখন হারু মিঞার ঘর খানাতল্লাসী করতে এল, হারু মিঞা তার চাদরের মধ্যে নিয়ে রাখলো টাকার পুঁটলী। সেই পুঁটলী নিয়ে ফকির শেখ সোজা রওনা দিল কলকাতার দিকে। রাণাঘাটে এসে সে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। ফকিরে মায়ের দেনা কোনোদিন শোধ করতে পারবো না।

স্তব্ধ শান্তভাবে মীরা সমস্ত কাহিনী শুনে গেল। পরে বললে, ওরা কি হাসনুকে ছাড়বে কোনোদিন?

বোধ হয় না!

কিন্তু ধরে রাখতে কি পারবে? হাসনু ত কোনোদিন মাথা নীচু করবে না? যারা বাঁধবে তাদেরই বিপদ বেশী!

হিরণ বললে, হ্যাঁ, হামিদ নিজের বিপদ ডেকে আনলো।—কিন্তু আর নয়, এবার তুমি একটু ঘুমোও। আমি বাইরে যাবো।

অতি মৃদুভাবে মীরা ওর একখানা হাত ধরলো। তারপর বললে, কোথা যাবে? আজ না গেলেই চলবে না?

বুঝতেই পাচ্ছ, কিছু কেনাকাটা আছে! ঘর যে শূন্য!

যেন কিছু একটা দুর্ভাবনা ছিল মীরার মনে। একটু ব্যস্ত হয়ে সে বললে, যাবে, কিন্তু—ধরো যদি—

হেঁট হয়ে হিরণ বললে, কি বলো?

না, কিছু না! কিন্তু—ফিরবে কখন্?

সকৌতুক স্নেহে হিরণ তার দিকে তাকালো। বললে, এতদিন ভয় করেনি,— আজ একলা থাকতে বুঝি ভয় করবে?

মীরা বললে, না, যাও তুমি। তোমার যখন খুশি এসো—যেদিন খুশি এসো! —এই বলে সে ওপাশ ফিরে শুয়ে চোখ বুজলো।

হিরণ খুব হাসলো। তারপর গায়ে জামা চড়িয়ে টাকা সঙ্গে নিয়ে সে মীরার আলুথালু গায়ের ওপর আঁচলটা টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। আজও হিরণ একা থাকলে মীরা নিজের বয়সটা ভুলে যায়।

সমগ্র দীর্ঘপথের উপরটায় পড়েছে হেমন্তের উজ্জ্বল রৌদ্র। চারিদিক খুশীতে ভরা। খাটো লালপেড়ে ধুতিখানা হিরণের পরনে ছিল এবং গায়ে ছিল হাসনুবানুর কেনা সেই হাফশার্ট,—নীল রংয়ের ছিটের জামা, পিছন দিকে ইংরেজি হরফের ছাপ, দাম লেখা অত টাকা অত আনা। ঐ নিয়ে ঘুরলো সে বউবাজার অঞ্চলের নানা পথে। পায়ে জুতো নেই, এক পা ধুলো সুতরাং এক মুচির দোকান থেকে সে সস্তায় কিনলো একজোড়া স্যাণ্ডাল্! তলাটা রবারের, হেঁটে গেলে মসমস করে না। রাস্তায় বসে ছিল নাপিত,—তার কাছে চুল ছেঁটে নিল কদমফুলের মতো; দাড়িটা নিল কামিয়ে। চেহারাটা দাঁড়ালো কেমন, সেটা দেখে নেবার জন্য পানের দোকানের আয়নার সামনে এসে হাসিমুখে দাঁড়ালো। মুখখানা বড় পরিতৃপ্ত, আনন্দের চোটে এক খিলি পান কিনে মুখে পুরে দিল। পানের

দোকান থেকে একশো টাকার একখানা নোট ভাঙিয়ে পানের দাম দিল এক পয়সা।

পৃথিবীর আর কেউ দুঃখ পাচ্ছে কিনা তার জানার দরকার নেই। কেননা সে আর দুঃখ পাচ্ছে না! রৌদ্রটা কিছু গরম, কিন্তু তার গায়ে লাগছে হেমন্তের স্নিগ্ধ হাওয়া। এই হাওয়া গায়ে একদিন লেগেছিল, সে যেদিন এম-এ পাস করে বেরোয়। কী নিবিড় রসকল্পনা তার দুই চোখে, কত রঙে রঙীন তার মন। মধুমতীর ধারে বসে থাকতো রাজকন্যা এলোচুলে,—বিপুল ঐশ্বর্য হাতছানি দিয়ে ডাকতো তাকে হাজিপুর থেকে। তার স্বাস্থ্য, তার বর্ণ, তার মুখের লাবণ্য এবং আতাম্র চুলের রাশির দিকে তাকিয়ে বন্ধুরা ভাবতো এ ছেলে পূর্বজন্মে ছিল রাজকন্যা, এ জন্মে রাজপুত্র! রেশম আর গরদ ছাড়া তার পোষাক ছিল না এবং বাহান্ন ইঞ্চির কোঁচানো কাঁচি ধুতির অগ্রভাগ লুটিয়ে-লুটিয়ে যেতো একদিন এই শহরেরই এপথে ওপথে। রাস্তার লোক থমকে দাঁড়িয়ে যেতো তার দিকে চেয়ে।

কিন্তু পুরুত বামুনের ছেলে সে, হিরণ নিজে জানতো। তবু মন্দ কি, সে-খেলাটা সেদিন বেশ লাগতো। আজো এ-খেলাটা নেহাৎ মন্দ নয়। খাটো কোরা ধুতি, আর ছাপমারা ছিটের হাফশার্ট। পানের দোকানের আয়নায় চোখ রেখে সে নিজের হাতের ঘুষি পাকিয়ে দেখে নিল, স্বাস্থ্য আজও বেশ ভালো! তাকে পুরুত বলুক, কিংবা বলুক নাপতে, কিছু এসে যায় না। রাজকন্যা তার মিলে গেছে—তবে কিনা কিছু ক্ষুন্ন, কিছু ভগ্ন! তা হোক, এখানে নৈতিক প্রশ্ন কিছু নেই, এটা আত্মিক ভগ্নতা। মীরাকে ভুল বুঝলে চলবে না,—কেননা তার ঘটনাপরম্পরায় কোনো ভুল নেই। ঐশ্বর্য-সম্পদের মধ্যে সে মানুষ হলেও একটা বিশেষ আদর্শবাদ নিয়ে সে লালিত। তার মধ্যে সুস্পষ্ট যে-চেহারাটা ছিল, সেটা অনেকটা দশভুজার পরিকল্পনা। মীরার দায়িত্ব ছিল লোক প্রতিপালনের। অসুরকে সে বিনাশ করবে, দুর্গতি হরণ করবে, অভয় দান করবে, অকল্যাণকে মোচন করবে! এ আত্মিক রূপটা মার খেয়ে গেছে ঘটনাচক্রে। এ অপরাধ মীরার নয়; এ যুগের মহিষাসুরের চক্রান্ত আবার সাফল্যলাভ করেছে, সেই কারণে আত্মিক শক্তি আজ শৃঙ্খলিত। দুর্গত মানুষ আর্তকণ্ঠে মুক্তির প্রার্থনা জানাচ্ছে চারিদিক থেকে। মীরার স্বপক্ষে এই কথাটা ভাবতে কবি হিরণের বেশ ভালো লাগলো।

বাজারে ঘুরে-ঘুরে সে কিনলো খানকয়েক ভালো শাড়ি, এবং নিজের গায়ের মাপে কিনলো কয়েকটা ব্লাউস। দোকানদার অবাক, —কিন্তু সেই নির্বোধ ব্যবসায়ীকে এই গল্পটা শোনানো গেল না যে, এককালে মীরা আর হাসনু তারই গায়ের পাঞ্জাবী আর শার্ট পরে লুকিয়ে যেতো ঠাকুরদীঘির ধারে গোলাপের বাগানে এবং এদিক থেকে একটা ব্লাউস গায়ে চড়িয়ে হিরণ ওদের তাড়া করে যেতো সেই বাগানের আড়ালে-আবডালে! যাই হোক, জামা আর কাপড়ের পর সে কিনলো নানাবিধ প্রসাধন সামগ্রী এবং তার সঙ্গে ঘরবসৃতি জিনিসপত্র আর বিছানা বাসন। পরিশেষে গোটা তিনেক মুটের মাথায় রাশি রাশি দ্রব্যসামগ্রী চাপিয়ে সে চললো বাসার দিকে। লোকে নাকি ঘরকন্নার বিবিধ সমস্যায় বিপর্যস্ত হয়ে থাকে, বাস্তব জীবন নাকি বড় কঠোর, দিনযাপনের নানা গ্লানি আছে নাকি মানুষের জীবনে,—কিন্তু কই, তিনটে মুটের মাথায় ওই ত একটা সমস্ত সংসার

চলেছে। যদি এখনই কেউ এসে তাকে প্রশ্ন করে,—কি হে, সংসার ধর্ম কিছু করলে নাকি? সে বলবে, হ্যাঁ, ওই যে তিনটে মুটে! ওদের মাথার ওপরেই আমার সুখ-দুঃখের বোঝা! ব্যাপারটা হোলো এই, সামাজিক জীবনে হিরণের কোনো দুঃখ নেই। সত্য বলতে কি, দুঃখ-দুর্দশাটা ভালো করে সে বুঝতেও পারে না। হাসনু রাগ করে বলতো, তোর লোভ নেই বলেই অভাব নেই! মীরা তামাসা করে বলতো, যার আসক্তি নেই, তার আক্ষেপও নেই। যদি আমরা ওর সামনে মরতে বসি, ও আমাদের শোকে কবিতা লিখতে বসবে,—কিন্তু ডাক্তার ডাকতে ছুটবে না! কাঁচকড়ার পুতুল, দেখতে চমৎকার, আদর করে সাজিয়ে রাখো,—কিন্তু প্রাণ নেই!

এসব কথা হিরণকে শুনতে হোতো। প্রাত্যহিক প্রাণধারণ সমস্যাবোধ থেকে দূরে থাকতো বলেই বাস্তব অভিজ্ঞতা তার কম। তুমি যদি দুঃখ পাও সে মর্মাহত হবে, কিন্তু দুঃখলাঘবের কোনো উপায় তার জানা নেই। কবিতার মধ্যে সে খুঁজে পায় প্রাণের গভীরতর চেতনা,—কিন্তু তাকে মুখের ওপর কোনো একটা আধ্যাত্মিক কিংবা আত্মিক প্রশ্ন করো, সে বোকা বনে যাবে। দুঃখ আর বেদনাবোধটা তার বৃহত্তর ক্ষেত্রে এবং আনন্দটা তার নৈর্ব্যক্তিক; অনেকটা যেন সন্ন্যাসী-ফকিরের মতো। ভালোবাসার স্বরূপটাকে সে বোঝে কাব্য-দৃষ্টির দিক থেকে, কিন্তু মীরা যদি আজ হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো? —হিরণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে। কোনো সদুত্তর তার মুখ দিয়ে কিছুতেই বেরোতে চাইবে না।

তিনটে মুটে চলেছে আগে আগে, আর সে চলেছে তাদের কিছু পিছু। আজকে তার সঙ্কটকাল উপস্থিত, সন্দেহ নেই। আজ তাকে দাঁড়াতে হবে মুখোমুখি একটা সমস্যার সামনে। আজ একা মীরা, একা সে। মীরা নিজে ঘরকন্না চায়নি এবং তার নিজের জানা নেই কোনটোর নাম ঘরকন্না। মেয়েরা জন্মায় ঘরোয়া হয়ে, পুরুষরা জন্মায় বেপরোয়া হয়ে। ঘরকন্নার মাঝখানে এসে দাঁড়ায় দুটো বিপরীত শক্তি,—ইংরেজিতে যাকে বলা হয় পজিটিভ আর নেগেটিভ। একটা চায় বন্ধন, একটা চায় ছেদন; একটা বলে, হ্যাঁ—একটা বলে, না! কিন্তু এই দুই বিপরীত এবং পরস্পর-বিরোধী শক্তিতেই ঘরবাঁধা সহজ হয়। এই দুই শক্তি মিল্লেই আলোটা জ্বলে, কাজের চাকাটা ঘোরে। কিন্তু তবু এর মধ্যে আছে হিরণের সঙ্কট। সঙ্কটটা নৈতিক নয়, মানসিক। বিবাহকে মীরা স্বীকার করেনি, কিন্তু উভয়ের সম্পর্কের অচ্ছেদ্যতাকে সে জেনে এসেছে আশৈশব। এটাকে এক কথায় আবাল্যের প্রণয়বন্ধন বলে ঘোষণা করলে ভুল হবে, কেননা এটা পারিবারিক। প্রণয়ের সম্পর্কটা আত্মিক, পারিবারিক সম্পর্ক অনেকটাই আধিভৌতিক, অর্থাৎ শ্মশানের চিতা ছাড়া তার আর কোনো পরিণতি ভাবা যায় না। সঙ্কট হোলো এইখানে।

তিনটে মুটে যদি এখনই তার চোখে ধুলো দিয়ে গা ঢাকা দেয় তাহলে হিরণের সংসারযাত্রার পরিকল্পনাটা আপাতত ধোঁয়া হয়ে যায় বটে এবং যদি যায়ও তাতে খুব বেদনার কারণ থাকবে না—কিন্তু তবু মীরার সামনে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। মীরা বলেছে, ঘরকন্না চাইনে, বাঁধন চাইনে —কিন্তু যেমন আমরা ছিলুম তেমনি থাকতে চাই। অর্থাৎ যেটা প্রয়োজনের বাইরে, সমস্ত সংস্কার আর সুলভ সামাজিকতার বাইরে, লৌকিক বিচার সিদ্ধান্তের বাইরে, —যেটাকে বলা চলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক! মীরা একবার বলতে চেয়েছিল স্বামীর সম্পর্ক কিংবা নরনারীর স্বাভাবিক সম্পর্কটাই হোলো জটিল,—সরসতায় সজলতায় সেটা নিতাই আবিল, সেটার থেকে মুক্তি দরকার।

(ক্রমশ)

সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়

অনেক রাত্তিরে হঠাৎ নাকি ঘণ্টা বেজে ওঠে। বন্ধু ফিরে এসেছে মনে ক'রে লোকটি দরজা খুলে দেয়। কিন্তু বন্ধু নয়, যে এলো, তাকে সে কোনোদিনও দেখে নি। লোকটি এসেই তাকে খালি বোতল দিয়ে কয়েকবার আঘাত করে। আঘাত সহ্য করতে পারে নি সে, অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। শুধু এইটুকু বুঝেছিলো যে, তার নাক আর কপাল থেকে দর্ দর্ করে রক্ত ঝরছে।

সমরেশের কানের কাছে মুখ এনে স্মিলম বললো, আর বেশি কিছু আমি জানি না।

তবে তুমি আসবার দু' একদিন আগে পুলিশ এসে ওকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করে গেল——

তাই নাকি, এখানে পুলিশ এসেছিলো?

হ্যাঁ, বলে-গেছে আবার আসবে।

আচ্ছা ওর পাশের খাটে যে বুড়ো ভদ্রলোক, তার অসুখটা কি?

কিছু না। ওর সত্তর বছর বয়স। যখনই ডাক্তার ওকে দেখতে আসে, বুড়োটা প্রচণ্ড কাশির ভান করে আর ডাক্তারকে ধোঁকা দেবার জন্যে 'বাবা গো, মা গো' বলে চেঁচায়।

সে কি, ইচ্ছে করে কেউ হাসপাতালে থাকতে চায় নাকি? আমি তো বেরিয়ে যেতে পারলে বাঁচি——

তোমার কথা আলাদা, হেসে স্লিম বললো, তোমার অল্প বয়স, অনেক পয়সা—ও বুড়ো বেচারা কি করবে বল। ওর তিন কুলে কেউ নেই, পয়সাও নেই কিছু। এখানে দিব্যি আরামে আছে। নার্সরা চব্বিশ ঘণ্টা দেখাশোনা করে। খাওয়া-দাওয়া চমৎকার আর একটি পয়সাও খরচ নেই—এতো সুখ ও বুড়ো বেটা পাবে কোথায়?

সমরেশ জিজ্ঞেস করলো, তোমার অসুখটা কি স্লিম্?

ব্লাড-প্রেসার।

কতোদিন থাকতে হবে তোমাকে হাসপাতালে?

কি জানি, কিছু ঠিক নেই, একটু গম্ভীর হয়ে স্লিম্ বললো, আর বেরিয়েই বা কি করবো জানি না——

কেন?

ব্যবসা করতাম, কিন্তু তাতে তো কিছুই করতে পারলাম না। হাতে পয়সা-কড়ি একেবারেই নেই। তবে এখন এই একটা সুবিধা যে, আমার স্ত্রীরও অসুখ, সেও এখন হাসপাতালে। কাজেই খরচ বেশি কিছুই নেই আর ন্যাশনাল হেলথ থেকে যা পাই, তাতে সপ্তাহে সপ্তাহে কিছু জমাতেও পারি।

সমরেশ বললো, তোমাদের দেশে এই বিনা পয়সায় চিকিৎসা আর যারা চাকরী করে তাদের যতোদিন অসুখ থাকবে, ন্যাশনাল হেলথ থেকে টাকা পাওয়া চমৎকার ব্যবস্থা কিন্তু—

স্লিম্ গর্বের হাসি হেসে বললো, এ ব্যবস্থা পৃথিবীর আর কোথাও নেই——আমেরিকাতেও নয়—ওষুধ-ডাক্তারের খরচ শুধু এদেশেই কাউকে দিতে হয় না——

ন' নম্বর খাট থেকে হঠাৎ বুড়ো ডেন্টিস্ট চেঁচালো, স্লিম্ স্লিম্, দু' চারটে পত্রিকা দিয়ে যাও না বাপু একটু নেড়ে চেড়ে দেখি——

এই যাই, সমরেশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্লিম্ ন' নম্বর খাটের দিকে গেল।

বড়ো ভালো ছেলে, বাঁ দিকের খাট থেকে মিঃ ডেভিস বললো। নাকি লোক, ডান দিকের খাট থেকে মিঃ হ্যাণ্ডারসান নিস্পৃহ গলায় উক্তি করলো, স্লিম্ একাই তবু হেঁটে চলে বেড়াতে পারে, আমাদের তো নড়বার উপায় নেই, পাইপ মুখে দিয়ে হ্যাণ্ডারসান দেশলাই খুঁজতে লাগলো।

সমরেশেরও নড়বার উপায় নেই। লণ্ডনের কোনো প্রসিদ্ধ হাসপাতাল। ওয়ার্ডের নাম কিং জর্জ ফিফ্থ্ ওয়ার্ড। সেই ওয়ার্ডের কুড়ি নম্বর খাটে সমরেশের জায়গা হলো। বেশ অনেকদিন তাকে থাকতে হবে এখানে। প্লুরিসি হয়েছে তার। কিন্তু হাসপাতাল থেকে বেরোবার জন্যে সে ছটফট করে আর কেন এ চাঞ্চল্য সেকথা কাউকে বলতে না পেরে অস্থির হয়ে ওঠে।

খুব জব্দ হয়েছে সমরেশ এবার। এখন আর ইচ্ছেমতো কিছু করবার উপায় নেই। আজ বারোটায় খেলাম, কাল দুটোয় রান্না করলাম, কোনোদিন লাঞ্চ খেলামই না——নার্সদের প্রভাবে এখন আর সে সব কিছুই করবার উপায় নেই। সবই ঘড়ি ধরে নিয়মমতো——এক মিনিট এদিক-ওদিক হলে চলবে না। সুন্দর ব্যবস্থা, খুব ভালো খাওয়া আর একটি পয়সাও খরচ নেই। খুব যত্ন করে এরা। কোনো অসুবিধা নেই। তবু থেকে থেকে সমরেশ ঘণ্টা গোণে—কখন লোরা আসবে। দেখা করবার সময় সপ্তাহে তিন দিন—বুধবার, শুক্রবার আর রবিবার—মাত্র এক ঘণ্টা করে। তার ওপর এতো বন্ধুবান্ধব আসে সমরেশের যে, লোরার সঙ্গে একা কথা বলবার অবসর হয় না তার। তার সঙ্গে এতো কম কথা বলে থাকতে পারবে—সেকথা আগে কোনোদিন ভাবতে পারেনি সমরেশ। তাই সে কিছুতেই হাসপাতালে আসতে চায়নি। ডাক্তার জোর করে না পাঠালে হয় তো আসতো না।

দেখা করবার সময় হাসপাতালের হাওয়া একেবারে ঘুরে যায়। রুগীরা অধীর প্রতীক্ষা করে তাদের প্রিয়জনের—বন্ধুবান্ধবের—আত্মীয়স্বজনের। দলে দলে লোক আসতে আরম্ভ করে। ছেলেমেয়ে, বুড়োবুড়ি নানা বয়সের নানা ধরণের লোক—তাদের হাতে ফুল-ফল আরও কত কি। নিজেদের বিশেষ লোকের কাছে তারা বসে থাকে। কেউ গল্প করে, কেউ সাহস দেয় কেউ প্রেমের কথা বলে। মাত্র এক ঘণ্টা সময়—কথা কি ফুরোয়! শুধু সেই সত্তর বছর বয়সের বুড়ো—সে শুধু এদিক-ওদিক তাকায় আর খক্ খক্ করে কাশে, তার কাছে কেউ আসে না।

সমরেশের একটা হাত শক্ত করে ধরে অন্য হাতে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো লোরা। কয়েকজন অল্পবয়সী নার্স লোরার দিকে কটমট করে তাকিয়ে গেল। সমরেশের বন্ধুরা সেটা লক্ষ্য করে লোরার সঙ্গে রসিকতা করছিলো।

আগে যদি হাসপাতালে আসতে, আস্তে আস্তে বললো লোরা, তাহলে তোমাকে এতো ভুগতে হতো না।

তোমার সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলতে পারবো না বলেই তো আগে আসতে পারি নি।

কিন্তু এখন? কবে বেরুবে তার ঠিক নেই। যাক্ ভালোই হলো, হেসে লোরা বললো, আমার এখন লম্বা ছুটি।

সত্যি কেমন করে দিন কাটবে তোমার?

বলবো কেন? কতো বন্ধু-বান্ধব আছে আমার।

মিথ্যা কথা, আমি ছাড়া তোমার কেউ নেই——

লোরা বললো, কে বললো তোমাকে সেকথা?

তোমার কথা আমি সব জানি।

ওদিকে সমরেশের ডান দিকের খাটের হ্যাণ্ডারসানও বেশ ব্যস্ত এখন। সমরেশ একবার তাকিয়ে দেখে নিলো। আজও মলি এসেছে—নিয়মিত আসে। হ্যাণ্ডারসানের মুখের খুব কাছে মুখ এনে কথা বলছে মলি। সমরেশ ভাবে ওরা নিশ্চয়ই বিয়ে করবে একদিন।

দেখতে দেখতে এক ঘণ্টা কেটে যায়। দেখা হয়ে আসে শেষ। তবু যেতে চায় না কেউ। নার্স আর একবার খুব শব্দ করে ঘণ্টা বাজায়। তাই করুণ চোখে লোরাকে উঠে যেতেই হয়। সমরেশ তখুনি হিসেব করে আর ক' ঘণ্টা পরে আবার লোরার সঙ্গে তার দেখা হবে আর নতুন করে আর একবার মনে হয়, কেন হাসপাতালে এলো সে।

নার্স এসে সমরেশকে বললো, এই যে বিস্কুট নাও, সাত নম্বর খাটের মিঃ টমাস দিলেন তোমাকে।

হাত নেড়ে সমরেশ তাকে ধন্যবাদ জানায়। মিঃ টমাস মানে সেই ভদ্রলোক রাত্তিরে বোতলের বাড়ি মেরে গুন্ডারা যার মাথা ফাটিয়ে দেয়।

ওদিকে ন' নম্বর খাটের ডেণ্টিস্ট আর আট নম্বরের উকিলের ঝগড়া বেধেছে। ডেণ্টিস্ট নাকি বলেছিলো, জানো ওই ছোকরা ডাক্তারটা আমাকে খালি বোকার মতো প্রশ্ন করে—

উকিল গম্ভীর হয়ে বললো, ডাক্তার লোক বুঝে প্রশ্ন করে, আর তুমিও নিশ্চয়ই চালাকের মতো উত্তর দাও না।

আর যাবে কোথায়! ডেণ্টিস্ট উকিলকে এই মারে তো সেই মারে।

উকিল লাফালাফি না করে আরও গম্ভীর হয়ে শুধু বললো, আহাহা অতো উত্তেজিত হয়ো না ডেণ্টিস্ট, শেষে অসুখ বেড়ে গেলে অনেকদিন তোমার খাটটা খালি হবে না— অন্য রুগী বেচারারা জায়গা পাবে না।

আর সামলাতে না পেরে ডেণ্টিস্ট চেঁচিয়ে উঠেছিলো, সাট্ আপ্!

স্লিম্ ছুটে গিয়ে ঝগড়া থামায়। ছি ছি কর কি তোমরা, ইণ্ডিয়ান ছাত্র কি ভাববে ইংরেজ সম্বন্ধে?

এই কথা শুনে চুপ হয়ে গেল ওরা দু' জনে। তাড়াতাড়ি কাগজ পড়ায় মন দিলো।

সমরেশের সম্বন্ধে কৌতূহল প্রত্যেকের, তাকে ভালোবাসে সকলেই। তাকে সকলে অনেক প্রশ্ন করে ভারতবর্ষের কথা জেনে নেয়।

এতো গম্ভীর হয়ে সারাদিন কি ভাবো সমরেশ? পাইপে দীর্ঘ টান মেরে হ্যাণ্ডারসান জিজ্ঞেস করলো।

লোরার কথা, ম্লান হেসে সমরেল বললো, কবে যে হাসপাতাল থেকে বেরোবো!

ও, তোমার সেই জার্মান বন্ধু, হ্যাণ্ডারসান একটু অবাক হয়ে বললো, তা তাড়াহুড়ো করে বেরোবার কি দরকার, এসেছো বিদেশে আগে শরীরটা ভালো করে সারিয়ে নাও—

ডেভিস বললো পয়সাওলা ইণ্ডিয়ান তুমি গার্ল-ফ্রেণ্ড বহু পাবে লণ্ডন শহরে, কিন্তু শরীর——বুড়ো ডেভিস কথাটা শেষ না করে হাসলো।

রেগে গিয়ে ডেভিস আর হ্যাণ্ডারসান দু'জনের উদ্দেশে সমরেশ বললো, চাই না অন্য মেয়ে, জানো লোরা আমাকে কতো ভালোবাসে আর আমিও ওকে——

উচ্ছ্বসিত হয়ে সমরেশ নিজের প্রেমের কাহিনী বলে গেল। কেমন করে আলাপ হলো, লোরা ওর জন্যে কি করেছে, ওরা শিগ্‌গিরই বিয়ে করবে, অমন মেয়ে নাকি পৃথিবীতে আর পাওয়া যায় না।

ডেভিস প্রাণপণে সমরেশের কথার মানে বোঝবার চেষ্টা করছিলো আর হ্যাণ্ডারসান অবাক হয়ে ভাবছিলো তার মাথাটা হঠাৎ খারাপ হলো কি না—না হলে এতো উচ্ছ্বাস মানুষের হয় কেমন করে।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সমরেশ এবার জিজ্ঞেস করলো, তুমি মলিকে ভালোবাসো হ্যাণ্ডারসান?

একটু ভেবে হ্যাণ্ডারসান বললো, ঠিক বলতে পারলাম না।

মলি তোমাকে ভালোবাসে নিশ্চয়ই?

হয়তো বাসে——জানি না।

তোমরা বিয়ে করবে তো?

অতো কথা তো ভাবি নি।

কতদিনের আলাপ তোমাদের?

তা প্রায় বছর খানেক——

সে কি, এখনও সম্পর্ক পাকাপাকি করনি তোমরা? অথচ তিন মাসের আলাপে আমাদের সব বন্দোবস্ত ঠিক।

সমরেশের ব্যাপারে কোনো কৌতূহল না দেখিয়ে হ্যাণ্ডারসান শুধু হাসে, উত্তর দেয় না।

সেপ্টেম্বারের লণ্ডন-সূর্য কখনও ম্লান, কখনও উজ্জ্বল। শরৎ এখানে আনন্দের নয়, আশঙ্কার। শরৎ নিয়ে আসে ঝরে যাওয়ার ক্ষণ। তাই শুধু পাতা ঝরে যায়। শীতের কঠিন সঙ্কেতে প্রকৃতি পায় ভয়। সমরেশের মন সহসা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। জানলা দিয়ে সে বাইরে তাকিয়ে থাকে আর মনে হয় সব ভেঙে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। লোরা এখন কি করছে কে জানে।

রবিবার দিন ছুটতে ছুটতে লোরা এলো দেখা করবার সময় শেষ হবার ঠিক পনেরো মিনিট আগে। সমরেশ কথা বললো না তার সঙ্গে। অভিমানে স্তব্ধ হয়ে গেছে সে।

এই, সমরেশের হাত ঝাঁকিয়ে লোরা বললো, আমি জানতাম তুমি রাগ করবে ডার্লিং, কিন্তু বিশ্বাস কর ঠিক সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম আমি, জানো তো কতদূর থেকে আসি আমি। আজ রবিবার বলে ট্রেন যে এতো লেট হবে, সেকথা কি ছাই জানতাম——

আরো আগে বাড়ি থেকে বেরোলে না কেন?

ছুটি পাইনি যে।

আমার জন্যে একদিনও ছুটি নিতে পারো না তুমি?

একটু অবাক হয়ে লোরা বললো, শুধু শুধু ছুটি নিয়ে কি হবে?

শুধু শুধু কেন, আমার জন্যে?

দূর বোকা, এই সব বাজে কারণের জন্যে কেউ ছুটি নেয়? বছরের ছুটি কমে যাবে যে তাহলে, লোরা হেসে সমরেশের একটা হাত ধরলো, কতো বলবার ছিলো তোমার সঙ্গে, কিন্তু এত দেরি হয়ে গেল!

কি কথা?

লোরা কয়েক মুহূর্তের জন্যে আনমনা হয়ে রইলো, তারপর বললো, আমার বড়ো একা একা লাগে সমরেশ, তুমি কবে বেরোবে হাসপাতাল থেকে?

জানি না, আমারও খুব খারাপ লাগে।

আহা তোমার তো অসুখ, কিন্তু আমি সুস্থ মানুষ হয়ে কেমন করে একা কাটাই বল তো?

আমার কথা মনে করে।

এতোদিন তো কাটালাম।

আজ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে তুমি কোথায় যাবে লোরা?

মুটস্-এর বাড়িতে নেমন্তন্ন আছে।

তোমার বান্ধবী মুটস্-এর সঙ্গে আজও আমার আলাপ হলো না।

কতোদিন বলেছি তোমাকে তুমিই তো এড়িয়ে গেছো। কেবলই আমার সঙ্গে একা থাকতে চাও।

চাই তো।

ঘণ্টা বাজলো। শেষ হলো দেখা। আবার দেখা হবে বুধবার। সে যে অনেক দেরী। লোরা চলে যেতেই সমরেশ ঝিমিয়ে পড়লো।

সন্ধেবেলা দেশলাইএর বাক্সের ওপর সিগ্রেট ঠুকতে ঠুকতে সমরেশ জিজ্ঞেস করলো, আজ মলি এলো না কেন মিঃ হ্যাণ্ডারসান?

কি জানি, কিছু কাজ-টাজ পড়েছে হয় তো।

সে কি, তোমার মন খারাপ করছে না?

মন খারাপ করবে কেন? অন্য কতো বন্ধু-বান্ধব এসেছিলো আমার—গ্রীনিং, কার্কম্যান, ওয়েলস্—কতোদিন যে দেখা হয় না ওদের সঙ্গে——

বেশ অবাক হয়ে সমরেশ বললো, লোরার বদলে যদি আমার সমস্ত বন্ধুসমাজ এখানে

ভেঙে পড়তো, তাহলেও আমার খুব খারাপ লাগতো।

তার কথা ঠিক ধরতে না পেরে হেসে হ্যাণ্ডারসান বললো, শুনেছি ইণ্ডিয়ানরা বড়ো বেশি ভাবপ্রবণ হয়।

মলিকে সমরেশ শুধু আর একদিন দেখেছিলো। হ্যাণ্ডারসানকে কয়েকটি কথা বলে মিনিট কুড়ি পর সে চলে যায়। কি ব্যাপার জানবার জন্যে সমরেশের কৌতূহল হলো।

আজ মলি এতো তাড়াতাড়ি চলে গেল কেন মিঃ হ্যাণ্ডারসান?

এক নতুন বন্ধু পেয়েছে, তার সংগে দেখা করবে বলে।

সে কি, তোমার অসুখ——

অসুখ বলেই তো নতুন বন্ধুর সংগে দেখা করা দরকার, হেসে হ্যাণ্ডারসান বললো, ছেলেমানুষ ও, একজন রুগীর কাছে এসে শুধু শুধু সময় নষ্ট করবে কেন!

বন্ধু অসুস্থ হলে নতুন লোকের সংগে দেখা না করলে ক্ষতি বিশেষ হয় কি—আর তোমাকে দেখতে আসা তো ওর পক্ষে সময় নষ্ট করা নয়——

পাইপ ধরাতে ধরাতে হ্যাণ্ডারসান বললো, মলি আর আসবে না সমরেশ, এবার থেকে সে তার নতুন বন্ধুর কাছে যাবে।

কিন্তু এতদিনের আলাপ তোমাদের—একদিনে ও সমস্ত সম্পর্ক কেটে দিলো কেমন করে?

আমার যে অসুখ করে গেল।

তাই তো ওর আরও বেশি কাছে থাকা দরকার——

একটু অবাক হয়ে হ্যাণ্ডারসান বললো, কেন? আমি সারাদিন যন্ত্রণায় ছটফট করি—মলির অসুখ নেই, সে বেচারী কেন আমার জন্যে কষ্ট করবে, ওর জীবনে এখন সবচেয়ে ভালো সময়—ওকে তো আনন্দ করতেই হবে, মিঃ হ্যাণ্ডারসান কলম খুলে চিঠি লেখায় মন দিল।

সেই রাত্তিরে ভয় পেলো সমরেশ। দুর্বল শরীর, নিস্তেজ মন। কাশি বেড়ে গেল, উত্তাপ উঠলো অনেক, দেহ কাঁপতে লাগলো। অন্য বন্ধু পেয়ে লোরাও যদি এমনি করে ওকে ছেড়ে যায়।

লোরাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছে সমরেশ——অনেক কল্পনা করেছে। সে ছাড়া তার জীবনে আর কোনো চিন্তা নেই। তাকে বিয়ে করবে সমরেশ। তার বাড়ির লোক জানে সব কথা। অসুখ না হলে ওরা এতোদিনে বিয়ে করে দেশে চলে যেতো।

সেই রাত্তিরে অনেক দুঃস্বপ্ন দেখলো সমরেশ। জ্বরের ঘোরে থেকে থেকে চীৎকার করে উঠতে লাগলো। নার্স ভয় পেয়ে ডাক্তারকে খবর দিলো। ডাক্তার প্রথমে দিলো ইনজেকশান, তার নতুন কড়া মিকশ্চার দিলে সমরেশকে। তবু শান্ত হলো না সে।

ডাক্তার, পরদিন সকালে সমরেশ বললো, আমি বাড়ি যাবো।

শান্তস্বরে ডাক্তার বললো, বেশ তো, আর কিছু দিন যাক্।

না, আমি ভাল হয়ে গেছি, অবাধ্য ছোটো ছেলের মতো গোঁ ধরে সমরেশ বললো, তুমি যা বলবে আমি তাই করবো, আমার দেখা-শোনা করবার অনেক লোক আছে—আমি আজই বাড়ি যাবো——

কথার উত্তর না দিয়ে ডাক্তার ভালোভাবে তাকে পরীক্ষা করতে লাগলো।

আমি বাড়ি যাবো——

শীগগিরই যাবে।

আমি আজই বাড়ি যাবো ডাক্তার——ডাক্তার——

সেই দিন বিকেলবেলা ঠিক তিনটের সময় লোরা এলো। তার হাসিমুখ দেখে অনেক শান্ত হলো সমরেশ। ছি ছি, এমন মেয়েকে কেন সন্দেহ করলো সে!

কেমন আছো?

তোমাকে দেখলেই আমার ভালো লাগে লোরা।

বেচারী, তোমার চেহারা আজ অনেক ভালো দেখাচ্ছে।

কাল সারারাত খুব খারাপ ছিলাম! কেন জানো?

কেন?

আচ্ছা লোরা, কাল তুমি কি করছিলে? লণ্ডনে এসেছিলে নাকি?

না তো——

আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, হাসলো সমরেশ, তুমি যেন এক নতুন বন্ধুর হাত ধরে 'কিউ গার্ডেনস্'এ বেড়াচ্ছো—কথা শুনে লোরা একটু বিচলিত হয়ে উঠলো যেন।

সে ভাব লক্ষ্য না করে সমরেশ বললো, তুমি আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি লেখ না কেন?

কি লিখবো? জানো তো আমার ইংরেজী বিদ্যার দৌড় আর তুমিও তো জার্মান জানো না।

তবু ইংরেজীতে যা হয় লিখো। চেষ্টা করবো।

আজ এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে তুমি?

হাসতে হাসতে লোরা বললো, সাড়ে চারটে থেকে ছ'টা অবধি একজনের মোটরে চড়ে বেড়াবো।

তাই নাকি, কে সে?

একজন ভদ্রলোক, মুটস্ তার সংগে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছে।

সমরেশের মুখে ছায়া নেমে এলো, এক-দিনের আলাপেই তুমি তার সংগে ঘুরতে বেরোবে?

তোমার সংগে একদিনের আলাপেই আমি ঘুরতে বেরিয়েছিলাম।

কিন্তু আমি যে তোমাকে বিয়ে করবো লোরা।

তাই বিয়ের আগে তুমি কিছুতেই আমার স্বাধীনতা কেড়ে নিতে পারো না।

বিয়ের পরেও আমি তা করতে পারবো না। শুধু একটা কথা, তোমাকে অনেকবার বলেছি আবার বলছি, যার তার সংগে ঘনিষ্ঠতা করো না—অনেক রকম লোক আছে এই লণ্ডন শহরে—বাধা দিয়ে লোরা বললো, আমি জানতাম তুমি এই সব আজে-বাজে কথা বলবে অথচ তুমি জানোই না আমি কার সংগে বেড়াতে যাবো। খুব ভালো লোক সে, বেশ বুদ্ধিমান, জার্মান জানে, আরো ভালো করে শিখতে চায়।

তবু——

দয়া করে আমাকে আর উপদেশ দিও না সমরেশ।

বেশ, তোমার যা ইচ্ছে তাই কর আমি আর কিছু বলবো না।

সেই ভালো, লোরা রেগে চুপ করে বসে রইলো।

পাশের খাটে আধ-শোয়া অবস্থায় হ্যাণ্ডারসান চিঠি লিখছিলো। ওদের দিকে অকারণে একবার মাথা তুলে তাকিয়ে আবার লেখায় মন দিলো। সমরেশ ভাবলো মলিকে ফেরাবার জন্যে নানা উপদেশ দিয়ে নিশ্চয়ই সে খুব বড়ো চিঠি লিখছে তাকে।

লোরা, হঠাৎ তার একটা হাত ধরে মিনতি করলো সমরেশ, বল এ সব কথা মিথ্যা?

কি কথা?

কারুর সংগে তোমার দেখা হয় নি, কারুর মোটরে চড়ে তুমি বেড়াতে যাবে না—সব মিথ্যা?

গম্ভীর মুখে লোরা বললো, একজন ইংরেজের সংগে মুটস্ আমার আলাপ

করিয়ে দিয়েছে, সেকথা সত্যি—তার বয়স আমার চেয়ে অনেক বেশি—পঁয়ত্রিশ।

তাকে তুমি আমার মতো একদিনেই ভালোবেসেছ নাকি?

না, বিশ্রী দেখতে সে, অমন লোককে আমি ভালোবাসতে পারবো না। আজ যখন তোমাকে দেখতে আসি, এই হাসপাতালের সামনে একটা গয়নার দোকানে তাকে দেখতে পেয়ে আমি হাসলাম। সে বললো, কোথায় যাচ্ছো? চলো গাড়ি চ'ড়ে বেড়াই। আমি বললাম, না ধন্যবাদ, আমার বন্ধুকে দেখতে যাচ্ছি। সে বললো, তারপর কি করবে? লোরা হেসে বললো, আমি বললাম, অন্য কাজ আছে——

আজ ঘণ্টা বাজতেই লোরা উঠে দাঁড়ালো, আমি যাই। আর দেখ সমরেশ, একটু থেমে লোরা বললো, রবিবারে আমি আসতে পারবো না। দু'টোর সময় ছুটি পাই, পৌনে চারটের আগে এখানে পৌঁছনো সম্ভব নয়। পনেরো মিনিটের জন্যে শুধু শুধু এতদূর এসে কি লাভ?

বেশ তো, তোমার একটু বিশ্রাম করা দরকার বৈকি।

যদি কিছু মনে না কর, হ্যাণ্ডারসান হাসিমুখে বললো, দয়া করে আমার এ চিঠিটা পোস্ট করে দেবে লোরা?

নিশ্চয়ই।

অনেক ধন্যবাদ।

লোরা চিঠি নিয়ে বেরিয়ে যেতেই সমরেশ বললো, তোমার কাছ থেকে অতো বড়ো চিঠি পেয়ে মলি ঠিক ফিরে আসবে হ্যাণ্ডারসান।

মলি! অবাক হ'য়ে হ্যাণ্ডারসান বললো, মলিকে আমি চিঠি লিখতে যাবো কেন, ওটা আমার আর এক বন্ধুকে লিখলাম।

প্রথমে সমরেশের মাথা ঘুরতে লাগলো। সমস্ত পৃথিবী যেন দুলছে। বুকের আর পিঠের ব্যথা বাড়লো। কয়েক মিনিটের মধ্যে সে একেবারে ভেঙে পড়লো। একি হ'লো তার। হঠাৎ এতো দুর্বল হ'য়ে গেল কেন? লোরা কোথায়? অনেক দূরে চ'লে গেছে। মোটর গাড়িটা কতো বড়ো? কি রঙ তার? এ কী করলো লোরা! স্পীড মিনিটে মিনিটে বাড়ছে। লোরা তাকে ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে—দূরে স'রে যাচ্ছে—অন্ধকারে না আলোয়? সমরেশ ঠিক বুঝতে পারলো না।

মোটরে ওরা কি এখনও ঘুরছে?

হাসপাতালে লোরা আর মাত্র একদিন এসেছিলো। সমরেশকে শুধু জানাতে যে, সে আর আসবে না।

আর বোধ হয় আমি তোমাকে দেখতে আসতে পারবো না সমরেশ—

কেন?

মানে, মানে—ছুটে বড়ো কম আর আমার নিজের অনেক কাজ করতে হবে—অনেক বেড়াতে হবে।

কিন্তু তোমাকে না দেখে আমি থাকবো কেমন ক'রে?

মাঝে মাঝে আমি তোমাকে দেখতে আসবো নিশ্চয়ই—কিন্তু নিয়ম ক'রে রোজ আসতে পারবো না।

তোমাকে আসতেই হবে লোরা।

না। এতোদিন আমি লণ্ডনে আছি অথচ আর কিছুই দেখিনি শুধু তোমাকেই দেখেছি।

এমন ক'রে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছো কেন?

স্তিমিত কিন্তু দৃঢ়স্বরে লোরা বললো, আমি ঠিকই বলছি, তোমাকে আমি আর

ভালবাসতে পারিনি না—

সমরেশ বিছানার ওপর উঠে বসলো, লোরা!

আমাকে মাপ কর সমরেশ কিন্তু যা বললাম তা' সত্যি।

তুমি আমাকে বিয়ে করবে না?

না।

কিন্তু আমার বাড়ির সকলে যে আমাদের বরণ করবার জন্যে ব'সে আছে—

তোমাকে আমি আর ভালবাসি না—কাজেই কেমন ক'রে বিয়ে করবো বল?

কিন্তু একদিনে তুমি আমাকে এমনি ক'রে ছেড়ে যাবে?

একদিনে নয়, তোমাকে যেদিন হাসপাতালে প্রথম দেখতে আসি সেদিন বাইরে বেরিয়ে আমার নিজেকে মনে হ'লো একেবারে একা—কাউকে চিনি না—একটাও যাবার জায়গা নেই, সমরেশের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে লোরা ব'লে গেল, আর ভেবে দেখলাম এতো তাড়াতাড়ি বিয়ে ক'রে লাভ নেই, আমার বয়স মোটে কুড়ি, জীবনের অনেক কিছুই জানি না—

সমরেশের গলার স্বর কাঁপছে, লোরা তুমি কি আর কাউকে ভালোবেসেছো?

না। আমি এখন অনেক লোক দেখতে চাই, অনেকের সংগে বেরোতে চাই, এতো কম বয়সে ভালোবেসে কিংবা বিয়ে ক'রে—

তুমি আমাকে বিয়ে না করলে আমি ম'রে যাবো—ম'রে যাবো—

পুরুষের মতো কথা বল সমরেশ, ছি এতো উচ্ছ্বাস তোমার, তাই আমি ঠিক করেছি ইণ্ডিয়ানদের সংগে আর বাইরে যাবো না, ওরা বড়ো ভাবপ্রবণ। একদিনের আলাপেই প্রেমে প'ড়ে বিয়ের স্বপ্ন দেখে পৃথিবীকে ছোটো ক'রে দিতে চায়, লোরা উঠে দাঁড়ালো।

রাগে ফেটে পড়তে চাইলো সমরেশ। কিন্তু একটি কথাও বলতে পারলো না লোরাকে।

তার হাত ধ'রে শুধু বললো, আর পাঁচ মিনিট ব'সে যাও।

না, আমার কাজ আছে।

মোটে পাঁচ মিনিট লোরা—

আর এক মিনিটও নয়, অনেক পুরোদিন দিয়েছি তোমাকে—

লোরা বেরিয়ে গেল। যাবার সময় সমরেশকে ভালো ক'রে বিদায়-চুম্বন দিতে ভুললো না কিন্তু।

হ্যাণ্ডারসান—মিঃ হ্যাণ্ডারসান শোনো, যেন বিকারের ঘোরে সমরেশ সব কথা ব'লে গেল তাকে।

সব শুনে আস্তে আস্তে হ্যাণ্ডারসান বললো, এতো ভেঙে পড়ছো কেন তুমি এই সামান্য ব্যাপারে? সেরে উঠে ভালো বন্ধু জোগাড় ক'রে নিও একটা—

আমাকে এই অবস্থায় ও ছেড়ে গেল কেমন ক'রে—আমি যে ওকে ভালোবাসি—

তুমি শুধু নিজের দিকটাই দেখছো সমরেশ, ওর কথা ভাবছো না। তার মোটে কুড়ি বছর বয়স। তুমি কতোদিন এখানে থাকবে ঠিক নেই। কি করবে ও একা একা? ও বয়সের মেয়ের পক্ষে এটা খুবই স্বাভাবিক।

তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না। লোরা বোধ হয় আমার সংগে ঠাট্টা ক'রে গেছে। এ অসম্ভব, এ হ'তে পারে না—লোরা আমাকে এ অবস্থায় ফেলে কিছুতেই যেতে পারে না—নার্স আমার বড়ো কষ্ট হচ্ছে, আমি আর কথা বলতে পারছি না, ডাক্তারকে একবার ডেকে দেবে?

আজ বুধবার। তিনটের সময় নিশ্চয়ই লোরা আসবে। সমরেশ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মিনিট গুনছিলো। কতো লোক বেরিয়ে গেল—কতো নতুন লোক এলো। মাথা ফাটা মিঃ টমাসের আজ বাড়ি যাবার দিন। কারুর সংগে কথা বলবার ক্ষমতা নেই সমরেশের। জ্বর অনেক, মাথায় বড়ো যন্ত্রণা।

মিঃ টমাস 'গুড বাই' জানাবার সংগে সংগে সমরেশ বললো, আমি সেরে গেছি। মিঃ টমাস, আমাকে তোমার সংগে নিয়ে চলো। আমাকে জানতেই হবে কি ব্যাপার—

যাবে বৈকি, তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো টমাস, শীগ্গীরই যাবে। এই নাও আমার কার্ড, বেরিয়ে একটা ফোন ক'রো, একদিন চা খেও আমার সংগে—বড়ো পছন্দ করি আমি তোমাকে—

লোরা এলো না।

পরদিন খুব সকালে দু'জন নার্স ব্যস্ত হ'য়ে সমরেশের মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে কি যেন আলোচনা করছিলো। তাদের কথায় ঘুম ভেঙে গেল হ্যাণ্ডারসানের। নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারলো না। চুপ ক'রে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো সমরেশের মৃত মুখের দিকে। তারপর পাইপ ধরাতে ধরাতে আপন মনেই ব'লে উঠলো, সিলি বয়্।

আর কারুর ঘুম ভাঙেনি তখন। শুধু ঘুমের ঘোরে সেই সত্তর বছরের বুড়ো থেকে থেকে চীৎকার করছে। তা ছাড়া কিং জর্জ ফিফ্থ্ ওয়ার্ডে আর কোনো শব্দ নেই।

সাহেব বিবির দেশে

নরেন্দ্র দেব

(সোয়েডেনের শেষ ক'টি দিন)

স্টকহোম থেকে বেরিয়ে আমরা দু'ধারের অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছি। এদেশের সূর্য যেন অস্ত যেতে চায় না। পথে পড়লো সোয়েডেনের সুপ্রসিদ্ধ 'উপশালা' বিশ্ববিদ্যালয়। ফেরবার পথে এটি দেখে যাবো স্থির করলাম। ট্রেন চলছে বোথনিয়া উপসাগরের ধার দিয়ে। একে একে পার হয়ে চললাম অনেকগুলি সুদৃশ্য সুন্দর স্টেশন। বাল্টিক সাগরকে পিছনে রেখে গাড়ী চলে এল প্রায় সোয়েডেনের মাঝামাঝি জেম্‌ল্যান্ডের মধ্যে। রাত তখন গভীর হয়েছে। শুয়ে পড়লাম আমরা।

ভোরে যখন ঘুম ভাঙলো গাড়ী তখন 'উমিয়া' স্টেশনে দাঁড়িয়ে। ঘড়ি দেখলাম সকাল পাঁচটা চল্লিশ মিনিট হয়েছে। 'উমিয়া' জায়গাটি বেশ। বোথনিয়া উপসাগরের খাড়ির মধ্যে বিশাল এক হ্রদের তীরে। সারাদিন গাড়ীতে যেতে যেতে দু'ধারে কত যে ঘন কালো পাহাড়, প্রচণ্ড জলপ্রপাত আর বড় বড় জলাশয় দেখলাম তার সংখ্যা হয় না। শীতের আমেজে দিঘির জল জমে ওঠবার আগে থম্‌থমে হয়ে রয়েছে। উমিয়া নদী পার হয়ে আমরা যখন 'বোদেনে' এলাম প্রাতরাশের ঘণ্টা পড়লো। বেলা তখন ন'টা। রেস্টুরেন্ট কারে গিয়ে দেখি গাড়ী এক বিশাল নদীর ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। সহযাত্রীরা বললেন এটা 'লুলিয়া' প্রবাহ। এমনিতর কত যে নদ-নদী গিরি বন পার্বত্য ঝর্ণা ও গভীর জলাশয় পার হ'তে হ'তে চলেছি তার সংখ্যা হয় না।

লাঞ্চের পর বেলা দু'টো উনিশ মিনিটে আমরা 'কিরুনায়' এসে দাঁড়ালাম। গাড়ি তখন ল্যাপল্যান্ড অতিক্রম করছে। এই-খানেই সোয়েডেনের অতুলনীয় লৌহ-ভাণ্ডার। এই কিরুনার কথা স্ট্রমগ্রেন সাহেব বার বার আমাদের বলেছিলেন। মধ্য রাতে সূর্য দেখা যায় এখান থেকে। কিরুনা রীতিমত একটি লোহার কারখানা! শোনা গেল দশ হাজার লোক এখানে এই লোহার খনির কাজে নিযুক্ত আছে। সারা দিন সারা রাত এখানে কাজ হয়। সমস্ত পাহাড় ইলেক্‌ট্রিক আলোতে উজ্জ্বল করে রাখে সারারাত। অনবরত ট্রেন চলেছে লোহা বোঝাই নিয়ে এখান থেকে নিকটবর্তী নার্ভিক বন্দরে জাহাজে তুলে চালান দিতে। এখানকার অনেক পাহাড়ও নাকি নিরেট লোহার পাহাড়! আমরা ঠিক ছ'টার সময় নার্ভিকে নামলাম। স্ট্রমগ্রেনের উপদেশ মতো হোটেল রয়ালে গিয়ে উঠলাম। নার্ভিকের সেই 'হোটেল-রয়াল' থেকে কিভাবে দুপুর রাতের সূর্য দেখে এসেছি, গত আশ্বিনের 'প্রবাসী' পত্রিকায় সে সম্বন্ধে বিশদভাবে লিখেছি বলে এখানে আর পুনরুক্তি করবো না।

স্টকহোম ফিরে এসে এবার আর ফ্রেডরিক সাহেবের পেনশানেটে জায়গা পাওয়া গেল না। আমরা ঘরটি ছাড়তে না ছাড়তেই নতুন লোকেরা এসে দখল করেছেন সে ঘর। সত্যিই দেখা যাচ্ছে—সোয়েডেনে এখন বিষম 'রাশ্‌'! ফ্রেডরিক সাহেবই উদ্যোগী হয়ে আমাদের জন্য ঠিক করে দিলেন 'হোটেল হেল্‌ম্যানে' একটি আস্তানা। এটি একেবারে থান্না ও নির্মল দের পাড়ায় বললেই হয়। একটা গলির মোড় ঘুরে গেলেই ও'দের বাড়ী। স্টেশন পোস্ট অফিস রেস্তোঁরা এবং বড় বড় দোকান পাট সব হাতের কাছে। সেন্ট্রাল স্টেশনের সামনে দিয়ে উত্তর দক্ষিণে 'ভাসাগাটান' বলে যে বড় রাস্তাটি চলে গেছে তারই একটি শাখা 'ব্রাইগারস্‌গাটেনে' এই হোটেলটি। হোটেলটি নেহাৎ ছোট নয়। পাঁচতলা বাড়ি। আমরা তিনতলার উপর একখানি বড় ঘর পেয়েছিলাম।

স্টকহোমে ফেরবার পথে 'উপশালা' স্টেশনে আমরা নেমে গেলাম। সোয়েডেনের ভুবনবিদিত বিশ্ববিদ্যালয় 'উপশালা' দেখবার লোভ ছিল অনেক দিনের। স্টক-হোম থেকে মাত্র একচল্লিশ মাইল দূরে এই য়ুনিভার্সিটি টাউন। উপশালা দেখে আমরা পরবর্তী যে কোনও ট্রেন ধরে আজ রাত্রেই স্টকহোম পৌঁছতে পারবো জেনেই নামতে সাহস হল। ৯৯২ মাইল রেলপথের
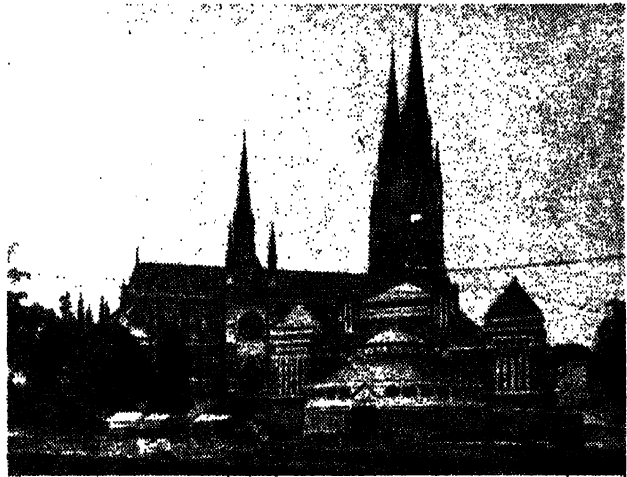
উপ্‌শালা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ্‌শালা ক্যাথিড্রাল

টিকিট ছিল হাতে। আমরা ইচ্ছামত যে কোনও জায়গায় 'ব্রেকজার্নি' করতে পারতাম। খুব ইচ্ছা হয়েছিল একবার ল্যাপ্‌ল্যাণ্ড নেমে যাবার। কিন্তু, পাছে দুপুর রাতের সূর্য দেখা ফসকে যায় বলে সাহস হল না। স্টেশনে নেমে পায়চারি করেই সখ মেটানো হয়েছিল। তবুতো ল্যাপ্‌-ল্যাণ্ডের তুষারাচ্ছন্ন ভূমিতে পদার্পণ করে আসা হল। এইটুকুই সান্ত্বনা! সে এক অপরূপ নূতন দৃশ্য চারিদিকে। শৈবালের শ্যামল চাদরে ঢাকা দেশ। পাহাড়গুলো বরফে সাদা। বেঁটে বেঁটে গোলগাল বরফের দেশের মানুষগুলিকে কিন্তু বেশ সুস্থ ও বলিষ্ঠ মনে হল। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে গুলি খেলছে যেন সাদা পশমের বল। কিন্তু গায়ে তাদের নানা রঙীণ পশমের ঝালর দেওয়া পুলওভার কিম্বা হরিণের চামড়ার অতি অপরিচ্ছন্ন কোট! বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে প্রত্যেক লোক যেমন ঘরে ঘরে গরু রাখতেনই আগে, এখানে তেমনি প্রায় প্রত্যেক ল্যাপ পরিবারের ঘরে হরিণ আছেই। এই রেইন-ডিয়ারগুলিই এদের ভবপারের কাণ্ডারী। হরিণের শ্লেজ্‌ চখে পড়লো, কিন্তু কুকুরটানা গাড়ী দেখলাম না। পরে সুইজারল্যাণ্ডে জুংফ্রাউর পথে কুকুরটানা শ্লেজ্‌ একাধিক দেখেছি, স্টেশনে মালবহনের কাজ করছে।

উপশালায় নেমে দেখা গেল উপশালা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বিখ্যাত এখানকার উপশালা ক্যাথিড্রাল! গির্জাটিকে এরা যত্ন করে রেখেছেও বেশ। দেখলে নেহাৎ গ্রাম্য গির্জা বলে মনে হয় না। একটা আভিজাত্য চোখে পড়ে! সোয়েডেনের এই উপশালা বিশ্ববিদ্যালয়টি অনেকদিনের প্রাচীন। ১৪৭৭ খৃঃ অব্দে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অবশ্য তখন এর কি রূপ ছিল জানি না, আজ কিন্তু সমস্ত উপশালা জনপদটাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রদেশ হয়ে উঠেছে। কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় দেখে এসেছি। কিন্তু তাঁরা কই এমন করে সমগ্র প্রদেশটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করতে পারেননি। ওখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ নয় এমন বহু লোক বাস করেন দেখেছি। কিন্তু উপশালার প্রত্যেক ইঞ্চিটুকু বিশ্ববিদ্যালয়ের। এখানকার উপশালা দুর্গটিও দেখবার মতো। সোয়েডেনের অবিস্মরণীয় অধীশ্বর গুস্তাভ ভাসা, যাঁকে নব সোয়েডেনের জনক বলা যেতে পারে তিনি এখানেই বাস করতেন। তাঁর সমাধি রয়েছে দেখে এলাম উপশালা ক্যাথিড্রালের মধ্যে।

'উপশালা' থেকে স্টকহোমে ফিরতে আমাদের রাত্রি ন'টা হয়েছিল। উপশালায় না নামলে আমরা বিকেল ছ'টার মধ্যেই আসতে পারতুম। সোয়েডেনে রাত্রি আট্‌টা নটা কেন, দিনের আলো প্রায় সারারাতই অল্পস্বল্প থাকে। পরদিন সকালে আমাদের নতুন ঠিকানার খবর দিয়ে শ্রীযুক্ত স্ট্রমগ্রেন সাহেবকে ফোন করে দিলাম। নির্মল ভায়াদেরও জানালাম এবং বোরের্ক-ম্যান সাহেবকেও জানাবার জন্য তাঁর মহিলা

রয়্যাল লাইব্রেরী—স্টকহোম

সেক্রেটারীকে অনুরোধ করলাম। শ্রীমতী রেগুলোর কথা মনে ছিল না। কিন্তু, তিনি নিজেই এসে হাজির হলেন। বললেন, তোমাদের পুরানো হোটেলের ম্যানেজার আমাকে তোমাদের ফিরে আসার খবর এবং নতুন হোটেলের ঠিকানা দিয়েছেন।

জুলাই মাস প্রায় শেষ হয়ে এল। ৩রা আগস্ট আমাদের লণ্ডনে ফিরতেই হবে। পেনক্লাবের আন্তর্জাতিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত হারমন আউল্ড ঐদিন আমাদের নিমন্ত্রণ করে রেখেছেন ওখানকার সাহিত্যিকবৃন্দের সঙ্গে পেনক্লাবের বিশেষ সভায় মিলিত হবার জন্য। এদিকে আবার দক্ষিণ নরওয়ে ঘুরে যাবার ইচ্ছাটাও প্রবল। উত্তরে নার্ভিক, লোফোটেন ও ট্রণ্ড্‌হাইম দেখে এসেছি। এবার নরওয়ের প্রধান শহর 'ওসলো' ও প্রধান বন্দর 'বার্গেন' দেখে একটু বোটে করে নরওয়ের 'ফিয়োর্ডে' বেড়িয়ে যাবার বাসনা। সুতরাং ঠিক করেই ফেলা হল যে, স্টকহোমে এবার দু' একদিনের বেশী থাকা হবে না। নির্মল-ভাই এ কথা শুনে সেইদিনই রাত্রে আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে খাওয়াবার জন্য। এ'দের সে আন্তরিক আগ্রহ উপেক্ষা করা অসাধ্য।

সারাদিন শ্রীমতী রেগুলোকে নিয়েই কাটলো। তিনি ধরে নিয়ে গেলেন আমাদের সোয়েডেনের সেই দিয়ুরগার্দেন দ্বীপে। এখানকার এই যে মনোহর উদ্যান; এই যে রমণীয় কুঞ্জবন, এ কোনো সরকারী বা মিউনিসিপ্যাল বাগান নয়। সোয়েডেনের অকৃপণা প্রকৃতির দান এই দ্বীপস্থ রম্য উদ্যান, স্টকহোমকে করে তুলেছে সুন্দরতম। মনে পড়লো স্ট্রমগ্রেন সাহেব এই স্থানটিকেই বোধ করি পিক্‌নিকের আর্দশ স্থান বলে উল্লেখ করেছিলেন। আজকে আমরা শ্রীমতী রেগুলোকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করলাম। ঐ নন্দন কাননেরই একটি 'বৈভ্রাজ্য' রেস্তোঁরায় পরমানন্দে আমাদের মধ্যাহ্নভোজ হল। সারাটা দিন কেটে গেল শুধু সাহিত্যচর্চা করে। অবশ্য রাজনীতি ও সমাজনীতি যে একেবারে বর্জিত ছিল তা নয়, তবে, সাহিত্যপাগল রেগুলো বিবি ঘুরে ফিরে সারদার পন্থবনেই ফিরে আসছিলেন। বললেন, 'আমি পেনক্লাবের' মেম্বর নই
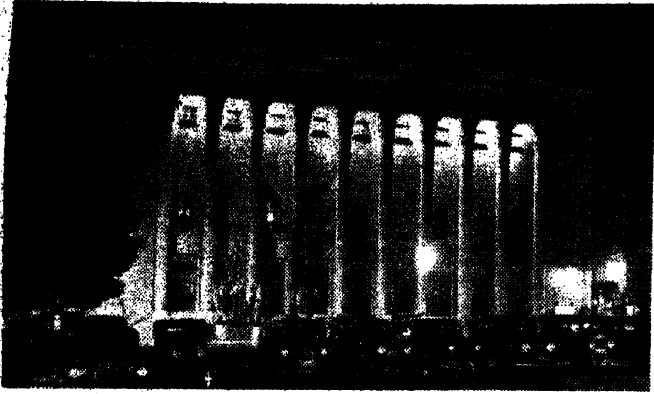
কনসার্ট হল—স্টকহোম

এবং এডিনবরার আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনে নিমন্ত্রিতও হইনি, কিন্তু, তোমরা সেখানে যাবে শুনে আমার খুবই যেতে ইচ্ছে হচ্ছে।— দেখি কি করতে পারি?' বিকেলে আমাদের চা পান করিয়ে তবে শ্রীমতী রেগুলো বিদায় নিলেন।

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র নির্মল সস্ত্রীক সে রাত্রে আমাদের বড় যত্ন করে খাওয়ালেন। ওমপ্রকাশও পত্নীকে নিয়ে এলেন আমাদের কাছে। একই বাড়িতে পাশাপাশি তো দুই বন্ধুর ঘর। শোনা গেল জাঁতি পেয়ে সেদিন নাকি সারারাত জেগে খাস্তাজী সুপারি বানিয়েছেন! জাঁতির সঙ্গে দিলেন এক কৌটা কাট্টা সুপারি আর তার সঙ্গে লবঙ্গ ও এলাচ ফাউ। নির্মল ভাইরা মাছ মাংস খান না। তাঁর রান্নাঘরেও ওসব ঢোকে না। পাঞ্জাবী পরোটা, ছোলার দাল, আলুর দম, বাঁধা-কপির র‍্যওতা, চাটনি আর তার সঙ্গে এতরকমের আচার বার করলেন নির্মলা বউ, যে মাছ মংসের চেয়ে খাওয়া এতটুকুও খারাপ লাগল না। আজ এখানে খাওয়ার আগে শ্রীমতী ওদের রসগোল্লা তৈরী করতে শিখিয়ে দিলেন। এখানকার দুধ খুব উৎ-কৃষ্ট। ও'রা সকালবেলাই ছানা তৈরী করে রেখেছিলেন। স্ফটিকের মতো ঝকঝক্ উৎকৃষ্ট দোবরা চিনি। গ্যাসের আঁচ। ইচ্ছামত তাপ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সুতরাং রসগোল্লা হয়ে উঠলো যেন বাগবাজারের নবীন ময়রার—রাজভোগ! প্রথম 'টেস্ট' করে দেখবার সম্মান আমি পেয়েছিলাম। গৃহিণীর স্বহস্তে প্রস্তুত রসগোল্লার আস্বাদ যেমনিই হোক না কেন, কেউ কি তার অখ্যাতি করার বোকামি করতে পারে? পাঞ্জাবী ছেলে দুটির ঘটে সে বুদ্ধি নেই। তাঁরা আমার প্রশংসা-পত্রটাকেই অকৃত্রিম বলে ধরে নিলেন। ভারি খুশী ও'রা।

গ্রামোফোন রেকর্ডে স্বদেশের বহু পরিচিত কণ্ঠের একাধিক গান শুনে আনন্দ-তৃপ্ত হয়ে অনেক রাত্রে আমরা হোটেলে ফিরলাম। ও'রাই কাল আমাদের প্রোগ্রাম ঠিক করে দিলেন। ও'দের অফিসের সেই সুইডিশ সাহেবটি লাঞ্চের পর এসে আমাদের নিয়ে 'গোটা ক্যানেলের' মধ্যে বোটে করে খুব খানিকটা ঘুরিয়ে আনবেন, তারপর সন্ধ্যায় বিমলের 'ব্যাচিলার্স ডেনে' গিয়ে নৈশভোজ!

পরদিন সকালে প্রাতরাশের পর স্ট্রমগ্রেন সাহেবের কথা মতো তাঁর কাছে হাজির হওয়া গেল। 'দুপুর রাতের সূর্য' আমরা খুব সুন্দর দেখেছি শুনে খুশী হয়ে তিনি আগের দিনের খানকয়েক 'ডাগেন্‌সে নাই-হিটার' কাগজ আমাদের উপহার দিয়ে বললেন—দেশের আত্মীয় বন্ধুদের কাছে পাঠিয়ে দিন। তাঁরা দেখে খুশী হবেন। মিসেস্ দেবের কাছে কবে আমরা 'মিড-নাইট সানের' উপর লেখা কবিতাটি দেখতে পাবো? ডাগেন্‌স নাইহিটারের এডিটারের সঙ্গে আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকবো সেই রচনাটি দেখবার জন্য। আমি সেটা সুইডিশ ভাষায় অনুবাদ করতে চাই। আতঙ্কিত হবেন না। আমি টেগোরের লেখা ভারতের জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন' অধিনায়ক সুইডিশ ভাষায় অনুবাদ করেছি, এবং দেখুন, বলে একখানি দু'ভাঁজ করা কার্ড বার ক'রে আমাদের হাতে দিলেন।' কার্ড-খানিতে স্বর্ণাক্ষরে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সঙ' লেখা আর তার উপর রুপালিতে 'এমবস্' করা হয়েছে ভারত রাষ্ট্রের সেই সারনাথীয় ত্রিমূর্তি সিংহপ্রতীক। ভিতরে বাঁ-দিকে দেবনাগরি ভাষায় 'জনগণমন' গানখানি ইন্ডিয়ানরেডে ছাপা। ডানদিকে ইংরাজি অনুবাদ এবং তার পিছনে অর্থাৎ চতুর্থ পৃষ্ঠায় আছে সুইডিশ অনুবাদ। শ্রীমতী তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন নিশীথ রাতের সূর্যের যে আশ্চর্য রূপ দেখে এসেছি তা অনির্বচনীয়। ভাষায় তা প্রকাশ করা যাবে না। ছন্দোবন্ধে তাকে ধরে আনার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র! তুলির আঁচড়ে বা আলোকচিত্রে তার সামান্য মাত্র আভাসও দেওয়া যাবে না। স্ট্রমগ্রেন সাহেব বললেন—'আপনার কথা ঠিক; তবু, আমার অনুরোধ, একবার চেষ্টা করবেন লিখতে। কবির লেখনীর মুখে প্রকৃতির অনেক গোপন রহস্য অপ্রত্যাশিত রূপে ধরা দেয় দেখেছি।

স্ট্রমগ্রেন সাহেব আমাদের নিয়ে চললেন 'অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস্' দেখাতে। পথে পড়লো স্টকহোমের প্রসিদ্ধ 'কনসার্ট হল সুন্দর বাড়িখানি। অভিনব স্থাপত্য কৌশল এ ভবনের আপাদশীর্ষে রূপায়িত। 'কনসার্ট হলে'র সামনেই একটি 'গ্রুপ স্ট্যাচু' রয়েছে। অর্থাৎ অনেকগুলি মূর্তির একত্র সমাবেশ। এর সবগুলিই সুর ও সঙ্গীতের কল্পিত রূপ বা প্রতীক মূর্তি। এটি দেখে মনে হ'ল সুইডিশ ভাস্কর্যকলার সেটি যেন একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন! মূর্তি-গুলি নগ্ন, কিন্তু শ্লীলতার মর্যাদা কিছু-মাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি কোথাও। ওখান থেকে এ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস দেখতে গিয়ে শোনা গেল সেটি আজ বন্ধ। স্ট্রমগ্রেন সাহেব তখন আমাদের নিয়ে চললেন, 'দ্রথনিংহোম দুর্গ' দেখাতে। দুর্গ প্রাঙ্গণে চমৎকার বাগান। দুর্গের মধ্যে প্রাচীন রাজকীয় নাট্যশালা রয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই নাট্যশালা প্রথম নির্মিত হয়েছিল। আজ এই বিংশ শতাব্দীর মাঝা-মাঝি সময়েও সেটিকে ঠিক সেই প্রথম-দিনের অবস্থায় সযত্নে অক্ষত রাখা হয়েছে। দুর্গের মধ্যে রাজারাজড়াদের ব্যবহারের বহু

...রানে আসবাবপত্র, ভাল ভাল সব দুর্লভ ...ও রাজন্যবৃন্দের প্রতিকৃতি দেখলাম।

বেলা বাড়ছিল। স্ট্রমগ্রেন ঘড়ি দেখে ...লেন—চলুন এই বার 'সুইডিশ' এ্যাকা-ডেমিতে' যাই। ওদের খবর দিয়েছি আজ সকালে এগারোটার সময় আমি আপনাদের নিয়ে যাবো। সুইডিশ এ্যাকাডেমি থেকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয় বটে, কিন্তু, তাবলে এ্যাকাডেমির চেহারা খুব নোবল মনে হল না। সাধারণ একখানি বাড়ি, তবে তার মধ্যে বিশেষ একটা গাম্ভীর্য রয়েছে। হ'তে পারে সেটা আমাদের মনের একটা সাইকোলজিক্যাল প্রক্ষেপ মাত্র! ওখানে প্রবেশ করা মাত্র কর্তৃপক্ষের কয়েকজন এগিয়ে এসে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। কবে এসেছি, কোথায় কোথায় ঘুরেছি ইত্যাদি নানা আলোচনার পর আমাদের নিয়ে গিয়ে এ্যাকাডেমির মধ্যে ঘোরালেন। কাউন্সিলরুম, লেকচার হল, বোর্ড-চেম্বার, অফিস, লাইব্রেরী ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে সব। লাইব্রেরীর নোবেল লিটারেচার বিভাগে আজপর্যন্ত যতগুলি কবি ও সাহিত্যিককে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তাঁদের চিত্র ও রচনাবলী রয়েছে। ওঁদের এ্যাকাডেমির রিপোর্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র একবোঝা আমাদের উপহার দিলেন। আমাদের কোনও রচনা য়ুরোপীয় কোনও ভাষায় অনুদিত হয়েছে কিনা জানতে চাইলেন। তাঁদের আনীত 'পানীয়র' পরিবর্তে আমরা কোল্ড সমাজের মানুষ, কোল্ড ড্রিংকস্ গলাধঃকরণ করে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

লাঞ্চের পর বোটে ক'রে ক্যানালে বেড়াতে যাওয়ার প্রোগ্রাম আছে শুনে স্ট্রম-গ্রেন সাহেব বললেন, তাহলে অমনি 'গ্রিপশোম দুর্গটা' দেখে আসবেন। আমরা পরশু ভোরের ট্রেনে স্টকহোম ছেড়ে ওস্‌লো চলে যাবো শুনি উনি বললেন তাহলে কাল রাত্রে আমার বাড়িতে আপনাদের ফেয়ারওয়েল ডিনারের নিমন্ত্রণ রইল। আমার স্ত্রী ও কন্যা আপনাদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য উৎসুক হয়ে আছেন। এরপর আর আমরা 'না' বলতে পারলাম না। উনি আমাদের হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

হোটেলে এসে শুনলাম শ্রীমতী রেগুলো আমাদের খুঁজতে এসেছিলেন। লাঞ্চের পর আবার আসবেন বলে গেছেন। সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে বেশ একটু ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল। দুপুরে মধ্যাহ্ন সেবার পর একটু বিশ্রাম করবার ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু, হল না। শ্রীমতী রেগুলো এসে হাজির তাঁর একতাড়া টাইপ করা কবিতা ও প্রবন্ধ নিয়ে। শুনতে হবে। হবে বৈ কি! সাহিত্য সেবার অপরাধ যখন রয়েছে, দণ্ড তার এড়াবার উপায় নেই। শ্রীমতী রেগুলো শুরু করেছিলেন তাঁর একটি দুর্বোধ্য রচনা পড়তে, দ্বিপ্রাহরিক গুরু ভোজনের পর এই গুরুপাক রচনার চাপে দু চোখে বেশ একটু তন্দ্রা নেমে আসছিল। ঘুমিয়ে পড়ার লজ্জা থেকে রক্ষা তিনটি দিনের আনন্দ অভিযান আপনাদের জীবনে চিরদিন এক অবিস্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। তিনি বার বার বলেছিলেন, গথেনবার্গে অতি অবশ্য যেও। সোয়েডেনের দ্বিতীয় বৃহৎ শহর সেটি। দেখে খুশী হবে। কিন্তু, আমরা সেখানে যেতে পারিনি। ওরা আগস্টের মধ্যে পি-ই-এন মিটিংয়ের জন্য লণ্ডনে ফিরতেই হবে। তাই কালই সোয়েডেন ছাড়বার ইচ্ছা ছিল। উত্তর সাগর পার হবার জাহাজে যায়গা পাওয়া গেল না বলে আর একদিন অপেক্ষা করতে হল।

ল্যাপল্যাণ্ডের দিকে

করলেন ইণ্ডিয়ান লিগেশনের সেই সুইডিশ কর্মচারিটি এসে। কিছুতেই এ ভদ্র-লোকের নামটা মনে করতে পারছি না। বেরিয়ে পড়লাম আমরা তাঁর সঙ্গে নৌ-বিহারে যাত্রা করবার জন্য। শ্রীমতী রেগুলোও সানন্দে আমাদের সঙ্গী হলেন। বললেন, 'চমৎকার হবে, চলো। মুক্ত প্রকৃতির কোলে—আকাশের নীচে—ঢেউয়ে দুলতে দুলতে বোটের উপর আমার কবিতা শোনাবো তোমাদের!

ম্যালার্ন লেক থেকে বোটে উঠে আমরা চললেম বাল্টিকের প্রসারিত বাহু ধরে গটল্যাণ্ড দ্বীপগুলি ঘুরে; গোটা ক্যানেলের দিকে। স্ট্রমগ্রেন বলেছিলেন সোয়েডেনে এসে যদি গোটাক্যানেলে বেড়িয়ে না যায় কেউ তাহলে সোয়েডেনের আসল রূপই তার চোখে পড়বে না। তিনি বলেন, মোটর লাঞ্চে স্টকহোম থেকে গথেনবার্গ পর্যন্ত যেতে মাত্র তিনদিন লাগবে। কিন্তু সেই কাজেই স্টকহোম থেকেই টেলিগ্রাম করে পেনক্লাবের আন্তর্জাতিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত হারমন আউল্ডকে জানিয়ে দিতে হ'ল—'অত্যন্ত দুঃখিত! স্টীমারে প্যাসেজ পাওয়া গেল না বলে আটকে পড়েছি। লণ্ডনের সমস্ত সাহিত্যিক বন্ধুগণকে আমাদের উভয়ের সাদর অভিবাদন ও শুভেচ্ছা জানাবেন।'

ঘণ্টাতিনেক গোটা ক্যানেলে বেড়িয়ে আবার স্টকহোমের ঘাটে এসে নামা গেল। স্ট্রমগ্রেন সাহেব কিছুমাত্র অত্যুক্তি করেননি। প্রথমতঃ এই গোটা ক্যানেলটাই তো পূর্ত বিভাগের ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের একটা অদ্ভুত কীর্তি। স্টকহোম আর গথেনবার্গের মধ্যে এই জলপথের সংযোগ করে বহু দূরত্বের ব্যবধান দূর করে কৃষিক্ষেত্রে সোণা ফলিয়েছে। তারপর এর দুধারের যে অপ-রূপ দৃশ্য তা দেখে দেবতারাও মুগ্ধ হবেন, আমরা তো মানুষ! বোটে আমাদের ছবি

গোটা কমলেল
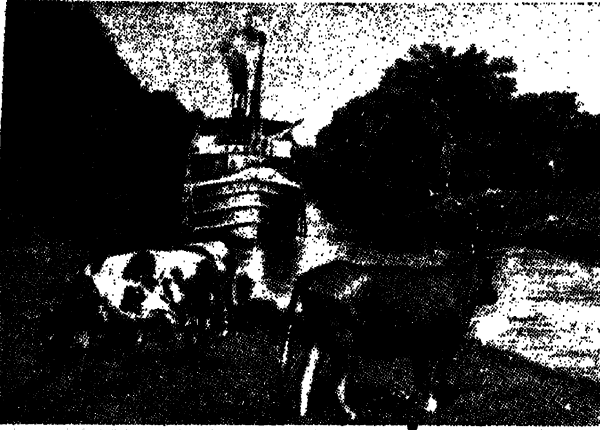
নিলেন অনেকে। 'ডাগেনস্ নাইহিটার' যে আমাদের কী সর্বনাশ করেছে তার পরিচয় আমরা সেই সুদূর নার্ভিক থেকে ট্রেনে বাসে দোকানে হোটেলে স্টেশনে পোঃ অফিসে সর্বত্র পাচ্ছি। যেখানেই যাই, লোকে আমার গোঁফ জোড়াটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকায়, সঙ্গের সাথী স্ত্রীকন্যাকে মনোযোগ দিয়ে দেখে, তারপর বিনীত কণ্ঠে বলে "মাপ করবেন, আপনারাই কি সেই 'ব্রাউনিং কাপ্‌ল' ফ্রম ইণ্ডিয়া? কেউ বা বলে, 'আপনারাই মিঃ ও মিসেস দেব, বেঙ্গল থেকে এসেছেন না? খবরের কাগজে আপনাদের কথা পড়েছি, আপনাদের ছবি দেখেছি। আলাপ করে সুখী হলাম। মিডনাইট সান কি দেখে এসেছেন?" এদের ঠেলায় পাগল হবার উপক্রম! ভাবলাম, গোঁফ জোড়াটা না হয় কামিয়ে ফেলি, কিংবা লম্বা দাড়ি রাখি, অথবা বাইরে বেরুবার সময় বুকে একখানা কার্ড ঝুলিয়ে যাই; যাতে লেখা থাকিবে—"আপনাদের অনুমান সত্য। আমরাই তারা।"

শ্রীমতী রেগ্‌নলোকে ঘাট থেকেই বিদায় দিয়ে আমরা চললাম শ্রীমান বিমলের বাড়ি নৈশ ভোজনে। শ্রীমতী রেগ্‌নলো সেদিন বোটে আর আমাদের কিছু শোনাবার সুযোগ পাননি। ও'কে আমরা কাল সকালে আমাদের হোটেলে এসে 'ব্রেকফাস্ট' করতে বললাম। উনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বললেন, আমি যে কিছুতেই বেলা দশটার আগে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারিনে। নইলে কি রোজ সকালে তোমাদের কাছে ছুটে আসতাম না।' মনে মনে বললাম, 'ভগবান রক্ষা করেছেন! তবু একটা বেলা তিনি তোমার হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েছেন।'

বিমলের বাড়ি গিয়ে আমরা অবাক! স্টকহোমের সদ্য প্রসারিত নূতন এক পাড়ায় সুন্দর একটি কোয়ার্টার নিয়েছে সে। আলট্রা মডার্ন হাউস! নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আমাদের অপরিচিত দু'টি তিনটি সুইডিশ তরুণী ছিলেন। বিমল বললে, এ'রা আমাদের অফিস ফ্রেণ্ড। তারপর এক এক জনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলে, বললে, এরাই আপনাদের জন্য আজ সব রান্না করেছে। মেয়েগুলির একজনেরও নাম মনে নেই, কিন্তু মুখ মনে আছে, হাসি মনে আছে, চোখের চাউনি মনে আছে। খান্না ও নির্মল আমরা যাবার আগেই এসে পড়েছিলেন। মিত্তির আমাদের পোলাও, ফাউলকারি, সবজী, চাটনি, পায়েস, পুডিং অনেকরকম খাওয়ালে। খুব হৈ হৈ ক'রে হাসি হুল্লোড় আর গল্পের ভিতর দিয়ে খাওয়া হ'ল। 'ব্যাচিলার্স ডেনে' এ ধরণের উচ্ছৃঙ্খলতা সর্বদাই মার্জনীয়। বিমলের ঘরের ভিতর একরকম লতাগাছ দেখলাম টবে হয়েছে। দেওয়ালের গা বেয়ে আইভি লতার মতো উঠছে। আর দেখলাম, টবের মধ্যে বামন বনস্পতি! তার সমস্ত আকৃতি, শাখাপ্রশাখা, কাণ্ড একটি পরিণত বিশাল শাল্মলী তরুর মতো, কিন্তু দৈর্ঘ্যে এক ফুটেরও বেশী হবে না। ক্লেন 'মিনিয়েচার' মহাবট! এই ধরণের গাছ সংগ্রহ করে দেশে আনবার সাধ হ'ল। কিন্তু, ও'রা বললেন, 'সুইডিশ সরকার আইন করে সেটা নিষেধ করেছেন। এ গাছ যদি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তা'হলে সোয়েডেনের বিশেষত্ব থাকবে কেন?' কথাটা না মেনে উপায় নেই।

পরেরদিন সকালে আমরা আবার 'এ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস' দেখতে গেলাম। আজ এর দরজা খোলা ছিল। চিত্র ও ভাস্কর্যকলার এমন শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ ইতিপূর্বে অল্পই চোখে পড়েছে। ছবি এদের যত প্রাচীন দুর্গ থেকে প্রত্যেক যাদুঘর পর্যন্ত সর্বত্রই আছে, কিন্তু, এমন সুনির্দিষ্ট কালানুসারে ও চিত্রের বিভিন্ন ধর্ম অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে সুবিন্যস্ত সর্বযুগের শিল্পকলার নিদর্শন সোয়েডেনের আর কোথাও নেই। সেই ভাইকিং যুগ থকে আধুনিককাল পর্যন্ত সোয়েডেনের শিল্প প্রতিভার গতি ও প্রকৃতির অখণ্ড ইতিহাস এখানে এলে পাওয়া যায়। যুগ যুগান্তের চিত্রকাহিনী—একি একদিনে মাত্র কয়েক ঘণ্টায় দেখা শেষ করা যায়। অসম্পূর্ণ দেখার ক্ষোভ নিয়ে বেরিয়ে আসতে হ'ল। ল্যাণ্ডটাইম উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

সবেমাত্র দ্বিপ্রাহরিক আহার শেষ করে হোটেলে এসে ঢুকেছি, শ্রীমতী রেগ্‌নলো এসে হাজির! নিরুপায়ের মত আত্মসমর্পণ করলাম তাঁর কাছে। শুরু হ'ল তাঁর রচনা পাঠ। কতক্ষণ পরে জানি না অকস্মাৎ পত্নী আমার গা ঠেলে নাড়া দিয়ে মৃদুস্বরে মাতৃভাষায় বললেন—'কি করছো? নাক ডাকছে যে!' সচকিত হয়ে বসলাম। কিন্তু রেগ্‌নলো বিবি তাঁর রচনা পাঠে এমনি তন্ময় যে, শ্রোতার অবস্থার প্রতি দৃক্‌পাত করবারও তাঁর অবকাশ নেই! আপন কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কোনও স্বরই বোধ করি তাঁর কানে যাচ্ছিল না।

চায়ের সময় হয়েছে দেখে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। আজ সোয়েডেনে আমাদের শেষ রজনী। দোকানে ঘুরে ঘুরে কিছু সওদা করা হল, কিছু 'সুভেনীর' নেওয়া হ'ল। রেগ্‌নলো সঙ্গে থাকায় সুবিধা হ'ল, কেননা কোন্ জিনিসের কি দর ও'র জানা আছে। সন্ধ্যাটা স্টকহোমের কেন্দ্রস্থল রয়াল লাইব্রেরী সংলগ্ন 'হ্যামল গার্ডেন' পার্কে বসে কাটানো গেল, তারপর শ্রীমতী রেগ্‌নলোর কাছে শেষ বিদায় নিয়ে আমরা

একখানা ট্যাক্সী ধ'রে চললাম স্ট্রমগ্রেনের বাড়ির বিদায় ভোজে। রেগ্নলোর দুই চোখ জলে ভরে উঠলো। আমাদের সকলকে সে আলিঙ্গন দিয়ে এবং তার ছবি ও রচনা উপহার দিয়ে বিদায় নিলে। ওর আন্তরিকতা আমাদের মনকে স্পর্শ করলো। চিত্ত ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো।

স্ট্রমগ্রেন তাঁর বাড়ির ঠিকানা একখানা কাগজে লিখে আমাদের দিয়েছিলেন। সেই কাগজখানি ড্রাইভারের হাতে দিয়ে আকারে ইঙ্গিতে বোঝালাম এইখানে যেতে চাই, এইখানে নিয়ে চলো। নিয়ে চললে সে। একবর্ণও ইংরাজী বোঝে না বেচারা। গাড়ি চলেছে তো চলেছেই। সারা স্টকহোম শহরটা প্রদক্ষিণ ক'রে ঘণ্টাখানেক বাদে যেখানে নিয়ে এল সে রাস্তায় ঐ নম্বরের কোন বাড়িই নেই! পথের একজন লোককে স্ট্রমগ্রেন সাহেবের ঠিকানা লেখা কাগজখানা দেখাতে তিনি ড্রাইভারকে বললেন, 'তুমি ভুল করেছো। এই নামের অন্য বানানের আর একটা রাস্তা অমুক জায়গায় পাবে' ড্রাইভার তখন বলে উঠলো, 'হাঁ হাঁ জানি সে রাস্তা! আমার ঠিকানাটা পড়বার সময় বানানটা দেখতে ভুল হয়েছে। আমি বড় দুঃখিত।'

এবার সে যথাস্থানে এনে হাজির করলে। স্ট্রমগ্রেন সাহেবের বাড়ি দেখে বিস্মিত হলাম। লেকের ধারে একটি উঁচু টিলার উপর অতি আধুনিক ফ্যাসানে তৈরি আকাশ-ছোঁয়া বারোতলা বাড়ি। কুমারী স্ট্রমগ্রেন আমাদের জন্য বাইরেই অপেক্ষা করছিলেন। সমাদরে নামিয়ে নিলেন। তাঁকে আমাদের বিলম্বের কৈফিয়ৎস্বরূপ ড্রাইভারের ভুলের গল্পটা বললাম। মেয়েটি হেসে ফেললে। স্নিগ্ধ মধুর হাসি। কোনও উচ্ছলতা নেই। কিন্তু, আমাদের হাসি তখন শুকিয়ে গেছে। ট্যাক্সীভাড়া দিতে হ'ল ১৫ ক্রোন ৫০ ওর্! মেয়েটি ছেলেমানুষ। বছর সতেরো আঠারোর বেশী বয়স হবে বলে মনে হ'ল না। খুব শান্ত লক্ষ্মী ধীর ও মিষ্টস্বভাবের মেয়ে। যখন বললাম, তোমার বাবার কাছে আমরা খুব ঋণী। সোয়েডেনে আসা পর্যন্ত তিনি আমাদের খুব আদর যত্ন করছেন। মেয়েটি বললে, 'সোয়েডেনের প্রত্যেক লোকের সেটা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করি।'

লিফ্টে তুলে নিয়ে গেল মেয়েটি আমাদের সেই বারোতলার উপরে একটি প্রশস্ত হলঘরে। স্ট্রমগ্রেন সাহেব হাসিমুখে এগিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করে স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, আর পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর আর একজন মহিলা অতিথির সঙ্গে। ইনি একজন সম্ভ্রান্ত ঘরের অভিজাত ইংরাজ মহিলা। নাম লেডী বারবারা হাডসন্। তিনি নাকি ইংলণ্ডের একজন স্বর্গগত মার্কুইসের পত্নী। বয়স হয়েছে যে এটা প্রথম সন্দর্শনে বোঝা যায়

শ্রীমতী ইলীন রেগ্নলো

না। প্রসাধনের নৈপুণ্যে ঢাকা পড়েছে। গোলাপী রং। এক সময়ে অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন, আজও তার জৌলুস রয়েছে। বিদুষী এবং সুরসিকা। আমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা যা কিছু সব তিনিই করলেন। স্ট্রমগ্রেনপত্নী অত্যন্ত স্বল্পভাষিণী। ইংরাজি ভাল জানেন না। চেহারাটি ভাল। পুরানো হাতীর দাঁতের মতো মৃদু উজ্জ্বল বাদামী রং এবং সেই রকমই নিটোল দেহ। অতি সংক্ষিপ্ত-তম বেশবাসে তিনি রয়েছেন দেখলাম। শুনলাম তিনি গরম সহ্য করতে পারেন না বলে যথাসম্ভব বস্ত্রবাহুল্য থেকে মুক্তি নিয়েছেন।

স্ট্রমগ্রেন সাহেবের সঙ্গে দেখা গেল লেডী বারবারা হাড্সনের সম্প্রীতি একটু বেশী। সান্ধ্য আসরের এক ফাঁকে কুমারী স্ট্রমগ্রেনের সঙ্গে অনেক কথা হ'ল। বেশ ইংরাজী বলে মেয়েটি। সে তার মাতার একমাত্র কন্যা। শৈশবে পিতৃহীনা। স্ট্রমগ্রেন তার সৎপিতা। স্ট্রমগ্রেন তাকে খুব ভালবাসেন বললে। সে কলেজ বোর্ডিংএ থাকে। ছুটিতে বাড়ি এসেছে।

স্ট্রমগ্রেন সাহেব খুব খাওয়ালেন। ডিনার টেব্লে ভাল ভাল রকমারি আসব বার করলেন, কিন্তু আমরা ও রসে বঞ্চিত। শ্রীমতী স্ট্রমগ্রেন নিজে টেব্ল্ ছেড়ে উঠে গিয়ে আমাদের জন্য অতি সুস্বাদু শীতল সিরাপ এনে দিলেন। হাসি ঠাট্টা রসিকতা ও বর্তমান পৃথিবী সংক্রান্ত নানা আলো-চনার ভিতর দিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত আনন্দে কাটল। স্ট্রমগ্রেনের সেই বারোতলার উপরের ঘরে শাঁখের মতো উজ্জ্বল সাদা দেওয়ালের গায়ে দেখা গেল সেই বিমলের বাড়ির মতো সুদৃশ্য শ্যাম লতা যেন কাশ্মীরী শালের নক্সাপাড়ের মতো আল্পনা দিতে দিতে নিজেকে বিস্তৃত ক'রে চলেছে! শোনা গেল ও'তে সুগন্ধ সুন্দর ফুলও নাকি নব-বসন্তের বার্তা নিয়ে আসে।

স্ট্রমগ্রেন সাহেব আমাদের ছাদে নিয়ে গেলেন। মনে হ'ল, যেন বেণীমাধবের ধ্বজার উপর থেকে দীপালির রাত্রে ভাগীরথী পরিবেষ্টিত বারাণসী নগর দেখছি। সেই বারোতলার ছাদের উপর থেকে ম্যালার্ন লেকের ধারে রাত্রির স্টকহোম যেন কোন রূপকথায় বর্ণিত স্বপ্নরাজ্যের আলোকোজ্জ্বল রহস্যপুরীর মতো দেখাচ্ছিল! স্ট্রমগ্রেন সাহেব হাসতে হাসতে বললেন,—'সারা সোয়েডেনের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু বাড়িতে একমাত্র আমিই বাস করি। প্রায় স্বর্গরাজ্যের কাছাকাছি।

কাল ভোরের গাড়ি ধ'রে 'ওস্লো' রওনা হ'তে হবে। আমরা বাড়ি ফিরতে চাইলাম। লেডী বারবারা হাড্সন রয়ে গেলেন। তিনি ছুটিতে বেড়াতে এসেছেন। স্ট্রমগ্রেনের অতিথি হ'য়ে—কিছুদিন এই স্বর্গরাজ্যের কাছাকাছি বাস করবেন। স্ট্রমগ্রেনের মোটর আমাদের হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

৬৮

সিমলা পাহাড়ের তুষারপাতের কথা বলতে গিয়ে সেখানকার আর একটা কাহিনীর কথা মনে পড়ে গেল। ব্যাপারটা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর এক অভিজ্ঞতার হাল্কা কথা; কিন্তু আমার জীবনে ঠিক সে ধরণের অভিজ্ঞতা একাধিক বার ঘটেছে বলে মনে পড়ে না। হরিষে বিষাদ বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। যে কাহিনী বলতে উদ্যত হয়েছি তা হরিষে বিষাদেরই এক ঘটনা। সাধারণত যে-সকল ক্ষেত্রে আমরা 'হরিষে বিষাদ' কথা প্রয়োগ করি, সেখানে হর্ষ এবং বিষাদের দুটি স্বতন্ত্র কারণ পাশাপাশি একসঙ্গে উদিত হওয়ায় আমাদের মনে যুগপৎ হর্ষ এবং বিষাদের অবস্থা নিয়ে আসে। কিন্তু এই দুটি স্বতন্ত্র কারণের অস্তিত্ব পূর্ব হতেই জানা থাকে বলে উভয়ের একসঙ্গে মিলিত হবার আঘাতটা আকস্মিক না হওয়ার দরুণ ততটা তীব্র হতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখানো যেতে পারে, পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘটনা। দুঃখ সম্পূর্ণভাবে অপসৃত হ'তে না হতেই আনন্দের কারণ উপস্থিত হয়েছে। সেদিন আত্মীয়স্বজনের মনে হরিষে বিষাদের অবস্থা।

কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু পৃথক রকমের হয়েছিল। যে চকমকি হর্ষের দীপ্তি উৎপাদন করেছিল, বিষাদের দাহও উৎপন্ন করেছিল সেই একই চকমকি। আর, একটি আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই অপর আঘাতটা ঘটেছিল বলে আঘাতের বেদনাও হয়েছিল অত্যন্ত তীব্র।

যে সময়কার কথা বলছি, তখনকার দিনে কলিকাতা টার্ফ ক্লাবের ডার্বি-লটারির প্রথম পুরস্কারের পরিমাণ সারা জগতের আকাঙ্ক্ষা, লোভ এবং বিস্ময়ের বস্তু ছিল। কোনও কোনও বৎসরে প্রথম পুরস্কারের তায়দাদ চল্লিশ লক্ষ টাকাও অতিক্রম করে যেত। পৃথিবীর আর কোনও দেশের লটারির প্রথম পুরস্কার বোধহয় এত অধিক ছিল না; সেইজন্য প্রত্যেক দেশের এবং জাতির লোক ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাবের লটারির টিকিট ক্রয় করে কিছু দিন ধরে ঐশ্বর্যের স্বপ্ন দেখত।

প্রথম পুরস্কারের কথা ত ছিল বিপুল ঐশ্বর্যের কথা। প্রথমেতর পুরস্কারও যারা লাভ করত তারাও নিজেদের ভাগ্যবান বলে বিবেচিত করত। এমন কি, যার টিকিটের ঘোড়া শেষ পর্যন্ত নন-স্টার্টার হত। তার ভাগ্যেও আট-দশ হাজার টাকা এসে জুটত। যে সকল ঘোড়া প্রতিযোগিতায় প্রবেশ করে, কিন্তু কোনও কারণে শেষ পর্যন্ত ঘোড়-দৌড়ে সরিক হতে পারে না, তাদের নন-স্টার্টার বলে। এ কথা অবশ্য সকলেরই জানা আছে, ডার্বি রেস হয় বিলাতে, কিন্তু তার ফলাফলের উপর কলিকাতার টার্ফ ক্লাব এবং নানান দেশের নানা প্রতিষ্ঠান পুরস্কারের লটারি চালায়।

প্রতিযোগিতায় ঘোড়ার প্রবেশ লাভের শেষ তারিখ উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর এবং ঘোড়দৌড়ের তারিখের কিছুদিন পূর্বে, লটারি টানা হয়। এই লটারি ঠিক কি পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হয় তা হয়ত আমার জানা নেই; কিন্তু মোটামুটি সাধারণ লটারির যে পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিই অনুসৃত হয়। যতগুলি ঘোড়া প্রতিযোগিতায় প্রবেশ করেছে ঘোড়ার নাম সম্বলিত ততগুলি টিকিট থাকে এক দিকে; অপর দিকে থাকে ভাগ্যান্বেষীদের নামাঙ্কিত আবর্তিত এবং ওলট পালট করা টিকিটের রাশি। একদিক থেকে একটি করে ঘোড়ার টিকিট নেওয়া হয় এবং অপর দিক থেকে একটি করে মানুষের টিকিট। যে সৌভাগ্যবানের নামে যে ঘোড়ার নাম উঠল, সে হল সেই ঘোড়ার ফলাফলের অধিকারী। অর্থাৎ ঘোড়দৌড়ের দিন সে ঘোড়া যেরূপ কৃতিত্ব দেখাবে, তদনুসারে সে ঘোড়ার টিকিটের অধিকারীও পুরস্কার লাভ করবে।

টিকিট ওঠা এবং ঘোড়দৌড়ের দৌড়ের সে টিকিটের পরিণতি নির্ণীত হওয়ার মধ্যে সময়ের যেটুকু ব্যবধান, তার মধ্যেও টিকিটের পরিত্রাণ নেই। সে টিকিটের ঘোড়া যদি তেমন জোর নামজাদা (hot favourite) কোনো ঘোড়া হয়, তাহলে তার ওপর ফটকা চলতে থাকে।

ধরুন, নরেন বসু নামে কোনও ভদ্রলোকের নামে Flying Fox ঘোড়া উঠেছে। বাজারে ফ্লাইং ফক্সের উপর প্রথম পুরস্কার লাভের জোর প্রত্যাশা। ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় ফ্লাইং ফক্স যদি প্রথম স্থান অধিকার করে তা হলে নরেনবাবু লাখ চল্লিশের কাছাকাছি একটা বিপুল অর্থের অধিকারী হন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোনও কারণে ফ্লাইং ফক্স যদি দৌড়ে নামতেই অসমর্থ হয়, তা হলে মাত্র আট দশ হাজার টাকার ওপর দিয়েই তাঁর ভাগ্যের দৌড় অবসিত হবে। এই চল্লিশ লক্ষ এবং আট হাজারের মধ্যবর্তী যে অনিশ্চয়তা, সেই অনিশ্চয়তার উপরই ফটকার অবকাশ।

এই অনিশ্চয়তার সুযোগ নিয়ে হয়ত মুরলীধর ঝুনঝুনওয়ালা নরেনবাবুর কাছে উপস্থিত হয়ে দু' লক্ষ টাকা দিয়ে টিকিটের স্বত্ব ক্রয়ের প্রস্তাব করলেন। ফ্লাইং ফক্স যদি প্রথম না হয়ে দ্বিতীয়-তৃতীয়ও হয়, তাহলেও অনেক টাকাই তাঁর লাভ; আর যদি দুর্ভাগ্যক্রমে অদৃষ্টে নন্-স্টার্টারই থাকে, তাহলে বেশ কিছু টাকা লোকসান। কিন্তু লোকসানের ঝুঁকি না নিলে লাভের সম্ভাবনাও থাকে না। অনিশ্চয়তার লতায় মধু এবং কণ্টক দুইয়েরই আশ্রয়।

নরেনবাবুর দিকে বিচারশীলতার, বিচক্ষণতার কথা। অধ্রুব চল্লিশ লক্ষের লোভে ধ্রুব দুই লক্ষ যদি হারাতে হয়, তাহলে পরে অনুশোচনা রাখবার জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ চল্লিশ লক্ষের সম্ভাবনাকে একেবারে বিসর্জন দিয়ে দুই লক্ষকেই বা বরণ করা যায় কি প্রকারে? তখন হয়ত তিনি দুকূল রক্ষার অভিপ্রায়ে একটা মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করলেন। দর কষাকষি করে সমগ্র টিকিটের মূল্য চার লক্ষ টাকায় তুললেন, আর আধখানা টিকিটের স্বত্ব বিক্রয় করলেন দু লক্ষ টাকায়। তার

ফলে হালফিল্ দু লক্ষ টাকা ঘরে উঠল, ফাউম্বরূপ আরও চার-পাঁচ হাজার ত' ঘোড়দৌড়ের পর আর একদিন উঠবেই, অধিকন্তু আরও লাখ বিশেক টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা হাতে রইল।

কিন্তু এত বুদ্ধি খাটিয়েও নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় নেই। ঘোড়দৌড়ের কাছাকাছি প্রতিদিন খবরের কাগজে ফ্লাইং ফক্স এবং অপরাপর নামজাদা ঘোড়ার বিবরণ প্রকাশিত হয়। দৌড়ের ঠিক পূর্ব দিনের কাগজে ফ্লাইং ফক্সের স্বাস্থ্য, ওজন, মেজাজ, গতিবেগ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হল, তাতে তার প্রথম স্থান অধিকার করবার সম্ভাবনা ষোল আনাই বলা চলে; দ্বিতীয় ফেভারিট ইভনিং স্টারের মোট যোগ্যতার নিরিখ অনেক নিম্নে। বেলা বারোটা আন্দাজ নরেনবাবুর কাছে সুরযলাল ঢনঢনিয়া এসে হাজির হলেন,—

"বাবুজী, আপনার আধখানা টিকিট আমাকে চার লক্ষ টাকায় বিক্রি করুন।"

পুনরায় নরেনবাবু ধ্রুব ও অধ্রুবর সমস্যার দ্বারা পীড়িত হয়ে উঠলেন। চার লক্ষ টাকাকে গ্রহণ করে মোট লাভের পরিমাণ ছয় লক্ষে দাঁড় করাবেন, অথবা মনে মনে 'বিশ লাখ রুপৈয়া দিলা দেও রাম' প্রার্থনা করে দ্বারপ্রান্ত থেকে চার লক্ষ টাকাকে বিদায় দেবেন, এই হল সমস্যা। রাতারাতি ষোল লক্ষ টাকার সুবিধা করতে এসে ঢনঢনিয়াজী নরেনবাবুকে রাতারাতি ষোল লক্ষ টাকার অসুবিধায় ফেলবার উপক্রম করেছেন।

নরেন বসু, ঝুনঝুনওয়ালা, ঢনঢনিয়ার গল্পটা অবশ্য কাল্পনিক; কিন্তু আমি যেকালের কথা বলছি, যখন কলিকাতা টার্ফ ক্লাবের ডার্বি-লটারি-সূর্য মধ্য গগনে অবস্থিত, যে সময়ে প্রথম পুরস্কারের পরিমাণ ত্রিশ লক্ষ টাকা থেকে চল্লিশ লক্ষ টাকার মধ্যে ওঠা-নামা করত, সে সময়ে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ঘোড়াগুলির উপর ঐভাবেই ফাটকা খেলা চলত। আমার মনে পড়ে, অন্তত একবার টার্ফ ক্লাবের ডার্বির প্রথম পুরস্কারের মূল্য চল্লিশ লক্ষ টাকা অতিক্রম করে গেছল। পরে ডার্বি লটারিকে অধিকতর জনপ্রিয় করবার উদ্দেশ্যে একটি প্রথম পুরস্কারকে ভাগ করে তিনটি অথবা চারটি সমমূল্যের প্রথম পুরস্কার করা হয়। বর্তমানে টার্ফ ক্লাবের অবনতির সহিত ডার্বি পুরস্কারের মূল্যও অনেক কমে গেছে।

ডার্বির টিকিট পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকেরাই বেশি কিনত, সে কথা অবশ্য সত্য; কিন্তু ভারতবর্ষে দেশীয় লোকের মধ্যেও ক্রেতার সংখ্যা কম ছিল না। বাঙালিদের মধ্যেও বহু ক্রেতা ছিল। কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন বিশ্ববিখ্যাত অ্যাডভোকেট স্যার রাসবিহারী ঘোষ বিশ বৎসর যাবৎ নিয়মিতভাবে প্রতি বৎসর দুখানা করে ডার্বি টিকিট কিনে আসছিলেন, যদিচ কোন বৎসর তাঁর অদৃষ্টে সামান্যতম পুরস্কারও জোটেনি। একদিন হাইকোর্টের উকিলদের লাইব্রেরিতে জনৈক উকিল স্যার রাসবিহারীকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আচ্ছা, আপনি ত কোন বৎসর একটা সামান্য পুরস্কারও পান না, তবু প্রতি বৎসর টিকিট কেনেন কেন? তাছাড়া আপনার আর টাকার দরকারই-বা কি? উত্তরে স্যার রাসবিহারী বলেছিলেন, 'ওহে, আমি ত টাকার জন্যে টিকিট কিনি নে,—কিনি আনন্দের জন্যে। টিকিট কেনার পর কিছুদিন মনটা যে পরিমাণ প্রফুল্ল থাকে তার মূল্য কুড়ি টাকার অনেক বেশি।'

টাকার প্রয়োজনে টিকিট না কিনেও স্যার রাসবিহারীর মন কিছুদিন প্রফুল্ল হয়ে থাকত—কিন্তু টাকার প্রয়োজনে যারা টিকিট কিনত, তাদের মন সেই সময়টা থাকত উৎফুল্ল হয়ে। আমার মেজদাদা রমণীমোহন ছিলেন সেই দলের মানুষ। তিনি প্রতি বৎসর টিকিট কিনতেন, এবং টিকিট কেনার দিন থেকে ড্রয়িং হওয়ার দিন পর্যন্ত শুধু নিজেই উৎফুল্ল হয়ে থাকতেন না, সমস্ত পরিবারকে উৎফুল্ল করে রাখতেন। তাঁর এই উৎফুল্ল হওয়া আর উৎফুল্ল করা ছিল অবশ্য চল্লিশ লক্ষ টাকার ভিত্তিতে। স্বপ্নই যদি দেখতে হল, তাহলে চল্লিশ লক্ষ টাকার না দেখে আট-দশ হাজার টাকার দেখার কোন অর্থ হয় কি? কৃপণতা কোন ক্ষেত্রেই সমর্থনীয় নয়, কল্পনা-বিলাসের ক্ষেত্রে তা নিঃসন্দেহ অপরাধ।

টিকিট কেনার দিন থেকেই স্বপ্ন দেখা আরম্ভ হয়ে যেত, কিন্তু যেমন-যেমন ঘোড়া ওঠার দিন এগিয়ে আসত—স্বপ্ন দেখার আড়ম্বর, বোধ করি গুণোত্তর হিসাবেই তেমনি-তেমনি বেড়ে উঠতে থাকত। যেবারের কথা বলছি, সেবার আমি সিমলায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। অফিস থেকে আসার পর চা-খাবার খেয়ে সকলকে নিয়ে জাঁকিয়ে বসে কতকটা নিম্নলিখিতভাবে মেজদাদা স্বপ্ন দেখতে এবং দেখাতে আরম্ভ করতেন।

লটারির ফলে ঘোড়া উঠলে ঝুনঝুনওয়ালা-ঢনঢনিয়াদের কিছুতেই আমল দেওয়া হবে না; সৌভাগ্যের যে দ্বার অদৃষ্টপুরুষ নিজ হাতে খুলতে আরম্ভ করেছেন, তাকে সর্বতোভাবে অবারিত রাখতে হবে, লোভে পড়ে তার একখানা পাল্লা রুদ্ধ করলে নিজের হাতে নিজের পায়ে কুড়ুল মারা হবে। ব্যাঙ্ক এবং অ্যাটর্নির মারফৎ টার্ফ ক্লাব থেকে টাকাটা পাওয়া গেলে অফিসে গিয়ে চাকরিতে ইস্তফা দেওয়া; সাহেবরা অবশ্য চাকরি না ছাড়বার জন্যে পীড়াপীড়ি করবে, কিন্তু কিছুতেই রাজি হওয়া নয়, যে কারণে চাকরি করা তাই যখন বিপুল পরিমাণে হস্তগত হল, তখন অপর একজনের স্থান জুড়ে আর কেন অকারণ বসে থাকা? অফিসের আরদালি, দফতরি, ঝাড়ুদার, জমাদার, চাকর-বাকরদের হাজার খানেক টাকা বকশিস দিয়ে, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে একটা বড় রকম বিদায়ভোজে আপ্যায়িত করে প্রথম শ্রেণীর ব্যবস্থা অবলম্বনে কাশীধামে উপস্থিত হওয়া; সেখানে হাজার-এক টাকা ব্যয়ে বাবা বিশ্বনাথের পূজা দিয়ে কলিকাতা যাত্রা।

এইখানে হয়ত আমি আপত্তি তুলে বলতাম, 'বাবা বিশ্বনাথের পুজোয় গোটা পঞ্চাশেক টাকা খরচ করে বাকি নশ' একান্ন টাকা গরীব-দুঃখীকে দান করা ভাল।'

আমার একথার প্রতিবাদ করে মেজবউদিদি হয়ত বলতেন, 'গরীব-দুঃখীদের দানে না-হয় হাজার টাকাই পুরিয়ে দাও ঠাকুরপো কিন্তু দেবতার টাকা কমিয়ো না।'

উত্তরে আমি হয়ত বলতাম, 'দেবতার টাকা ত' কমাচ্ছিনে, কমাচ্ছি মানুষের টাকা, পান্ডার টাকা।'

এই নিয়ে হয়ত একটু বাদ-প্রতিবাদও হয়ে যেত।

তারপর আরম্ভ হত কলিকাতার কাহিনী। কলিকাতায় পৌঁছে সাধারণ দাতব্য বিষয়ে লাখ খানেক টাকা দান; লাখ খানেক টাকা দুঃস্থ আত্মীয়বর্গের আর্থিক উন্নতিকল্পে প্রয়োগ; কলিকাতায় তিন ভাইয়ের নামে তিনখানা বাড়ি খরিদ; সিমলা, দার্জিলিং ও

পুরীতে আপাতত আরও তিনখানা প্রবাস-যাপনের জন্য।

এইরূপ বহুতর কল্পনা-জল্পনা, প্রস্তাব-প্রতিপ্রস্তাব, বাদ-প্রতিবাদ চলতে চলতে অবশেষে একদিন ড্রয়িং হবার দিন উপস্থিত হল। সন্ধ্যার পর কলিকাতায় টার্ফ ক্লাবের লটারির দ্বারা টিকিট ক্রেতাদের ভাগ্য নির্ণীত হবে। সর্বশ্রেষ্ঠ চার-পাঁচটা ঘোড়া যে ভাগ্যবানদের নামে উঠবে, আর্জেণ্ট টেলিগ্রামের দ্বারা তাদের আজই সুসংবাদ দেওয়া হবে।

মেঘ সঞ্চয়ের কাল গত হয়েছে, আজ বৃষ্টিপাতের দিন। সকাল থেকে সকলের মনের আকাশ প্রত্যাশার বেগে চকিত হয়ে উঠেছে। এতদিন যে-জিনিস কল্পনা-জল্পনা হাস্য-পরিহাসের বস্তু ছিল, আজ তা সকলের মনে উদ্বেগ জাগিয়ে তুলেছে। এতদিনকার ফুল আজ ফলে পরিণত হবে। সে ফল মধুর রস দান করবে, অথবা তিক্ত—তাই হচ্ছে আজকের প্রশ্ন।

সন্ধ্যার পর মেজদাদা চা-খাবার খেয়ে শয্যায় গিয়ে বসে আবার আমাদের অল্প-অল্প স্বপ্ন দেখাতে আরম্ভ করলেন; বললেন, বিশ্বাস হারিয়ো না তোমরা। এবার নির্ঘাৎ ঘোড়া উঠবে আমাদের টিকিটে। আটটার সময়ে ড্রয়িং শেষ হবে, নটার সময়ে টেলিগ্রাম করবে, মিনিট কুড়িকের মধ্যে সে টেলিগ্রাম সিমলায় এসে পেঁৗছবে—আমাদের বাড়িতে এসে পেঁৗছতে বড়জোর আর মিনিট দশেক। অর্থাৎ সাড়ে নটা আন্দাজ আমরা টেলিগ্রাম পাচ্ছি।'

রাত্রি সওয়া নয়টার সময়ে আমরা আহারে বসলাম। মেজদাদা বললেন, 'ঘোড়া যদি উঠে থাকে আমাদের টিকিটে, তাহলে এতক্ষণে সিমলা টেলিগ্রাম অফিসে আমাদের টেলিগ্রাম নিশ্চয় পেঁৗচেছে।'

অফিস থেকে আসার পর মেজদাদা ক্ষণকাল একটু চুপচাপ হয়ে ছিলেন; —প্রত্যাশার উদ্বেগ হয়ত তাঁকে একটু থমথমিয়ে দিয়েছিল। এখন কিন্তু যে কারণেই হোক, পুনরায় স্ব-মেজাজে ফিরে এসে তাঁর আপন ভঙ্গীতে রঙ চড়িয়ে কথা কইতে আরম্ভ করেছেন। হয়ত-বা মনে মনে হতাশ হয়ে পড়ছিলেন বলেই ব্যাপারটাকে সরস ভঙ্গীর মধ্য দিয়ে হাল্কা করে দেবার মতলব।

মিনিট দুয়েক পরে মেজদাদা বললেন, 'আমাদের টেলিগ্রাম যদি এসে থাকে, পিয়ন তাহলে এতক্ষণে হন হন করে আমাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে।'

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ পুলকিত হয়ে হেসে উঠলাম বটে, কিন্তু মেজদাদার কথা বলার স্বর ও ভঙ্গীর গুণে একজন দ্রুত-আগমনশীল পিয়নের মূর্তি আমাদের চক্ষের সম্মুখে যেন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল।

পুনরায় মেজদাদা বললেন, 'হাসছো বটে, কিন্তু বকশিস পাওয়ার লোভে পিয়ন যেরকম তাড়াতাড়ি আসছে, মিনিট দুয়েকের মধ্যে আমাদের বাড়ির কড়া নড়ে উঠবে।'

এ যে মেজদাদার বিশ্বাসের কথা নয়, পরিহাসের কথা, তা বুঝতে আমাদের ভুল হচ্ছিল না। সহাস্যমুখে মেজবউদিদি বললেন, 'তোমার পিয়নের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।'

দু মিনিট ত হয়ে গেলই, সাড়ে নটাও বেজে গেল। ঈষৎ নৈরাশ্য সহকারে মেজদাদা বললেন, 'তাই ত!' এবারও অন্যবারের মতো ভেস্তে গেল নাকি?'

একথাও বলা, আর সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজায় কড়া নড়ে ওঠা, খটাখট্ খটাখট্!

তড়িৎস্পৃষ্টের মতো আমরা সকলে এক-যোগে চকিত হয়ে উঠলাম! কি ব্যাপার?

মুহূর্ত পরেই পুনরায় খটাখট্ খটাখট্ শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈস্বরে হাঁক, 'তার হ্যায় বাবু!'

একটা অস্ফুট কিন্তু সমবেত উল্লাস রব ধ্বনিত হয়ে উঠল। মেজবউদিদি বললেন, 'ঐ! এসে গেছে তাহলে!'

একটা সুদৃঢ় প্রতীতি সকলের মনে জাগ্রত হয়ে দেখা দিলে।

কড়া নড়ার শব্দ শুনেই ভৃত্য ছুটে গিয়েছিল, অবিলম্বে একটা টেলিগ্রামের খাম এনে মেজদাদার হাতে দিলে। সেই পীতাভ খামের নয়নাভিরাম মূর্তি দেখে সকলের চক্ষু জুড়িয়ে গেল। ইত্যবসরে মেজদাদা গেলাসের জলে হাত ধুয়ে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছেন, ভৃত্যের হাত থেকে তাড়াতাড়ি খামখানা নিয়ে কম্পিত হস্তে ছিঁড়তে আরম্ভ করলেন।

এদিকে আমি সঙ্কোচে এবং ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছি! সর্বনাশ! শেষ পর্যন্ত তাই যদি হয়, তাহলে ত মুখ দেখাবার যো থাকবে না! মনে মনে কাতরকণ্ঠে বললাম, হে বাবা বিশ্বনাথ! রাগ কোরো না বাবা! তোমার পুজো হাজার-এক টাকাতেই দোবো। ও দুর্ঘটনা যেন ঘটিয়ো না!

খাম থেকে কোন রকমে টেলিগ্রামটা খুলে বার করে তার ওপর দৃষ্টিপাত মাত্র মেজদাদার উত্তেজনাদীপ্ত মুখ সীসার মতো পাংশু হয়ে গেল! আর্তনেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, 'তুমি পাশ হয়েছ!'

লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল! এরকম প্রত্যাশার মুখে আইন পাশ করার মতো এত বড় অপকর্ম আমার পূর্বে বোধ হয় কেউ কখনো করেন নি!

বেদনাহত কণ্ঠে মেজবউদিদি বললেন, 'লটারির টেলিগ্রাম নয়?'

মুখে উত্তর না দিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে মেজদাদা জানালেন, লটারির টেলিগ্রাম নয়। তখন তিনি টেলিগ্রামের রসিদের শিলপে সই করছেন।

দুঃখের স্তূপে পাশের আনন্দ চাপা পড়ে গেছে। আমাকে অভিনন্দিত করবার জন্যে সকলেরই মন তখন বহু পশ্চাতে পড়ে।

আর্তস্মিত মুখে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে মেজবউদিদি বললেন, 'যা! সব ফুস্ হয়ে গেল!'

ফুস্ বলে ফুস্! এত বৃহৎ ক্ষতিকর ফুস্ আমাদের সংসারে আর কোনদিন ঘটেনি।

আঘাত পাবার তখনো কিছু বাকি ছিল। রসিদের শিলপ ফিরিয়ে দিয়ে এসে চাকর বললে, 'খুস্-খবরের জন্যে পিয়ন বকশিস চাচ্ছে।'

মনে মনে বললাম, হে মা ধরিত্রী, তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি! এযেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে!

এক টাকা বকশিস দেবার আদেশ দিয়ে মেজদাদা আমাদের সকলের মনের ঐকান্তিক কথাটি ব্যক্ত করলেন, 'এর চেয়ে লটারির টেলিগ্রাম এসে তুমি ফেল হলে বেশি খুশি হতাম!'

তাতে আর সন্দেহ আছে! আমি বোধ হয় সকলের বেশি হতাম।

হরিষে বিষাদের অভিজ্ঞতা জীবনে আরও হয়েছে, কিন্তু এত আকস্মিক ও তীক্ষ্ন অভিজ্ঞতা আর কখনো হয়নি।

(ক্রমশ)

বেতারে "তরজা" গান

গত ২৬শে কার্তিক রাসপূর্ণিমার রাত্রিতে কলিকাতার বেতার কেন্দ্র থেকে আধ ঘণ্টার মত বাঙলা দেশের 'তরজা' গান শোনানো হয়েছিল। এই কার্যসূচীটিকে আমরা সাদরে সম্ভাষণ জানাচ্ছি এবং বেতার কর্মীদের এইরূপ সংগীতের প্রতি উৎসাহের পরিচয় পেয়ে খুশি হলাম। মনে হচ্ছে এতদিনে তাদের চিন্তা গ্রামমুখী হতে চলেছে। যারা ঐ আসরে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তারা গ্রামের কি শহরের তা আমরা জানি না। কিন্তু তাদের গানে কলিকাতার আধুনিকতার প্রভাব যে ছিল না, সেটা বেশ ধরা পড়ে। অর্থাৎ তারা এখনো এযুগের তথাকথিত আধুনিক গান ও তার গাইয়েদের অনুকরণমুক্ত আছেন, এটুকু জোর করে বলা যায়।

এছাড়া আমাদের ভাল লাগবার আর একটি কারণ হল এই যে, এতদিন প্রাচীন ও পল্লীর নামে কেবলমাত্র এক ধরণের গানই আমরা শুনতাম বেশি, তার মধ্যে এরও স্থান হল। তরজা গাইয়েরা সময় অল্প পেয়েছিলেন, কিন্তু সুরে তালে ও কথার মিলনে যে পরিবেশটি রচনা করেছিলেন, তা প্রশংসার যোগ্য। এ-গান একদিক থেকে সরল ও সহজ হলেও শ্রোতাদের প্রাণে যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে। আমাদের সংগীতপ্রিয় বন্ধুরা বহুদিন পরে বেতারে স্বাদ-বদলাবার মত কিছু পেলেন বলে খুশি হয়েছিলেন।

তরজা গান এক যুগে কলিকাতা অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত ছিল। ক্রমে স্থানচ্যুত হয়ে সে গ্রামাঞ্চলে আশ্রয় নেয়। আজও বাঙলার নানা জেলায় এই গানের কবিরা ছড়িয়ে আছে। এদের গানকে অনেকেই 'কবিগান' বলে জানেন। এর একটি প্রধান বিশেষত্ব হল এই যে, সুরে ও ছন্দে, দুই গাইয়ে পরস্পরে কথায় যুদ্ধ করে। গানের সুরে কথা কয়ে একজন কোন প্রশ্ন করলে, অপরে একই প্রথায় প্রশ্নের উত্তর দেয় এবং এইভাবে উত্তর-প্রত্যুত্তরের দ্বারা কে কাকে হারাতে পারে, সেটাই হল এই বাক্যযুদ্ধের মূল লক্ষ্য। এর গাইয়েরা আগে থেকে সুরে, ছন্দে মিলিয়ে গান তৈরি করে

আনে না বা তখনি কাগজে-কলমে লিখে তৈরি করে নেয় না। সামনা সামনি দাঁড়িয়ে যেমন শোনে, তেমনি উত্তর দেয়। প্রশ্নকালে বা উত্তরদানের সময় অনর্গল একটানা নানারূপ গল্প তারা বলে যায়। এই বাক্যযুদ্ধের সুর ও ছন্দে বৈচিত্র্য খুব কম, কিন্তু তার মধ্যে আছে এমন একটি সরল সহজ প্রাণমাতানো আবেদন, যা মন আকর্ষণ করবেই। সুরে ও ঢোলের তালের সঙ্গে মিলিয়ে অনর্গল গল্প বলে যাওয়া ও কথাকাটাকাটি করার যে দক্ষতা এঁরা রাখেন, তা সত্যি খুব আশ্চর্যজনক। এই গীতসম্প্রদায়েরা সাধারণের লেখাপড়ার দিক থেকে উচ্চাঙ্গের কোন শিক্ষায় শিক্ষিত নন। কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত, বেদ-বেদান্ত, পুরান ইত্যাদির জ্ঞান তাদের অসাধারণ। তাদের মুখে গানের সুরে ও ছন্দে এসবের নানারূপ ব্যাখ্যা শোনবার মত। এদের কাছ থেকে এখনকার তথাকথিত আধুনিক গাইয়ে বা গীত-রচয়িতারা প্রেরণা নেবার মত অনেক কিছু পেতে পারেন বলে আমরা মনে করি।

কিছুদিন থেকে রেকর্ড-সংগীতের সাহায্যে গ্রামের সুখ-দুঃখ নিয়ে রচিত কিছু আধুনিক গান আমরা শুনে এসেছি। সেগুলিও প্রায় গানে গল্প বলারই আদর্শে রচিত; অথচ তার সঙ্গে এই তরজা গাইয়েদের গল্পগান পাশাপাশি শুনলে এটুকু বেশ ধরা পড়বে যে, এই সব 'আধুনিক' গানগুলি কত দুর্বল। তরজা গানের মত স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ তাতে নেই। 'তরজা' গানে রাগ-রাগিণীর বৈচিত্র বিশেষ নেই। তাতে থাকে না যন্ত্রসংগীতের মত 'Back ground music' বা 'Musical affect' কিন্তু আছে, সহজ হলেও মনটানা ও প্রাণমাতানো সুর ও প্রাণমাতানো একটি ছন্দ।

এই কার্যসূচীর বিষয়ে বেতার পরিচালকদের কাছে আমাদের একটি নিবেদন আছে। এই ধরণের কার্যসূচীর জন্যে তাঁরা যে আধ ঘণ্টা সময়ও যে নামে প্রচার করছেন, আমরা মনে করি, তা না করে অন্যভাবে করলে ভাল হত। এই সব গানের পক্ষে আধ ঘণ্টা সময় অত্যন্ত কম বলেই মনে হল। দুজন গাইয়ের এক-একজন মাত্র চোদ্দ মিনিট করে সময় পেয়েছিলেন, তার মধ্যে আরম্ভে বন্দনা গান করে মূল বক্তব্যে আসতেই প্রায় অর্ধেক সময় কেটে গিয়েছিল। এছাড়া বেতার পত্রিকাগুলিতে এই রকম কার্যসূচীর নাম স্পষ্ট করে উল্লেখ থাকা দরকার। 'Composit Program' বা 'মিশ্র অনুষ্ঠান' নামে কার্যসূচীর তালিকায় এ ধরণের গান হলে অনেকেই তা জানতে পারে না। কারণ এই মিশ্র অনুষ্ঠানে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে নানা রকমের গান-বাজনা থাকে। স্পষ্ট নাম দিয়ে বেতারে প্রকাশ করলে গাইয়েদেরও সম্মানিত করা হয়, আর সংগীতের প্রতি যারা আগ্রহান্বিত, তারাও ঠিকমত জানতে পারার দরুণ আগ্রহ নিয়ে তা শুনতেন। এইভাবে আরো বেশি সময় দিয়ে দেশে প্রচলিত যাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা, কথকথা, পালা-কীর্তন ইত্যাদি বড় বড় গান ও গীতাভিনয়ের আসর যথাযথ প্রথায় দেশবাসীর কাছে মাঝে মাঝে পরিবেশন করলে দেশবাসীর যথেষ্ট উপকার হতো। বেতার পরিচালকদের আমরা এটুকু আশ্বাস দিতে পারি যে, এই ধরণের কার্যসূচী আগ্রহভরে শোনবার মত লোক তা শিক্ষিত বা অশিক্ষিতই হোন দেশে যথেষ্ট আছে। আজও কলকাতার মত শহরে বালীগঞ্জের মত শিক্ষিত ধনী বাঙালী পাড়ায় দিনের পর দিন এক মাস ধরে রামায়ণ গান কথকেরা গেয়ে শোনান। পালা কীর্তন গায় কীর্তনীয়ারা, সুরে ও কথায় মিলে ভাগবত ইত্যাদি পাঠ হয়। বাঙলার মফঃস্বল শহরে 'যাত্রা' বা 'কৃষ্ণযাত্রা' প্রভৃতির আদর যথেষ্ট। সুতরাং বেতারের দ্বারা এই সব গীতপদ্ধতির ভাল প্রচার হলে বাঙলা দেশের বেশির ভাগ লোকেই বেতারকে সমর্থন করবে। এছাড়া এও জোর করে বলতে পারি যে, দেশে এমন বহু বাঙালী আছেন, যাঁরা কোনদিন এসব শোনবার সুযোগ পাননি এবং বেতারের সাহায্য ছাড়া জীবনে কখনো শোনবার সুযোগও তাঁদের হবে না।

নির্বাসিতের আত্মকথা

স্থাপত্যের বেলা ব্যাপারটা চট করে বোঝা যায়, কিন্তু সাহিত্যে অতটা সোজা নয়। তাজমহলকে পাঁচগুণ বড় করে দিলে তার লালিত্য সম্পূর্ণ লোপ পেত, যদিও ঐ বিরাট বস্তু তখন আমাদের মনকে বিস্ময় বিমূঢ় করে দিত, আর আমরা স্তম্ভিত হয়ে বলতুম, 'এ কী এলাহি ব্যাপার!' ফলে শাহজাহান যে প্রিয়ার বিরহে কাতর হয়ে ইমারতখানা তৈরী করেছিলেন, সেকথা বেবাক ভুলে যেতুম।

আর তাজমহলকে ছোট করে দিলে কি হয়, তা তো নিত্যি নিত্যি পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। শ্বেতপাথরের ক্ষুদে তাজমহল মেলা লোক ড্রইং-রুমে সাজিয়ে রাখেন। পাঁচজন তার দিকে ভালো করে না তাকিয়েই গৃহস্বামীকে জিজ্ঞেস করেন তিনি আগ্রায় গিয়েছিলেন কবে? ভদ্রলোকের আগ্রা গমন সফল হ'ল—ক্ষুদে তাজ যে কোণে, সেই কোণেই পড়ে রইল।

সাহিত্যের বেলাও অনেক সময় প্রশ্ন জাগে, এ উপন্যাসখানা যেন বড্ড ফেনিয়ে লেখা হয়েছে কিংবা অন্য আরকখানা এতটা উর্ধ্বশ্বাসে না লিখে আরো ধীরে-মন্থরে লিখলে ঠিক আয়তনে গিয়ে দাঁড়াত। 'যোগাযোগ' পড়ে মনে হয় না, এ বইখানাকে বড় কিম্বা ছোট করা যেত না, 'গোরার' বেলা মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে, হয়ত এ অনবদ্য পুস্তকখানা আরো ছোট করলে তার মূল্য বাড়ত।

আমার মনে হয় 'আত্মকথা' সংক্ষেপে লেখা বলে সেটি আমাদের মনে যে গভীর ছাপ রেখে গিয়েছে, দীর্ঘতর হলে হয়ত সে রকম অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারত না। আবার মাঝে মাঝে মনে হয়, এ বইখানা লিরিক না করে এপিক করলেই হয়ত ভালো হ'ত। এ বই যদি 'ওয়ার অ্যান্ড পীসের' মত বিরাট ক্যানভাস নিয়ে চিত্রিত করা হ'ত, তবে বুঝি তার উপযোগী মূল্য দেওয়া হ'ত। কিন্তু এ বিষয়ে কারো মনে দ্বিধা উপস্থিত হবে না যে, লিরিক হিসেবে এ বই এর চেয়ে কি বড়, কি ছোট কিছুই করা যেত না।

বই আরম্ভ করতেই চোখে পড়ে প্রথম বিপ্লবী যুগের এই তরুণদের হৃদয়, কী অদ্ভুত সাহস, আর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কী অবিশ্বাস্য তাচ্ছিল্যে ভরা ছিল। পরবর্তী যুগে ইংরেজের জেলখানার স্বরূপ আমরা চিনেছিলুম এবং শেষের দিকে জেল-ভীতি সাধারণের মন থেকে তো একরকম প্রায় উঠেই গিয়েছিল, কিন্তু যে যুগে এঁরা হাসিমুখে কারাবরণ করেছিলেন, সে যুগের যুবকদের মেরুদণ্ড কতখানি দৃঢ় ছিল, আজ তো আমরা তার কল্পনাই করতে পারিনে। উল্লাস, কানাই মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শুনে হেসেছিল—যেন কাঁধ থেকে বেঁচে-থাকার একটা মস্ত বোঝা নেমে গেল। আজ যখন বাঙলাদেশের দিকে তাকাই, তখন বারম্বার শিরে করাঘাত করে বলতে ইচ্ছে করে, "হে ভগবান, সে যুগে তুমি অকৃপণ হস্তে বাঙলা দেশকে এত দিয়েছিলে বলেই কি আজ তোমার ভাণ্ডার সম্পূর্ণ রিক্ত হয়ে গিয়েছে?

অথচ রুদ্র মহাকাল এই তরুণদের হৃদয় এবং জীবনে যে তাণ্ডব নৃত্য করে গেলেন, যার প্রতি পদক্ষেপে বঙ্গদেশের লক্ষ লক্ষ কুটির আন্দোলিত হল, বাঙালীর ইষ্টদেবী কালী করালী যখন বারম্বার হুঙ্কার দিয়ে বললেন, "মৈঁ ভূখা-হূঁ" তখন যে এই বঙ্গ-সন্তানগণ প্রতিবারে গম্ভীরতর হুঙ্কার দিয়ে বলল,—

"কালী তুই করালরূপিণী
আয় মাগো আয় মোর কাছে,"

যূপকাষ্ঠে স্বেচ্ছায় স্কন্ধ দিয়ে বলল, 'হানো, তোমার খড়্গ হানো, তখনকার সেই বিচিত্র ছবি উপেন্দ্রনাথ কী দম্ভহীন অনাড়ম্বর অনাসক্তিতে চিত্রিত করে গেলেন।

দক্ষিণ ভারতের মথুরা, মদুরায় এক তামিল ব্রাহ্মণের বাড়িতে কয়েক মাস বাস করার সৌভাগ্য আমার একবার হয়েছিল। গৃহকর্ত্রী প্রতি প্রত্যূষে প্রহরাধিককাল পূর্বমুখী হয়ে রুদ্র-বীণা বাজাতেন। একদিন জিজ্ঞাসা করলুম, "আজ আপনি কি বাজালেন বলুন তো। আমার মনের সব দুশ্চিন্তা যেন লোপ পেল।" বললেন, "এর নাম 'শঙ্করবরণম'—সন্ন্যাসী রাগও একে বলা হয় কারণ এ রাগে আদি, বীর, করুণ কোনোপ্রকারের রস নেই বলে একে শান্তরসও বলা হয়। কিন্তু শান্ত অবস্থাকে তো রসাবস্থা বলা চলে না, তাই এর নাম সন্ন্যাস রাগ।"

উপেন্দ্রনাথের মূল রাগ সন্ন্যাস রাগ।

অথচ এই পুস্তিকা হাস্যরসে সমোজ্জ্বল।

তাহলে তো পরস্পরবিরোধী কথা বলা হল। কিন্তু তা নয়। উপেন্দ্রনাথ তাঁর সহকর্মীদের জীবন তথা বাঙলাদেশের পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা নিরীক্ষণ করেছেন অনাত্মীয় বৈরাগ্যে—তাই তার মূল রাগ সন্ন্যাস—এবং তার প্রকাশ দিয়েছেন হাস্যরসের মাধ্যমে, দুঃখ-দুর্দৈবকে নিদারুণ তাচ্ছিল্যের ব্যঙ্গ দিয়ে। এ বড় কঠিন কর্ম—কঠোর সাধক এবং বিধিদত্ত সাহিত্য-রস একাধারে না থাকলে এ ভানুমতী অসম্ভব।

আমার প্রিয় চরিত্র ডন কুইক্‌সট্। উপেন্দ্রনাথ বিপরীত ডন্।

ডন এবং উপেন্দ্রনাথের সাহস অসীম; দুজনেই পরের বিপদে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে শাণিত তরবারি নিয়ে আক্রমণ করেন, অন্যায় অত্যাচারের সামনে দুজনই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড লোহিতরঙ্গে রঞ্জিত দেখেন।

পার্থক্য শুধু এইটুকু, উইন্ডমিলকে ডন মনে করেন দৈত্য, দাসীকে মনে করেন রাজনন্দিনী, ভেড়ারপালকে মনে করেন যাদুকরের মন্ত্র-সম্মোহিত পরীর দল।

আর উপেন্দ্রনাথ দেখেন বিপরীত। কারাগারকে ভাবেন রঙ্গালয়, কারারক্ষককে মনে করেন সার্কাসের সং, পুলিস বাহিনীকে মনে করেন ভেড়ার পাল।

এই নব ডন কুইক্‌সট্‌কে বার বার নমস্কার।

ট্রামে-বাসে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার মৎস্য ধরিবার জন্য জাপান হইতে ধীবর আমদানীর ব্যবস্থা করিতেছেন। শ্যামলাল বলিল—

"খেলনা তৈরিতে জাপানীদের জুড়ি নেই, দেখা যাক্ মাছের খেলনাটা কী রকম দাঁড়ায়!"

* * * *

আসন্ন নির্বাচনে দুইশত আটত্রিশটি আসনের জন্য তিনহাজার প্রার্থী আবেদনপত্র পেশ করিয়াছেন।—"তাঁরা নির্বাচনকে ট্রাম-বাস মনে করেন নি তো?"—জিজ্ঞাসা করেন খুড়ো।

* * * *

শ্রীযুক্ত নেহরু মন্ত্রীদের সরকারী নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে বারণ করিয়াছেন। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"বক্তৃতা দিতে দিলেও ক্ষতি কিছু হতো নাঃ কেননা রাজকুলেকে অবিশ্বাস করার নীতি সম্বন্ধে জনসাধারণ আবার বেশ সচেতন হয়ে উঠেছেন।"

* * * *

প্রসঙ্গত এক সংবাদে প্রকাশ সম্প্রতি ভোটদানের মহড়া হইয়া গিয়াছে। বিশু খুড়োই আবার বলেন—"তার চেয়ে হবু জন-প্রতিনিধিদের মহড়া হলেই ভালো হতো, শুনছি অনভ্যাসের ফোঁটা অনেকের কপালেই চড়চড় করছে।"
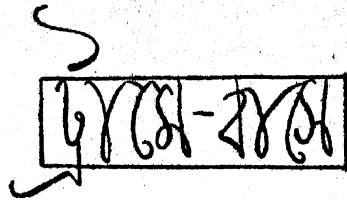
টেলিফোন দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ আগামী ডিসেম্বর হইতে "West" এক্সচেঞ্জ উঠাইয়া দেওয়া হইবে।—"No reply" বা "Engaged" এক্সচেঞ্জ কবে উঠে যাবে তা এখনো জানা যায় নি"—মন্তব্য খুড়োর।

* * * *

বরোদাতে শুনিলাম একটি Grass Bank স্থাপন করা হইয়াছে। "খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে তা হলে আমাদের আর

ভাবনা নেই"—বলেন আমাদের এক সহযাত্রী।

* * * *

নির্বাচন ব্যাপারে সফর করিবার জন্য পাক্ সরকার সুরাবর্দি সাহেবকে প্রথম সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশ করিতে দেন নাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন দিলেন, তখন তা সময় সঙ্কীর্ণতার জন্য কোন কাজেই লাগে নাই। এই ব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের এক সহযোগী মন্তব্য করিয়াছেন—এ যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা। শ্যাম বলিল—"সহযোগীর বর্ণনা ঠিক্ হয় নি, শুনছি ছিটা দেওয়ার মতো নুনেরও এখন পাকিস্থানে অভাব।"

পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল শিক্ষিতদের গ্রামাঞ্চলগুলি "আলোকিত" করার নির্দেশ দিয়াছেন।—"আগামী দেওয়ালিটা শহর ছেড়ে গ্রামেই যদি জমে উঠে তাহলে আমরা বেঁচে যাই"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * * *

পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রী ডাঃ আমেদ নাকি বলিয়াছেন যে, উদ্বাস্তুরা কোন রকম সাজসরঞ্জামের অভাব সত্ত্বেও নূতন করিয়া ঘরবাড়ি তৈয়ার করিতে পারে, তাদের এই আদর্শ সবার পক্ষেই অনুকরণীয়।—"সবাই শুনছি এই Rope trick আয়ত্ত করার জন্যে উদ্বাস্তু কলোনীতে ভীড় করছেন"—বলেন বিশু খুড়ো।

* * * *

পাকিস্থান সেক্রেটেরিয়েটের কর্মীরা নাকি নিজেদের ফটোগ্রাফ তুলিতে দিতে আপত্তি জানাইয়াছেন। শ্যাম বলে—"এ তাঁদের অহেতুক আপত্তি, Camera cannot lie কথাটা চেহারা সম্বন্ধেই খাটে, নীতি সম্বন্ধে নয়!"

* * * *

Dame Peace shy of all courtships—বলিয়াছেন জনাব জাফরুল্লা

খাঁ। বিশু খুড়ো বলিলেন—"শান্তি দেবী খুব সম্ভব বোরকা পরতে নারাজ!!"

রাসের নবদ্বীপ

গৌরকিশোর ঘোষ

শুধু এক শ্রীরাধিকা নন, তাবৎ গোপাঙ্গনাগণের মনোরঞ্জনের জন্যই প্রয়োজন হয়েছিল রাস উৎসবের। বৃন্দাবনের কানু প্রেমের যে এজলাসের পোত্তাপত্তন করেছিলেন, যুগে যুগে ভক্তগণের দৌলতে সে রাসোৎসবের রাশ অদ্যাপি ঢিলে হয়নি।

শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে বিদিত। আর শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্যের খাস-তালুক। কিন্তু আশ্চর্যের কথা নবদ্বীপের যে রাস উৎসব তার সম্পূর্ণটাই শক্তির উৎসব। বৈষ্ণবীভাবের টিকিও দৃষ্ট হয় না।

জগাইমাধাই ছিলেন শাক্তসমাজের মুখ-পাত্র। কলসীর কানার আঘাতে প্রভু নিত্যানন্দের রক্তপাত ঘটিয়ে যে বন্যা তারা রোধ করতে চেয়েছিলেন, একদিন তারই স্রোতে এঁরা ভেসে গিয়েছিলেন। বৈষ্ণবীয় ভাবের পাথারে ডুবুডুবু শাক্ত সংস্কৃতি আপাত পশ্চাদপসরণ করে কালের শেলেটে ঢ্যারা কাটতে লাগল। নবদ্বীপে আর শক্তি অভ্যুত্থান হয়নি। তেমনি বৈষ্ণবী-ভাবও নবদ্বীপের মজ্জায় ঢুকতে পারেনি। তাই নবদ্বীপের গেঞ্জিতে শাক্ত-সেন্টই মাখানো; তবে উড়নীতে হরের্নামৈবকেবলম্। গঙ্গার ওপার থেকে যেমন সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা-মৃদঙ্গ বাদ্য শুনে নবদ্বীপের গোটাটাকেই ঠাকুরবাড়ী বলে ভ্রম হয়, তেমনি বিদেশ থেকেও। আসলে আছে নবদ্বীপচন্দ্রের নামটাই, ধামটি বেহাত বরাবরই।

তাই নবদ্বীপ শাক্তভিতেই পোক্ত। আর রাসপূর্ণিমা তারই 'এনিভার্সারী সেলিব্রেসন।'

সম্বচ্ছরে নবদ্বীপও যা, অন্যান্য পাঁচটা মফস্বল শহরও তাই। নির্জীব জীবন-যাত্রা। ক্ষীণ জীবন আর হীন জীবিকা দেখে বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই এই অতি সাধারণ দেহগুলি কোন একদিন আবার চঞ্চল হয়ে উঠতে পারে। উদ্দামতায়, উন্মাদনায়, চাঞ্চল্যে টগবগ, রঙ্গে রসে ডগমগ যে হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। এই একটি দিন এরা দাসের প্রবৃত্তি ঝেড়ে ফেলে প্রবৃত্তির দাস বনে।

শীতের প্রথম আভাষ, চাঁদের পূর্ণ আলো, শানাই-এর চটুল সুর, ঢোলকের উন্মাদনাময় সংগত, সব মিলে একটা নতুন মানে এসে যায় জীবনে, আর সে শুধু এই একটি দিনের জন্যই। দ্বাপরের বৃন্দাবনের সেই রাতের সঙ্গে হেথাকার একটি বড় মিল চোখে পড়ে, বাঁশী শুনে ঘর ছাড়বার আকুলতা। বদল হয়েছে অনেক কিছুর। মুরলীর বদলে শানাই, যমুনা-তটের বদলে খোয়া বাঁধানো রাস্তা আর গোপবালাদের বদলে গোঁফওয়ালারা। কিন্তু আকুলতাটুকু ঠিক আছে। তেমনি আদিম, তেমনি অবিকৃত। এক বংশীধারীর পরিবর্তে এখান শত শানাইদার। "রাধা রাধা রাধা"র বদলে "বলি মাগো সুরধনী, কাতরে তোমারে ভণি, কেন মাগো বহাও নাকো সুরা।" খেমটা আর পিলুবারোয়ার সস্তা সুর সংগতের সঙ্গে কোমর বেঁকিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে নাচ। চোদ্দ থেকে চল্লিশ, চব্বিশ থেকে চৌষট্টি বছরের ভেদ নিমেষে লুপ্ত, বাছবিচারের বাধো বাধো ভাবটুকু ভাঁজ করে ততক্ষণে পকেটে চলে গেছে। উচ্চ নীচ, ভদ্রজন আর জনগণে এমন মাইডিয়ারী মিলাজুলা আর কোথায় পাওয়া যাবে? এই রাসপূর্ণিমার রাতটুকু ছাড়া

সপ্তমী

নবদ্বীপেই কি আর কোনো দিন দেখা মিলবে?

এর সবটাই যে শোভন, সুন্দর, শালীনতাদুরস্ত তা নয়, তবু জীবন্ত। রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চেহারা বদলাতে থাকে। বেলেল্লাপনা বাড়তে থাকে, খিস্তিখেউড় শিকল খুলে বেরিয়ে আসে। বাকী রাতটুকু এদেরই রাজত্ব। রেফেরের ওভারকরা রঙ ধরে ভদ্রজ্ঞানের সামনে নোটিশখানা ঝুলতে থাকে 'আউট অব বাউণ্ড'। সুন্দর তখন মদের বোতলে, শিব উলঙ্গিনীর পদতলে। সত্য শুধু জেগে এই ঘোরলাগা মানুষদের অন্তরে। জগৎকে জানিয়ে দাও উদ্দাম হয়ে বাঁচা যায়। বাঁধন ছিড়ে নাচা যায়।

একটা দুটো নয়, প্রায় শ'খানেক, যত রাস্তায় যতগুলো মোড়, ততগুলো প্রতিমা। তার মধ্যে পার্থসারথি, হরিহর আর কৃষ্ণকালী ছাড়া সব "ক"ই "কালী" হয়েছেন। প্রধান যে কালী, তিনি ভদ্রকালী। তিনি ভদ্র তাই বোধহয় সারা অঙ্গে কালোর লেশমাত্র নেই। দিব্যি ফর্সা, টকটক কচ্ছে রং, বিরাট উঁচু (এখন হাত আঠারো। আগে হাত চব্বিশেক হতেন। ইলেকট্রিক হবার পর থেকে তারে ঠেকে যাবার আশঙ্কায় হাতচারেক কমেছেন) দশাসই চেহারা। দিব্যি কাঠামোর উপরে জাঁকিয়ে বসেছেন। নীচে এক বিরাট হনুমান আসনশুদ্ধ গোটা প্রতিমাই মাথায় করে বয়ে বেড়াচ্ছেন। দুই কাঁধে ফাউ হিসেবে রামলক্ষ্মণ দুভাইকে চাপিয়ে রেখেছেন। দেবী ভদ্রকালী সিংহবাহিনী। বিরাট বর্ষা অসুরের বুকে বসিয়ে মিটিমিটি হাসছেন। যেন সুড়সুড়ি দিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, কিরে, আর দুষ্টুমী করবি?

নবদ্বীপের রাস উৎসবে কেন জানিনে দেবীর এই রূপটিরই প্রাধান্য বেশী। এই খাঁটি ভদ্রকালীই অনেকগুলো আছে। আর রকমফের ধরলে প্রায় দশ আনাই তো এই মূর্তি। ভদ্রকালীর মধ্যে সেরা হচ্ছেন চারিচারাপাড়ার। প্রোসেশনের দিন পথে বেরুলে এঁকে দেখেই চোখ ট্যারা হয়ে যাবার উপক্রম। খুব পোক্ত চাকার উপর বসিয়ে ধীরে ধীরে তোয়াজ করে করে এঁকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। সারাক্ষণ সামাল সামাল। রাজপথের ইজ্জৎ সেদিন একদম ঢিলে ঢলঢলে হয়ে যায়। চওড়া রাস্তার এপাশ ওপাশ জুড়ে শ্রীমতী ভদ্রকালী আহ্লাদী মেয়ের মতো গজেন্দ্র-গামিনী নন এবং মাঝে মাঝে বিগড়ে গিয়ে ভক্ত অভক্ত সবাইকে বিলক্ষণ বিপদে ফেলেন।

কল্পনা করুন, ভাসানের দিন প্রত্যেকটি প্রতিমা সারবন্দী হয়ে পাড়া ঘুরতে বেরিয়েছেন। রাস্তায় যতগুলো পাথরকুচি প্রায় ততগুলোই লোক। তার মধ্যে রাস্তা জুড়ে বের হলেন ভদ্রকালী। ধীরে ধীরে এক মিনিটের পথ এক ঘণ্টায় অতিবাহিত করতে করতে চলেছেন। হঠাৎ হৈ হৈ। কী ব্যাপার? ভদ্রকালীর ধুড়ো ভেঙেছে। ব্যস্, সব কাজের আঁটি পোঁতা হয়ে গেল। আবার ধুড়ো বদলাও, চাকা লাগাও, ঘণ্টা দেড়েকের মতো একেবারে নিশ্চিন্ত।

ভদ্রকালী ছাড়া এই ফ্যামিলীর মধ্যে গণ্যমান্য হচ্ছেন আমড়াতলার মহিষমর্দিনী, জোড়াবাঘ গৌরাঙ্গিনী, বিন্ধ্যবাসিনী প্রভৃতি।

এর পরেই আসেন শ্যামা পরিবার। একে-বারে ট্র্যাডিশন্যাল কালী। করালবদনী, লোলজিহ্বা, বিকটদর্শনা, উলঙ্গিনী, আলু-থালু কেশপাশ, পদতলে শয়ান শান্ত শিব। সবচেয়ে বড় তেঘরিপাড়ার শ্যামা। আকাশে উঠতে পারে না, তাই উন্মার্গগামী হবার শখ মেটালে কারিগর এই শ্যামা মূর্তি গড়ে। ভদ্রকালীর মাথা ছাড়িয়ে ভেংচি কাটবার চেষ্টা করতে গিয়ে আশপাশের কথা আর চিন্তা করবার ফুরসৎ হয়নি।

নৃত্যকালী

মহিষমর্দিনী

অন্নপূর্ণা
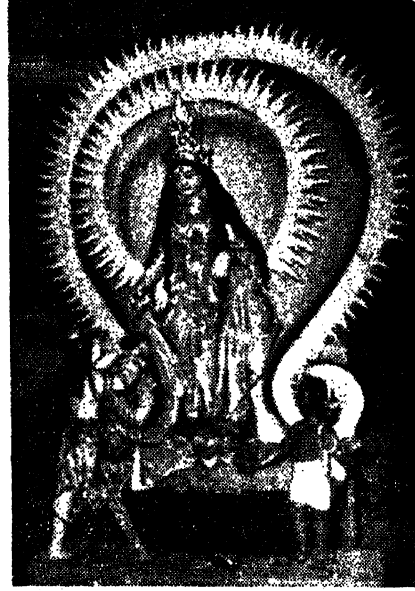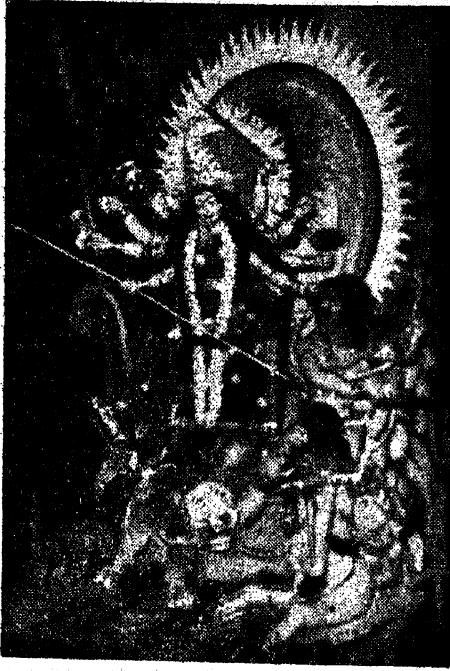
তাই ভদ্রমহিলা শুধু মাথাতেই বেড়ে গেছেন। শ্যামারও আবার বর্ণফের, নাম-ফের আছে। নৃত্যকালীর রঙের সঙ্গে এড়ো-কালীর বর্ণভেদ নজরে পড়ে। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণের পাশাপাশি ধূসর বর্ণের, শ্যামবর্ণের কালীও উঁকিঝুঁকি মারেন।

এঁদের মধ্যেই আবার বিশিষ্টা হচ্ছেন শবশিবা। শবের উপরে শায়িত শিব। শিবের উপরে উপবিষ্টা শ্যামার গঠন-বৈশিষ্ট্য সহজেই নজরকে টানে। চণ্ডীতে বর্ণিত দুর্গার যত রূপের উল্লেখ আছে, তার মধ্যে শবশিবার কথা আছে বলে স্মরণ হচ্ছে না।

কৃষ্ণকালীর কথা আগেই উল্লেখ করেছি। গণেশজননী, কাত্যায়নী, অন্নপূর্ণা, আর কমলেকামিনী দেবীরাও একই পরিবারের।

এদের সকলের সঙ্গে স্পষ্ট তফাৎ চোখে পড়ে গঙ্গার। মকর বাহিনী গঙ্গা, একপাশে শিব, অন্যদিকে নারায়ণ। সম্মুখে শাঁখে-ফুঁ ভগীরথ।

পার্থসারথি অবশ্য নির্ভেজাল কৃষ্ণপুজো। হরিহরের অর্ধেক শ্রীকৃষ্ণ অর্ধেক শিব।

পার্থসারথি
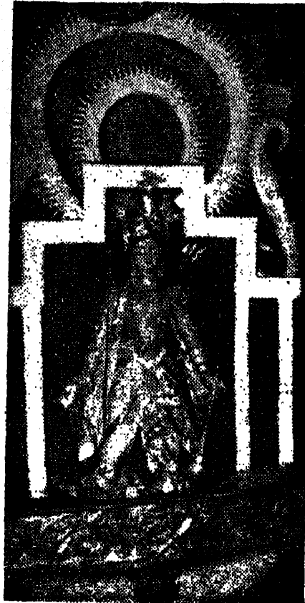
রাসপূর্ণিমার দিনের বেলাতেই পুজো সমাপ্ত হয়ে যায়। সন্ধ্যার সময় থেকেই rush শুরু হয়। রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রাশ আলগা উন্দামতা আসর বিছাতে শুরু করে। ঢোল শানাইএর সঙ্গে গান শুরু হতে থাকে। "গোলাপ, তোর বুকে যে কাঁটা আছে, তাতো আমি জানি, তা বলে কি তোমায় ছোঁব না।" কিম্বা "তোমায় তো দিয়েছি সখি, দিয়েছি তো আমার সবি, তবু কেন প্রাণে মার ঘুরিয়ে তোমার নাকের ছবি।" সদ্য রং ধরে ওঠা ভদ্র মুখে কিছু উদ্ভট গানও শোনা যায়, "একটা এঁড়ে গরু দুধ দেয় দশ সের, এক টানে কি দুই টানে হায়।" শানাইদার বাজিয়ে চলে। রঙের উপর রঙ চড়ে। মুখের বাঁধন ঢিলে হয়ে আসে। হৈচৈ বাজনার কটা দল এগিয়ে আসে। হা রা রা রা রা। "এই গিজ্জিঘিনাতা বাজাও।" ডগর কাড়া ঢোল ঢাক উন্দাম বেজে ওঠে। লাফঝাঁপ শুরু হয় প্রচণ্ডভাবে। "এই চুপ। গান ধর, গান ধর।" টলতে টলতে একজন এগিয়ে আসে। ঢোলের উপর হাত রেখে দাঁড়ায়, বাকীরা মুকিয়ে থাকে।

মেলা

"এই শানাই বাজা—ও। ঠিকসে। মাথা খাও ঠাকুরজামাই কাল সকালে বাড়ি যেও। আজকে যদি থাক রেতে—" অমনি হৈ হৈ করে বাধা দেয় কজনে। এই খবরদার। নো খিস্তি। ভাল গান গাও। আরে যা শালা ভাল গান শুনবি তো কেত্তন শুনগে যা। দশটা পার হয়ে গেছে। বাজাও গিজ্জিঘিনাতা। হা রা রা রা রা রা। আচ্ছা আচ্ছা ভাল গান হোক। চুপ চুপ। এই শানাই ধর। "আহা পা টলে টলে খানায় পড়ে সে ভারী মজা। সে ত ভারী মজা সখি। 'জলদ বাজাও'। সে তো ভারী মজা।" হায় হায়। কোমর বেঁকিয়ে নাচ শুরু হয়। ছেলে বুড়ো যুবা সবার চোখেই লাগে নাচের ঘোর। ওদিকে ভোর হতে আর কত বাকী?

যারা একটু হুঁশিয়ার, একটু সন্ধানী, একটু রসিক তারা একটু খোঁজে থাক। সুযোগ মতো ফরমাস কর। 'কত্তা এবার একটা ইমন'। কান ভরে শানাই শুনে নাও। ঢোল বাজাবার কসরৎ দেখ। 'একখানা দরবারী। এই নাও বিড়ি নাও।' 'একখানা কেত্তন।' 'একখানা মালকোষ'। তারপর চোখের সামনে থেকে সব গলতে শুরু করবে। এই শহর, এই মানুষ। সুরের কোটাল নামবে। ধীরে ধীরে ডুবে যাবে। সুরের পাথারে। 'আঃ কি মাইরী রাবিস, এই বুড়ো লারে লাপ্পা বাজাও।' হ্যা হ্যা লারে লাপ্পা হোক। লারে লাপ্পা লারে লাপ্পা। হায় হায়। শুরু হল নাচন। কেটে পড় ওখান থেকে। ধর আরেকজনকে দাও সিগারেট। 'কি পুরিয়া বাজাব? ভীম পলাশ?'

রাত কাবার। ভাসান।

দুপুরের পর থেকে আয়োজন। তারপর যাত্রা। হৈ চৈ লারে লাপ্পা নাচ ভীড় মারামারি সবই চরমে। রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমা বিসর্জন। সব উত্তেজনার শান্তি।

পরদিন থেকে আবার ভদ্র, নিরীহ, নির্জীব জীবন। প্রবৃত্তির দাস আর কেউ নয়। সবায়েরই এখন দাসের প্রবৃত্তি নিয়ে ঘরকন্না।

রঙ্গজগৎ

সুনন্দার বিয়ে (এভারশাইন ফিল্মস—ইস্টার্ণ টকিজ)—কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সুধীর সরকার; আলোকচিত্র : দিব্যেন্দু ঘোষ; শব্দযোজনা : পরিতোষ বসু; সুরযোজনা : সুধীরলাল; শিল্পনির্দেশ : মদন গুপ্ত; ভূমিকায় : সমর রায়, বিকাশ রায়, ছবি বিশ্বাস, তুলসী চক্রবর্তী, প্রেমতোষ, বেচু সিংহ, নৃপতি, অনুভা গুপ্তা, ছায়া দেবী প্রভৃতি।

এস ডি পিকচার্সের পরিবেশনে ছবিখানি ২৩শে মিনার, বিজলী ও ছবিঘরে মুক্তিলাভ করেছে।

চুটিয়ে নিন্দেও করা যায় না, আবার প্রশংসা করার বিশেষ কথাও বানিয়ে বলা যায় না, এমন শ্রেণীর ছবির মধ্যে পড়ে "সুনন্দার বিয়ে"। তোলা আরম্ভ হওয়া থেকেই ছবিখানি নামের জন্যে চিত্রানুরাগীদের মনে বেশ খানিকটা কৌতূহল সঞ্চারে সক্ষম হয়েছিলো, কিন্তু দেখবার পর সেই কৌতূহল মিটেছে বলে উপচে পড়ে বলবারও কিছু পাওয়া যায় না।

বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রেম নিয়ে কিন্তু পরিণতি টানা হয়েছে যতো সব কিলিয়ে পাকানো ঘটনার মধ্য দিয়ে। নাটক দাঁড় করাবার মতো ঘাতপ্রতিঘাতকে নাট্য-ব্যাকরণের সঙ্গে কিছুটা তাল মিলিয়েই হাজিরও করা হয়েছে কিন্তু এমনি পুরাতনকে ঘেঁষে এবং নিস্তেজভাবে যে নাট্যরস তেমনভাবে জমাট বাঁধতে পারেনি কোন ক্ষেত্রেই।

সুনন্দা গ্রাম ছেড়ে শহরে এলো তার মায়ের সইয়ের বাড়িতে থেকে কলেজে পড়ার জন্যে। এক সময়ে দুই সইয়ে পরস্পরের ছেলে এবং মেয়ের বিয়ে দেবার কথা হয়েছিলো, অবশ্য সে ঘটনা সুনন্দা বা দেবনাথ জন্মাবার আগে। কলকাতায় এসে সুনন্দা দেখলে দেবনাথ অন্ধ; সে-বাড়িতে দেবনাথের বন্ধু কমলেশের সঙ্গেও সুনন্দার পরিচয় হলো। অন্ধ দেবনাথের ওপর সুনন্দার মমতা প্রেমে রূপান্তরিত হলো। এই সময়ে কমলেশের বাইরে চাকরীর খোঁজ আসে। যাবার আগে কমলেশ সুনন্দাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু সুনন্দা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে। দেবনাথ নিজেকে সুনন্দার জীবনের বোঝা হবে মনে করে সুনন্দার সামনে এমন অভিনয় করলে যার ফলে সুনন্দা গৃহত্যাগ করে। অনির্দিষ্টের পথে সুনন্দা দুষ্ট লোকের পাল্লায় পড়ে অজ্ঞান অবস্থায় লক্ষ্ণৌতে নীত হয়। সেখানে গুণ্ডাদেরই দলের একজন সুনন্দাকে দেখে তার মায়ের কথা মনে পড়ায় তাকে উদ্ধার করে। সুনন্দা হাসপাতালে নার্সের কাজ করতে থাকে। সেই হাসপাতালের ডাক্তার মুখার্জি চোখের চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত বলে খ্যাত। দেবনাথ সেখানে এলো চোখের চিকিৎসা করাবার জন্যে। ডাঃ মুখার্জি সুনন্দা ও দেবনাথের প্রেমের ব্যাপারটা ধরে ফেললেন। তিনি সুনন্দাকে জানালেন যে, দেবনাথের তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে পারেন এই সর্তে যে, সুনন্দা যদি তাকে বিয়ে করে। সুনন্দা তা প্রত্যাখ্যান করলে। ডাঃ মুখার্জি সুনন্দাকে নিজের বাড়িতে বন্দী করে রাখলেন। একদিন সুনন্দাকে জানালেন যে, তিনি দেবনাথের চোখ উৎপাটিত করে ফেলেছেন; আর একদিন এসে জানালেন যে, দেবনাথ মারা গিয়েছে। সুনন্দা প্রায় পাগলিনীর মতো হয়ে পড়লো। এর পরও ডাঃ মুখার্জি সুনন্দাকে বিয়ের কথা বললেন কিন্তু তবুও প্রত্যাখ্যাত হলেন। ডাঃ মুখার্জির মধ্যে পরিবর্তন এলো। একদিন সুনন্দার কাছে তিনি বিয়ের কথা বলছেন এমন সময় একখানি কার্ড এসে উপস্থিত হলো। সুনন্দা ছুটে বেরিয়ে দেখলে দেবনাথ। ডাঃ মুখার্জি জানালেন যে, দেবনাথ সত্যিই মরেনি, তিনি তার চোখ ভালো করে দিয়েছেন এবং তিনিই দেবনাথকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সুতরাং দেবনাথের সঙ্গেই সুনন্দার বিয়ে হলো।

বিন্যাসের মধ্যে রসপুষ্ট শিল্পচাতুর্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা একেবারেই নেই। ঘটনাগুলি উপস্থাপনের মধ্যে জোর করে হাজির করে দেওয়ার লক্ষণটাই এতো স্পষ্ট হয়ে পড়েছে যে, ঘটনাগুলি এমনিতে নেহাৎ অবাস্তব না হয়েও অযৌক্তিকতাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। গোড়া থেকেই ঘটনাগুলির এমনি ধারাই ঠেলেঠুলে হাজির হওয়ার ভাব, অর্থাৎ যথোপযুক্ত পরিবেশের অভাব। দেবনাথের মা অন্ধ অসহায় ছেলেকে উন্নতযৌবনা কুমারী সুনন্দার হাতে ছেড়ে দিয়ে তীর্থভ্রমণে চলে যেতে পারেন কোন যুক্তিতে? দেবনাথকে আরো অসহায় রেখে সুনন্দার গৃহত্যাগ করে যাওয়ার
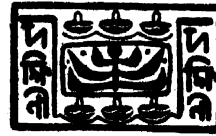
পিছনে হেতু ছিলো কিন্তু যুক্তির ওপরে কোন জোর দেওয়া হয়নি। গুণ্ডাদের পাল্লায় পড়ে সুনন্দা লক্ষ্ণৌতে পৌঁছলো। তাকে মা বলে যে উদ্ধার করলে সেও গুণ্ডাদলেরই একজন অথচ তার মধ্যে সে লক্ষণ তো দেখাই গেলো না উপরন্তু তাকে বেশ ভদ্রভাবেই হাজির করা হলো। তার ওপর সে ব্যক্তির উপযাজক হয়ে দেবনাথের কাছে গিয়ে তাকে লক্ষ্ণৌতে চক্ষু চিকিৎসার জন্যে যাওয়ার সুপারিশ করা ব্যাপারটা নেহাৎই টপকে পড়া ঘটনা। কমলেশ সুনন্দাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো, কিন্তু সেই সুনন্দা দেবনাথের গৃহ ছেড়ে যখন কমলেশের কাছে আশ্রয় চাইলে, তাকে বিয়ে করতে চাইলে তখন কমলেশ কেন যে পিছিয়ে গেলো তার পিছনে কোন যুক্তি ধরে দেওয়া হয়নি। এমনিভাবে আগাগোড়া প্রায় সব ঘটনাই কেমন যেনো টেনে এনে সাজিয়ে দেওয়া বলে মনে হয়।

দেবনাথের ভূমিকায় এই প্রথম সমর রায় তাকে সহ্য করে দেখবার মতো নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন এবং সারা ছবিখানির মধ্যে তার অভিনয়ই হয়েছে সবচেয়ে সংযত। সুনন্দার ভূমিকায় অনুভাকে এবারের মতো এতো রূপলাবণ্যহীনা বোধ হয় আর কোন ছবিতেই দেখায়নি। তার অভিনয়ের মধ্যে কৃত্রিমতার ভাগটাই ফুটেছে বেশী করে। দেবনাথের মার ভূমিকায় ছায়া দেবী অথবা ডাঃ মুখার্জির ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের মতো শিল্পীর দরকারও ছিলো না, কারণ তাদের ক্ষমতা দেখাবার মতো চরিত্র নয়। বিকাশ রায়ও কমলেশের ভূমিকায় অমনিই একটি গৌণ আকর্ষণ; অর্থাৎ নামেরই কেবল আকর্ষণ।

ছবিতে দুটি বাইজী নাচের দৃশ্য আছে। ঘটনাসূত্রে একেবারে অপ্রয়োজনীয় নয়, কিন্তু এমনিধারা তাদের বিন্যাস যে, কাহিনীর প্রয়োজন মেটাবার চেয়ে দর্শকদের আদিবৃত্তিতে সুড়সুড়ি দেবার চেষ্টার দিকেই যেনো আসলে নজর দেওয়া হয়েছে।

কলাকৌশলের দিক অতি সাধারণ। আলোকচিত্রের বাহাদুরী দেখাবার জন্যে অহেতুকভাবে প্রায় প্রত্যেকটি দৃশ্যেই সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা এতো বেশী মাত্রায় দেখানো হয়েছে যাতে ছবিখানির নামই "সিঁড়ি" হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত হতো বলে মনে হয়। মোট ছ'খানি গান। গানগুলির সুর ভালো—কিন্তু গাওয়াও ভালো নয়, আর তার সঙ্গতও সুবিধের নয়। দেবনাথের বেহালা শুনে সুনন্দা মুগ্ধ হলো, কিন্তু বেহালায় যে বাজনা সংযোজিত হয়েছে তা প্রেমকে চটিয়ে দেবার মতোই বিশ্রী। তেমনি, সুনন্দার লেখা যে গান দেবনাথের সুরে প্রতিযোগিতায় প্রশংসা পেয়েছিলো সে গানখানিও মোটেই তারিফ করার মতো নয়। সেই গান বা দেবনাথের বেহালা বাজনা নাটককে জমিয়ে তোলার অন্যতম মুখ্য অবলম্বন কিন্তু সে জোর নেইকো একটুও।

নরমেধ যজ্ঞ (মিনার্ভা থিয়েটার)—নাট্যকায়ঃ রাজকৃষ্ণ রায়; পরিচালনা ঃ রঞ্জিৎ রায়; ভূমিকায় ঃ শিবকালি চট্টোপাধ্যায়, জীবন গোস্বামী, আদিত্য ঘোষ, সূর্য সেন, জীবন বসু, মাধুরী, অর্পণা, রাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, লীলাবতী প্রভৃতি। গত ২২শে নভেম্বর মঞ্চস্থ হয়েছে।

মিনার্ভা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত যে মঞ্চটিকে সম্পূর্ণরূপেই হিন্দী নাট্যমঞ্চে পরিণত করে ফেলতে বদ্ধপরিকর 'নরমেধ যজ্ঞ' দেখার পর সে বিষয়ে আর সন্দেহ রইলো না। পুজোর সময় ওরা নতুন নাটক আরম্ভ করেছিলেন। শচীন সেনগুপ্তের 'তুষার কণা' যা বৈচিত্র্যের দিক থেকে বছরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান বলে অভিনন্দন লাভ করেছিলো, সেখানিকে মধ্য সাপ্তাহিক আবেদনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। আর সেই জায়গায় শনি-রবিবারের আকর্ষণ হিসাবে উপস্থিত করা হয়েছে 'নরমেধ যজ্ঞ'। 'নরমেধ যজ্ঞ' কেবলমাত্র অতি পুরাতন নাটকই নয়, বিষয়বস্তুর আবেদনের দিক থেকে এখনকার তুলনায় যেমনি বেখাপ্পা, তেমনি সাজসজ্জা, দৃশ্যপট, অভিনয় সবদিক থেকেই ছেলেমানুষী। এমনভাবে নাটকখানিকে তৈরী করে উপস্থিত করা হয়েছে যার তুলনা কেবল হিন্দী নাটক অভিনয়ের সঙ্গেই হতে পারে। পঞ্চাশ বছর আগেও বাঙলার মঞ্চ এর চেয়েও গৌরব করার মতো সুসমঞ্জস মঞ্চাবদান উপস্থিত করেছে। এ যেন ইচ্ছে করে মিনার্ভা থিয়েটার থেকে বাঙলা নাটকের স্তাবকদের দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা যাতে হিন্দী নাট্যাভিনয়টাই একচ্ছত্র হয়ে ওখানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। হয়তো আমাদের এ ধারণা ঠিক নয়,—হয়তো এমনও হতে পারে যে, সম্প্রতি ওখানকার ব্যবস্থা-

পনা বদলে নতুন যারা হাতে নিয়েছেন বাঙলার নাট্যসম্পদ সম্পর্কে তাদেরই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতারই অভাব।

'নরমেধ যজ্ঞে'র কাহিনী হচ্ছে রাজা যযাতি কর্তৃক পিতা নহুষের প্রেতাত্মার স্বর্গবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যে নরশিশু বলি দেওয়া নিয়ে। কুসীদজীবী রত্নদত্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ সিদ্ধার্থকে তার পুত্র কুশধ্বজকে এই কাজে বিক্রী করে দিতে বাধ্য করে। কুশধ্বজ পিতাকে ঋণমুক্ত করার জন্য আত্মবলিতে স্বীকৃত হয়। স্বয়ং নারদ-মুনি এই বলির উদ্যোক্তা হলেও পরিশেষে তারই দেওয়া মন্ত্র উচ্চারণ করার ফলে বালক কুশধ্বজ রক্ষা পায়, অথচ নহুষেরও আত্মা তৃপ্ত হয়।

নাটকখানি পুরণো এবং তখনকার হিসেবেও অত্যন্ত সাধারণ। পৌরাণিক কাহিনী কিন্তু দৃশ্যপট বা সাজসজ্জায় কাল-অকালকে এমনি অবজ্ঞা করা হয়েছে যাতে রূপটা এক জগাখিচুড়ী ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। একমাত্র কুশধ্বজের ভূমিকায় মাধুরীর অভিনয়ই যা কিছু আকর্ষণ এবং তা সত্যিই দেখবার মতো কৃতিত্ব। সিদ্ধার্থের ভূমিকায় শিবকালী চট্টোপাধ্যায়কেও প্রশংসা করা যায়। রত্নদত্তের ভূমিকায় আদিত্য ঘোষের রূপসজ্জা ভালো। এ ছাড়া সমগ্র নাটকখানির মধ্যে আর কিছু প্রশংসা করার নেই।

পৌরাণিক বিষয়বস্তুর আবেদন এখনও আছে, কিন্তু নাটকখানির দুর্বলতা, তার ওপর তাকে যাত্রাভাবে মঞ্চস্থ করার আবেদন বলতে কিছুই দাঁড়াতে পারে নি।

সাংবাদিকদের বিচারে শ্রেষ্ঠ ছবি

বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের কার্যকরী সভা আগামী চলচ্চিত্র মেলায় প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে থেকে একখানি ছবিকে শ্রেষ্ঠ নির্বাচন করে পুরস্কার দেবার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। আর এক প্রস্তাবে মেলার আঞ্চলিক সংগঠন কমিটিতে একজন চলচ্চিত্র সাংবাদিককে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

কিশোর কল্যাণ পরিষদের আনন্দানুষ্ঠান

গত ৩রা ও ৪ঠা নবেম্বর বড়বাজার মেট্রোপলিটান বিদ্যালয় ভবনে কিশোর কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কিশোর সম্মেলন উপলক্ষে দুদিন আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রথম দিন সন্ধ্যায় বিশিষ্ট শিল্পীদের সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় ছোটদের বিচিত্র অনুষ্ঠান ও রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটক অভিনয় হয়।

ফুটবল

আই এফ এর পরিচালকমণ্ডলীর উদ্দেশ্যই শেষ পর্যন্ত সফল হইল। সুইডেনের খ্যাতি-সম্পন্ন তরুণ খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত গোটেবর্গ ফুটবল দল অসময়ে কলিকাতায় মাঠে অবতীর্ণ হইয়া প্রবল উত্তেজনা ও উন্মাদনার সুযোগে দরিদ্র অন্নহীন বস্ত্রহীন বাঙলার ক্রীড়ামোদীদের একরূপ সর্বস্বান্ত করিয়া প্রচুর অর্থ সহ ভারত ত্যাগ করিল। মাত্র তিনদিন এই দল খেলায় যোগদান করে, কিন্তু এই তিনদিনই ফুটবল পাগল জ্ঞানহীন বাঙলার ক্রীড়ামোদিগণ মাঠের মধ্যে ও বাহিরে সমবেত হইয়া এক অভূতপূর্ব মরসুমী ফুটবল খেলার আবহাওয়া সৃষ্টি করে। কিন্তু এই বিরাট ক্রীড়ামোদী দল শেষ পর্যন্ত কি লভ করিল এই কথা কি কেহ একবার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? আমাদের যতদূর ধারণা কেহই করেন নাই। কারণ আমরা জানি অধিকাংশ লোকই এই প্রশ্নের উত্তরে বলিবেন, কেন? গত অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন সুইডিস ফুটবল দলের খেলার কি রীতি তাহা দেখিয়াছেন? আর উপলব্ধি করিয়াছেন ভারতের ফুটবল স্ট্যাণ্ডার্ড বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানদের অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। আর শুনিয়াছেন সুইডিস দলের ম্যানেজারের আত্মপ্রসাদ লাভের বাক্য "ভারতের ফুটবল স্ট্যাণ্ডার্ড যে এত উচ্চস্তরের ইহা আমাদের ধারণাই ছিল না। আমরা ভারতের ফুটবল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুবই উচ্চ আশা লইয়াই চলিলাম। ভারতীয় দলকে আমাদের দেশে পাইলে খুবই সুখী হইব।" "সুইডিস ফুটবল দলের ম্যানেজারের এই যে উক্তি ইহা যে ভারতীয় ফুটবল দলকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানের পর্যায় লইয়া গেল—ইহা কি কম বড় কথা?" এই উক্তিও কেহ কেহ করিবেন ইহাও আমরা জানি। আবার কেহ কেহ বলিবেন "ভারতীয় ফুটবল স্ট্যাণ্ডার্ড যাচাই করিবার ইহা একটি বিশেষ সুযোগ। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, এই সকল উক্তির একটিও সমর্থন-যোগ্য নহে। কেন নহে, তাহা আলোচনা করিতে হইলে অনেক কিছুই বলিতে হয়। আমরা কেবল এই টুকুই বলিতে চাহি যে, এই ভ্রমণ ব্যবস্থা বাঙলার ক্রীড়ামোদিগণের অত্যুগ্র ফুটবল উৎসাহের সুযোগ গ্রহণ করিয়া কতকগুলি লোক তাহাদের প্রতিপত্তি ও খ্যাতির টলটলয়মান অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ও সঙ্গে সঙ্গে কিছু আর্থিক সঙ্গতিও করিল। ফুটবল খেলোয়াড় বা ক্রীড়ামোদিগণের কোনই লাভ হয় নাই, হইয়াছে প্রচুর ক্ষতি। তিনদিন মাঠে ক্রীড়াকৌশলের শিক্ষনীয় কিছুই হয় নাই, হইয়াছে শারীরিক পটু দলের সহিত ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত ভারতীয় খলোয়াড়গণের শারীরিক হয়রাণি। লক্ষাধিক টাকা বিনা বাধায় হইয়াছে সংগৃহীত যাহার অধিকাংশই সুইডিস দলের পকেটস্থ হইয়াছে বলিলে কোনরূপ অন্যায় করা হইবে না। দীর্ঘ মরসুমী ফুটবল খেলায় শেষে এই ভাবে স্ট্যাণ্ডার্ড যাচাই করা মানে নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় প্রদান করা ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহার পরিবর্তে কয়েক সহস্র অর্থ ব্যয়ে যদি বৈদেশিক ফুটবল শিক্ষক আনাইয়া খলোয়াড়দের শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহা হইলে প্রকৃতই ভারতীয় খেলায় উন্নতির পথ রচিত হইত। জানি না কতদিনে এই বিষয়ে ফুটবল পরিচালকগণ সচেষ্ট হইবেন।

নিম্নে সুইডেনের গোটবের্গ ফুটবল দলের বিভিন্ন খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

(১) মোহনবাগান বনাম গোটেবর্গ দল। এই খেলায় গোটেবর্গ দল ২—০ গোলে বিজয়ী হয়। গোটেবর্গ দলের পক্ষে গোল করেন রলফ ব্যানষ্টম ও লার্স জুংগব্লাড।

(২) ইষ্টবেঙ্গল বনাম গোটেবর্গ দলঃ—এই খেলায় ইষ্টবেঙ্গল ১ গোলে বিজয়ী। ইষ্টবেঙ্গল দলের সালে দ্বিতীয়ার্ধের ১৬ মিনিটে হেড করিলে বল গোটেবর্গ গোলরক্ষকের হাতে পড়িয়া ফস্‌কাইয়া গোলে প্রবেশ করে।

(৩) আই এফ এ বনাম গোটেবর্গ দলঃ—খেলা ২—২ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। গোটেবর্গ প্রথমার্ধে একটি ও দ্বিতীয়ার্ধে অপর গোল করে। আই এফ এ দল পর পর দুই গোল পরিশোধ করে। আই এফ এর পক্ষে আপ্পা রাও ও মেওয়ালাল গোল করেন। গোটেবর্গ দলের লেনার্ট এণ্ডারসন ও লাঘ জুংগব্লাড গোল করেন।

এ্যাথলেটিকস

বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় প্রতিনিধিগণ একমাত্র হকি খেলা ব্যতীত অপর কোন বিষয়েই এই পর্যন্ত গৌরব অর্জন করিতে পারে নাই। ইহা লক্ষ করিয়া অন্যান্য সকল বিষয়ের পরিচালকগণ চঞ্চল না হইলেও ভারতীয় এ্যামেচার এ্যাথলেটিক ফেডারেশন একেবারেই নীরব থাকিতে পারেন নাই। ইহার প্রধান কারণ, এই ফেডারেশনের সভাপতি পতিয়ালার মহারাজা। তিনি ফেডারেশন গঠিত হইবার পর হইতেই প্রতি অধিবেশনেই বলিয়াছেন, "ভারতীয় এ্যাথলীটগণ বিশ্ব অলিম্পিক
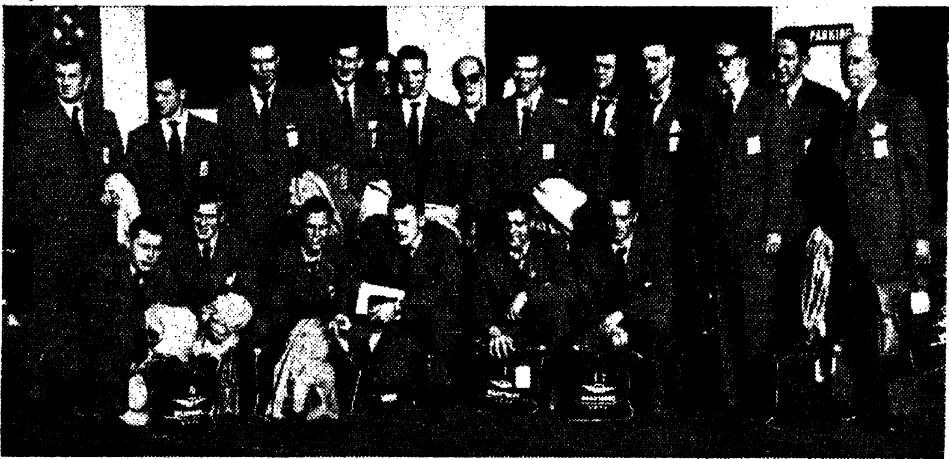
সুইডেনের গোটেবর্গ ফুটবল দলের খেলোয়াড়গণ

অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া কেবল শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিবে ইহা কিছুতেই চলিতে পারে না। আমরা এমন সকল প্রতিনিধি প্রেরণ করিব, যাহারা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানদের সমতুল্য না হইতে পারিলেও বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না। এ্যাথলেটিকসের প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য একটি সর্বনিম্ন স্ট্যান্ডার্ড বা মান স্থির করা প্রয়োজন।" পাতিয়ালার মহারাজার এই জিদের জন্যই শেষ পর্যন্ত ফেডারেশন এক উপসমিতি গঠন করেন। এই উপসমিতি সম্প্রতি দিল্লীর অধিবেশনে এ্যাথলেটিকসের প্রত্যেকটি বিষয়ের সর্বনিম্ন স্ট্যান্ডার্ড বা মানের তালিকা গঠন করিয়া কার্যকরী সমিতির নিকট পেশ করিয়াছেন। ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতিও ঐ তালিকা অনুমোদন করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রস্তাবে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, কোন ভারতীয় এ্যাথলীট বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরিত হইবেন না, যিনি ঐ সর্বনিম্ন মান অতিক্রম করিতে না পারিবেন। এমন কি ১৯৫২ সালের হেলসিঙ্কি অলিম্পিক অনুষ্ঠানের ভারতীয় প্রতিনিধি নির্বাচনের সময়ও উক্ত স্ট্যান্ডার্ড বা মান বিবেচনা করা হইবে। ভারতীয় এ্যামেচার এ্যাথলেটিক ফেডারেশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, তবে কিছুদিন অর্থাৎ দুই বৎসর পূর্বে হইলেও ভাল হইত। মাত্র তিন মাস পরে মাদ্রাজে ভারতীয় অলিম্পিক অনুষ্ঠান হইবে এবং তাহার সাফল্য-মণ্ডিত ভারতীয় এ্যাথলীটগণই হেলসিঙ্কি অনুষ্ঠানে প্রেরিত হইবেন বলিয়াই বহু পূর্বে ঘোষণা করা হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় মাত্র তিনমাস পূর্বে এক স্ট্যান্ডার্ড বা মানের তালিকা প্রকাশ করিয়া উৎসাহী ভারতীয় এ্যাথলীটদের বিভ্রান্ত করা ছাড়া আর কিছুই করা হইল না। তিন মাসের মধ্যে কোন এ্যাথলীটই স্ট্যান্ডার্ডে উপনীত হইতে পারে না। কয়েক বৎসরের সাধনার পরই ইহা সম্ভব। ১৯৫২ সালের বিশ্ব অলিম্পিক প্রতিনিধি নির্বাচনের সময় উক্ত স্ট্যান্ডার্ড অনুসৃত না হইয়া পরবর্তী বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানের সময় করা হইবে বলিলে বোধ হয় সমীচীন হইত।

নিম্নে যে সর্বনিম্ন স্ট্যান্ডার্ড বা মানের তালিকা গঠিত হইয়াছে তাহা প্রদত্ত হইল:—

১০০ মিটার দৌড় : ১০.৮ সেকেণ্ড
২০০ মিটার দৌড় : ২২ সেকেণ্ড
৪০০ মিটার দৌড় : ৪৯ সেকেণ্ড
৮০০ মিটার দৌড় : ১ মিঃ ৫৪ সেকেণ্ড
১৫০০ মিটার দৌড় : ৪ মিঃ
৫০০০ মিটার দৌড় : ১৪ মিঃ ৫৬ সেকেণ্ড
১০০০০ মিটার দৌড় : ৩১ মিঃ ৩০ সেকেণ্ড
১১০ মিটার হার্ডল : ১৪.৮ সেকেণ্ড
৪০০ মিটার হাই হার্ডল : ৫৪.৫ সেকেণ্ড
৩০০০ মিটার ষ্টিপল চেজ : ৯ মিঃ ৩০ সেকেণ্ড
১০০০০ মিটার ভ্রমণ : ৪৭ মিনিট
৫০ কিলোমিটার ভ্রমণ : ৫ ঘণ্টা ৫ মিনিট
৪×১০০ মিটার রিলে : ৪২ সেকেণ্ড

নাগপুরে মধ্যপ্রদেশের মাননীয় রাজ্যপাল পশ্চিম বাঙলার হাডুডু খেলোয়াড়দের সহিত করমর্দন করিতেছেন।

৪×৪০০ মিটার রিলে : ৩ মিঃ ২২ সেকেণ্ড
ম্যারাথন দৌড় : ২ ঘণ্টা ৪২ মিঃ
উচ্চ লম্ফন : ৬ ফিট ৩ ইঞ্চি
দৈর্ঘ্য লম্ফন : ২৩ ফিট ২ ইঞ্চি
হপ্ ষ্টেপ্ জাম্প : ৪৮ ফিট
পোল ভল্ট : ১৩ ফিট
গোলা ছোড়া : ৪৮ ফিট ৬ ইঞ্চি
ডিসকাস্ ছোড়া : ১৫০ ফিট
বর্শা ছোড়া : ২০০ ফিট
হাতুড়ী ছোড়া : ১৬৫ ফিট

[উপরোক্ত সমস্ত বিষয়গুলি পুরুষ এ্যাথলীটদের জন্য। ভারতীয় মহিলা এ্যাথলীটদের স্ট্যান্ডার্ড এত নিম্ন স্তরের যে, ভারতীয় এ্যামচার এ্যাথলিট ফেডারেশন কোন মহিলা প্রতিনিধি প্রেরণ করা হইবে না বলিয়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন]

হকি

জাপানী হকি দলের ভারত ভ্রমণ এখনও শেষ হয় নাই। ভ্রমণের সূচনা হইতে এই দল যেরূপ খেলিতে ছিলেন তাহা অপেক্ষা যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে সত্য, কিন্তু কোন খেলাতেই বিজয় গৌরব লাভ করা সম্ভব হয় নাই। ভ্রমণের শেষ খেলাতেও উহা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। নিম্নে দিল্লীর তৃতীয় টেস্ট ম্যাচের পর যে সকল খেলা হইয়াছে, তাহার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

(১) আগ্রা একাদশ বনাম জাপান:—জাপানী দল ৪—২ গোলে পরাজিত।

(২) মীরাট একাদশ বনাম জাপান:—জাপানী দল ৬—১ গোলে পরাজিত। মীরাট দলের পক্ষে গোল করেন ধ্যানচাঁদ ১টি, ওমপ্রকাশ ৩টি, শিবরত্ন ১টি ও আনন্দ ১টি।

(৩) সিমলার পাঞ্জাব একাদশ বনাম জাপান:—জাপানী দল ২—১ গোলে পরাজিত। পাঞ্জাব দলের পক্ষে গোল করেন কৃপাল ও বলবীর (জুনিয়ার)। জাপানের পক্ষে গোল করেন কুবো।

(৪) জাপান বনাম ভারত চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ:—ভারত ৪—১ গোলে বিজয়ী। জাপানী দলের টকুনাগা প্রথম গোল করেন। পরে ভারতের পক্ষে গোল করেন বলবীর সিং ২টি, বকশিস সিং ১টি ও উধম সিং ১টি।

(৫) পতিয়ালা বনাম জাপান দল:—জাপানী দল ৩—১ গোলে পরাজিত।

জাতীয় খেলাধুলা

প্রত্যেক স্বাধীন দেশে জাতীয় খেলাধুলার সম্মান আছে। ভারত স্বাধীন হইবার পর সকলেই মনে করিয়াছিলাম উপেক্ষিত জাতীয় খেলাধুলা সারাভারতের ক্রীড়ামোদীর সমাদর লাভ করিবে। ভারতের কতকগুলি রাজ্যের সরকার এই বিষয় একেবারেই উদাসীন নহেন। ইহারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়া জাতীয় খেলাধুলার প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। ইহার ফল স্বরূপ সম্প্রতি নাগপুরে মধ্যপ্রদেশ সরকারের সহায়তায় ও মধ্যপ্রদেশ ক্রীড়ামণ্ডলের উদ্যোগে যে জাতীয় স্বাস্থ্য সপ্তাহ পালিত হইল তাহাতে বিভিন্ন ব্যায়াম, এ্যাথলিটিকস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের সহিত জাতীয় খেলাধুলার বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। এত অধিক সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা দল জাতীয় খেলাধুলায় যোগদান করে যে পরিচালকদের প্রতিদিন সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত প্রতিযোগিতার আয়োজন করিতে হয়। প্রতিদিন খেলার সময় বিপুল দর্শকমণ্ডলী সমবেত হইয়া বিভিন্ন দলকে উৎসাহিত করেন। মধ্যপ্রদেশের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীমঙ্গলদাস পাকবাস অধিকাংশ দিনেই খেলার সময় উপস্থিত থাকিতেন। এই উপলক্ষে যে দল বাঙলা হইতে প্রেরিত হয়, তাহাকে রাজ্যপাল নিজ ভবনে অভ্যর্থনা করিয়া রাজসিক সম্মানদান করেন। খেলার সময় উপস্থিত থাকিয়াও বাঙলার খেলোয়াড়গণকে উৎসাহিত করেন। তিনি বাঙলার ক্রীড়াকৌশল দেখিয়াও বলেন, "সত্যই স্ট্যান্ডার্ড প্রশংসনীয়।" কিন্তু আশ্চর্য ও দুঃখের বিষয় যে, সেই বাঙলা দেশে জাতীয় খেলাধুলার কোনই সম্মান নাই। কতদিনে যে বাঙলার ক্রীড়া পরিচালকগণ, এমন কি সরকারের দৃষ্টি যে এই দিকে পড়িবে বলা কঠিন। তবে ইহা আমরা নিশ্চিত করিয়া বলিতে

পারি বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্য যে ভাবে জাতীয় খেলাধূলার প্রাধান্য দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাতে বাঙলার সরকার একেবারে নীরব থাকিতে পারিবেন না। ইঁহাদের কোন ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

জাতীয় খেলাধূলায় আছে প্রচুর আনন্দ, প্রচুর স্বাস্থ্যলাভের সুযোগ। তাহা ছাড়া ইহাতে অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন নাই। এই খেলাধূলাকে উপেক্ষা করা অর্থে মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

ক্রিকেট

ভারত ভ্রমণকারী এম সি সি দল বর্তমানে পাকিস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে খেলায় যোগদান করিতেছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের খেলায় বিশেষ করিয়া প্রথম টেস্ট ম্যাচে এই দলের যেরূপ শক্তিহীনতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল পাকিস্থানের বিভিন্ন খেলাতেও তাহার ব্যতিক্রম হইতেছে না। এম সি সি দল পাকিস্থানের কোন খেলাতেই বিজয়ী হইতে পারে নাই। একটী খেলাতে "ফলো অন" পর্যন্ত করিতে হইয়াছে। দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে অসুস্থতার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় এই দলের জন্য লণ্ডন হইতে শীঘ্রই খেলোয়াড় প্রেরিত হইবে বলিয়া আশা করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। আগামী মাসেই এম সি সি দল ভারতের সহিত বোম্বাইতে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ খেলিবে। ঐ খেলায় কোন নূতন খেলোয়াড়কে খেলিতে দেখিলে কোনরূপ আশ্চর্য হইবার কোনই কারণ থাকিবে না। পাকিস্থানের ক্রিকেট খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড সম্পর্কে ভারতের বহু ক্রীড়ামোদীই বিশেষ উচ্চ ধারণা পোষণ করেন না। এই জন্য এম সি সি দলের পাকিস্থানের বিভিন্ন খেলায় ফলাফল অবলোকন করিয়া কেহ কেহ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, "জাতে উঠাইবার চেষ্টা হইতেছে। এই সকল খেলা বোঝাপড়ার খেলা।" এই অভিমতের সমর্থনে এই সকল ক্রীড়ামোদী কোন প্রমাণ পাইয়াছেন কি না জানি না, তবে সন্দেহ করিবার যে কারণ নাই, ইহা অস্বীকার করা চলে না। যে পাকিস্থানকে ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্স কোন মূল্য দিতে চাহে নাই; প্রতিনিধি গ্রহণেও অস্বীকার করে, সেই পাকিস্থানের ক্রিকেট খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড যে জানিল না বা শুনিল না, রাতারাতি প্রথম শ্রেণীর স্তরে উপনীত হইল; এম সি সি'র মত দলকে শোচনীয় পরাজয়ের সম্মুখীন পর্যন্ত করিতে সক্ষম হইল, ইহা সত্যই চিন্তার বিষয়। তাহা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় দলের অখ্যাতনামা তরুণ খেলোয়াড় পর্যন্ত বেপরোয়া-ভাবে ব্যাটিং করিয়া বিনা বাধায় শতাধিক রান করিবার গৌরব অর্জন করিল—ইহাও কল্পনাতীত। যাহাই হউক, ইহাতে পাকিস্থানের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্ষেত্রে সম্মান অর্জনের পথ সুগম হইল—ইহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। নিম্নে এম সি সি দলের পাকিস্থানের বিভিন্ন খেলায় ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

(১) ওয়েস্ট পাঞ্জাব বনাম এম সি সি:—শিয়ালকোটে অনুষ্ঠিত এই খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

ওয়েস্ট পাঞ্জাব: প্রথম ইনিংস্—৩৬৪ রান (নজর মহম্মদ ১৪০ রান, আখা আমেদ ৫২ রান, ওয়াজির হোসেন ৪০ রান, ফজল মামুদ ৪০ রান, মুরাওয়াৎ হোসেন ৩৬ রান)

এম সি সি: প্রথম ইনিংস্—২২৯ রান (কার ৬৩ রান, লসন ৩০ রান, হিল্টন ৪৭ রান; ফজল মামুদ ৫৮ রানে ৪টি, অনিল কুরেশী ৭৪ রানে ৪টি উইকেট পান)

ওয়েস্ট পাঞ্জাব: দ্বিতীয় ইনিংস্—(৬ উইঃ) ১১৪ রান (নজর মহম্মদ ৩২ রান, আগা রেজা ২৪ রান; রিজওয়ে ১৭ রানে ৩টি উইকেট পান)

এম সি সি: দ্বিতীয় ইনিংস্—(১ উইঃ) ৫০ রান (লসন নট আউট ২৪ রান, গ্রেভনী নট আউট ২২ রান)

(২) এম সি সি বনাম পাকিস্থান: প্রথম টেস্ট ম্যাচ—খেলা লাহোরে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

এম সি সি: প্রথম ইনিংস্—২৫৪ রান (রবার্টস্ ৬১ রান, গ্রেভনী ২৬ রান, ট্যাটারসল নট আউট ৩৩ রান; খান মহম্মদ ৮৪ রানে ৫টি উইকেট ও আমীর ইলাহী ৯৭ রানে ৪টি উইকেট পান)

পাকিস্থান: প্রথম ইনিংস্—(৯ উইকেট) ৪২৮ রান (ডিক্লেয়ার্ড) (মকসুদ আমেদ ১৩৭ রান, নজর মহম্মদ ৬৬, গজানী ৮৬ কারদার ৪৮ রান; কার ৩৭ রানে ২টি উইকেট ও স্যাকলটন ৮২ রানে ২টি উইকেট পান।)

এম সি সি: দ্বিতীয় ইনিংস্—(১ উইকেট) ৩৬৮ রান (স্পুনার নট আউট ১৬৮ রান, গ্রেভনী নট আউট ১০৯ রান, রবার্টসন ৭০ রান; কারদার ৯৫ রানে ১টি উইকেট পান)

(৩) এম সি সি বনাম পাকিস্থান বিশ্ববিদ্যালয়—খেলা লাহোরে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

পাকিস্থান বিশ্ববিদ্যালয়: প্রথম ইনিংস্—৮৮ রান (স্ট্যাথাম ৮ রানে ৪টি উইকেট ও রিজওয়ে ২৬ রানে ৩টি উইকেট পান)

এম সি সি: প্রথম ইনিংস্—(৩ উইকেট) ১৩৩ রান ডিক্লেয়ার্ড (কোনিয়ন নট আউট ৭০ রান)

পাকিস্থান বিশ্ববিদ্যালয়: দ্বিতীয় ইনিংস্—(২ উইকেট) ২৪৫ রান ডিক্লেয়ার্ড (সুজাউদ্দীন ১১২ রান নট আউট, এস আমেদ নট আউট ১০৪ রান)

এম সি সি: দ্বিতীয় ইনিংস্—(১ উইকেট) ৫৪ রান

(৪) করাচী ও বাহালপুর একাদশ বনাম এম সি সি—খেলা অমীমাংসিত।

করাচী বাহালপুর একাদশ: প্রথম ইনিংস্—(৯ উইকেট) ৩৪৮ রান (মহম্মদ হানিফ ৭৭ রান, ইমতিয়াজ আমেদ ৯৯ রান, ওয়াজির মহম্মদ ৭৭ রান; ওয়ার্টকিন্স ৭৭ রানে ৩টি উইকেট ও রবার্টসন ৩৬ রানে ২টি উইকেট পান)

এম সি সি: প্রথম ইনিংস্—১২৩ রান

এম সি সি: দ্বিতীয় ইনিংস্—(৩ উইকেট) ১৩১ রান

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১৭ই নবেম্বর—ঢাকা জেলার শুভাড্যা গ্রামে মুসলমান উদ্বাস্তুরা হিন্দু পরিবারগুলিকে বলপূর্বক উচ্ছেদ করিতেছে বলিয়া পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের বিরোধীদলের নেতা শ্রীবসন্ত-কুমার দাসের একটি মন্তব্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই সংবাদ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু মন্ত্রী শ্রী সি সি বিশ্বাসের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন যে, পূর্ববঙ্গের গ্রামগুলিতে বল-পূর্বক হিন্দু গৃহ দখলের অভিযোগ কিছুকাল হইতে তাঁহার নিকট আসিয়া পৌঁছিতেছে।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজওহরলাল নেহরু হিমাচল প্রদেশে তাঁহার নির্বাচনী পরিভ্রমণ সমাপ্ত করিয়াছেন।

কলিকাতা হইতে ২৮ মাইল দূরে হাবরা ষ্টেশনে প্রায় ২৫০ জন উদ্বাস্তু প্রত্যূষ হইতে তাহাদের দাবী আদায়ের জন্য রেল লাইনের উপর বসিয়া থাকায় অদ্য বনগাঁ ও শিয়ালদহের মধ্যে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে।

১৮ই নবেম্বর—এরূপ জানা গিয়াছে যে, কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শেখ আব্দুল্লাকে পাকিস্থানে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার একটি চাঞ্চল্যকর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে।

অদ্য প্রাতে কটকে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন যে, স্বাধীনতা এবং দেশের সম্পদ জন-সাধারণের সম্মুখে এক অভূতপূর্ব সুযোগ আনিয়া দিয়াছে। এই সুযোগ জনসাধারণকে গ্রহণ করিতে হইবে।

পুরুলিয়ার এক সংবাদে প্রকাশ—স্থানীয় এক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের হইয়া প্রবেশিকা টেস্ট পরীক্ষা দিবার সময় এক মধ্য-ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ধরা পড়েন। তাঁহাকে পুলিশের হাতে সমর্পণ করা হয়।

১৯শে নবেম্বর—প্রজাতান্ত্রিক ভারতের ঐতিহাসিক প্রথম সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধান সভার মোট ২৩৮টি আসনের জন্য সমগ্র রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে অন্যূন তিন হাজার প্রার্থী এবং সংসদের লোকসভায় ৩৪টি আসনের জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে দেড় শতাধিক প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করিয়াছেন। গত সোমবার সমস্ত কেন্দ্রে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিবস অতিবাহিত হয়।

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু তাঁহার মন্ত্রিসভার সহকর্মিগণের প্রতি এই নির্দেশ জারী করিয়াছেন যে, সাধারণ নির্বাচন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা যেন সরকারী নীতি সংক্রান্ত কোনরূপ বিবৃতি না দেন।

কলিকাতায় প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, জন-নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের নির্বিচারে প্রয়োগের ফলে পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলায় ভীষণ ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে।

২০শে নবেম্বর—জম্মু ও কাশ্মীর সরকার অদ্য রাজ্যের জন্য একটি নূতন অস্থায়ী সংবিধান বলবৎ করিয়াছেন। এই আইনের দ্বারা শাসনকর্তার হাত হইতে ক্ষমতা লোকায়ত্ত সরকারের নিকট হস্তান্তরিত হইল।

২১শে নবেম্বর—গত বুধবার প্রাতঃকালে দমদম বিমান ঘাটির অনতিদূরে ১৭ জন আরোহী সমেত একখানি ডাকোটা বিমান এক ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ভূপতিত হয়। উক্ত দুর্ঘটনায় ভারতীয় সংসদের সদস্য ও নিঃ ভাঃ সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের সভাপতি শ্রীদেশবন্ধু গুপ্ত এবং বিমানের ৪ জন কর্মচারীসহ মোট ১৬ জন আরোহী নিহত হন। একজন মাত্র যাত্রীর জীবন দৈবক্রমে রক্ষা পাইয়াছে।

ভারতের খাদ্য মন্ত্রী শ্রী কে এম মুন্সী অদ্য এশিয়ার অনশনক্লিষ্ট কোটি কোটি নরনারীকে সাহায্যদান করিতে রাষ্ট্রপুঞ্জ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার নিকট আবেদন জানান।

২২শে নবেম্বর—প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে অদ্য রাত্রে এক বেতার বক্তৃতায় দেশবাসীর প্রতি "প্রফুল্ল মন লইয়া সাধারণ নির্বাচনের সম্মুখীন হইতে এবং এমন কি যাহারা আমাদের বিরোধিতা করিতেছে, তাহাদের প্রতি কোনওরূপ বিরূপ মনোভাব পোষণ না করিবার" আবেদন জানাইয়াছেন।

২৩শে নবেম্বর—আসামের মুখ্যমন্ত্রী আনন্দ-বাজার পত্রিকার প্রতিনিধির নিকট বলেন, সরকার যেমন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, আসামে কম্যুনিস্টগণ গোপনে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ চালাইবার নীতি ত্যাগ করে নাই।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজওহরলাল নেহরু অদ্য বোম্বাইয়ে এক মহতী জনসভায় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণ করিয়া এক বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভারতের পররাষ্ট্র-নীতি বাস্তবপন্থী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১৮ই নভেম্বর—সোভিয়েট সরকারী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'তাস' জানাইয়াছেন, রুশিয়া ত্রিয়েস্ত অঞ্চলকে দখলে রাখিবার বিরুদ্ধে বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট প্রতিবাদ জানাইয়াছে।

কায়রোর এক সংবাদে প্রকাশ—জনৈক সামরিক মুখপাত্র ঘোষণা করিয়াছেন যে, গত রাত্রিতে ইসমাইলিয়ায় বৃটিশ সেনা ও মিশরী পুলিশের মধ্যে বন্দুকের লড়াইয়ে একজন বৃটিশ অফিসার নিহত হইয়াছেন।

২০শে নভেম্বর—টোকিওর এক সংবাদে প্রকাশ—অদ্য পিকিং বেতারে রাষ্ট্রপুঞ্জের বিরুদ্ধে কম্যুনিস্ট যুদ্ধ বন্দীদের আণবিক বোমার পরীক্ষা কার্যে গিনিপিগের ন্যায় ব্যবহার করা হইতেছে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে।

২৩শে নভেম্বর—টোকিওর এক খবরে জানা যায় যে, কোরিয়ায় যুদ্ধ-বিরতি প্রতিনিধিদলের মধ্যে অদ্য যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখা নির্ধারণ সম্পর্কে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ণাঙ্গ সামরিক সন্ধির পথে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বড়দিনের মধ্যেই যুদ্ধাবসান ঘটিবার সম্ভাবনা।

সোভিয়েট রাশিয়া অভিযোগ করিয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের "আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ এবং আক্রমণাত্মক কার্যাদি করিয়াছে।"

২৪শে নভেম্বর—অদ্য বৃটিশ গভর্নমেন্ট মিশর সরকারের নিকট এক নোট প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছে যে, সুয়েজ খাল এলাকা সংক্রান্ত চুক্তি অনুযায়ী বৃটিশ বাহিনী সুয়েজ খাল এলাকায় অবস্থান করিবে।

কোরিয়ার যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখার মানচিত্র অঙ্কনে রত রাষ্ট্রপুঞ্জ ও কম্যুনিস্ট স্টাফ অফিসারগণ অদ্য ১৪৫ মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনের প্রায় অর্ধাংশ সম্পর্কে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন।

ভারতীয় মূল্যঃ প্রতি সংখ্যা—৵০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,
পাকিস্থান মূল্যঃ প্রতি সংখ্যা (পাক) ৵০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, (পাক)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালকঃ আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৬নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিষয় লেখক	পৃষ্ঠা

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন　　　　সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

ঊনবিংশ বর্ষ]　　শনিবার, ২০শে পৌষ, ১৩৫৮ সাল।　　Saturday, 5th January, 1952.　　[১০ম সংখ্যা

নববর্ষ ও নির্বাচন

ইংরেজী নববর্ষ এখনও ভারতীয় রাষ্ট্রের সরকারী নূতন বৎসর হিসাবে পরিগৃহীত হইতেছে। ব্রিটিশের প্রভুত্ব ভারত হইতে অপসারিত হইয়াছে, কিন্তু সেই প্রভুত্বের পাকে ভারতের বুক জুড়িয়া কালের যে আবর্ত উঠিয়াছিল, তাহার ঘূর্ণি অদ্যাপি উপশমিত হয় নাই এবং ভারত সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ হইবার অবসর লাভ করে নাই। ইংরেজী বর্ষচক্রের এই আবর্তনের মুখেই আবার আমাদের সাধারণ নির্বাচন আসিয়া পড়িয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বল অঞ্চলে কতকগুলি কেন্দ্রে ভোট-গ্রহণ আরম্ভ হইয়াছে। বিভিন্ন দলের নির্বাচন সম্পর্কিত প্রচারকার্যেও জোর বাড়িয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের সভাপতিস্বরূপে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি কেন্দ্রে এবং কলিকাতা শহরে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। এই উপলক্ষে কংগ্রেস সভাপতি যে দুইদিন পশ্চিমবঙ্গে ছিলেন, তিনি বিরাট জনতার দ্বারা সংবর্ধিত হইয়াছেন। বিভিন্ন সভায় বিপুল জন-সমাবেশে তিনি আবেগোদ্দীপ্ত প্রতিবেশের মধ্যে অভিনন্দিত হইয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলাল দার্শনিকসুলভ উপনিষদের উদার ছন্দে ভারতের সংস্কৃতির কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। তিনি উচ্ছ্বসিত ভাষায় ভারতের স্বাধীনতার জন্য বাঙলার আত্মবদানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আশ্বাসে ও উদ্দীপনায় বাঙলার অন্তরের সুরটি তবুও যেন বাজিয়া উঠে নাই। ইহার কারণ কি?

কারণ খুঁজিতে অবশ্য বেশী দূর যাইতে হয় না। বস্তুত ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পর পশ্চিমবঙ্গের জনমানসে যে আশা ও আগ্রহের সঞ্চার হইয়াছিল, কংগ্রেসী শাসনের এই কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় তাহা যেন অনেকখানি স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে। ভারত ব্যবচ্ছেদ বাঙলার পক্ষে বিপর্যয়কর ব্যাপার, সন্দেহ নাই; কিন্তু ব্যবচ্ছেদের এই দুর্দৈবের মধ্যেও বাঙালী নূতন কিছু আশা করিয়াছিল। বাঙলার জাতীয়তামূলক ঐতিহ্য এবং তাহার সংস্কৃতি বলিষ্ঠ আদর্শের প্রেরণা পাইবে, অন্তত বাঙালী ইহা মনে করিয়াছিল। কিন্তু সে আশা তাহাদের পূর্ণ হয় নাই; পক্ষান্তরে আদর্শহীন একটা অবসাদ জাতির অন্তরকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। পরন্তু নেতাদের কোন আশ্বস্তি এবং ভরসাই সে অবসাদের ভাব একান্তরূপে অপসারিত করিতে সমর্থ হইতেছে না। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু, কংগ্রেসের ঐতিহ্যের কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, সাম্প্রদায়িকতার অনিষ্ট-কারিতার সম্বন্ধে তিনি আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, প্রাদেশিকতার তিনি নিন্দা করিয়াছেন, অখণ্ড রাষ্ট্রের আদর্শে তিনি আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের পক্ষে, বিশেষভাবে বাঙালীর পক্ষে এসব নূতন করিয়া শুনিবার কিছুই নাই। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের গৌরবময় ঐতিহ্য বাঙালীর বুকের রক্তেই গড়িয়া উঠিয়াছে। সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রাদেশিকতাকে বাঙালী কোনদিনই স্বীকার করিয়া লয় নাই। তাহার সংস্কৃতিই সমন্বয়মূলক। সংস্কৃতির বৃহৎ পরিপ্রেক্ষার কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যাইবে, স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙালীর অবদান অখণ্ড ভারতের একাত্মতার আদর্শকেই অন্তরধর্মে উজ্জ্বল করিয়া তোলে। বরং স্বাধীনতা লাভ করিবার পরই সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, বিশেষভাবে অখণ্ড ভারতের একাত্মতামূলক আদর্শের অভাবজনিত দৈন্যের চাপ পশ্চিমবঙ্গের জন-মানসকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে। মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার মত স্থান আজ বাঙালী পাইতেছে না। তাহার কণ্ঠ আজ অবরুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। বস্তুত বাঙালীর সম্মুখে ভবিষ্যতের কোন আশা এবং কোন ভরসাই দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে না। পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-জীবনে এই যে রোগের লক্ষণটি দেখা যাইতেছে, ব্যাপকভাবে ইহার গুরুত্ব আছে বলিয়া আমরা মনে করি; কারণ, বাঙলা দেশকে ভারতের হৃদয় বলা যাইতে পারে। আধুনিক যুগে উচ্চ আদর্শের সব ভাব এই বাঙলা হইতে সমগ্র ভারতে সঞ্চারিত হইয়াছে। এখান হইতে তপ্ত রক্ত-স্রোত সমগ্র ভারতের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া তাহার প্রাণশক্তিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং বাঙলার এই যে

মনস্তাত্ত্বিক সঙ্কট, এই যে অবসাদ, ইহাতে সমগ্র ভারতের প্রাণের অবস্থায়ই প্রতিফলিত হইতেছে অর্থাৎ ভারতের রাষ্ট্র-জীবনে মারাত্মক ব্যাধির জীবাণু যে প্রবেশ করিয়াছে, ইহা বোঝা যাইতেছে। এই ব্যাধির বিস্তার যদি বন্ধ করিতে হয়, তবে ভারতের রাষ্ট্র-নীতির যাঁহারা নিয়ামক, যাঁহারা দেশের প্রকৃত কল্যাণকামী পশ্চিমবঙ্গের অবস্থার উন্নতির জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হইবে এবং বাঙলার সংস্কৃতির বলিষ্ঠ আদর্শকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে হইবে। বলা বাহুল্য, বাঙালী যদি বাঁচে, তবে ভারতও বাঁচিবে; পক্ষান্তরে বিপর্যস্ত এবং বিপন্ন বাঙলা যদি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার মত, বর্তমানের এই স্বাধীন ভারতেও না পায়, তবে ভারতেরও ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। প্রকৃতপক্ষে বাঙালী আজ তাহার অন্তরের মানুষকে হারাইয়াছে। অতীতের স্মৃতিকে উন্মথিত করিয়া সে আজ সেই অগ্নিময় পুরুষেরই আবির্ভাব কামনা করিতেছে। বাঙলার বুকে বৃহতের জন্য সাধনার দুর্জয় বুভুক্ষাই জাগাইয়া তুলিয়াছে। বাঙালী চায় তাহার বিপর্যস্ত সমাজ-জীবনের পুনর্গঠনে বৈপ্লবিক এবং ব্যাপক প্রচেষ্টার উদ্বোধন, কোন্ দল সেজন্য সাহস ও সঙ্কল্প-শীলতার সঙ্গে আগাইয়া যাইবে? নূতন নির্বাচনের মুখে বাঙলার এই অন্তঃপ্রকৃতির পরিচয়টি জানিয়া রাখা ভাল। কারণ নির্বাচনে যে দলই জয়ী হোক্ এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে জবাবদিহি হইতে হইবে।

সংস্কৃতি ও সংহতি

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন স্বদেশী আন্দোলনের পরিপূরক এবং পরিপোষক-স্বরূপে একদিন বাঙলাদেশে নূতন যুগের উদ্বোধন করিয়াছিল। বঙ্গবাণীর সাধনা সেদিন জাতির অন্তরে নবসৃষ্টির অগ্নিময় আবেগ জাগাইয়াছিল। কিন্তু সে বাতি নিভিয়া গিয়াছে। বঙ্গ সাহিত্যের জন্মক্ষেত্র বাঙলাতেই বর্তমানে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের নিয়মিতভাবে অধিবেশনের কোন ব্যবস্থা নাই। এখন শুধু আছে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। এবার 'প্রবাসী' কথাটি গোড়া হইতে তুলিয়া দিয়া সম্মেলনকে অতঃপর নিখিল ভারত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন এই নামে অভিহিত করিবার যে সিদ্ধান্ত পাটনায় গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুত সুধাংশুকুমার দাস যথাক্রমে পাটনায় আহূত বিগত সম্মেলনের মূল সভাপতি এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের উভয়ের অভিভাষণই সুচিন্তিত এবং বিশেষভাবে সময়োপযোগী হইয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির মাননীয় সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে প্রথমেই 'প্রবাসী' এই কথাটির সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, প্রবাসী বাঙালীর শুধু এই পরিচয়ে আমরা ক্ষুন্ন, কারণ, বাঙালী যে শুধু বাঙালীর এই কথাই আজ বড় কথা নয়। স্বাধীন ভারতে আমরা ভারতীয় নাগরিক এবং ভারতীয় সাধনার সহিত বাঙলা সাহিত্য ও সমাজের যে নিগূঢ় যোগ রহিয়াছে, আজ তাহাই বড় কথা।" মূল সভাপতি শ্রীযুত অতুল গুপ্ত মহাশয় প্রকৃতপক্ষে এই প্রশ্নটিকেই একটি বৃহত্তর পটভূমিকায় রাখিয়া বিস্তৃততর আলোচনা করিয়াছেন। ভারতের বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষায় বাঙালী আজ নিজকে এমনভাবে পরবোধ করে কেন, গুপ্ত মহাশয় তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে ইংরেজ রাজত্বকালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে পারস্পরিক পরিচয় নিবিড় হইয়া উঠে নাই। পক্ষান্তরে আগে যেটুকু ছিল তাহাও যেন ক্ষুন্ন হইয়াছে। তাঁহার কথা এই যে, 'ভারতবর্ষের এক ভাষার সঙ্গে ভাষীদের অপরিচয়ে অবশ্য প্রমাণ হয় যে, ইংরেজের রাষ্ট্রশাসনে ভারতবর্ষকে এক করেছিল, ভারতবাসীদের এক করে নাই।' কথাটা আরও একটু ভাঙিয়া তিনি বলিয়াছেন,—"স্বীকার করতে হবে, বাঙালীর সঙ্গে ইংরেজের যে পরিচয়, পাঞ্জাবী কি রাজস্থানী, কি বিহারীর সঙ্গে তার সে পরিচয় নেই; কারণ ইংরেজের মনকে আমরা জেনেছি তার সাহিত্যের মধ্যে। পাঞ্জাবী, কি রাজস্থানী, কি বিহারীর মনকে তাদের সাহিত্যের মধ্যে দেখতে চেষ্টা করেনি। অন্য জাতির মনের এ পরিচয়, তাদের মধ্যে বসবাস না করলে তাদের সাহিত্য ছাড়া আর কিছুতে পাওয়া যায় না। জাতির সাহিত্য জাতির মনের দর্পণ।" এ তো খাঁটি সত্য কথা। কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করিবার পর অখণ্ড ভারতের রাষ্ট্রীয়তা-বোধ বা একাত্মতার সম্বন্ধে যাঁহারা আমাদের এত রকমে নীতি-কথাও শুনাইতেছেন, তাঁহাদের দৃষ্টি এদিকে কতখানি পড়িয়াছে। শ্রীযুত গুপ্ত আমাদিগকে এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন আশার কথা শুনাইতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে তাঁহাকে দুঃখের সঙ্গে বলিতে হইয়াছে যে, "স্বাধীন ভারতের আদি পর্বে রাজ্যগুলি পরস্পরের কাছে না এসে দূরে সরছে।" শ্রীযুত গুপ্ত মহাশয়ের মতে রাজনীতিক প্রভুত্ব-লাভের প্রয়োজনে প্রাদেশিকতার মনোভাব প্রশ্রয় দেওয়ার ফলেই এ সমস্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। কারণ, প্রাদেশিকতার মোহে জনগণের মনকে সহজে আকর্ষণ করা যায়। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি এই মনোবৃত্তিকে নিদারুণ ব্যাধি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ভারতের নানা ভাষার সাহিত্যগুলি সকল ভাষাভাষীর মধ্যে প্রচারের দ্বারাই ইহার কিছু প্রতীকার সম্ভব হইতে পারে বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমরাও অনুরূপ মত পোষণ করিয়া থাকি। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি মর্যাদা এবং মমত্ববোধকে আশ্রয় করিয়াই এ কাজটা সার্থক হইয়া উঠিতে পারে। প্রত্যুত কোন ভাষা বা সাহিত্যকে চাপা দিয়া নয়। দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙলা ভাষা এবং বাঙলা সাহিত্যকে সেইভাবে চাপা দিবারই একটা দুর্নিবার চক্র চলিতেছে। এই চক্র যতদিন চলিবে ভারতের উদার সংস্কৃতিকে ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে একাত্মতাও ততদিন সত্য হইয়া উঠিবে না। সুতরাং বাঙলা ভাষা এবং বাঙলা সাহিত্যকে যাঁহারা পিষ্ট করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা দেশ এবং জাতির প্রকৃতপক্ষে শত্রুতা সাধনেই প্রবৃত্ত আছেন। এ বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই। রাজনীতিক ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রয়োজনে মহতী বিনষ্টির দিকে এই যে গতি ইহা সর্বপ্রযত্নে নিরুদ্ধ করা একান্তই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সে প্রয়োজন শুধু বাঙলা বা বঙ্গবাসীদের জন্য নয়, সমগ্র ভারতের শক্তি বৃদ্ধি এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির জন্যও তাহা অত্যাবশ্যক।

বিহারের বাঙলা ভাষা-ভাষী অঞ্চল

সম্প্রতি মানভূমে নির্বাচন সম্পর্কিত প্রচারকার্যের উপলক্ষ্যে বক্তৃতা করিতে গিয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র

রায় আমাদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বাঙলা ভাষাকে কেহ দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না। সে ভাষার প্রাণশক্তি বিনষ্ট হইবার নয়। ফলতঃ রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি মনীষিবৃন্দের অবদানে যে ভাষা সমৃদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে পিষ্ট করিবার চেষ্টা মূর্খতারই পরিচায়ক; অথচ তেমন চেষ্টা বহুদিন হইতেই বিহারে আরম্ভ হইয়াছে। ডক্টর রায় জানাইয়াছেন যে, বাঙলা ভাষা সম্বন্ধে বিহারে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহার একটা মীমাংসার জন্য তিনি চেষ্টা করিতেছেন। এই সম্পর্কে মানভূমের জননায়ক শ্রীযুত অতুল্য ঘোষের সঙ্গেও ডক্টর রায়ের পরামর্শ হয়। বিহারের মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায়ও সেই সময় উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার ফল কি হইয়াছে জানা যায় নাই। তবে বিহারের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের একটি বিবৃতিতে দেখা যায়, ডক্টর রায় এ সম্বন্ধে যে মীমাংসা করিবেন, বিহার সরকার তাহাই মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন। প্রকৃতপক্ষে বিহারে বাঙলা-ভাষাভাষী অঞ্চল সম্পর্কিত এই প্রশ্নটি পশ্চিম বঙ্গের প্রধানমন্ত্রীর নিকট কিভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে, বুঝিবার উপায় নাই। সম্প্রতি ধানবাদের বাঙলা ভাষাভাষীদের পক্ষ হইতে এ সম্বন্ধে ডক্টর রায়ের নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করা হইয়াছে, তাহাতে সেখানে বাঙলা ভাষায় দলিলপত্র রেজেস্ট্রী করিবার অধিকারটি যাহাতে নষ্ট না হয়, সেজন্য তাঁহারা প্রার্থনা করিয়াছেন। বিহার সরকার এতদিনের ব্যবস্থা রদ করিয়া দিয়া দলিল রেজেস্ট্রী করিতে হইলে হিন্দী ভাষায় তাহা করিতে হইবে, এই বিধান প্রবর্তন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। বিহারের মন্ত্রী শ্রীযুত কৃষ্ণবল্লভ সহায় বাঙলা ভাষাভাষীদের এই সঙ্গত অনুরোধ মঞ্জুরও করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে আদেশ বাতিল করিয়া হিন্দী চালাইবার জন্য আবার উপর হইতে হুকুম আসিয়াছে। সুতরাং বাঙলা ভাষা-ভাষীদের ন্যায্য দাবীকে চাপা দিবার জন্য বিহার সরকারের জিদ যে কতখানি তাহা বেশ বোঝা যায়। এমন অবস্থায় ডাক্তার রায়ের মধ্যস্থতা এক্ষেত্রে কতটা সাফল্য লাভ করিবে, অর্থাৎ বাঙলা ভাষা-ভাষীদের অসন্তোষের কারণ দূর করিতে তিনি শেষ পর্যন্ত কতটা সমর্থ হইবেন সে সম্বন্ধে আমাদের মনে যথেষ্টই সন্দেহ আছে। বাস্তবিকপক্ষে গোঁজামিল দিয়া এ সমস্যার যে সমাধান হইবে, এমন ভরসা আমাদের নাই। ব্যক্তিগত সৌজন্যের সূত্রে সাময়িকভাবে অবশ্য একটা ব্যবস্থা হইতে পারে; কিন্তু তাহা যে দুই দিন পরেই উল্টাইয়া যাইবে, এমন আশঙ্কা ষোলআনাই রহিয়াছে। বলা বাহুল্য প্রশ্নটি নূতন নয় এবং এ সম্বন্ধে বিহারের কর্তৃপক্ষ বিবেচনা ও গবেষণা করিবার যথেষ্টই সুযোগ-সুবিধা পাইয়াছেন। জন-আন্দোলনের সম্মুখীনও তাঁহাদের হইতে হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের নীতির এবং রীতির কিছুই পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। ফলতঃ বিহার হইতে বাঙলা ভাষাকে যত রকমে সম্ভব উৎখাত করিবার অনমনীয় মনোভাব লইয়াই তাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন। ভাষাগত ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের দ্বারা এই সমস্যার স্থায়ীভাবে মীমাংসার কথা উত্থাপন করিলেই তাঁহারা অধৈর্য হইয়া পড়েন এবং কংগ্রেস-বিঘোষিত নীতির কথা তাঁহারা বিস্মৃত হন। সুতরাং, প্রশ্ন উঠে এই যে, সত্যই বাঙলা ভাষা-ভাষীদের সম্বন্ধে ন্যায্যভাবে বিচার-বিবেচনা করিবার জন্য তাঁহাদের মধ্যে আগ্রহ কি এতদিনেও দেখা দিয়াছে? তাঁহারা প্রাদেশিকতার এই বিষ হইতে বিহারের বঙ্গ-ভাষা-ভাষী অঞ্চলকে সত্যই কি মুক্ত করিতে চাহেন? যদি প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা এই প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া থাকেন, তবে সরকারীভাবেই এই সমস্যা সমাধানের জন্য অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। ডাক্তার রায়ের উপর এই সমস্যা সমাধানের ভার বিহার সরকার দিয়াছেন, ডাক্তার রায়ের সিদ্ধান্ত অবিসম্বাদিতভাবে স্বীকার করিয়া লউন, বিহার সরকার সরকারী বিজ্ঞপ্তির দ্বারা তাঁহাদের এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন, আমরা ইহাই চাই। তাহার ফলে সমস্যার স্থায়ীভাবে মীমাংসা হোক্ না হোক্ পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার সরকার এ বিষয়ে সাক্ষাৎসম্পর্কে উভয় রাষ্ট্রের দায়িত্ব আসিয়া বর্তিবে এবং ইহাতেও ভবিষ্যতের জন্য কিছু পরিমাণে আশার কারণ সৃষ্টি হইবে।

কোমাগাটামারু'র স্মৃতি

গত ২রা জানুয়ারী ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বজবজে 'কোমাগাটামারু' স্মৃতিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন। 'কোমাগাটামারু' জাহাজের আত্মদাতা শিখ বীরদের রক্তে ৩৮ বৎসর পূর্বে বজবজের মাটি সিক্ত হইয়াছিল। ভারতের মর্যাদা রক্ষার জন্য শিখ-নেতা বাবা গুরুদিৎ সিংহের এবং তাঁহার অনুগামী দলের আত্মোৎসর্গের সেই ব্যাপার ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অধ্যায়কে উজ্জ্বল করিয়াছে। বিদেশে ভারতীয়দের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য গুরুদিৎ সিংহ কোমাগাটামারু জাহাজযোগে সরাসরি কানাডার উপকূলে উপস্থিত হন। কিন্তু কালা আদমী শিখদের উপকূলভাগে অবতরণ করিতে দেওয়া হয় নাই। জাহাজখানাকে নজরবন্দী অবস্থায় ভারতে প্রেরণ করা হয়। বজবজ হইতে জাহাজের শিখদিগকে বন্দীস্বরূপে পাঞ্জাবে চালান করিবার জন্য ব্রিটিশ প্রভুদের ব্যবস্থা বাঁধা ছিল। কিন্তু শিখেরা এই অবস্থা স্বীকার করিয়া লইতে সম্মত হন নাই। তাঁহারা পদব্রজে কলিকাতায় আসিতে প্রবৃত্ত হন। আত্মমর্যাদার উপর আঘাতে বিক্ষুব্ধ শিখদের কলিকাতা আসিবার উদ্যোগে বাঙলার কর্তারা বিচলিত হইয়া পড়েন। বজবজের পথে শিখ বীরদের উপর গুলী বর্ষিত হয় এবং 'কোমাগাটামারুর' বীর যাত্রীদের রক্তে রাজপথ সিক্ত হয়। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পাঞ্জাবের আত্মদাতা সন্তানদের সঙ্গে বাঙলার মুক্তিকামীদের মিলনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নাই। সেই মিলনের পরিণতিতে ভারতের ইতিহাসে বিপ্লবের ব্যাপক এক রক্তসিক্ত অধ্যায় উন্মুক্ত হয়। পাঞ্জাব এবং বাঙলার বীর সন্তানেরা দলে দলে ফাঁসিকাষ্ঠ বরণ করিয়া লন। গদর আন্দোলনের ফলে ভারত স্বাধীনতালাভ করে নাই সত্য; কিন্তু স্বদেশের স্বাধীনতার বেদীমূলে সেদিন যাঁহারা অম্লান বদনে আত্মদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শোণিতোৎসর্গ নিরর্থক হয় নাই। প্রত্যুত ভাবাদর্শের সেই বলিষ্ঠ প্রেরণাই ভারতের আত্মাকে জাগ্রত করিয়া তোলে। পশ্চিম বাঙলার বুকে 'কোমাগাটামারু'র স্মৃতি বাঙলার বিশিষ্ট সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের এক ভাস্বর মূর্তিই প্রদীপ্ত রাখিবে এবং সকল সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে মানবের অধিকার ও মর্যাদার মহিমা ঘোষণা করিবে।

কাল-কলম

দিনেশ দাস

আমি কবি
কী চেয়েছি তোমাদের কাছে?
শোনাব আমার গান
শুনব তোমার সুর যতটুকু আছে—
এর বেশি কী চেয়েছি তোমাদের কাছে?

সেটুকু কি দিয়েছ আমায়?
তোমার কাগজ হ'তে প্রতি ভোরে কাঁচা রক্ত ট'পে পড়ে
আমার চায়ের পেয়ালায়ঃ
ভাত-রুটি তেতো হয় রোজ
জীবনের স্বর্ণমৃগ কোথায় নিখোঁজঃ
নাই
সন্ধ্যার স্ফটিক-রোশনাইঃ
একাকার
ঘন অন্ধকার।

প্যারাসুটে নামিনি তো নীচে
এ মাটির চারা আমি, জানি আমি নিজে
এ গহন অরণ্যেরও পথ আছে—
দুধের ধারার মত সরু মেঠো পথ,
আশার শপথ।

জানিনা সে কোন্ কালে—মহাসাগরের কোন্ কূলে
বোতলের প্রেত এক ছাড়া পেয়েছিল ছিপি খুলে,
সেই দানো
প্রতিদিন দুঃসহ ভুখায়
লোহার চামচ দিয়ে পৃথিবীর মাংস কুরে খায়।

মুমূর্ষু সামন্ত যুগ মরণের দিন গোনে
ছড়ায় মৃতের শ্বাস সামনে পিছনে,
নিজে পোড়ে
আমাদের ধমনীতে মৃতরক্ত ফোঁড়ে,
ম্লান মূক
জীবনের পানপাত্রে রেখে যায় বিষের চুমুক।

যুগের সন্ধিক্ষণ
প্রত্যাশা প্রদীপ শিখা জেবলেছে কখন
মানুষের স্বপন আজ সত্য হ'য়ে ছন্দ হ'য়ে ঝরে
জীবনের সোনার নির্ঝরে।

এপাড়া ওপাড়া
শুনেছি ভোরের সাড়া,
সবুজ শিশিরঃ
পৃথিবীর মৌচাকে
ঝাঁকে ঝাঁকে
অসংখ্য মৌমাছি ওড়ে পবিত্র যৌথ গুঞ্জরণে।

এই রক্ত-সরোবর হ'তে একদিন
জাগবে জলের গান,
সোনালী মধুর মত প্রশান্তি আরাম
আমার পুরোনো ঘরে ফাঁপা দেহলিতে—
খাতার প্রীতির গিঁটে—কলমে-কালিতে।

জাহাজে যে ক'দিন ছিলুম রোজ দু' একবার ও'র কাছে গিয়ে বসতুম। ভদ্রমহিলা নিজের থেকেই একদিন বললেন, "আপনি যেন না আবার ভাবেন আমি আপনার এক বোঝা হয়ে উঠলুম। যাঁদের সঙ্গে হৈহল্লা করতে আপনি ভালোবাসেন তাঁদের বাদ দিয়ে আমার সঙ্গে বেশী সময় কাটাবার কোনো প্রয়োজন নেই।"

আমি আপত্তি জানালুম।

তবু তিনি শান্তভাবে লাউঞ্জে আপন কোণে বসে থাকতেন; কথা বলার জন্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার কোনো চেষ্টাই করতেন না। আমি কাছে গেলেই মিষ্টি হেসে বলতেন, "বসুন"; তার পর শুধাতেন কি খাবেন বলুন।" জাহাজে খাবার ব্যবস্থা কুলীন শ্বশুর বাড়ীর মত কাজেই এস্থলে "খাবার" বলতে পানীয়ই বোঝায়।

আমি একদিন বললুম, "প্রতিবারেই আপনি আমাকে কিছু একটা খেতে বলেন কেন, বলুন তো?"

অবাক হয়ে বললেন, "কী আশ্চর্য! আপনি মেশেদে অর্থাৎ লন্ডনে আমার বাড়ীতে এলে আপনাকে ভালোমন্দ খেতে দিতুম না?"

আমি বললুম, "কিন্তু এটা তো আপনার বাড়ী নয়।"

তিনি বললেন, "সে কি কথা। আমার কাছে এলেন তার মানে আমার বাড়ীতে এলেন।"

তারপর বললেন, "কিন্তু এখানে খেতে দিই বা কি? আচ্ছা বলুন তো, আপনি জাহাজের এই বিলিতি রান্না খেতে ভালোবাসেন?"

আমি বললুম, "এ জাহাজের রান্নার খুশনাম আছে; আমি কিন্তু আমাদের দিশী রান্নাই পছন্দ করি।"

হেসে বললেন, "তবে আপনার রসবোধ আছে। এই আইরিশ স্টু আর বাঁধাকপি সেদ্ধ মানুষ কি করে খায় খোদায় মালুম। সেদিন আবার পোলাও রেঁধেছিল—মাগো! ছিরি দেখে ভিরমি যাই।"

আমি শুধালুম, "মেশেদের লোক পোলাও খায়?"

বললেন, "হায়, জাহাজে আপন রান্না-বান্নার ব্যবস্থা নেই তা না হলে আপনাকে এ্যসা পোলাও খাইয়ে দিতুম যে জীবনভর তার সোয়াদ জিভে লেগে থাকত। ভালো কথা, আপনি তো বোম্বাই যাচ্ছেন সেখানে আপনাকে আচ্ছাসে পোলাও খাইয়ে দেব।"

আমি বললুম, "আমি তো ভেবেছিলুম আপনি মিশর যাচ্ছেন।"

তিনি বললেন, "ওঃ, আপনাকে বলিনি বুঝি, আমি বোম্বাই যাচ্ছি—আমার মেয়ের সেখানে বিয়ে হয়েছে। যে ভদ্রলোক আপনাকে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন তিনি আমার স্বামীর বন্ধু। উনি বিপদে আপদে সাহায্য করতে পারবেন বলেই এই জাহাজে যাচ্ছি।"

তারপর একটুখানি লাজুক হাসি হেসে বললেন, "আমি যে দিদিমা হতে চললুম।"

তারপর রোজই গল্প হত তাঁর মেয়ের সম্বন্ধে। আমাকে কতবার জিজ্ঞেস করলেন, বোম্বাইয়ে ভালো ডক্তার-বদ্যির ব্যবস্থা আছে কি না। আমি বলতুম, লণ্ডনের মত না তবে ব্যবস্থা মেশেদের চেয়ে নিশ্চয় ভালো। ইস্তেক জার্মানীতে পাশ করা ইহুদী ডাক্তারও বোম্বাইয়ে আছে।

বললেন, "ও কথা বলবেন না, মশাই; মেশেদে আমাদের যে বুড়ী ধাইমা ছিলেন তাঁর হাতে কখনো কোনো পোয়াতী মরেনি, কোনো বাচ্চা কোনো জখম নিয়ে জন্মায়নি। আর তাঁর সব কেরদানি তো শুদ্ধমাত্র দুখানা খালি হাত দিয়ে—ডাক্তারদের যন্তরপাতির তো উনি ধার ধারতেন না।"

আমি বললুম, "আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে এখনো এ রকম ধাই আছেন তবে বোম্বাই শহর সেখানে সায়েব-সুবোদের ব্যাপার।

উৎসাহিত হয়ে বললেন, "আপনি ঠিক ধরেছেন কিন্তু আজকের দিনের বড় শহরে কেউ আর একথা মানে না। আমার মেয়েকে চিঠিতে ঐ কথা লিখেছিলুম, সে তো হেসেই উড়িয়ে দিল।"

চুপ করে থেকে বললেন, "আর দেবেই না কেন? ওর ছেলে বেলা ও মেশেদে কাটিয়েছে কিন্তু মেশেদের জন্য তো এতটুকু দরদ নেই। আমার স্বামীরই মত, লণ্ডন প্যারিসের নামে অজ্ঞান।

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, "আপনি এ নিয়ে এত শোক করেন কেন? সে সব কাল গেছে, জমানা বদলে গিয়েছে; এখনও মানুষ আঁকড়ে ধরে থাকবে নাকি মেশেদ-কারবালা, কান্দাহার-হিরাত?"

বললেন, "কেন, আপনি তো পারিস ভিয়েনা লণ্ডন বার্লিন দেখেছেন—তবু তো ফিরে যাচ্ছেন কোথাকার এক ছোট শহরে।"

আমি ঘাড় চুলকে বললুম, "আমার যে মা রয়েছেন।"

বললেন, "একই কথা; মা যা মায়ের শহরও তা।"

* * * * *

বোম্বাইয়ে জাহাজ ভিড়েছে। এক সুন্দরী তরুণী আর ছোকরাকে দেখে আমার পরিচিতা মহিলা আকুল হয়ে উঠলেন। তাঁরা জাহাজে উঠতেই তিনজনে জড়াজড়ি কোলাকুলি। আমি একটুখানি কেটে পড়লুম।

তা হলে কি হয়, আমার নিষ্কৃতি নেই। আমাকে পাকড়ে ধরে নিয়ে মেয়ে জামাইকে বার বার বলেন, "এই আমার বন্ধু, দিল জানের দোস্ত, আমার সঙ্গে ফার্সী কথা কয়েছে, ফুর্তি-ফার্তি হৈ হল্লা ছেড়ে দিয়ে।"

মেয়ে যতই জিজ্ঞেস করে, জাহাজে ছিলে কি রকম, খেলে কি, বাবা কি রকম আছেন, কেবা শোনে কার কথা সত্য সত্যই জাহাজে যেন 'সমুদ্রে রোদন'। তিনি বার বার বলেন, "বুঝলি, নয়মি, একে আচ্ছাসে খাইয়ে দিতে হবে। পোলাওর সব মালমশলা আছে তো বাড়ীতে?"

ভেবেছিলুম হোটেলে উঠব। মহিলা শোনামাত্র আমাকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চললেন তাঁদের সঙ্গে; আমাকে কড়া নজরে রাখলেন কাস্টম অফিসে, যেন আমি চোরাই মদ—পাছে কাস্টমস্ আমাকে পাকড়ে নিয়ে যায়।

তিন দিন তাঁদের সঙ্গে থেকে অতি কষ্টে নিষ্কৃতি পাই।

সে তিন দিন কি রকম ছিলুম। মাছ যে রকম জলে থাকে। ভুল বলা হল; মাছকে যদি শুধান, 'কি রকম আছ?' তবে সে বলবে, 'সৈয়দের ব্যাটা যে রকম ইহুদি পরিবারে ছিল।'

চক্রদত্ত

আমেরিকার নবতম মারণাস্ত্র বি-৬১, একে 'ম্যাটাডোর'ও বলা হয়। এটি চালকবিহীন জেট বিমান। ম্যাটাডোরের গতি ঘণ্টায় ৭০০ মাইল। ভবিষ্যতে যুদ্ধের সময় এটি বেশ কার্যকরী হবে কারণ যদি এর মধ্যে এ্যাটোমিক বোমা পুরে কোনও নির্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশে ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে

ম্যাটাডোরটি ছাড়বার ব্যবস্থা করা হচ্ছে

অনায়াসেই ঐ স্থানের ধ্বংস সাধন হবে। এটি এত দ্রুতগতি বিশিষ্ট যে, অন্য কোনও শক্তিশালী বিমান একে ধরতে পারবে না আর নীচে থেকে কোনও কামান দেগেও একে ঘায়েল করা যায় না। এটি রেডিও চালিত হওয়ার দরুণ এটাতে কোনওরকম চালক থাকে না বলে খুব বেশী ওপরে ওঠার দরকার হয় না। অবশ্য খুব বেশী দূর পর্যন্ত এটি রেডিও দ্বারা চালনা করা যায় না বলে এর সঙ্গে আর একটি প্লেনের দরকার হয়। এই প্লেনটি একটি নিরাপদ স্থানে থেকে 'ম্যাটাডোর'কে তার নির্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশে রেডিওর সাহায্যে চালিত করে।

*

রোগের চিকিৎসা করার চেয়ে রোগ ধরাই কঠিন। বিশেষতঃ ক্যান্সার রোগ শরীরের কোন অংশে হয়েছে এবং আদৌ হয়েছে কিনা ধরতে পারাই কষ্টকর। মাথার খুলির মধ্যে মস্তিষ্কে অনেক সময় ক্যান্সারের টিউমার হয় আর এরকম হলে রোগ ধরা বোধহয় কোনওমতেই সম্ভব নয়। বোস্টন শহরের ম্যাসাচুসেট জেনারেল হাসপাতালে একটি রোগী ভর্তি হয়। তার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে মাথার যন্ত্রণা এবং সর্বদা বমি বমি ভাব হতো। ডাক্তার আন্দাজ করলেন যে, এর মগজের মধ্যে টিউমার হয়েছে কিন্তু সেটা রঞ্জনরশ্মির সাহায্যেও খুঁজে বার করা সম্ভব হলো না। ডাক্তারেরা তখন রোগ খুঁজে বার করার জন্য পরমাণুকে কাজে লাগালেন। রোগীর ধমনীতে তেজষ্ক্রিয় গুণসম্পন্ন ফসফেট সলিউশন ইনজেক্‌শন করা হলো। এটি তেজষ্ক্রিয় হওয়ার দরুণ মস্তিষ্কের গভীরতম অংশে প্রবেশ করতে পারে। এছাড়া এই টিউমারও ফসফরাসকে আকর্ষণ করে অতএব ফসফরাসের তেজষ্ক্রিয় কণাগুলি যেখানে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হবে, বোঝা যাবে যে, সেইখানেই টিউমারটির অবস্থান। এখন এই ফসফরাস কোথায় গিয়ে জমা হয়েছে তাই দেখা দরকার। 'গিগার কাউনটার' নামে একটা নতুন যন্ত্র বার হয়েছে এটি ফসফরাসের তেজষ্ক্রিয় কণাগুলি কোথায় জমা হয়েছে তা খুঁজে বার করতে পারে। গিগার কাউনটারটি একটি সূক্ষ্ম সূচাগ্র বিশিষ্ট যন্ত্র। এটি ধীরে ধীরে মগজের মধ্যে প্রবেশ করাতে হয় এর সঙ্গে ফসফরাসের অবস্থিতি বোঝানর জন্য বৈদ্যুতিক আলোক সংকেতের ব্যবস্থা থাকে। এবং গিগার কাউনটার মস্তিষ্কের গভীরতম প্রদেশের অংশে পৌঁছান মাত্র যদি আলোক সঙ্কেত তেজষ্ক্রিয়া ফসফরাসের অবস্থিতি জ্ঞাপন করে তখনই ডাক্তাররা বুঝতে পারেন যে, টিউমারটি কোথায়। অবশ্য সুস্থ অংশেও তেজষ্ক্রিয় ফসফরাস থাকতে পারে কিন্তু টিউমার যেখানে থাকে সেখানে এই ফসফরাস কণাগুলি প্রায় ত্রিশ গুণ বেশী আকৃষ্ট হয়। এর জন্যই আলোক সঙ্কেতের কম বেশী অনুসারে টিউমারের অবস্থিতি বোঝা যায়। এই ফসফরাস পদ্ধতির পূর্বে মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ জর্জ মুর তেজষ্ক্রিয় আইওডীনের সাহায্যে শরীরের অভ্যন্তরস্থিত টিউমার খুঁজে বার করতেন।

*

দৈবের বিড়ম্বনায় যাদের ক্রাচ্ ব্যবহার করতে হয় তাদের অসুবিধার অন্ত নেই। সাধারণতঃ কাঠের ক্রাচই দেখা যায়। আজকাল‌কার নতুন আবিষ্কৃত এলুমিনিয়ম ক্রাচই সবচেয়ে ভাল বলা যেতে পারে। এই ধরণের ক্রাচটি ছোটবড় করা যায় আর পিছলে যাওয়ার কোনও ভয় থাকে না। বিশেষতঃ এটি কাঠের ক্রাচের চেয়ে ওজনে অনেক হাল্কা। এর ওজন একসেরের চেয়েও কম। এটি খুব শক্ত ধরণের এলুমিনিয়ম দিয়ে তৈরী—ভেঙ্গে যাওয়ার ভয় নেই। সবচেয়ে সুবিধা এই যে, কাঠের ক্রাচ ব্যবহার করলে বগলের নীচে যে রকম চাপ পড়ে এবং ক্রমে কড়া পড়ে যায় এতে সেরকম চাপও লাগে না এবং কড়াও পড়ে না।

*

প্রস্তর যুগ, লৌহ যুগ, পার হয়ে এখন যে যুগে পৌঁছেছি তাকে প্লাষ্টিক যুগ বলা যায়। জিনিসপত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার সময় সেগুলোকে জল রোদ ও ধুলোর থেকে রক্ষা করার জন্য আমরা সাধারণতঃ ক্যানভাসের ত্রিপল আচ্ছাদন হিসাবে ব্যবহার করি। এখন এর বদলে প্লাস্টিকের ত্রিপল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই আচ্ছাদনটি ভিনাইল ক্লোরাইড্ দিয়ে তৈরী হয়। এই ত্রিপলের চাদর এক ইঞ্চির আট হাজার ভাগের এক ভাগ মত পাত্‌লা আর সাধারণ ত্রিপলের চেয়ে ওজনে অনেক হাল্কা। এত পাতলা হওয়া সত্ত্বেও এই প্লাস্টিকের চাদর ঘণ্টায় ষাট মাইল গতিসম্পন্ন ঝড়েও নষ্ট হয় না। তাছাড়া অত্যধিক ঠাণ্ডা বা অত্যধিক গরমেও এর কোন ক্ষতি হয় না। কোনও যন্ত্রপাতি যদি প্লাস্টিকের ত্রিপলে ঢেকে বাইরে রেখে দেওয়া যায় তাহলে সাধারণ ত্রিপলে ঢাকলে যেমন থাকতো তার চেয়ে অনেক ভাল থাকে। অনেক সময় আবার এই চাদরে এমন একটা জিনিস লাগান হয় যার ফলে লোহার যন্ত্রপাতি ঢেকে রাখলে তাতে মরচে ধরতে পারে না।

*

হার্ণিয়া চিকিৎসার একটা নতুন পদ্ধতি বার হয়েছে। 'টেনটালুম' নামক একটি ধাতু নির্মিত খুব সরু তারের জাল দিয়ে যদি শরীরের অভ্যন্তরস্থ হার্ণিয়াটি ঘিরে রাখা যায় তাহলে সেটি আর বাড়তে পারে না এবং পরে অস্ত্রোপচারের খুব সুবিধে হয়। আর এক রকমভাবে ঘিরে রাখবার জন্য এটা শরীরের ঐ স্থানের অন্য কোনও টিস্যু বৃদ্ধি নষ্ট করে না অথবা শরীরের ভেতর থাকার দরুণ এই জালটিও নষ্ট হয় না।

(১)

বৈঠকখানা ঘরের বড় ঘড়িটা একটানা বেজেই চলেছে ঢং ঢং ঢং ঢং। ও মা আরো যে বাজে। আবার বুঝি আগের মত বিগড়েছে ঘড়ি। বারোটা না বাজবার আগে আর থামবে না। কিন্তু এদিকে বাইরের অন্ধকার পাতলা হয়ে এসেছে। ভুবনময়ী শিয়রের জানলা দিয়ে একবার তাকিয়েই তা টের পেলেন। ভোর হয়ে এল বলে। চারটে নাকি সাড়ে চারটেই বাজল। কিন্তু ঘড়ির বাজনার শব্দে তা বুঝবার জো নেই। না থাকলো জো। সময় বুঝবার জন্যে ভুবনময়ীকে ঘড়ির দিকে তাকাতে হয় না। ঘড়ির শব্দে কানও পাততে হয় না তাঁকে। সময় তিনি অমনিতেই টের পান। ঠিক তিনটের সময় রোজই তাঁর ঘুম ভাঙে। আজও তাই ভেঙেছে।

ঠিক যা ভেবেছেন। বারো বার শব্দ করবার পর ঘড়িটা থামল। আবার মাসখানেক হোল বিগড়েছে। বাড়িতে এত লোক। কিন্তু এ ঘড়ি তেমন ভালো করে মেরামত করবার দিকে কারো ঝোঁক নেই। এ ঘড়ির জন্যে তো কেউ অপেক্ষা করে না। জনে জনে ছেলে-বুড়ো অনেকের হাতেই এখন ঘড়ি হয়েছে। তারা সেই হাত-ঘড়ি দেখেই কলেজে যায় অফিসে যায়। দেয়াল-ঘড়ির দিকে কারো তাকাবার দরকার হয় না।

ছেলে বৈদ্যনাথ বলেছিল, 'মা, এবার ঘড়িটাকে ওখান থেকে সরিয়ে ফেলি।'

ভুবনময়ী বলেছিলেন, 'সরিয়ে ফেলবি কেন। সারিয়ে আন।'

বৈদ্যনাথ বলেছিল, 'কতবার সারালাম। ও আর ঠিক হবে না।'

ভুবনময়ী জবাব দিয়েছিলেন, 'না হয় না হোল। তবু ও ঘড়ি ওখানেই থাকবে। খবরদার ওতে পাছে হাত দিস। ও তাঁর হাতের জিনিস।'

ছেলে তা জানে। তাই আর কোন কথা বলেনি।

কর্তার নিজের হাতে কেনা ঘড়ি। সেই থেকে আজ কুড়ি বছর ধরে ওই একই জায়গায় ঘড়িটা রয়েছে। তাঁর হাতের জিনিস। কেবল কি ওই ঘড়ি। বাড়ি ভরেই তো তাঁর হাতের জিনিস ছড়ানো। জিনিস পড়ে থাকে। শুধু মানুষ থাকে না।

ভুবনময়ী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। কতকাল হয়ে গেল চলে গেছেন। যাওয়ার আগে বলেছিলেন, 'ভেব না, তোমাকেও দু'দিন বাদে টেনে নেব।'

ওগো, এই বুঝি তোমার দু' দিন। যুগ-যুগান্তর হয়ে গেল যে। আর কতকাল ফেলে রাখবে, আর কতকাল ভুলে থাকবে।

কিন্তু ভুবনময়ী নিজেও কি ভুলে থাকেন নি? কই কয় সময় তাঁর কথা মনে পড়ে, তাঁর মুখ মনে পড়ে। মনে পড়বার কি জো আছে? একপাল শত্তুর যে তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। কেবল বাঁধন, কেবল বাঁধন। 'লোহার বাঁধনে বেঁধেছে সংসার, দাস-খত লিখে নিয়েছে হায়।' তিনি গাইতেন। ভারি চমৎকার ছিল গলা।

কিন্তু মেয়েটার কাণ্ড দেখ। শোওয়ার ছিরি দেখ ওর।

'ও মিণ্টু, পা টা একেবারে আমার গলার ওপর তুলে দিলি নাকি, এ্যাঁ? মেরে ফেলবি নাকি আমাকে? বজ্জাত মাগী। আট উৎরে ন' বছর বয়স হোল তোমার, তবু শোওয়া ঠিক হোল না?'

নাতনী মিণ্টুর পা-টা একটু রাগ করেই সরিয়ে দিলেন ভুবনময়ী।

একতলার ঘরের মেঝেয় ঢালা বিছানা। ডাইনে বাঁয়ে ছোট বড় নানা বয়সী ডজনখানেক পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী নিয়ে ভুবনময়ীকে রাত কাটাতে হয়। দিনটাও এদের পরিচর্যায় আর রাগারাগি চেঁচামেচিতেই কাটে। আচ্ছা ফ্যাসাদ হয়েছে যা হোক। একটুকাল নির্জনে শান্তিতে বসে দু' দণ্ড যে ঠাকুর-দেবতার নাম করবেন, তা হবার জো নেই। সে পথে কাঁটা দিয়েছে শত্তুররা। সব শত্তুর, সব শত্তুর। নিজের পেটে হয়েছিল দুটি। তাদের ভিতর থেকে কতগুলি বেরিয়েছে দেখ। রাবণের বংশ।

ঠাকুরমার ধাক্কা খেয়ে মিণ্টুর ঘুম ভেঙে গেছে; অভিমানে সে খানিকটা দূরে সরে গিয়ে একটুকাল চুপ করে রইল, তারপর বলল, 'আমার পা-টা মুচড়ে দিলে কেন ঠামা?'

ভুবনময়ী বললেন, 'ঈস মুচড়ে কেন, একেবারে ভেঙে দিয়েছি। দিয়েছি তো বেশ করেছি। যা, কাল থেকে আমার কাছে আর থাকিসনে। আসিসনে আর এ-ঘর শুদ্ধু। নিজের বাপ-মার কাছে থাকিস। মা'র-গুতো খাওয়ার জন্যে পরের কাছে এসে দরকার কি। বেশ মজা পেয়েছে তোদের বাপ-মারা। বছর বছর একটি করে হবে আর এক-একটিকে নিচের ঘরে ঠেলে পাঠাবে। নিজেরা আরামে নাক ডেকে ঘুমুতে পারলেই হোল। আর কেউ সারা রাতের মধ্যে চোখের পাতা এক করতে না পারুক তাতে কার কি এসে যায়। হ্যাঁরে মিণ্টু, সত্যিই লেগেছে নাকি তোর পায়ে? দেখি আয় দেখি এদিকে।'

এবার মিণ্টু সরে এসে সাদরে ঠাকুরমার গলা জড়িয়ে ধরল, 'একটুও লাগেনি ঠামা। একটুও না। আমি অমনি অমনি বলছিলাম।' তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'আজ কি হবে জানো ঠামা?'

ভুবনময়ী বললেন, 'এই মুখ সরা, মুখ সরা। অমন করিসনে মিণ্টু আমার শুড়-শুড়ি লাগে। সরু বলছি কানের কাছ থেকে।'

এপাশে ওপাশে নাতি-নাতনীর দল খিল খিল্ করে হেসে উঠল। শুড়-শুড়ি কথাটাই তাদের শুড়-শুড়ি দিয়েছে।

মিণ্টু কিন্তু মুখ সরাল না। ঠাকুরমার কানের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে তেমনি ফিস্ ফিস্ করেই বলল, 'জানো ঠামা আজ নান্তুদা আসছে। দিল্লী থেকে নান্তুদা আসছে আজ। মনে আছে তোমার?'

ভুবনময়ী বললেন, 'না আমার মনে নেই, তোমার মনে আছে। রাত তিনটেয় ঘুম

ভাঙতেই সে কথা আমার মনে পড়েছে। নান্তু আসবে, সে কথা আমার মনে নেই। শোন কথা।'

অন্তু সন্তু টুলু বুলুর দল কল্ কল্ করে উঠল, 'আমাদের সকলেরই মনে আছে। নান্তুদা আসবে, সে কথা কালও তো আমরা বলা-বলি করতে করতে ঘুমালাম। মিণ্টুই তো আগে ঘুমিয়ে পড়েছিল।'

মিণ্টু প্রতিবাদ করল, 'এই মিথ্যে কথা বলবিনে,—'

ভুবনময়ী ধমক দিলেন, 'হ্যাঁ, এই নিয়ে ঝগড়া কর সক্কালবেলা। আর সারাদিন মারামারি, কাটা-কাটি করে মর। একটা ভালো কথা, কি কোন ঠাকুর-দেবতার নাম তো কোন দিন মুখে নিয়ে উঠবিনে। বাপ-মার যেমন শিক্ষে, তেমন তো হবে। আর তোদের পাল্লায় পড়ে, তোদের সংসর্গে থেকে আমারও জপ-তপ, শিক্ষা-দীক্ষা সব গেছে। দুর্গা, দুর্গা।'

বিছানা ছেড়ে এবার উঠে পড়লেন ভুবনময়ী। ফের তাড়া দিলেন নাতি-নাতনীদের, 'আর গড়া-গড়ি করিসনে। ওঠ এবার উঠে বিছানা তোল।'

খিল খুলে ভুবনময়ী বেরুলেন ঘর থেকে। সামনেই মেয়ের সঙ্গে দেখা। দোতলা থেকে ভুবনময়ীর মেয়ে বাসন্তী নেমে এসেছেন।

মেয়েকে দেখে ভুবনময়ী একটু যেন থমকে দাঁড়ালেন, 'ও বাসি, তুই আবার এত ভোরে উঠলি কেন। তোর না শরীর খারাপ। জ্বর জ্বর হচ্ছে কদিন ধরে। কেন উঠলি তুই। যা আর একটু শুয়ে থাক গে যা।'

তেতাল্লিশ উৎরে চুয়াল্লিশে পা দিয়েছে বাসন্তী। তাঁর বড় ছেলের বয়সই এখন ছাব্বিশ। কিন্তু মার ধমকাবার ধরণ দেখ। বাসন্তী যেন এখনও তের চোদ্দ বছরের সেই ছোট্ট মেয়েটি রয়ে গেছেন। অসময়ে বিছানা থেকে উঠে এসেছেন বলে মা ফের তাই ধমকে শুতে পাঠাচ্ছেন ঘরে। না, সেই ছোট্টটি তিনি আর নেই। অনেক বয়স হয়ে গেছে। যতটা না বয়স হয়েছে তার চেয়ে বেশি বুড়ো দেখায়। এমনকি স্বামী অবনীমোহন পর্যন্ত সেই খোঁটা দেন। কিন্তু শুধু মার কাছে দাঁড়ালেই, মার সামনে দাঁড়ালেই নিজের বয়সের কথা আর মনে থাকে না। মনে হয়, সেই ছোট্টটিই আছি।

মার কথার জবাবে বাসন্তী বললেন, 'না উঠলে চলবে কেন মা। কত কাজ পড়ে রয়েছে। ঝি আসছে না ক'দিন ধরে। এক-রাশ বাসন পড়ে আছে কলতলায়।

ভুবনময়ী চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বাসন পড়ে রয়েছে তার তুই কি করবি। রোগা শরীর নিয়ে তুই বুঝি মাজতে বসবি সারা গুষ্টীর ওই এঁটো বাসন। কেন বাড়িতে আর লোক নেই? আর কেউ না থাকে তোর নিজের মেয়েগুলিতো আছে। তাদের ডেকে দে। তারা এসে বসুক বাসন মাজতে। মেয়েগুলিকে ডাক, মেয়েগুলিকে ডাক। তাদের আর বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াস নে। আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে পরকাল নষ্ট করিসনে তাদের।'

বাসন্তী মৃদু হাসলেন, এখনো তাঁকে বেশ সুন্দর দেখায় হাসলে। রঙ তেমন ফর্সা নয়, কিন্তু মুখের গড়নটুকু বেশ মিষ্টি। রোগে ভুগে ভুগে আর বেশি সন্তান হয়ে হয়ে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়েছে। চোয়ালের আর চিবুকের হাড়গুলি দেখা যায়। তবু কিসের একটু লাবণ্য যেন একেবারে যাই যাই করেও যায়নি। বাসন্তী মার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'আমি যেন আমার মেয়েদের আহ্লাদ দিচ্ছি মা। আর তুমি তোমার মেয়েকে কি করছ। তুমি তোমার মেয়েকে কিভাবে বড় ক'রে তুলেছ। সেই তুলনায় আমি ওদের কি করি, কতটুকু করতে পারি। তোমার নাতি-নাতনীরা বলে কি জানো, তুমি শুধু আমাকেই ভালোবাস, ওদের বাস না', বলে বাসন্তী ফের একটু হাসলেন।

কিন্তু ভুবনময়ী হাসলেন না, খানিকক্ষণ মুখ গম্ভীর করে রইলেন। তারপর রূঢ় কণ্ঠে বললেন, 'কেবল ওদের কেন, তোমারও সেই ধারণা। তা আমার জানতে বাকি নেই বাছা, ভালবাসিইতো না। কেন বাসব। মেয়ের পেটের ছেলেমেয়ে। তারা আমার কে। তাদের ভালোবাসলে আমার কোন্ গুণ দেবে। দূরে দূরে চোখের আড়ালে থাকলে ছ' মাস বছরেও তো একবার দেখা সাক্ষাৎ হোত না। নেহাৎই কাছে আছি, কাছে রেখেছি, তাই ভোরে উঠেই মুখ দেখতে হয়।' ভুবনময়ী এর পর গলার স্বর বদলাইলেন আমি ভালোবাসিনে ওদের, এই কথা তুই বললি। পেটের মেয়ে হয়ে এই খোঁটা তুই দিলি আমাকে। যাদের জন্যে দিনরাত আমার এক ফোঁটা অবসর নেই, মুখে ভাত নেই, চোখে ঘুম নেই, তাদের নাকি আমি ভালোবাসিনে, তাদের নাকি আমি দেখতে পারিনে। ভগবান তুমিই শোন, তুমিই শোন।

ভুবনময়ীর আক্ষেপোক্তি উচ্চ থেকে উচ্চতর হতে লাগল। এঘরে ওঘরে বাড়ির সবাই জেগে উঠল। কেউ কেউ মুখ বাড়াল জানালা দিয়ে।

বাসন্তী অপ্রতিভ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আচ্ছা জ্বালা হয়েছে এই বুড়ো মাকে নিয়ে। এঁর সঙ্গে কথা বলাও বিপদ। বাসন্তী বা কোন ধরণে কথাটা বললেন, আর মা তার জবাবে কি শুরু করলেন দেখ। বুড়ো মার সামনে দাঁড়িয়ে মুহূর্তকাল আগে তাঁর স্নেহের কথা ভেবে বাসন্তীর মন মাধুর্যে স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছিল। এখন সেই মনেই বিরক্তির আর সীমা রইল না। ঝকমারি করেছেন বাসন্তী মার সঙ্গে কথা বলে। আর কক্ষণো কথা বলতে যাবেন না।

সিঁড়ি বেয়ে ততক্ষণে আর একটি মহিলা নিচে নেমে এসে দুজনের পাশে দাঁড়ালেন, 'কি হয়েছে মা?' মেয়ে নয়, ছেলের বউ। পরের মেয়ে, তবু তার মুখের মাতৃ সম্বোধন ভুবনময়ীর কানে এই মুহূর্তে নিজের মেয়ের মা ডাকের চাইতেও বেশি মধুর লাগল। তিনি মুখ তুলে নালিশের ভঙ্গিতে বললেন, 'শোন, তোমার ননদ কি বলছে। আমি নাকি ওর ছেলেমেয়েদের ভালোবাসিনে, শুধু তোমার ছেলেমেয়েদেরই সোহাগ আদর করি।'

বাসন্তী প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'ওকথা আবার আমি কখন বললাম মা। সকাল বেলা তুমি কেন কতকগুলি মিথ্যে কথা বানিয়ে বানিয়ে বলছ আমার নামে। তোমার উদ্দেশ্যটা কি। তুমি কি চাও এবাড়ি ছেড়ে আমরা চলে যাই?

কনকলতা বাথরুমের দিকে এগুচ্ছিলেন, 'ননদের কথায় এবার ফিরে দাঁড়ালেন, 'তারপর অনুত্তেজ আর অনুচ্চ গলায় বললেন, 'যাওয়া যাওয়ির কি হোল ঠাকুরঝি। অবনীবাবু তো এ বাড়িতে ঘর-জামাই হয়ে নেই যে, কিছু একটু হলেই পান থেকে চুণ খসলেই তোমরা সব উঠে যাবার ভয় দেখাবে। ভাড়াটে বাড়ি। ভাড়া দিয়ে তোমারাও আছ, আমরাও আছি। সকলেরই সমান অধিকার। যাওয়ার কথা উঠল কিসে। আসল কথা তো নিজেরা ওঠা নয়, উঠে যেতে বলা। এবাড়ির খোঁজ এনেছিলেন অবনীবাবু, বাড়িওয়ালার সঙ্গে তাঁরই খাতির নাতির বেশি। তোমরা কেন উঠবে, উঠতে হয় আমরাই উঠে যাব'।

বাসন্তী স্থির দৃষ্টিতে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বউদি, তুমি আবার কেন এলে আমাদের কথার মধ্যে।'

কনকলতা বললেন, 'শুধু তোমাদের কথাই যদি হোত ঠাকুরঝি, তাহলে কথা বলতে আমি আসতাম না।' নিজের গায়ে না লাগলে কার বাঁ পায়ে যায় কথা বলতে।'

ধীরে ধীরে পা ফেলে কনকলতা চৌবাচ্চার দিকে এগিয়ে গেলেন।

ঠিক মুখের মত জবাব দিতে না পেরে বাসন্তী রুদ্ধ আক্রোশে একটুকাল কনকলতার সেই গমনভঙ্গির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কনকলতা বাসন্তীরই সমবয়সী এবং প্রায় সমসংখ্যক সন্তানের জননী। কিন্তু কনকলতার চেহারা দেখলে মনেই হয় না যে, সত্যিই অতগুলি ছেলেমেয়ে তাঁর হয়েছে। কনকলতা যেমন সুন্দরী, তেমনি স্বাস্থ্যবতী। এখনো তাঁর গায়ে পাকা সোনার রঙ, নিটোল মুখের সুন্দর গড়ন, বড় বড় কালো চোখের কোলে কোথাও একটু কুঁচকে যায়নি, মুখের কোথাও কোন একটু ক্ষীণতম রেখাও পড়েনি যেন। এখনো সেজেগুজে দাঁড়ালে বাড়ির যে কোন অনূঢ়া তরুণী মেয়ের সঙ্গে তিনি পাল্লা দিতে পারেন। সাজগোজের দিকে বেশ একটু ঝোঁকও রয়েছে কনকলতার। সান্ধ্য প্রসাধনে তাঁর বেশ একটু সময় যায়, সময় লাগে চুল বাঁধতে। তা পিঠভরা যাঁর এখনো অত চুলের রাশ, তার সময় কিছু লাগলই বা। তাছাড়া দিনের অন্য সময়েও বেশ একটু ফিটফাট হয়ে, একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে থাকতে ভালোবাসেন কনকলতা। নিজের রূপ সম্বন্ধে তিনি আত্মসচেতন। রূপ আর স্বাস্থ্য যে শরীরকে একটু তোয়াজে না রাখলে থাকে না, তা তিনি জানেন। বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে রূপসী বলে তাঁর মনে অহঙ্কারও একটু আছে। কিন্তু তা খুব প্রচ্ছন্ন। কথায় বার্তায় তা সহজে ধরা পড়ে না। শুধু চালচলনে একটু একটু ফুটে বেরোয়। তা বেরোলই বা। শোভন সীমার মধ্যে রূপবতীর মনের অহঙ্কার, তার গায়ের অলঙ্কারেরই মত।

একথাটা বাসন্তীর স্বামী অবনীমোহনই বলতেন, এখনো বলেন, অবশ্য অন্য ভাষায়। বেশি সন্তান হলেই যে সকলের স্বাস্থ্য ভাঙে না, তার চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত হিসাবে মাঝে মাঝে কনকলতার কথাটা ওঠে তাঁদের মধ্যে। আর এই তুলনাটা বাসন্তীর ভালো লাগে না। বউদির ওপর স্বামীর যে বেশ একটু পক্ষপাতিত্ব আছে, তা বাসন্তী ভালো করেই জানেন। এর জন্যে আগে আগে যেমন খোঁচা লাগত, খটকা লাগত, এখন আর তা লাগে না। অবনীমোহন দেবচরিত্রের মানুষ। তাঁর আচার আচরণে কেউ কোনদিন অশোভনতার অপবাদ দেয়নি। আরো অনেকের মত একথা বাসন্তীও জানেন। তবু কনকলতার সঙ্গে তাঁর স্বাস্থ্যের তুলনায় বাসন্তীর মন এখনো অপ্রসন্ন হয়। এই তুলনা আর যে দেয় দিক অবনীমোহনের দেওয়া তো উচিত নয়। তিনি কি জানেন না বাসন্তীর স্বাস্থ্যভঙ্গের মূলে অবনীমোহন নিজে। তিনি কি জানেন না, শুধু সন্তানাধিক্যই নয়, স্বামীর মহানুভবতার আধিক্যই বাসন্তীকে এমন অকালে জীর্ণ করে ফেলেছে। কিন্তু একথা কোনদিন অবনীমোহন স্বীকার করবেন না।

এঁটো বাসনের পাঁজার পাশ ঘেঁষে ছোঁয়া বাঁচিয়ে কনকলতা কলের জল ছিঁটিয়ে ছিঁটিয়ে চোখমুখ ধুয়ে নিলেন। আঁচল দিয়ে মুখ মুছলেন না সঙ্গে সঙ্গে। মুখের এখানে ওখানে বিন্দু বিন্দু জল লেগে রইল। ফুটন্ত কমলে যেন শিশিরের ফোঁটা।

এ উপমাও অবনীমোহনেরই দেওয়া। অনেককাল আগে তরুণ বয়সে কাব্য সাহিত্যের বড় ভক্ত ছিলেন অবনীমোহন। তখনকার কথা। এখন অবশ্য জলের ফোঁটা বউদির মুখে আর তেমন করে মানায় না। অন্ততঃ বাসন্তীর তো তাই মনে হয়। কিন্তু বউদি অনেক স্নেহমমতা উপকারের কথা ভুললেও এই উপমাটুকুর কথা সযত্নে মনের মধ্যে যেন গেঁথে রেখেছে।

ঝি না আসায় কনকলতাদেরও বাসনের স্তূপ পড়ে রয়েছে এক পাশে। কিন্তু তিনি দিব্যি পাশ কাটিয়ে চলে এলেন। সহজে তিনি হাত দেবেন না এঁটো বাসনে। মেয়েরা মাজবে। নেহাৎই যদি ওরা কেউ না আসে কোন একটা ব্যবস্থা না হয়, নিজে এসে বসবেন তখন।

বাসন্তী আর দেরি করলেন না। এগিয়ে গিয়ে বসলেন নিজেদের বাসনের পাঁজার কাছে। কাজে হাত লাগালেন।

ভুবনময়ী মেয়ে আর ছেলের বউয়ের কথা কাটাকাটিতে এতক্ষণ হতবাক হয়েছিলেন। কনকলতার কাছে বাসন্তীর নামে অমন একটা মিথ্যে কথা বলে ফেলে তিনি নিজেও বড় কম অপ্রতিভ হননি। কেন বললেন, ওকথা বলা তো তাঁর ইচ্ছে ছিল না। আজকাল ছেলেমেয়ে নাতিনাতিনীগুলির মত নিজের জিভটাও যেন আর নিজের শাসন মানে না। ফস করে এক একটা কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। আর তাই নিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধে। ওরা একথা বোঝে না যে, বুড়ো মানুষের মুখের কথাটাই সব কথা নয়। তা ধরতে নেই।

কিন্তু জেদী মেয়ের কাণ্ড দেখ। শরীর খারাপ তবু গিয়ে বসল এঁটো বাসনগুলি নিয়ে। আর তাও কি দু'একখানা বাসন। এক রাশ।

ভুবনময়ী ফের মেয়েকে ধমক দিলেন, 'আচ্ছা বাসি, এত বয়স হোল, বুড়ো হতে চললি, এখনো তোর একগুঁয়েমি গেল না। এখনো সেই কচিখুকিটি আছিস নাকি তুই? বললুম যে দরকার নেই তোর আজ বাসন মেজে। তবু তুই কথা শুনবিনে। তোর মত জেদী আমি আর দুটি দেখিনি দুনিয়ায়। সরে আয় বলছি।'

বাসন্তী দ্রুত হাতে কাজ করতে করতে বললেন, 'সরে এলে চলবে না মা। তুমি মিছিমিছি বকবক না ক'রে নিজের কাজে যাও।'

মেয়ের রূঢ় কথায় ভুবনময়ী এবার আর রাগ করলেন না। খানিকক্ষণ আগের অপরাধের কথা তাঁর মনে আছে।

তিনি এবার কোমল সুরে অনুরোধের ভঙ্গিতে বললেন, 'লক্ষ্মীটি, উঠে আয়, আমার কথা শোন। আজ না নান্তু আসবে, বাড়িতে। ওর গাড়িতো সকালের দিকেই। এসে যদি দেখে তুই এই বাসনের রাশ নিয়ে বসেছিস আর রক্ষে রাখবে না।

প্রবাসী ছেলের মুখ মনে পড়ে যাওয়ায় তার বাড়ি আসবার প্রসঙ্গে বাসন্তীর মনটা মুহূর্তের জন্যে প্রসন্ন হয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল কি অবস্থায় ছেলে বাড়ি ফিরছে। মার দিকে তাকিয়ে বাসন্তী বললেন, 'না রক্ষে রাখবে না। ছেলে আমার সব দুঃখ দূর করবে বলেই তো চাকরি বাকরি সব খুইয়ে বাড়িতে এসে বসছে। কে যে আমাকে কতখানি রাজা করবে, তা আমার জানা আছে।'

প্রায় দুশো টাকা মাইনের ভালো সরকারী চাকরিটা নান্তুর চলে গেছে। তা নিয়ে ভুবনময়ীর নিজের মনেও আফসোস কম নেই। তবু কান্নার সুরে মেয়েকে বললেন, 'আহা, পুরুষ ছেলের চাকরি কখনো হয়, কখনো যায়, তাই বলে কি ঘরের ছেলে ঘরে আসবে না? এ তোর বড় অন্যায় কথা বাসি।'

বাসন্তী বললেন, 'তার ঘর কোথায় যে আসবে? এ বাড়িতে এসে সে থাকবে কোথায়? কোন ঘরে কি এক ফোঁটা জায়গা আছে যে মাথা গুঁজবে? চিলে কোঠার

ওই খুপরিটুকুর মধ্যে সে থাকত, সেখানেও তো—'

বলে বাসন্তী হঠাৎ থেমে গেলেন।

সেখানে কনকলতার জামাই সুবিমল আছে ক'মাস ধরে। তারও চাকরি নেই। এখানে থেকে চাকরিবাকরির চেষ্টা করছে।

কিন্তু কথাটা বাসন্তী চাপতে চাইলেও কনকলতা চাপতে দিলেন না। মুখ ধুয়ে দোতলায় উঠে যাচ্ছিলেন, ফের কয়েক সিঁড়ি নিচে নেমে এলেন। তারপর ননদ আর শাশুড়ীর দিকে তাকিয়ে তেমনি শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'সেখানা সুবিমল বেদখল করেছে এই তো ঠাকুরঝি। কিন্তু ছেলে বাড়ি আসবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের ঘর তোমরা ফিরে পেলেই তো হোল। সেজন্য ভাবনা নেই তোমার। আমি তো প্রথমে যেতেই দিতে চাইনি সুবিমলকে ওঘরে। আমি আগেই বলেছিলুম ওটা নান্তুর 'পড়া' ঘর, ছুটি-ছাটায় এসে থাকে। ওঘরে কাউকে ঢুকতে দেখলে তার সহ্য হয় না, ওঘরে গিয়ে কাজ নেই সুবিমলের। আছে জামাই আছে, তবু সে নিচের ঘরে চাকরবাকরদের সঙ্গেই থাকুক। কি করবে। তার শ্বশুরের যেমন সাধ্য, তার বেশিতো আর কিছু করবার জো নেই। কিন্তু অবনীবাবুই তো তা হতে দিলেন না। তিনিই তো তখন ভালো-মানুষিতা দেখিয়ে নিজে সব ব্যবস্থা করলেন।'

সিঁড়িতে এবার একটি পুরুষের গলা শোনা গেল। 'কি বিষয়টা কি। সকাল থেকে সকলে মিলে সেই যে বক বক শুরু করেছ, হয়েছে কি তোমাদের। ঘাড় ফিরিয়ে স্বামীকে দেখে নিয়ে মাথার আঁচলটা আর একটু টেনে সরে দাঁড়ালেন কনকলতা। বৈদ্যনাথ দ্রুত নিচে নেমে এলেন। পরনে নীল রঙের লুঙ্গি। খোলা গা। রোমশ বুক। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। রূপবান নয়, তবে স্বাস্থ্যবান পুরুষ। বেঁটে খাটো আটসাঁট গড়ন। এখনো বেশ শক্তসমর্থ চেহারা। এক হাতে ছোট্ট একটা হাতুড়ি, গোটা দুই 'সোল।'

নেমে এসে বোনের দিকে তাকিয়ে বৈদ্যনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে রে বাসন্তী?'

বাসন্তী বললেন, 'কিছু হয়নি দাদা'।

কনকলতা বললেন, 'হবে না কেন অনেক কথা হয়েছে। সুবিমলকে এখনি চিলে কোঠা ছেড়ে দিতে বলো। সে আজই কোন মেসে টেসে চলে যাক।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'কেন মেসে যাওয়ার কি হয়েছে। মেসে যাবে খাবে কি। চাকরি নেই বাকরি নেই, খরচ চালাবে কি ক'রে'।

কনকলতা বললেন, 'সে বুঝ তো আর অন্য মানুষে বুঝতে আসবে না। তুমি আজই সুবিমলকে উঠে যেতে বলো। নান্তুর ঘর যেন ও এখনই ছেড়ে দেয়। আর যে কয় মাস জামাইকে পরের ঘরে রেখেছ, তার জন্যে ভাড়াটা হিসেব ক'রে গুনে দিয়ো। খাই না খাই, আমি কারো অনুগ্রহ নিতে চাইনে'। বলে কনকলতা তরতর করে উঠে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে।'

বৈদ্যনাথ গম্ভীরভাবে বললেন, 'হুঁ'। তারপর বৈঠকখানা ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

ভুবনময়ী বাধা দিয়ে বললেন, 'উঠেই ওদিকে আবার কোথায় যাচ্ছিস বৈদ্য।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'ঘড়িটা ঠিক করতে হবে। রাত থেকে আবার বেয়াড়াভাবে বাজতে শুরু করেছে।'

ভুবনময়ী বললেন, 'তা করে করুক। ও ঘড়িতে তোমার আর হাত দিয়ে কাজ নেই বাপু।'

বৈদ্যনাথ চটে উঠে বললেন, 'কেন, আমার ঘড়িতে আমি হাত দেব, তাতে তোমার কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হবে শুনি?

ভুবনময়ী অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, 'মহাভারত অশুদ্ধ হবে না, কিন্তু ঘড়িটা যাবে। যাবে কি গেছে। তুমিই ওটাকে নষ্ট করেছ। তোমার কেরামতি মেরামতিতে ও ঘড়ির যেটুকু আছে, সেটুকুও আর থাকবে না।'

বৈদ্যনাথ গলা চড়িয়ে বললেন, 'বেশ না থাকে না থাকবে। আমার জিনিস আমি নষ্ট করি, কি যা খুসি তাই করি, তাতো তোমার দেখতে আসবার দরকার নেই মা। সব সময় বক বক না করে একটু চুপ করে থাকোতো'।

ভুবনময়ীও বিড়বিড় করে উঠলেন, 'কেন, চুপ করে থাকবার কি হয়েছে শুনি? কেন চুপ ক'রে থাকব? কার ভয়ে চুপ করে থাকব? তোমার ভয়ে? তুমি দুটি খেতে পরতে দিচ্ছ সেই জন্যে! দিওনা খেতে। তোমাকে তো আমি হাজার বার বলেছি, খেতে তুমি আমাকে দিও না। তুমি ছাড়া আমার আরো গতি আছে।'

বৈদ্যনাথ তিক্তস্বরে বললেন, 'তা তো আছেই। সেই আশা আছে বলেই তো তোমার গলায় এখনো এত জোর আছে। সেই আস্কারা পেয়ে পেয়েই তো তোমার চেঁচানি কমছে না।' একটু কিছু হতে না হ'তেই চেঁচিয়ে একেবারে বাড়ি মাথায় করে তুলছ।

ইঙ্গিতটা অত্যন্ত স্পষ্ট। অন্ততঃ বাসন্তীর তা বুঝতে কিছু মাত্র অসুবিধা হোল না। বাসন মাজতে মাজতে তিনি ফের মুখ তুললেন, মুখ খুললেন, 'নিজেরা মায়ে পোয়ে যত খুশি ঝগড়া করো দাদা, কিন্তু মিছিমিছি অন্য মানুষকে দুষতে যেয়ো না। কেউ কাউকে আস্কারা দেয়নি, দেবেও না, বিনা আস্কারাতেই এই। এরপর আস্কারা দিলে কি আর রক্ষে ছিল।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'তোর আবার কি হোল বাসি। তোর গায়ে আবার কোত্থেকে কোন্ ফোস্কা পড়ল।'

বাসন্তী বললেন, 'চামড়ার গা হলেই তাতে ফোস্কা পড়ে দাদা। মাটি কি পাথর দিয়ে তৈরি হলে ফোস্কা পড়ার কোন বালাই থাকে না। তাতে সব সয়। রক্ত মাংস দিয়ে তৈরী না করে বিধাতা যদি কাঠ কি পাথর দিয়ে আমাকে তৈরী করতেন, তাহলেই তোমাদের সকলের পক্ষে সুবিধে ছিল।'

সামনের চৌবাচ্চায় মগ ডুববার একটু শব্দ হ'তেই বাসন্তী চোখ ফিরিয়ে তাকালেন। অবনীমোহন নিঃশব্দে দোতলার ঘর থেকে কখন নেমে এসেছেন। উঠান পেরিয়ে কখন এসে চৌবাচ্চা থেকে জল নিয়েছেন মগে, কেউ টেরও পায়নি। মুখ দিয় সহজে তো কোন কথাই বেরোয় না অবনীমোহনের, চলাফেরাটাও যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে সারেন। একটু আগে মাটি কি পাথরে গড়া মানুষের কথা বলছিলেন বাসন্তী। স্বামীর সম্বন্ধে তাঁর সেই কথাই মনে হয়। একেবারে পাথরের মানুষ। কালো পাথরের নয়, রঙীন পাথরের। পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে বয়স। কিন্তু স্নিগ্ধ মসৃণ গৌর বর্ণ এখনো তেমন ম্লান হয়নি। সুদীর্ঘ সুন্দর চেহারা, সবল আর তেমন বলা চলে না, স্বাস্থ্যবানও নয়। দেহে ভাঙন ধরেছে অবনীমোহনের। কপালের ত্রিবলী একটু যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কানের কাছে পাক ধরেছে চুলে। তবু তাঁর রূপ চোখে পড়ে। এ রূপ কনকলতার মত যত্ন করে রাখা নয়, প্রসাধনে মার্জিত নয়, অবহেলায় অনাদৃত।

বাথরুমের দিকে যাওয়ার আগে অবনীমোহন একবার সকলের মুখের দিকে তাকালেন। তাঁকে দেখে সকলেই মুহূর্তের জন্যে কথা থামিয়েছে। অবশ্য এই থামাই থামা নয়। অবনীমোহন জানেন, আজকাল

...খানি শ্রদ্ধা আর সমীহা তিনি আর দাবী ...ন না। তিনি বাথরুমে ঢুকবার সঙ্গে ...গ এরা আবার কলহ শুরু করবে। তার- ... শ্রান্ত হয়ে কিংবা দৈনন্দিন কাজের ...গিদে আপনিই সবাই থেমে যাবে। তার ...গে ধমক দিলে শুনবে না, অনুরোধ ...লে শুনবে না। তাতে কিছু লাভ নেই। অবনীমোহন জলের মগ হাতে এগিয়ে ...লেন সামনের দিকে।

পিছনে ঝগড়া চলতে লাগল।

...বোনের কথার জবাবে বৈদ্যনাথ বললেন, ...াক, থাক, আর মাটি পাথরের কথা তুলিস ...। কে যে কোন্ ধাতু দিয়ে তৈরি, কার যে ...তখানি ধৈর্য-স্থৈর্য, তা আমার আর ...ানতে বাকি নেই। চিনতে আর কাউকে ...াকি নেই আমার।

বাসন্তী কোন জবাব দিলেন না।

ভুবনময়ী আগের কথার জের টেনে ...লতে লাগলেন, "কেবল আমার যা খুসি ...াই করব, আমার জিনিস আমি নষ্ট করব। দিনরাত কেবল এই বুলি, দিনরাত কেবল এই বুলি, আরে কপালপোড়া, নষ্টই তো করলি জীবন ভরে। ভেঙে ফেলা ছাড়া, গড়তে পারলি কোনটা। রাখতে পারলি তাঁর হাতের কোন জিনিস। একটা একটা করে নিজের খেয়ালে সবই তো খোয়ালি। টাকা গেল পয়সা গেল, কারবার গেল, বিষয়-আশয় গেল শেষে আমার যে ক'খানা গয়না ছিল তাও রইল না। নষ্ট করা ছাড়া' তুই আর কি করতে পারলি জীবনে।'

অভিযোগগুলি সত্য। তাই বৈদ্যনাথ মুহূর্তকালের জন্যে একটু চুপ করে রইলেন। ছেলে মেয়ে ভাগ্নে ভাগ্নীরা ততক্ষণে প্রায় সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁদের এই বচসা শুনেছে লক্ষ্য করে নিজের ছোট ছেলে বিনুকে এক প্রচণ্ড ধমক দিলেন বৈদ্যনাথ, 'যা হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসগে যা। কি দেখছিস, কি শুনছিস হাঁ করে। যা ভাবছিস তা নয়। তোদের বাবা মদ খেয়ে বদমাসি করে রেস খেলে তার বাবার একটা পয়সাও ওড়ায়নি। সৎপথে ব্যবসা করতে গিয়েই সব খুইয়েছে। আর খুইয়েছে বলে তার মনে বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই, আপসোস নেই। পুরুষের জীবনে অমন কত আসে কত যায়। মেয়েরা তা নিয়ে হা হুতাশ করে। পুরুষে তার সময় পায় না। দুনিয়ায় তার অনেক কাজ।'

হঠাৎ ঘড়ি সারবার কাজের কথাটা ফের মনে পড়ে গেল বৈদ্যনাথের। তিনি আর দেরী না করে বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

বৈঠকখানা অবশ্য নামেই বৈঠকখানা। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের বাইরের ঘর। ভিতরে যাদের স্থান সঙ্কুলান হয়নি তাদেরই কেউ কেউ এসে উপচে পড়েছে এ ঘরে। তাই চেয়ার টেবিল কৌচ সোফায় না সাজিয়ে সস্তা দামের দু' খানা বড় বড় তক্তপোষ জুড়ে তাদের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছেলেদের মধ্যে যারা বড় হয়েছে, মা ঠাকুরমার গণ্ডী পেরিয়ে এসে তারা এ ঘরে স্থান নেয়। অতিথি-অভ্যাগত কেউ এলেও অপেক্ষাকৃত একটু ভালো বিছানা বালিসের ব্যবস্থা করে এই ঘরেই তাদের অভ্যর্থনা করা হয়, দিনের বেলায় ছেলেরা কেউ কেউ পড়ে। বার্ষিক পরীক্ষার দু' তিন মাস আগে অঙ্কে কি ইংরেজীতে নেহাৎ কাঁচা ছেলের জন্যে কোন কোন বছর প্রাইভেট টিউটর রেখে দেওয়া হয়। তিনি সকালে না হয় সন্ধ্যায় এসে পড়ান। স্থায়ী-ভাবে পূব দিকের কিনার ঘেঁষে থাকে মণীন্দ্র দাস। অবনীমোহনের গাঁয়ের ভিটে বাড়ীর প্রজা, আর এখানকার বাসাবাড়ীর বাজার সরকার। কিন্তু এখন তক্তপোষ খালি। সবাই বিছানা গুটিয়ে উঠে গেছে। শুধু বাঁ কাৎ হয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে অতুল। অবনী-মোহনের মেজো ছেলে। তেইশ চব্বিশ বছরের জোয়ান। স্বাস্থ্যবান চেহারা। গায়ের রঙ ঘোর কালো। বিরাট এক গাব গাছ যেন আড় হয়ে পড়ে রয়েছে।

বৈদ্যনাথ তার পাশ দিয়ে পা টিপে টিপে ঘড়ি সারবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। ঘুমন্ত ভাগ্নের একখানা হাত পায়ের ওপর এসে পড়ল। পড়ুক। নেহাৎ বিজয়া দশমীর দিন ছাড়া সজ্ঞানে জাগ্রত অবস্থায় তো ভাগ্নেরা পায়ে হাত বড় একটা দেয় না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যদি দেয় তো দিক। তাও কত বেলা অবধি ঘুমুচ্ছে। ঘুমুবে না? সারা রাত বাইরে বাইরে কাটিয়ে এসেছে। কোথায় কালী কীর্তন নাকি একটা দল আছে পাড়ায় সেখানে গিয়ে জুটেছে। কি করে আর কি না করে ভগবানই জানেন। একে-বারে বয়ে গেছে ছোঁড়া। লেখাপড়া কিছু হোল না। টেনে মেনে ফার্স্ট ক্লাস অবধি উঠেছিল। পর পর বছর দুই ফেল করে পড়া ছেড়ে দিয়েছে। পাড়া ভরে শহর ভরে হৈ চৈ মারামারি করে বেড়ান ছাড়া এখন আর ওর কোন কাজ নেই। বছরের পর বছর একইভাবে কাটছে। আশ্চর্য বাপ। অবনী বলেই তার ছেলে এমন হতে পেরেছে। বৈদ্যনাথের কোন ছেলে এমন বিগড়ে গেলে তিনি তাকে চাবকে সোজা করতেন। তাতেও যদি না শোধরাত বাড়ি থেকে বের করে দিতেন, দেখতেন কেমন না শোধরায়।

ঢং করে একটা শব্দ হোল ঘড়ির। কিন্তু বাজে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ছ'টা। 'দাঁড়াও তোমাকে বাজাচ্ছি।' মনে মনে বললেন বৈদ্যনাথ। তারপর ওপরের ডায়ালটা খুলে ফেললেন।

আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজার কাছে ঠুন্ ঠুন্ করে রিকসার শব্দ হোল। সেই সঙ্গে ছোট ছেলে মেয়েদের একযোগে কল-স্বর শোনা গেল 'নান্তুদা এসেছে নান্তুদা এসেছে।'

বৈদ্যনাথ নিজের জায়গা ছেড়ে বিন্দুমাত্র নড়লেন না। দুই বুড়ো আঙুলের ওপর ভর করে যেমন ঘড়ির কলকব্জাগুলি পরীক্ষা করছিলেন, তেমনি করে যেতে লাগলেন।

কিন্তু বাড়ীর আর সবাই বৈঠকখানার দোরের কাছে এসে ভীড় করে দাঁড়াল। ঘর-খানা ভরে গেল লোকে। সবাইকে ধরলও না। সব চেয়ে পিছনে এসে দাঁড়ালেন ছাই মাটিতে হাতমাখা বাসন্তী। মুখে অপূর্ব স্নিগ্ধ বাৎসল্যের হাসি। এই মুহূর্তে তিনি ভুলে গেছেন ছেলে বেকার হয়ে এসেছে। প্রবাসী ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে এখনকার মত এই তো ঢের।

রিকসাওয়ালাকে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে অরুণ এসে দোরের সামনে দাঁড়ালো। তার

জিনিসপত্রগুলি নিয়ে ছোট ভাইদের মধ্যে ততক্ষণে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। কেউ ধরেছে হোল্ড অলটা, কেউ সুটকেস, কেউ ট্রাঙ্কটা নিয়ে টানাটানি করছে। মামাত ভাই বিজু থার্ড ইয়ারে পড়ে। আর কেউ পারছে না দেখে সে নিজে এসে তুলে নিয়ে গেল ট্রাঙ্কটা। নিজের জিনিসপত্রে অন্য কেউ হাত দেয় অরুণ তা একটা বড় পছন্দ করে না। ছেলেপুলেদের কলরবও তার খুব সহনীয় নয়। কিন্তু আজকের দিন আলাদা, আজকের ধরণটা আলাদা। হাসিমুখে নিজের জিনিস আর ভাইবোনগুলির দিকে তাকিয়ে সে ভিতরে ঢুকতে গেল। আর ঢুকবার সংগে সংগেই চৌকাঠে ঠুকে গেল মাথাটা!

ভুবনময়ী বলে উঠলেন, 'আহাহা, আহাহা, ষাট ষাট। দিল্লীর জল বাতাসে তুই কি আরো লম্বা হয়ে গেছিস নাকি নান্তু? গায়ে পায়ে তো কিছু বাড়েনি।'

অরুণ দিদিমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, 'এর চেয়ে আর কি বাড়বে দিদা? তাহ'লে তো তোমাদের দরজা দিয়ে একেবারেই ঢুকতে পারতাম না। বাইরে থেকেই বিদায় নিতে হোত।'

ভুবনময়ী বললেন, 'ঈস, কথার ছিরি দেখ ছেলের। যা একখানা তালপাতার সেপাইর মত চেহারা তাই নিয়ে আবার বড়াই।'

কথাটা ঠিক। দৈর্ঘ্যের তুলনায় অরুণের প্রস্থের স্বল্পতাটা চোখে পড়ে। ওকে ঠিক সুপুরুষও বলা যায় না, স্বাস্থ্যবান পুরুষ তো নয়ই. তবু ওর নিজস্ব একটা শ্রী আছে। শুধু নাকটাই তীক্ষ্ম নয়, চোখ দুটিও ধারাল। বিদ্যে-বুদ্ধির ছাপটা বেশ ধরা যায়। চওড়া কপাল, পাৎলা ঠোঁট, ছোট্ট চিবুকে একটু আত্মম্ভরিতাও আঁচ করা কঠিন হয় না।

দিদিমাকে প্রণাম সেরে নীচু হয়ে, অরুণ মামীমার পায়ে দুটি আঙুল ছোঁয়াল কি ছোঁয়াল না, তারপর মাথা তুলে সোজা তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছ রাঙা মামী?'

কনকলতা বললেন, 'তোর মামী কটা রে নান্তু যে রাঙা মামী বলছিস? ফাজিল ছেলে।'

অরুণ বলল, 'বাঃ অমন টুকটুকে তোমার রঙ, রাঙা কথাটাই সব চেয়ে আগে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে।

লজ্জিত হলেন কনকলতা। লঘু গুরু জ্ঞান নেই অরুণের। বাইরে চাকরিতে গিয়ে ফিচলেমিটা আরো বেড়েছে। কনকলতা বললেন, 'তাহলে তোর বাবাকেও ওই রকম একটা রাঙা টাঙা বলেই ডাকবি, রঙ তো গায়ে তাঁরও নেহাৎ কম নেই।'

হঠাৎ বাবার কথাটা মনে পড়ায় অরুণের মুখে কিসের একটা ছায়া পড়ল। ঘরের চার দিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিল। না, তাঁকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তিনি আসেন নি। তিনি নামেননি নীচে। যে কথাটা অরুণ এতক্ষণ ভুলে ছিল, সেই কথা ফের মনে পড়ল। তার চাকরি গেছে। যুদ্ধের সময়কার ডি জি এম পি অফিসে চাকরি। একেবারে শেষের দিকে জুটেছিল। কলকাতার অফিস উঠে গিয়েছিল দিল্লীতে। তারপর ভারত স্বাধীন হবার বছর খানেক যেতে না যেতেই ভারত গভর্নমেন্ট তাকেও সম্পূর্ণ স্বাধীন করে দিয়েছেন। আরও অনেক সহকর্মীদের সংগে সেও পড়েছে ছাঁটাইতে। এ চাকরি যে একান্ত অস্থায়ী বাবা তা জানেন, ছাঁটাইয়ের কথাটাও অনেকদিন ধরে চলছিল। আঘাতটা একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়, তবু আঘাত তো বটে। আর সব চেয়ে বাবারই বেশী লাগবার কথা। কারণ ভুগতে তাঁকেই হবে, বিপুল পরিবারের ভার তাঁর ঘাড়েই পড়বে এবার থেকে, অরুণ সবই বুঝতে পারছে। তবু একবার তিনি এলেও তো পারতেন। মনটা কেমন যেন অপ্রসন্ন হয়ে রইল অরুণের।

একটু এগিয়ে গিয়ে নীচু হয়ে মাকে প্রণাম করে তাঁর দিকে তাকাল। বাসন্তীও তাকালেন ছেলের দিকে, 'কেমন আছিস?' অরুণ সংক্ষেপে বলল, 'ভালো।'

হঠাৎ চোখে পড়ল, তক্তপোষের ওপর দাঁড়িয়ে মামা কি ঠুক ঠুক করছেন। এগিয়ে এসে পাটা আলগোছে একটু ছুঁয়ে বলল, 'ও করছেন কি?'

বৈদ্যনাথ ঘড়ির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ভাগ্নের মুখের দিকে তাকালেন, 'এই যে ভালো আছিস? গাড়ী কি লেট ছিল?'

অরুণ বলল, 'সামান্য, করছেন কি ওখানে? বৈদ্যনাথ বললেন, ঘড়িটা সারছি। দিন কয়েক হোল ফের বিকল হয়েছে। ঠিক টাইম দিচ্ছে না।'

অরুণ হাসি চেপে বলল, 'দেখুন চেষ্টা করে।'

প্রায় জন্মাবধি এই ঘড়ি মামাকে সারাতে দেখে আসছে অরুণ। নিজের মনেই ফের একটু হাসল, 'ও ঘড়ি আর সেরেছে।'

ভিতরের দিকে আরো খানিকটা এগুতেই শ্যামবর্ণা আঠার উনিশ বছরের একটি তরুণী মেয়ে অরুণের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, কি নান্তুদা, আমাকে যে চিনতেই পারছ না, রাজধানী থেকে এসে গরীবের দিকে বুঝি আর নজরই পড়ছে না?'

মামাত বোন অণিমা।

অরুণ বলল, 'চোখে পড়লেই কি আর চিনতে পারব? সিঁথিতে কপালে সিঁদুর-টিঁদুর লেপে তুই তো একেবারে কালী-ঘাটের কালী সেজেছিস।'

অণিমা লজ্জিত হয়ে বলল, 'আহাহা।'

তার পাশে প্রায় তারই সমবয়সী আরো একটি মেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। ফর্সা সুন্দর চেহারা। অরুণের নিজের বোন। তার বিয়ে হয়নি। ম্যাট্রিক পাশ করে ঘরে বসে আছে। অরুণ বাবাকে লিখেছিল কলেজে ভর্তি করে দিতে। তিনি জবাব দিয়েছিলেন তাঁর সাধ্য নেই। অরুণের মনে হয়েছে শুধু সাধ্যের কথাই নয়, বাবার আর ইচ্ছেই নেই ওকে পড়াবার।

অরুণ বোনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি রে অমন মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস যে? বিয়ে হয়নি বলে? কলেজে ভর্তি হতে পারিসনি বলে না কি আমার চাকরি গেছে সেই দুঃখে?'

প্রীতি বলল, 'তা ছাড়া আর বুঝি কোন কারণ থাকতে নেই দাদা?'

অরুণ বলল, 'আর আবার কি কারণ থাকবে? তবে কি প্রেমে ট্রেমে পড়লি না কি?'

হেসে উঠল অরুণ। হাসতে হাসতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল।

(ক্রমশ)

লিবিয়া-

লিবিয়া ছিল *আফ্রিকার প্রাচীন গ্রীক নাম। লিবিয়া বলতে সাধারণভাবে আফ্রিকাকে অথবা মিশর থেকে আতলান্তিক পর্যন্ত সমস্ত উত্তর আফ্রিকাকে বোঝাতো। রোমানরাও সাধারণভাবে আফ্রিকা অর্থে অথবা বিশেষভাবে কার্থেজ অঞ্চল অর্থে লিবিয়া শব্দ ব্যবহার করত। আধুনিক কালে লিবিয়া যে অঞ্চলের নাম তার উত্তরে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা, পশ্চিমে টিউনিসিয়া এবং পূর্বে মিশর ও সুদান। সিরীনেইকা, ত্রিপোলিতানিয়া ও ফেজান এই তিনটি দেশ বা প্রদেশ নিয়ে লিবিয়ার যুক্তরাজ্য গঠিত হয়েছে এবং তার প্রথম রাজা হলেন সিরীনেইকার আমীর মহম্মদ ইদ্রিস এল সেনুসি। সেনুসি একটি মুসলমান সম্প্রদায়ের নাম। গত শতাব্দীতে আলজেরিয়ায় সিদি মহম্মদ আলি সেনসি নামে একজন মুসলমান ধর্ম সংস্কারকের অভ্যুদয় হয়। লিবিয়াতে অনেক লোক তাঁর মতাবলম্বী হয় এবং তাঁর নাম অনুসারে এই সম্প্রদায়ের নাম হয় সেনুসি। সেনুসিদের সংখ্যা সিরীনেইকা অঞ্চলেই বেশী। ইহাদের দলপতি আমির ইদ্রিসকে লিবিয়ার যুক্তরাজ্যের রাজা করা হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে সেনুসিদের উপর জার্মান প্রভাব ছিল, ফলে ইংরেজদের সঙ্গে তাদের সঙ্ঘর্ষ হয়। মুসোলিনীর আমলে লিবিয়ায় ইতালির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৩১ সালে সেনুসিদের সম্পূর্ণ দমন করা হয়। গত মহাযুদ্ধের সময়ে ইংরেজরা লিবিয়ার আরবদের নিয়ে এক সৈন্যদল সৃষ্টি করে, তাতে সেনুসিরা যোগ দেয়। মিত্রপক্ষ যুদ্ধে ইতালিয়ানদের হারিয়ে তাদের লিবিয়া সাম্রাজ্য খতম করে দেয় এবং ১৯৪৩ সাল থেকে লিবিয়া বৃটিশ ও ফরাসী রেসিডেন্টের কর্তৃত্বাধীনে ছিল। সিরীনেইকা ও ত্রিপলিতানিয়া ছিল বৃটিশ রেসিডেন্টের অধীনে এবং ফেজান ছিল ফরাসী রেসিডেন্টের অধীনে। পরে ইউ নো'তে স্থির হয় যে ১৯৫২ সালের ১লা জানুয়ারীর পূর্বে লিবিয়াকে স্বাধীনতা দিতে হবে। ইতিমধ্যে লিবিয়ার জন্য একটি 'ফেডারেল' শাসনতন্ত্র প্রস্তুত হয়েছে। সেই অনুসারে সিরীনেইকা, ত্রিপোলিতানিয়া ও ফেজানে এক একজন গভর্নর থাকবেন এবং আমির ইদ্রিস 'যুক্তরাজ্যের' রাজা হবেন।

লিবিয়ার স্বাধীনতা লাভের পরে, চিরাচরিত প্রথানুযায়ী অন্যান্য দেশের সঙ্গে অভিনন্দন বিনিময় চলছে। ভারত গভর্নমেণ্টও লিবিয়ার স্বাধীনতা লাভে আনন্দপ্রকাশ করে অভিনন্দন জানিয়েছেন। লিবিয়াকে অবিলম্বে ইউনো'র সদস্য করে নেবার কথাও আমেরিকার পররাষ্ট্র সচিব বলেছেন। দূরদেশের লোকদের যেখানে এত উৎসাহ সেখানে লিবিয়ার নিকটতম প্রতিবেশী মিশর কিন্তু উৎকণ্ঠিত। লিবিয়া যদি সত্যই পুরোপুরি স্বাধীন হোত তবে মিশরের উৎকণ্ঠার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু লিবিয়ার স্বাধীনতা যে অনেকখানিই অন্তঃসারশূন্য। লিবিয়াতে বৃটিশ সৈন্য যেমন ছিল তেমনি থাকছে, বৃটিশ কর্তৃক লিবিয়াকে আর্থিক সাহায্য দিবার অধিকার ও ব্যবস্থা যা ছিল তাও থাকছে। অর্থাৎ লিবিয়ার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বাধীনতা লাভের পূর্বেও যেমন পরেও তেমনি ইংরেজেরই থাকছে। এককথায় লিবিয়া একটি বৃটিশ ঘাঁটি হয়ে থাকল।

বর্তমানে ইংরেজের সঙ্গে মিশরের যে সম্বন্ধ তাতে লিবিয়ার উপরোক্ত প্রকার স্বাধীনতা লাভে মিশরের পক্ষে আনন্দিত হওয়া সম্ভব নয়। লিবিয়া মিশর ও সুদানের একেবারে গাত্র-সংলগ্ন দেশ। লিবিয়ায় বসে ইংরেজের পক্ষে মিশরের উপর চাপ দেয়া সহজ হবে। লিবিয়া হাতে থাকলে সুদানকে মুঠোর মধ্যে রাখাও তত কঠিন হবে না। লিবিয়া থেকে আরব রাজনীতির খেলায়ও বড় চালাচালি করা যাবে। আর একটা কথাও আছে। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে মিশরের যে একটা সুবিধা ছিল সেটাও বিপন্ন হোল। মিশর যেভাবে অবস্থিত তাতে তার সহযোগিতা না পেলে মধ্য প্রাচ্য সুরক্ষার ইঙ্গ-মার্কিন প্ল্যান কার্যে পরিণত করার অসুবিধা আছে। এটা মিশরের দিক থেকে অন্তত দরদস্তুর করার পক্ষে বড়ো একটা জোর ছিল। লিবিয়ায় যদি শক্ত ইঙ্গ-মার্কিন ঘাঁটি তৈরীর ব্যবস্থা হয়ে যায় তাহলে মিশরের সেই জোর কমে যাবে।

তবে লিবিয়ার পক্ষেও অসুবিধা আছে। মিশর যদি অসন্তুষ্ট এবং শত্রুভাবাপন্ন হয়ে থাকে তবে লিবিয়ার যুক্তরাজ্যের সংহতি ও উন্নতির পথে যথেষ্ট অন্তরায় উপস্থিত হতে পারে। যে ধরণের স্বাধীনতা লাভ হোল তাতে মিশর যদি লিবিয়ার স্বাধীনতাকে ভুয়া স্বাধীনতা বলে রব তুলে দিয়ে প্রচার শুরু করে তবে লিবিয়ায় জনমতের উপর তার প্রভাব হয়ত নিতান্ত সামান্য হবে না। ইঙ্গ-মিশর কলহে লিবিয়ার বহুলোকের সহানুভূতি মিশরের প্রতি রয়েছে ও থাকবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেখানে যদি দেখা যায় যে লিবিয়ার গভর্নমেণ্ট সর্ববিষয়ে ইংরেজের উপর নির্ভরশীল তাহলে অনেক লিবিয়াবাসীর চক্ষে সেটা মোটেই প্রীতিকর লাগবে না। তাছাড়া ইংরেজের প্রতিও যে সেনুসিরা ষোল আনা প্রসন্ন তা নয়। অবিশ্যি ইতালিয়ানদের উপরই তারা বিরূপ বেশী এবং ইতালিয়ানদের তাড়াবার জন্যই তারা গত মহাযুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল কিন্তু ১৯১৪—১৮ সালের যুদ্ধের সময়ে তাদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের অভিযানের কথাও তারা ভোলে নি। সুতরাং ইংরেজ সৈন্যের পাহারায় এই 'সার্বভৌমত্ব, ও 'স্বাধীনতা' লিবিয়ায় যে সকলের পছন্দ হবে তা নয়।

নবঘোষিত লিবিয়ার যুক্তরাজ্যের আর একটি বড়ো আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা আছে। আমির ইদ্রিস যিনি রাজা হয়েছেন তিনি সেনুসিদের দলপতি এবং গত ৩০ বছর যাবৎ নাকি সেনুসিদের উপর তাঁর প্রভাব অক্ষুণ্ণ রয়েছে। সিরীনেইকাতেই সেনুসিদের সংখ্যা বেশী। ফেজানে ও ত্রিপলিতানিয়াতেও সেনুসি অনেক আছে, কিন্তু সমগ্র লিবিয়ায় নূতন রাজার অনুবর্তীদের সংখ্যাধিক্য আছে কি না সন্দেহ। বিশেষতঃ ত্রিপলিতানিয়ার উত্তরাঞ্চল যেটা লিবিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশী উন্নত অঞ্চল সেখানে রাজা ইদ্রিসের অনুবর্তীদের সংখ্যা খুবই কম সুতরাং সেনুসি রাজের অধীনে লিবিয়ার সংহতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। এরূপ অবস্থায় প্রতিবেশী মিশর যদি বিরূপ ও অপ্রসন্ন থাকে তবে তার পক্ষে এই নূতন রাজ্যের মধ্যে নানারূপ বিভেদের সূত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে না। তবে ইংরেজ আশা করছে মিশর নিজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা নিয়েই শীগ্গির এত বিব্রত হয়ে উঠবে যে অন্য কারো দিকে তাকাবার ফুরসুৎ পাবে না।

৩০।১২।৫১

হাইদ্রাবাদের একটি ভোট কেন্দ্রের সংবাদে প্রকাশ, সেখানে মহিলারা নাকি ভোট দেওয়ার আগে ব্যালট বাক্সে পুষ্পার্ঘ্য দিয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"এর পর অনেকেই হয়ত উড়ু খৈ গোবিন্দায় নমঃ করবেন"!

* * * * *

ডাঃ কাটজু তাঁর এক নির্বাচনী ভাষণে বলিয়াছেন,—"আপনারা সামান্য ক'টি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে ভোট বিক্রয় যেন না করেন।—"এই বাজারে সামান্য কটি টাকার বদলে কি আর ভোট ছাড়ি বাবা" —সহযাত্রীদের মধ্যে কে একজন মন্তব্য করিয়া ট্রাম হইতে নামিয়া গেলেন।

* * * * *

কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ছাত্র-ছাত্রীদের অভাব-অভিযোগ দূর করিতে প্রয়াসী হইবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। জনৈক ছাত্র সহ-যাত্রী মন্তব্য করিলেন—"শিক্ষক মহোদয়-গণের অভাবের কথাটা চাপা দেওয়ার রেওয়াজ ভদ্রলোকের এক কথার মতোই অক্ষুন্ন আছে"।

* * * * *

শ্রীযুক্ত নেহরু নাকি বলিয়াছেন যে, অন্তত এক ফালি জমি যে চাষ করে নাই, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাকে যেন কোন খেতাব দেওয়া না হয়।—"নেহরুজী নূতন-কিছু বল্লেন নি, ধান দিয়ে লেখা-পড়া শেখার কথা আমরা অনেক আগেই জানি"—মন্তব্য খুড়োর।

* * * * *

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিরোধিতা সম্বন্ধে আশঙ্কিত হইয়া, অনেকে নানা দলে ভিড়িয়া পড়িয়াছেন। নেহরুজী এ'দের সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন—নিজের পায়ে দাঁড়াইতে না পারিয়া এ'রা অন্যের সঙ্গে এক পায় দাঁড়াইতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু এক পায় চলা চলাই নয়। বিশুখুড়ো বলিলেন—"নেহরুজী ভুল করেছেন, অনেকের চলা দেখে মনে হয় এ'রা চার পায়েই চল্‌ছেন"!!
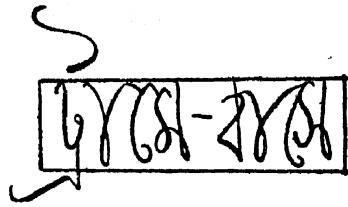
একটি পশু চিকিৎসকদের সভায় খাদ্য মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মুন্সী জানাইয়াছেন যে, দেবাদিদেব ইন্দ্র ছিলেন পৃথিবীর আদি 'জকি' বা ঘোড়-সোওয়ার, সুতরাং ঘোড়-দৌড় আমাদের দেশে চিরকাল অব্যাহত থাকিয়াই সমৃদ্ধি লাভ করিতে থাকিবে।—"নির্বাচনের Trial stakesএর winner আমরা ধরে ফেলেছি কিন্তু খবর ফাঁস করা চলবে না"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * * * *

নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রার্থীরা ভাত-কাপড় হইতে শুরু করিয়া মাদকদ্রব্য এবং ঘোড় দৌড় পর্যন্ত চালু রাখিবার আশ্বাস দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বিশুখুড়ো বলিলেন—"ট্রাম-বাসে সহজ-যাতায়াত আর কোলকাতা স্টেডিয়ামের আশ্বাস না দিয়ে প্রার্থীরা যে কী হারাইতেছেন তা জানেন না;—শিবরামবাবু আর সিগ্রেট কোম্পানী ক্ষমা করবেন!"

* * * * *

মা ও শিশুদের ভাগে একটুখানি বেশী দুধের বরাদ্দের জন্য পশ্চিম-বঙ্গের রাজ্যপাল বয়স্কদের দুগ্ধপানে বিরত থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন।—"কিন্তু কল বা ডোবার জলের বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্যে এতটা ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন আছে কি" —মন্তব্য বলা বাহুল্য বিশুখুড়োর।

* * * * *

মেডিক্যাল ক্লাবের এক সভায় পশ্চিম-বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী উপদেশ দিয়াছেন চিকিৎসকগণ যেন মানুষের স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতি যত্নবান হন। —"কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ চিকিৎসার চেয়ে সোয়া পাঁচ-আনার মানতের প্রতিই যে বেশী বিশ্বাসী" —বলে শ্যামলাল।

নারীদের মধ্যে যাঁরা ভোট দিবেন তাঁদের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা আছে কি না তাহা নাকি অনেকেই জানিতে চাহিয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন,—"আমরা যদ্দুর জানি, লেডিস্‌ সীট ছোড় দিজিয়ে বলবার কেউ থাক্‌বে না।"

* * * * *

উড়িষ্যার এক ভোট-কেন্দ্রে ভোট-দাতারা নাকি বাঘ-ভালুকের ভয়ে যাইতে সাহস পাইতেছেন না।—"বাঘ-ভালুক না হলেও অনেক ভোট-কেন্দ্রে হেলে ছুঁচোর ভয় বড় কম নয়"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

অ্যালান ক্যাম্বেল-জনসন

(১৩)

লিয়াকতের বিবৃতি—"কুখ্যাত অমৃতসর সন্ধি ও কাপুরুষ মহারাজার জালিয়াতী।" ভারতীয় নেতাদের সমালোচনায় ইস্মে। চেম্বারলেনের গডেসবার্গ যাত্রা, রুজভেল্টের ইয়ল্টা যাত্রা এবং নেহরুর লাহোর যাত্রা। বিশ বছর আগের প্রতিষ্ঠানহীন ও নগণ্য জিন্না। জুনাগড়ের নবাব করাচীতে।

ফিলিপ-এলিজাবেথ বিবাহ—বরকর্তা ও কন্যাকর্তা মাউণ্টব্যাটেন। অস্থায়ী গবর্ণর-জেনারেল রাজাগোপালাচারী। ষন্মুখম চেট্টির বিশ্বাস ও আশা—কংগ্রেসের প্রভাব ও চাপ দূরে সরিয়ে দিতে পারবেন। চেট্টি-ভাবা-মাথাই সংহতি—মন্ত্রিসভার প্রধান মস্তিষ্ক হয়ে উঠবার পরিকল্পনা।

একটি তথ্য—আগস্ট মাসেই ডন পত্রিকায় কাশ্মীর গ্রাসের ইচ্ছা। ভারতীয় মুসলমানের মনের সংকট—দুইদিকে আনুগত্য রক্ষার প্রশ্ন। হানাদার উপ-জাতীয়দের উৎসাহ ফুরিয়ে এসেছে। লিয়াকতের বিবৃতি—'কংগ্রেসী দালাল কুইস-লিং আবদুল্লা'। বিচিত্র 'উদ্ঘাটনী' ঘোষণা। ভারতের প্রত্যাখ্যানকেই প্রতিশ্রুতি বলে রটনা। কয়েকটি সুসংবাদ। স্থিতাবস্থা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দান করেছেন নিজাম। চুক্তিপত্রের দাঁড়ি-কমা পরিবর্তনেও মাউণ্টব্যাটেন রাজী হননি। নিজামের ওপর প্যাটেলের বিশ্বাস।

কাশ্মীর সম্পর্কে হিন্দু মহাসভা। 'হিন্দু রাষ্ট্র' সমর্থকদের ইচ্ছা—কাশ্মীর ভারতের বাইরেই থাকুক। স্বামী রামানন্দ তীর্থের কারামুক্তি। সুপ্রীম কম্যান্ডের বিরুদ্ধে প্যাটেলের অভিযোগ—'দিল্লীতে অবস্থিত পাকিস্থানী ঘাটি'। মাউণ্টব্যাটেনের তীব্র প্রতিবাদ। পাকিস্থানের অভিযোগ—সুপ্রীম কম্যান্ড ভারতীয় বাহিনীর ইংগিতে ও ইচ্ছায় চালিত হচ্ছে। লিয়াকতের প্রস্তাব—তবু সুপ্রীম কম্যান্ড থাকুক। 'অকিনলেক থাকলে পাকিস্থানের সুবিধা।" সুপ্রীম কম্যান্ডের অবসান। ভারতীয় বাহিনীর চার হাজার ব্রিটিশ অফিসারের কর্মচ্যুতি। মাউণ্টব্যাটেনের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে পাকিস্থানের সন্দেহ। যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে আর থাকতে চান না মাউণ্ট-ব্যাটেন।

দিগ্বলয়ে কৃষ্ণমেঘ। ভারত-পাকিস্থান বিরোধ কি যুদ্ধে পরিণত হবে? প্যাটেলের নির্দেশ—পাকিস্থানের প্রাপ্য পঞ্চান্ন কোটি টাকা এখন দেওয়া হবে না। রাষ্ট্রীয় সংহতির আর এক অধ্যায়—উড়িষ্যার ও ছত্রিশগড়ের রাজ্যসমূহ প্রদেশের সাধারণ অঞ্চলে পরিণত। প্রাচ্য দেশের পরিবেশ ও মাউণ্টব্যাটেন পরিবারের অনুরাগের ইতিহাস। জিন্নার আক্ষেপ—পাকিস্থানকে অবহেলা করছেন বৃটেন। পাকিস্থানী প্রচার—হিন্দুভক্ত ও মুসল-মানবিদ্বেষী মাউণ্টব্যাটেন পাকিস্থানের ক্ষতি করছেন। লণ্ডনে মাউণ্টব্যাটেনের উক্তি—সমগ্র ভারতের শতাংশের মাত্র তিন অংশে হাঙ্গামা হয়েছে।

বিফল আলোচনা। যুদ্ধক্ষেত্র হিসাবে কাশ্মীর। ভারতীয় বাহিনীর শক্তি নিয়োগে অসুবিধা—ফিনল্যান্ডের যুদ্ধে রুশ বাহিনীর অসুবিধার মত। মাউণ্ট-ব্যাটেনের পরামর্শ—আর অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। নেহরুর কাছে মাউণ্টব্যাটেনের বড়দিনের পত্র। নেহরুকে সংযম ও সতর্কতা অবলম্বনে উপদেশমূলক অনুরোধ। নৈতিক সত্যের মূল্য ও মর্যাদা স্বীকারে নেহরুর শক্তি। মাউণ্টব্যাটেনের আশঙ্কা—ঘটনার ও অবস্থার চাপে নেহরুর মন যদি দুর্বল হয়?

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ৪ঠা নবেম্বর, ১৯৪৭ সাল। যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের একটা বৈঠক শীঘ্রই হবে এবং সে বৈঠকে লিয়াকৎও যোগদান করবেন। লক্ষ্য করে আসছি, যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের এক একটা বৈঠকের ঠিক প্রাক্কালে লিয়াকৎ তাঁর প্রতি-পক্ষের উদ্দেশে এক একটা ভর্ৎসনা -বাণী ঘোষণা করছেন। এবারও তাই করলেন, এখন তিনি অসুস্থতার জন্য শয্যাশায়ী হয়ে রয়েছেন এবং এই অবস্থাতেই একটা বিবৃতি দিয়েছেন। এই বিবৃতিতে তিনি কুখ্যাত অমৃতসর সন্ধির ফল উল্লেখ করেছেন। [১৮৪৬ সালে এই সন্ধি অনুযায়ী লর্ড হার্ডিঞ্জ কাশ্মীরের বর্তমান মহারাজার পূর্বপুরুষ গোলাব সিংকে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য দান করেন।] লিয়াকৎ বলেছেন, কাশ্মীর রাজ্যের ওপর মহারাজার অধিকার রীতিবিরুদ্ধ ও আইনবিরুদ্ধ। এই কারণেই কাশ্মীরী জন-সাধারণের প্রতি সহানুভূতি দেখাবার জন্য রাজ্যের বাইরের এক দল লোকের মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। লিয়াকৎ তাঁর বিবৃতিতে একথাও বললেন যে, যাঁরা কাশ্মীরী জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের এই অভিযানকে 'উপজাতীয় আক্রমণ' আখ্যা দিচ্ছেন, তাঁরা একটা মিথ্যা ইতিহাস নতুন করে রচনার চেষ্টা করছেন। আরও অভিযোগ করেছেন লিয়াকৎ—কাশ্মীরের কাপুরুষ মহারাজা ভারত গবর্ণমেণ্টের সশস্ত্র সাহায্য নিয়ে কাশ্মীরী জনসাধারণের ভাগ্যের বিরুদ্ধে জালিয়াতী করেছেন। নেহরুর অসুস্থতার সত্যতা সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন লিয়াকৎ, অর্থাৎ নেহরু লাহোরে না যাবার জন্যেই অজুহাত হিসাবে একটা অসুস্থতার খবর রটনা করেছেন। ভাবছি, এই ধরণের ভাষা কি 'বন্ধুত্বপূর্ণভাবে আলোচনা'র অনুকূল ভাষা?

ভারতের দেশরক্ষা কমিটির বৈঠক হলো। প্যাটেল এবং বলদেব সম্প্রতি কাশ্মীরের যুদ্ধাঞ্চল থেকে ফিরেছেন। উভয়েই কাশ্মীরের অবস্থা সম্পর্কে উদ্বেগজনক বিবরণ প্রদান করলেন। কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, সবার আগে বরমূলা পুনরধিকার করার জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দান করতে হবে। উপজাতীয় হানাদারের দল তাদের প্রথম অভিযানের বেগে এগিয়ে এসে বরমূলা অধিকার করে নিয়েছে। কাশ্মীর উপত্যকার প্রবেশপথে বরমূলা অবস্থিত। বরমূলাতে কিছুসংখ্যক য়ুরোপীয় নর-নারী হতাহত হয়েছেন। কিছুসংখ্যক

ব্রিটিশ প্রজারও সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না। ডেলি এক্সপ্রেসের সিডনি স্মিথের পাত্তা নেই। এ'রা কোথাও আটক হয়ে আছেন বলেই মনে হচ্ছে। কমিটি উপলব্ধি করেছেন, বরমুলা পুনরধিকার করে ফেলতে পারলে উপত্যকার অভ্যন্তরে উপজাতীয়েরা সহজে আর ছড়িয়ে পড়বার পথ পাবে না।

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ৭ই নবেম্বর, ১৯৪৭ সাল। জরুরি কমিটির বৈঠক। শান্তিরক্ষায় পূর্ব পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের যোগ্যতা ও শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা এবং সমালোচনা হলো। গোপালস্বামী এবং নিয়োগী, উভয়েই পূর্ব পাঞ্জাবের যোগ্যতা ও শক্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারছিলেন না। আর একটি বিষয় আলোচিত হলো—উদ্বাস্তু গরু-মহিষের সমস্যা। গুরগাঁও জেলা থেকে যেসব অধিবাসী ঘর ছেড়ে পাকিস্থানে চলে যাচ্ছে; তারা কতসংখ্যক্ গরু-মহিষ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে? কমিটির সদস্যেরা প্রস্তাব করলেন—প্রতি দশ ব্যক্তির এক একটি পরিবার একটি করে গরু সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন—অতএব এই ব্যবস্থাই হলো যে, পরিবারে পাঁচজন লোক থাকলে আধখানা গরু সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে।

গবর্ণর-জেনারেলের বডিগার্ড দলের দ্বিতীয় কম্যাণ্ডার ক্যাপ্টেন ইয়াকুব খাঁকে আজ আমরা সম্বর্ধনা জানিয়ে বিদায় দিলাম। সৈন্যবাহিনী বিভক্ত করা হচ্ছে, তাই যথানির্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুসারে ইয়াকুব খাঁ করাচীর গবর্ণমেণ্ট হাউসে চলে যাবেন বডিগার্ড দলের মুসলমান সৈনিকদের সঙ্গে নিয়ে। এই অনুষ্ঠানে রীস এবং ইস্‌মেও যোগদান করলেন। ইয়াকুব, রীস, ইসমে ও আমি—মাত্র এই চারজনে মিলে বিদায়-ভোজের টেবিলে গল্প করলাম।

ইস্‌মে বললেন, ভারতীয় নেতাদের কেউ কেউ আপত্তি করছেন যে নেহরুর কখনই লাহোরে যাওয়া উচিত নয়। নেহরুর লাহোর যাবার প্রস্তাবকে নেতারা চেম্বারলেনের গডেসবার্গ যাবার ঘটনার সঙ্গে তুলনা করছেন। ইস্‌মে বললেন—ভারতীয় নেতাদের আমার স্মরণ করিয়ে দিতে ইচ্ছে করে যে, রুজভেল্টও ইয়ল্টা গিয়েছিলেন।

জিন্নার নেতৃত্ব ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধেও আলোচনা হলো। জিন্না বস্তুতঃ তাঁর শেষ বয়সে নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন এবং এ প্রতিষ্ঠাও বেশী দিনের ঘটনা নয়। ইস্‌মে বললেন, ভূতপূর্ব গবর্ণর-জেনারেল উইলিংডনের সময়েও তিনি ভারতে কাজ করেছিলেন। সেই সময় জিন্নাকে কেউ প্রথম শ্রেণীর নেতা বলে মনে করতো না, কারণ ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে বড় নেতা হিসাবে গুরুত্ব লাভ করার মত কোন প্রতিপত্তি এবং প্রভাবও সে সময় জিন্নার ছিল না। তখন কেউ ধারণাও করতে পারেননি যে, এই জিন্নাই ভবিষ্যতে মুসলমানদের সব চেয়ে বড় নেতা হয়ে উঠবেন।

ইস্‌মের কথা শুনে আমারও একটা কথা মনে পড়ে গেল। গতবার লণ্ডনে যখন ছিলাম তখন লেডি রীডিং-এর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। বিশ বছর আগের জিন্নার অবস্থা সম্পর্কে লেডি রীডিং সংক্ষেপে কয়েকটি কথার মধ্যে যে পরিচয়-চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন, সেটা এখনো আমার স্মরণে আছে। লেডি রীডিং বললেন—'আমি যখন ভারতে ছিলাম তখন জিন্না শিকারসন্ধানী চিতাবাঘের মত চারদিকে শুধু ছুটোছুটি করেই ফিরতেন।'

নয়াদিল্লী, শনিবার, ৮ই নবেম্বর, ১৯৪৭ সাল। আজ সকালে এখানে যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের বৈঠক হলো। জিন্না ও লিয়াকৎকে এই বৈঠকে যোগদানের জন্য অনেক অনুরোধ করেছিলেন মাউণ্ট-ব্যাটেন, কিন্তু দুজনের একজনও এলেন না। পাকিস্থানের পক্ষ থেকে এসেছেন যানবাহন মন্ত্রী নিশ্‌তার এবং গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী জেনারেল মহম্মদ আলি। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর নেহরু ও নিশ্‌তার একটি কক্ষে বসে 'রাজনৈতিকভাবে' এবং ভি পি মেনন ও মহম্মদ আলি আর এক কক্ষে বসে 'সরকারীভাবে' সমস্যার আলোচনা করলেন।

আলোচনার মত সাধারণ বিষয়ক্ষেত্র অনেকগুলি পাওয়া গেল, কিন্তু ব্যবস্থার কথা উঠতেই দুপক্ষের অভিমত পরস্পর-বিরোধী হয়ে উঠলো। কাশ্মীর থেকে উভয় পক্ষেরই সৈন্য অপসারণ করা কর্তব্য—এবিষয়ে মতান্তর দেখা দিল না, কিন্তু কিভাবে অপসারণ করতে হবে? এখানেই যত মতভেদ। পাকিস্থান চাইছেন—দুই পক্ষই একই সময়ে নিজের নিজের সৈন্য দুদিকে সরিয়ে নিয়ে যাবেন। ভারতের পক্ষ থেকে দৃঢ়ভাবেই দাবী করা হয়েছে—কাশ্মীর থেকে সমস্ত হানাদার অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত ভারত সৈন্য অপসারণ করতে পারবেন না।

ভারতবাসীর এই দাবীর জোরের পেছনে এখন একটা মনের জোরও দেখা দিয়েছে, কারণ কাশ্মীর থেকে এই সংবাদ এসে গেছে যে, বরমুলো পুনরধিকার করা হয়ে গেছে। গত মঙ্গলবার ভারতীয় বাহিনীকে বরমুলার দিকে সৈন্য চালনার যে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সে নির্দেশ সার্থক হয়েছে।

আগামীকাল মাউণ্টব্যাটেনের লণ্ডন রওনা হবার কথা। এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত মনেই যেতে পারবেন মাউণ্টব্যাটেন। আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে এতটা নিশ্চিন্ত হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

জুনাগড় সমস্যা নতুন উদ্বেগ সৃষ্টি করেই চলেছে। গত সোমবারেই দেশরক্ষা কমিটির কাছে রিপোর্ট এসে গেছে যে, ভারতীয় সৈন্য পয়লা নবেম্বর তারিখে মাংরোল এবং বাবরিয়াবাড়ে প্রবেশ করেছে এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থাতেই ঐ দুই রাজ্য পুনরধিকার করা হয়ে গেছে। আশা করা যাচ্ছে যে, প্যাটেল জুনাগড় রাজ্য অধিকার করার প্রস্তাব আর উত্থাপন করবেন না। অন্যান্য বৃহত্তর সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত জুনাগড় অধিকার-প্রস্তাব স্থগিত রাখতে প্যাটেল এখন খুশিমনেই রাজী হবেন বলে বিশ্বাস করা যেতে পারে।

কিন্তু আজই বেলা একটার সময় জুনাগড়ের দেওয়ানের কাছ থেকে একটা অনুরোধ-পত্র উপস্থিত হলো। দেওয়ান লিখেছেন—জুনাগড় রাজ্য একটা বিশৃংখলার মধ্যে সম্পূর্ণভাবেই ভেঙে পড়তে চলেছে। এই পরিণাম থেকে জুনাগড় রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য জুনাগড়ের সমগ্র দায়িত্ব ভারত গবর্ণমেণ্টকে গ্রহণ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। যতদিন না জুনাগড়ের রাষ্ট্রভুক্তি সম্পর্কিত সকল জটিল প্রশ্নের একটা সংগত সমাধান হয়ে যায়, ততদিন ভারত গবর্ণমেণ্টকে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে।

লিয়াকৎকেও একটি ভিন্ন পত্রে দেওয়ান জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি রাজ্যের জনমত, রাজ্যের শাসন কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত এবং স্বয়ং নবাবের অভিমতে সমর্থিত হয়েই ভারত গবর্ণমেণ্টের কাছে এই প্রস্তাব তথা অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন। দেওয়ান যে সময় ভারত সরকারের কাছে এই অনুরোধ-পত্র লিখেছেন, তার সামান্য কিছুক্ষণ আগেই নবাব জুনাগড় রাজ্য ছেড়ে বিমানযোগে করাচী চলে গেছেন।

দেওয়ানের প্রস্তাবে সম্মত হতে এক মুহূর্তও দেরী করেননি ভারত গবর্ণমেণ্ট। জুনাগড়ের প্রশাসন ব্যবস্থার সকল ভার গ্রহণের জন্য তখুনি রাজকোটের

আঞ্চলিক কমিশনারের কাছে নির্দেশ পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

জুনাগড়ের সম্পর্কে এই যে সিম্ধান্ত গ্রহণ করা হলো, তার কোন খবরই মাউণ্টব্যাটেন জানতে পারেননি। সন্ধ্যা হবার পর মাউণ্টব্যাটেনকে জানানো হলো। এরকম ব্যাপার এই প্রথম হলো। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর থেকে আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রের নীতি সম্পর্কিত কোন বড় রকমের কাজ মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনা না করে গবর্ণমেণ্ট কখনো করেননি। মাউণ্টব্যাটেনের ধারণা, প্যাটেল এবং ভি পির ইচ্ছা অনুসারেই জুনাগড় সম্বন্ধে এই সিম্ধান্তের সম্পর্কে তাঁর পরামর্শ চাওয়া হয়নি। প্যাটেল ও ভি পি সম্ভবতঃ মনে করেছেন যে, এ সিম্ধান্ত সমর্থন করতে মাউণ্টব্যাটেন নিজেকে বিব্রত বোধ করবেন। তাই তাঁরা মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনা না করেই সিম্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে আর একটা উদ্বেগজনক সংবাদ এসেছে হায়দরাবাদ থেকে। নিজামের প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের শুভেচ্ছার যেটুকু এখনো অবশিষ্ট রয়েছে, নিজাম যেন সেটুকুও নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য বেপরোয়া ব্যবহার আরম্ভ করেছেন। চারদিন ধরে আলোচনা করে মাউণ্টব্যাটেন নিজামের নতুন ডেলিগেশনকে রাজী করাতে পেরেছিলেন যে, ডেলিগেশন এইবার হায়দরাবাদে ফিরে গিয়ে পূর্বরচিত স্থিতাবস্থা চুক্তির কোন রদবদল না করে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দান করবার জন্যই নিজামকে অনুরোধ করবেন। গত কাল ডেলিগেশন দিল্লী ছেড়ে হায়দরাবাদ চলে গেছেন। এর পরেও নিজাম আবার সময় চাইছেন। মাউণ্টব্যাটেন লণ্ডনে যাচ্ছেন, এই ঘটনাকেই একটা যুক্তি তথা যুক্তির অজুহাত করে নিজাম জানিয়েছেন যে—আগামী ২৫শে নবেম্বর পর্যন্ত সময় দেওয়া হোক, তার আগে তিনি চুক্তিপত্রে সই করতে পারবেন না।

ভারত গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে পরামর্শ করার পর মাউণ্টব্যাটেন নিজামকে প্রত্যুত্তরে জানিয়ে দিলেন যে, নিজামের এই প্রস্তাবে তিনি সম্মত হচ্ছেন, কিন্তু সর্ত এই যে, এই মাস শেষ হবার আগেই নিজামকে ভারত গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে একটা নিষ্পত্তি করে ফেলতেই হবে।

নয়াদিল্লী, রবিবার, ৯ই নবেম্বর, ১৯৪৭ সাল। মাউণ্টব্যাটেন চললেন লণ্ডন। রাজকুমারী এলিজাবেথের বিবাহ অনুষ্ঠানে মাউণ্টব্যাটেনকে উপস্থিত থাকতেই হবে। এ সময় লণ্ডন যেতে তাঁর মোটেই ভাল লাগছিল না। এতগুলি সমস্যা অতি জটিল অবস্থায় পেছনে রেখে সাময়িকভাবেও এখন লণ্ডন যেতে তাঁর মন চাইছিল না। কিন্তু কুমারী এলিজাবেথ সম্পর্কের দিক দিয়ে মাউণ্টব্যাটেনের ভ্রাতুষ্পুত্রী। তা ছাড়া, বর ফিলিপ মাউণ্টব্যাটেন তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র। শুধু তাই নয়, ফিলিপ গত আঠার বছর ধরে ইংলণ্ডে মাউণ্টব্যাটেনেরই সঙ্গে ঘরের ছেলের মত রয়েছেন। সুতরাং, এ বিবাহ অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকাও মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে সম্ভবপর নয়। বরকর্তা ও কন্যাকর্তা মাউণ্টব্যাটেন লণ্ডন রওনা হয়ে গেলেন।

খুব সকালে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে পালাম বিমানবন্দরে উপস্থিত হলাম। বিমান ছাড়বার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মাউণ্টব্যাটেনকে দেখে মনে হলো না যে, লণ্ডন যেতে তিনি একটুও উৎসাহ বোধ করছেন।

সকাল দশটার সময় রাজাগোপালাচারীর শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলাম। মাউণ্টব্যাটেনের অনুপস্থিতির সময় রাজাগোপালাচারীই গবর্ণর-জেনারেলের পদে নিযুক্ত থাকবেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় থেকেই কংগ্রেসের এই রাজনীতিজ্ঞ প্রবীণ নেতা বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণরের পদে অধিষ্ঠিত থেকে কাজ করছেন। কাউন্সিল চেম্বারে অন্যান্য সকল মন্ত্রীর সম্মুখে ভারতের প্রথম (অস্থায়ী) ভারতীয় গবর্ণর-জেনারেলের শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান পালিত হলো।

কিছুদিন আগে শপথ গ্রহণের প্রসঙ্গে ভারতের অর্থমন্ত্রী ষণ্মুখম চেট্টির সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছিল। গত আগষ্ট মাসের শেষ দিকে গবর্ণমেণ্ট হাউসের এক মধ্যাহ্নভোজের আসরে উপস্থিত পাঁচজন অতিথির মধ্যে ষণ্মুখম চেট্টি, পাক হাই কমিশনার জাহিদ হোসেন এবং বোম্বাইয়ের প্রধান মন্ত্রী খেরের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। জাহিদ হোসেন বড় ছটফটে স্বভাবের মানুষ, একটুতেই ঘাবড়ে যান এবং দিল্লীতে তিনি নিরাপদে থাকতে পারবেন কি না, এই সন্দেহেই তাঁর মন তখন ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। খেরের সঙ্গে এর আগে বোম্বাইয়ে আলাপ করবার সুযোগ আমার হয়েছিল। সেদিনের ভোজসভাতেও খেরের সঙ্গে আলাপ করে আমার ধারণা হয়েছে যে, ভারতীয় রাজনীতির এই নতুন ও পরিবর্তিত অধ্যায়ে খের ভারতের অন্যতম 'শক্তিশালী' ব্যক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা ও কৃতিত্বের পরিচয় দেবেন।

ষণ্মুখম চেট্টির পাশেই আমি বসেছিলাম। চেট্টি ভারতের অর্থমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত রয়েছেন, অনেকে এই ঘটনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে নেহরু গবর্ণমেণ্টের অর্থনীতিক আদর্শ সম্বন্ধে মন্তব্য করে থাকেন। বলা হয়ে থাকে যে, চেট্টিকে অর্থমন্ত্রীর পদ প্রদান করে নেহরু শিল্পপতি, ধনিক এবং বিদেশী মূলধনের প্রতি কিছুটা অনুগ্রহ প্রদর্শনের নীতি গ্রহণ করেছেন। বিশেষজ্ঞের মত নিজের ধারণার নির্ভুলতা সম্বন্ধে একটা দৃঢ় প্রত্যয়ের ভাব নিয়ে চেট্টি কথা বলেন। কিন্তু খেরের চরিত্রে যে রাজনৈতিক নিষ্ঠা ও শক্তির প্রমাণ পেলাম, চেট্টির মধ্যে তার কোন প্রমাণ পেলাম না।

চেট্টি তাঁর একটি আশা এই ভোজের আসরে কথায় কথায় ব্যক্ত করলেন। চেট্টি আশা করছেন যে, মাথাই এবং ভাবাকে নিয়ে তিনি এমন একটা গোষ্ঠী সৃষ্টি করবেন, যেটা বস্তুতঃ মন্ত্রিসভার 'প্রধান মস্তিষ্ক' হয়ে উঠতে পারবে। কংগ্রেসের অর্থনীতিক আদর্শের এবং কংগ্রেসের চাপ দূরে সরিয়ে রেখে এ'রা তিনজন তাঁদের ইচ্ছামত নীতি অবাধে অনুসরণ করতে পারবেন।

চেট্টি যেভাবে যতটা আশা ও বিশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন, আমার পক্ষে ততটা বিশ্বাস করা সম্ভবপর হয়নি। এতটা প্রাধান্য লাভ করতে এ'রা পারবেন কি না, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমার ধারণা, নতুন ভারতের নতুন রাজনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থার মধ্যে এ'রা নেতৃত্বের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর চেয়ে বেশী বা উচ্চতর কোন প্রাধান্য লাভ করতে সক্ষম হবেন না।

এর পর চেট্টি শপথ গ্রহণের প্রসঙ্গে নানারকম আলোচনা করলেন। চেট্টির কাছেই শুনলাম, ভারতে শপথ গ্রহণ করা লোকের পক্ষে একটা যা-তা ব্যাপার নয়। চেট্টি বললেন—স্বর্গে যাবার পর নিজের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ দেবার মত পার্থিব নথিপত্র হয়তো হাতের কাছে না'ও থাকতে পারে। তখন কি হবে? এই বিষয়টা চিন্তা করেই শপথ গ্রহণের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। চেট্টি আরও তথ্য জানালেন। সাধারণতঃ তিনটি বস্তু স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করা হয়। গরুর লেজ, কর্পূরে দীপের শিখা এবং সন্তানের মস্তক। চেট্টি বললেন—অবশ্য এমন হৃদয়হীন লোকও আছে, যে ছেলের মাথার টুপির নীচে চাপাটি লুকিয়ে রেখে, তারপর টুপির ওপর থেকে মাথা ছুঁয়ে শপথ গ্রহণ করে।

আজ স্বচক্ষে জনৈক ভারতীয়ের শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান দেখলাম। সাদা ধুতি

পরিহিত এবং চোখে কালো চশমা, ভারতের 'সি-আর' মৃদু মৃদু হাসছিলেন। হিন্দু পদ্ধতিতে হাতজোড় করে তিনি সকলকে নমস্কার জানালেন। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী ব্যানার্জি রাজকীয় অনুমোদন-বাণী পাঠ করলেন—"আমাদের বিশ্বস্ত ও অতিপ্রিয় চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীকে অভিনন্দিত করে...........।" এর পর প্রধান বিচারপতি কানিয়া শপথবাণী নিবেদন করলেন। দেখলাম, এই শপথ-বাণীতে 'শপথ' (swear) কথাটাই বদলে দেওয়া হয়েছে। চক্রবর্তী রাজাগোপালা-চারী তাঁর দায়িত্ব 'স্বীকার ও সমর্থন' করে গবর্ণর-জেনারেলের পদ গ্রহণ করলেন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়ে গেল। অতি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান, কিন্তু কী বৃহৎ ঐতিহাসিক পরিবর্তনের একটি দৃশ্য আমরা চোখের সম্মুখে আজ দেখতে পাচ্ছি। অদ্ভুত নাটকীয় নিয়তির মত একটা পরিবর্তন। এক কংগ্রেস-যোদ্ধা যিনি সারা জীবন ধ'রে ব্রিটিশরাজের অবসান ঘটাবার জন্য চেষ্টা করেছেন, তিনি আজ সত্য সত্যই রাষ্ট্রের প্রধানের পদ গ্রহণ করছেন। কংগ্রেস-যোদ্ধার অভীষ্ট পূর্ণ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথাও মনে হচ্ছে। এই নাটকীয় পরি-বর্তনের মধ্যে একটা পরিহাসের দৃশ্যও দেখতে পাচ্ছি। ব্রিটিশরাজের যে সব প্রথা ও উপাধির উচ্ছেদ করার জন্য কংগ্রেস-যোদ্ধা সারাজীবন ধরে আন্দোলন করেছেন, আজ তিনি ব্রিটিশরাজের প্রচলিত সেই সব প্রথা ও উপাধির ঠাট স্বীকার করে নিয়েই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ গ্রহণ করছেন।

অস্থায়ী গবর্ণর-জেনারেল রাজা-গোপালাচারীর প্রথম ভোজসভায় উপস্থিত হলাম। এই ভোজসভায় তিনি গবর্ণর-জেনারেলের স্টাফকে নিমন্ত্রণ করেছেন। রাজাগোপালাচারীর কন্যা শ্রীমতী নার্মাগিরি সভাস্বামিনীরূপে অতিথিদের সম্বর্ধনা জানালেন। এ ডি সি তথা পার্শ্বচর অফি-সারেরা বাইরের অতিথিদের রীতি অনু-যায়ী আপ্যায়িত করলেন। আমরা স্টাফের লোকেরা সার দিয়ে দাঁড়ালাম গবর্ণর-জেনারেলকে পরিচয় প্রদানের জন্য। মহিলা অতিথিরা সকলেই যথারীতি হাঁটু ভেঙে ও শরীর ঝুঁকিয়ে সৌজন্যের ভঙ্গী প্রদর্শন করলেন। সি-আর অনুরোধ করলেন—'থাক থাক, আমার জন্যে এ সব কিছু করতে হবে না।'

ভোজপর্ব হয়ে যাবার পর সি-আর আমাকে ও ভের্নেনকে ডেকে পাঠালেন। আমরা আশা করেছিলাম, সাধারণ লৌকিকতা ও সৌজন্য হিসাবে সি-আর কয়েকটা সাধারণ আলাপী কথাবার্তা বলে আমাদের বিদায় দেবেন। কিন্তু তা হয়নি, বরং অনেকক্ষণ ধরে নানা বিষয়ে তিনি আমাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন এবং আমরা তাঁর মনের পরিচয়ও অনেকখানি পেয়ে গেলাম। আলোচনার শেষে আমাদের মনে এই ধারণা খুবই দৃঢ় হয়ে গেল যে, মাউণ্টব্যাটেন বিদায় নেবার পর তাঁর জায়গায় বসবার মত আদর্শ যোগ্য ব্যক্তি একজন আছেন। তিনি রাজাগোপালাচারী।

মাউণ্টব্যাটেন ও রাজাগোপালাচারী—ভারতের গবর্ণর-জেনারেল পদের দু'জনেই যোগ্য অধিকারী। কিন্তু চিন্তারীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীতে দু'জনের মধ্যে কত পার্থক্য! প্রবল কর্মশক্তি ও উৎসাহের মানুষ মাউণ্ট-ব্যাটেন। এগিয়ে যেয়ে সমস্যার ও ঘটনার সম্মুখীন হতে তিনি সর্বদা প্রস্তুত। সমস্যাকে তিনি আঘাত করেন বাইরের দিক থেকে। তীব্র ও অকুণ্ঠ উদ্যমের সঙ্গে তিনি সমস্যার বাহিরটাই ভেঙে দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে ইচ্ছুক। রাজাগোপালাচারী এর বিপরীত। প্রবীণ সি-আর অন্তর্দৃষ্টিকুশল মানুষ। তিনি আসলে তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ও চিন্তাশীল মনীষী। সমস্যার ভিতরে দৃষ্টিপাত করতেই তিনি অভ্যস্ত। সমস্যার গভীরে নিহিত মূল কারণগুলির উচ্ছেদসাধন করে সমস্যার সমাধান করতে তিনি ইচ্ছুক।

সিমলা, বৃহস্পতিবার, ২০শে নবেম্বর, ১৯৪৭ সাল। গবর্ণর জেনারেল রাজ-গোপালাচারীর অনুমতি নিয়ে সিমলাতে এসেছি। আমার পরিবারের সকলেই সিমলাতে রয়েছে। এখানে এসেও কোন বিশ্রাম নেই। দিল্লী থেকে আমার সেক্রেটারী থলি ভর্তি করে কাগজপত্র পাঠিয়েই চলেছেন। তা ছাড়া টেলি-ফোনেও প্রতিদিন দিল্লী থেকে তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ করতে হচ্ছে।

কয়েকদিন ধরে নিয়মিতভাবে দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ করবার সুযোগ পাইনি। আজ সংবাদপত্রের স্তূপের দিকে চোখ পড়তেই দেখতে পেলাম ১২ই নবেম্বর তারিখে ডন পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধের একটি শিরোনামা—'আক্রান্ত জুনাগড়'। ডন লিখেছেন—'জুনাগড়ের দেওয়ান এবং ভারত গবর্ণমেন্ট যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করে থাকুক না কেন, জুনাগড় নিয়মতন্ত্র অনুসারে পাকিস্থানেরই অন্তর্ভুক্ত রাজ্য। জুনাগড়ের নবাব পাকিস্থানের সঙ্গে রাষ্ট্রভুক্তির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দান করেছেন। ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের নির্দেশ অনুসারে জুনাগড়ের এই পাকিস্থানভুক্তি সর্বতোভাবে বৈধ সঙ্গত ও অপরিবর্তনীয়।'

কিন্তু কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সম্বন্ধে ডন কি বলেন? যে আইনের উল্লেখ করেছেন ডন, সেই আইন অনুসারে কাশ্মীরের ভারতভুক্তিকেও তো 'বৈধ সঙ্গত ও অপরিবর্তনীয়' বলতে হয়? কিন্তু এ প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন ডন।

আমার নিজের নোট বইয়ে লিখিত তথ্যগুলির দিকে দৃষ্টি দিতেই বিশেষ অর্থপূর্ণ একটি তথ্যের উল্লেখ চোখে পড়লো। কাশ্মীর যখন রাষ্ট্রভুক্তির কোন সিদ্ধান্তই করেননি, সেই সময়ের ডন পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধের একটি অংশ। ২৪শে আগষ্ট তারিখের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ডন লিখেছেন—"কাশ্মীরের মহারাজাকে এইবার স্পষ্ট করে বলে দেবার সময় এসে গেছে যে, তাঁকে একটা সিদ্ধান্ত করে ফেলতেই হবে এবং সে সিদ্ধান্ত হবে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হবার সিদ্ধান্ত।......যদি কাশ্মীর পাকিস্থানে যোগদান না করেন, তবে যতদূর ভয়াবহ ও সাংঘাতিক অশান্তি হতে পারে তাই হবে। এ অশান্তি হবেই হবে, ঠেকিয়ে রাখা আদৌ সম্ভবপর হবে না।"

কাশ্মীরের সামরিক পরিস্থিতি ভারতের পক্ষে আরও কিছুটা উন্নত এবং অনুকূল হয়েছে। ভারতীয় বাহিনী উরি সহরও অধিকার করে নিয়েছে। সামরিক ক্রিয়াকলাপের দিক দিয়ে উরি সহর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া শীত এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গিরিপথগুলি বরফে ঢাকা পড়ে বন্ধ হয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। কাজেই কাশ্মীরে সামরিক সংঘর্ষও কিছুটা মন্দীভূত হয়ে আসবে বলে মনে হয়। আর একটা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, উপজাতীয় হানাদারের দল এখন উৎসাহহীন হয়ে ঘরে ফিরে যাবার জন্যই উৎসুক হয়ে উঠেছে। যারা 'ধর্মযুদ্ধ' করতে এসেছিল তারা লুণ্ঠনকার্যেই উৎসাহ দেখিয়েছে বেশী এবং লুণ্ঠনকার্যের শেষে ধর্মযুদ্ধের উৎসাহ আর বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না। যাই হোক, এই ঘটনায় কাশ্মীরের মুসলমানদের মনে যে অতি গভীর ও ব্যাপক একটা চিন্তার আলোড়ন দেখা দিয়েছে তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

গত সপ্তাহেই দুই ডোমিনিয়নের মধ্যে সম্ভাবিত চুক্তির যে খসড়া রচিত হয়েছিল, সে খসড়া বিবেচনা করার পর লিয়াকৎ একটি বিবৃতি দিয়েছেন। এই বিবৃতির দ্বারা মীমাংসার সম্ভাবনাকে

কতখানি সাহায্য করা হয়েছে সেটা বিবৃতির ভাষা, মন্তব্য ও বক্তব্য থেকেই ধারণা করা যেতে পারে। লিয়াকৎ বলেছেন —'কুইসলিং শেখ আবদুল্লা, কংগ্রেসের দীর্ঘকালের দালাল আবদুল্লা নিজের ব্যক্তিগত প্রাধান্য এবং স্বার্থের জন্য কাশ্মীরী জনসাধারণের প্রাণ, সম্মান ও স্বাধীনতা বিকিয়ে দেবার চেষ্টা করে ফিরছে।'

নেহরু ও আবদুল্লা দুজনেই ব্যক্তিগতভাবে পরস্পরের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং বন্ধুত্বের সম্পর্কও দীর্ঘকালের। সুতরাং লিয়াকতের এই উক্তি নেহরুর মন কতখানি ক্ষুব্ধ করে তুলবে, সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। মানুষের মনে ও সম্মানে আঘাত দেবার মত উক্তি এর চেয়ে বেশি খারাপ আর হতে পারে না।

মাউণ্টব্যাটেন এখন লণ্ডনে রয়েছেন, তাই লিয়াকৎ এই সময়ে একটি কথা মাউণ্টব্যাটেনকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত মনে করেছেন। লিয়াকৎ এই বিবৃতিতে বলেছেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে মাউণ্টব্যাটেন এর আগেই যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন, সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হচ্ছে কেন? লিয়াকৎ একটা 'ভিতরের কথা' উদ্‌ঘাটন করে দেওয়া কর্তব্য মনে করেছেন। ভিতরের কথাটি হলো—মাউণ্টব্যাটেনের প্রতিশ্রুতি। পয়লা নবেম্বরের লাহোর বৈঠকে জিন্না যেসব 'সর্ত' উত্থাপন করেছিলেন, সেই সব সর্তই মেনে নিয়ে মাউণ্টব্যাটেন নাকি একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সর্তগুলি হলো—দুই গবর্ণমেণ্টই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করবেন, ভারতীয় সৈন্য এবং অভিযানকারী উপজাতীয়েরা একই সময়ে কাশ্মীর থেকে সরে যাবে, দুই ডোমিনিয়নের দুই গবর্ণর-জেনারেল সম্মিলিতভাবে কাশ্মীর রাজের শাসনকার্য আপাততঃ পরিচালনা করবেন, এবং তাঁদেরই সম্মিলিত পরিচালনায় ও পর্যবেক্ষণে কাশ্মীরের গণভোট গৃহীত হবে।

লিয়াকৎ এই যে তথ্য তাঁর বিবৃতিতে উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছেন, সেটা তথ্যই নয়। কারণ, সেই সময়েই জিন্নার এই 'সর্তাবলী' মাউণ্টব্যাটেন ভারত গবর্ণমেণ্টকে জানিয়েছিলেন এবং ভারত গবর্ণমেণ্টও সে সর্তাবলী প্রত্যাখ্যান করে অবিলম্বে করাচীতে পত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। প্রত্যাখ্যানই করা হয়েছিল, কোন প্রতিশ্রুতি কেউ দেয়নি। অথচ লিয়াকৎ তাঁর বিবৃতিতে তথ্য 'উদ্‌ঘাটন' করেছেন।

সিমলা, বুধবার, ২৬শে নবেম্বর, ১৯৪৭ সাল। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর অনুগ্রহে আজ কয়েকটি সুসংবাদ শুনলাম। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর কোন একটি দিনের মধ্যে এতগুলি ভাল খবর একসঙ্গে শুনবার সৌভাগ্য হয়নি। চারদিকের লক্ষণ দেখে এই ধারণা হচ্ছে যে, উপমহাদেশের শান্তি ছিন্নভিন্ন করবার জন্য যে ঝড় দেখা দিয়েছে, সে ঝড়ের রূপ যতখানি খারাপ হয়ে উঠবার ছিল তা হয়ে গেছে। এইবার ধীরে ধীরে কেটে যেতে থাকবে। মাউণ্টব্যাটেন লণ্ডন থেকে দিল্লীতে ফিরেছেন। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কণ্ঠে শুনলাম—নেহরু শেখ আবদুল্লারই একটা বিপজ্জনক প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেছেন। আবদুল্লা বলেছেন যে, গণভোটের আর প্রয়োজন নেই। নেহরু এক বিবৃতিতে বিশেষ জোর দিয়ে এবং পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যে সর্তে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি স্বীকার করা হয়েছে, ভারত গবর্ণমেণ্ট সেই সর্ত অবশ্যই পালন করবেন। কোন নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডলীর পরিচালিত ব্যবস্থায় গণভোট গ্রহণ করে কাশ্মীরী জনসাধারণের ইচ্ছা নির্ণয় করা হবে। কাশ্মীর থেকে একই সময়ে উভয় পক্ষের সৈন্য অপসারণের প্রস্তাব নেহরু প্রত্যাখ্যান করেছেন। নেহরু বলেছেন, এ প্রস্তাব সমর্থন করার অর্থ পাকিস্থানের নিছক একটা কূটকৌশলকে সমর্থন করা। আর একটি ভাল খবর হলো —লিয়াকৎ আগামীকাল দিল্লীতে আসছেন, যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের বৈঠকে যোগদানের জন্য। কাশ্মীরের ওপর আক্রমণ আরম্ভ হবার পর দুই প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে এই প্রথম সাক্ষাৎ হবে। তৃতীয় সুসংবাদ, করাচী ঘোষণা করেছেন যে, নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ভেঙে দেওয়া হলো। নিখিল পাকিস্থান মুসলিম লীগ শুধু পাকিস্থানের মধ্যেই তাঁদের ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ করে রাখবেন। খুবই প্রশংসনীয় ও বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্তের ফলে ভারতের চার কোটি মুসলমানের মন একটা বাঁধা থেকে মুক্তি লাভ করবে। দুদিকে আনুগত্য রক্ষা করার একটা কঠিন মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে ভারতীয় মুসলমানেরা রক্ষা পেল।

সিমলা, শনিবার, ২৯শে নবেম্বর, ১৯৪৭ সাল। ভাল খবর। শেষ পর্যন্ত নিজাম স্থিতাবস্থা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দান করেছেন। প্যাটেল একটি বিবৃতিতে মাউণ্টব্যাটেনের কৃতিত্বের প্রশংসা করেছেন।

স্থিতাবস্থা চুক্তিতে নিজামের সম্মতি পেতে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঝঞ্ঝাট ভুগতে হয়েছে। গত মঙ্গলবারেও নিজামের ডেলিগেশন মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনা করতে এসে চুক্তিপত্রের সামান্য এক একটা কথা, একটা কমা বা দাঁড়ি ইত্যাদি তুচ্ছ বস্তু রদবদল করার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি ও বাগাড়ম্বর করেছেন। চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু তাঁরা বদলাতে পেরেছেন, এইরকম একটা আত্মশ্লাঘা ও বাহাদুরী করবার একটা প্রমাণ যাতে নিজামের কাছে গিয়ে দেখাতে পারেন, তারই জন্যে কমা-দাঁড়ি ইত্যাদি রদবদলের জন্য এ'দের এত আগ্রহ। হায়দরাবাদে গিয়ে বলা যাবে যে, ভারত গবর্ণমেণ্টকে চুক্তিপত্রের সর্ত রদবদল করতে তাঁরা বাধ্য করেছেন, এই হ'লো ডেলিগেশনের মনের ইচ্ছা। মাউণ্টব্যাটেনও ডেলিগেশনের এই সাধের ইচ্ছাটা সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন। সেই কারণে মাউণ্টব্যাটেনও এই জেদ ধরলেন যে, একটিও শব্দ, অক্ষর বা কমা-দাঁড়ির পরিবর্তন করা হবে না। চুক্তিপত্রের সঙ্গে নিজাম যে দু'টি আনুষঙ্গিক পত্র দিয়েছিলেন, সে পত্রে উল্লিখিত অনুরোধ অবশ্য মাউণ্টব্যাটেন স্বীকার ক'রে নিলেন। কিন্তু এখানেও নিজামের পররাষ্ট্রনীতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করলেন না মাউণ্টব্যাটেন। সুস্পষ্টভাবেই জানিয়ে দেওয়া হ'লো যে, কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার নিজামের থাকবে না।

এই সময় ইত্তেহাদী নেতা কাশিম রেজভিও দিল্লীতে ছিলেন। রেজভি এখন মাত্র এইটুকুই অহঙ্কার করতে পারবেন যে, তাঁরই নির্দেশ ও ইচ্ছা অনুসারে নিযুক্ত নূতন ডেলিগেশনের দ্বারা স্থিতাবস্থা চুক্তি নিষ্পন্নের কাজ করানো হয়েছে। আসল কথা হ'লো উপায়ান্তর না দেখে রেজভি এবং নতুন ডেলিগেশন কোন মতে নিজেদের মুখ রক্ষা করেছেন মাত্র। কিন্তু এভাবে নিজেদের মুখ রক্ষা করাও তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হ'তো না, যদি প্যাটেলের মনের ভাব অন্য রকমের হ'তো। নিজামের ওপর প্যাটেলের কেন জানি একটা বিশ্বাস আছে। প্যাটেলের ধারণা, নিজামের মনে কোন খারাপ অভিপ্রায় নেই। যাই হোক, স্থিতাবস্থা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এখন অন্ততঃ একটা বৎসরের সময় পাওয়া যাবে, যার মধ্যে মাথা ঠাণ্ডা করবার এবং মন নরম করবার সুযোগ সকলেই পাবেন।

আরও কয়েকটি সুসংবাদ। একে একে ভাল লক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ

করেছে। শরণার্থীদের অবস্থা সম্পর্কে নেহর, যে ঘোষণা করেছেন, তাতে সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ লোকের পক্ষে উপলব্ধি করা এখন অনেক সহজ হবে। প্রতিশোধ গ্রহণের মঢ়তা বর্জনের জন্য তিনি অত্যন্ত দঢ় অথচ যক্তিপর্ণ আবেদন জানিয়েছেন। গোপালস্বামী আয়েঙ্গার ঘোষণা করেছেন যে, ভারত-পাকিস্থান আলোচনারই একটি নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। যে কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রথম দফায় দই গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারীদের মধ্যে আলোচনা হবে। তারপর আলোচনা হবে দই গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রীদের মধ্যে। প্যাটেলও একটি বিবৃতিতে বলেছেন যে, লিয়াকতের সঙ্গে তাঁর 'সৌহার্দ্যপর্ণ' আলোচনা হয়েছে। পরামর্শ গ্রহণের জন্য লিয়াকৎ জিন্নার কাছে গিয়েছেন। যক্ত দেশরক্ষা পরিষদের বৈঠক যথারীতি চলতেই থাকবে। আগামী ৬ই ডিসেম্বর লাহোরে যক্ত দেশরক্ষা পরিষদের পরবর্তী বৈঠকের তারিখ নির্দিষ্ট হয়েছে।

সিমলা, সোমবার, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৪৭ সাল। আর একটি লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে কাশ্মীর খব সম্ভবতঃ নানারকম অভিমতের আলোড়ন সৃষ্টি করবে। ভারতীয় নেতারা বঝতে পেরেছেন যে, কাশ্মীরকে যদি ভারত ইউনিয়নের ভেতরে রাখতে হয়, তবে প্রায় ত্রিশ লক্ষ কাশ্মীরী মসলমানকে ভারতীয় জনসমাজের মধ্যে উপযক্ত স্থান ক'রে দিতে হবে এবং তুষ্টও করতে হবে। শেখ আবদল্লা তাই গণভোটের প্রস্তাবের পক্ষেই তাঁর সমর্থন স্পষ্টতরভাবে ঘোষণা করেছেন। কাশ্মীর সম্পর্কে হিন্দ মহাসভা ভিন্ন নীতি ও মনোভাব অবলম্বন করেছেন। হিন্দ মহাসভার ইচ্ছা নয় যে, মসলমান প্রধান কাশ্মীর রাজ্য ভারতের মধ্যে থাকে। বঝতে পারা যাচ্ছে যে, কাশ্মীরের ভারতীয়তা প্রতিষ্ঠার পক্ষে গান্ধী-নেহর-আবদল্লা একমত হয়ে এবং এক নীতি নিয়ে দাঁড়াবেন। এর বিরদ্ধে দাঁড়াবেন হিন্দ মহাসভা। তা ছাড়া, কংগ্রেসের মধ্যেও দই মনোভাবের একটা সঙ্ঘর্ষ বেধে উঠবার সম্ভাবনা রয়েছে। কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা জাতীয়তার নীতিতে বিশ্বাসী, তাঁরা কাশ্মীরবাসীকে ভারতীয় জাতির অংশরূপে গ্রহণ করতেই উৎসাহিত হবেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন কংগ্রেসীরা জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসীদের কাশ্মীর নীতির বিরদ্ধেই দাঁড়াবার ইচ্ছা করছেন। যাঁরা হিন্দ রাষ্ট্র চাইছেন, তাঁরা কাশ্মীরকে চান না। কংগ্রেসীদেরও এক শ্রেণীর মনের ইচ্ছা যে, কাশ্মীর ভারতের বাইরেই থাকুক। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট কাশ্মীর সম্পর্কে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন, সেটা লক্ষ্য ক'রে কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক অংশ অবশ্য এখন চুপ হয়ে গেছেন।

নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটি একটি প্রস্তাবে বলেছেন যে, মসলমানেরা ভারত ছেড়ে চলে যাবে, এটা কংগ্রেস একেবারেই ইচ্ছা করেন না। যে-সব মসলমান চলে গেছে, তারা আবার নিজের ঘরে ফিরে আসক, এই নীতি এবং ইচ্ছাও কংগ্রেসের প্রস্তাবে ঘোষিত হয়েছে।

হিন্দ মহাসভা সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের এই প্রস্তাবের নিন্দা ক'রে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। অনমান করতে পারছি, কংগ্রেস ও হিন্দ মহাসভার মধ্যে খব শীঘ্রই একটা সঙ্ঘর্ষ বেধে উঠবে এবং এই দই পরস্পরবিরোধী নীতির জয়-পরাজয়ের একটা মীমাংসাও হয়ে যাবে।

হায়দরাবাদের সঙ্গে সম্পাদিত স্থিতাবস্থা চুক্তির সফলেরও একটা প্রমাণ দেখতে পাওয়া গেল। হায়দরাবাদ রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি স্বামী রামানন্দ তীর্থকে কারগার থেকে মক্ত ক'রে দেবার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেছেন নিজাম।

নয়াদিল্লী, বধবার, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭ সাল। সিমলা থেকে সপরিবারে দিল্লী ফিরে এসেছি এবং সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছি গবর্ণমেণ্ট হাউসেরই বৃহত্তর পরিধির মধ্যে অবস্থিত সেই কণ্ট্রোলার হাউসে, যেখানে এর আগে র‍্যাডক্লিফ বাস করতেন এবং আরও আগে ১৯৪২ সালে ভারতের অতিথি চিয়াং কাইশেক ও মাদাম কাইশেক কিছদিন অবস্থান করেছিলেন।

অকিনলেকের সপ্রীম কম্যাণ্ড আর নেই। আমি গতবার লণ্ডনে থাকার সময়েই এদিকে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে দই ডোমিনিয়নের অনেক বাদ-প্রতিবাদ ও আলোচনা হয়ে গেছে। দই ডোমিনিয়নের কেউই সপ্রীম কম্যাণ্ডকে আর পছন্দ করছিলেন না। ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে ঠিক হয়েছিল যে, ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত সপ্রীম কম্যাণ্ড থাকবে। কিন্তু দই ডোমিনিয়নই সপ্রীম কম্যাণ্ডের সম্পর্কে যেসব অভিযোগ ও আপত্তি উত্থাপন করছিলেন, তাতে বঝা গিয়েছিল যে, এতখানি বিরূপ মনোভাবের বিরদ্ধে সপ্রীম কম্যাণ্ডের আর থেকে কোন লাভ নেই। কাজেই গত ৩০শে নবেম্বর তারিখেই সপ্রীম কম্যাণ্ডের অবসান হয়ে গেছে।

সপ্রীম কম্যাণ্ডের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ব্রিটিশ সৈনিকের আর কোন দায়িত্ব রইল না। অর্থাৎ ভারতীয় বাহিনীর সকল ব্রিটিশ অফিসারের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হয়ে গেল। এখন যদি কোন ব্রিটিশ সৈনিক ভারতীয় বাহিনীতে কাজ নিয়ে থাকতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁকে নতুন ক'রে ভারত গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে একটা কনট্রাক্ট বা 'ঠিকা' করে নিয়ে থাকতে হবে। যাঁরা থাকতে চাইবেন না, তাঁদেরও কোন বাধা নেই। তাঁরা চলে যাবেন। ভারতীয় বাহিনীর চার হাজার ব্রিটিশ অফিসারকে এই নতুন অবস্থার সম্মখীন হতে হয়েছে। যাঁরা ভারতীয় বাহিনীতে এখনো কাজ করতে চান, তাঁরা কোন সর্তে কাজ করবেন, সে সম্বন্ধে লণ্ডনের সঙ্গে ভারত গবর্ণমেণ্টের আলোচনাও হয়েছে। অকিনলেক এর আগে প্রস্তাব করেছিলেন যে, সপ্রীম কম্যাণ্ডের কার্যকালের মেয়াদ ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হোক। তাঁর যক্তি এই ছিল যে, ১লা অক্টোবর তারিখে সব ব্রিটিশ অফিসারেরা কর্মচ্যুতির নোটিশ পেয়েছেন। আইনতঃ নোটিশের মেয়াদও তিন মাস হওয়া উচিত। সেই হিসাবে ৩১শে ডিসেম্বরের আগে ভারতে ব্রিটিশ সৈনিকের অভিভাবক সপ্রীম কম্যাণ্ডকে কখনই ভেঙে দেওয়া চলতে পারে না।

অকিনলেকের প্রস্তাবের বিরদ্ধে আপত্তি জানিয়েছিলেন প্যাটেল। তাঁর দাবী অবিলম্বে সপ্রীম কম্যাণ্ডকে ভেঙে দিতে হবে। প্যাটেল মাউণ্টব্যাটেনকে জানিয়েছিলেন যে, সপ্রীম কম্যাণ্ডের প্রধান দপ্তর দিল্লীতে থাকায় ভারতীয় বাহিনীকে নানা রকম বাধা ও অসবিধা ভুগতে হচ্ছে। ভারতীয় বাহিনীকে ইচ্ছামত কাজ করতে বাধা দিচ্ছেন সপ্রীম কম্যাণ্ড। আরও সাংঘাতিক অভিযোগ করেছিলেন প্যাটেল। তিনি মাউণ্টব্যাটেনকে এমন কথাও বলেছিলেন যে, সপ্রীম কম্যাণ্ড বস্তুতঃ পাকিস্থানেরই একটা অগ্রবর্তী ঘাটি হিসাবে দিল্লীতে কাজ করছেন।

অত্যন্ত কঠোর ভাষায় প্যাটেলের এই উক্তির প্রতিবাদ করেছিলেন মাউণ্টব্যাটেন। মাউণ্টব্যাটেন বলেছিলেন, সপ্রীম কম্যাণ্ডের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে এই সংশয়

নিতান্ত অন্যায়। অকিনলেকের সততা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কোন যুক্তি নেই। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেনের প্রতিবাদ সত্ত্বেও প্যাটেল তাঁর মত পরিবর্তন করেন নি, এবং তাঁর দাবীও প্রত্যাহার করেন নি।

প্যাকিস্থান গবর্ণমেণ্টও খোলাখুলি-ভাবে সুপ্রীম কম্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু অভিযোগের যুক্তি ছিল প্যাটেলের যুক্তির ঠিক বিপরীত। পাকিস্থান বলেছিলেন, সুপ্রীম কম্যাণ্ডের কোন স্বাধীনতা নেই। অকিনলেক ও তাঁর সুপ্রীম কম্যাণ্ড বস্তুতঃ ভারতীয় বাহিনীরই ইচ্ছা, অভিমত ও সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করছেন।

অথচ গত অক্টোবরের মাঝামাঝি লাহোরে যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের বৈঠকে অকিনলেকই যখন প্রস্তাব করলেন যে, ৩০শে নবেম্বর তারিখে সুপ্রীম কম্যাণ্ড ভেঙে দেওয়া হোক, তখন লিয়াকৎ আলিই প্রবলভাবে প্রতিবাদ করলেন এবং সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানও করলেন। মাউণ্ট-ব্যাটেনকে লিয়াকৎ জানিয়ে দিলেন যে, একজন ব্রিটিশ সুপ্রীম কম্যাণ্ডার থাকলে প্যাকিস্থানেরই পক্ষে সুবিধার বিষয়। 'বিভক্ত' সামরিক উপকরণের পাকিস্থানী অংশ এখনো ভারত থেকে প্যাকিস্থানে প্রেরণের কাজ চলছে। দুই ডোমিনিয়নের দুই প্রধান সেনাপতির দ্বারা সম্মিলিত-ভাবে প্যাকিস্থানে সামরিক উপকরণ প্রেরণকার্যের ব্যবস্থা অবশ্যই পরিচালিত হতে পারে। কিন্তু তার চেয়ে জনৈক ব্রিটিশ সেনাপতির অধীনে এ কাজ পরি-চালিত হতে থাকলে প্যাকিস্থান আরও ভালভাবে তাঁদের প্রাপ্য অংশ পেতে পারবেন।

মাউণ্টব্যাটেন একথাও লিয়াকৎকে বললেন যে, ব্রিটিশ সেনাপতি অকিন-লেকের এখন এইটুকু মাত্রই ক্ষমতা আছে যে, প্যাকিস্থানের প্রাপ্য অংশ প্যাকিস্থানে প্রেরণের পরিকল্পনা শুধু তিনি করতে পারেন। ঐ পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার, অর্থাৎ প্যাকিস্থানে ভালভাবে সামরিক উপকরণ প্রেরণের কাজ নির্ভর করে ভারত গবর্ণমেণ্টের ওপর। কারণ উপকরণ প্রেরণের ব্যবস্থা করা ভারত গবর্ণমেণ্টেরই দায়িত্ব।

মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকে এ কথা শোনার পরেও লিয়াকৎ মত পরিবর্তন করেননি এবং সুপ্রীম কম্যাণ্ডের কার্যকাল আরও বৃদ্ধি করবার জন্যই তিনি দাবী করলেন। ভারত চাইছিলেন ৩০শে নবেম্বর অবশ্যই সুপ্রীম কম্যাণ্ড ভেঙে দিতে হবে এবং লিয়াকৎ চাইলেন, ৩০শে নবেম্বরের পরেও সুপ্রীম কম্যাণ্ডকে রাখতে হবে। এই অবস্থায় মাউণ্ট-ব্যাটেন লণ্ডনের কাছ থেকেই পরামর্শ চেয়ে পাঠালেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট জানিয়ে দিলেন যে, সুপ্রীম কম্যাণ্ডকে ৩০শে নবেম্বর তারিখেই ভেঙে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। যাই হোক, আর কোন যুক্তি তর্কের অবকাশ নেই। সুপ্রীম কম্যাণ্ডের শেষ হয়ে গেছে। অকিনলেক মুক্ত হয়েছেন।

গত ২৬শে নবেম্বর তারিখে যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের যে বৈঠক হয়ে গেছে, সে বৈঠকের আলোচনা থেকে একটা ভাল ফললাভ করা গেছে। সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, সুপ্রীম কম্যাণ্ড যদিও উঠে গেল, কিন্তু যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদ থাকবে এবং যথারীতি নিয়মিত বৈঠকও হতে থাকবে। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন জানিয়েছেন যে, তিনি আর এই পরিষদের চেয়ারম্যান পদে থাকতে পারবেন না। মাউণ্টব্যাটেনের বক্তব্য হলো—পাকিস্থানের মনে যখন এ সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে, ভারতের স্বার্থরক্ষার দিকেই তাঁর মনে বিশেষ একটা ঝোঁক রয়েছে, তখন তাঁর পক্ষে চেয়ারম্যান হয়ে থাকা আর উচিত হবে না।

কিন্তু পরিষদের শুধু ভারতীয় সদস্যেরা নয়, প্যাকিস্থানী সদস্যেরাও মাউণ্টব্যাটেনের এই সংকল্পে আপত্তি জ্ঞাপন করে তাঁকে চেয়ারম্যানের পদে থাকবার জন্য খুব জোর পীড়াপীড়ি করলেন। অনেক দ্বিধার পর মাউণ্টব্যাটেন সম্মত হলেন।

জরুরি কমিটির শেষ বৈঠকও হয়ে গেছে। এর পর আর জরুরি কমিটি নয়, জরুরি অবস্থায় প্রয়োজনীয় সকল দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টই এবার থেকে প্রত্যক্ষভাবে বিবেচনা ও পালন করবেন। সব দায়িত্বের মধ্যে দুরূহতম হলো শরণার্থীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব।

এক্ষেত্রেও গবর্ণমেণ্টের চিন্তায় দুটি নীতির সংঘাতে একটা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। পূর্ব পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের অভি-মতে এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অভিমতে মিল দেখা যাচ্ছে না। পূর্ব পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট বলছেন যে, পূর্ব পাঞ্জাবের ভেতরেই সকল শরণার্থীর জায়গা হতে পারে না। পরিবার পিছু দশ একর জমি দিলে যত সংখ্যক লোকের জমি পূর্ব পাঞ্জাবে পাওয়া যেতে পারে, ঠিক তত সংখ্যক শরণার্থীই পূর্ব পাঞ্জাবে আশ্রিত হবে। বাকী সকলকে ভারতের অন্য প্রদেশে বা রাজ্যে জমি ও থাকবার জায়গা দিতে হবে।

অপর দিকে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, সমগ্র সংখ্যক শরণার্থীকে পূর্ব পাঞ্জাবের ভেতরেই জায়গা দিতে হবে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট বলছেন, ভারতে পরিবার পিছু জমির পরিমাণ গড়পড়তা দুই একর মাত্র অথবা তারও কম। তা ছাড়া পূর্ব পাঞ্জাব থেকে যত সংখ্যক মুসলমান চলে গেছে, তার চেয়ে কম সংখ্যক অমুসলমান পাকিস্থান থেকে এসেছে। সুতরাং পূর্ব পাঞ্জাবে জায়গা হবে না কেন? ভারত গবর্ণমেণ্ট পূর্ব পাঞ্জাবের ভেতরেই সকল শরণার্থীর পুনর্বাসন ব্যবস্থা করতে চান। ভারত গবর্ণমেণ্ট আর একটা বিষয়েও অবশ্য সচেতন আছেন। পূর্ব পাঞ্জাবের ভেতরে সমগ্র সংখ্যক শরণার্থীকে জায়গা দিলে বস্তুতঃ বিরাট সংখ্যক বিক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট ব্যক্তিকে এক জায়গায় জমা করা হবে। আরও একটা স্মরণীয় বিষয় এই যে, পূর্ব পাঞ্জাবের সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে শিখদের আনুপাতিক জনসংখ্যা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি হয়ে যাবে।

নয়াদিল্লী, বৃহস্পতিবার, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭ সাল। দিগ্বলয়ে আবার কৃষ্ণমেঘ দেখা দিয়েছে। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের নিসর্গে এ দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায় যে, আকাশের একদিক সূর্যালোকে ঝলমল করছে এবং অপরদিকে মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে। সূর্য অস্তগত হবার আগেই মাথার ওপর ঝড়ের আক্রোশ পুঞ্জীভূত হতে থাকে।

ভারতের রাজনীতির আকাশেও এই দৃশ্যই দেখা দিয়েছে। মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে, ঝড় আসছে, যদিও এখনো সূর্যের আলো নিভে যায়নি। গবর্ণমেণ্ট হাউসে বসে আমরা একে একে যেসব খবর পাচ্ছি, তাতে এখন স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে ঘটনার গতি হঠাৎ তীব্রতর হয়ে উঠেছে। কাশ্মীর-সংকট এখন দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধে পরিণত হবার জন্য দ্রুতগতিতে নতুন বিরোধের পথে এগিয়ে চলেছে।

প্যাটেল একটি কঠোর নির্দেশ দান করেছেন। পাকিস্থান যদি কাশ্মীরের হানাদারদের সাহায্য দেওয়া বন্ধ না করে, তবে পাকিস্থানের সঙ্গে অনুষ্ঠিত প্রত্যেকটি অর্থসংক্রান্ত ব্যবস্থা ও চুক্তি ভারত গবর্ণমেণ্টও প্রতিপালন

করবেন না। অর্থসংক্রান্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী পাকিস্থানকে এখন প্রায় পঞ্চান্ন কোটি টাকা ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রদান করার কথা। পাকিস্থানের এই পাওনা এখন ভারত যদি মিটিয়ে দিতে অস্বীকার করেন, তবে পাকিস্থানের আর্থিক অবস্থার ওপর তার প্রতিক্রিয়া খুবই খারাপ হবে। প্যাটেলের এই প্রস্তাবের নৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিণামের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। এ প্রস্তাবের আর্থিক তাৎপর্যও যে খুবই সাংঘাতিক। পাকিস্থান রাষ্ট্রের অর্থভাণ্ডারে এখন মাত্র দুই কোটি টাকা 'রিজার্ভ' আছে, তা ছাড়া আছে বহু পরিমাণ জরুরী ঋণের দায়। প্যাটেলের এই প্রস্তাবের সমর্থনে এই মাত্র একটি যুক্তি দেখানো হবে যে—"কেন পাকিস্থানকে টাকা দেব, যে টাকা দিয়ে পাকিস্থান অস্ত্রশস্ত্র খরিদ করবে আমাদেরই সৈনিকদের মারবার জন্য?" অনুমান করছি, মন্ত্রিসভার বৈঠকেও যখন প্যাটেলের এই প্রস্তাব উত্থাপিত হবে, তখন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি খুব সম্ভব উত্থাপিত হবে না।

ভারতীয় নেতারা তাঁদের নিজ নিজ সন্ধানসূত্রে ক্রমশঃ খুব বেশী করেই প্রমাণ পেতে আরম্ভ করেছেন যে, উপজাতীয় হানাদারদের এই কাশ্মীর অভিযানের পেছনে পাকিস্থানেরই অভিসন্ধি ও সমর্থন কাজ করছে। প্রধানতঃ এই কারণেই পাকিস্থান সম্বন্ধে ভারতীয় মনোভাব কঠোর হয়ে উঠছে। অনেকে কাশ্মীরের ঘটনাবলীকে বৃহত্তর পাকিস্থানী চক্রান্তের একটা দিক অথবা অংশ বলে মনে করছেন। এঁদের ধারণা, পাকিস্থান কাশ্মীরের ওপর হানাদারী উপদ্রব সৃষ্টি করে ভারতীয় বাহিনীকে কাশ্মীরের মধ্যে টেনে আনবার মতলব করেছে। কাশ্মীরের ভেতরে ভারতীয় বাহিনীকে এই কৌশলে ব্যস্ত করে রাখবার পর পাকিস্থান হায়দরাবাদের ভেতরে উপদ্রব সৃষ্টি করবে, তার পর পাঞ্জাব সীমানা পার হয়ে সোজা মার্চ করে একেবারে দিল্লীতে এসে ঢুকবে।

এই গবেষণার তুলনায় একটু কম উদ্ভট আর একটা অভিমত প্রচারিত হতে আরম্ভ করেছে, যদিও অভিমতটা কম বিপজ্জনক নয়। পাকিস্থান যদি হানাদারদের কাশ্মীর-প্রবেশে বাধা দিতে না পারে; তবে হানাদারদের নিবৃত্ত করা ভারতেরই কর্তব্য। হানাদারদের কাশ্মীর-প্রবেশ বন্ধ করতে হলে ভারতীয় বাহিনীর পাকিস্থানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু পাকিস্থান যদি বাধা দেয়? এ প্রশ্নের উত্তর এক শ্রেণীর আলোচনাকারী খুব সহজেই দিয়ে দিচ্ছেন। উত্তর হলো—তাহ'লে যুদ্ধ হবে। জাল যুদ্ধের চেয়ে খাঁটি যুদ্ধই ভাল।

সরকারী মহলের মনে আর একটা আশঙ্কা জেগেছে। কাশ্মীরের ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় শিখ-সমস্যা আবার কোন্ রূপ গ্রহণ করে বসে তার কোন ঠিক নেই। কাশ্মীরের বিরোধ ও সংঘর্ষ যত বেশী দিন চলতে থাকবে, শিখদের সামলে রাখা ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ততই কঠিন হয়ে উঠবে। আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে, এই সময় যদি লিয়াকৎকেই দিল্লীতে আনিয়ে একটা সুচিন্তিত রাজনৈতিক প্রস্তাব উত্থাপন না করানো যায়, তবে অবস্থা অতিদ্রুত এবং বিপজ্জনকভাবে আরো খারাপের দিকে এগিয়ে যাবেই। এটাও অবশ্য বুঝতে পারছি যে, শান্তির অনুকূল কোন রাজনৈতিক প্রস্তাব যদি লিয়াকৎ উত্থাপন করেন তবে তাঁর দেশ ও সহকর্মীদের পক্ষে সে প্রস্তাবে সম্মত হওয়া খুবই কঠিন হবে।

উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশ পরিভ্রমণ করে দিল্লীতে ফিরেছেন প্যাটেল। অক্লান্তকর্মা ভি পি'র সহযোগিতায় প্যাটেল ভারতের রাষ্ট্রীয় গঠনে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টির আর এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত করেছেন। উড়িষ্যা ও ছত্রিশগড়ের উনচল্লিশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য এর আগেই রাষ্ট্রভুক্ত হয়েছিল। নিতান্ত রাষ্ট্রভুক্ত অবস্থা থেকে এই দেশীয় রাজ্যগুলিকে প্যাটেল আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে এসে একেবারে ভারতের সাধারণ শাসিত অঞ্চলের অংগীভূত করে ফেলেছেন। উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যগুলি উড়িষ্যা প্রদেশের এবং ছত্রিশগড়ের রাজ্যগুলি মধ্যপ্রদেশের সাধারণ শাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। প্রায় সত্তর লক্ষ প্রজার ওপর শাসনকার্য পরিচালনা করবার কোন কর্তৃত্ব উনচল্লিশটি দেশীয় রাজার হাতে আর রইল না, সব কর্তৃত্ব প্রাদেশিক ও ডোমিনিয়ন গবর্ণমেণ্টের হাতে চলে গেল। রাজাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, উপাধি এবং সম্পত্তির বংশানুক্রমিক অধিকার অবশ্য ক্ষুন্ন করা হলো না।

এই প্রসংগে সাইমন কমিশনের একটি প্রস্তাবের কথা মনে পড়ছে। কমিশনের একটি সাব-কমিটি, যার অন্যতম সদস্য ছিলেন সাইমনের এক জুনিয়র সহকর্মী—অখ্যাত ও অজ্ঞাত এটলি। সেই সাব-কমিটিই প্রথম সুপারিশ করেছিলেন যে, উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যগুলিকে উড়িষ্যা প্রদেশেরই সাধারণ শাসিত অঞ্চলে পরিণত করে ফেলা উচিত।

মাউণ্টব্যাটেন পরিবারও বোম্বাই এবং জয়পুর পরিভ্রমণ করে ফিরে এসেছেন। আগামী গ্রীষ্মে ভারত থেকে বিদায় নেবার আগেই মাউণ্টব্যাটেনকে ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশ ও প্রধান দেশীয় রাজ্যে একবার পরিভ্রমণ করে আসতে হবে। এর অর্থ হলো, পূর্বে প্রত্যেক ভাইসরয় পাঁচ বছরের মধ্যে যে পরিভ্রমণ সম্পূর্ণ করতেন, মাউণ্টব্যাটেনকে পাঁচ মাসের মধ্যে তাই করতে হবে।

আজ মাউণ্টব্যাটেনের জামাতা জন ব্র্যাবোর্ণ এবং বড় মেয়ে প্যাট্রিসিয়া ব্র্যাবোর্ণ এখানে এসেছেন এবং তিন মাস থাকবেন। জনের পিতা হলেন বোম্বাই ও বাঙলার জনপ্রিয় গবর্ণর। ছয় মাসের জন্য ভারতের গবর্ণর-জেনারেলের পদেও তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক মহলে তাঁর বেশ সুনাম ছিল। অকালে মৃত্যু না হলে তিনিই ভারতের স্থায়ী গবর্ণর-জেনারেল হতেন। প্রাচ্য প্রদেশের পরিবেশের মধ্যে মাউণ্টব্যাটেন পরিবারের ব্যক্তিগত জীবনের অনুরাগের ইতিহাসও মিশে আছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কম্যাণ্ড নিয়ে মাউণ্টব্যাটেন ১৯৪৫ সালে পূর্ব-এশিয়াতে যখন ছিলেন তখনই জন ও প্যাট্রিসিয়ার মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। জন ও প্যাট্রিসিয়ার পিতা-মাতাও এই ভারতেই ১৯২২ সালে বিবাহের অংগীকার-সূত্রে মিলিত হয়েছিলেন।

নয়াদিল্লী, সোমবার, ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭ সাল। বি বি সি'র রবার্ট স্টিমসনের সংগে আলোচনা করে আজ কতকগুলি নতুন কথা জানতে পারলাম। স্টিমসন পনর দিন করাচীতে থেকে আজ ফিরেছেন। জিন্নার সংগে স্টিমসন দেখা করেছিলেন। পাকিস্থান কমনওয়েলথে থাকবে কি না থাকবে, এবিষয়ে জিন্না অনেক কথা স্টিমসনকে বলেছেন। জিন্না অভিযোগ করেছেন যে, পাকিস্থানকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অবহেলা করছেন।

স্টিমসনের অন্যান্য কথা থেকে আমি এবার নিঃসন্দেহ হয়ে গেলাম যে, পাকিস্থানের সংবাদপত্রে এখন যে তুমুল মাউণ্টব্যাটেন-বিরোধী প্রচারকার্য আরম্ভ হয়েছে, তার মূল প্রেরণাদাতা ও উদ্যোক্তা

হলেন স্বয়ং জিন্না। কোন বিশেষ একটি তথ্য বা ঘটনাকে উল্লেখ করে নয়; মাউণ্ট-ব্যাটেনকেই ব্যক্তিগতভাবে লক্ষ্য করে এই প্রচার অভিযান চালিত হয়েছে। মাউণ্ট-ব্যাটেন ভারতের গবর্ণর-জেনারেল, সুতরাং মাউণ্টব্যাটেন অত্যন্ত হিন্দুভক্ত এবং মুসলিমবিরোধী—এই হলো পাকিস্থানের প্রচারিত সকল বক্তব্যের মূল সুর। মাউণ্টব্যাটেন মাত্র একটি ডোমিনিয়নেরই গবর্ণর-জেনারেল। এই অবস্থায় কোন্ ধরণের অভিযোগ উত্থাপন করলে, মাউণ্টব্যাটেনকে ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে বেশি অপ্রস্তুত করা যায়, সেটা জিন্না বুঝেছেন এবং ঠিক সেই অভিযোগ করেই প্রচারকার্য চালাতে আরম্ভ করেছেন।

অবশ্য পাকিস্থানের অন্যান্য দায়িত্ব-শীল মহলে ভেতরে ভেতরে এ সত্য স্বীকার করা হয়ে থাকে যে, মাউণ্টব্যাটেন ভারতের গবর্ণর-জেনারেল হওয়ায় ভারত-পাকিস্থান বিরোধ মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারছে না। কিন্তু জিন্নার আচরণ দেখে ধারণা করতে হয় যে, তিনি মাউণ্ট-ব্যাটেনকে পাকিস্থানের বিরোধী বলেই একটা দৃঢ় ধারণা করে বসে আছেন। জিন্নার বিশ্বাস, ভারতের গবর্ণর-জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত মাউণ্টব্যাটেন পাকিস্থানের ক্ষতি করে চলেছেন। বিশেষ করে কমনওয়েলথের অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্থানের সম্পর্ক খারাপ করে দেবার চেষ্টা করছেন মাউণ্টব্যাটেন। এই অভিযোগের সমর্থনে একটা প্রমাণও পাকিস্থানী সংবাদপত্রে প্রায়ই উল্লেখ করা হচ্ছে। সম্প্রতি লণ্ডনে গিয়ে মাউণ্ট-ব্যাটেন একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, ভারতের সমগ্র অঞ্চলের শতাংশের মাত্র তিন অংশ সাম্প্রতিক হাঙ্গামায় উপদ্রুত হয়েছে। পাকিস্থানের মতে, এই উক্তি হলো মাউণ্টব্যাটেনের মুসলিম বিদ্বেষ ও হিন্দুপ্রীতির একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭ সাল। এ সপ্তাহের প্রথম দিকে লিয়াকৎ দিল্লীতে এসেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে নেহরুর আলোচনাও হয়ে গেছে। কিন্তু আলোচনা বিফল হয়েছে। কাশ্মীর এবং পাকিস্থানের পাওনা টাকা, এই দুই বিষয়কে কেন্দ্র করে বিরোধের সমস্যা এখন আরও সাংঘাতিক রূপ ধারণ করেছে। যুদ্ধক্ষেত্র হিসাবে কাশ্মীর ভারতীয় সৈন্যদেরই বেশি অসুবিধার কারণ সৃষ্টি করেছে। মাউণ্টব্যাটেন পূর্বেই এবিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন যে, কাশ্মীরে যুদ্ধ করতে গিয়ে ভারতীয় বাহিনীকে কতগুলি বিশেষ বিপজ্জনক অবস্থায় পড়তে হবে। মাউণ্টব্যাটেন একথাও বলেছিলেন যে, কাশ্মীরে এমন বিশেষ কতগুলি বাধা ও অসুবিধা আছে যার জন্য ভারতীয় বাহিনী তার পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করবার অথবা ইচ্ছামত অগ্রসর হবার সুযোগ পাবে না। মাউণ্টব্যাটেনের অনুমান সত্য হয়েছে। ১৯৩৯ সালে ফিনল্যাণ্ডে রুশ বাহিনীকে যে ধরণের অসুবিধায় বিব্রত হতে হয়েছিল, ভারতীয় বাহিনীকেও কাশ্মীরে সেই ধরণের অসুবিধায় পড়তে হয়েছে, ফিনল্যাণ্ডে রুশ বাহিনী অস্ত্রবলে ও জনবলে যদিও প্রতিপক্ষের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর ছিল, কিন্তু ফিনল্যাণ্ডের পার্বত্য অধিত্যকার প্রকৃতি এবং গঠন এমনই যে, সেখানে রুশ বাহিনীকে অনেক অসুবিধায় বিব্রত হতে হয়েছিল। কাশ্মীরেও ভারতীয় বাহিনীকে অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

সামরিক বিষয়ে মাউণ্টব্যাটেনের যে অভিজ্ঞতা আছে, সেই অভিজ্ঞতার জোরেই তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টকে এই পরামর্শ দিয়েছেন যে, ভারতীয় বাহিনীর আর অগ্রসর হওয়া উচিত হবে না। ভারতীয় বাহিনী যতদূর অগ্রসর হয়ে এখন যে স্থানে পেঁাছেছে, সেই স্থান পর্যন্ত সংযোগ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখাই এখন খুব দুরূহ হয়ে উঠেছে। মাউণ্টব্যাটেনের অভিমত, অগ্রবর্তী সৈন্যবাহিনীর সংযোগ-পথের দূরত্ব আর বৃদ্ধি ক'রে লাভ নেই। সব-চেয়ে অগ্রবর্তী গ্যারিসনগুলি এরই মধ্যে বেকায়দায় পড়েছে এবং নানা অসুবিধায় উপদ্রুত হচ্ছে। পুঞ্চের গ্যারিসনের সঙ্গে শেষ সরবরাহ কেন্দ্রের সংযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এখন শুধু বিমানযোগে পুঞ্চ শিবিরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা ছাড়া আর কোন পথ নেই। ঝানগড়ে অবস্থিত দুটি পদাতিক কোম্পানী প্রায় ছয় হাজার সংখ্যক বিপক্ষ সৈন্যের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। ফলে ভারতীয় পদাতিকদের মধ্যে হতাহতের সংখ্যাও খুব বেশি হয়েছে। ঝানগড়ের গ্যারিসনের সাহায্যের জন্য যে নতুন সেনাদল এগিয়ে গিয়েছিল, তারাও ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে।

সব চেয়ে সাংঘাতিক সংবাদ হলো, উরির কাছে শত্রুপক্ষের বিরাট ও প্রচণ্ড সৈন্য সমাবেশের সংবাদ। ভারতীয় বাহিনীর একটি দলের বর্তমান লক্ষ্য হলো কাশ্মীরের সীমান্তে অবস্থিত ডোমেল। ডোমেল অভিমুখী ভারতীয় সৈন্য এখন উরি অধিকার ক'রে রয়েছে। উরি ছাড়িয়ে ভারতীয় সৈন্য এখন অগ্রসর হয়নি। কিন্তু শত্রুপক্ষের আক্রমণে এখন যদি ভারতীয় বাহিনীকে উরি ছেড়ে দিয়ে পেছনে হটে আসতে হয়, তবে নতুন করে বরামুলা, শ্রীনগর ও সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকাকে পূর্বের মতই আবার অগ্রগামী শত্রুর আক্রমণের প্রকোপে সহজেই পড়তে হবে।

মাউণ্টব্যাটেনের ধারণা, উরি যদি ভারতীয় বাহিনীর অধিকারচ্যুত হয়, তবে ভারত গবর্ণমেণ্টেরই অভিমতের ওপর তার একটা নতুন প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। স্বাভাবিকভাবেই সরকারী মহলে এই ধারণাই দৃঢ়তর হবে যে, হানাদারদের ঘায়েল করার পক্ষে সবচেয়ে ভাল পন্থা হলো হানাদারদের মূল ঘাটিগুলি আক্রমণ করা। হানাদারদের সব ঘাটি এবং 'প্রেরণা-কেন্দ্র' পশ্চিম পাঞ্জাবেই অবস্থিত। সুতরাং হানাদারদের ঘাটি আক্রমণ করার অর্থ পাকিস্থানের অভ্যন্তরে সৈন্য চালনা করা। এর অর্থ ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধ।

আজ সকাল সাড়ে এগারটার সময় মাউণ্টব্যাটেন এক ঘরোয়া বৈঠকে রোণি, ভের্নন ও আমাকে ডাকলেন। ভি পি'ও বৈঠকে উপস্থিত হলেন। বড়দিন উপলক্ষে নেহরুকে একটি পত্র দেবেন মাউণ্ট-ব্যাটেন। সেই পত্রেরই একটা খসড়া আমাদের এ বৈঠকে আলোচিত হলো। এই পত্রে মাউণ্টব্যাটেন নেহরুকে সংযম ও সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আমি আর একটি প্যারা এই পত্রে যুক্ত করে দেবার প্রস্তাব করলাম। পাকিস্থানের সঙ্গে ভারত যদি যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে নেহরুর পররাষ্ট্র নীতির স্বাধীনতা এবং ভারতের সামাজিক প্রগতি সাধনের সকল ভরসা কিভাবে বিনষ্ট হয়ে যাবে, একটি নতুন প্যারাতে তাই উল্লেখ করা হলো। ভি পি বললেন, এ বিষয় উল্লেখ করলে পত্রের তাৎপর্য আরও উন্নত হবে। মাউণ্টব্যাটেন এই নতুন প্যারা পত্রের অন্তর্ভুক্ত করতে সম্মত হলেন।

আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি, আজ যে পত্র নেহরুকে মাউণ্টব্যাটেন পাঠিয়ে দিলেন, সে পত্রের মূল বক্তব্য ভবিষ্যতের ঘটনার পরীক্ষায় সত্য ও যথার্থ বলেই প্রমাণিত হবে। নেহরুকে আজ এমন একটি সমস্যার ভেতর পথ

খুঁজতে হচ্ছে, যে সমস্যার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার আবেগও জড়িয়ে রয়েছে। তিনি কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান, কাশ্মীরী আবদুল্লার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক বন্ধুত্বও অত্যন্ত অন্তরঙ্গ। সুতরাং কাশ্মীর-সমস্যা সম্পর্কে কোন মনোভাব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় কাশ্মীরের সঙ্গে এই ব্যক্তিগত সম্পর্কের টান তুচ্ছ করা অথবা বিস্মৃত হওয়া তাঁর পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে উঠেছে।

গত সেপ্টেম্বর মাসেই আমি আমার ভ্রাতার কাছে লিখিত একটি পত্রে লিখেছিলাম:

"নৈতিক সত্য উপলব্ধি করবার মত মন এবং সত্যের মূল্য ও মর্যাদা স্বীকার করার মত আত্মিক শক্তি নেহরুর যথেষ্ট আছে। এই কারণেই তিনি প্রতিদিনের নানা রকম সরকারী দায়িত্ব ও শাসন-কার্যের সঙ্কটেও তাঁর বিচারশক্তিকে তুচ্ছ সুবিধা ও মিথ্যার ঊর্ধ্বে রাখতে পারেন। এমনকি, নিজের মনের ইচ্ছা ও অভিরুচির আবেগ দূরে সরিয়ে দিয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে সদসৎ বিচার করবার ক্ষমতা তাঁর আছে।"

কাশ্মীরের কথা চিন্তা করতে গিয়ে নেহরু তাঁর মনের ভেতর যে বেদনা অনুভব করছেন, তার প্রমাণ বেশি স্পষ্ট করেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মাউণ্ট-ব্যাটেন আজ মন্তব্য করলেন যে, নেহরুর সম্পর্কেও তাঁর মনে একটা দুশ্চিন্তা আছে। মাউণ্টব্যাটেনের আশঙ্কা, নিছক ঘটনা ও অবস্থার চাপে পড়ে নেহরু তাঁর নিজেরই অজ্ঞাতসারে হয়তো এমন এক মানসিক অবস্থা লাভ করবেন, যখন তিনি সত্য সত্যই অন্যের তোয়াজ ও তোষামোদে প্রভাবিত হয়ে পড়বেন। এইখানেই বিপদ। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, এটা যে কত বড় এবং কি রকমের বিপদ, তাও তিনি ভালভাবেই জানেন। এই কারণেই তিনি আগামী এপ্রিলের পরে আরও কিছুকাল গবর্ণর-জেনারেল হয়ে থাকবার প্রস্তাবে সম্মত হতে পারছেন না। বরং আবার সমুদ্রের সার্ভিস নিয়ে কোন নিম্নতর পদে ফিরে যাওয়াই ভাল।

প্যাটেল মাউণ্টব্যাটেনকে অনুরোধ করেছেন, নতুন সংবিধান গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে ভারতে থাকতে হবে। এর অর্থ, আর এক বছর ভারতে থাকা। মাউণ্টব্যাটেন মনে করেন, আর এক বছর ভারতে থাকলে তাঁর পক্ষে একটা মস্ত ভুল করা হবে। মাউণ্টব্যাটেন বিশ্বাস করেন, কমনওয়েলথের সঙ্গে যুক্ত থাকা ভারতেরই পক্ষে কল্যাণকর। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন যদি নতুন সংবিধানের প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত অবস্থান করেন, তবে তাঁকেই বস্তুতঃ আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের রাজনৈতিক পরিবর্তনের আর একটা বৃহৎ পরিবর্তনের শেষ অঙ্ক সমাপ্ত ও সম্পূর্ণ করে দিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ এক বৃটিশ গবর্ণর-জেনারেল এক ভারতীয় প্রেসিডেণ্টকে প্রজাতন্ত্র ভারতের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত দেখে প্রত্যাবর্তন করবেন। এ অনুষ্ঠানের সঙ্গে মাউণ্ট-ব্যাটেন প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকলে এই ধারণাই প্রচারিত হবে যে, মাউণ্টব্যাটেন ভারতের প্রজাতান্ত্রিকতারই সমর্থন করছেন। তার ফলে ভারতের মনে কমন-ওয়েলথের সঙ্গে যুক্ত থাকার আগ্রহও কমে যাবে। সুতরাং এপ্রিল মাস পর্যন্ত নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ামাত্র চলে যাওয়াই ভাল। তাহলে ভারতের প্রজা-তান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় ব্যাপারে পরিণত হতে পারবে—ভারতীয় গবর্ণর-জেনারেলের বদলে ভারতীয় প্রেসিডেণ্টের আবির্ভাব। এই পরিবর্তনই হবে স্বাভাবিক, সহজ ও স্বচ্ছন্দ পরিবর্তন।

(ক্রমশঃ)

বেণুকুঞ্জ

নির্মল রায়

ভোরের দুয়ারে—
কুয়াশার বাঁধ ভাঙে আলোর জোয়ারে।
দূরে বহুদূরে
ঝিমায় মনের গ্রাম সকালের সোনালী রোদ্দুরে।
রৌদ্রের আমেজে
মনের গহনকেন্দ্রে ওঠে বেজে বেজে
শিশিরের ছন্দে জাগা আকাশের বীণ্‌
রিণ্‌ রিণ্‌ রিণ্‌ঃ
বানের জোয়ারে জাগা নব-রস ধারা
ভাঙে রুদ্ধ নৈরাশ্যের হিমবন্ধকারা॥

সকালের আলো
দিগন্তে বনের বুকে বিছানা বিছালো।
নব রৌদ্রে ঝিলিমিলি

আনন্দে অধিরা বধু কাঁপে থরোথরঃ
যৌবনের বেণুকুঞ্জ কাকলী-মুখর॥

তখনও আকাশে
আনন্দের ছন্দ দোলে ভেসে ভেসে আসে
স্বর্ণপুঞ্জ আলোর মেঘেরা।
বনের মেয়েরা
তখনও ছড়ায় বনে সাতরাঙা রং;
সময়ের ঘণ্টা দূরে বাজে ঢং ঢং॥

রাত্রি ঘন ঘোর
সুস্নিগ্ধ শান্তির মত স্বপন বিভোর
নামে শান্ত ঘুমঃ

চৌগাছি ঝিনুক শিল্পালয়
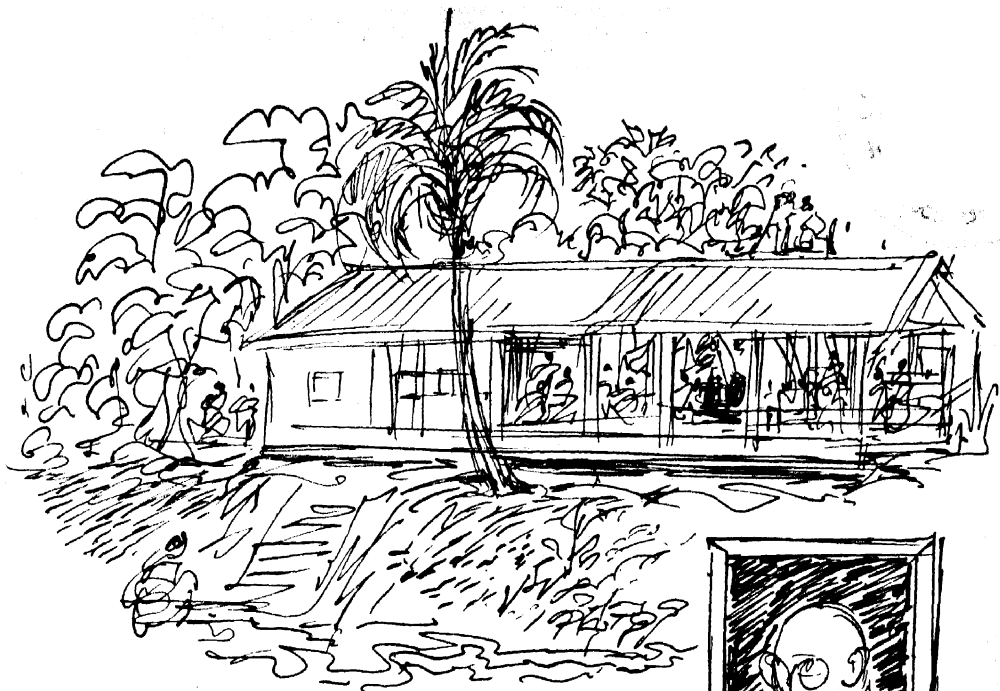
শ্রীঅন্নদা মুন্সী

মধুমতী নদীর তীরে গঙ্গারামখালির মেলায় একজন লোক একটা কাঠের বাক্সের ওপরে নানারূপ পণ্য সাজিয়ে বসলো। সবাই তাকে ঘিরে ধরে জিজ্ঞেস করতে লাগলো। এটার দাম কত? ওটার দাম কত? কোনটা চার পয়সা, কোনটা ছ'পয়সা, কোনটা দু' আনা। ঝিনুকের তৈরী মাথার ফুল, নাকের নোলক, কানের দুল, বেশ ঝকঝকে চকচকে দেখতে, তার ওপরে কারুকার্য আর পালিশ চমৎকার। পাড়াগাঁয়ের লোকে খুশী হয়ে এইসব অলঙ্কারে নিজেদের প্রিয়জনকে সেই মেলার দিন সন্ধ্যাবেলায় ভূষিত করে যথেষ্ট তৃপ্তি পেয়েছিল সন্দেহ নেই।

প্রয়োজনের অতিরিক্তই শিল্প। মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটিয়ে যেটুকু সময় উদ্বৃত্ত থাকে সেই সময়টুকু সে শিল্পচর্চা করে, উদ্বৃত্ত অর্থ বা সামর্থ্য থাকলে সে গুণগ্রাহী হয়, না থাকলে হয় না। স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা বঙ্গনারীর ঝিনুকের গহণার প্রয়োজন কি?—এই প্রশ্নের জবাবে বলা যায় স্বর্ণালঙ্কার বঙ্গনারীর অঙ্গে কবে এবং কোথায় ছিলো? শাঁখা, সিঁদুর, লাল-পেড়ে শাড়ী, খালি গা এই সবই ত বাল্যকাল
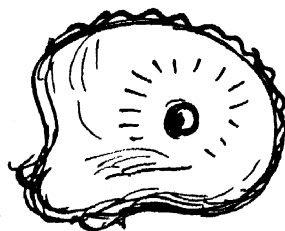
থেকে দেখে আসছি, মুষ্টিমেয় লোকে রূপার গহনা ক্রয় করে এবং বিন্দুমাত্র স্বর্ণ তথা-কথিত ভদ্রঘরের ঐশ্বর্য বাড়ায়। অর্থাৎ মানুষের যা প্রয়োজন তা সব সময়েই মানুষের আছে তার ভেতরে কেউ যদি ঝিনুক বা কাঁচ কিংবা প্ল্যাশটিকের পেঁচে গড়িয়ে বউ বা মেয়েকে সাজাতে চায় তাহলে নিশ্চয়ই সে তা পারে, তাই প্রায় চল্লিশ বছর আগে গ'ড়ে উঠেছিলো চৌগাছি ঝিনুক শিল্পালয়। কিন্তু কেবল মাত্র গহনা গড়েই এ শিল্পালয় সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি তাই এ'রা সামুদ্রিক ঝিনুক সংগ্রহ করে তার ওপরে নানাপ্রকার ছবি খোদাই করতে আরম্ভ করলেন। কাঠের আলমারী, হাত বাক্স, টেবিল ও নানাপ্রকার ক্ষুদ্র আসবাবের ওপরে প্রথমে কাঠ খোদাই করে নিয়ে তারপর সেই

মাপে ঝিনুকের লতাপাতা পাখী ফুল কেটে বসানোর কাজেও এ'রা পারদর্শী হয়ে উঠলেন। দুর্গা, কালী, শিব, গণেশ ও রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি সর্বত্র আদর পেতে লাগলো এই অভিনব শিল্পীর অঙ্গুলীস্পর্শে। আর সে কি একজন মাত্র? প'চিশ ত্রিশজন কারিগর সর্বদা খাটতো এই অভিনব শিল্প প্রতিষ্ঠানে। অদম্য উৎসাহ নিয়ে নিরক্ষর গে'য়ো চাষীরা অল্পদিনেই শিল্পসৃষ্টির অদ্ভুত নিদর্শন জাহির করলে। এ শিল্প প্রতিষ্ঠানের বয়স বছর চল্লিশেক মাত্র, কিন্তু প্রথম থেকে দশ বছরের মাঝে হু হু করে বেড়ে উঠেছিল এর সুনাম, লণ্ডনে ওয়েমব্লী এগজিবিশন, প্যারী, এমন কি হেনরী ফোর্ডের বাড়ীতে তাঁর নিজ প্রতিকৃতি, ভারতবর্ষের প্রতি রাজগৃহে তাঁদের নিজেদের এবং পূর্বপুরুষদের প্রতিকৃতি সমগ্র শিল্পজগতে একটা চাঞ্চল্য এনে দিয়েছিলো সামান্য কিছুদিন আগে, এ খবর তখন আমরা রাখিনি তার প্রধান কারণ যে ঝিনুকশিল্পে প্রচুর সময় লাগে, মুক্তা ফলতে যতটা সময় লাগে তার চাইতে বেশী লাগে একটা সাধারণ গ্রাম্যসমাজকে একত্রীভূত করে কর্মক্ষম করা এবং সেই কর্ম থেকে দশের উপকার করা। যুদ্ধের প্রচণ্ড ধাক্কায় মানবজাতি বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হয়ে পড়লো এবং জীবনকে ক্ষণস্থায়ী একটা কিছু ভেবে সস্তা দামের শিল্পকে বড় বলে গ্রহণ করতে লাগলো কিংবা সরলতার দিকে ঝু'কে কঠিন কার্যকে ফাঁকি দেওয়ার ফলে ঝিনুক শিল্পালয়ের শিল্প কেনবার মত লোক আর পাওয়া গেলনা কিন্তু তারিফ করবার মত লোক যথেষ্ট ছিল এবং সেইজন্যই এই শিল্পালয় আবার নতুন উৎসাহ নিয়ে কর্মে নেমেছে। শ্রদ্ধেয় প্রধান মন্ত্রী বিধানবাবু মহাত্মা গান্ধীর ঝিনুকের প্রতিমূর্তি আমেরিকায় পাঠিয়ে লিখেছেন—A gift from India এইখানেই শিল্প ও শিল্পীর বড় পরিচয়। দেশহীন, গৃহহীন নীরব সাধনারত কত ভদ্র গৃহস্থ কত প্রকারে ভারতবর্ষের বিরাটত্ব প্রচার করছে তার প্রকৃত খোঁজ দেবার জন্যই কংগ্রেস সরকার এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে সম্প্রতি কিছু অর্থ সাহায্য দিয়ে সমগ্র ভারতের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

কুটির শিল্প হিসাবে ঝিনুক শিল্প সব গ্রামেই সম্ভব নয়। যেখানে দেশী ঝিনুক বেশ পাওয়া যায়, কাছে নদী খাল বিল যথেষ্ট থাকে, সেখানে এইরূপ একটি কারখানা অনায়াসেই চলে। প্রত্যেক গ্রামেই দশ বিশ জন নিষ্কর্মা বালক যুবক পাওয়া যায়, একার্য তাদের দ্বারা খুব ভালোভাবেই চলে। গৃহস্থালীর কাজের পরে মেয়েদের পক্ষে একাজ সম্ভব নয় কিন্তু যাদের চাষ আবাদ আছে এবং অবসর সময়ও আছে এরূপ লোকও খুব অল্প সময়ে মনোযোগ দিয়ে এই শিল্প আয়ত্ত করতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু পরিচালনার জন্য একজন উপযুক্ত শিল্পীর প্রয়োজন সব সময়েই হয়। সরকারী শিল্প বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন। তা ছাড়া ব্যবসা পরিচালনা এবং বাজারের চাহিদা মেটানোর জন্য সামান্য লেখাপড়া জানা যুবকেরও প্রয়োজন আছে। ঝিনুকের বোতাম, ফুল ইত্যাদি কাটবার জন্য ছোটখাট "অয়েল এঞ্জিন" রাখা যেতে পারে। চৌগাছি ঝিনুক শিল্পালয়ের কেরোসিন চালিত এঞ্জিনটি শান, পালিশ, বোতাম কাটা ছাড়াও গ্রামের এবং অন্যান্য দশ গ্রামের লোকের ধানভানা কার্যে ব্যবহৃত হয়েছিল, তেলের ঘানি চালাবার চেষ্টাও হয়েছিল কিন্তু দেশের কলুরা এতে আপত্তি জানায়। পাড়াগাঁয়ে ঢে'কী যন্ত্র খুবই উন্নত ধরণের না হলেও এতে ধান ছাঁটাই উৎকৃষ্টভাবে হয় এবং ভদ্রবাড়ীর মেয়েরাও এই কাজ করে দেহমনকে সুস্থ সবল রাখেন। ঝিনুক শিল্পও "মেশিন" ছাড়া চলে না কিন্তু মোটা ঝিনুক ঘষে পাতলা করতে একটা লোকের গা ঘেমে জল বেরিয়ে যায় তখন সেই লোকটার দুঃখ দেখে একটা এঞ্জিনের কথা মনে হয়, কিন্তু তাতে দশটা লোক চুপ করে বসে থাকে কারণ সবাই ত আর সূক্ষ্ম কারিগর হতে পারে না। ক্ষণভঙ্গুর, সরু, তীক্ষ্ম করাত দিয়ে সামুদ্রিক ঝিনুকের ভেতরে জালিকাটা নক্সার কাজ করবার মতো লোক এক গ্রামে বেশী থাকে না, চৌগাছি ঝিনুক শিল্পালয়ের প্রধান এইরূপ একটি কারিগরের নাম কাজী নুরেউদ্দিন। দ্বিতীয় জনের নাম কাজী মহীউদ্দীন। এ'রা সবাই স্বভাবশিল্পী কিন্তু নিরভিমান ওস্তাদ শ্রেণীর। ওস্তাদ না হলে রাজা মহারাজার ঘরে ছবি দেওয়া চলে না কিংবা দেশ-দেশান্তরের লোকের সঙ্গে পরিচয় ঘটে না তাই এইরূপ প'চিশ ত্রিশজন ছোট বড় কর্মী একযোগে বাঙলাদেশের একটি নগণ্য গ্রামকে শিল্পজগতের চোখের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিল, যুদ্ধের কিছুকাল পূর্বে; যুদ্ধের কিছুকাল পরে আবার এ'দের কর্মতৎপরতা দেখে মনে হয় এই শিল্পের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল!

ভুতির মার রেস্টুরেন্ট

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

ভুতিদের রেস্টুরেন্টটা বিক্রী করে দেওয়া হচ্ছে। দোকানের দরজায় ভুতির বাবা এক টুকরো শাদা কাগজে 'রেস্টুরেন্ট বিক্রয়' বেশ বড় বড় হরফে লিখে ঝুলিয়ে দিল। কাগজটা দুলতে লাগল ঝুলতে লাগল বাতাসে।

ভুতির মার রেস্টুরেন্টের সামনে গাড়ি দাঁড়ায়। ভোলানাথ বটব্যাল নামেন।

শহরের বিজনেস ম্যাগনেট। সৌভাগ্যক্রমে এবং শহরের একটি বৈশিষ্ট্য বলেও ভোলানাথবাবু থাকেন ভুতিদের বাড়ির একশ হাত দূরে। ঠিক রাস্তার উল্টো দিকে তাঁর বিরাট হালফ্যাসনের চারতলা বাড়ি সামনের আকাশটা কালো করে রেখেছে।

এই ছোট্ট দোকানে ভুতির হাতের চা খেতে তিনি দোকানে ঢোকেন কি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাগজের লেখাটা পড়া শেষ করে ভোলানাথ গাড়িতে ঢুকছিলেন। ভুতির নরম গলা শুনে ফিরে দাঁড়ালেন।

'তুই চা করতে পারিস?' ভোলানাথ ভুতির কোঁকড়া চুলের মধ্যে সাদা বিশাল হাত ঢুকিয়ে হাসেন এবং ভুতির পিছনে পিছনে দোকানে ঢোকেন। ভুতি সারা দুপুর বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল চা খেতে কেউ আসে কি না। আশ্বিন মাস। এখন তো দুপুরে তেমন গরমও থাকে না বরং বেশ চা চা করে মন। তবু খদ্দের নেই। ছিল না।

ভুতি ঠিক জানত না, ভুতি আজ দুদিন ভেবে ভেবে বুঝতে চেষ্টা করছে ক্রাইসিস কথাটার অর্থ কি। দোকানে আর তেমন খদ্দের ঢুকছে না। এটা ওটা হাতে করে এ টেবিলে ও টেবিলে ছুটোছুটি থেমে গেছে। ভুতিও থেমে গেছে।

ভুতির বাবা 'বয়' কেষ্টকে কাল বিদায় করেছে। কাল রাত নটায় দোকানের আলো নিভেছে। আজ সকালে দোকান খোলা হল বটে কিছু তৈরী করা হয় নি। হবে না। বাজারই করা হবে না।

বাজারের ধরণ-ধারণ দেখে ভুতির বাবার তো বটেই ভুতির মার চোখও চড়কে উঠেছে।

আসলে রেস্টুরেন্ট দিয়েছিল ভুতির মা।

গয়না বিক্রির টাকায়। যখন ভুতির বাবার চাকরি যায়। জীবনের মধ্যাহ্নে দাঁড়িয়ে সহজ সরলমন কালীনাথ ডুকরে কেঁদে ফেলেছিল। আফিস থেকে বাড়ি ফিরে মুখের ওপর দু' হাত রেখে কাঁদছিল।

বাবার সতেরো বছরের তাড়াহুড়ো করে ড্যালহৌসীর ট্রামে চাপবার তাড়া, ট্রামে চাপবার তাড়ায় তাড়াহুড়ো করে মাথায় জল ঢালা ও ভাত খাওয়া হঠাৎ একদিন থেমে গেল দেখে ভুতিও কম ভয় পায়নি। সেদিন বারো বছরের কান দুটোতে অনেক কথা উড়ে উড়ে গিয়ে ঢুকল। চাকরি গেল মানে সব যাচ্ছে। ভুতিরা মরবে। ভুতি ও ভুতির আর চারটি ভাইবোন মরবে।

সকলের বড় মেয়ে ভুতি।

ইস্কুলে নাম কাটা যাবে ওর, বিয়ে হবে না। কিন্তু ভুতির মা ভুতির বাবার চেয়ে শক্তমানুষ। ভুতিরা এটা আবিষ্কার করল এবং সব চোখের ওপর দেখল। মার চুড়ি বিক্রীর টাকা দিয়ে বাবা টেবিল কিনেছে, হার বিক্রীর টাকায় টেবিল ও দশটা চেয়ার, আর পাপোসটা এসেছে।

দুটো ফুলের টব বসিয়েছিল দোকানের দরজার দু' পাশে ভুতির বাবা।

পাড়াটা ভাল ছিল।

বড় রাস্তা সামনে ছিল।

অনেক আশা ছিল রেস্টুরেন্ট চলবার। বেপারীটোলার এই গলির মোড়ে ওরা যুদ্ধের বহু আগে থাকতে দু'খানা ঘরে সামান্য টাকা ভাড়ায় বাস করছিল। দুখানা বেশ বড় ঘর।

ভুতির বাবাকে অনেক আশ্বাস দিয়ে এবং ব্যবসা করাই যে এখন বুদ্ধিমানের কাজ; রাস্তার ওপর সদর খোলা এমন যাদের একটি বড় ঘর আছে তাদের আর ভাবনা কি। ইত্যাদি বলে এবং ভেবে ভুতির মা রেস্টুরেন্ট খুলেছিল।

ভুতির বাবা দোকানে বসল। কিন্তু রেস্টুরেন্ট চলল না।

ভুতির বাবা চালাতে পারল না।

দু' মাসের মধ্যে দেনার দায়ে জর্জরিত হয়ে গেল। বলতে গেলে কালীনাথ একরকম গা ঢাকা দিয়ে আছে পরশু থেকে। পাওনাদাররা হুলুম হালুম করে তাগিদ দিচ্ছে দিনে দশবার করে।

বাড়িঅলা, দুধ, ডিম মাংস, মুদি। ভুতির মার মাথা ঘুরছিল।

ক'টা দিন সহস্র ভাবনায় মাথা ঘুরতে ঘুরতে কাল শেষ রাত্রের দিকে ভুতির মার মাথা ঘোরা হঠাৎ থেমেছে। যেমন ইলেকট্রিকের বিল মেটানো হয়নি বলে তাদের মাথার ওপরের পাখা হঠাৎ থেমে গেছে। শুধু থেমে যায়নি। পাখা দুটোও নেই। পাখার লোক কাল এসে পাখা খুলে নিয়ে গেছে।

আজ ভোরে উঠে ভুতির মা ঠিক করে ফেলেছে দোকান বিক্রী করে ফেলবে। আর আশা করা বৃথা।

'বিক্রী না হওয়া তক দোকানের দরজা অবশ্য খোলা থাকুক'। ভুতির মা বলল, 'নয়তো পাওনাদারদের মনে আরো বেশী সন্দেহ জাগবে।'

কালীনাথ দোকানে নিজে বসবে না। দোকানে এখন থেকে ভুতি থাকবে।

রেস্টুরেন্ট হওয়া অবধি দিনে দশ কাপ চা খাওয়া যেমন রপ্ত করে ফেলেছিল তেমনি চমৎকার তৈরী করতেও শিখেছিল ভুতি চা।

দোকানে বসে থাকতে থাকতে হাই উঠছিল ওর।

তাই এইমাত্র উঠে গিয়েছিল ও দেখতে বারান্দায়। খদ্দের কেউ আসে কি না।

গাড়িওলা কোনো খদ্দের তাদের চুপচাপ ঠাণ্ডা প্রায় উঠে যাওয়া দোকানে ঢুকবে ভুতি বিশ্বাস করতেও পারল না।

বার বার ডাগর কালো দুটো চোখ তুলে বটব্যালকে দেখছিল আর মাথা নীচু করছিল।

বটব্যাল ভুতির ছিপ্‌ছিপে সুন্দর পাখির পালকের মতন হাল্কা নরম থুতনিটা হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে বললেন, 'তুই চা করতে পারিস?'

হাতের মুঠো থেকে থুতনি নিয়ে ভুতি ঘাড় নাড়ল।

'আর কি খাবেন?' ভুতি প্রশ্ন করল।

বটব্যাল ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সকৌতুকে দোকানের ভিতরের অবস্থাটা দেখল। কিছুই নেই।

পাউরুটি মাখন বিস্কিট ডিম ও ঘিয়ের টিনগুলি খা খা করছিল। মশলার কৌটোয় মশলা ছিল না।

গেল মাসে বড় রকমের লোকসান দিয়ে ভুতির মা এমাসের গোড়া থেকে সাবধান হয়েছিল। কিছুই আর কেনাকাটা হয়নি এবং এই করে করে এখন তো দোকানশুদ্ধ বিক্রী হতে চলল। টেবিল চেয়ার উনুন সস্‌পেন কেট্‌লী চামোচ পেয়ালা পিরিচ বালতি ঝাঁটা। দরজার পর্দা দুটো।

সুন্দর পা-পোসটাও বিক্রী করে দেওয়া হবে। দোকান আরম্ভ করার সময় বেশ বড় একখানা পা-পোস কেনা হয়েছিল। ভুতির মা ওটা সাধ করে দোকান ও অন্তঃপুরের দরজার মাঝখানে বিছিয়েছিল। দানাপুরের কারিগরের হাতের তৈরী পা-পোস। মাঝখানে দুটো বড় গোলাপ।

এদিকে, পর্দার ওপারে দাঁড়িয়ে, দোকানের অবস্থার কথা ভাবতে ভাবতে ভুতির মাও, যাকে বলে 'ডাক সাইটে' বড়লোক খদ্দেরকে হঠাৎ দোকানে ঢুকতে দেখে চমকে উঠল।

বুকের ভিতর ঢিব্ ঢিব্ করছিল ভুতির মার। বটব্যাল তার কোলের কাছে ভুতিকে টেনে নিয়ে আদর করছে আর কথা বলছে।

'তোর বাবা কই, খুকি।'

'মাল কিনতে গেছে।' ভুতি বলে। কেন না ভুতিকে এই বলতে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। পালিয়ে বেড়াচ্ছে বললে পাওনাদাররা আরো গণ্ডোগোল করবে, দোকানে ঢুকবে, ভিতরের ঘর পর্যন্ত ধাওয়া করে ভুতিদের বাক্স পেটরা বাসন কোসন বিছানা পত্তর হাতের কাছে যা কিছু পাবে টেনে নিয়ে চলে যাবে। ডিমওলা ভুতির বাবার কাছে একুশ টাকা পায়, গয়লা পায় পঞ্চান্ন, মুদি পায় (রেস্টুরেন্টের ও সংসারের তেল মশলা আলু এবং কাঠ নিয়ে) একশ পঁচিশ, মাংসের মদন বসাকের ছাপ্পান্ন টাকা পাওনা হয়েছে। সকালবেলার মধ্যে দুবার এসে ওরা ভুতির বাবাকে খুঁজে গেছে। তাগিদ দিয়ে গেছে টাকার জন্য। বস্তুত ভুতিদের ঘরেও আজ উনুন ধরানো হয়নি। চাল-ডাল এতটুকু নুন পর্যন্ত নেই। কাল বিকেল থেকে সব ফুরিয়েছে। দুটো বাচ্চাকে একমুঠো আটা ভেজে খাইয়ে এবং ভুতিকে কিছু আটা ও কিছু ছোলা ভাজা খাইয়ে ভুতির মা নিজে পেট ভরে কুজোর জল খেয়ে পর্দার কাছে ঘন ঘন এসে দাঁড়াচ্ছিল। কেউ যদি দোকানটা কিনতেই আসে। এইবেলার মধ্যে আজকের মধ্যে ওটা বিক্রী হলে সন্ধ্যার দিকে যাহোক কিছু বাজার সওদা করা যায়।

রান্নাবান্না করলে ছেলেমেয়েগুলো খেয়ে বাঁচে।

কিন্তু তিনি তো আর দোকান কিনবেন না, যেন শুধু চা খেতেই এসেছেন। ভুতির মা পর্দার ফাঁক দিয়ে বটব্যালকে দেখতে দেখতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কান খাড়া করে শুনতে লাগল কথা।

'মাল কিনতে গেছে? কোথায়?' বটব্যালের লাল মেদস্ফীত মুখে হাসি। 'তোদের দোকানটা বিক্রী করে ফেলছিস?'

ভুতি কথা কইছে না এইবার।

নুয়ে কেট্‌লীর জল গড়াচ্ছে।

বটব্যাল আসন ছেড়ে উঠে খুকীর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। ভুতির মা চোখ দুটোকে পর্দার ফাঁক দিয়ে আরো বড় করে এ ঘরে পাঠিয়ে রুদ্ধশ্বাস হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘাড় নাড়ছিল বটব্যাল ভুতির দিকে তাকিয়ে। 'এমনি নয়, এমন করে চা করতে হয়।'

বটব্যাল কেট্‌লী ও ছাকনি নিজের হাতে তুলে নিয়ে খুকিকে চা করে দেখায়। ভুতি মিটমিট হাসে।

এতক্ষণ পর ওর জড়তা কেটেছে যেন। তরুলতা ঠোঁট টিপে হাসল।

বটব্যালেরও মেয়ে আছে। এই ভুতির বয়সী। দিব্যি গাড়ি চড়ে সেজেগুজে ইস্কুলে যায়।

গৌরী। ওর মেয়ের নাম গৌরী। পর্দার এপারে দাঁড়িয়ে ভুতির মার মনে পড়ল।

একসঙ্গে ইস্কুলে পড়ে। তাই বাড়িতে অনেক তথ্য কুড়িয়ে নিয়ে আসে ভুতি নিত্য। তিনটি বাড়ি করেছে বটব্যাল কোলকাতা শহরে। তিনখানা তাঁর গাড়ি।

সব পেরেছে এই লোক বুদ্ধির জোরে। তাঁর ব্যবসায়ী বুদ্ধি।

চোখ বড় করে তরুলতা তাঁর চা তৈরী করা দেখতে লাগল। 'এমনি চা করতে হয়। এমন করে যদি তোর বাপ চা তৈরী করতে পারতো তোদের দোকান ফেল পড়ত না।' ভুতি চুপ।

মুখে আঙুল গুঁজে কথা শুনছে। ভুতির মার গা শির শির করছিল।

লোহালক্কড়ের কারবারী। শহরে তিনটে দোকান। হাতের ছোঁয়ায় হুন্দরে হুন্দরে লোহা সোনা করে দিচ্ছে। সেই কারবারী হাতের তৈরী চা সোনার মত টলটল করবে ভুতির মার জানা ছিল বৈকি। ভুতিকে আবার কোলের কাছে টেনে নিয়ে সেই সোনালী চা একটা কাপে খানিকটা ভুতিকে দিয়ে বাকিটা নিজের জন্যে ঢেলে রেখে বড়লোক আবার খুকীর সঙ্গে গল্প শুরু করল।

ভুতির মা একবার অন্তঃপুরে গিয়ে ছোট শিশুটাকে কোল থেকে নামিয়ে বিছানায় শুইয়ে রাখল। বড়টাকে এক টুকরো মিশ্রী হাতে গুঁজে দিয়ে বুঝিয়ে সুজিয়ে ঘরের মাঝখানে বসিয়ে রেখে আবার চলে এল পর্দার কাছে।

না, আরো বেশি কৌতূহল হচ্ছিল ভুতির মার এই জন্যে এই ভেবে যে সমান বয়সী কালীনাথ কত অক্ষম, অপদার্থ। একলা মানুষ এই লোক কি না করেছে।

বটব্যালের নিয়মিত মদ, মাংস, ফল, দুধ, ডিম ও সব্‌জি খাওয়া উজ্জ্বল স্বাস্থ্য-মণ্ডিত চেহারার দিক থেকে ভুতির মা এক সময় চোখ ফেরাতে পারল না।

তাঁর গিলে-মারা এণ্ডি, শান্তিপুরী ধুতি, চক্‌চকে পাম্প-সু, সোনার বোতাম আংটি, দামী সিগারেটের সুন্দর গন্ধ দোকানের আবহাওয়া বদ্‌লে দিয়েছে। না, রেস্টুরেণ্টে কি আর দু'টি চারটিও খদ্দের আসে নি তাদের। আসতো।

বেশির ভাগ এসেছে বেকার, বাউণ্ডুলে। ধারে খাওয়ার গোষ্ঠী।

এদের জন্যেই দোকানটা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারল না ভুতির মা ভেবেছে। আর বটব্যালের মত বড়মানুষরা গাড়ি হাঁকিয়ে তাদের দোকানের দরজার সামনে দিয়ে চলে যায় সোজা সাহেবপাড়ার রেস্টুরেণ্টে। কি জানাশোনা কোন দেশী চায়ের দোকানে। যেখানে ভাড়াটে মেয়ে রাখা হয়েছে, বাবুদের টেবিলে চা তুলে দিতে হেসে সোহাগ করে একটা দুটো মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে চা-এর সঙ্গে আরো দু'পদ খাবার গছিয়ে দিতে।

ভুতি তাঁর হীরে বসানো আঙুলের আংটিটার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে দেখছিল কি।

চা খাওয়া শেষ করে ভুতির গালে আর একটি চুমো দেয় বড়মানুষ।

'আপনি তো আমাদের দোকানে আসেন না।' যেন আরও এক ধাপ সাহস বেড়েছে মেয়ের। বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে প্রশ্ন করছে।

'আসব এখন থেকে, রোজ আসব।' চায়ের বাটি হাত থেকে নামিয়ে রেখে বটব্যাল হঠাৎ যে কেন কথাটা বলল, ভুতির মা ঠিক বুঝল না। বাইরে 'রেস্টুরেণ্ট বিক্রী' ঝুলছে কি বড়মানুষের চোখে পড়ে নি?

পর্দার সঙ্গে একরকম লেপ্‌টে দাঁড়িয়ে ভুতির মা চুপ করে রইল। কৌতুকবোধ করল ও গরিবের দোকানে পা দিয়ে শহরের নামজাদা সওদাগরটি তার নোংরা ফ্রক-পরা তেরো বছরের মেয়ের সঙ্গে কেমন মজার গল্প করছে।

'বেশ তো, যদি রোজ এমন সুন্দর চা করে খাওয়াতে পার, আমি রোজ আসব।'

ভুতি কথা বলছে না। চোখে ওর অবিশ্বাসের হাসি তরুলতা টের পেল।

'বেশ তো, রেস্টুরেণ্ট বিক্রী হয়ে যাবে, এই তো তোমার ভাবনা?' সিগারেট ধরিয়ে বটব্যাল খুকিকে বোঝায়, 'আমি রোজ এসে তোমার হাতের চা খাব, আর চাএর দাম একশ টাকার একটা নোট তোমার হাতবাক্সে ফেলে যাব, কেমন? কোথায় তোমার হাতবাক্স?'

ভুতি এদিক ওদিক তাকায়।

পোড়ারমুখী ভুতি কথাগুলো কি বিশ্বাস করছে? ভুতির মা কড়িকাঠের দিকে চেয়ে একটা নিশ্বাস ফেলল।

ভুতি বড়মানুষের কোলের সঙ্গে আহ্লাদে একেবারে লেপ্‌টে গিয়ে এখন কথা গিলছে।

'না থাক। আমি একজন একশ টাকায় এক পেয়ালা চা খেয়ে গেলে আর কি হবে। আরো খদ্দের চাই। তার চেয়ে বরং—' যেন ব্যবসায়ীর হিসাবে ভুল হয়েছে, এদিক-ওদিক তাকিয়ে সিগারেটের সবটুকু ধোঁয়া মুখ থেকে বার করে দিয়ে খুকিকে আর একটু আদর করতে করতে অন্য প্রস্তাব দেয়, 'তার চেয়ে তোমাদের দোকানটা কিনে নেয়াই ভাল। কিছু বেশি টাকা দিয়ে। তোমাদেরও সাহায্য হবে, আমারও কাজ হয়। এ বিউটিফুল সাইট্ ফর এ শপ্। দোকানের পক্ষে ঘরখানা চমৎকার।'

পর্দার এপারে দাঁড়িয়ে তরুলতা লোকটির শুভ্র কঠিন সুন্দর মজবুত দাঁতগুলি দেখল।

লোকটির মধ্যে যে প্রচুর ক্ষমতা, উৎসাহ ও বুদ্ধি আছে, যেন তাঁর দাঁতে সেকথা লেখা আছে।

হ্যাঁ, দোকানের দিকে চোখ গেছে। ঘর-খানাই চাইছে কারবারী। একশ টাকায় এক পেয়ালা চা খাওয়ার কথাটা কিছু না।

টেবিলটার দর হচ্ছে নাকি?

ভুতির মা কান খাড়া করে রাখল।

'কত, বলো, বলো তোমার সুন্দর টেবিলটারই আগে দাম শোনা যাক।'

লোহার সঙ্গে তিনি চা-ও চালাবেন। এমন না হলে ব্যবসায়ী, এমন না হলে পুরুষ!

কিন্তু, কিন্তু এসব প্রস্তাব খুকিকে কেন? একরত্তি মেয়ে বোঝে কি।

এখন আর শ'ট না, হাজার লাখ।

টেবিল, চেয়ার, মিট্‌সেফ, বাসনকোসন, পেয়ালা-পিরিচ, চামচ সব তাঁর পছন্দ হয়েছে, সব তাঁর চাই। একটি একটি করে ভুতির চুপ করে থাকা সত্ত্বেও তিনি দামের লেবেল এ'টে দিচ্ছেন। যেন এক্ষুনি দোকানটা কিনে ফেলবেন।

একটা আঙুল মুখের মধ্যে গুঁজে ভুতি ড্যাব্‌ড্যাবে চোখে বড়মানুষকে দেখছে।

না কি তাঁর যে অনেক টাকা আছে, আড়াই টাকা ডজন চামচের জন্য তিনি পঞ্চাশ টাকা ইচ্ছে করলে দিতে পারেন, ত্রিশ টাকার টেবিল তিনশ' টাকায় কিনতে রাজী শোনাতে খুকিকে ভাল লাগছিল, তরুলতা ভাবল এবং ঠোঁটে ঠোঁট টিপে এবার বেশ কঠিন ভঙ্গিতে পর্দায় বুক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'ওটা কত দাম? ভারি সুন্দর জিনিস?'

এবার চোখ পড়ল। যেন এতক্ষণ পর অন্তঃপুর ও দোকানের মাঝামাঝি অংশে বিছানো সুন্দর পাপোসটার দিকে চেয়ে থেকে তিনি হঠাৎ চুপ করে যান।

পর্দার এপারে দাঁড়িয়ে তরুলতার বুকের ভিতর ঢিব্‌ ঢিব্‌ করছিল।

ভুতির চোখে এখন আবার হাসির ঝিলিক লেগেছে। অর্থাৎ ও টের পেয়েছে মা পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছে। বাবা তো আর কাছে নেই। দোকান কেনা সংক্রান্ত গুরুগম্ভীর কথাগুলো মা'র সঙ্গে হতে দোষ কি ভাবছিল কি ও ? বিশেষ, এত চড়াদামে যখন সব তিনি কিনতে চাইছেন?

তা ছাড়া, তা ছাড়া। তরুলতা আর একটা নিশ্বাস ফেলল। কালীনাথ কখন ফেরে, তার ঠিক নেই। আজ তিনদিন উস্কুখুস্ক চুল গালভরা দাড়ি নিয়ে বন্ধুদের কাছে ঘুরছে। কেউ যদি দোকানটা কিনে নেয়। এ দোকানের মার নেই, বলছে সে মুখে, পর্যাপ্ত মূলধনের অভাবে চালাতে পারে নি, আরো ক'দিন ঘর থেকে দিয়ে চালিয়ে যেতে পারলে দোকানটা চলত।

কিন্তু কেউ আসছে না।

কারো সাহস নেই কালীনাথের এই রোগা টিংটিঙে চাএর দোকান নিয়ে চালায়।

কি কুক্ষণে যে তরুলতা সাহস করে এখানে দোকান খুলেছিল এখন ভাবে।

'বলো বলো কত দাম?' মনিব্যাগ বার করছেন তিনি। পাপোসটা তাঁর এত বেশি পছন্দ হয়েছে যে, যেন এর জন্য যে কোন মূল্য দিতে তিনি প্রস্তুত। ভুতি শুধু একবার বললেই হয়।

সাহস পাচ্ছে না খুকি।

কি করে পাবে?

দোকানের আর পাঁচটি জিনিসের মত এটিও তরুলতার গয়না বিক্রীর টাকায় কেনা হয়েছিল। তরুলতা নিজে গিয়ে পছন্দ করে রাধাবাজার থেকে এনেছিল, পাপোস আর ঝাড়ন দুটো।

বলতে কি, দোকানের আর পাঁচটি জিনিস ভাল দামে বিক্রী হলে তরুলতা ঠিক করে রেখেছিল ওটা হাতছাড়া করা হবে না। দোকান থেকে অন্তঃপুরে টেনে নেবে। কিন্তু কত টাকা তিনি দিতে চাইছেন, এত ভাল জিনিসটির জন্যে।

না কি তিনিও সাহস পাচ্ছেন না, এর উচিত মূল্য ধরতে। তা কি করেই বা পাবেন, ভাবল তরুলতা, সাধের জিনিসের মূল্যে টাকা দিয়ে যাচাই করা চলে না।

আ, তবু যদি কারবারী জানতো, এই দোকানের চামচ-পিরিচ থেকে আরম্ভ করে ঝাঁটা-বালতিটা পর্যন্ত তরুলতার হার, চুড়ি, দুল বিক্রীর সাক্ষী হয়ে ওখানে পড়ে আছে।

কি হল?

চোখের তারা ঝিকিয়ে উঠল ভুতির মার।

ভুতি পাপোসের ন্যায্য মূল্য কত বলতে না পেরে ফ্যাল্‌ফ্যাল চোখে পর্দার দিকে চেয়ে আছে, পর্দার এপাশে পাপোসের প্রান্ত ঘে'সে মা'র ফর্সা দু'টি পা দেখছে কি বোকা মেয়ে!

'নাঃ, তুমি দেখছি একেবারে আনাড়ি দোকানদার। তুমি যদি নিজে থেকে একটিরও দাম না বলো, কি করে আর আমি এই রেস্টুরেণ্ট কিনি, বলো?' কারবারীর মনিব্যাগ পকেটে ঢুকল। ত্রাস্ত চোখে তিনি হাতঘড়ি দেখেন। আর তার সময় নেই, অনেকক্ষণ কাট্‌ল এখানে, এই বেলা শেয়ারের বাজারে ডাক উঠেছে, ছুটতে হবে তাঁকে এক্ষুনি।

বটে! তরুলতা ঢোক গিলল।

একশ টাকায় এক পেয়ালা চা খাওয়ার মতই তিনশ টাকায় আমকাঠের টেবিল কেনার প্রস্তাবটাও তাঁর বাতাসে ঝুলে রইল।

সত্যি কেবল খুকিকে কোলে নিয়ে চুমো খাওয়া আর ওর রেশমী ঝাঁকড়া চুলে আঙুল চালানো।

ওটা কি? বড়মানুষের দুই আঙুলে একটা আধুলী। 'দু'আনা তোমার চাএর দাম। বাকি পয়সা দিয়ে লজেন্স খেও, কেমন?'

আদুরে মোটা গলায় কথা বলতে বলতে তিনি মুদ্রাটি ভুতির হাতে গু'জে দিয়ে উঠে দাঁড়ান। শুকিয়ে অপরাজিতার কলির মত নীল শাদাটে হয়ে গেছে খুকির মুখ। দেখে তরুলতার কণ্ট হ'ল।

আজ, তরুলতা না ভেবে পারল না, কোন বেকার বাউণ্ডুলে দোকানে ঢুকে ভুতিকে এভাবে ফাঁকি দিলে ভুতি কি করত! কামড়ে দিত নোখ দিয়ে আঁচড়ে দিত। আত্মসম্মানে ঘা লাগলে খুকি যে আজকাল বেশ ফোঁস করে ওঠে, তরুলতা লক্ষ্য করেছে বৈকি। তবু তো গত পরশু থেকে 'ধারে বিক্রী' বন্ধ করে দেওয়াতে বেকার বাউণ্ডুলেগুলো আর এমুখো হচ্ছে না। উঃ কি সব খদ্দের! ওরা ধার খেয়ে খেয়ে রেস্টুরেণ্টটা তো খায় নি, তরুলতার গায়ের গয়নাগুলো চিবিয়ে খেয়েছে। সেজন্যেই ওগুলোর ওপর তরুলতার আরো বেশি রাগ। তা ছাড়া, অস্বীকার করবে কে, আজ ভুতি একলা দোকানে আছে দেখলে রক্ষে ছিল! দোকান ছাড়বার নাম করত না একটিও। অষ্টপ্রহর মাছির মত বিজ্‌ বিজ্‌ করত। চা খেতো আধ পেয়ালা থেকে বড় জোর দেড় কি দু'কাপ। ঐ খেয়ে রাত আটটা পর্যন্ত চলত আড্‌ডা। না এক টুকরো রুটি, না একটু মাংস। মাঝখান থেকে ভুতির বারোটা বাজত। হ্যাঁ, ঐ একরত্তি একটা ফ্রকপরা মেয়ের পিছনে লাগতে অসভ্য জানোয়ারগুলো ইতস্তত করত নাকি। অবশ্য এক্ষেত্রে তরুলতা সেসব কিছু ভাবল না।

কিন্তু তিনি এ কি করলেন। বাপস্‌! এত আদর ও চুমো খাওয়ার পর শেষে ছ'আনা বক্‌শিস।

কিন্তু, কিন্তু ভুতি যে শেষ পর্যন্ত এত বড় লোকটাকে এভাবে ঘায়েল করবে, তরুলতা ভাবে নি।

আপনি ভয়ানক ভীরু।' খুকি মুখ খুলল। 'ভয় পেয়ে যাচ্ছেন, আমাদের দোকানটা কি আপনিও চালাতে পারবেন না, এত বড় কারবারী মানুষ, শুনি।'

বটব্যাল চৌকাঠের দিকে পা বাড়িয়েও ফের ঘুরে দাঁড়ায়।

জানেন? বাবা চালাতে পারল না বলে আমাদের দোকান ফেল্ পড়ল। মা হার, চুড়ি বেচে বাবাকে এই রেস্টুরেণ্ট করে দিয়েছিল।'

'তাই নাকি!' সহানুভূতির ভঙ্গিতে তিনি ঈষৎ ঘাড় নাড়েন। একটি সেয়ানা মেয়ের মতই দুই হাত কোমরে রেখে ভূতি বলছিল, 'মা রাতদিন বাবাকে বোঝাচ্ছে দোকান হিসাবে ঘরটি ভাল। রাস্তার ওপর ডবল দরজার ঘর,—চাল ডাল তেল নুন কাঠ কাপড় আলু ডিম ফল ফুল কড়াই বালতি যে কোন জিনিস এখানে চলে।'

'তাই তাই।' বটব্যাল মৃদু হেসে মাথা নেড়ে আবার ভূতিকে আদর করেন।

'কিন্তু বাবার তো ব্যবসায়ে মাথা নেই! হুর্ হুর করে ভূতি বলে চলল—'চায়ের মত সোজা ব্যবসাই চালাতে পারল না যখন—'

পর্দার এপারে দাঁড়িয়ে তরুলতার দুই কান লাল হয়ে গেল। ভূতি যে চোখেমুখে এত কথা বলতে শিখেছে, তরুলতা জানত না। বয়সের তুলনায় মেয়ে একটু বেশি পেকে গেছে না কি! তরুলতা খুকির ওপর রাগ করল আবার করলও না। এটা অবশ্য বাড়ির ওপর রেস্টুরেণ্ট খোলার মন্দ দিক। কিন্তু এ আর কতটুকু মন্দ। ক'দিন ভূতিকে রেস্টুরেণ্টে যেতে দিয়েছে ও? তা নয়, সে একটা কথা নয়। বরং বলো, দোকান বলে দোকান, মেয়ের হাত ধরে তরুলতার যে এখন রাস্তায় দাঁড়াবার অবস্থা। পাওনাদাররা বাড়িতে ঢুকে অপমান করতে চাইছে। তারা ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছেচে। 'স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রী-ই তো সব। ঘরবাড়ি আছে, দোকান আছে, কালীনাথ যদি ফেরার হয় ক্ষতি নেই, পর্দার ওপারে না থেকে কর্ত্রী যদি এপারে এসে আমাদের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা করেন, তবু তো মনে সান্ত্বনা পাই। আমরা কতকাল আর পাওনা ফেলে রাখব।' বলছিল সব হাত নেড়ে।

কিন্তু এখন আদরের চাপে ভূতি কি বেশ কিছুদূর এগিয়ে যাচ্ছে না। এত সব ও'র কানে তুলছে কি?

'ক'ভাই-বোন তোমরা?' খুকিকে আবার তিনি কোলে নেন।

'তিনটি।'

'তুমি বড়?'

'হুঁ,' ভূতি বলল, 'জানেন, এটা আগে দোকান ছিল না। আমাদের শোবার ঘর ছিল। বাবার চাকরি গেছে পর থেকে দোকান।'

বটব্যাল নীরব।

'এখানে আমার পড়ার জায়গা ছিল, ওধারে ছিল মা'র লক্ষ্মীর আসন। মাঝখানে পড়তো খাট।'

বটব্যাল ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে আবার দোকানটা দেখল।

'কিন্তু এত করে কি হল।' গলার অদ্ভুত সুর করে খুকি বলে, 'মা এত সব করেও বাবাকে তুলতে পারল না।' কথা শেষ করে ও পর্দার দিকে তাকায়।

এবার তিনিও তাকান।

তারপর, তারপর ভূতি যে কথা বলে, শুনে তরুলতা এক মনে হাকে, আর এক মনে দাঁতে দাঁত ঘসে মেয়ের মুণ্ডপাত করে। বোকা মেয়ে। ও কি ভেবেছে, ঘরের সব খবর তাঁর কানে তুললেই তিনি গলে যাবেন, আর আড়াই টাকার পাপোস পাঁচিশ টাকায় কিনে নেবেন! পাকা ব্যবসায়ী। তোমার বাপ নয়।

'মা রোজ বাবাকে বলে, তোমার হাতের চা খেতে ভাল-খদ্দের জোটে না, আসে যত এক পয়সার মা-বাপ ইতর ছোটলোক, জন্তু-জানোয়ার, আমি যেদিন চা তৈরী করব, সেদিন শহরের সব বড়লোক ছুটে আসবে এ দোকানে। কিন্তু তা তো আর হচ্ছে না। তা হলে এই দোকান দিয়ে আমাদেরও তিনখানা বাড়ি হ'ত, গাড়ি হ'ত।'

ভয়েলের কাপড়ে পর্দার কি-ই বা থাকে। বটব্যালের সঙ্গে প্রায় চোখাচোখি হয়ে যায়। পর্দার একটা পুরু অংশে চোখ সরাবার চেষ্টা করে তরুলতা বিফল হয়।

'সত্যি আপনি একটি জীনিয়স।' বটব্যালের চোখে মোলায়েম মিষ্টি হাসি। 'খুকির মুখে সব শুনলাম। যতটা করার করেছেন আপনি; কিন্তু, কিন্তু—সত্যি খুব প্রোস্পেক্ট ছিল এই দোকানের,—তা, কেন যে চালাতে পারল না খুকির বাবা—' বলে তিনি একবার থামেন। তরুলতা অবশ্য এই মুহূর্তে আর স্বামীর অক্ষমতার কথা ভাবল না। বিব্রত হল ভূতির ডাকে। 'তুমি এসো না মা, এসে ভাল করে ও'কে একটি কাপ চা করে দাও। দোকানে আর এখন কে-ই বা আছে।'

'ডেঁপো।' ভূতির মা দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে আর একবার মেয়ের মুণ্ডপাত করল। কিন্তু ভূতি ইতিমধ্যে পুরোপুরি নিজের মধ্যে ফিরে গেছে। আর একটা চুমো খেয়ে আহ্লাদে ওর দুই গাল থৈ থৈ করছিল।

বটব্যাল ওর রেশমী চুল নিয়ে খেলা করছিল।

জিহ্বাকাটা ভূতি পরিষ্কার বলে বসল, 'আমার চা খেয়ে উনি একশ টাকা দিচ্ছিলেন। তোমার চা খেয়ে ক'হাজার টাকা দেন দেখা যাক্।'

শুধু রাগ নয়, লজ্জায় তরুলতার কর্ণমূল আরক্ত হয়ে উঠেছিল।

বটব্যালের দৃষ্টি এড়াল না।

সূক্ষ্মবুদ্ধি কারবারী সুন্দর হেসে বলল, 'ভালই তো। খুকির বাবা যখন ঘরে নেই, আপনিই তো সব। ও চা খাওয়ার প্রস্তাবটা তেমন কিছু না, ধরুন দোকানখানা আমিই কিনছি। কিনতে চাইছি। অবশ্য ন্যায্য মূল্যে, সুতরাং সামনাসামনি কথাবার্তাটা—'

'তা তো বটেই।' কারবারীর মনের কথাটা বুঝতে তরুলতারও কষ্ট হয় না।

'আপনি বসুন।' আর লজ্জা না করে তরুলতা তৎক্ষণাৎ উত্তর করল। তারপর পর্দা ছেড়ে চলে এলো অন্তঃপুরে।

আর ভূতির উপর রাগ করল না সে। ছেলেমানুষ ও, বোঝে কি।

তরুলতা শুধু বুঝল, দোকান কেনার আগ্রহ তাঁর প্রবল। ভূতিকে ফাঁকি দিতে চেয়েছিলেন, তরুলতাকে অন্ত্র কারবারী ফাঁকি দিতে চান না। সত্যিকারের দর-দস্তুর করতে কথা বলতে চান। কিসের কারবার করবেন তিনি?

ঘরে সাবান, পাউডার ছিল না।

এমনি মুখখানা একটু ধোয়ামোছা করে সারল তরুলতা। ভূতির একটা ফর্সা কাপড় বাঁচানো ছিল। তাই প'রে নিল।

'কিসের কারবার করবেন তিনি?' তরুলতা সিঁথিতে সিঁদুর এবং চোখে কাজল পরতে পরতে আবার ভাবল, 'তেল চিনি নুন আটা ডিম ফল ফুল মধু না কি সেই চা?'

চা, আশ্চর্য! চা-এ কত লোক ডুবল, কতজন উঠল।

পর পর দুটো দীর্ঘশ্বাস ফেলে তরুলতা বাকি প্রসাধনটুকু সংক্ষেপে যখন শেষ করল, দরজায় আবার গাড়ির শব্দ শুনে চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি পর্দার কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল, চিনল গাড়ি।

মশলার হালদার।

রোজ দু'বেলা এই দোকানের সামনে দিয়ে তিনি বড় বড় হোটেল রেস্টুরেণ্টে চা, ডিনার লাঞ্চ্ পার্টি খেতে গেছেন।

এই মাছি ভন্‌ভন্‌ কানা রেস্টুরেণ্টে আজ তাঁর কি দরকার?

কৌতূহলী লোহালক্কড়ই আগে প্রশ্ন করল।

'এই দোকান আমি কিনব।' মৃদু হেসে হালদার বলল, 'এ বিউটিফুল সাইট্ ফর এ শপ্।'

'ও বুঝেছি, আপনারও এদোকান মনে ধরেছে।' কোনরকম ভূমিকা না করে পাকা মেয়ে ভুতি এবার হুট্ করে বলে বসল, 'বসুন। আগে এই দোকানের চা খেয়ে দেখুন কি তার দাম হ'তে পারে তারপর তো রেস্টুরেণ্ট কেনার কথা হবে।' বলে খুকি পর্দার দিকে তাকিয়ে ফিক্ ক'রে হাসল।

ভুতির দুষ্টু ভুরুর দিকে তাকিয়ে তরুলতা তৃতীয়বার দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করল আর সেই মুহূর্তে মিহি ভয়েলের ওপীঠে এলাচ ব্যবসায়ীর এলাচের মত ছোট ঈষৎ চ্যাপ্টা চোখের সঙ্গে তরুলতার চোখের ঠোকাঠুকি লাগল।

'ও, আপনারই দোকান?' হাসল হালদার।

'বসুন।' এবার আর ততটা আরক্ত না হয়ে তরুলতা ঘাড় নাড়ল। এবং সেই মুহূর্তে, দেখে আর ও অবাক হ'ল না, ঢুকল তেল-কলের তালুকদার। তিনিও দোকানটা কিনতে চাইছেন।

'বেশতো, বসুন বসুন।' প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে আড়নয়নে তাকিয়ে এলাচ সিগারেটের টিন থেকে সিগারেট তুলল।

কে? আবার কে? তরুলতার বুকের ভিতর দুরদুর করছিল। তুলার মার্চেণ্ট নন্দী! ধারেকাছেই থাকেন বুঝি?

লক্ষপতিরা আরো লক্ষ লক্ষ টাকা করতে চাইছেন এখানে ব্যবসা দিয়ে এই দোকান ভাঙিয়ে। দোকানের দরজায় চুণের কারবারী চাকলাদারের সুন্দর বিশাল পণ্টিআক্ দেখে ভুতির মার যত না চোখ জুড়ালো শরীর টাটাল তার শতগুণ।

কিসের দোকান? এক চা ছাড়া আর কি ব্যবসা চলতে পারে এখানে ভাবতে ভাবতে তরুলতা ঘরের টুকিটাকি একটা দুটো কাজ সেরে এবং কোলের বাচ্চা দু'টোর হাতে আরো দু'টুকরো মিছরী দিয়ে যখন দোকানে এসে দাঁড়াল বাইরে আশ্বিনের পড়ন্ত বিকেল সোনার পাতের মত ঝিক্‌মিক্ করছিল।

যত্ন করে তরুলতা পাঁচ' পেয়ালা চা তৈরী ক'রে পাঁচজন অতিথির সামনে তুলে ধরল। এবং ভাঙ্গা টিম্‌টিমে রেস্টুরেণ্টের দরজায় হঠাৎ পাঁচটা গাড়ি ভিড় করতে দেখে সেদিন ডিমওলা নিজে থেকে আরো দু'কুড়ি ডিম ধার দিয়ে গেল ভুতির মাকে। মুদী মহোল্লাসে বয়ে নিয়ে এল ঘি আলু নুন পেঁয়াজ লঙ্কা। 'দাম এখন থাক।'

তারা দু'দিন সবুর সইতে জানে।

'যদি দোকান চলে দামের জন্যে আটকাবে না।' কয়লাওলা ফিস্‌ফিসিয়ে বলে গেল তরুলতাকে।

এদিকে, উপস্থিত পাঁচজন, দোকান কেনার প্রস্তাব করতে করতে নিরামিষ চা না খেয়ে চায়ের সঙ্গে কিছু খাওয়া দাওয়া করার ভদ্রতা ও সৌজন্যতা মর্মান্তিকভাবে অনুভব ক'রে এটা ওটার অর্ডার দেন।

তৈরী হয় ডেভীল কট্‌লেট কারী চপ্।

আমকাঠের টেবিলের দর অনেক পিছনে পড়ে থাকে। কাটা-চামচের আওয়াজের কাছে এমন যে মনোরম পাপোস সেটার পর্যন্ত দর করা হয় না আর সেই বিকেলে।

শুধু চাএর সুখ্যাতি।

'সত্যি বড় বড় হোটেল রেস্টুরেণ্টে আমরা এমন জিনিস খাইনি!'

মুগ্ধ অবাক চোখে ও হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে কারবারীরা তরুলতার চাএর প্রশংসা ও তার চপ্ কট্‌লেট তৈরীর পদ্ধতির গুণগান করল।

'মন্দ কি!' মৃদু গলায় তরুলতা বলল, 'এখন থেকে নয় রোজই এসে এখানে একটু চা খাবেন!'

'না, না,' বিনয়নম্র গলায় তাঁরা তরুলতাকে আশ্বাস দেন, 'তিনি যদি ইচ্ছা করেন প্রকৃতই যদি দোকানখানা বিক্রী করতে চান ভাল দাম এর পাবেন বৈকি। কেন না জায়গাটা শীগ্‌গীরই ডেভলাপ্‌ড হচ্ছে। এই গলি আর গলি থাকছে না—বড়রাস্তা হবে। ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাস্টের নজর পড়েছে এই অঞ্চলে।'

'তদ্দিন কি আপনারা অপেক্ষা করবেন,—কবে দোকানের ন্যায্য মূল্য স্থির হবে তারপর দোকান কিনবেন।' ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে তরুলতা সুন্দর হেসে উত্তর করল।

'নিশ্চয়! নিশ্চয়' বিলাতী রেস্টুরেণ্টের ফাউল ডেভিল কট্‌লেট ও চাএ শানানো পাঁচটি জিহ্বা একসঙ্গে কল্‌কলিয়ে উঠল। 'আগে তো আপনার সুশ্রী হাতের চাএর প্রকৃত মূল্য নিরূপণ হোক, তারপর দোকানের দর ঠিক হবে, এখনা কি। সত্যি, ভারি সাইট্ হোম্‌লী অ্যাট্‌মোসফিয়ার'।

তরুলতা আর কথা কইল না।

রেশমী চুল দুলিয়ে দুলিয়ে টেবিল থেকে টেবিলে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে ভুতি প্রত্যেকের প্লেটে চিংড়ি কট্‌লেট, ভেট্‌টি-ফ্রাই মাংসের চপ্ ও ডবল ডবল ডিমের বড়া তুলে দিয়ে হি-হি করে হাসতে লাগল।

অর্থাৎ এতক্ষণ যে সবাই ওর গালে এক-রাশ চুমো খেয়ে চুলে অনেকক্ষণ হাত বুলিয়ে তারপর শুধু এক বাটি চা গিলে বেরিয়ে যাবার মতলবে ছিল সেটি আর হতে পারল না দেখে ভুতির আহ্লাদের সীমা ছিল না।

যেন প্রতিশোধ নিতে পারার আনন্দে ও কারবারীদের পাকা চুলে হাত বুলোচ্ছিল আর প্রত্যেকের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বলছিল, 'এখানে একজোড়া চপের দাম ন সিকে, কট্‌লেট-জোড়া পুরো তিনটাকা, শেষটায় ভুলে যাবেন না মশাই।'

বলেই এলার্ম দেওয়া ঘড়ির মত দূরে ছিট্‌কে গিয়ে হাসছিল।

দেখে, মেয়ের এটা বাড়াবাড়ি, ভেবে ভুতির মা যে দু'একটা ভুরুর শাসন না করছিল খুকিকে এমন নয়।

কিন্তু সম্ভ্রান্ত খদ্দেরগণ তৎক্ষণাৎ দুঃখিত হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তরু-লতার ব্যবহারের। 'নিশ্চয়ই, ওরই তো এই রেস্টুরেণ্ট, ওই তো আমাদের বলে দেবে ক্যেন্‌টার কত দাম।' ব'লে চা সমাপনান্তে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে সিগারেট ধরিয়ে তরুলতার চোখের দিকে তাকিয়ে সবাই মিটিমিটি হাসছিলেন। আশ্বিনের অপরাহ্নে সুন্দর একটা পার্টির আবহাওয়া ঘনিয়ে উঠেছিল ছোট্ট রেস্টুরেণ্টে।

এটা অবশ্য শত্রুপক্ষের বানানো কথা। সন্ধ্যার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে কালীনাথ বাড়ি ফিরে দোকানের ক্যাশ দেখে খুশির চোটে লাফিয়ে উঠে নাকি দরজায় টাঙানো 'রেস্টুরেণ্ট বিক্রয়'-টা ছিঁড়তে গিয়েছিল, তরুলতা বাধা দিয়ে বলেছিল, 'আজই দরকার কি, বরং আরো ক'দিন ওটা দরজায় ঝুলুক। আর তুমি দিনকতক এমনি গা ঢাকা দিয়ে বাইরে থাক।'

আমি সেসব জানি না। আমি সেদিন শীতের দুপুরে 'ভুতির মার রেস্টুরেণ্টে' ব'সে পরম তৃপ্তি সহকারে একটা ওমলেট ও চা খেয়ে এসেছি ও এক বন্ধুর মুখে সেখানে বসেই গল্পটা শুনেছি।

সত্যি, কতকাল গেছে, কারবারীদের দূর-দৃষ্টি সফল হয়েছিল। বেপারীটোলার সেই গলি ভেংগেচুরে কতবড় গণেশ এভিন্যু ক'রে দিলে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট। কিন্তু, কিন্তু ভুতিদের রোগা টিংটিংএ রেস্টুরেণ্টের মাথায় আজও লাল শালুর ওপর বড় বড় হরফে 'দোকান বিক্রয়ে'র নোটিশ ঝুলছে। আজও বিক্রী হয়নি দোকান। কি করে হবে, রাস্তার অনুপাতে ঘরটার এতই দাম যে, এখনপর্যন্ত নাকি এর ভ্যালুয়েশন ঠিক করা যাচ্ছে না। বিকেল পড়তে, আজ অবশ্য আর পাঁচটা নয়, পঁচিশটা গাড়ি এসে দাঁড়ায় রেস্টুরেণ্টের দরজায়।

কি, আপনি মনে করেছেন আমার মত আপনিও একদিন দেড়টাকা খরচ ক'রে একটা ডিমের বড়া ও এক কাপ চা খেয়ে আসবেন আর ভুতিকে দেখে আসবেন? সে গুড়ে বালি।

হ্যাঁ, অস্বীকার করে কে, ভুতি আজ আর তেরো বছরের ফ্রকপরা খুকি নেই, ভাদ্রের ভরানদীর মত পূর্ণযৌবনা রূপসী নারী, —আছে বরের সংগে মনের সুখে কোয়েম্বাটুরে। ভাল পাত্র দেখে মেয়ের বিয়ে দিয়ে তরুলতা কাশীবাসিনী হয়েছে। আপনার টেবিলে চা তুলে দিতে এখানে আছে এখন বাঁকুড়ানিবাসী মিশমিশে কালো ছোকরা নিধিরাম।

কার পায়ের ছাপ?

অমরেন্দ্রকুমার সেন

মাত্র কিছুদিন পূর্বে খবরের কাগজে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদটি সারা দেশে বেশ কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে। সংবাদটি হল এই রকম—

হিমালয়ে অতিকায় তুষার মানব
অভিযানকারিগণ কর্তৃক পদচিহ্ন আবিষ্কার

নয়াদিল্লী, ৭ই ডিসেম্বর—কাঠমাণ্ডুর একটি সংবাদে জানা গিয়াছে যে, বৃটিশ হিমালয় অভিযানের সদস্যগণ তাঁহাদের সাম্প্রতিক মাউণ্ট এভারেস্ট অভিযানের সময় পৌরাণিক অতিকায় তুষার মানবের পদচিহ্ন দেখিয়েছেন এবং তাহার ফটো লইয়াছেন।

অভিযানের ৪৪ বৎসর বয়স্ক নেতা মিঃ এরিক সিপটন এই সম্পর্কে একটি পাহাড়ীর সংগে আলাপ করিয়াছেন। সেই পাহাড়ীটি বলে যে, রহস্য মানব অর্ধমানব গরিলা সদৃশ সেই অতিকায় মানুষটিকে সে নিজে দেখিয়াছে। হিমালয়ের তুষারাচ্ছন্ন অঞ্চলে সম্ভবতঃ সে বাস করে। মিঃ সিপটনের দল যে পদচিহ্নটি পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহা দেখিতে ত্রিকোণাকার এবং অভিযানের সদস্যগণ যে বরফজুতা পরেন আকারে তাহার অপেক্ষাও বৃহৎ।

মাউণ্ট এভারেস্টে তিন মাস অভিযানের পর মিঃ সিপটন গত সপ্তাহে দিল্লীতে পেঁছেন। তিনি আজ রাত্রে বিমানযোগে লণ্ডন রওনা হইয়া গিয়াছেন।

মিঃ সিপটন যে ফটো লইয়াছেন লণ্ডনের বিশিষ্ট জীবতাত্ত্বিকগণ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং উহা কোন শ্রেণীর জন্তুর পদচিহ্ন তাহা নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিবেন।

তিব্বত, নেপাল ও সিকিমে এই অতিকায় তুষার মানব সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহাতে জন্তুটিকে নরখাদক বলিয়া

এরিক সিপটন

বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহারা সাদা, কালো ও পাটকেলে রঙের হয়। কিংবদন্তী অনুসারে ইহার দর্শনমাত্র মানুষের মৃত্যু হয়। পি টি আই।—আনন্দবাজার পত্রিকা রবিবার ৯ই ডিসেম্বর।

এরপর আরও খবর আছে। বিখ্যাত পর্বতারোহণকারী ফ্রাঙ্ক স্মাইথ ১৯৩৭ সালে হিমালয়ের ভিউণ্ডার ভ্যালি যা ফুলময় উপত্যকা নামে পরিচিত, সেখানে এক দ্বিপদ জন্তুর পায়ের ছাপ দেখেছিলেন যা লম্বায় তেরো ইঞ্চি, যার সামনে পাঁচটি এবং বিপরীত দিকে দুটি আঙুল আছে। অনেকে সেই সময় এই পদচিহ্ন মহাভারতোক্ত অশ্বত্থামার পায়ের ছাপ বলে মনে করেছিলেন। মনে থাকতে পারে যে, এই পায়ের ছাপের প্রতিলিপি সেই সময় কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় বিক্রয় হতো এবং সারা দেশে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। জলপাইগুড়িতে একজন লোক নাকি সেই বিরাট পুরুষকে পর পর বাড়ির ছাদ ডিঙিয়ে অবলীলায় চলে যেতে দেখেছিলেন।

কিন্তু এই পায়ের ছাপ কার?

এই পায়ের ছাপ প্রথম লক্ষ্য করেন কর্ণেল হাওয়ার্ড বেরি ইংরেজি ১৯২১ সালে। তিনি ছিলেন প্রথম মাউণ্ট এভারেস্ট আরোহণকারী দলের নেতা এবং এই পদচিহ্ন তিনি দেখেছিলেন এভারেস্টের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত বাইশ হাজার ফুট উচ্চ লাখপা লা নামে গিরিবর্ত্মে। এই পদচিহ্নের বিষয় তিনি একটি সংবাদপত্রে লিখেছিলেন এবং সেই সংগে তাঁর কুলিদের অভিমতও জানিয়েছিলেন। কুলিদের ধারণা যে ঐ পদচিহ্নগুলি কোনোও তুষার মানবের।

এই সকল কুলি যখন দার্জিলিংএ ফিরে এল তখন জনৈক হেনরি নিউম্যান তাদের সংগে সাক্ষাৎ করেন এবং নানাপ্রকার প্রশ্ন করার পর তাদের কাছ থেকে এই তথ্য সংগ্রহ করেন যে, ঐ সকল তুষার মানবের পা উল্টো দিকে ঘোরানো যার ফলে তারা নাকি বরফের পাহাড়ের ওপর দিয়ে অবলীলাক্রমে চলাফেরা করতে পারে এবং তাদের দেহ ঘন ও দীর্ঘ লোমে আবৃত। তিব্বতী ভাষায়

এই জীবগুলির নাম "মেতে কাংগমি"। "কাংগমি" কথার অর্থ হল তুষার মানব, কিন্তু "মেতে" মানে হল অত্যন্ত অপরিষ্কার। মিঃ নিউম্যান ইংরেজিতে এদের নাম দিলেন "অ্যাবমিনেবল স্নোমেন"। সেই থেকে এই নাম চলে আসছে। মিঃ নিউম্যান কলকাতার এক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে ছিলেন এবং "কিম" এই ছদ্মনামে নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন। ১৯৪২ সালে ইংলণ্ডে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

এরপর অনেক দিন কেটে গেল। ১৯৩৬ সালে আবার সেই পায়ের ছাপের দেখা পাওয়া গেল। এবার দেখলেন রোনাল্ড কলব্যাক, উচ্চ সালউইনে, ষোলো হাজার ফুট উচ্চে। তিনি পাঁচ জোড়া বিভিন্ন পায়ের ছাপ দেখেছিলেন যেগুলি দেখে তাঁর মনে হয়েছিল "মানুষের খালি পায়ের ছাপ"। তিনি আরও বলেছিলেন যে, এই অঞ্চলে কোনো ভাল্লুক নেই অতএব এগুলি অন্ততঃ তাদের পায়ের ছাপ নয়। উইং কমান্ডার বোমান নামে একজন সাহেব বললেন যে, মধ্য হিমালয়ে তিনিও এই রকম পায়ের ছাপ দেখেছেন। এই পদচিহ্ন নিয়ে তখনকার লণ্ডন টাইমস পত্রিকায় পাঠক মহলে পত্রের মারফৎ বেশ কিছুদিন ধরে আলাপ-আলোচনা চলেছিল। অনেকে বললেন, পায়ের ছাপগুলি দীর্ঘ লেজবিশিষ্ট বানরের। মিঃ কলব্যাক উত্তরে বললেন যে, সেখানে অত উচ্চে তিনি কোনো বানরই দেখেননি, তা ছাড়া সেখানে কোনো গাছপালাও নেই; শেষ গাছ আছে সেখান থেকে তিন হাজার ফুট নীচে। গাছ না থাকলে বানর থাকাও আশ্চর্য। কিন্তু সেখানে জায়েণ্ট পাণ্ডা নামে জীব অথবা তুষার ভাল্লুকও ত থাকতে পারে? কেউ কেউ প্রশ্ন করলেন। মিঃ কলব্যাক আবার উত্তর দিলেন যে, এই দুটি জীবের দেখা তিনি সেখানে পাননি আর তাছাড়া যেখানে বাঁশবন নেই সেখানে পাণ্ডাও থাকতে পারে না।

১৯৩৭ সালে ফ্রাঙ্ক স্মাইথি টাইমস পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখলেন। সেই প্রবন্ধ পাঠে জানা গেল যে, স্মাইথি সাহেব হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলে সাড়ে ষোলো হাজার ফুট উচ্চে কোনো এক দ্বিপদ জন্তুর বিরাট পায়ের ছাপ দেখেছেন। সেই পায়ের ছাপের ফোটোগ্রাফ নেওয়া হয়েছিল এবং এক বিবরণীতে শের্পা কুলিরা সহি করে দিয়েছিল যাতে লেখা ছিল যে, এই পদচিহ্ন গুলি মেতে কাংগামির। মিঃ স্মাইথি সেই সকল ফোটোগ্রাফ কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে দেখিয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই প্রায় একমত হয়ে স্বীকার করেছিলেন যে, পায়ের ছাপগুলি ভাল্লুকের, যদিও নরম বরফের ওপরের ছাপ চেনা দুঃসাধ্য। কিন্তু দুজন সাংবাদিক ঘোষণা করলেন যে, হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলে তাঁরাও পায়ের ছাপ দেখেছেন তবে সে ছাপ গোলাকার। রহস্য যেন আরো ঘনিয়ে উঠল।

গেল যে এক জার্মান দল গিয়েছিল কিন্তু আরও অনুসন্ধানে জানা গেল যে তারা জেমু গিরিসংকটে যায়নি। তবে টিলম্যান বলছেন হাণ্ট যে পায়ের ছাপ দেখেছেন তা হল গোলাকার আর তিনি যা দেখেছেন তা বড় বুট জুতোর ছাপের মতো। টিলম্যান মনে করেন যে ঐ পায়ের ছাপগুলি কোনো মনুষ্যাকৃতি তুষার মানবের।

ডক্টর অডেলের নাম আপনারা অনেকেই জানেন। ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি ম্যালরি এবং
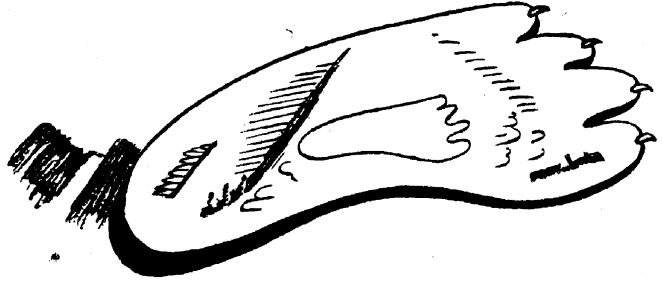
পরের বছর সিকিমে আবার এই পায়ের ছাপ দেখা গেল তবে এবার আর গাড়োয়ালে নয় সিকিমে। ছাপ দেখলেন টিলম্যান সাহেব, উনিশ হাজার ফুট উচ্চ জেমু গিরিসংকটে, কাঞ্চনজঙ্ঘা আর সিমভুর মধ্যবর্তী অঞ্চলে। টিলম্যান ও কয়েকজন শের্পা কুলি নরম বরফের ওপর স্পষ্ট ছাপ দেখলেন, যেন কিছুক্ষণ আগে কেউ চলে গেছে। তাঁদের সন্দেহ হল কেউ বুঝিবা তাঁদের আগে সেই পথ দিয়ে চলে গেছে, কিন্তু সেখানকার খাড়াই এত বেশী যে মানুষের পক্ষে একা সেখান দিয়ে চলে যাওয়া অসম্ভব এবং কোথায় গিয়ে যে সেই ছাপ শেষ হয়েছে তারও কোনো হদিস পাওয়া গেলনা।

টিলম্যান সাহেব দার্জিলিংএ ফিরে এসে অনুসন্ধান করে জানলেন যে তাঁর পূর্বে জেমু গিরিসংকটে কোনো অভিযান-দল যায়নি, গিয়েছিলেন পূর্ব বৎসরে ব্রিগেডিয়ার জন্ হাণ্ট। জন হাণ্টকে টিলম্যান চিঠি লিখলেন। উত্তরে হাণ্ট জানালেন যে পূর্ব বৎসর নবেম্বর মাসে তিনি জেমু গিরি-সংকটে গিয়েছিলেন এবং দুই সারি পায়ের ছাপ দেখেছিলেন। তাঁরও সন্দেহ হয়েছিল যে আগে কেউ এই পথে গিয়েছিল। জানা

আরভিনকে এভারেস্টশৃঙ্গে শেষ দেখেছিলেন এবং সেই স্থান থেকে চূড়োয় পোঁছতে নাকি আর মাত্র ছয়শত ফুট বাকি ছিল; কিন্তু ম্যালরি এবং আরভিন আর ফিরে আসেনি। যাই হোক এই অডেল টিলম্যানকে একখানি বই পড়তে দেন, বইখানি লিখেছেন জনৈক এ এন তোম্বাজি। সীমাবদ্ধ প্রচারের জন্য বইখানি খুব কমসংখ্যক ছাপা হয়েছিল। বইখানির বিষয়বস্তু হল ১৯২৫ সালে সিকিম অঞ্চলে ভ্রমণ, কিন্তু জেমু গিরি-সংকট থেকে তোম্বাজি এই অতিকায় তুষার মানব দেখেছিলেন বইখানিতে তারও উল্লেখ আছে।

তোম্বাজি লিখছেন যে একদিন সকালে তিনি তাঁবুর মধ্যে ছিলেন, এমন সময় তাঁর কুলিরা বাইরে থেকে তাকে উত্তেজিত স্বরে ডাকলে। জোর সূর্যালোকের জন্য প্রথম কয়েক সেকেণ্ড তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল কিন্তু তারপরই তিনি দেখলেন যে প্রায় দু' তিনশো গজ দূরে দীর্ঘকায় মনুষ্যাকৃতি একটি জীব কুঁজো হয়ে খাটো জাতের রডোডেনড্রন গাছ তুলছে। বরফের সম্মুখে জীবটিকে কালো দেখাচ্ছিল এবং তার পরিধানে কোনো বস্ত্র ছিল না; কিন্তু মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাশেই এক ঝোপের

[illegible] একটি অদৃশ্য হয়ে গেল। টম্বাজি সেই স্থানে এসে পদচিহ্নগুলি পরীক্ষা করে বরফের ওপর পাঁচটি আঙুলের চিহ্ন সুস্পষ্ট অঙ্কিত দেখলেন কিন্তু গোড়ালি নেই বললেই চলে, তবে একথা ঠিক যে পায়ের ছাপ কোনো দ্বিপদী জীবের এবং তোম্বাজি জোর করেই লিখছেন সেই জীবের সঙ্গে মানুষের আকারের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে।

ক্যাপ্টেন দ্যঅভার্ন নামে জনৈক ব্যক্তি বহুদিন তিব্বতে বসবাস করেছিলেন; তিনি বলেন যে, এই সকল তুষার মানবরা সত্যকারের আমাদের মতই হাত-পা-ওয়ালা মানুষ, তারা কল্পনালোকের কোনো জীব নয়। বিহার অ্যান্ড ওড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি সমীপে ১৯৪০ সালে তিনি এক বক্তৃতা দেন; সেই বক্তৃতায় তিনি উপরোক্তরূপ মন্তব্য করেন। ক্যাপ্টেন অভার্ন বলেন যে, তিব্বতের উত্তরে কোনো এক অঞ্চলে এই সকল মানুষের পূর্বপুরুষেরা বাস করত, তাদের নাম ছিল আওরি জাতি কিন্তু এক অত্যাচারী রাজা কর্তৃক পরাজিত হয়ে তারা জন্মভূমি পরিত্যাগ করে হিমালয় অঞ্চলে এসে বসবাস করতে সুরু করে। কিন্তু এতদূর আসতে আসতে তাদের যে তীব্র ক্লেশ সহ্য করতে হয় তার ফলে অধিকাংশ ব্যক্তিরই মৃত্যু হয় এবং অবশিষ্টাংশ কোনো-রকমে বেঁচে আছে।

বহুকাল পূর্বে তিব্বতীদের সঙ্গে এদের খণ্ডযুদ্ধ হয় যার ফলে এরা আরও দুর্গম অঞ্চলে চলে যায় এবং স্থানীয় আবহাওয়া অনুযায়ী নিজেদের দেহকে উপযোগী করে নেয় যার ফলে তাদের দেহ ঘন লোমে আবৃত হয়ে যায়। ক্রমাগত বলশালী লোকের কাছে আঘাত পেয়ে এরা মানুষকে পরিহার করে চলতে চেষ্টা করে। সেইজন্য এরা দিনের আলোকে গুহা ত্যাগ করে বাইরে আসতে চায়না। জীবনধারণের জন্য রাত্রে শিকার করে। ক্যাপ্টেন অভার্ন বলেন, তিনি এই-রকম একটি মানুষ দেখেওছেন।

এরপর দীর্ঘদিন কেটে গেছে, আর কেউ ইতিমধ্যে সেই রহস্যময় পায়ের ছাপ দেখেছে কিনা শোনা যায়নি, অবশ্য মধ্যবর্তী বৎসর-গুলিতে হিমালয় অভিযানও বড় একটা হয়নি এবং লোকে ব্যাপারটা একরকম প্রায় ভুলেই গিয়েছিল কিন্তু সদ্য হিমালয় প্রত্যাগত এরিক সিপটন জানালেন যে, তিনি সেই পায়ের ছাপ দেখেছেন এবং শুধু তাই নয় সেই পায়ের ছাপের ফোটোগ্রাফ তুলে এনেছেন; ফোটোগ্রাফগুলি বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পরীক্ষা করাবার জন্য লণ্ডনে নিয়ে যাচ্ছেন। এরিক সিপটন হিমালয়ে গিয়েছিলেন এভারেস্টের চূড়োয় পৌঁছোবার নতুন রাস্তার সন্ধানে। সে কার্যে তিনি কৃতকার্য হয়েছেন।

গত ৮ই নবেম্বর তিনি এবং সেন তেনসিং নামে একজন শের্পা কুলি প্রায় উনিশ হাজার ফুট উচ্চে সেই পায়ের ছাপ দেখতে পান। তেনসিং দেখা মাত্রই বলে ওঠে যে এগুলি সেই তুষার মানবের পায়ের ছাপ। সিপটন প্রায় এক মাইল দীর্ঘ এই পদচিহ্নের সারি দেখেন। তিনি সেই পায়ের ছাপে তিনটি চওড়া আঙুল এবং আরও বেশী চওড়া একটি একটি বুড়ো আঙুল লক্ষ্য করেন। সিপটন সাহেব এই রকম পায়ের ছাপ হিমালয়ের নানা অঞ্চলে এবং কারাকোরাম পাহাড়েও দেখেছেন কিন্তু সুস্পষ্ট ছাপ তিনি ইতিপূর্বে আর দেখেননি। সেন তেনসিং বলে যে হিমালয়ের তিয়াংবোচি অঞ্চলে সে পঁচিশ গজ দূরে একটি তুষার মানব দেখেছিল। তার মতে জন্তুটি না বানর না মানুষ, লম্বায় প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট, দেহ লালচে বাদামী চুলে আবৃত কিন্তু মুখ পরিষ্কার।

সিপটন সাহেব গৃহীত ফোটোগ্রাফ দেখে এবং সেন তেনসিংএর বর্ণনার ওপর নির্ভর করে লণ্ডনের বিশেষজ্ঞগণ বলছেন যে পায়ের ছাপগুলি এক জাতীয় বানরের যার বৈজ্ঞানিক নাম প্রেসবাইটিস এনটেলাস অ্যাকিলিস। এই বানর কাঠমাণ্ডুর পঞ্চাশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে বারো হাজার ফুট উচ্চে পাওয়া যায়। এই বানরের রং বাদামী, মুখ কালো, মাথা সাদা। এদের উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট এবং পশ্চাৎ দিকের পায়ের ছাপ প্রায় পৌণে নয় ইঞ্চি।

লণ্ডনের বিশেষজ্ঞদের এই উক্তি অনুমান বলেই মনে হয়, কারণ তাঁরা আসল জীবকে দেখেননি। আবার তাঁদের অনুমান ঠিকও হতে পারে। তবে এমনও ত হতে পারে যে হিমালয়ের তুষার অঞ্চলে কোনো উপমানব বিচরণ করে যাদের দেখা যায়না। প্রাণীরা তাদের বাসস্থান ও পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে নিজের দেহকে মিলিয়ে নিতে পারে এ প্রমাণ বহু আছে। বাঘ বনের সঙ্গে, সিংহ মরু-ভূমির সঙ্গে, লাউডগা সাপ লতা গাছের সঙ্গে এবং শ্বেত ভল্লুক মেরুপ্রদেশের বরফের সঙ্গে নিজেকে বেশ ক্যামুফ্লাজ করে বাস করে যাতে তার শত্রুরা তাকে সহজে দেখতে না পায়। ঠিক সেই রকম হিমালয়ের এই তুষার মানবেরাও তুষারের সঙ্গে নিজের দেহকে একেবারে প্রায় মিলিয়ে এনেছে, হয়ত তারা প্রায় স্বচ্ছ, বরফের মধ্যে তাদের দেখাই যায় না। হিমালয় পর্বত আরোহণকারী অনেকেই বলেছেন যে শৃঙ্গে আরোহণ করবার সময় অনেক সময় তাঁদের মনে হয়েছে কে যেন তাদের অনুসরণ করছে এমন কি ফ্রাঙ্ক স্মাইথি বলেন যে, এই অনুভূতি তাঁর কাছে এমনই স্পষ্ট মনে হয়েছে যে তিনি ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছেন পর্যন্ত যে কেউ তাঁর অনুসরণ করছে কিনা!

তবে এই পায়ের ছাপ কার?

সাহেব বিবির দেশে

নরেন্দ্র দেব

(ফ্রান্স—৪)

পরের দিন শেষবারের মতো আমরা লুভ্‌র্‌ ঘুরে এলাম। পারিসে যে ক'দিন ছিলাম, সময় পেলেই এখানে আসতাম। মধুর সন্ধান পেলে মধুকর যেমন ফুলের চারপাশে গুঞ্জন করে ফেরে, লুভ্‌র্‌ আমাদের কাছে সেই মধুচক্রস্বরূপ হয়ে উঠেছিল। ফ্রান্সের একটি শ্রেষ্ঠ সুন্দর বিশাল রাজপ্রাসাদ এই মিউজিয়মে পরিণত হয়েছে। যেমনি বিশাল সে পুরী, তেমনি বিশাল তার সংগ্রহ। সেন নদীর শান্ত স্নিগ্ধ উপকূলে, পারিসের পরম রম্য কেন্দ্র-স্থলে এটি স্থাপিত। ফরাসী বাস্তুশিল্পের ও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী য়ুরোপীয় স্থাপত্য-কলার সঙ্গে ফরাসী সৃজনী-প্রতিভার আশ্চর্য সুন্দর নিদর্শনস্বরূপ যে ভূতপূর্ব রাজপুরী লুভ্‌র্‌, ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ নৃপতি চতুর্দশ লুই যেখানে বাস করতেন, মোলেয়ার যে প্রাসাদে এসে একদা তাঁর নাট্যাভিনয় দেখাতেন, সেইখানে এই মিউজিয়ম। তাই এর নাম হয়ে গেছে 'লুভ্‌র্‌ মিউজিয়ম। রাণী এ্যানের বিচ্ছেদ-বেদনা জড়িত মহল, মারি থেরেসার ছোট মেয়ে মারি আঁতোনোয়েৎএর উচ্ছৃঙ্খলতার স্মৃতি বিজড়িত এ প্রাসাদ—এখানে এলে শুধু ফরাসীদের রাষ্ট্রগত সাংস্কৃতিক ইতি-হাসেরই কয়েকটি পরিচ্ছেদ পড়া যায় না, পৃথিবীর সকল দেশের সকল জাতির বিগত নানা যুগের ললিতকলা-কলায়িত চিত্তাকর্ষক জীবন আখ্যায়িকার, তাদের জাতীয় এবং সামাজিক সৌকুমার্যের অনেকটা বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের বহু বিলুপ্ত কীর্তির সন্ধান মেলে এখানে। মনে হয়, যেন প্রবেশ করেছি এসে এক বিশ্ব-মানবের মহান্‌ তীর্থক্ষেত্রে—'যেথায় আর্য যেথা অনার্য একসাথে গেছে মিশি!'

এর উৎপত্তি ১৭৫০ খৃঃ অব্দে। লুক্‌-সাঁবুর প্রাসাদে রাজকীয় এক বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল। ফ্রান্সের জীবিত ও মৃত সমস্ত রুচিবান্‌ রাজা-রাজড়াদের ও সৌখীন-বিলাসী ধনীদের পুরুষানুক্রমে স্বগৃহে সঞ্চিত ও সংগৃহীত যতকিছু বিচিত্র শিল্পসামগ্রী, সমস্ত সেখানে টেনে এনে প্রদর্শিত হয়েছিল। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, পৃথিবীর প্রদর্শনীর ইতিহাসে এইটেই নাকি আদি বা প্রদর্শনীর ইতিহাসে এইটেই নাকি আদি বা সর্বপ্রথম প্রদর্শনী। এর আগে নাকি এভাবে আর কোনও দেশে কোনও প্রদর্শনী হয়নি। এই ধরণের প্রদর্শনীর উপকারিতা বুঝতে পেরেই ফ্রান্সের যাঁরা তদানীন্তন সুধী-সজ্জন ও চিন্তাশীল দেশপ্রেমিক ছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে রাজ-দরবারে অনুরোধ এল যে, এ প্রদর্শনীটিকে সাময়িক কয়েক দিনের জন্য না করে, এটিকে বরাবরের জন্য স্থায়ী করা হোক। এই প্রস্তাবের ফলেই 'লুভ্‌র্‌' মিউজিয়মের জন্ম।

তারপর চলেছে অব্যাহতগতিতে এর উন্নতি ও বিস্তার। ফরাসী নৃপতি প্রথম ফ্রাঁসোয়া থেকে শুরু করে, সপ্তদশ শতাব্দীর মহাসচিব কোলবার্ট—রাজা চতুর্দশ লুই এবং ফ্রান্সকে ইনিই রক্ষা করেন। ধনাঢ্য মহাজন জাবাশ, ডিউক অফ মাঁতোয়া, নৃপতি পঞ্চদশ লুই, রাজকুমার কারিগাঁ, নৃপতি ষোড়শ লুই প্রভৃতির অমূল্য সংগ্রহসমূহ কালে কালে আহরণ করে এনে এখানে রাখা হয়েছে। ফ্রান্সে তৃতীয়বার যে গণ-তান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, সে সময়ও লুভ্‌র্‌ আত্মনির্ভরশীল হতে পারেনি। এর পরিচালক সংঘ বা কর্মাধ্যক্ষ-গণ সেদিন এই বিরাট যাদুঘরকে কয়েকটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে রাখার প্রয়োজন অনুভব করেন। তখনই সৃষ্ট হয় এর প্রাচ্য প্রত্নশালা, মিশরীয় প্রত্নশালা, গ্রীস ও রোম্যান প্রত্নশালা, মধ্যযুগীয় ভাস্কর্য শিল্প এবং রেনেসাঁ ও আধুনিক শিল্পকলা, অলংকরণ ও প্রসাধনী শিল্প; তৈলচিত্রে অঙ্কিত প্রতিকৃতি ও অন্যান্য ছবি এবং রেখা চিত্র।

পরবর্তীকালে প্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের সংগৃহীত যা কিছু প্রদর্শনীয় সামগ্রী সমস্ত এখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়েছে 'ম্যুজে গিমে' নামে আর একটি নব-প্রতিষ্ঠিত যাদুঘরে। এই যাদুঘরটি আমরা
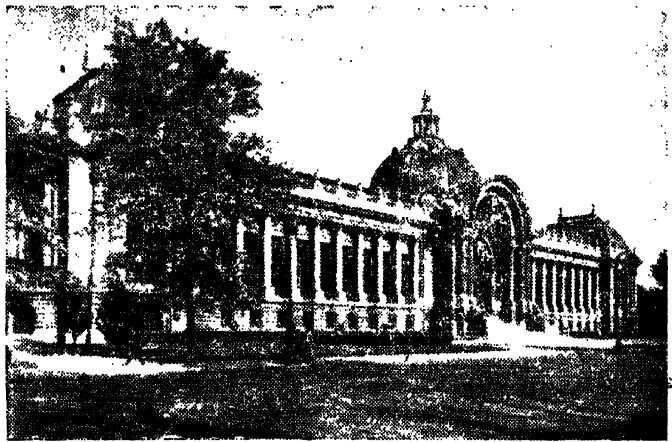
পিটি প্যালেস্‌—পারিস
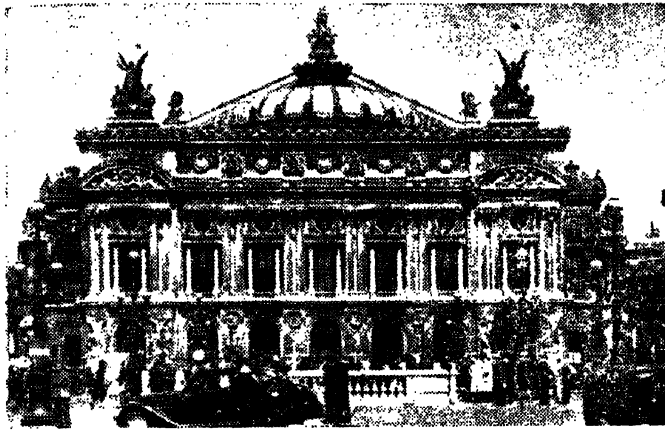
'অপেরা-হাউস'—পারিস

যেদিন দেখতে যাই, সেদিন এর দরজা বন্ধ ছিল। জনসাধারণের সেদিন এখানে প্রবেশ নিষেধ। আমরা হতাশ হয়ে ফিরে আসছি এমন সময় মুজ্যো গিমের কিউরেটার মাদাম লেভির সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়ে গেল। আমরা ভারতবর্ষ থেকে এসেছি আর কালই প্যারিস ছেড়ে চলে যাচ্ছি শুনে এবং আমাদের কার্ডে আমাদের পরিচয় পেয়ে তিনি সেদিন বন্ধের দিন হলেও মিউজিয়মটি দেখবার জন্য আমাদের স্পেশাল পারমিশান দিলেন। শুধু তাই নয়, নিজে আমাদের সঙ্গে থেকে ঘুরে ঘুরে পরিষ্কার ইংরিজীতে সব বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। কোন্‌টি কি এবং কিভাবে কোথা থেকে সংগ্রহ করে আনা হয়েছে। ভারত, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া কাম্বোজ, সায়াম, আনাম, চায়না, জাপান কোনও দেশ বাকী নেই। বাঙলা দেশের অমর রূপদক্ষ অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের হাতে আঁকা ছবিও এখানে আছে শুনেছি। তাড়াহুড়ার মধ্যে সেগুলি খুঁজে বার করে আর দেখা হয়ে ওঠেনি।

লুভ্‌রের কেবলমাত্র চিত্রশালা ও ভাস্কর্য সংগ্রহেরই পরিচয় দিতে বসলে তার আর শেষ নেই, সুতরাং শুধু এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হই যে, পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী ও ভাস্করের হাতের সর্বোৎকৃষ্ট রচনা এখানে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। লুভ্‌র থেকে বেরিয়ে আমরা এলাম 'পিটি প্যালেসে' পারিসের সুকুমার রম্যকলার প্রদর্শনী দেখতে। এখানে যা আছে সমস্তই ফরাসী শিল্পীদের হাতের কাজ। পথে পড়লো 'আর্ক দু কারুশেল' এও একটি বিজয় তোরণ। এতোয়েলের 'আর্ক দ্য ট্রায়াম্ফ' অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট ব'লে মনে হ'ল না। ওখান থেকে টিলেরী বাগানের পাশ দিয়ে প্লেস দ্য লা কংকর্দে এলাম। প্লেস দ্য লা কংকর্দের সুন্দর ফোয়ারাটি তখন পূর্ণ তেজে উৎসারিত হয়ে এই সুরম্য স্থানটিকে আরও রমণীয় করে তুলেছিল। ফোয়ারা দেখতে পাওয়া যায় প্যারিসের প্রায় সব পাড়াতেই। এগুলি শুধু নগরীর শোভা বর্ধনই করছে না; প্রত্যেকটি কোনও না কোনও সুমধুর স্মৃতি বহন করছে ফোয়ারা নির্মাণকারী প্রতিভাবান্‌ শিল্পীর অবিস্মরণীয় স্মৃতির সঙ্গে। ফোয়ারার চেয়ে আবার প্রতিমূর্তির ছড়াছড়ি প্যারিসের যত্রতত্র। প্রত্যেক প্রতিমূর্তিটি এত সুন্দর যে, দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ না দেখে যাওয়া যায় না। রোঁদার মিউজিয়ম দেখে আসবার পথে একটি চমৎকার ফোয়ারা দেখেছিলাম মনে আছে। সেটিকে এ'রা বলেন, 'দি ফাউন্টেন অফ্ দি ফোর সীজনস্', অর্থাৎ এক কথায় 'ঋতু-উৎস!' য়ুরোপে প্রকৃতপক্ষে চারটি ঋতুই যাওয়া-আসা করে, শীত, বসন্ত, শরৎ, গ্রীষ্ম। বর্ষা ও হেমন্তের কোনও পৃথক রূপ নেই এদেশে, কারণ বৃষ্টি যখন-তখন হচ্ছেই। শীতের সময়েই তার প্রাদুর্ভাব দেখে এলাম। আর হিমের দেশে কুহেলিকাচ্ছন্ন হেমন্তের আবির্ভাব তো হচ্ছে দু বেলাই।

ফ্রান্সের আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল এখানে ভাল ভাল সব উপাসনা মন্দিরের ছড়াছড়ি! এত গির্জা এ পর্যন্ত য়ুরোপের আর কোনও দেশে দেখিনি। একা প্যারিস শহরেই অন্তত আমাদের দেখা পনেরোটি রোম্যান ক্যাথলিক চার্চ আর চৌদ্দটি বিভিন্ন শ্রেণীর প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের হিসাব দিতে পারি। এসব আমাদের কাশীধামের যেমন-তেমন শিবমন্দির নয়! প্রত্যেক ক্যাথলিক গির্জাটির উপাসনাগার ও তার চূড়া এবং 'সাঁৎ জাক' জাতীয় 'টাওয়ার' বা গগনচুম্বী বুরুজ স্থাপত্য-কলার দিক দিয়ে, প্রাচীর চিত্রের দিক দিয়ে, মূর্তি শিল্পের দিক দিয়ে, দারু-কারু এবং রঙীন কাচ শিল্পের দিক দিয়ে অতুলনীয় বলেই মনে হবে। বহু অর্থব্যয়ে এই সব অপূর্ব ধর্ম-মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এগুলি দেখে মনে হয়, ফ্রান্সে এক সময়ে ধনী ধার্মিকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। অবশ্য ফ্রান্সের রাজন্যবর্গও একাধিক গির্জা নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন। আমার মনে হয়, রাজগুরু এবং রাজার প্রধান মন্ত্রিপদে মাঝে মাঝে ধর্মযাজকেরা এসে কায়েমী হয়ে বসেছিলেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

অপেরার দু রাত্রের টিকিট কেনা ছিল। গেলাম আজ আমরা সেখানে 'সামসন ও দালাইলা' গীত-নাট্যাভিনয় দেখতে। অভিনয় দেখবো কি, রঙ্গালয় দেখেই মাথা গেল ঘুরে! মনে হল, এ যেন কোনও এক মহামহিম সম্রাটের ভুবনবিজয়ী রাজ-প্রাসাদে এসে প্রবেশ করলাম। অপূর্ব কারু-কার্যখচিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত নাট্যশালা। প্রশস্ত মর্মর হল। চারিদিকে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের প্রমাণাকার প্রতিমূর্তি। শোভন বেষ্টনীযুক্ত শুভ্রশিলা বিশাল সোপান শ্রেণী উঠে গেছে উপরের হলে। সেখান থেকে আবার দুপাশে সিঁড়িটি দুভাগ হয়ে ত্রিতলের হলে উঠেছে। সিঁড়ির মুখেই দর্শকদের প্রবেশ-পত্র পরীক্ষা হচ্ছে। যার যেদিকে আসন, তাকে সেদিকে যেতে বলা হচ্ছে। চারিদিকে মনোরম আলোক-সজ্জা যুগপৎ নয়ন-মন মুগ্ধ করে দেয়। মূল্যবান বেলওয়ারী ঝাড়-লণ্ঠনের মধ্যে

উজ্জ্বল বিজলী বাতি জ্বলছে। দালানের মর্মর বৃত্তিশীর্ষে বড় বড় সুদৃশ্য পুষ্পাধারে ফুলের রাশি সাজানো রয়েছে। সোপানের উপর অগ্রসর হতে না হতেই সুবেশা সুন্দরী তরুণীরা এগিয়ে এসে 'শুভ সন্ধ্যা' বলে সমাগত দর্শকবৃন্দকে সাদর অভিবাদন জানিয়ে সেই রাত্রির নৃত্যগীতের পুস্তকাকারে মুদ্রিত এক-একখানি সুন্দর ছোট প্রমোদ-সূচী বিতরণ করছেন। মাত্র পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক তার দক্ষিণা। উপরের হলে পৌঁছতেই সেখানেও অপেক্ষা করছিলেন রজনীর নর্মবেশে সুসজ্জিতা রূপসী কন্যারা। হাসিমুখে এগিয়ে এসে দর্শকদের ছড়ি, ছাতা, টুপী, ওভারকোট প্রভৃতি সযত্নে কেড়ে নিয়ে ক্লোকরুমে নম্বর দিয়ে জমা রাখলেন এবং আমাদের হাতে সেই নম্বরের অনুলিপি এক-একখানি উপহার দিলেন। প্রবেশ-পত্র পরিদর্শিকারা আমাদের সঙ্গে নিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে দিলেন। সেখানেও অপেক্ষা করছিলেন নৈশ নাট্য-বেশে সুসজ্জিতা সুন্দরীরা, আমাদের নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেন যার যার প্রবেশ-পত্রে উল্লিখিত সংখ্যানুসারে তাঁদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট আসনে। এই যৎসামান্য সাহায্য-টুকুর জন্য তাঁদের কিন্তু অসামান্য মোটা পুরস্কার দিতে হল আমাদের। শুধু মাথাটি সামনে হেলিয়ে সহাস্য ধন্যবাদে কুলালো না। উপায় কি? সবাই যে তাঁদের মুক্তহস্তে দান করছেন দেখলাম। মনে হতে লাগলো, একি সেই মণিপুরে উলূপীর রাজ্যে এসে পড়লাম, না স্বর্ণলঙ্কায় প্রমীলার মহলে প্রবেশ করলাম? সবই যে করছে দেখি এখানে মেয়েরাই।

আমাদের 'ব্যালকনিতে' এসে বসলাম। চারিদিক এবং ঊর্ধ্ব অধঃ লাল রঙের পুরু ভেলভেটে মোড়া। প্রবেশদ্বারে ভেলভেটের পর্দা মেয়েরা তুলে ধরে আমাদের সেখানে বসিয়ে দিয়ে গেলেন ভেলভেটের পুরু গদীমোড়া আরামপ্রদ আসন। চারজনের বসবার মতো কামরা সেটি। দুজন দর্শক সামনের দুখানি আসনে বসবেন, তাঁদের পিছনে আর একটু উঁচু ধাপে আর দুজন দর্শক বসবার দুটি আসন ছিল। নবনীতা ও তার জননীকে সামনের আসন দুটি ছেড়ে দিয়ে আমি তাদের পিছনের একটি আসন দখল করলাম। অপরটি শূন্যই পড়ে রইল। তাতে আমার খুবই সুবিধা হল। প্রেক্ষাগার অন্ধকার হবা মাত্র পা দুটি অপর আসনের উপর সংগোপনে লম্বা করে মেলে দিয়ে অর্ধ-শায়িত অবস্থায় বড় আরামে অভিনয় দেখলাম।

রঙ্গালয়ের চারিদিক, নাট্যমঞ্চের সম্মুখ ভাগ এবং প্রেক্ষাগারের ছত্রতল প্রচুর সোনালী ফ্রেম ও কার্নিশের ন্যায় কারুকার্যমণ্ডিত এবং বড় বড় শিল্পীদের আঁকা রঙীন তৈল-চিত্র শোভিত। সেগুলি এমনই চমৎকার যে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখতে হয় বহুক্ষণ।

অপেরা হাউসের উপরে যাবার সুসজ্জিত মর্মর সোপান

কখন সময় হয়েছে বুঝতে পারিনি। ঝম্ ঝম্ করে অর্কেস্ট্রা বেজে উঠলো। চমকে চেয়ে দেখি-নাট্যপীঠের সামনের দিকে প্রেক্ষা-গারেরই খানিকটা স্থান অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে নিয়ে তার মধ্যে অর্কেস্ট্রার জন্য 'হোল্ড' তৈরি হয়েছে। অর্কেস্ট্রা পরিচালকের দণ্ড ও কর-সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় শতাধিক যন্ত্র-শিল্পীর হাতে বহুবিধ বাদ্যযন্ত্র একত্রে বেজে উঠে এমন একটি সুরসঙ্গতি সৃষ্টি করে তুললো, যা শুনে মনে হল এ স্বর্গীয় সুর মূর্চ্ছনা বোধ করি শুধু কেবল সুর-লোকেই বেজে ওঠা সম্ভব।

যবনিকা উঠলো। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য। রাত্রি প্রভাত হয়ে আসছে। গাজা শহরের পূর্বাকাশে উষার অরুণ আলো দেখা দিয়েছে। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে ফিলিস্টাইন প্রহরী রাজপথের একধারে রাত্রিজাগরণ জনিত ক্লান্তিতে নিদ্রালস। সূর্য উঁকি মারছে উদয়াচল থেকে। একে একে রাজপথে লোক চলাচল শুরু হল। গাজা শহর ফিলিস্টাইনদের শাসনাধীন। ভীমবল সামসনের বিদ্রোহাচরণে ফিলিস্টাইনরা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। পরস্পরের সঙ্গে পথে দেখা হলেই তারা এই আলাপই করছে—তাই তো! কী করা যায় একে নিয়ে? এর অত্যাচার থেকে বাঁচবার উপায় কি? প্রবল পরাক্রমশালী বজ্রতুল্য বলিষ্ঠ দেহ এই সামসন ফিলিস্টাইনদের বিরুদ্ধে নগরবাসীদের বিদ্রোহে উত্তেজিত করে তুলছে। নগরপাল আবিমেলেককে সে হত্যা করে ফেললে। যুদ্ধ বেধে গেল। সামসন সে যুদ্ধে জয়ী হয়ে সগৌরবে গৃহে ফিরে এল। দম্ভ তার দুঃসহ হয়ে উঠলো ফিলিস্টাইনদের কাছে।

চললো তখন সামসনের বিরুদ্ধে ফিলি-স্টাইনদের গোপন ষড়যন্ত্র। ডাকপড়লো সেই গুপ্ত মন্ত্রণাসভায় নগরের সর্বজনপ্রিয় নটী রূপসী দালাইলার। দালাইলা প্রচুর পুরস্কারের লোভে সম্মত হল সামসনকে সে রূপের আকর্ষণে ভুলিয়ে এনে তার শক্তি হরণ করে তার সর্বনাশ করবে।

দ্বিতীয় অঙ্কে দেখা গেল দালাইলার অসামান্য রূপের আকর্ষণে, তার প্রেমের মিথ্যা ছলনায় সামসন ধরা দিয়েছে। দালাইলা তাকে কপট সোহাগ জানিয়ে আপন গৃহে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এল—মিলনসুখে নিশি-যাপনের প্রলোভনে ভুলিয়ে। তারপর?...... বাসরশয়নে প্রগাঢ় ঘুমে অচেতন সামসন। দালাইলার সংকেত পেয়ে রাত্রের অন্ধকারে চোরের মত এসে ফিলিস্টাইনদের সৈনিকেরা নিদ্রিত সামসনকে অতর্কিত আক্রমণে অন্ধ করে দিয়ে বন্দী করে নিয়ে গেল।

তারপর তৃতীয় অঙ্ক। অন্ধ সামসন ক্রীত-দাসের মতো ফিলিস্টাইনদের চাবুকের ঘায়ে ঘানি ঘোরাচ্ছে দেখা গেল। ফিলিস্টাইনদের প্রতিহিংসা এতেও পূর্ণ হয়নি। ধরে নিয়ে এল তারা একদিন সামসনকে তাদের দেব-মন্দিরে। দেবতার চরণে প্রণত হবার জন্য আদেশ করা হল তাকে। দালাইলা সহচরী-দের সঙ্গে দেবমন্দিরে নৃত্য করছিল। সেও সেও হেসে উঠে ব্যঙ্গভরে অনুরোধ করলে।

সামসন অস্বীকার করলে ফিলিস্টাইনদের পুতুল দেবতার কাছে মাথা নোয়াতে। তখন লৌহশৃঙ্খলে তার কটি দেশ বেঁধে জোর করে তাকে টেনে আনা হল দেবতার সম্মুখে। সেই সময় অন্ধ সামসনের হাতে ঠেকলো বিগ্রহ বেদীর দু' পাশের দুটি কারুকার্যখচিত সুবৃহৎ স্তম্ভ। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের প্রচন্ড আলিঙ্গনে লৌহ-ভীম চূর্ণ করার মতো সামসন তার সর্ব-শক্তি দিয়ে সেই স্তম্ভ দুটিকে আঁকড়ে ধরে এমন ভীমবলে ঝাঁকুনি দিলে, যে, সেই প্রাচীন মন্দিরের থাম দুটি মুহূর্তের মধ্যে স্থানচ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মন্দিরটি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো। মন্দিরের মধ্যে সেদিন তামাসা দেখবার জন্য উপস্থিত হয়েছিল যে ফিলিস্টাইন জনতা, তারাও সকলেই প্রতিহিংসাপরায়ণ ফিলিস্টাইন কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে এবং নটনটীদের করুণ আর্তনাদের মধ্যে সমাধিস্থ হ'ল। এইখানে গীতিনাট্যের যবনিকা।

সুদীর্ঘ তিন ঘণ্টা সময় যে কখন কেমন করে কোথা দিয়ে স্বপ্নের মতো কেটে গেল কিছুই জানতে পারিনি। সে কি আশ্চর্য সুন্দর অভিনয়, সে কি মর্ম-ছোঁয়া সঙ্গীত! সমগ্র নাটকের অভিনয়টাই সঙ্গীতের মাধ্যমে ও অভিনয় কলার সাহায্যে পরিস্ফুট করা হয়েছে। স্বভাবসুন্দর প্রত্যেকটি দৃশ্যপট—প্রভাত, সন্ধ্যা, নিশীথ-রাত্রি, ঝড়বৃষ্টি, দুর্যোগেভরা আকাশ, এতই সব প্রকৃতধর্মী যে দর্শকদের যেন 'মেস্‌মেরাইজ' করে একটা সত্যের বিভ্রম উৎপাদন করে। দালাইলার নৃত্যগীত, তার সহচরীদের মন্দিরে পূজারিণী নৃত্য, নাগরিকদের লোক-নৃত্য এ সবের তুলনা হয় না। অভিনেতৃদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও নিখুঁত রূপসজ্জা যেন ভুলিয়ে দিয়েছিল আমারা প্যারিসের এক শ্রেষ্ঠ নাট্যশালায় বসে আছি না সেই আড়াই হাজার বছর আগের গাজা শহরের ফিলিস্টাইনদের মধ্যে এসে পড়েছি!

য়ুরোপের এই শ্রেষ্ঠ অপেরা হাউসটি প্যারিসের তদানীন্তন মেয়র গার্নিয়ার সাহেবের পরিকল্পনা অনুসারে প্রস্তুত হয়েছিল। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে ৫ই জানুয়ারী তারিখে এর প্রথম উদ্বোধন হয়। উচ্চাঙ্গের নৃত্য, গীত ও অভিনয়-কলার উপযোগী এমন একটি সুন্দর রঙ্গালয় এর আগে আর কোথাও নির্মিত হয়নি। এ'রা বলেন, ভিয়েনার 'অপেরা হাউস' নাকি এর তুলনায় খেলাঘর মাত্র। অপেরা হাউসের পূর্বাঙ্গনে যে একটি 'গ্রুপ স্ট্যাচু' বা একত্রে সমবেত একাধিক নৃত্যচারিণীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, এটি দেখে কেবলই স্টকহোমের কনসার্ট হলের সামনের 'গ্রুপ স্ট্যাচুটির' কথা মনে পড়ছিল। প্যারিস অপেরা হাউসের অনুকরণে সেটি করা বলে বোঝা

অপেরা হাউসের অনুপম 'ফয়ার' বা লবি

গেল। নৃত্য-গীত সংক্রান্ত বিষয়বস্তু এক হলেও কিন্তু প্রকাশভঙ্গী উভয়ের সম্পূর্ণ পৃথক। প্যারিসের এ-মূর্তির তুলনা হয় না। এর মধ্যে যে সুষম ছন্দ আছে, তা স্টকহোমের মূর্তির মধ্যে নেই। সেটিতে যেন বৈষম্যের মধ্যেই সঙ্গতির সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা প্রতিভাত হয়।

অপেরার মাপজোপ কতক কতক এখানে তুলে দিলে এই নাট্যশালার বিরাটত্ব সম্বন্ধে কতকটা ধারণা হতে পারে বলে মনে হয়। নাট্য মঞ্চটির উচ্চতা পীঠ থেকে চাঁদোয়া পর্যন্ত প্রায় ৫২ ফুট এবং প্রস্থেও তাই। কিন্তু গভীরতা প্রায় দ্বিগুণ। এসব খবর হয়ত' এদেশের নাট্যামোদীদের অনেকেরই জানা আছে। সম্প্রতি এই গীতি-নাট্যশালায় মঞ্চ সংক্রান্ত এমন কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় অথচ সুবিধাজনক ও সহজেই ব্যবহারোপযোগী যন্ত্রপাতি সংযুক্ত করা হয়েছে, সেগুলি এই রঙ্গমঞ্চকে শুধু অধিকতর চিত্তাকর্ষকই করে তোলেনি, পরন্তু নাট্যশালা সংক্রান্ত ইঞ্জিনীয়ারিং ও মঞ্চ-কৌশলের দিক থেকে এই অপেরাকে একেবারে সুসম্পূর্ণ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছে।

এই সব যন্ত্রাদির সাহায্যে মঞ্চের উপর ইচ্ছামত বিবিধ বর্ণের আলোকসম্পাত করা যায়। বিকীর্ণ আলোক রাশিকে যদৃচ্ছা উজ্জ্বল, মৃদু, ক্ষীণ অথবা ক্রমদীপ্ত বা ক্রমনিষ্প্রভ করা চলে। উৎস আলো (ফ্লাডলাইট), ঝরণা আলো (স্প্রিং লাইট), পুঞ্জীভূত আলো (স্পট লাইট), সব কিছুই পাওয়া যাবে মাত্র এক-একটি চাবি টিপলেই। নাট্যপীঠের মানুষেরা তাই এ-যন্ত্রটির নাম রেখেছেন 'যন্ত্ররাজ' (দি অরগ্যান)। এই যন্ত্রের সাহায্যে যে কোনও ধ্বনি উৎপাদন করা যায়। অশ্ব ক্ষুর ধ্বনি, রেল ইঞ্জিনের শব্দ, মোটরের আওয়াজ, বন্দুকের গুলী থেকে কামানের তোপ ধ্বনি, পিয়ানো, বাঁশী, জয়ঢাক, সবই বাজে। সকলের চেয়ে উল্লেখ-যোগ্য, স্টেজের উপর অভিনেতৃবর্গের অভিনয়ে ফিস্‌ফিস্ করে গোপন আলাপও বহুদূরবর্তী আসনে উপবিষ্ট প্রত্যেকটি দর্শকের কাণে সুস্পষ্ট পৌঁছয়। শব্দ নিয়ন্ত্রণের কৌশল এত সুন্দর যে, দূরের ও নিকটের শব্দের তারতম্য যথাযথভাবে কাণে আসে। একে তাই ও'রা সামান্য কলকব্জা জাতীয় 'মেশিন' বলে অসম্মান করেন না। 'যন্ত্ররাজ' বলে খাতির করেন। ২৪০০ মাত্রার 'কিলোওয়াট' বৈদ্যুতিক শক্তি প্রায় তিন শতাধিক 'সারকিটের' সাহায্যে এই যন্ত্রটি রঙ্গমঞ্চের উপর একই সঙ্গে বিতরণ করতে পারে। পৃথিবীর আর কোনও রঙ্গালয়ে নাকি এ-জিনিস নেই ও'রা বলেন।

রঙ্গমঞ্চের উপর এমন অনেক দৃশ্যের অবতারণা করতে হয়, যেটা ঘটে বাড়ির বাইরে, পার্কে, বাগানে, ল্যানে, রাজপথে বা একেবারে ছাদের উপর। এসব ক্ষেত্রে আগে কোনও শক্তিশালী শিল্পীর আঁকা দৃশ্যপট ব্যবহার করাই রেওয়াজ ছিল। আজকাল সে ব্যবস্থা অচল। এখন সে স্থান অধিকার করেছে 'পানোরামা' বলে একটি বিশাল যন্ত্র। অর্থাৎ বাহিরের নানা দৃশ্যাবলীর স্বাভাবিক চিত্রসম্বলিত একটি আবর্তনশীল সুবৃহৎ রোলার বা সিলেন্ডার যা ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চের ন্যায়ই ইচ্ছামতোই

ঘুরিয়ে দৃশ্যপট পরিবর্তন করা চলে। দিগন্তপ্রসারী আকাশের বা অসীম সমুদ্রের অথবা বিশাল মরুভূমির আশ্চর্য বিভ্রম উৎপাদন করা সম্ভব হয় এই যন্ত্রের সাহায্যে। এটি স্টীলের তৈরি এবং ধনুর ন্যায় সংবৃত্ত-মধ্য (কনকেভ) আকার। উপর দিকটায় আসবেস্টো ও অভ্রের প্রলেপ দেওয়া আছে শব্দ নিবারণের জন্য। এর ভিতর দিকে ইচ্ছামতো আলোকসম্পাতের দ্বারা বিভিন্ন দৃশ্য পরিস্ফুট করে তোলা যায়। আকাশের আশমানী রং, ঊষার রক্তিমাভা, গোধূলির সোনার গুঁড়ো, দুর্যোগের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, আসন্ন ঝড়ের কালো ছায়া, সাগরের উত্তাল তরঙ্গ, তিমিরান্ধ নিশীথিনীর অগণ্য তারকাখচিত নিস্তব্ধ আকাশ, সবই এখানে আলোক ফেলার কৌশলে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। যখন এসব দৃশ্যের প্রয়োজন থাকে না, তখন এই বহির্দৃশ্যের বাহনকে স্টেজের মাথার উপর অনেকটা উঁচুতে তুলে রাখা হয়। এ যন্ত্রটির ওজন ফরাসী টনের প্রায় বাইশ টন। কিন্তু বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে একে নিঃশব্দে ও অতিসহজে অল্পক্ষণের মধ্যেই নামানো বা ওঠানো যায়।

অবশ্য একথা ঠিক যে, এরকম একটি যন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিশেষ কোনও জরুরী প্রয়োজন ছিল না, কারণ অপেরায় যে সব দর্শকেরা আসেন, তাঁরা দিনান্তে ক্ষণকালের জন্য সুমধুর সুরতালের ছন্দ দোলায় দোল খেয়ে সঙ্গীত ও নৃত্যের চিত্তপ্রসাদ উপভোগ করতে আসেন। দৃশ্যপটের ঐশ্বর্য দেখতে আসেন না। কিন্তু রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ প্রযোজক ও পরিচালকেরা বলেন যে, দর্শকের শ্রবণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সমতালে যদি তার দর্শনেন্দ্রিয়কেও এক সুরে বাঁধতে পারা যায়, তাহলে সে যা শুনতে এসেছে, তা পুরোপুরি উপভোগ করতে পারে, নইলে তার দেখা শোনা হয়ে থাকবে আংশিক মাত্র। কথাটা ভেবে দেখবার মতো। বিজ্ঞানের দিক থেকে এটাকে অবিসম্বাদী সত্য বলে মেনে নিয়েই বহু অর্থব্যয়ে অপেরায় এই রুচিরম্য বিস্ময়কর প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের অবতারণা করা হয়, যাতে দর্শক ও শ্রোতার চক্ষু ও কর্ণ একত্রে সমান প্রীত ও মুগ্ধ হতে পারে। এমনি করেই তাঁরা সিনেমার প্রবল আকর্ষণ থেকে রঙ্গমঞ্চকে রক্ষা করতে পেরেছেন। পটের আক্রমণে পীঠের পৃষ্ঠ প্রদর্শনের প্রয়োজন হয় নি এদেশে।

অপেরা থেকে হোটেলে ফিরতে রাত্রি বারোটা হয়ে গেল। পরের দিন ছিল আমাদের অপেরায় 'সালোম' নৃত্য-নাট্য দেখতে যাবার প্রবেশপত্র। এত ভাল লেগেছিল পূর্বদিনের অভিনয় যে, আজকের সারাদিনটা উৎসুক আগ্রহে কেটে গেল! 'বিব্লিওতেক্ নাসিওনাল' ফ্রান্সের যেটি সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার সেখানে ঢুকেও মন বসছিল না। কখন সন্ধ্যা হবে, অপেরায় যাবো। এ যেন অনেকটা সেই নবপরিণীত তরুণের প্রিয়া-মিলন ব্যাকুলতা! 'সালোম' দেখেও মুগ্ধ হয়ে এলাম। যেমনি দৃশ্যপট, তেমনি নৃত্য-গীত, তেমনি অভিনয়। অর্কেস্ট্রার আবহসঙ্গীত যেন এই অপেরার প্রাণস্বরূপ। বিশেষ করে নৃত্য-নাট্যের সেই দৃশ্যটি বোধ করি জীবনে কখনো ভুলবো না—সেই যেখানে সালোম তার মনের মানুষ—তার প্রণয়ী—'জন দি ব্যাপটিস্টের' ছিন্ন-মুণ্ড এনে আপন জননীকে উপহার দিলে। প্রতিহিংসাপরায়ণা, হৃদয়হীনা হেরোদিয়ার দুই চক্ষে সেই জিঘাংসার জ্বলন্ত আগুন। ছিন্ন-মুণ্ডের জিহ্বা নিষ্ঠুরভাবে টেনে বার করে তার কবরীর কাঁটা খুলে নিয়ে বারংবার মৃতের সেই জিহ্বাতে বীভৎস উল্লাসে বিদ্ধ করা—উঃ! মনে হলে সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে।

শেষটা যাবো না যাবো না করেও, পারিস ছাড়বার আগের দিন রাত্রে 'নাইট লাইফ অফ প্যারিস' দেখতে যাবার কৌতুহলটা এসে ঘাড়ে চাপলো। বিদেশী টুরিস্টদের জন্য প্রচারিত ভ্রমণ তালিকা খুঁজে দেখলাম দু'হাজার একশ ফ্রাঙ্ক লাগবে রাত্রি সাড়ে নটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত ঘণ্টা চারেক ঘুরিয়ে গোটা চার-পাঁচ 'কাবারা' বা নাইট ক্লাব দেখিয়ে নিয়ে আসতে। আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানীর কেয়ারেই দেখতে যাবো বলে তাঁদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে রাখলাম। পত্নী সেখানে যেতে চাইলেন না। লোকমুখে ওখানকার যেসব বিবরণ পেয়েছেন তাতে বুঝেচেন ভদ্রমহিলাদের যাবার উপযুক্ত স্থান সেটা নয়। আজ সারাদিন ছিলাম আমরা ভাঁশাঁয়। (ভিন্সেন্স) পারিসের উপকণ্ঠে এই জনপদ ভাঁশাঁ। এখানে মধ্যযুগীয় একটি দুর্গ আছে দেখবার মতো এই শুনে সেখানে গিয়েছিলাম। গিয়ে কিন্তু হতাশ হয়েছি। এর ঐতিহাসিক মূল্য হয়ত আছে স্বীকার করি কিন্তু বিদেশী ভ্রমণকারীদের কাছে এর আকর্ষণ কি? ভাঁশাঁ দুর্গের ভগ্নাবশেষ মাত্র। এটি নাকি একসময়ে আটটি চূড়াযুক্ত একটি বিশাল দুর্গ ছিল'। আজ মাত্র তার একটি বুরুজ অবশিষ্ট আছে। দীর্ঘকাল এটি বড় বড় রাষ্ট্রদ্রোহীদের বন্দীনিবাসরূপে ব্যবহৃত হ'ত। এখানে যাঁরা আবদ্ধ ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'কার্ডিনাল দ্য রেজ্'। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর মানুষ। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও প্রণয়ের জন্য দ্বন্দ্বযুদ্ধ করা বা রাষ্ট্রীয় শক্তি লাভের জন্য ষড়যন্ত্র করা কিছুই বাদ দিতেন না। প্রধান-মন্ত্রী মাজারীণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য এঁকে বন্দী করা হয়েছিল। 'নিকোলা কুশে' প্যারিসের একজন উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারী, কার্ডিনালেরই সমসাময়িক। ইনিও মাজারীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য বন্দী হয়েছিলেন। 'দাইদেরো' অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের একজন শক্তিশালী লেখক সমালোচক ও দার্শনিক। কিন্তু, আপত্তি-জনক রচনা প্রকাশের জন্য এঁকে কিছুদিন কারাবাস করতে হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফ্রান্সের দুর্ধর্ষ চরিত্র, জীবন-যুদ্ধে সবলে এগিয়ে চলা শক্তিমান পুরুষ 'মীরাবো' বৃদ্ধ মার্কুইস দ্য মনীয়ারের তরুণী পত্নীকে হরণ করে নিয়ে পালানোর অপরাধে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই এখানে মহাবীর নেপলিয়ঁর আদেশে 'ডাক্ দ্য গাঁকে' বন্দী করে এনে সেই রাত্রেই তার বিচার শেষ করে গুলী করে মারা হয়েছিল।

'পল্লী তোরণ' শীর্ষক একটি চূড়া বা বুরুজ বিশিষ্ট সিংহদ্বারের মধ্য দিয়ে দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করলাম। প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। তার বাম দিকে গথিক স্থাপত্য কৌশলে তৈরী একটি উপাসনা মন্দির, দক্ষিণে দুর্গ। ধ্বংসাবশেষ এই দুর্গের আটটি চৌকোণা পাঁচতলা বুরুজের মধ্যে একটি অবশিষ্ট রয়েছে। এর ভিত্তি ও দেওয়াল ৯ ফুট পুরু! দেখে ভাবলাম এ দুর্গের বাকী ৭টি বুরুজ ভাঙলো কেমন করে। এটি এখন ফ্রান্সের ঐতিহাসিক যাদুঘরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিনশ' বছর ধরে ফ্রান্সের সমস্ত রাজারাই এখানে বসবাস করতেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের রাজা পঞ্চম হেনরীর এইখানেই মৃত্যু হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভাঁশাঁ পরিত্যাগ করে ফ্রান্সের রাজারা ভের্সাই প্রাসাদে বস-বাস শুরু করেন। গাইড বললেন, এক-

তলায় ছিল রাজারাণীর রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর এবং ভৃত্যাবাস। দ্বিতলের মহলে ছিল রাজার বাস, ত্রিতলের মহলে ছিল রাণীর বাস, চারতলায় ছিল রাজকুমার ও রাজকুমারীদের বাস আর পাঁচতলায় ছিল পরিচারিকাদের কোয়ার্টার। আমরা তা বিনা

মাদামোয়াজেল সুজাঁ লের্ফাং
(দালাইলার ভূমিকার অভিনেত্রী)
ম্যশেঁ চার্লস ফ্রঁভাল্
(সামসনের ভূমিকার অভিনেতা)

প্রতিবাদে মেনে নিলাম। কারণ, কোনও তলাই আর নাই!

দুর্গের বাইরে প্রাঙ্গণের একধারে রয়েছে রাণীদের মণ্ডপ। এও একটি ছোটখাটো দুর্গ বিশেষ। এর খানিকটা পুড়ে গেছে। গাইড বললে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানরা পুড়িয়ে দিয়েছে। এখন বোঝা গেল গাইডের কোনও কথাটাই ঠিক নয়। আগে যে বলেছিল ভাঁশাঁ দুর্গের তিনতলায় রাণীদের মহল ছিল সেটা ঠিক নয়, কারণ, রাণীদের এইত 'পাভিলঁ দ্য' লা রাইন' নামে আলাদা মহল পাওয়া যাচ্ছে। এর আধখানা অবশ্য পুড়েছে, কিন্তু কে পুড়িয়েছে তা কে জানে? ১৯১৪ সালের যুদ্ধের একটি মনুমেন্ট এখানে আছে বটে। মনে পড়ল, আগ্রার দুর্গ ও প্রাসাদ দেখাতে দেখাতে আমাদের এক বৃদ্ধ মেডেলধারী গাইড বলছিল—এখানকার যা কিছু ভাঙাচোরা দেখছেন হুজুর, সব ভরতপুরের মহারাজা ভেঙে দিয়ে গেছেন। সমস্ত হীরে জহরৎ এখান থেকে তিনি লুট করে নিয়ে গেছেন। 'তুমি মিছে কথা বলছো!' বলে যখন ধমক দিয়ে উঠলাম, তখন চুপি চুপি বললে—'ফিরীঙ্গী শালালোক সব তোড়কে ফাড়কে লুটকে লিয়া বাবুজী, লেকেন কালেক্টার অফিসমে হামলোগনুকে উয়ো বাত কহনে মানা কর দিয়া গিয়া! নেইতো গাইডকা 'লাইসেন্স' নেহি মিলেগা!' ভাঁসাঁ ভাল লাগলো না। এখান থেকে আমরা চলে গেলাম পারিসে ফিরে। বোধকরি মুষড়েপড়া মনটা চাঙ্গা করে তোলবার জন্যই রাত্রে ডিনারের পর রেস্তোরাঁ থেকে আমি বেরিয়ে পড়লাম পারিসের নৈশরূপ দেখবার জন্য। পত্নী চলে গেলেন কন্যাকে নিয়ে হোটেলে।

অপেরা হাউসের পাশ থেকে রাত্রি সাড়ে নটায় আমাদের গাড়ী ছাড়লো। বাস নয়। একটি 'সপ্তাসন' মোটরকার। কিন্তু পাঁচজনের বেশী যাত্রী জোটেনি দেখলাম। আমি এবং একটি সিংহলী যুবক। ছাত্র বলেই মনে হল। দামী পোষাক তার আর্থিক স্বাচ্ছল্যের পরিচয় দিচ্ছে। জনৈক ইটালিয়ান শিল্পী এবং একজোড়া অতিক্রান্ত যৌবন মার্কিন দম্পতি। গাড়ী আমাদের মঁ পার্নার লাটিন কোয়ার্টারে নিয়ে এল। লাটিন কোয়ার্টারকে এরা বলেন 'কার্তিয়ে লাঁত্যা! এখানে দুদিন দিনের বেলা ঘুরে গেছি, রেস্তোরাঁয় বসে খেয়েছি, কিন্তু, এখানে যে 'নাইট ক্লাব' আছে কিছুই জানতে পারিনি। একটু বিস্মিত হলাম। ছাত্রদের পাড়ায় এ কি ব্যাপার? আমাদের নামিয়ে নিয়ে গেল ভিতরে। ভীষণ ভীড়। শুনলাম এদের অধিকাংশই নাকি শিল্পী ও ছাত্র ছাত্রীর দল! এবার রীতিমতো অবাক হলাম! উঁকি ঝুঁকি মেরে ভিতরে একটু দেখবার চেষ্টা করলাম। সুবিধা হ'ল না। কারণ, সবাই সেই চেষ্টাই করছেন। আমাদের টেবিল 'বুক্' করা হয়েছে শুনলাম সাড়ে দশটা থেকে। কোম্পানীর কাছে অনেক লেটে আসায় প্রথম ঘণ্টায় স্থান পাইনি। আসনসংখ্যা পরিমিত। তখনও দশটা বাজেনি, কিন্তু সেই সন্ধ্যারাত্রিকেই এরা বলেন 'কার্তিয়ে লাঁত্যা!' এখানে দুদিন গীতের আভাস পাচ্ছিলাম। ঐকাতান বাদ্যের সুমধুর সুরের সঙ্গে সুরামত্ত সমঝদারদের বাহবা ধ্বনিও কানে আসছিল। ভীড় কমলে পরে আসা যাবে বলে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে 'নোতরদাম গীর্জা' ও 'লা' হাল' (সেন্ট্রাল মার্কেট) পার হয়ে এলাম সোজা ম' মার্ত্রে। এখানকার কাবারেতে ভীড় থাকলেও প্রবেশ করা গেল। এখানে কেউ ভিতরে যাবার প্রবেশপথে ভীড় করে দাঁড়ায়নি। সুরা নারী প্রেম ও প্রেমারার জোয়ার চলেছে এখানে। হলের মাঝখানে একটি চক্রাকার বেদীর উপর নামমাত্র স্বল্পবেশা সুন্দরীদের উদ্দাম নৃত্যগীত চলেছে। অর্কেস্ট্রা বাজছে সেই চক্রবেদী ঘিরে। অভ্যাগতদের অসংখ্য টেবিলে, হলটি ভরে গেছে। গাইড আমাদের জন্য নির্দিষ্ট টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসালে। পান করি আর না করি রূপসী পরিচারিকা হাসিমুখে 'শুভ সন্ধ্যা' জানিয়ে দিয়ে চলে গেল এক বোতল শ্যাম্পেন ও সুদৃশ্য পানাধার প্রত্যেকের সামনে। যৎকিঞ্চিৎ মিষ্টিমুখের ব্যবস্থাও আছে, স্যাণ্ডউইচ, কেক, বিস্কিট। গাইড চেয়ে নিলে একপাত্র কাফি। শুনলাম সুরাপান না করলেও দক্ষিণা পাঁচশো ফ্রাঙ্ক দিতেই হবে। এই নাকি এখানকার প্রচলিত বিধি। গাইড বললে, না, আপনাদের কিছু দিতে হবে না। আপনারা যে দু'হাজার একশ ফ্রাঙ্ক ক'রে দিয়েছেন তার মধ্যে এসব ব্যয় ধরা আছে। যাক্! শুনে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো!

মেয়েরা আসছেন অনেকের কাছেই। চেনা কি অচেনা জানি না। সম্ভবতঃ পরস্পর পরিচিত। কণ্ঠলগ্ন হয়ে 'ডার্লিং' বলে চুমু দিচ্ছেন দু'গালে। একই পানপাত্রে চুমুক দিয়ে সোহাগভরে দিয়াশলাই জেলে সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছেন মুখে। তাদের সকলেরই পরনে লেটেস্ট্ প্যারিসিয়ান ফ্যাশানের রকমারী 'ইভনিং গাউন'। জরি, ভেলভেট, ব্রোকেড ও সিল্কের ছড়াছড়ি! হীরে মুক্তও ঝলমল করছে। পিঠের দিকটা সবই প্রায় কোমরপর্যন্ত খোলা। বুকের দিকেও অর্ধ অনাবৃত। অর্কেস্ট্রা বাজছেই। জোড়ায় জোড়ায় মহানন্দে নাচ চলেছে অর্কেস্ট্রার সুর অনুসরণ করে। রূপসী তরুণীর সঙ্গে নৃত্যে অংশীদার হবার জন্য সকল বয়সের পুরুষের মধ্যেই প্রতিযোগিতা চলেছে দেখলাম। স্ফূর্তিবাজদের এখানে আনন্দ উপভোগের অনেক রকম আকর্ষণই রয়েছে। গাইডটি আমাদের একটি ওস্তাদ্ ঘুঘু বলে মনে হ'ল। বলছে—'নাচো গাও স্ফূর্তি করো বন্ধু। যৌবন ক'দিনেরই বা? উপভোগ করে নাও জীবনটা তাজা থাকতে থাকতে! সন্দেহ হল লোকটা এদেরও দালালী করে নাকি? সত্যই এখানকার পরিবেশের মধ্যে একটা মাদকতা আছে। আনন্দের প্রমত্ত আবেগে প্রাণ চঞ্চলতার তরঙ্গভঙ্গে জীবনউৎস যেন উচ্ছ্বল হয়ে উঠছিল। গায়কের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সবাই তার গানে যোগ দিচ্ছিলেন। মার্কিন দম্পতি নেমে গেলেন নৃত্যের আসরে। ইটালিয়ান শিল্পীও পেলে তার মনের মতো নৃত্যসঙ্গিনী। শুধু সিংহল ও ভারত বসে রইল নিষ্প্রাণ পুতুলের মতো টেবিলের ধারে।

(ক্রমশঃ)

আমার ঠাকুরমা

শ্রীসরলাবালা সরকার

আমার ঠাকুরমার জীবনকাহিনী এত অপূর্ব যে উপন্যাস ও উপকথার ভিতরেও হয়তো তেমন আশ্চর্য ও অপূর্ব ব্যাপারের সন্ধান পাওয়া যায় না।

১২১৬ সালে চৈত্র মাসে পাবনা জেলার নিকটস্থ পোতাজিয়া নামক গ্রামে এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। ১৩০৩ সালে যখন তাঁহার বয়স ৮৮ বৎসর, তখন তাঁহার আত্মজীবনী পুস্তক তৃতীয়বার প্রকাশিত হয়।

স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই পুস্তকের যে ভূমিকা লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে প্রথমেই কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

"ইঁহার আত্মজীবনী পড়িয়া মনে হয়, ইনি একজন আদর্শ রমণী। যেমন গৃহধর্ম পালনে নিপুণা তেমনি ধর্মপ্রাণা ও ভগবদ্ভক্ত।"

*　*　*　*　*

"শৈশবে তিনি অতিশয় ভীরুস্বভাব ছিলেন, সেই সময় ইঁহার জননী ইঁহার ভয় নিবারণার্থে ইঁহাকে একটি অভয়মন্ত্র প্রদান করেন। সেই অবধি সেই অভয়মন্ত্রটি অক্ষয় কবচরূপে তাঁহাকে চিরজীবন রক্ষা করিয়াছে। তাঁহার মা বলিয়াছিলেন, "ভয় হইলেই দয়ামাধবকে ডাকিও।" শোকে, তাপে, ভয়ে ও বিপদে মাতৃদত্ত এই অভয়মন্ত্রটিই তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিয়াছে।"

দয়ামাধব তাঁহার পিতৃগৃহের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ। অনেকে বিগ্রহে দেবত্ব-আরোপ অপরাধ এবং কুসংস্কার বলিয়া মনে করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন,

"ইঁহার ধর্ম বাহ্যিক অনুষ্ঠান-আড়ম্বরে পর্যবসিত নহে; ইঁহার ধর্ম—জীবন্ত আধ্যাত্মিক ধর্ম। জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় ইনি ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পান, তাঁহার করুণা উপলব্ধি করেন, তাঁহার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া থাকেন; এক কথায় তিনি ঈশ্বরেতেই তন্ময়। × × আমাদের দেশে ঈশ্বরের নামে যে বিগ্রহ স্থাপন করা হয়, তাহা ঈশ্বরের স্মারক-চিহ্ন মাত্র, তাহাতে পৌত্তলিকতার সংকীর্ণ ভাব নাই। × × × লেখিকার জননী লেখিকাকে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা হইতেই এই কথা প্রতিপন্ন হইবে।"

"আমি তখন মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মা! দয়ামাধব দালানে থাকিয়া কেমন করিয়া আমাদের কান্না শুনিলেন? মা বলিলেন, তিনি পরমেশ্বর, তিনি সর্বস্থানেই আছেন এজন্য শুনিতে পান। × × তাঁহাকে যে যেখানে থাকিয়া ডাকে তাহাই তিনি শুনেন। বড় করিয়া ডাকিলেও তিনি শুনেন, ছোট করিয়া ডাকিলেও তিনি শুনেন, মনে মনে ডাকিলেও তিনি শুনিয়া থাকেন।"

(আমার জীবন, ১৫ পৃঃ)

তাঁহার বাপের বাড়ীতে ছিলেন দয়ামাধব বিগ্রহ আর শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া তিনি পাইয়াছিলেন দয়ামাধবেরই আর এক রূপে প্রকাশ, মদনগোপাল বিগ্রহ। বিগ্রহের ভিতর ভগবানের জীবন্ত স্বরূপ কিভাবে অনুভূতি-গম্য হইতে পারে ঠাকুরমার সমস্ত জীবনই যেন তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

ঠাকুরমা লেখাপড়া জানতেন না। যদিও তিনি খুবই আদরের মেয়ে ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইবার কল্পনাও কেহ করেন নাই। কেননা তখনকার দিনে মেয়েদের লেখাপড়া শিখানো হইত না, বরং লেখাপড়ার চর্চা করিলে মেয়েদের গার্হস্থ্য-জীবনে বৈধব্য প্রভৃতি দারুণ অকল্যাণ ঘটে এইরূপ একটি বদ্ধমূল সংস্কার ছিল।

সেকালে হিন্দু পরিবারে মেয়েদের আদর ছিল না বলিলে অনেকটা ঠিক কথাই বলা হয়। মেয়ে ছিল যেন বাপ ও মায়ের, এমন কি সমস্ত পরিবারেরই ভারস্বরূপ। এই জন্যই 'কন্যাদায়' কথাটির উৎপত্তি হইয়াছিল। যেমন সংস্থান থাকুক বা নাই থাকুক বাপ মায়ের মৃত্যুর পর তাঁহাদের শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিতেই হইবে তাই শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য যে ক্রিয়া তাহা হইয়াছিল, 'পিতৃদায় ও মাতৃদায়'। আর নির্দিষ্ট বয়সের ভিতর কন্যাকে পাত্রস্থ করিতেই হইবে এই যে সামাজিক বিধান ইহা হইতেই 'কন্যাদায়' কথাটির উৎপত্তি।

কিন্তু ঠাকুরমার সম্বন্ধে যে কথা খাটে নাই নানা কারণে। প্রথম কারণ, তিনি ছিলেন পরমা সুন্দরী, কাজেই অতি অল্প বয়সে তাঁহার জন্য নানা স্থান হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসিতেছিল। কিন্তু তাঁহার গুরুজনেরা অত অল্প বয়সে আদরের পুত্তলী কন্যাটিকে পরহস্তে দিতে একেবারেই ইচ্ছুক ছিলেন না। এইজন্য তখনকার দিনে কিছু বেশী বয়সে অর্থাৎ বার বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু তিনি এতই সরল ছিলেন যে বিবাহ কাহাকে বলে তখনও তাহার কিছুই তিনি জানিতেন না।

ছেলেরা অবশ্য লেখাপড়া শিখিত। ঠাকুরমা তাঁহার জীবনীতে লিখিয়াছেন,—

"ছেলেদের জন্য বাঙলা স্কুল আমাদের বাড়ীতেই ছিল, একজন মেমসাহেব সেই স্কুলে গ্রামের সমস্ত ছেলেকে লেখা ও পড়া শিখাই-তেন। × আমার খুড়া আমাকে কালো রঙের একটা ঘাগরা পরাইয়া একখানা উড়ানী গায়ে দিয়া সেই স্কুলে মেমসাহেবের কাছে বসাইয়া রাখিতেন। আমি সকল দিবস সেই স্কুলেই থাকিতাম। তখন ছেলেরা ক খ চৌত্রিশ অক্ষর মাটিতে লিখিত, যুক্তাক্ষরও লিখিত; পরে এক নড়ি হাতে লইয়া ঐ সকল লেখা উচ্চৈঃস্বরে পড়িত। আমি মনে মনে ঐ সকল পড়াই শিখিলাম।"

ইহাই তাঁহার প্রাথমিক অক্ষর পরিচয়।

এই প্রাথমিক অক্ষর পরিচয় হইতে তিনি যখন সত্যকার অক্ষর পরিচয় লাভ করিলেন তখন তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর। তাঁহার প্রথম সন্তান বিপিনবিহারী তখন সাত বৎসরের ছেলে। সেই সময় তিনি একদিন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তিনি যেন চৈতন্য ভাগবত পড়িতেছেন। সেই অবধি দিন রাত তিনি মনে মনে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন "আমাকে পড়িতে শিখাও, আমি যেন চৈতন্য ভাগবত পড়িতে পারি।"

স্বামীকে তিনি কর্তা বলিতেন। কর্তার ঘরে অনেক তালপাতে ও তুলট কাগজে লেখা পুঁথি ছিল। ঠাকুরমা ভাবিলেন চৈতন্য ভাগবতও নিশ্চয় তাহার ভিতর আছে। কিন্তু তিনি কি করিয়া পুঁথি-খানি চিনিতে পারিবেন?

তখন তিনি ভগবানের শরণ লইলেন। "হে দীননাথ, আমি কাল স্বপ্নে যে পুঁথি

পড়িয়াছি সেখানি আমাকে চিনাইয়া দাও। তুমিই তো স্বপ্নে আমাকে পুস্তক পড়াইয়াছ, সে স্বপ্ন তো তোমারই দেওয়া, তবে কেন সে স্বপ্ন সত্য হইবে না, ঐ পুঁথিখানি তোমার আমাকে দিতেই হইবে, তুমি না দিলে আর কে দিবে?"

ঠাকুরমা বলিতেছেন,—

"আহা কী আশ্চর্য! দয়াময়ের কী অপরূপ দয়ার প্রভাব! আমি যেমন মনে মনে এই সকল চিন্তা করিতেছিলাম, অমনি তিনি শুনিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। আমি পাকের ঘরে পাক করিতে করিতে শুনিলাম, কর্তা বিপিনকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "বিপিন, আমার চৈতন্যভাগবত পুঁথি এখানে থাকিল, আমি যখন তোমাকে লইয়া যাইতে বলিব, তখন তুমি লইয়া যাইও" বলিয়া তিনি বাহির বাটীতে গেলেন।

"আমি পাকের ঘরে থাকিয়া এই কথা শুনিলাম। তখন আমার মনে যে কি পর্যন্ত আনন্দ হইল, তাহা বলা যায় না। আমি অতিশয় পুলকিত মনে তাড়াতাড়ি গিয়া দেখিলাম, সেই চৈতন্যভাগবত পুস্তকখানি বিদ্যমান।"

ঠাকুরমা বইখানি তো পাইলেন, কিন্তু প্রথমত তিনি পড়িতে জানেন না। দ্বিতীয়ত কর্তার ঘরে অনেক পুঁথিই ছিল, সেই সমস্ত পুঁথির সঙ্গে একত্রে রাখা হইলে তিনি কি করিয়া আবার বইখানিকে চিনিয়া বাহির করিবেন?

ঠাকুরমা তাঁহার জীবনীতে লিখিয়াছেন,

"এখনকার পুস্তক সকল যে প্রকার, সেকালে এ প্রকার পুস্তক ছিল না। সে সকল পুস্তকে কাঠের আড়িয়া লাগানো থাকিত। ঐ আড়িয়ায় নানা প্রকার চিত্র বিচিত্র ছবি আঁকাইয়া রাখিত। এক এক পুস্তকে এক এক প্রকারের ছবি থাকিত। আমি তো লিখিতে পড়িতে জানি না, কিরূপে ঐ পুস্তক চিনিব? আমি কেবল ঐ চিত্র পুত্তলিকা দেখিয়া ঠিক করিয়া রাখিলাম।

"পরে পুস্তকখানি ঘরের মধ্যে রাখিলে আমি ঐ পুস্তক হইতে একটি পাতা খুলিয়া লইলাম। (পুঁথির পাতা সুতা দিয়া গাঁথা থাকিত, তাই একটি পাতা খুলিয়া নেওয়া সম্ভব হইয়াছিল) × ঐ পুস্তকের পাতাটি লইয়া আমি ভারী মুসকিলে পড়িলাম। হাতে করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কি করিব, কোথায় রাখিব, কোথায় থুইলে কে দেখিবে।

মনে মনে স্থির করিলাম, যে স্থানে রাখিলে আমি সতত দেখিতে পাইব, অথচ অন্য কেহ না দেখে এমন স্থানে রাখা উচিত। আর কোথা রাখিব, রান্নাঘরের হেঁসেলের কাছে জ্বালানি খড়ির নীচে লুকাইয়া রাখিলাম।"

এই রান্নাঘরেই ঠাকুরমাকে অনেক সময় থাকিতে হইত, কেননা বৃহৎ পরিবারের দুই বেলা রান্নার ভার একা তাঁহাকেই বহন করিতে হইত। বাড়ীতে যে সকল বাহিরের দাসদাসী ছিল তাহারা সংখ্যায় ১৪।১৫ জন। তাহাদের জন্য এবং বাড়ির সকলের জন্যই তাঁহাকে রান্না করিতে হইত। ইহা ছাড়া ছেলেমেয়েও অনেকগুলি। ঠাকুরমা লিখিয়াছেন,—

"ঐ ছেলেগুলি নিদ্রিত থাকিতেই প্রভাতে উঠিয়া ঘরের সকল কাজ করিতাম এবং তাহাদের জন্য অন্ন পাক করিয়াও রাখিতাম। উহারা ঘুম হইতে উঠিলে উহাদের সকালের খাওয়ানো ও অন্যান্য কাজ মিটাইয়া স্নান করিয়া বিগ্রহ সেবার জন্য যাহা দিতে হয়, সেগুলি আয়োজন করিয়া দিতাম। ইহার পর ঘরের রান্নার আয়োজন করিয়া পাকের ঘরে যাইতাম। সে পাকও নিতান্ত কম নহে। এক সন্ধ্যায় দশ বার সের চাউল পাক করিতে হইত। এদিকে আবার বাড়ির কর্তাটির স্নান হইলেই ভাত চাই, অন্য কিছু আহার করিতে বড় ভালবাসিতেন না। সেজন্য তাঁহার জন্য অগ্রে এক প্রস্থ পাক হইত, পরে অন্যান্য সকল লোকজনের জন্য পাক হইত।"

অন্যান্য সকলের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকাইয়া দিয়া প্রায় অপরাহ্নে তাঁহার নিজের খাওয়ার সময় হইত। ঠাকুরমা লিখিয়াছেন,

"একদিন যখন আমি ভাত লইয়া খাইতে বসিব, ঐ সময় একজন লোক আসিয়া অতিথি হইল। সে লোকটি জাতিতে নমোশূদ্র, সে পাক করিয়া খাইতে চাহিল না, অন্য সামগ্রী কিছু খাইতেও স্বীকার করিল না। সে বলিল, চারটি ভাত পাইলে খাই। আমি যে তাহাকে পাক করিয়া দিব, সে সময়ও নাই। আর কি করিব, আমার ঐ যে মুখের ভাতগুলি ছিল, সেই ভাতই অতিথিকে ধরিয়া দিলাম। ভাবিলাম, এবেলা না হউক রাত্রিতে পাক করিলে খাওয়া যাইবেক।"

কিন্তু রাত্রেও তাঁহার অদৃষ্টে অন্ন জুটিল না। তিনি লিখিয়াছেন,—

"বৈকালের কাজ সারিয়া সন্ধ্যায় ছেলেদের ঘুম পাড়াইয়া পাক করিতে চলিলাম। তখন আমার অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছিল, কিন্তু ভাত ছাড়া অন্য জিনিস কখনও নিজে হাতে লইয়া খাওয়ার অভ্যাস ছিল না। বিশেষত মায়ে খাইতে বসিলে ছেলেপিলে আসিয়া ভারি গোলযোগ করিবে, তাহাতে অনেক সময় নষ্ট ও কাজের হানি হইবে, সুতরাং সে ল্যাঠায় আর কাজ নাই ভাবিয়া পাক করিতে চলিলাম।"

সেদিন পাক শেষ ও সকলের খাওয়া হইয়া গেল, কিন্তু বাহির বাটীর কাছারী আর ভাঙ্গে না, কর্তাও বাটীর মধ্যে আসেন না।... আমি ভাবিতে লাগিলাম, এত রাত্রি হইয়া গেল, কর্তা এতক্ষণ পর্যন্ত আইলেন না, ইহার পর ছেলেরা জাগিয়া উঠিবে, তাহা হইলে আমার আজি আর খাওয়া হইবে না।

এই ভাবিতে ভাবিতেই সেই ভাবনাটি সিদ্ধ হইল। কর্তাও বাটীর মধ্যে আসিলেন সঙ্গে সঙ্গে একটি ছেলে উঠিয়া কাঁদিতে লাগিল, আমি কর্তার সম্মুখে ভাত দিয়া ঐ ছেলেটিকে কোলে তুলিয়া ঘুম পাড়াইতে লাগিলাম; ভাবিলাম কর্তার খাওয়া হইতে হইতেই ছেলেটির ঘুম আসিবে, আর না হয় তাহাকে কোলে করিয়াই খাওয়া যাইবেক। কিন্তু তাঁহার খাওয়া শেষ না হইতেই কোলের ছেলেটি উঠিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন মনে করিলাম দুজনকে লইয়াই খাওয়া যাইবে, এই ভাবিয়া সে ছেলেটিকেও আনিলাম এবং দুই ছেলে লইয়াই খাইতে বসিলাম।

ইতিমধ্যে দৈবাৎ ঝড়-বৃষ্টি আসিল, বাতাসে ঐ ঘরের দীপটাও নিভিয়া গেল, অন্ধকার দেখিয়া দুই ছেলেই কাঁদিতে লাগিল। আমার এত ক্ষুধা হইয়াছিল যে, ছেলেরা না উঠিলে আমি অন্ধকারেই ভাত খাইতাম। যে চাকরাণীরা আছে তাহারা বাহিরের লোক, ঘরে আসে না। আবার ছেলে দুটি যদি কাঁদে তাহা হইলে কর্তা 'কাঁদে কেন, কাঁদে কেন' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে সোর করিবেন। তখন কাজে কাজেই ঐ ভাত ঐখানে রাখিয়া ছেলে দুটিকে নিয়া অন্য ঘরে যাইতে হইল। পরে ঝড়বৃষ্টি থামিল এবং ছেলেরাও ঘুমাইয়া পড়িল। তখন অধিক রাত্রি হইয়াছে আমারও অতিশয় আলস্য হইল, সুতরাং সে দিবস আর খাওয়া হইল না।

তার পরের দিনের ঘটনার সম্বন্ধে ঠাকুরমা লিখিয়াছেন,

"পর দিবস ঐ নিয়মে তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া পাক করিতে চলিলাম। আমার যে কল্য মোটেই খাওয়া হয় ন্যাই তাহা কেহই জানে না। আমি সকল লোকের খাওয়া হইয়া গেলে পরে খাইব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু কোলের ছেলেটিকে একটি লোক এতক্ষণ রাখিয়াছে তাহার তখনও খাওয়া হয় নাই, ছেলেটিকেও দুধ দিতে হইবে, সুতরাং ঐ লোকটিকে ভাত দিয়া ছেলে কোলে লইয়াই ভাত খাইতে বসিলাম। বসা মাত্রেই ছেলেটি কোলের মধ্যে হাগিয়া দিল এবং কোলে থাকিয়া এত জোরে প্রস্রাব করিল যে, সমুদয় ভাত এককালে ভাসিয়া চলিল।"

ঠাকুরমা লিখিয়াছেন,

"পরমেশ্বরের ঐ কাণ্ড দেখিয়া আমি হাসিতে লাগিলাম। আমি যে দুই দিবস ভাত খাই নাই একথা আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিলাম না, আমার মনে মনেই থাকিল। বিশেষতঃ আপনার খাওয়ার কথা সকল লোক শুনিবে, সেটি ভারি লজ্জার বিষয়। এই প্রকার মাঝে মাঝে কত দিন আমার খাওয়া হইত না, কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় আমার শরীরে রোগ পীড়া ছিল না।"

যাহা হউক, এবার আমরা ঠাকুরমার চৈতন্যভাগবত পড়িবার ব্যাপারে আসিতেছি।

যাঁহার রান্নাঘরেই দিনের বেশীর ভাগ সময় থাকিতে হইবে রান্নাঘরের জ্বালানি কাঠের নীচে তাঁহার সেই পরম সম্পত্তিটি লুকাইয়া রাখা অবশ্য নিশ্চয়ই খুব বিবেচনার কাজ হইয়াছিল। কিন্তু পড়িবার চেষ্টা করিবেন কখন?

"সকল দিবস সংসারের কাজে অবকাশ পাওয়া যায় না, পাতাটি যে কখন দেখিব তাহার সময় নাই। রাত্রে পাকশাক সারিতে ভারি রাত্রি হইয়া পড়ে, তখন কাজ মিটিতে না মিটিতেই ছেলেগুলি জাগিয়া উঠিয়া বসে।......ইহার পর তাহাদের সকলকে শান্ত করিতে করিতে রাত্রি অনেক হইয়া যায়, চোখে ঘুম আসিয়া চাপে তখন আর লেখাপড়া করিবার সময় থাকে না।"

ইহার পর আরও বিশেষ বাধা এই যে ঠাকুরমার অক্ষর পরিচয়ই হয় নাই, পুঁথির পাতার অক্ষরগুলি চিনিবেন কি করিয়া! অতি বালিকাকালে ছেলেদের পাঠশালায় তাহাদের খড়ি দিয়া অক্ষর লিখিতে দেখিয়াছিলেন, সেই অক্ষরের রূপ কি এতদিন পরে স্মৃতি হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন? ইহাও কি সম্ভব?

কিন্তু তাঁহার জীবনে এই অসম্ভব ব্যাপারই সম্ভব হইয়াছিল; আজিও ভাবিয়া পাই না যে ঠাকুরমা কি করিয়া সত্য সত্যই পড়িতে শিখিলেন এবং কেবল পড়িতে নয়, লিখিতেও শিখিলেন এবং গদ্য ও পদ্য রচনা করিয়া আত্মজীবনী লিখিলেন।

ঠাকুরমা বলিয়াছেন, একজন না শিখাইলে কেহ শিখিতে পারে না। কিন্তু তাঁহাকে শিখাইবার লোক তো নাই-ই, বরং পাছে কেহ এই প্রচেষ্টা দেখিয়া ফেলে সেই ভয়ে দিবানিশি ব্যাকুল হইয়া আছেন।

কিন্তু তবুও মনে সাহস হয়, পরমেশ্বর যখন এতখানি আশা দিয়াছেন, চৈতন্য ভাগবতের একখানি পাতা পর্যন্ত মিলাইয়া দিয়াছেন তখন তিনি কি নিরাশ করিবেন?

রান্নাঘরে উনানের কাছে বসিয়া আছেন তখনও ঘোমটায় মুখ ঢাকা। এই ঘোমটা তাঁহার অতি বৃদ্ধ বয়সেও ছিল। কলিকাতায় যখন তিনি আসিতেন, চৌবাচ্চায় স্নানের জন্য জলে [illegible] তাঁহার নাক পর্যন্ত ঘোমটা। গঙ্গা স্নানে গেলে তো কথাই নাই।

ঠাকুরমা লিখিয়াছেন,

"পরমেশ্বরের ভরসাতেই সাহস করিয়া ঐ পাতাটি রাখিলাম। যখন পাক করি সেই পুস্তকের পাতাটি বাঁ হাতের মধ্যে রাখি, আর এক একবার ঘোমটার মধ্যে লইয়া দেখি। দেখিলেই বা কি হইতে পারে, আমি মোটেই কোন অক্ষর চিনিতে পারি না।

তখন আমার বড় ছেলেটি তালপাতে লিখিত, তাহার লেখা একটি তালপাতও লুকাইয়া রাখিলাম। ঐ তালপাতটি একবার দেখি আবার পুঁথির পাতটিও দেখি, আর আমার মনের ভিতর যে অক্ষরের স্মৃতি আছে সেই অক্ষরের সঙ্গে যোগ করিয়া দেখি যদি কোন পাঠ উদ্ধার করিতে পারি।"

ছেলের কাছেও কিছু জিজ্ঞাসা করিবার সাহস নাই। সাত আট বৎসরের বালক, যদি কাহাকেও কিছু বলিয়া বসে।

কিন্তু অধ্যবসায়, স্মৃতিশক্তি অথবা ভগবানের কৃপা যাহাই হউক না ইহারই ভিতর ঠাকুরমা একটু একটু করিয়া অক্ষর চিনিতে ও ভাগবতের পাঠ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি লিখিয়াছেন,

"আমি যে ছেলেবেলা ছেলেদের স্কুলে বসিয়া থাকিতাম তাহাতে আমার অনেক উপকার হইয়াছে। আমি চৈতন্য ভাগবতের পাতটি ও ঐ তালের পাতটি লইয়া মনের অক্ষরের সঙ্গে মিলাইয়া মিলাইয়া দেখিতাম।......এইভাবে প্রতিদিন পড়িয়া অনেক দিবসে, অনেক পরিশ্রমে, অনেক যত্নে ও অনেক কষ্ট করিয়া ঐ পাতাখানি পড়িতে পারিলাম। সেকালে ছাপার অক্ষর ছিল না, হাতের লেখা পড়িতে খুব কষ্ট হইত। আমার এত দুঃখের পড়া।"

বাস্তবিক এত দুঃখের লেখাপড়া বোধ হয় আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। ছাপার অক্ষরের প্রথম ভাগ পড়া নয়, একেবারে তুলটে লেখা চৈতন্য ভাগবত; এই চৈতন্য ভাগবতের পৃষ্ঠা হইতে ক্রমশ তাঁহার পাঠচর্চা যে ছাপার অক্ষরের বই পড়া, হাতের লেখা লিখিতে শেখা এমন কি গ্রন্থ রচনায় পর্যন্ত অগ্রসর হইল কেমন করিয়া, কিছুতেই তাহা ভাবিয়া পাই না। এটিকে একটি অলৌকিক ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়, আর এরকম অলৌকিক ব্যাপার তাঁহার জীবনে আরও অনেক সময় ঘটিয়াছে।

তিনি ছিলেন এত সরল স্বভাব যে, যখন তাঁহার বয়স বার বৎসর তখনও বিবাহ কাহাকে বলে তাহা মোটেই জানিতেন না। পল্লীগ্রামের মেয়েদের পক্ষে এটি এক অসাধারণ ব্যাপার। তিনি অতিশয় ভীরু স্বভাবও ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভয় নিজের জন্য নয়, এই ভয় সকলের জন্য। তাঁহার মা বলিয়াছিলেন, "ভাল ছেলেমেয়েকে ছেলেধরা ধরে না, দুষ্ট ছেলেমেয়েদের ধরে।" কাহারও মুখে হয়তো তিনি ছেলেধরার নাম শুনিয়াছিলেন তাই তাঁহার ভয় দূর করিবার জন্য তাঁহার মা সান্ত্বনার জন্যই কথাটি বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভয় যেন আরও বাড়িয়া গেল। কেননা তাঁহার সঙ্গিনী অনেক মেয়েই তাঁহার সরলতার সুযোগ লইয়া তাঁহার উপর অত্যাচার করিত এমন কি হয়তো খেলনা কাড়িয়া লইত এবং পরে প্রহারও করিত। তিনি সে সকল কথা মোটেই কাহারও কাছে বলিতেন না, পাছে তাহারা শাস্তি পায় এই ভয়ে। কিন্তু ছেলেধরা! ছেলেধরারা তো সবই জানিতে পারে! যদি তাহারা ঐ দুষ্ট মেয়েদের দুষ্টামীর জন্য ঝোলায় পুরিয়া ধরিয়া লইয়া যায় ইহাই ছিল তাঁহার দারুণ ভয়।

কথায় কথায় তাঁহার চোখে জল আসিত, তাঁহার শেষ বয়সেও এই অভ্যাসটি তাঁহার ছিল। একবার তাঁহাদের পোতাজিয়ার বাড়ীতে আগুন লাগে। বাড়ীতে আগুন লাগায় জিনিসপত্র বাঁচাইবার জন্য যখন সকলে ব্যস্ত তখন তাঁহারা তিন ভাই-বোন আগুনলাগা বাড়ীর কাছ হইতে দৌড়াইয়া পলাইতেছিলেন। তাঁহার দাদা তাঁহার অপেক্ষা দুই বছরের বড় এবং ছোট ভাইটি দুই বৎসরের ছোট। সম্ভবত তখন তাঁহার বয়স নয় কি দশ বৎসর। আগুনের হল্‌কায় উত্তাপ তাঁহাদের গায়ে আসিয়া লাগিতেছিল আর তাঁহারা দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতেছিলেন।

ছুটিতে ছুটিতে এক নদীর ধারে আসিয়া পড়িলেন। নদীর ধার একেবারে জনমানবশূন্য। যেখানে তাঁহারা আসিয়া পৌঁছিলেন সেটি একটি শ্মশানঘাট। ভয়ে তাঁহারা চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছেন, এমন সময় তাঁহার মনে হইল মা বলিয়াছেন "ভয় হইলে দয়ামাধবকে ডাকিও।" সেই কথা মনে হইবামাত্র মনে ভরসা আসিল। তিন ভাই-বোনে উচ্চৈস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, "দয়ামাধব, দয়ামাধব!" কিন্তু সে ডাক কে শুনিবে, একদিকে নদী ও আর দিকে জ্বলন্ত অগ্নির ভীষণ তাণ্ডব। বাঁশ ফাটার শব্দ ও লোকের কলরব দূর হইতে ক্রমাগত কানে আসিতেছে, আর তিন ভাই-বোন প্রাণপণে ডাকিতেছেন, "দয়ামাধব, দয়ামাধব!"

নদীর ওপারে কয়েক ঘর চাষীর বসতি ছিল; গ্রীষ্মের নদী, জায়গায় জায়গায় হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। কয়েকজন লোক

আগন নিভাইবার জন্য এপারে আসিতেছিল, তাহারাই এপারে আসিয়া তাহাদের দেখিতে পাইল এবং কোলে করিয়া বাড়ী পেণছাইয়া দিল। বাড়ীর সকলে তাঁহাদের না দেখিতে পাইয়া তাঁহারা পুড়িয়া মারা গিয়াছেন ভাবিয়া কাঁদাকাটি করিতেছিল, সেজন্য বাড়ির জিনিসপত্র কিছুই বাহির করা হয় নাই, এখন আবার তাঁহাদের ফিরিয়া পাইয়া যেন আনন্দে উন্মত্ত হইল, সর্বস্ব পুড়িয়া গিয়াছে সেজন্য কাহারও দুঃখ হইল না।

পল্লীগ্রামে কাহারও বাড়ী পুড়িয়া গেলে পোড়াভিটায় ছেলেমেয়ে সকলকে নিয়া পরমান্ন অর্থাৎ পায়েস খাওয়ার প্রথা আছে, তাই দয়ামাধবের ভোগের পরমান্ন তাঁহারা পরদিন পোড়াভিটার উপর কলাপাতায় খাইতে বসিয়াছেন। চারিধারে পোড়া হাঁড়ি-কুড়ি, বেগুনগাছে বেগুন, কলা গাছে কাঁদি শুদ্ধ কলা পুড়িয়া রহিয়াছে। ঠাকুরমার সেই সব দেখিয়া বেশ একটু আহ্লাদ হইল, ভাবিলেন এখানে এই সব ভাঙ্গা হাঁড়ি-খুরি নিয়া খেলা করিবার বেশ সুবিধা হইবে।

দয়ামাধবের প্রসাদ পরমান্ন খাইতে খাইতে কালিকার কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কাল আমরা দয়ামাধবকে ডেকেছিলাম, তাই কেমন তিনি তাড়াতাড়ি এসে আমাদের কোলে নিয়ে বাড়ি পেণছে দিলেন।"

তাঁহার ছোট ভাই বলিল, "সে দয়ামাধব হবে কেন, সেতো মানুষ।" ইহা শুনিয়া তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার কান্না শুনিয়া তাঁহার মা আসিয়া বলিলেন, "ওকে তোরা কাঁদাচ্ছিস্ কেন?" তখন সকল কথা শুনিয়া মা হাসিতে লাগিলেন। মায়ের হাসি দেখিয়া ঠাকুরমা অবাক, মা হাসিতেছেন কেন? মা তখন তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন "মানুষই তোমাদের আনিয়াছিল, কিন্তু তোমাদের কান্না শুনিয়া দয়ামাধবই ঐ মানুষকে পাঠাইয়াছিলেন। তাই সেই নির্জন নদীর ধারেও তোমাদের কোলে করিয়া বাড়ী পেণছিয়া দিবার লোক তোমরা পাইয়াছিলে।"

ইহার পর তাঁহার মা পরমেশ্বর সম্বন্ধে তাঁহাকে এমনভাবে বুঝাইলেন যে, তিনি সেকথা আর ভুলিলেন না। তিনি লিখিয়াছেন, "সেই দিন হইতে পরমেশ্বর আছেন, মনে মনে ডাকিলেও তিনি সে ডাকও শুনিতে পান মায়ের দেওয়া এই মহামন্ত্র আমার মনে অক্ষয় হইয়া আছে।"

তিনি অত্যন্ত আদরের ছিলেন বটে, কিন্তু আদুরে হইয়া যান নাই। তবে চোখের জলটি বরাবরই ছিল। তাঁহার অমনোনীত কোন ব্যাপারে যদি তাঁহার মনে আঘাত লাগিত, তখন ঐ চোখের জলই ছিল তাঁহার প্রতিবাদের ভাষা। তিনি মৌখিক অসন্তোষ বা বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না, কেবল জলভরা চোখে নির্বাকভাবে থাকিতেন।

এই চোখের জলের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করিতেছি। আমার বাবা আমার ছোট ভাই বাঁশরীর মুখে ভাত দিবার জন্য রামদিয়ায় গিয়াছেন। আমার কোলেও তখন ছোট একটি খুকী। মদনগোপালের প্রসাদ ইহাদের দুইজনেরই মুখে দেওয়া হইবে, তাই বাবা আমাকেও লইয়া গিয়াছেন। বোধ হয় সেটি ১৩০১ সালের ভাদ্র মাস।

বাবা কলিকাতা হইতে কয়েক বস্তা আলু, ফুলকপি ও মটর সুঁটি, চিনি, ময়দা, ঘিয়ের টিন এবং আরও অনেক জিনিস সঙ্গে নিয়া গিয়াছেন। জিনিসগুলি নৌকা হইতে নামাইয়া বাহিরের ভাণ্ডার ঘরে তোলা হইতেছে, এই সংবাদ যখন ঠাকুরমাকে একজন দিল, তখন তিনি যেন একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। জিনিসপত্র মদনগোপালের ভাণ্ডারে না তুলিয়া তোলা হইতেছে বাহিরের ভাণ্ডারে? কিশোরীর ছেলের ভাতে কি না এই অঘটন ঘটিল। কিশোরী কি ভুলিয়া গেল যে, এ বাড়িতে মদনগোপাল আছেন, এ বাড়ির যাহা কিছু উৎসব সে তো মদনগোপালেরই সেবার মহোৎসব। সেই মহোৎসবের প্রসাদান্নই তো ছেলের অন্নপ্রাশনে তাহার মুখে দেওয়া হইবে, না হইলে কিসের অন্নপ্রাশন?

বাহিরে নান্দিমুখের ব্যবস্থা হইতেছে, পুরোহিত দুর্গাচরণ চক্রবর্তী মহাশয় নান্দিমুখ ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের তত্ত্বাবধান করিতেছেন, হবিষ্যঘরে নান্দিমুখের জন্য ক্ষীরের নাড়ু ও তিলের নাড়ু পাক করা হইতেছে, ঠাকুরমা নাড়ু করা ছাড়িয়া দাওয়ায় আসিয়া বসিলেন, তাঁহার দুই চোখের জল তখন নিঃশব্দে গালের উপর ঝরিয়া পড়িতেছে।

চক্রবর্তী ঠাকুরের মা বউঠাকরুণ তাড়াতাড়ি আসিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন, বলিলেন, "ছি, ছি, স্বারির মা, কর কি? শুভ কাজে চোখের জল ফেলতে নেই। জিনিস বাইরের ভাণ্ডারে উঠেছে তাতে হয়েছে কি, এখন বহরপুরের হাটে লোক পাঠালে বেলাবেলিই জিনিস এসে পড়বে।"

ঘরের মধ্যে উনান হইতে সরা নামাইয়া ঠাকুরমা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া আছেন, আর আমরা আছি উঠানে দাঁড়াইয়া। কাহারও মুখে কথা নাই।

ইতিমধ্যে খবর পাইয়া বাবা ছুটিয়া আসিয়াছেন। "মা, মা" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে হবিষ্যান্ন ঘরের দাওয়ার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বোধ হয় তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, ঠাকুরমার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িবেন। কিন্তু এখন তো তাঁহাকে ছুঁইতে পারিবেন না, কাজেই দাওয়ার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মা বাড়ি কার? মদনগোপালেরই তো বাড়ি? বাহিরের ভাণ্ডারও মদনগোপালের, ভিতরের ভাণ্ডারও তাঁরই। একটাতে না তুলে যদি আর একটাতে জিনিস তোলা হয়ে থাকে, তাতে দোষ হল কি?"

এই হল বাবার সওয়ালের ধারা, বাবা ছিলেন খুব বড় উকীল।

ঠাকুরমা চোখের জল মুছিলেন, ধরা গলায় বলিলেন, "তাই তো, সবই তো তাঁরই, কিশোরী তো কিছু মন্দ করে নি।"

কিন্তু চক্রবর্তী ঠাকুরের মা এ কথায় সায় দিতে চাহিলেন না, তিনি বলিলেন, "বাহিরের ভাণ্ডারের জিনিস আবার কি করে মদনগোপালের ভাণ্ডারে তোলা হবে, ও বাইরের জিনিস বাইরেই থাক, বরং বহরপুরের হাটে এখনি একজন মানুষ পাঠাও, যা পায় তাই নিয়ে আসুক।"

কিন্তু এবার ঠাকুরমার মন স্থির হইয়া

গিয়াছে, তাঁহার মনে এখন আর কোন দ্বিধাই নাই। তিনি বলিলেন, "না, না, কিশোরী ঠিকই বলেছে, বাহির আর ভিতর সবখানেরই মালিক তো মদনগোপালই। বাহিরের ঘর কালই ভাল করে নিকানো হয়েছে। কিশোরী এতদূর থেকে রেল-গাড়ি করে জিনিস বয়ে এনেছে মদন-গোপালেরই ভোগের জন্য, সে জিনিস ভোগে লাগবে না, এ কী হয়?"

কাজেই সেইখানেই মীমাংসা হইয়া গেল, আনন্দের ভিতরেই উৎসব সমাধা হইল।

ঠাকুরমা ভীরু-প্রকৃতি ছিলেন বটে, কিন্তু অনেক সময় তাঁহার সাহস দেখিয়া অবাক হইতাম। রামদিয়ায় চারিপাশেই নমঃশূদ্র ও জেলে এবং মুসলমান প্রজা। হঠাৎ তাহাদের মধ্যে মারামারি বাধিয়া গেল। মাছমারা কোঁচ, দা, কুড়াল প্রভৃতি লইয়া উন্মত্তের মত যখন তাহারা একদল আর একদলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় অবগুণ্ঠিতা হইয়া ঠাকুরমা আসিয়া তাহাদের দুই দলের মাঝে দাঁড়াইয়াছেন অন্তঃপুর ছাড়িয়া একেবারে বিলের ধারে। "ওরে কর্তমা আইছেন" ফিস্ ফিস্ ধ্বনি উঠিল এবং অল্পক্ষণের ভিতরেই সমস্ত বিবাদের মীমাংসা হইয়া গেল।

ছেলেবেলায় ছেলেধরার ভয়ের সহিত ঠাকুরমার ভূতের ভয়ও ছিল। তাঁহার বয়স যখন ৬০ অথবা ৬৫ সেই সময়ের কথা বলিতেছি। রামদিয়ার বাড়িতে পুকুরের ধারে একটি প্রকাণ্ড গাবের গাছ ছিল, সেই গাছে একজন লোক গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছিল। লোকে বলিত, সে ওই গাছে ভূত হইয়া রহিয়াছে। পারতপক্ষে কেহ সেই গাছতলা দিয়া হাঁটিত না। একদিন ঠাকুরমা বিশেষ দরকারে রাত্রে একজন দাসীকে সঙ্গে নিয়া পুকুরের ওপারের এক বাড়িতে যাইতেছেন, গাবতলার কাছে আসিতেই গাছ হইতে যেন একটা যন্ত্রণার গোঙানী শব্দ শুনা গেল। শব্দ শোনা-মাত্র ঝিটি চীৎকার করিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল, কিন্তু ঠাকুরমা সেই গাছতলায় আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং মৃদু সান্ত্বনা স্বরে বলিতে লাগিলেন, "ভগবানের নাম কর, তিনি সব দুঃখ দূর করে দেবেন। মদনগোপাল, মদনগোপাল! তাঁকে ডাক, কোন ভয় নাই।" এই সব বলিতে বলিতে সেই গোঙানী ক্রমে থামিয়া গেল।

ঠাকুরমার সাহসের আর একটি কাহিনী তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি। রামদিয়ার কাছাকাছি স্থানে এক মুসলমান জমিদারের বাস ছিল। তাঁহার নাম ছিল সামসুল হুদা। তিনি হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। জমিদারীর দখল লইয়া তাঁহার সহিত কর্তার মামলা মোকদ্দমা লাগিয়াই থাকিত। কখনও কখনও অপরপক্ষের লোকেরা এপক্ষের ধানের ক্ষেতে আসিয়া রাতারাতি ধান কাটিয়া লইয়া যাইত, আবার এপক্ষের দুর্ধর্ষ নমঃশূদ্রেরা অপরপক্ষের উপর পাল্টা চড়াই হইত। এইভাবে বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল। একবার কর্তা যখন উত্তরে (রংপুর জেলায়) মদনগোপালের দেবত্রের কোষ্ঠা ও ধান প্রভৃতি আনিতে গিয়াছিলেন, তখন স্বয়ং সামসুল হুদা আসিয়া রামদিয়ার কাছাকাছি জমিজমা দখলের জন্য হানা দিলেন। প্রজাদের উপর উৎপীড়নের সীমা রহিল না। ঘটনা শুনিয়া ঠাকুরমা গোমস্তাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া পর্দার আড়ালে দাঁড়াইলেন। গোমস্তা বলিলেন, "মা, কর্তাবাবু বিদেশে, আপনার উপর এখন প্রজারক্ষার ভার। জোর করিয়া কবুলতি আদায় করিবার জন্য প্রজাদের উপর যে অত্যাচার হইতেছে তাহার সীমা নাই।" ঠাকুরমার কথা মত গোমস্তা ঠাকুরমার স্বাক্ষরিত এক পত্রে হুদাকে সসম্মানে আমন্ত্রণ করিলেন। সামসুল হুদা এই আমন্ত্রণ উপেক্ষা করেন নাই। পর্দার আড়ালে থাকিয়া ঠাকুরমা তাঁহাকে গোমস্তার প্রমুখাৎ বলিলেন, "আপনি উচ্চবংশীয় ও মহাবিশ্বান। দরিদ্র প্রজার উপর অত্যাচার আপনার হুকুমে হইতেছে, আমি কি করিয়া ইহা বিশ্বাস করিব।" সামসুল হুদা হিন্দু নারীর এই ভাষণে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সসম্মানে কুর্নিস করিয়া তখনই এক স্বীকৃতিপত্রে এই বলিয়া স্বাক্ষর করিলেন যে, "আজ হইতে এই পুরুষানুক্রমিক বিবাদ একেবারে শেষ হইয়া গেল।" ঠাকুরমাকেও সেই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইয়াছিল। কর্তার অনুপস্থিতিতে এইভাবে চুক্তিবন্ধ হইতে যদিও তাঁহার মনে বিশেষ দ্বিধা হইয়াছিল, কিন্তু অসহায় প্রজাদের বাঁচাইবার জন্য তিনি ইতঃস্তত না করিয়া মদনগোপালকে স্মরণ করিয়া স্বাক্ষর দিলেন। কর্তা বাড়ি আসিয়া এই ঘটনা শুনিয়া সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন এবং 'চৌধুরাণী' বলিয়া ঠাকুরমাকে উপহাস করিয়াছিলেন।

আমি কতবার ঠাকুরমাকে দেখিয়াছি ও তাঁহার সহিত দিবারাত্রি একত্র থাকিয়াছি, সেই দেবীদুর্লভ মূর্তি মনে যেন অঙ্কিত হইয়া আছে। সমস্ত রাত্রি ঠাকুরমা বুকের উপর মালা রাখিয়া বিছানায় শুইয়া মালা জপ করিতেন, আমি তাঁহার পাশে শুইয়া আছি, যখনই জাগিতেছি, দেখিতেছি ঠাকুরমার মৃদু মৃদু ঠোঁট নড়িতেছে, ধীরে ধীরে মালা সরাইতেছেন। আশ্চর্য হইয়া ভাবিতাম, "ঠাকুরমার চোখে কি ঘুম নাই?"

একবার কলিকাতায় ঠাকুরমার ফটো তোলার জন্য বাবা ফটোগ্রাফার আনিয়াছেন, বলিলেন, "মা, একটা ভাল কাপড় পরে আসুন।" ঠাকুরমা আমার একখানি ময়ূর-কণ্ঠী চেলী সম্মুখে দেখিয়া তাহাই পরিলেন এবং তাহা পরিয়াই ফটো তুলিলেন। ঠাকুরমার সেই একখানি মাত্রই ফটো, সেইখানিই তাঁহার বইতে দেওয়া হইয়াছে।

ছেলেবেলায় আমি কার্পেটে অক্ষর তুলিব বলিয়া বড় একখানি কার্পেট কিনিয়া আনিয়াছিলাম, ঠাকুরমা তখন কলিকাতায় ছিলেন। কার্পেট দেখিয়া বলিলেন, "এতে কি হয়?" আমি বলিলাম, "অক্ষর তোলা হয়, ছবি তোলা হয় আরও অনেক লতা ফুলও তোলা হয়।" ঠাকুরমা আমার তোলা অক্ষর প্রভৃতি দেখিয়া কি যে ভাবিলেন জানি না। সেদিন বাগবাজারে মামার বাড়ি গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে, প্রকাণ্ড কার্পেট ভরিয়া ঠাকুরমা বড় বড় স্বরচিত অক্ষরে এক কবিতা তুলিয়াছেন,

"ওহে প্রভু রাধাকান্ত কে জানে
তোমার অন্ত,
তুমি আদি অন্তের অন্তর্যামী।" প্রভৃতি দেখিয়া আমার কান্না আসিল। এত বড় কার্পেটটা ঠাকুরমা নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। আমি যখন রাগারাগি করিতে লাগিলাম, দেখি ঠাকুরমা মৃদু মৃদু হাসিতেছেন, বলিলেন, "পচাল পাড়িসনে। তোর লেখার চেয়ে ভাল লেখাই হয়েছে।" বাবা ঠাকুরমার লেখা সেই কার্পেটখানি সযত্নে বাঁধাইয়া রাখিয়াছিলেন।

ঠাকুরমা যখন পরলোকগমন করেন, আমরা তখন দেওঘরে ছিলাম। তাই শেষ সময়ে ঠাকুরমার সহিত বাবার দেখা হয় নাই। জ্যাঠামহাশয় অত্যন্ত ধুমধাম ভালবাসিতেন। ঠাকুরমা একজ্বরী হইয়াছিলেন ৭।৮ দিন, তখন ডাক্তারের মতানুসারে তাঁহাকে গঙ্গাযাত্রা করাইবার জন্য জ্যাঠামহাশয় পাল্কী করিয়া স্বরূপগঞ্জের বাগান বাটীতে নিয়া গিয়াছিলেন। সঙ্গে গিয়াছিলেন পিসিমা ও জ্যাঠাইমা প্রভৃতি আত্মীয়গণ, দুইজন কবিরাজ এবং দুই দল কীর্তনীয়া। ইহার কয়েক দিন আগেই বাবার কাছে ঠাকুরমার হাতে লেখা এক চিঠি আসিয়াছিল, চিঠিতে ঠাকুরমা বাবার শারীরিক কুশল ও খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ঠিকমত হইতেছে কি না জানিতে চাহিয়াছিলেন। বাবা ঠাকুরমার হাতের রান্না তরকারী খাইতে ভালবাসিতেন বলিয়া বাবা কাছে গেলে তখনও তাঁহার জন্য তিনি নিজে হাতে রান্না করিতেন।

বাবা টেলিগ্রাম পাইয়াই রওনা হইয়াছিলেন, কিন্তু সময়মত পৌঁছিতে পারেন নাই। "মা নৌকায় করে গঙ্গায় যাবেন কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুরমা যখন ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানান, তখনও একবার এদিক ওদিক চাহিয়াছিলেন, পিসিমার বিশ্বাস তখন তিনি বাবাকে খুঁজিয়াছিলেন। আবার যখন 'অর্ধনাভি গঙ্গাজলে' নামাইবার জন্য জ্যাঠামহাশয় তাঁহার সম্মতি চাহিলেন, তখনও তিনি ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়াছিলেন।

এই সমস্ত বিবরণ শুনিয়া বাবা জ্যাঠামহাশয়ের উপর রাগিয়া গেলেন। বলিলেন, "দাদার যেমন কাণ্ড, টানাটানি করেই মাকে মেরে ফেল্লেন। আমি মার এ রকম জ্বর কতবার হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়ে আরাম করেছি।"

জ্যাঠামহাশয়কে বাবা অত্যন্ত সম্মান করিতেন। কিন্তু এই ব্যাপারে হয়তো কিছু কটুকথা বলিয়া থাকিবেন, তাই জ্যাঠামহাশয় বাবাকে বলিলেন, "কিশোরী, মার একানব্বই বৎসর হয়েছিল, সজ্ঞানে চলে গিয়েছেন, এতে দুঃখের কিছু নেই।" তবুও বাবা আস্তে আস্তে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, "একশো বছর যদি বাঁচতেন, তাতেই বা কি দোষ হ'ত!"

স্বামী ত্রিগুণাতীত

শ্রীআশুতোষ মিত্র

স্বামী ত্রিগুণাতীত বা সারদা মহারাজ শ্রীঠাকুরের দ্বাদশটি অন্তরঙ্গ ভক্ত মধ্যে গণ্য। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে সারদা মহারাজের গর্ভধারিণী তাঁহাকে যে নামে সম্বোধন করিতেন, সেই নামে বর্ণনা করা হইয়াছে; অর্থাৎ 'প্রসন্ন' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সারদা মহারাজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত প্রণেতা শ্রীম-র ছাত্র ছিলেন, সারদা মহারাজ লেখকের মধ্যমাগ্রজ ছিলেন এবং তাঁহার কৃপায় সে মঠে সংযুক্ত হয় ও শ্রীমার সন্তান মধ্যে গণ্য হয়।

সারদা মহারাজ শুনিয়াছি বরাহনগর মঠে চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করেন। পরে কয়েকটি জিলায় দুর্ভিক্ষ কার্যে ব্রতী হয়েন। তিনি ভারতের বহু স্থান এমনকি, তিব্বত পর্যন্তও ভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণের কিছু কিছু বৃত্তান্ত সেকালের Indian Mirror নামক সংবাদ-পত্রে প্রকাশিতও হইয়াছিল।

স্বামীজীর (স্বামী বিবেকানন্দের) আদেশে সারদা মহারাজ কলিকাতা হইতে 'উদ্বোধন' নামক পাক্ষিক (পরে মাসিক) পত্র বাঙলা ভাষায় সম্পাদন করেন। প্রত্যুতঃ তাঁহারই দ্বারা ঐ পত্রখানি সম্পাদিত, প্রকাশিত এবং মুদ্রিতও হয়। ঐ পত্রে স্বামীজির যাবতীয় বাঙলা প্রবন্ধ প্রকাশ পায়।

সারদা মহারাজ কয়েকবার শ্রীমাকে তাঁহার জন্মভূমি জয়রামবাটীতে লইয়া যান। একবারের বৃত্তান্ত এখানে বর্ণনা করিতেছি। সেকালে বেশীরভাগ বর্ধমান হইয়া যাইতে হইত। শ্রীমার জন্য একখানি গরুরগাড়ি ভাড়া করিয়া উহাতে শ্রীমা আদিকে বসাইয়া বর্ধমান হইতে দামোদর নদ পার হইয়া যাইতেছেন, আর সারদা মহারাজ নিজ স্কন্ধে একখানি বংশ-যষ্ঠী বহন করিয়া পদব্রজে গাড়ির অগ্রে যাইতেছেন। রাত্রিকাল—সারদা মহারাজ চলিতে চলিতে দেখিতে পান রাস্তার এক ধার হইতে অপর ধার পর্যন্ত পূর্ব বর্ষায় ভাঙিগয়া যাওয়ায় জল একদিক হইতে অপর দিকে যাইতেছে এবং সে ভাঙ্গন পার হইতে গাড়ির পক্ষে বিশেষ কণ্টকর আর সে ঝটকানিতে শ্রীমার নিদ্রাও ভাঙিগয়া যাইতে পারে। ইহা যেমন মনে হওয়া, অমনি তিনি নিজ স্থূলদেহ সেই ভাঙ্গনের মধ্যে উপুড় করিয়া শোয়াইয়া রাখেন, যাহাতে গাড়িখানি বিনা ঝটকানিতে তাঁহার শরীরের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পারে। সারদা মহারাজ নিজ শরীর দিয়া এমন কি হয়ত নিজ প্রাণ দিয়া শ্রীমার নিরাপদের জন্য সব করিলেন বটে, কিন্তু একবার ভাবিলেন না যে, যাহা ভাবা যায়, সব সময় কি তাহাই হয়? গাড়ি সেই ভাঙ্গনের নিকট আসিবামাত্র নিদ্রিতা শ্রীমার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তিনি গাড়োয়ানকে ডাকিয়া তাহার দ্বারা গাড়ি থামাইয়া স্বয়ং গাড়ি হইতে নামিয়া সারদা মহারাজকে উঠাইয়া তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"বাবা তুমি কি মনে করেছিলে যে, কল্‌কেতা থেকে মাটির ঠাকুর নিয়ে যাচ্ছ, আর তা হলেও তুমি মরে গেলে কে সে ঠাকুর পৌঁছাত? সারদা মহারাজের ঐ ভর্ৎসনায় চৈতন্য হয় এবং তৎক্ষণাৎ শ্রীমার পদরজ নিজ মস্তকে ধারণ করিয়া উত্তর করেন—"মা, ক্ষমা করুন—আমি ত মানুষ, আপনার মহিমা বুঝতে পারিনি।

হরিমহারাজের (স্বামী তুরিয়ানন্দের) আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনে সারদা মহারাজ মঠ হইতে তথায় প্রেরিত হয়েন। তিনি উদ্বোধনের ভার অপরকে সমর্পণ করিয়া স্যানফ্রান্সিস্কো শহরে গিয়া ত্বরায় স্বীয় অধ্যবসায়ে একটি হিন্দু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই হইল আমেরিকার প্রথম হিন্দু মন্দির। এই মন্দিরে কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি ধারাবাহিকরূপে ধর্ম প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। অতঃপর একদিন যখন তিনি তাঁহার বক্তৃতার মধ্যাংশে আসিয়াছিলেন, সে সময় অকস্মাৎ শ্রোতৃবর্গের মধ্য হইতে একটি বোমার আঘাত তাঁহার শরীরে লাগে এবং তাঁহাকে নিকটস্থ হাসপাতালে অপসারণ করা হয়—তথায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে। আততায়ীও বোমার আঘাতে তৎক্ষণাৎ মন্দির-মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শুনা গিয়াছে, কিছুদিন পূর্বে সে সারদা মহারাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার নিকট কাকুতিমিনতি করে এবং তাহাকে প্রত্যাখ্যান করায় সে ঐ কাজ করে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

৭৩

মানুষের আয়-পয় সংক্রান্ত একটা বিশ্বাস সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে। কোনো নূতন লোক সংসারে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সংসার যদি সৌভাগ্যে ও সম্পদে সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে, তা হ'লে নবাগত অথবা নবাগতাকে পয়মন্ত ব'লে বিবেচিত করা হয়। পক্ষান্তরে, প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকলে তাদের বলা হয় অপয়া। এই পয়া ও অপয়া শব্দ দুটি নবাগতা বধূর সম্পর্কেই বিশেষভাবে লক্ষিত ও প্রযুক্ত হয়।

শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই নয়, গৃহপালিত পশুপক্ষী, এমন কি, বৃক্ষলতার ক্ষেত্রেও, এই পয়া-অপয়া শব্দ দুটি প্রতীত এবং প্রযুক্ত হয়। নারিকেল বৃক্ষে প্রথম ফল ধরার সঙ্গে সঙ্গে সংসারে যদি একাধিক মৃত্যু, বিশেষত অকাল মৃত্যু, অথবা অন্য কোনোপ্রকার দুর্ঘটনা ঘটে, তা হ'লে সাধারণ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকেও সেই অপয়া নারিকেল গাছের মূলোচ্ছেদ ক'রে ফেলে তার অশুভ প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে দেখা যায়।

এ বিশ্বাসের মূলে সত্য সত্যই কোনো সত্য আছে অথবা নেই, সে তর্ক তুলছিনে। দীর্ঘকাল যাবৎ যে অগণ্য ঘটনা চোখে পড়ার ফলে এই বিশ্বাস উৎপন্ন হয়েছে, আমার বিশ্বাস, সে সমস্ত ঘটনাই কাকতালীয় শ্রেণীর ঘটনা।

কিন্তু সে যাই হ'ক না কেন, পয়া-অপয়ার কথা আমি বিশ্বাস করি আর না-ই করি, বিশ্বাস করতেন যোগীন্দ্রনাথ,—অন্তত তাঁর পুত্রবধূ মলিনার সম্পর্কে। পুত্রের বিবাহের অব্যবহিত পরেই তাঁর সংসারের সৌভাগ্যের রথচক্রে যে ত্বরিত গতিবৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল, মনে প্রাণে তিনি বিশ্বাস করতেন তা একমাত্র তাঁর আদরের পুত্রবধূর কল্যাণে। স্নেহাধিক্যের প্রভাবে তিনি তাঁর প্রবল কর্মশক্তিকে বেশ খানিকটা বিস্মৃত হতেন।

এ কথা তিনি সর্বসমক্ষে মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত ক'রে আনন্দলাভ করতেন। একবার এক পারিবারিক বৈঠকে আমার দাদাকে বলেছিলেন, "বড় বেহাই মশায়, যে মেয়ে সংসারে প্রবেশ করার পর সংসারে আয়-পয় বেড়ে যায়, ধুলোমুঠো ধরলে সোনামুঠো হয়, সে মেয়ের ভারি খাতির। আমাদের সংসারে আপনার ভাইঝির ভারি খাতির।"

আমার কন্যার বিবাহের পর যোগীন্দ্রনাথ সাড়ে আট বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সাড়ে আট বৎসরের মধ্যে তাঁর আর্থিক সঙ্গতি অন্তত চতুর্দশ গুণ বৃদ্ধিলাভ করেছিল। এ কথা প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রগণ কর্তৃক সাকসেশন সার্টিফিকেটের (Succession Certificate) জন্য যে দরখাস্ত করা হয়েছিল, তার সংলগ্ন সম্পত্তির তালিকা ও মূল্যনিরূপণ থেকে।

১৯২৫ সালের মাঝামাঝি। কার্যোপলক্ষে দু-চার দিনের জন্য ভাগলপুর থেকে কলিকাতায় এসেছি। যোগীন্দ্রনাথের ব্যবসায়-বাণিজ্য কাজ-কারবার তখন উন্নতির উল্লসিত ছন্দে চলেছে। যেদিকে তিনি বাতি জ্বালান, সেই দিকই উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে।

একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছি, কথায় কথায় তিনি বললেন, "বেহাই মশায়, অবাঙালির দেশে অত দূরে অবস্থান ক'রে আপনার সঙ্গ থেকে আমাদের বঞ্চিত করছেন। কলকাতায় এসে ব্যবসা আরম্ভ করুন।"

বললাম, "কি ব্যবসা? ওকালতি?"

মাথা নেড়ে যোগীন্দ্রনাথ বললেন, "না, না, ওকালতি কেন?—ওকালতি ত' করছেনই সেখানে। অন্য ব্যবসার কথা বলছি।"

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যোগীন্দ্রনাথ সফল মানুষ, ব্যবসায়ের গূঢ় তত্ত্ব তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে, তিনি ত সহজেই ব্যবসায়ের কথা বলবেন। কিন্তু তাঁর হাতের যে জাল জলের মাছকে ডাঙ্গায় টেনে নিয়ে আসে, আমার হাতে সেই জাল ডাঙ্গার মানুষকে জলে টেনে নিয়ে গিয়ে না ডোবায়। নিজের সে অক্ষমতার এবং দুশ্চিন্তার কথা না তুলে বললাম, "ব্যবসা করব, কিন্তু অর্থ কোথায়?"

যোগীন্দ্রনাথ বললেন, "ধরুন, অর্থের যদি অভাব না ঘটে?"

বললাম, "কিন্তু শুধু অর্থেই ত' ব্যবসা হয় না, সামর্থ্যও ত' চাই।"

যোগীন্দ্রনাথ হাসতে লাগলেন, বললেন, "শুধু অর্থে ব্যবসা হয় না ব'লেই ত' আপনাকে বলছি। অপরের অর্থের সঙ্গে আপনার সামর্থ্যের যদি যোগ হয়, তা হ'লে ব্যবসা কেন চলবে না বলুন?"

এই 'অপর' যে তিনি নিজে ছাড়া অপর কেউ নয়, তা বুঝতে অবশ্য বাকি ছিল না; বাকি ছিল শুধু বুঝতে আমার সামর্থ্যের কথা। বিস্মিত কণ্ঠে বললাম, "আমার সামর্থ্য কোন্ ব্যবসায়ের মধ্যে খুঁজে পেলেন?"

কৌতুকের হাস্যে যোগীন্দ্রনাথের দুই চক্ষু কুঞ্চিত হ'য়ে উঠল; বললেন, "সাহিত্যের ব্যবসায়ের মধ্যে। আপনি নিজে একজন সাহিত্যিক, সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকে আপনার বন্ধুবান্ধব আছেন, শরৎ চাটুজ্জে আপনার আত্মীয়,—আপনার সামর্থ্যের অভাব কোথায়?"

কথাটা তখন খোলাখুলিভাবে অগ্রসর হ'তে লাগল। সাহিত্যের ব্যবসায়ে তিনি যে, গৌরী সেনের ভূমিকা গ্রহণ করবেন, সে কথা আর অনুক্ত রইল না। কাজের মানুষ,—মুখে মুখে মোটামুটিভাবে একটা পরিকল্পনা তখনি তখনি গ'ড়ে তুললেন। প্রথমে একটা মাসিক পত্র, সঙ্গে সঙ্গে দু-চারখানি সুনির্বাচিত গ্রন্থের প্রকাশ, ক্রমশ গ্রন্থ প্রকাশ বিভাগের বিস্তার, তারপর একটি পুস্তক বিক্রয়ের বিপণি, এবং শেষ পর্যন্ত একটি উচ্চাঙ্গের দৈনিক সংবাদপত্র। এ সকল কাজ যথাসময়ে এবং যথোচিতভাবে নির্বাহের জন্য নিজস্ব ছাপাখানার একান্ত প্রয়োজন,—সুতরাং সর্বপ্রথমে একটি ছাপাখানা।

শুধু ব্যবসাই উদ্দেশ্য নয়, খবরের কাগজ প্রকাশ বিষয়ে তাঁর গোপন মনে একটা যে প্রবল সখ বর্তমান ছিল, সে কথা ধরা পড়তেও বাকি রইল না।

আমি দু-চার কথায় অতি সংক্ষেপে মোটামুটিভাবে তাঁর পরিকল্পনার কথা বললাম। তিনি কিন্তু এমন গুছিয়ে-গাছিয়ে সম্ভাব্যতার লোভনীয় রঙে এমন

পরিপাটিভাবে রঞ্জিত ক'রে তাঁর পরিকল্পনার সুপরিণতির চিত্র অঙ্কিত করলেন যে, আমি থমথমিয়ে গেলাম। প্রস্তাবটা যে লোভ জাগিয়ে তোলবার পক্ষে যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক তাতে আর সন্দেহ নেই। কলিকাতার প্রতি আমার চিরদিনই আকর্ষণ আছে। কিছুকাল পূর্বে চিত্তরঞ্জন আমাকে দুবার কলিকাতায় আহবান করেছিলেন; দুবারই ভাগলপুর আমাকে তার আশ্রয়ে আটকে রেখেছিল। এবারকার আকর্ষণ কিন্তু প্রবলতর, কারণ এবার আহবান সাহিত্যের উপবনে,—মাসিক পত্রের বীণা বাজাবার জন্যে।

মাসিকপত্র সম্পাদনার একটা উগ্র অভিলাষ চিরদিনই আমার মনে-মনে, অন্তত নিশ্চেতন মনে, নিশ্চয়ই ছিল। প্রথমে সে বিষয়ে হাতেখড়ি নিয়েছিলাম ভবানীপুর সাহিত্য সমিতির হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা 'তরণীতে'। তারপর হাত পাকাই বন্ধুবর ফণীন্দ্রনাথ পাল সম্পাদিত 'যমুনা' মাসিক পত্রিকায়। এবার একেবারে খোদ নিজের দায়িত্বে সম্পাদন করবার আহবান। সুতরাং প্রস্তাব শুনে খানিকটা যদি থমথমিয়ে গিয়ে থাকি, তা'তে এমন কিছু গুরুতর অপরাধ হয়নি।

আমার দ্বিধাগ্রস্ত ভাব লক্ষ্য ক'রে যোগীন্দ্রনাথ বললেন, "রাজি হ'য়ে যান

টুকরো কথা (১১)

'কোন ঠাকুর? অবন ঠাকুর—ছবি লেখে।'—সুখী সচ্ছল খুশিভরা একদাবাঙলার শতকান্ত ছবি। সেই শতকান্ত বর্ণ—এবং ভাষা-চিত্রের কণ্ঠে দরবারী খেয়াল সুরের, কখনো নীরব, কখনো বাঙ্ময় মূর্ছনা। অবনীন্দ্রনাথের বাঙলাদেশকে আমরা দেখিনি। কেউ দেখেনি, এক তিনি ছাড়া। শুধু চোখের দেখা তো নয়, মনপ্রাণ কানায় কানায় ভরে নিয়ে অফুরন্ত, অন্তহীন দেখা; বর্ণে গন্ধে গানে জীবনের ঐশ্বর্যরস আকণ্ঠ পান করে দেখা। বিদীর্ণ বাঙলার হৃতশ্রী এই শূন্য উঠোনেই জীবনকে তবু ধন্য মনে হয়—আনন্দলোকের আচার্য শিল্পীকে দেখলাম আমরা। ভারত শিল্পের একাল-সেকাল দুই তীরের মধ্যে সাঁকো পড়ল। দিনে দিনে আর এক দীর্ঘ আশি বছর ধরে গড়ে উঠলো এক শিল্পের প্রাসাদ। রূপকথায় চিত্রিত দেয়াল, প্রকোষ্ঠে নিঃশেষিত আতরের খোশবো, বারান্দায় দীর্ঘ থামের ছায়ায় বসে এক চিরকিশোর কাঠে কুটোয় কুটুম-কাটাম গড়ে। রাত্রি দুই প্রহরে সারেঙ্গীর মৃদু আলাপ ভেসে আসে। শেষ প্রহরের ক্লান্ত নূপুর থেমে যায়। জোড়া-সাঁকোর অবন ঠাকুর এই আনন্দের প্রাসাদখানি গড়ে রেখে গেলেন আমাদের জন্য। কেননা বাঙলায় মোগলযুগের শেষ সম্রাট তিনি।

গাছেরও ভাষা আছে। সেই অব্যক্ত ভাষার লিপি উদ্ধার করেছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র। বিজ্ঞানে অসামান্য বলেই পৃথিবী তাঁকে জানে। লেখক হিসেবেও তিনি অসামান্য সেকথা জানে শুধু বাঙালী। গাছের ভাষা শুনতে পায় যে সংবেদী মন, একমাত্র তার হাতেই 'অব্যক্তের' মতো সাহিত্য গ্রন্থ রচিত হওয়া সম্ভব। তিরিশ বছর পর নতুন সংস্করণ হয়েছে!

বেদান্ত এবং শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ইদানীং কোনো কোনো খ্যাতিমান ইউরোপীয় লেখকের মন আকৃষ্ট হয়েছে সবাই জানেন। বাঙালী আধুনিক লেখকদের মধ্যে এ বিষয়ে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তই প্রথম এবং প্রধান। পরিণত বয়েসের ভক্তিস্নিগ্ধ ভাষায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের যে মহাজীবন কাহিনী তিনি রচনা করছেন শ্রী-ম কথিত কথামৃতের পর তার তুলনা নেই। মাসিকপত্রে প্রকাশের সময় প্রবল আলোড়ন তুলেছে 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ'।

অচিন্ত্যকুমার জানিয়েছেন কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তাঁর শরৎচন্দ্র-বক্তৃতার বিষয় হবে 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ'।

হঠাৎ মনে হয় বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ দপ্তরের দৈন্যদশা। কথাটা সত্যি নয়। প্রবোধেন্দু ঠাকুরের 'কাদম্বরী'-অনুবাদ সাহিত্যের এ দপ্তরকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। বাণ-ভট্টের এই প্রাচীন সংস্কৃতউপন্যাসখানি অনুবাদে পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ অনুবাদকের সাধুবাদ করেছিলেন।

ইংরেজি সাহিত্যে খ্যাতিমান, মার্কিণ প্রবাসী বাঙালী ভাগ্যান্বেষী—ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের তিনটি ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদও এই সঙ্গে স্মরণীয়। ১৯৩৬ সালে রয়টার যখন তাঁর আত্মহত্যার সংবাদ দিলেন তার আগেই তিনি যশস্বী বলে সম্মান পেয়েছেন। তাঁর শিশু উপন্যাস 'গে নেক্' ১৯২৭ সালে শিশু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বই বলে আমেরিকায় পুরস্কার পেয়েছিল। 'চিত্রগ্রীব' নামে এ বইয়ের অনুবাদ করেছেন সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুবাদে এমন একটা স্বচ্ছন্দ সরস মৌলিক রচনার স্বাদ কদাচিৎ পাওয়া যায়। 'যূথপতি' (উপন্যাস) আর 'ঘরের ছেলে বাইরে' (আত্মজীবনী)—এ দুখানিও অনুবাদ। এসব বই সেই জাতের যা ছোটদের আগে বড়দের পড়লে ভালো হয়।

এ ছাড়া নিগ্রো লেখক রিচার্ড রাইট-এর উপন্যাস 'ব্ল্যাক বয়' অনুবাদ করেছেন নিখিল সেন। অভিশপ্ত এক নিগ্রো বালকের হৃদয়-বিদারক কাহিনী।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ বছর জগত্তারিণী পদক পেলেন কবি শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর এবার সত্তর বছর পূর্ণ হ'ল।

'কারার প্রার্থনা' নামে জগন্নাথ চক্রবর্তীর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম বই 'নগর সন্ধ্যা' পাওয়া যায় না। কাব্যগ্রন্থমালা পর্যায়ে বিমলচন্দ্র ঘোষের কবিতা ৩য় খণ্ডের নাম 'ভুখা ভারত'। দশ বছর আগে প্রকাশিত তাঁর 'দাক্ষিণায়ন' গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য হলেও সিগনেট বুকশপে কয়েকটি কপি আছে। আর প্রবোধেন্দু ঠাকুরের 'পুষ্পমেঘ'।

'কবিগুরু গ্যেটে'-র লেখক কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের সাহিত্য বিষয়ক রচনার একটি বৃহৎ সংগ্রহ প্রকাশিত হচ্ছে 'শাশ্বত বঙ্গ' নামে। মনীষী লেখকের এই উল্লেখযোগ্য সংকলনটি সিগনেট বুকশপে পাওয়া যাবে। তাছাড়া আর নতুন প্রবন্ধের বই : (১) বঙ্কিম মানস—অরবিন্দ পোদ্দার (মার্কসীয় বিচার পদ্ধতিতে বঙ্কিম-চন্দ্রের বিশ্লেষণ) এবং (২) সময় ও সাহিত্য—কিরণশংকর সেনগুপ্ত (কাব্য ও সাহিত্য জিজ্ঞাসার আলোচনা)। আর পাওয়া যাচ্ছে, নতুন সংস্করণে, অমিত সেনের 'ইতিহাসের ধারা'।

প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ থেকে কী করে মানুষের উদ্ভব হল—এই কঠিন বিষয়ে ছোটদের আগ্রহ জাগিয়ে তোলা সহজ ব্যাপার নয়। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'যে গল্পের শেষ নেই' বইটিতে সেই অসাধ্য সাধন করা হয়েছে। প্রবোধকুমার সান্যালের 'নূতন নূতন দেশ' বইটিও ছোটদের ভালো লাগবে। ভ্রমণ সংক্রান্ত।

সরস ব্যক্তিগত প্রবন্ধের মধ্যে একটি নতুন সংযোজন—অনুকূলচন্দ্র রায়ের 'যদি'।

গল্প উপন্যাস ছাড়া বাংলা সাহিত্যের অন্য যে বিস্তীর্ণ বিভাগটি আছে তাতে গৌরকিশোর ঘোষের 'এই কলকাতায়'-র মতো এমন উল্লেখ-যোগ্য বই খুব কমই বেরিয়েছে। পড়তে পড়তে সৈয়দ মুজতবা আলীর সহজসুরের খোশগল্প 'দেশেবিদেশে'র কথা মনে পড়ে। লেখকের প্রথম প্রকাশিত এই বই যে আলী সাহেবের পরিচ্ছন্ন কৌতুক আর মনোহারী প্রসাদগুণে বহুল পরিমাণে আত্মসাৎ করতে পেরেছে এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

রামমোহন রায়ের পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে একশোখানা বইয়ের মধ্যে স্থান হতে পারে—এমন কোনো গ্রন্থের নাম কি আপনার মনে আছে? আপনার অভিমত জানালে সিগনেট প্রেস কৃতজ্ঞ বোধ করবেন।

বেহাই মশায়! বেশি ভেবে চিন্তে কোনো কাজ করা যায় না। ওটুকু দ্বিধা ত্যাগ করুন।"

যেটুকু দ্বিধা মনের মধ্যে ছিল তা ত্যাগ করলে ভাগলপুর ত্যাগ করবার প্রস্তাবটাই ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু সে কথা ব'লে বেহাই মশায়ের মনে দুঃখ না দিয়ে বললাম, "আচ্ছা, তা হ'লে সামান্য একটু ভেবে-চিন্তে দেখি।"

ভাগলপুরে ফিরে গিয়ে বেহাই মশায়কে খান-দুই চিঠি দিলাম, কিন্তু সাহিত্য-ব্যবসায়ের বিষয়ে টুঁ-শব্দ করলাম না। দ্বিধা, কলিকাতায় যতটুকু উৎপন্ন হ'য়েছিল, তা প্রায় ত্যাগ ক'রেই ফেলেছি। মুন্দই-মুন্দালেহ্ এবং আপীলাণ্ট্-রিস্পডাণ্ট্দের মুখ দেখি, আর মনে-মনে বলি, তোমাদের মায়া কাটিয়ে সহজে ভাগলপুর ছেড়ে যাব, এত বড় পাষাণ আমি নই।

মাস দুই পরে বেহাই মশায়ের এক চিঠি পেয়ে কিন্তু চক্ষু স্থির হ'ল! তিনি লিখে-ছেন, "একটি ছোট-খাটো প্রিণ্টিং মেশিন কিনিয়া আমার কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। এবার আপনার আসিবার পালা। আপনি আসিলেই প্রয়োজন মতো এবং আপনার উপদেশ মতো সকল ব্যবস্থা করিব।"

কি বিপদেই না পড়া গেল! কাজের মানুষের সংগে অকেজো মানুষের কর্ম-যোগের মত কর্মভোগ আর দ্বিতীয় কিছু নেই। অনেক ভেবে-চিন্তে অনেক কায়দা-কৌশল ক'রে এমন গোলমেলে একটা উত্তর দিলাম, যার যথার্থ মর্ম নির্ণয় করা, যোগীন্দ্রনাথের পক্ষে ত কথাই নেই, আমার পক্ষেও দুরূহ। যত্নপূর্বক কয়েকবার আমার উত্তর পাঠ ক'রে যদি কিছু তিনি একান্তই বুঝে থাকেন ত এইটুকুই হয়ত বুঝেছিলেন যে, কলিকাতায় আলোচনার পর যেটুকু দ্বিধা আমার মনে লেগে ছিল ব'লে তাঁর মনে হয়েছিল, তার কিয়দংশ তখনও আমার মনে যাই যাই করছিল।

১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে বড়দিনের ছুটিতে কলকাতায় এসেছি। ফেরবার সময়ে মলিনাকে এবং তার শিশুপুত্র ললিতকুমারকে ভাগলপুরে নিয়ে যাব,—অনেকদিন মলিনা পিত্রালয়ে যায়নি। ৪ঠা জানুয়ারী সন্ধ্যার ট্রেনে যাওয়া স্থির হ'য়েছে।

৪ঠা জানুয়ারী অপরাহ্নে পটলডাঙ্গা স্ট্রীটে যোগীন্দ্রনাথের গৃহে উপস্থিত হয়েছি, আর ঘণ্টাখানেক পরে রওনা হ'তে হবে। আমরা দুই বৈবাহিকে নানা বিষয়ে কথোপকথন করছি, তার মধ্যে কথায় কথায় যোগীন্দ্রনাথ বললেন, "দেখুন বেহাই মশায়, আপনার মেয়েটির মতো অমন বোকা মেয়ে সমস্ত ভূভারতে আমি আর একটিও দেখিনি। লোকে চিরকাল ওকে ঠকিয়ে খাবে, ও কিন্তু কোনোদিন কাউকে ঠকাবে না।"

উত্তরে আমি বললাম, "আপনি যে কথা বললেন বেহাই মশায়, তার মধ্যে সব আশীর্বাদ ভরা আছে। ভগবানের অনুগ্রহে আপনার কথা যেন সত্যি হয়।"

ক্ষণকাল পরে গাড়িতে তুলে দিয়ে আদরিণী পুত্রবধূর মাথায় হাত বুলিয়ে যোগীন্দ্রনাথ বললেন, "বাবা নিতে এসেছেন, যাচ্ছ যাও; আমি কিন্তু শীঘ্রই তোমাকে নিয়ে আসছি।"

তাকিয়ে দেখি শ্বশুর-পুত্রবধূ উভয়েরই চক্ষু চক্চক্ করছে।

পরদিন অতি প্রত্যুষে ভাগলপুরে পৌঁছলাম। প্রচণ্ড শীতের দিন, রাজপথে লোক-চলাচল তখনো প্রচুর হয়নি। গৃহে পৌঁছে দেখি আমাদের প্রত্যাশায় অত ভোরেও বাড়িশুদ্ধ সকলে জাগ্রত হ'য়ে অপেক্ষা করছে। আমাদের গাড়ি কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করা মাত্র হর্ষের একটা কলধ্বনি উত্থিত হ'ল। মাতাঠাকুরাণী তাঁর অতি আদরের পৌত্রীর জন্য ব্যস্ত হ'লেন; মাতা-ঠাকুরাণীর পুত্রবধূ কন্যার ক্রোড় থেকে তাঁর শিশু-দৌহিত্রকে ছিনিয়ে নিয়ে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। হাস্যে কৌতুকে গল্পে কথোপকথনে দেখতে দেখতে গৃহ চকিত হ'য় উঠল।

মাতাঠাকুরাণী মাঝে মাঝে তাগাদা দিচ্ছেন, "সমস্ত রাত্রি তোমরা গাড়িতে এসেছ, কাপড় বদলে মুখ-হাত ধুয়ে চা-টা খাও।" কিন্তু হয়ত মাতাঠাকুরাণী নিজেই আবার নূতন প্রসংগের উত্থাপনের দ্বারা প্রথম আনন্দের সুযোগকে বাড়িয়ে তুলছেন।

তখনো আমি পায়ের জুতা উন্মোচিত করিনি, তখনো মলিনা তার ছোট ভাই-বোনদের আদরআপ্যায়ন শেষ করবার সময় পায়নি, এমন সময়ে বাহিরের বারান্দায় হলঘরের দরজায় কড়া ন'ড়ে উঠল, কট্‌কট্ কট্‌কট্, আর সংগে সংগে ডাক শোনা গেল, "তার হ্যায় বাবুজী!"

তার হ্যায়?—একটা অনির্ণেয় আতঙ্কে আনন্দমুখর গৃহ একেবারে মূক হ'য়ে গেল! এত সকালে হঠাৎ কিসের তার! তাড়াতাড়ি দরজা খুলে রসিদে সই ক'রে টেলিগ্রাম খুলে দেখে মানে বুঝতে পারিনে! কথাগুলো যেন দৃষ্টির সামনে জড়িয়ে যেতে আরম্ভ করেছে!

Father expired last night. Please come with Bowdidi soon. Sudhir.

কি সর্বনাশ! এ সুধীর ত' মনে হচ্ছে মলিনার দেওর সুধীরই! তবে কি বেহাই মশায় এ জগতে আর নেই! মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে দেখে এসেছি সবল সুস্থ সতেজ মানুষ, আর এরই মধ্যে expired last night! কথাটা যেন কিছুতেই ধারণার মধ্যে আসতে চায় না।

কিন্তু সত্যি সত্যিই যখন ব্যাপারটা ঘটেছে, তখন না এসেই বা উপায় কি? মলিনা কাঁদতে লাগল, অতি করুণ মর্মান্তিক কান্না! হায় বেচারা! এমন শ্বশুরকেও কেউ এমনভাবে হারায়!

একটা দুর্বার বৈরাগ্যের কুজ্ঝটিকায় সমস্ত মনটা উদাস হ'য়ে গেল। শেষ পর্যন্ত সংসারটা তা হ'লে এতই অলীক! যোগীন মুখোপাধ্যায়ের মতো একজন কর্মী মানুষ, যার জীবনের খানিক অংশ পরার্থে নিয়োজিত, তারও রেয়াৎ নেই। যখন, যে মুহূর্তে ডাক পড়লেই হ'ল!

মলিনা একদিনও বিলম্ব করতে চাইলে না। সেইদিনই সন্ধ্যার গাড়িতে তাকে নিয়ে কলকাতায় ফিরলাম। বেহাই মশায় বলে-ছিলেন, 'আমি কিন্তু শীঘ্রই তোমাকে নিয়ে আসছি।' কিন্তু তাই ব'লে এত শীঘ্র!

কলিকাতায় পৌঁছে অবগত হলাম, আমাদের রওনা ক'রে দেবার ঘণ্টা পাঁচ ছয় পরে আহারাদির পর যোগীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিদিনকার অভ্যাস মতো পুস্তক পাঠ করছিলেন। হঠাৎ শরীরটা খারাপ মনে হওয়ায় জল চেয়ে পান ক'রে বার দুই কাসলেন, তার পরই মাথা অবসন্ন হ'য়ে ঢ'লে পড়ল। মিনিট কয়েক পরে ডাক্তার এসে উপস্থিত হ'লেন। তখন কিন্তু যোগীন্দ্র ইহলোকের বন্ধন ছিন্ন করেছেন।

(ক্রমশ)

ভারত-শিল্প

বিমলকুমার দত্ত

প্রাচীন যুগের অবসান বা মধ্যযুগ

(৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে মুসলমান আক্রমণ পর্যন্ত)

প্রাচীন ভারতেতিহাসের প্রতি পাতায় এতদিন যে সর্বভারতীয় আদর্শ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ও সাধনা চলিয়া আসিতেছিল; হর্ষবর্ধনের সময় হইতে সে স্বপ্ন বিলীন হইয়া গেল। সে কারণ হর্ষবর্ধনই ভারত ইতিহাসের বিশেষ করিয়া হিন্দু যুগের সর্বশেষ—"সকলোত্তর পথনাথ"। ঐতিহাসিকের মাপকাঠিতে প্রতিহার সাম্রাজ্যের পতন কাল (৯১৬ খৃঃ) হইতেই ভারতে প্রাচীন যুগের অবসান ও মধ্যযুগের আরম্ভকাল ধরা হইলেও প্রকৃতপক্ষে হর্ষবর্ধনের পর হইতেই সর্বভারতীয় আদর্শের পরিবর্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমা বিশিষ্ট বিভিন্ন প্রাদেশিক শক্তির অভ্যুদয় সূচনা করে। এই প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক রাষ্ট্রচেতনার প্রভাব ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনেও স্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে শুরু করিল।

মধ্যযুগে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্বীয় প্রভাব ও প্রতিপত্তির জন্য সর্বদা স্বার্থদ্বন্দ্বে ধর্ম, ভাষা ও অন্যান্য চারুকলার বিকাশ ও বিস্তার পুরাদমেই চলিতেছিল। অবিচ্ছিন্ন অশান্তি ও যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে কিরূপে ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল তাহা ভাবিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। হিন্দু ধর্মের অসীম প্রাণশক্তির প্রেরণাই এই অসম্ভব সম্ভব হইবার একমাত্র কারণ।

মৌর্য ও গুপ্তযুগে সারা ভারতের শিল্প

গুজরাটের পুঁথিচিত্র

খাজুরাহের মন্দির

প্রকাশে যে সর্বভারতীয় আদর্শ ও চেষ্টা ছিল এ যুগে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। আঞ্চলিক রাজশক্তি সকল স্ব স্ব প্রাদেশিক শিল্পে স্বীয় নিজস্বতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। এই স্বকীয়তা বা শিল্পের প্রাদেশিকতা ভারতীয় শিল্প ইতিহাসে—"সাপে বর"রূপে গ্রহণীয় কারণ ইহাদের মধ্যে ভারতীয় চিন্তাধারার বিভিন্নরূপ ও প্রকাশ সত্তা দৃষ্ট হয়।

প্রাক্ মুসলমান যুগে বৈদেশিক আক্রমণের সহিত যে সকল অভারতীয়গণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহাদের অনেকেই ভারতীয় ধর্ম ও আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ ভারতীয়গণের সহিত একাঙ্গীভূত হইয়া যায়। রাজপুত-জাতি এরূপ সংমিশ্রণের বিশেষ নিদর্শন।

মুসলমান আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত যে সকল রাজবংশ উত্তর ভারতে প্রাধান্য লাভ করে তাহাদের মধ্যে মালবের পরমার, বুন্দেলখণ্ডের—চন্দেল্লো, জব্বল-পুরের চেদী বা কলচুরি; গুজরাটের—শোলাঙ্কী, আজমীরের—চৌহান, কনৌজের—গড়হবাল, বঙ্গের—পাল ও সেন বংশ, উড়িষ্যার—গঙ্গ ও কেশরী এবং কাম-রূপের—বর্মগণ প্রসিদ্ধ।

উড়িষ্যার শিল্প ভারতীয় শিল্প ইতিহাসের বিশেষ অধ্যায় এবং একাধিক কারণে উল্লেখ-যোগ্য।

স্থাপত্য শিল্পে ভুবনেশ্বর, পুরী এবং কোনারকের মন্দিরগুলির মধ্যে নাগরী ধারার এক সুন্দর এবং সম্পূর্ণ ক্রম পরিণতির বিকাশ দেখা যায়। ভুবনেশ্বরের পরশু-রামেশ্বর (৭৫০ খৃঃ) মুক্তেশ্বর (৯৫০) লিঙ্গরাজ (১০০০), রাজরাণী (১১৫০), পুরীর জগন্নাথ মন্দির (১১৫০) এবং কোনারকের সূর্যমন্দিরগুলি (১২৫০) উক্ত মন্দির স্থাপত্যের ক্রম-পরিণতির সুন্দর দৃষ্টান্ত। নাতিউচ্চ এবং দুই প্রস্ত ছাদযুক্ত মণ্ডপ সমেত পরশুরামেশ্বর শিবের মন্দিরটিকে উড়িষ্যার নাগরী মন্দিরের ক্রম-পরিণতির প্রথম পর্যায়ভুক্ত করা যায়। উড়িষ্যার আসল মন্দিরটিকে "দেউল" এবং ইহার সম্মুখভাগস্থ মণ্ডপটিকে "জগমোহন" বলা হইত। জগমোহন ও দেউলের একত্র সংলগ্নী রূপই উড়িষ্যা মন্দিরের মোটামুটি ছাঁচ। পরবর্তীকালে ইহাদের সহিত নাট ও ভোগ মন্দির যুক্ত হইয়া উড়িষ্যা মন্দিরের কলেবর বৃদ্ধি করে। দেউল ব্যতীত অন্যান্য মন্দিরের ছাদ পিরামিডের আকারে স্তরে স্তরে সজ্জিত......ইহারা পীড় দেউল নামে খ্যাত। ভুবনেশ্বরের মুক্তেশ্বর মন্দিরে সর্বপ্রথম যথারীতি পিরামিড আকৃতি জগমোহন দৃষ্ট হয়। লিঙ্গরাজের মন্দিরটি ইহার উচ্চতা ও সম্পূর্ণতার জন্য আদর্শ উড়িষ্যা মন্দিরের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। সমুদ্র তীরবর্তী কোনারকের বিখ্যাত সূর্য মন্দিরটির কেবলমাত্র একটি জগমোহন ব্যতীত অন্য সমস্তই ধ্বংসীভূত। এই সূর্য মন্দিরটির বর্তমান অবশিষ্টাংশ হইতে জানা যায় যে, ইহা চক্রবিশিষ্ট রথের আকারে গঠিত।

উড়িষ্যার অধিকাংশ মন্দির গাত্রে নাগ-নাগিনী, মিথুন, দেবদেবী, বিভিন্ন পশুপাখী, লতাপাতা ও ফলফুলের মূর্তির দ্বারা অলংকৃত করা হইত। এ যুগের উড়িষ্যার ভাস্কর্য শিল্পের সরস সাবলীল ছন্দগতি—উড়িষ্যার তথা ভারতের শিল্প ইতিহাসের বিশেষ গৌরবের বস্তু। মুক্তেশ্বর মন্দিরটি ইহার নিখুঁত কারুকার্যের জন্য বিশেষ প্রশংসনীয়। উড়িষ্যার বিশেষতঃ ভুবনেশ্বরের মন্দির গাত্রে রূপায়িত স্ত্রী-মূর্তিগুলি তাহাদের সরস দেহ ভঙ্গিমার লাবণ্য বিলাসে চির উজ্জ্বল। মনে হয় পৃথিবীর অন্য কোথাও এত সুন্দর লাস্যময়ী স্ত্রীমূর্তির প্রস্তর রূপ আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই।

কোনারকের সূর্যমন্দিরের অশ্ব

উড়িষ্যার অধিকাংশ মন্দির গাত্রে নরনারীর দৈহিক মিলনমূর্তি বা মিথুন মূর্তির প্রাচুর্য দেখা যায়। মন্দির গাত্রে এইরূপ মিথুন মূর্তির রূপ পরিবেশনের গভীর তাৎপর্য ছিল। কোনারকের মিথুন মূর্তিগুলি সরস মানবীয় ভাব প্রকাশের অপূর্ব দক্ষতায় উড়িষ্যার ভাস্কর্য শিল্পকে এক বিশেষ গৌরবময় আসন দান করিয়াছে।

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী খিচিং; তাম্র শাসনোক্ত খিজ্জিঙ্গকোট্টের ভগ্নস্তূপ খনন করিয়া যে সকল প্রস্তর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে নটরাজের, মহিষী মর্দিনীর ও নামমূর্তি-গুলি প্রধান। খিচিং এর বড় মন্দিরের কারু-কার্য অতীব সুরুচি প্রকাশক ও সংযত। শিল্পে অলঙ্কার বাহুল্য ইন্দ্রিয় পরায়ণতার নিদর্শন। বড় মন্দিরের অলংকারের সংযত-ভাব বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

চান্দেল্যাদিগের রাজধানী বুন্দেলখণ্ড নামক স্থানে অবস্থিত খাজুরাহের হিন্দু ও জৈন মন্দিরগুলি ভারত শিল্পের গৌরবের বস্তু। মন্দিরগুলি সম্ভবতঃ ৯৫০-১০৫০ খৃঃ মধ্যে নির্মিত এবং ইহাদিগের মধ্যে কন্দারেও মহাদেবের মন্দিরটি স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। এরূপ নিখুঁত কারুকার্য সম্পন্ন মন্দির খুবই কম দেখা যায়। উড়িষ্যার পরই ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যের উৎকর্ষতায় খাজুরাহের স্থান অনস্বীকার্য। মন্দিরটি উচ্চ বেদীর উপর স্থাপিত এবং মন্দির গাত্রের চতুপার্শ্বে অসংখ্য শিখর সংস্থাপনের জন্য ইহার প্রকৃত উচ্চতা অপেক্ষা (১১৬ ফিট) চাক্ষুষ দৃষ্টিতে ইহাকে অধিক উচ্চ দেখায়। শিখর ব্যতীত মন্দির গাত্রের সর্বাংশ ফুললতা পাতা ও মনুষ্য মূর্তির দ্বারা শোভিত। প্রদক্ষিণ পথটি মূল মন্দিরের অঙ্গীভূত। জৈন আদিনাথ ও বৈষ্ণব চতুর্ভুজের মন্দিরদ্বয়ও একই ছাঁচে নির্মিত।

মধ্য ভারতে চান্দেল্য প্রভুত্বকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আধিপত্যের জন্য শিল্পে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তিই অধিক দৃষ্ট হয়, কিন্তু লক্ষ্মৌ যাদুঘরে রক্ষিত মহোবায় প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্তি-গুলি প্রমাণ করে যে, মধ্য ভারতের কোন কোন অংশে বৌদ্ধ ধর্মস্রোত স্রোতস্বিনী না হইলেও প্রবহমানা ছিল। মূর্তিগুলির অধিকাংশই সনাক্তিত এবং তাহারা একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নির্মিত।

গুজরাটের সোলাঙ্কী রাজাদের রাজত্ব-কালীন হিন্দু ও জৈন মন্দিরগুলি অধিকাংশই মুসলমান আক্রমণে ধ্বংসীভূত। মন্দিরগুলির ধ্বংসাবশেষ হইতে বুঝা যায় যে, এককালে তাহারা আকারে প্রকারে কিরূপ বিরাট ছিল। কাথিওয়াড়ের সোমনাথ ও সিদ্ধপুরের রুদ্রমালের মন্দির দুইটি উল্লেখ-যোগ্য। সোমনাথের বিরাট মন্দিরটি ১০২৫ খৃঃ মামুদ কর্তৃক লুণ্ঠিত ও ধ্বংসীভূত হইবার পরও ১১৪৩-৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কুমার পাল কর্তৃক ইহা পুনর্গঠিত হয়। পরবর্তীকালে ইহা পুনরায় লুণ্ঠিত ও মসজিদে পরিণত হয়। অতুল ধনৈশ্বর্যের
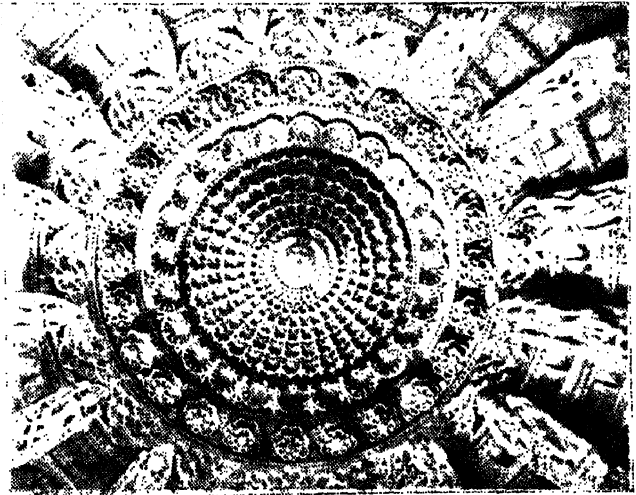
তেজপাল মন্দিরের গম্বুজ—অভ্যন্তরভাগ
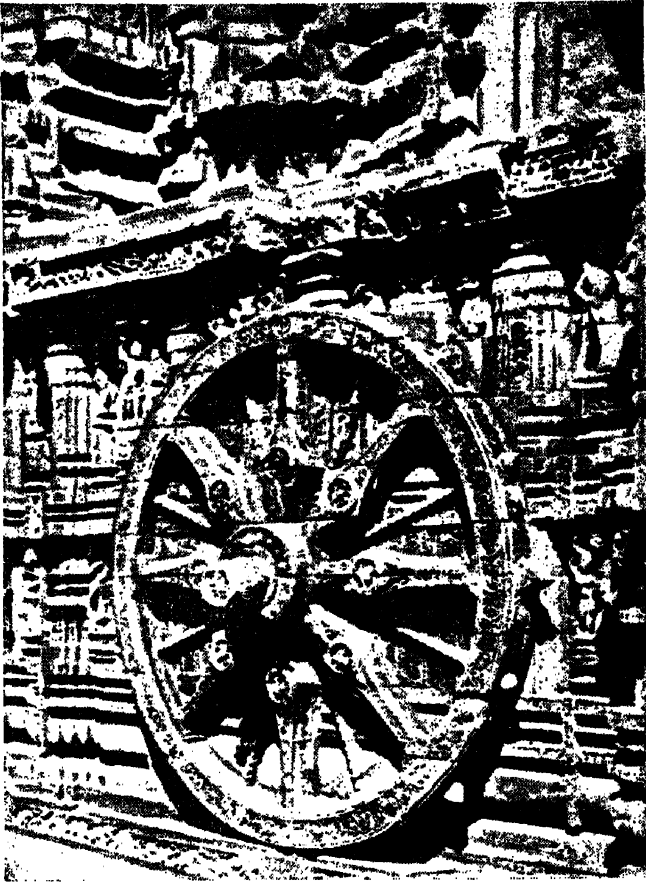
কোনারকের সূর্যমন্দিরের রথের চাকা

জন্য ইহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। সম্প্রতি মন্দিরটি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চিতোরের জয়স্তম্ভগুলি মধ্যযুগে রাজপুত-রাজাদের কিতীস্তিস্তম্ভরূপে দণ্ডায়মান। আবু পাহাড়ের জৈন মন্দিরগুলির মধ্যে বিমলা ও তেজপালের মন্দির দুইটি ইহাদের অপূর্ব কারুকার্যের জন্য খ্যাত। জানা যায় যে, শ্বেত প্রস্তর নির্মিত এই মন্দির দুইটি যথাক্রমে ১০৫২ ও ১২৩২ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। ছাদের নিম্নে অপূর্ব কারুকার্যময় ব্যবস্থা ভারতীয় শিল্পের চরম সূক্ষ্মকার্যের নিদর্শন। যদিও অতিমাত্রায় অলঙ্কারপ্রিয়তা ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার প্রকাশ তথাপি একমাত্র এই সকল আলঙ্কারিক শিল্পের প্রাচুর্য সমস্ত স্থাপত্যটির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ইহাকে সম্পূর্ণ সুন্দর শিল্প নিদর্শনে পরিণত করিয়াছে। ডাঃ কুমারস্বামীর মতে—

It must not be supposed that all this work is over wrought: this is rather one of those cases when exuberance is beauty."

স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার ন্যায় শহরের বিশেষ বিশেষ অংশে তোরণদ্বার নির্মাণ করার প্রথা প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। বরোদার নিকটস্থ দভোই এবং গোয়ালিয়রের তোরণ-দ্বারগুলি উপরোক্ত ধারার নিদর্শনরূপে আজিও বিদ্যমান।

দ্বাদশ শতাব্দীর পর * গুজরাটের জৈন ধর্মগ্রন্থে বাঙলা নেপালের চিত্রশিল্পের অনুরূপ ক্ষুদ্রাকার পুঁথির উপর অঙ্কিত চিত্রের নমুনা পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লাল রংয়ের জমীর উপর হলুদ, সবুজ, কাল প্রভৃতি রংএর সমাবেশে চিত্রগুলি অঙ্কিত হইত। চিত্রগুলির মধ্যে মনুষ্য মূর্তিগুলি এক পাশ হইতে দেখান (Three quarter Profile)। ইহাদের নাসিকা বিশেষ তীক্ষ্ণ ও ছুঁচাল এবং চক্ষুদ্বয় সকল ক্ষেত্রেই বিশাল এবং আয়ত ও একই ছাঁচে আঁকা। গুজরাটের এই সকল জৈন পুঁথির উপর অঙ্কিত চিত্রগুলির রেখা-প্রাধান্য বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জৈন্য কল্পলতা ও মহাবীরের জীবনী চিত্র রূপায়িত। কাঞ্চিপুরম ও শ্রাবণ বেলগোলার জৈন ভিত্তিচিত্রগুলি ঐ একই ধারায় অঙ্কিত কিন্তু ইহার দাক্ষিণীভাবে ভরপুর। গুজরাটের চিত্র শিল্পের সহিত ইলোরার ভিত্তিচিত্রের (দ্বিতীয় যুগ) ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র লক্ষ্য করিয়া ডাঃ কুমারস্বামী বলিয়াছেন—

Guzrati painting is no doubt a continuation of the early Western Style, referred to by Taranath as that of the "Ancient West," the Rastrakutas and perhaps Paramara frescoes of Elora representating the intermediate stage in the developemnt."

পর্বত শিখরে ধর্ম মন্দির নির্মাণ প্রথা জৈনদিগের মধ্যে বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। কথিওয়াড়ের শিত্রুঞ্জয় এবং গিরনার পর্বত শিখরে অসংখ্য জৈন মন্দিরের একত্র সমাবেশ হওয়ার জন্য উহাদিগকে মন্দির নগরী বলা যায়। গিরনার পর্বতস্থ মন্দিরগুলির মধ্যে নেমীনাথের মন্দিরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ২০০০ ফিট উচ্চ শিত্রুঞ্জয় পর্বত শিখরে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক মন্দিরের সমাবেশ দেখা যায়। মন্দিরগুলির অধিকাংশ ১৬১৮ খৃঃ রচিত এবং সমস্ত মন্দিরগুলি একত্রে উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। দক্ষিণ ভারতের মহীশূর রাজ্যের শ্রবণ বেল গোলায় চন্দ্রগিরি ও ইন্দ্রবেত পর্বত শিখরস্থ জৈন মন্দিরগুলিও উল্লেখযোগ্য।

[আগামীবারে সমাপ্য]

লণ্ডনে প্রমথেশ বড়ুয়ার সঙ্গে কয়েকটি দিন

শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

সেদিনও অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ লণ্ডনে এসে পৌঁছলেন না। ১৯৪৮ সালের মহাষ্টমী। ঠিক ছিল, এ বছর বাঙলা সাহিত্য সম্মিলনীর বিজয়া উৎসবে অধ্যাপক মহলানবীশ হবেন প্রধান অতিথি। যদি তিনি যথাসময়ে লণ্ডনে উপস্থিত না থাকেন, তাহলে ভারতের হাইকমিশনার কৃষ্ণ মেননকে তাঁর আসনে বসাবার আয়োজন করা হবে কি না, সে সম্বন্ধে আজ ইণ্ডিয়া লীগে আলোচনা হবার কথা। কৃষ্ণ মেনন বাঙলা জানেন না, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না, কারণ বাঙলা সমিতির অসংখ্য অবাঙালী সভ্য ব'লে প্রধান অতিথির অভিভাষণ সাধারণত ইংরেজীতেই হ'য়ে থাকে।

স্ট্র্যাণ্ডে ইণ্ডিয়া লীগ অফিসে পৌঁছতে আমার অনেক দেরী হ'য়ে গেল। এই অক্টোবরে ভারী ঠাণ্ডা পড়েছে—কুয়াশাও হয়েছে গভীর। হাতড়ে হাতড়ে পথ চলতে চলতে লোকের ঘাড়ে প'ড়ে কতবার যে 'সরি' ব'লতে হয়েছে, তার ঠিক নেই। ইণ্ডিয়া লীগের জীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে শুনতে পেলুম, বিজয়া উৎসবের মহড়া এর মধ্যেই শুরু হ'য়ে গেছে—

"যদি মাতে মহাকাল উদ্দাম জটাজাল
ঝড়ে হয় লুণ্ঠিত ঢেউ ওঠে উত্তাল
হ'য়ো নাকো শঙ্কিত তালে তার দিও তাল
জয় জয় জয় গান গাইও———"

এ সময় ঘরের দরজা খুলে তাল কেটে দিতে ইচ্ছে হ'লো না। তাই পাশের নির্জন অফিস ঘরে গিয়ে আলো জ্বাললুম। আর সঙ্গে সঙ্গে কে যেন ব'লে উঠলো, অন্ধকারে গান শুনতে ভালো লাগে না?

চমকে পেছন ফিরে মিঃ বড়ুয়াকে দেখে খুশী হলুম। চুপ ক'রে গালে হাত দিয়ে ব'সে মৃদু মৃদু হাসছেন।

একি, আপনি ওঘরে যান নি যে? কতক্ষণ এসেছেন?

অনেকক্ষণ—

যমুনা দেবী?

দু'এক মিনিট কান পেতে শোনবার ভান ক'রে মিঃ বড়ুয়া উত্তর দিলেন, ওই শুনতে পাচ্ছেন না? মহাকালের তালে তাল মেলাচ্ছেন—

কিন্তু আপনি এখানে একা ব'সে আছেন কেন?

ভয়ে, কারণ ওরা আমাকেও কোরাসে টানতে চেয়েছিলো।

রেহাই পেলেন কেমন ক'রে?

শরীরের দোহাই দিয়েছি, কিন্তু দাঁড়িয়ে কেন বসুন, সেই পরিচিত হাসি হেসে মিঃ বড়ুয়া খালি চেয়ারের দিকে হাত দেখালেন।

আপনার শরীরের অবস্থা এখন কেমন?

ভালোই, তবে মাঝে মাঝে বড় দুর্বল লাগে। কিছুদিন আগে একবার টিউবে একা বেরিয়ে অজ্ঞান হ'য়ে যাই—কিন্তু অসুখের কথা আর নয়—কথা শেষ না ক'রে মিঃ বড়ুয়া মুখ ভরিয়ে দিলেন সরল হাসিতে।

এখন কি থাকবেন এদেশে কিছুদিন?

না, এমাসের শেষে ফিরবো—আপনি?

নিয়ে চলুন না আপনাদের সঙ্গে—

কথার উত্তর না দিয়ে হেসে তিনি বললেন, সিগ্রেট খান। তারপর চেয়ারে দেহ আরও শিথিল ক'রে ওপরে তাকিয়ে আস্তে আস্তে ধোঁয়ার রিং করবার চেষ্টা ক'রে ব'লে গেলেন, আবার আসতে হবে এদেশে—

আপনি তো প্রায়ই আসেন।

হ্যাঁ, কিন্তু যে কাজগুলো করতে চাই, সেগুলো পাকাপাকি করবার জন্যে বোধ হয় আরও অনেকবার আসা-যাওয়া করতে হবে, ভাবছি আসছে বছরে আসবো আবার—

দেশে থাকতে শুনেছিলাম, ছবি থেকে খাবারের কিংবা আরও নানা গন্ধ যেন দর্শক পায়, আপনি সেই বিষয় নিয়ে নতুন একটা আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন—

খুব জোরে হেসে তিনি বললেন, না না, আমার দু'টো প্ল্যান আছে—এদেশে আমাদের ছবি নিয়ম ক'রে দেখাবার ব্যবস্থা করা, আর এই লণ্ডনেই সুটিং ক'রে বাঙলা আর হিন্দীতে একটা ছবি তোলা—

তাহলে তো অদ্ভুত কাণ্ড হয়। এখানে ইণ্ডিয়ানদের জীবন নিয়ে গল্প হবে নাকি?

না না, মাথা দোলালেন মিঃ বড়ুয়া, আমার সঙ্গে এ বিষয়ে এদেশের কয়েকজন ডাইরেক্টারের সঙ্গে আলোচনা হ'য়ে গেছে—হিস্টোরিক্যাল ছবিই ঠিক করেছি।

বই ঠিক ক'রেছেন নাকি?

না, অতোদূর কাজ এগোয় নি তো এখনও, একটু ভেবে তিনি বললেন, আমাদের দেশ থেকে কাউকেই আনাবো না, প্রত্যেককে এখান থেকে ধরবো—

কিন্তু অ্যাকটার—অ্যাকট্রেস্?

সব এখান থেকেই হবে।

বলেন কি? এখানে অভিনয় করবার মতো ইণ্ডিয়ান ক'জন আছেন?

মিঃ বড়ুয়া হেসে বললেন, আপনারা সকলেই আছেন—রাজী?

এখখুনি, কিন্তু আমরা অভিনয় করলে দেখবে কে?

রাজা—উজীর সাজতে পারলে সকলেই দেখে বৈকি। সেইজন্যেই তো হিস্টোরিক্যাল বই করা ঠিক ক'রেছি, এতো গম্ভীর হ'য়ে মিঃ বড়ুয়া কথাগুলি বললেন যে, আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না, তিনি ঠাট্টা করছেন কি—না।

এক সময় বুঝতে পারলুম পাশের ঘরের দরজা খোলা হলো। আমাদের অনেক বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে যমুনা দেবীও এ ঘরে এলেন। আজকের মতো রিহার্স্যাল শেষ হ'লো।

মেয়েদের দেখে তাড়াতাড়ি মিঃ বড়ুয়া উঠে দাঁড়ালেন। কেউ কিছু বলবার আগেই আমাদের সকলের দিকে তিনি বললেন, এখন কি প্রোগ্রাম আপনাদের?

আমাদের প্রোগ্রাম তো এইমাত্র শেষ হলো, এবার বলুন আপনার কি প্রোগ্রাম?

এই সবাই মিলে একটু এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে চাই, কারণ—

লণ্ডনে প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া

বলুন বলুন।

না থাক—

আরে কি আশ্চর্য, মিঃ বড়ুয়া আপনি যেন লজ্জা পাচ্ছেন মনে হচ্ছে—

সলজ্জ হাসি হেসে এবার তিনি বলে ফেললেন, আজ আমার জন্মদিন।

বলেন কি? এই কথাটা বলতে আপনি সঙ্কোচ করছিলেন, অনেকে এক সঙ্গে ব'লে উঠলো, চলুন আমরাই আজ খাওয়াবো আপনাকে, আসুন যমুনা দেবী—প্রচণ্ড হট্টগোল করতে করতে আমরা ইণ্ডিয়া লীগ থেকে বেরোলাম।

সেই শীতের রাত্তিরে কুয়াশা থমথম করা রাস্তায় একদল ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে সারা ভারতের অতিপ্রিয় নট প্রমথেশ বড়ুয়াকে দেখলে কারুরই মনে হতো না যে, তিনি ছাত্রদের একজন নন।

মিঃ বড়ুয়া জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাবেন?

আপনার কি খেতে ইচ্ছে করছে? দিশি না বিলিতি?

না না বিলিতি নয়, দিশি অনেক ভালো।

যমুনা দেবী হাসলেন, ডাক্তার যা করতে বারণ করেন, উনি তাই করেন, ঝালঝোল খাওয়া ওঁর উচিত নয়—

বাধা দিয়ে বড়ুয়া উদাসভাবে শুধু বললেন, উচিত?...এই কুয়াশায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁপা কি উচিত—আজ যে আমার জন্মদিন—

আমরা এক সঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠলাম, Many happy returns.

গোটা তিন চার ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে স্ট্র্যান্ড থেকে কেম্ব্রিজ সার্কাসের 'রাজা' রেস্টুরেণ্টে পেশছতে আমাদের মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগলো। দুটো বড় বড় টেবিল জোড়া দিয়ে আমরা এক সঙ্গে বসলাম—মাঝখানে পাশাপাশি বড়ুয়া ও যমুনা দেবী।

মিঃ বড়ুয়া বললেন, বাঃ দিশি খাবারের গন্ধ বেশ লাগছে তো—

বললাম, এদেশে আমাদের সাহেব সাজতে বড় ভালো লাগে, কিন্তু খাবার ব্যাপারে সাহেব সাজা বড়ো কঠিন।

ঠিক ঠিক একটু উসখুস ক'রে তিনি বললেন, কই, খাবার আনতে ওরা বড়ো দেরী করছে যে—

যমুনা দেবী হেসে বললেন, তুমি কতো খাবে আমরা জানি।

সত্যি তিনি খুবই কম খেলেন। বলতে গেলে কিছুই খেলেন না।

যমুনা দেবী জানালেন, বাড়িতেও তিনি নাকি অমনি পাখীর মতো আহার করেন। ভোজনে তার রুচি একেবারেই নেই।

কিছু বলুন মিঃ বড়ুয়া?

কি বলবো?

জন্মদিনের বাণী?

নির্ভয়ে বলবো?

নিশ্চয়ই।

এবার তিনি প্রত্যেকের দিকে একবার ক'রে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, বাঙলা সাহিত্যে কিছু হচ্ছে না—একেবারে রাবিশ—

আমিও সঙ্গে সঙ্গে বললাম, আর বাঙলা ছবি?

খুব জোরে হেসে তিনি বললেন, বোকা ব'নে গেলেন তো—সাহিত্য যদি রাবিশ

হয়, তাহলে ছবি তো মানে—বুঝলেন? তাই ছবি খারাপ হ'লে সব সময় সাহিত্যিককে দায়ী করবেন— ডাইরেক্টারকে নয়।

কিন্তু ভালো লেখকের ভালো বই যখন—

যমুনা দেবী বাধা দিয়ে বললেন, আহা আজ ওঁর জন্মদিন।

তাই ভাবছি একটা কবিতা লিখবো।

সে কি মিঃ বড়ুয়া আপনি কবিতা লেখেন নাকি?

হঠাৎ উদাস হবার ভান ক'রে তিনি বললেন, ওটাই জীবনে বাকি আছে—তাই আজ লিখবো ভাবছি।

সবাই ব'লে উঠলো, কি লিখবেন, বলুন না শুনি?

বলবো?

হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

ভয়ে না নির্ভয়ে?

নির্ভয়ে।

রিয়েলি? কিন্তু একটা বিপদের কথা আছে যে—মানে আমাদের মধ্যে এখানে দু'একজন কবি-টবি আছেন কি না—

কেউ নেই মিঃ বড়ুয়া, আমি আরও পাঁচ-ছ' চামচ পোলাউ প্লেটে তুলে নিয়ে বললাম, এখানে সব গদ্য লেখক।

চলুন সকলে একদিন পিকনিক করতে যাই—

আগে কবিতা বলুন।

মিঃ বড়ুয়া আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কবির অভিনয় ক'রে বললেন, হোটেলে কবিতা হয় না, যেদিন পিকনিক করতে যাবো, সেদিন হবে—গাছের ছায়ায় খোলা আকাশের নিচে—বলুন কবে পিকনিকে যাওয়া হবে?

সেই রাত্তিরেই পিকনিকে যাবার দিন ঠিক হ'য়ে গেল।

অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ ঠিক দিনেই লণ্ডনে এসে পড়লেন। কাজেই প্রধান অতিথির ভাবনা আর কাউকেই ভাবতে হলো না। মনের মতো লোককে পেয়ে আমরা সকলেই নিশ্চিন্ত হলাম।

হবোর্ন হলে বাঙলা সাহিত্য সম্মিলনীর উৎসব শুরু হ'য়ে গেছে। গল্প, কবিতা গান একের পর এক শোনা যেতে লাগলো। একেবারে সামনে ব'সে আছেন অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ, শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় এবং প্রমথেশ বড়ুয়া। তাঁকে আজ বড়ো ছেলেমানুষের মতো দেখাচ্ছে, আর তাই মনে হচ্ছে তিনি যেন অন্যান্য দিনের চেয়েও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছেন। শুধু ভারতীয়দের নয়, অনেক ইউরোপীয় অতিথির কৌতূহলী চোখ তাঁরই দিকে তাকিয়ে আছে।

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় ও প্রশান্ত মহলানবীশের সারগর্ভ বক্তৃতার পর যখন শেষ কোরাস গাওয়া হবে, তখন কোলাহল জাগলো, অর্থাৎ সকলে মিঃ বড়ুয়ার কথা শুনতে চান। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না। জেদী ছাত্রদের ঠেকাবে কে? তাই অবশেষে মিঃ বড়ুয়াকে উঠতেই হলো। তিনি মুখে সেই হাসি নিয়ে একেবারে স্টেজের সামনে এগিয়ে এলেন। তারপর অনেক বিদেশীর ভীড় হ'য়েছে ব'লে অন্যান্য বক্তাদের মতো ইংরেজীতে বলতে আরম্ভ করলেন, আমার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহালানবীশের সামনে কিছু বলতে হবে ভেবে আমি বেশ বিচলিত হ'য়ে পড়ছি, আর আপনাদের সকলকে সামনে দেখে কেমন ক'রে আরম্ভ করবো, তাও ভেবে পাচ্ছি না। কথা তৈরী করা তো আমার কাজ নয়—আমার যা কাজ তা'তে এতো লোকও সামনে থাকে না। আশা করি, প্রথমেই আপনারা আমার এই মুহূর্তের অসহায় অবস্থার কথা দয়া ক'রে বুঝে নেবেন। আজ বাঙলা সাহিত্য সম্মিলনীর এই বিজয়া উৎসবে আমি আপনাদের সঙ্গে থাকতে পেরেছি ব'লে নিজেকে সত্যিই সৌভাগ্যবান মনে করেছি। সাত হাজার মাইল দূরে আমাদের জাতীয় উৎসব এমন ক'রে যাঁরা সার্থক করে তুললেন, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সেই ছাত্র-ছাত্রী বন্ধুদের আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জীবনে অনেক লোকের সংস্পর্শে এসেছি, কিন্তু আপনাদের কাছে একথা বলতে পেরে ভালো লাগছে যে, ছাত্রদের সঙ্গে থাকলে আমি যেন নতুন শক্তি পাই, কারণ আপনারা সব সময় আমাকে যৌবনের গান শোনান—

কয়েক দিন পর এক হালকা রোদ্দুর ওঠা সকাল বেলা ওয়েস্ট বোর্ন পার্ক রোড (মিঃ বড়ুয়ার বাড়ি) থেকে আমরা হ্যাম্পস্টেড হীথে পিকনিক করতে বেরিয়ে পড়লাম।

খাবার-দাবার যে যার সঙ্গে নিয়েছিলো, তা ছাড়া যমুনা দেবীও অনেক আয়োজন করেছিলেন।

ওয়েস্ট বোর্ন পার্ক রোড থেকে হ্যাম্পস্টেড হীথ বেশী দূরে নয়, আমাদের পৌঁছতে দেরী হলো না। পিকনিক করবার জায়গা বটে—সুদূর বিস্তৃত মাঠ, এপাশে ওপাশে অসংখ্য গাছের সারি, কতো রকম ঢিবি আর মাঝে মাঝে পুকুর। এই হ্যাম্পস্টেড হীথের ভেতরেই কয়েকটা বাড়ি আছে—রাত্তিরে তার আলো লাইট হাউসের মতো জ্বলে। দোকান-বাজার বেশ দূরে ব'লে যারা হ্যাম্পস্টেড হীথের ভেতর বাস করে, তাদের সব সময় কেনাকাটার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হয়।

প্রথমে খেলা আরম্ভ হ'লো। গাছের ভাঙা ডাল দিয়ে তৈরী হ'লো ব্যাট আর রবারের একটা বল আমরা সঙ্গে ক'রে এনেছিলাম। বড়ুয়া সাহেব ভাঙা ডালের ব্যাট নিয়ে কেবলই এদিক-ওদিক ছুটো-ছুটি করছেন। খেলতে গেলে যে একটা বলের দরকার, সেকথা তাঁর খেয়াল নেই।

যমুনা দেবী থেকে থেকে হাঁ হাঁ করে উঠছেন, আঃ তুমি অতো লাফালাফি কর না—শরীর খারাপ হবে।

কিন্তু কে শোনে কার কথা।

মিঃ বড়ুয়া আপনার যে আজ কবিতা লেখবার কথা—

My goodness, আমার এখন মুড্ নেই—

ছাত্রদের সব ব্যাপারেই মিঃ বড়ুয়ার উৎসাহ ছিলো সব চেয়ে বেশী। এমনভাবে কতোবার তিনি আমাদের সঙ্গে হৈ হৈ করেছেন তার ঠিক নেই। নিজে প্রচুর উৎসাহ নিয়ে লণ্ডনের সেই প্রচণ্ড শীতেও তিনি যেন আমাদের মাতিয়ে রাখতেন।

শুধু তাঁর উৎসাহ ছিলো না মাত্র একটি ব্যাপারে। নিয়ম করে রোজ রোজ কিছুতেই তিনি ডাক্তারের বাড়ি যেতে চাইতেন না! ও ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ ছিলো যমুনা দেবীর। আমাদের সামনেই কথা হ'তো।

কাল তাহলে, মিঃ বড়ুয়া বললেন, স্কেটিং দেখতে যাওয়া যাক—

যমুনা দেবী বাধা দিলেন, না ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

সে তো আজ গেলাম।

কালও যেতে হবে।

ও বাবা, সে হয় না।

খুব হয়।

কিন্তু আমি তো বেশ ভালো আছি।

তবু তোমাকে রোজ এখন নিয়ম ক'রে ডাক্তারের বাড়ি যেতে হবে।

নিয়ম কি আমি মানি?

যমুনা দেবী কথা না ব'লে মুচকি হাসলেন। কথা তিনি খুবই কম বলতেন।

আমি হেসে বললাম, যমুনা দেবী আপনার খুব মুশকিল হয়েছে বলুন?

না না মুশকিল আর কি—

মিঃ বড়ুয়া কথা শেষ ক'রে দিলেন, ওঁর বড়ো ভাবনা হয়।

যমুনা দেবী স্নেহভরা দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, তা হয়।

ডাক্তার কি বলেন?

চিকিৎসা তো চলেছে।

কিছুদিন হাসপাতালে থাকলে ভালো হয় না?

শিউরে উঠে মিঃ বড়ুয়া বললেন, অসম্ভব, আমি কিছুতেই হাসপাতালে যেতে পারবো না—গেলে সেখান থেকে পালিয়ে যাবো—

শুনলেন তো? উনি ওই রকম।

সে-বছর নয়। গত বছর মিঃ বড়ুয়া আবার লণ্ডনে গিয়েছিলেন। যমুনা দেবী সঙ্গে ছিলেন না এবার। মিঃ বড়ুয়া তার দিদি শ্রীমতী নীলিমা দেবীর সঙ্গে থাকতেন।

হঠাৎ একদিন ইণ্ডিয়া হাউসে সাড়া জাগলো। শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া সত্যি হাসপাতাল থেকে পালিয়েছেন। ইংল্যাণ্ডের হাসপাতালের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। সে-দেশের লোক রীতিমতো অবাক হ'য়ে গেল। বিনা খরচে প্রচুর আরামে থাকা যায় বলে রোগ সেরে গেলেও হাস-পাতাল থেকে ইংল্যাণ্ডের লোক সহজে বেরিয়ে আসতে চায় না। তারা বলাবলি করলো, ইণ্ডিয়ান প্রিন্সের কাণ্ডই আলাদা, ওদের মেজাজ বোঝা সহজ নয়, বুঝলে হে নার্স?

নার্স মাথা নেড়ে জানালো, বুঝেছে।

মিঃ বড়ুয়াকে কোথাও পাওয়া গেল না। নীলিমা দেবী আর তাঁর ছেলে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। ছাত্রমহলে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেলো।

সন্ধ্যেবেলা বড়ুয়া সাহেব হাসতে হাসতে ফিরে এলেন। তিনি নাকি ব্রাইটনে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তার হঠাৎ সমুদ্রের হাওয়া খাবার সাধ হয়েছিলো।

যমুনা দেবী নেই ব'লেই আপনি এতো বাড়াবাড়ি করছেন?

বাড়াবাড়ি? যাঃ—

চলুন আবার হাসপাতালে—

শান্ত ছেলের মতো তিনি বললেন, চলুন।

তাকে দেখলেই আমাদের যমুনা দেবীর কথা মনে পড়তো।

লণ্ডনে দিনকয়েকের আলাপে আমরা মিঃ বড়ুয়াকে যতো ভালোবেসেছি ঠিক ততো শ্রদ্ধা করেছি যমুনা দেবীকে। মিঃ বড়ুয়ার অসুখ অনেকদিনের—শুনেছি এক মুহূর্তের জন্যেও যমুনা দেবীর সেবায় ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি। তার মঙ্গলকামনায় তিনি সব কিছুই তুচ্ছ করেছেন। আমরা সকলেই লক্ষ্য করেছি তার ভালোবাসায় এতোটুকুও ফাঁকি ছিলো না। কথা তিনি বেশী বলতেন না কিন্তু মিঃ বড়ুয়ার আরোগ্যের জন্যে তার চোখে মুখে ফুটে উঠতো নীরব ব্যাকুলতা। স্বামীর সুখ-দুঃখ যার কাছে সমান, যে শুধু আনন্দ দিনের সঙ্গিনী নয়, স্বামীর কল্যাণ কামনায় যার চোখে রাত্রিদিন জ্বলে মঙ্গলের আলো—তাকে বাঙলাদেশ চিরকাল কি চোখে দেখে এসেছে?

সেকথা আর নতুন ক'রে বলবার প্রয়োজন নেই।

চিত্রপ্রদর্শনী

সরকারী বিদ্যায়তন

বড়দিনের কাছাকাছি প্রতিবারের মতই কলকাতায় বিভিন্ন চিত্র-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন হতে আরম্ভ হয়েছে। এ সময়টা রূপ-রসিকরা নানান্ সম্ভারে সজ্জিত প্রদর্শনী দেখে কখনও পরিতৃপ্ত হন, আবার কখনও-বা তাঁদের আশা অপূর্ণই রয়ে যায়! এই প্রদর্শনীগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণ নিয়ে আসে একাডেমি অব ফাইন আর্টস এবং তার পরেই কলকাতার সরকারী বিদ্যায়তনের বিরাট প্রদর্শনীটি, এ-দুটি প্রদর্শনী ছাড়া এত বিভিন্নধর্মী শিল্পীদের রচনা আর কোন প্রদর্শনীতে দেখতে পাওয়া যায় না, হয় তাঁরা একক প্রদর্শনী করেন, নয়বা দু-চারজন সম্মিলিতভাবে। তাই শিল্প-বিদ্যায়তনের প্রদর্শনীটি বিভিন্ন দিক থেকে আকর্ষণ নিয়ে আসে।

শিল্প-বিদ্যায়তনের নতুন করে প্রতিষ্ঠা-দিবসে কিছুদিন আগে এখানে এক মনোরম অনুষ্ঠানে ছোট্ট একটি প্রদর্শনী হয়ে গেছে, কিন্তু তাতে হস্তনির্মিত নানান্ ধরণের সামগ্রীর প্রাধান্যই ছিল বেশি; কিন্তু এই বাৎসরিক প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে নানান্ ধরণের কাজ। এবারকার বিরাট সংগ্রহ দেখে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, প্রতিবারকার চাইতে এবারকার প্রদর্শনী উন্নততর, অবশ্য প্রদর্শিত জিনিসের, বিশেষ করে ছবির সংখ্যা কমালে দর্শকের প্রতি সুবিচার করা হত, কারণ এমন ছবিও প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে, যা বাদ দিলে অনেক হাল্কা ও সুষ্ঠু হত এই প্রদর্শনীটি।

বিদ্যায়তনের নতুন ঘরগুলোয় আলাদা আলাদা করে নানান্ ধরণের রচনা সাজানোর জন্য প্রতিবারকার চাইতে প্রদর্শনীটি বেশি ভাল লাগে, কারণ হঠাৎ একই সঙ্গে বিরাট হলে নানান্ প্রদর্শিত বস্তুর সম্মুখে গিয়ে পড়তে হয় না। পরিমার্জিত সাজানো ও আকর্ষণের দিক থেকে প্রথমেই আকৃষ্ট করে কারুশিল্পের ঘরটি। নানান্ শিল্প-সংগ্রহ, শিক্ষকমণ্ডলীর কাজ এবং ছাত্রছাত্রীদের তৈরি হাতে নির্মিত বিভিন্ন সামগ্রী এই ঘরটিতে স্থান পেয়েছে। দর্শকমণ্ডলী এদিকে আরও আকৃষ্ট হন একটি কারণে, তা হচ্ছে প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহার্য নানান্ ধরণের কাপড়, পাত্র প্রভৃতি এখানে নামমাত্র মূল্যে সংগ্রহ করা যেতে পারে। তাছাড়া বাটিকের সুন্দর কাজগুলো, ফুলদানী প্রভৃতি নানান্ ধরণের ছোট-বড় কাজের বর্ণবৈচিত্র্য ও রূপসজ্জা আরও আকর্ষণ নিয়ে আসে।
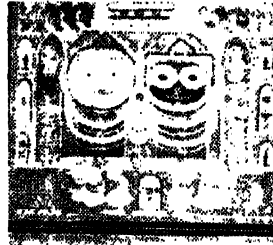
পোস্টার চিত্র শিল্পী—শ্রীরামচন্দ্র দাস

উদ্বোধনী প্রদর্শনীতে শিক্ষকমণ্ডলীর কতকগুলি অনন্যসাধারণ রচনা এ-ঘরটিকে আরও আকর্ষক করে তুলেছিল, কিন্তু সে তুলনায় শিক্ষকমণ্ডলীর এবারকার কাজ অনেকটা ম্লান—বোধ হয়, শীতের সময় নানান্ প্রদর্শনীর উদ্বোধনই এর কারণ। শিক্ষকদের এই রচনাগুলির মধ্যে প্রথমেই অধ্যক্ষ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর তেলরঙে আঁকা শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুরের আবক্ষ প্রতিকৃতিটি রঙে ও আঙ্গিকে জীবন্ত। গোপাল ঘোষের কয়েকটি সুন্দর রচনার বর্ণপ্রয়োগে এবং আঙ্গিকের নূতনত্বে এক 'রোম্যাণ্টিক' স্বপ্ন-জগতের সৃষ্টি করে। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য 'সুবর্ণ-রেখা'। এ ছাড়া সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পূজারত', মাখন দত্ত-গুপ্তের দৃশ্যচিত্র দুটি, ধীরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মর কাঠ-খোদাইয়ে গণেশের মূর্তিটি, প্রদোষ দাশ-গুপ্তের 'বাচ্চু'র মিষ্টি মুখাবয়বটি, বিমল রায়ের রেখাচিত্রটি (প্রতিকৃতি) এবং হলধর পালের 'দাঁড়-টানা' নামের বিরাট মূর্তিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভাস্কর্য-বিভাগে প্রদর্শিত একটি প্যানেল — শিল্পী—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ পাল

দশাশ্বমেধ ঘাট (বারাণসী) শিল্পী—শ্রীসুভাষরঞ্জন সিংহ

এর পরেই পরিপাটিভাবে সাজানোর জন্য 'কমার্শিয়াল আর্টের' ঘরটি আকৃষ্ট করে। এই গৃহটির বিভিন্ন বিভাগের উন্নত ধরণের কাজগুলোর মধ্যে রামচন্দ্র দাসের পুরী-ভ্রমণের প্রচারপত্রটি (৭৭৮) বর্ণ-সুষমায় এবং উড়িষ্যার পটের আঙ্গিকে আঁকা বলে বিশেষভাবে দর্শককে মুগ্ধ করে। প্রচারচিত্রগুলোর মধ্যে চুণীলাল দত্ত-গুপ্তের নং ৭৮৭, দিব্যেন্দু চাকীর দেয়াল-পঞ্জী নং ৮০০ এবং বাটার প্রচারচিত্রটি নং ৮০৩ ছবিতে সুন্দর কল্পনাপ্রবণতা আছে। কানাই কর্মকারের ভারত-ভ্রমণের প্রচার-চিত্রটি এবং নমিতা মিত্রের রাজপুতনা ভ্রমণের চিত্রটিতে যেমন বর্ণসুষমা আছে, তেমনি আছে নতুন ধরণের পরিকল্পনা। পুস্তক প্রচ্ছদপটগুলোর মধ্যে রণেন মুখোপাধ্যায়ের নং ৮২০, আবদুল নাইমের নং ৮৫৫, রামকৃষ্ণ দত্তর নং ৮৯৩, বীরেশ গুহর নং ৮৯৬, রমেন মিত্রর নং ৯১৪ এবং সুনির্মল চট্টোপাধ্যায়ের নং ৯১৫ রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়—জীবনবন্ধু সেনের ৮৩০ নং পত্রিকার 'লে-আউট' এবং অমূল্য-ভূষণ চৌধুরীর টেক্সটাইলের চিত্রটিতেও নূতনত্ব আছে।

মুখ্যাত ভারতীয় আঙ্গিকে আঁকা রচনা-গুলোর ঘরে শান্তিরঞ্জন মুখার্জির কয়েকটি পরিচ্ছন্ন রচনা বেশ ভাল লাগে। রঙে ও রেখায় কোথাও জড়তা নেই, যদিও তা অতিমাত্রায় বিধিনির্দিষ্ট পদ্ধতির রচনা। এদের মধ্যে কুরুক্ষেত্র, স্নানের ঘাট এবং শরশয্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শরশয্যার পশ্চাদপটে যুদ্ধের কোন ছাপই নেই—যদিও কয়েকটি শিবির দেখিয়ে তা প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। ছবিটির আর একটি দোষ হয়েছে এই যে, তা অতিমাত্রায় সাজানো বলে মনে হয়। মনোরঞ্জন ঠাকুরের আদিবাসী মেয়ে সিল্কে আঁকা একটি সুন্দর প্রতিকৃতি। সুনির্দিষ্ট রেখা ও হাল্কা রঙের নিপুণ প্রয়োগে মধুর হয়েছে এই রচনাটি। নীলিমা দে'র 'পারাবত' একটি সুন্দর রচনা, কিন্তু পারাবতগুলো অত্যন্ত বেশি সাজিয়ে বসানোর জন্য চিত্রের মান একটু ক্ষুন্ন হয়েছে। মদনমোহন রায়ের পঞ্চবটি, গোষ্ঠবিহারী কুমারের মানভঞ্জন এবং 'জয়ের পরে'র রঙ, কম্পোজিশন এবং ড্রইং বেশ ভাল যদিও তা অত্যন্ত গতানুগতিক ঢঙে আঁকা। যূথিকা ঘোষের বসন্ত ছবিটির রঙ ও কম্পোজিশান ভাল, কিন্তু ড্রয়িংয়ের হাত কাঁচা। টি রঙের সিল্কের পরে তাদের খাঁটি দেশীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত নৌকা ও প্যাগোডার রঙ মোলায়েম ও পরিবেশ মনোরম। অমরনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের 'কুয়াসাচ্ছন্ন সকাল' বেশ ভাল কাজ। গোপাল সান্যালের ৪নং পেন্সিলের ছোট্ট কাজটিতে গতি আছে। কান্তি রায়ের কালি দিয়ে আঁকা 'কলেজের কোণে' ছবিটিতে বিশিষ্ট এক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ক্ষুধার্ত কুকুরের রঙীন স্কেচটি সজীব, সমীর সরকারের ক্রেয়ন ড্রইং নং ৭৩, অমলেন্দু চক্রবর্তীর ৮০নং স্টাডিও এই পর্যায়ের। শঙ্কর নন্দীর 'জল রঙের' রচনায় হলদে মেঘগুলোর সোনালী আভা এবং মাটির বুকে ঘন বন উপভোগ্য এক নতুন জগতের সৃষ্টি করেছে। তারসেনলাল পালের 'একটি প্রতিকৃতি' ভাল হলেও তাতে অনুকরণ-প্রয়াস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সনৎ করের খয়েরী রঙে তুলির পোঁচে আঁকা 'সুখী পরিবার' একটি বলিষ্ঠ কাজ। ফণিভূষণ ঘোষের 'সাথী'—ড্রইং প্রভৃতির দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও ভাল লাগে। কল্যাণী চক্রবর্তীর রাঙামাটি আর একটি সুন্দর দৃশ্যচিত্র, কিন্তু

'চীনাপল্লী' শিল্পী—শ্রীকমল চৌধুরী

বড় ফাঁকা ঠেকে—দু-একটি মানুষের প্রয়োগে ছবিটি আরও প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠত বলে মনে হয়। অনিলবরণ রায়ের—২৭৩নং এবং ২৭৫নং ছবি দুটি রঙের ব্যবহারে একই ধরণের হলেও বিশেষ দৃষ্টিকোণের জন্য উপভোগ্য। বিমলকুমার সাহার কলম ও কালির আঁচড়ে আঁকা 'খোড়া' ছবিটি, সুভাষ রঞ্জনসিং রায়ের হাতী ফটকা

কাপড়ের পোস্টার
শিল্পী—অমূল্যভূষণ চৌধুরী

সুরচিত। সলিলকুমার ভট্টাচার্যের গরু ও মোষ একটি সুন্দর বলিষ্ঠ কাজ—তবে দুপাশে ঠিক মধ্য পটের মত আরও 'ফিনিশ' করলে ভাল হত। গোকুল বরের জোনায় দৃশ্যর রঙ কাঁচা—দু একটি ফিগার ব্যবহারে ছবির বিন্যাস আরও জমত। সত্যেন দত্তর গ্রাম্য পুষ্করিণী মন্দ নয়। শঙ্কর বসুর নৌকা এবং 'গ্রাম্যজীবনে' জ্যোৎস্নারাত্রের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও নারিকেল বৃক্ষের আড়ালে আলো-আঁধারের খেলায় বেশ প্রসন্নতা আছে। অসিত সেনের জোড়া নৌকো ও মুরগীর লড়াই ভাল লাগল। সুনির্মল বসুর চেতলার পেন্সিল ড্রইংটি বেশ পরিচ্ছন্ন।

তেল রঙের কাজগুলো অত্যন্ত কাঁচা, এদের মধ্যে হৈমন্তী সেনের ৫০৯নং প্রতি-কৃতিটি মিষ্টি রঙের ব্যবহারে ভাল হয়ে উঠেছে। মনতোষ কুশারীর বিশা, রবীন হালদারের প্রতিকৃতি নং ৪৪৯ও মোটের উপর ভাল।

'গ্রাফিক আর্ট'এর কাজগুলোর মান বেশ উন্নত এবং প্রায় প্রত্যেকটি কাজই উচ্চ-স্তরের। এদের মধ্যে চিত্ত দাসের ফকীর (কাঠখোদাই)ও বেশ ভাল কাজ। সত্যেন দত্তর সরোবরের তীরে রাত্রি (রঙীন কাঠ খোদাই) রচনাটিতে বেশ একটা রহস্যেভরা রোম্যাণ্টিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু মোটর গাড়িটি বসিয়ে তিনি সেই আবহাওয়াকে একেবারে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। সুমঙ্গল সেনের রঙীন কাঠ খোদাই (৬৮৮) শচীন রায়ের কাঠখোদায়ের ক্লাস (দ্বিবর্ণ কাঠ খোদাই) অরুণ গুহ-ঠাকুরতার কাঠ খোদাই (৬৯৪) গোকুলচন্দ্র বরের 'মা' (কাঠ খোদাই নং ৭০১) প্রবোধ-কুমার দাসের ৭২৩নং রচনা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

মূর্তিগুলো প্রায় প্রত্যেকটিই ভাল, যদিও ক'একটি কাজে অতিমাত্রায় অনুকরণপ্রিয়তা বড়ই দৃষ্টিকটু লাগে। বিপ্রচরণ মহান্তির 'তারক দাস', 'প্রসাধন' এবং ১১৮৯নং 'প্যানেলটি' জিতেন্দ্রনাথ নাগের 'মা ও ছেলে'র সুন্দর ছোট প্যানেলটি, আশুতোষ সামন্তর ১১৯৪নং লম্বা প্যানেল বেশ ভাল লাগল। সমরেশ চৌধুরীর 'প্রাতঃ ভোজন' ছোট্ট কাজ হলেও প্রদর্শনীর এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। দুগ্ধপানরত ছাগলের বাচ্চা-গুলোর দুগ্ধপানে ব্যস্ততা এবং মায়ের শান্ত ভাবটি সুন্দর ফুটেছে। গোষ্ঠবিহারী কুমারের 'লক্ষ্মী' এবং 'ছন্দ' ভারতীয় আঙ্গিকে তৈরী সুন্দর কাজ। এ ছাড়া শ্রীদাম সাহার 'ব্রতচারী নৃত্য' আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। সভাস্থলটি সাজানোয় কলেজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যে যত্ন ও পরিশ্রম করা হয়েছিল এবার সেই যত্ন না নেওয়ার জন্য সভাস্থলটি শিল্পবিদ্যায়তনের এই বাৎসরিক অনুষ্ঠানের মর্যাদা রক্ষা করতে পারেনি। কোনভাবে জোড়া-তালি দিয়ে সাজানোর

একটি আদিবাসী মেয়ে
শিল্পী—মনোরঞ্জন ঠাকুর

প্রচেষ্টায় ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছিল। আর একটি কথা এই যে, বিদ্যালয়ের প্রধান প্রবেশদ্বারের ওপরে যে অপূর্ব আলপনার বিরাট চিত্রটি টাঙানো হয়েছে সেটিও প্রদর্শনী গৃহে বিশেষ স্থান পাবার যোগ্য ছিল—এতই সুন্দর সেই আলপনার কাজটি, কিন্তু তার ওপরে বার্ষিক প্রদর্শনীর নাম লিখে মনে হয় তাকে নষ্ট করা হয়েছে এবং অবশ্য দর্শনীয় এই সুন্দর কাজটি সাধারণের দৃষ্টি এড়িয়েই যায়। এ-বিষয়ে শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্ররা আরও মনোযোগ দিলে সুখী হতাম।

বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ

(Glimpses of World History) ঃ জওহরলাল নেহরু ঃ প্রকাশক—শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার; শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস; আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী; ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯ ঃ মূল্য বারো টাকা আট আনা।

শ্রীজওহরলাল নেহরু Glimpses of World History একখানি বিশ্ব-বিশ্রুত গ্রন্থ; ভারতীয় চিন্তানায়কবৃন্দের রচিত স্বল্পসংখ্যক যে-কখানি গ্রন্থ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ-দেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে, তার অন্যতম। এ-স্থলে একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। এ-গ্রন্থ যখন রচিত এবং প্রকাশিত হয়েছিল, আমাদের তখন বন্ধনদশা চলছে। অন্যান্য দেশের কাছে ভারতবর্ষকে যাতে স্বাধীনতা লাভের অনুপযুক্ত একটি প্রায় অসভ্য দেশ বলে প্রমাণ করা যায়, বিদেশী শাসকদের পক্ষ থেকে তার জন্যে তখন কোনও-রকম প্রচেষ্টারই কোন ত্রুটি হয়নি। সে অপপ্রচার যে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে, তার জন্যে—শুধু-মাত্র রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছেই নয়—চিন্তা-নায়কদের কাছেও আমরা ঋণী। জননায়ক এবং চিন্তানায়ক—জওহরলালের মধ্যে এই দুই পৃথক সত্তার এক সুবর্ণ সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যাবে। এবং তাঁর সংস্কৃতিবিষয়ক গ্রন্থাদির মধ্য দিয়েও বিশ্ববাসীর হৃদয়ে তিনি চিন্তার যে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এতদ্দেশীয় রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তি-আন্দোলনের স্বপক্ষেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তা কম সহানুভূতি সৃষ্টি করেনি। তাঁর আত্মজীবনী এবং আলোচ্য গ্রন্থপাঠে অন্যান্য দেশের অধি-বাসীরা যে শুধু লেখক জওহরলালের প্রতিই শ্রদ্ধা অনুভব করেছেন তা-ই নয়, যে মুক্তি-সংগ্রামের তিনি তখন অন্যতম পুরোবর্তী সৈনিক—তার প্রতিও শ্রদ্ধা অনুভব করেছেন। কালতাৎপর্য বিচারে তার গুরুত্ব খুব কম নয়।

বিশ্বের ইতিহাস রচনায়—ইতিহাসের পাঠক-মাত্রেই জানেন—সচরাচর দুটি বিভিন্ন পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এক, প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি দেশ এবং জাতির আনু-পূর্বিক ইতিহাস রচনা; আর নয়তো সমগ্র পৃথিবীকে একটি অখণ্ড সত্তা হিসেবে গ্রহণ করে অতঃপর সেই সমগ্রতার পটভূমিকায় কাল-পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দেশ এবং জাতির পারস্পরিক সম্পর্কের আলোচনা। অর্থাৎ কেউ কেউ দেশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন, কেউ কেউ কালের ওপর।

দুটি পথেই সার্থক ইতিহাস রচিত হওয়া সম্ভব এবং তা হয়েওছে। তবু, তুলনামূলক বিচারে, দ্বিতীয় পন্থাটিকেই অধিকতর নির্ভর-যোগ্য বলে মনে হবে। তার কারণ, যতোই না কেন সতর্কতা অবলম্বন করা হোক, ঐতিহাসিক যদি বিভিন্ন দেশের নিজস্ব ইতিহাসের ওপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন তো তার মধ্যে খানিকটা পরিমাণে ত্রুটি থেকেই যাবে, এমন আশঙ্কা বর্তমান। কেননা, কোনও দেশের ইতিহাসই তার নিজস্ব ইতিহাস নয়। সে ইতিহাসের মধ্যে আর পাঁচটা দেশেরও আংশিক ইতিহাস জড়িয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আলেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষে এসেছিলেন, তখনকার কালের ভারতীয় ইতিহাস কি শুধু ভারতবর্ষেরই ইতিহাস? গ্রীসেরও নয়? সে বিচারে কালপারম্পর্য অনুসারে মধ্যপ্রাচ্য, পর্তুগাল, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ইত্যাদি বহু ভূখণ্ডেরই আংশিক ইতিহাস ভারতীয় ইতিহাসের অঙ্গীভূত হয়ে রয়েছে। এ কারণে, যাঁরা প্রথম পন্থানুসারী ঐতিহাসিক, একটি দেশের পর্ব সমাপ্ত করে তাঁরা যখন অন্যদেশের পর্ব শুরু করেন, অনিবার্যভাবেই তখন—কিছু কিছু পরিমাণে হলেও—পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে।

জওহরলাল দ্বিতীয় পন্থাটিকে গ্রহণ করেছেন। প্রাধান্য দিয়েছেন কালকে, দেশকে নয়। তাঁর রচিত ইতিহাসের পটভূমিকা তাই সমগ্র বিশ্ব; এবং সেই সমগ্রতার পরিপ্রেক্ষিতেই কালানুসারে তিনি বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের সূত্র ধরে তাদের ইতিহাস আলোচনা করেছেন।

এখানে একটা কথা ওঠে। স্বতন্ত্র ইতিহাস না থাকুক, কোনও দেশেরই কি অন্যদেশ-নিরপেক্ষ কোনও স্বতন্ত্র সত্তা নেই? আছে। তবে ঘটনার মধ্যে সে-স্বাতন্ত্র্য নিহিত নয়, দেশের সত্তায় কিভাবে সেই ঘটনার প্রতিফলন ঘটছে—তারই মধ্যে। জওহরলালের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো এই যে, ঘটনাবিচারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের ইতিহাসকে একীভূত করে নেওয়া সত্ত্বেও, তাদের সত্তার সেই স্বাতন্ত্র্যকে তিনি অবহেলা করেননি।

বস্তুবুদ্ধির একাগ্র তীক্ষ্ণতা এবং ঠিক তারই পাশাপাশি পরম-নৈর্ব্যক্তিক দার্শনিক মানোভাব, এই দুইয়ে মিলিয়ে বর্তমান গ্রন্থের লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী একটি আশ্চর্য পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। যে উৎসাহে তিনি ইতিহাসের বহিরঙ্গের বিশ্লেষণ করেন, ততোধিক উৎসাহে তিনি তার অন্তর-চেতনার অন্বেষণে মগ্ন হন। ব্যবহারিক রাষ্ট্রনীতির তাৎপর্য-বিচারে তাঁর যতোখানি আগ্রহ, রাষ্ট্রদর্শনের বিশ্লেষণে ততোধিক। এবং এই কারণেই বিভিন্ন দেশ এবং জাতির প্রত্যেক ইতিহাস আলোচনার পরে তিনি তার অন্তরালবর্তী আর একটি abstract ঐতিহাসিক ক্রমপ্রবণতার সঙ্গেও পাঠকদের পরিচয় ঘটিয়ে দিতে পেরেছেন।

সে প্রবণতা শুধুই মাত্র রাজনৈতিক নয়; ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা—ইত্যাদি সমস্ত কিছুরই সে নেপথ্য-চালক। দেশ এবং জাতির উত্থান-পতনের এক-একটি সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে নেহরু তাকে অত্যন্তই নিষ্ঠার সহিত বিবেচনা করে দেখেছেন।

বিশ্ব-ইতিহাস রচনায় লেখকের মধ্যে যে গুণটির অস্তিত্বের প্রয়োজন সর্বাধিক, তা হলো আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী; এবং সেইসঙ্গে বিচারবুদ্ধির নৈর্ব্যক্তিক ঔদার্য। এই আন্ত-র্জাতিকতা এবং ঔদার্যের অভাবেই এতদ্দেশীয় এবং বৈদেশিক বহু গ্রন্থকার তাঁদের রচিত গ্রন্থাদিতে বহুস্থানেই ইতিহাসের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেছেন। শ্রী নেহরুর আন্তর্জাতিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর কথা সর্বজনবিদিত। যদিচ প্রগাঢ় দেশ-প্রেমিক, সে-প্রেম বহির্বিশ্বকে তাঁর চোখের থেকে আড়াল করে রাখেনি। প্রতিটি দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস এবং সভ্যতাকে তিনি তদ্দেশীয় পরিপ্রেক্ষিতে এবং মূল্যবিচারের আপনাপন কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখেছেন। এই ঐতিহাসিক সততার মধ্যেই বর্তমান গ্রন্থের সার্থকতা নিহিত।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আজ যে সংকটজনক অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, তা কিছু একদিনকার আকস্মিক ব্যাপার নয়। ঘটনাপারম্পর্যের মধ্যে তার কারণ নিহিত। সে সম্পর্কে যাঁরা একটা ক্রমানুসারী সুশৃঙ্খল ধারণা অর্জন করতে চান, প্রাগ্-আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত এই ইতিহাস-গ্রন্থ পাঠে তাঁরা অপরিসীমভাবে উপকৃত হবেন। বিশেষভাবে যুবসমাজের পক্ষে, দেশের ভবিষ্যৎ যাঁদের ওপর নির্ভরশীল, এ-গ্রন্থ অপরিহার্য। জে এফ হোরাবিন অঙ্কিত মানচিত্রসমূহের এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

অনুবাদ অত্যন্তই বলিষ্ঠ এবং ঋজু, সামান্য-মাত্র আড়ষ্ট না হয়েও সর্বত্র মূলানুসারী। 'বিশ্ব-ইতিহাস প্রসঙ্গ' বাঙলা অনুবাদ-সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। ২২৩।৫১

টাকা কোন পথে?—অধ্যাপক শ্রীভবানীচরণ রায়। প্রাপ্তিস্থান—দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য ১, টাকা। ১৪।৫১

হাস মুরগী চাষ সংক্রান্ত ব্যবসায়ের এমন দুই একটি দিক আছে, যাহা আমাদের স্বল্প আয়ের পরিবারগুলি ও বেকার যুবকদের যথা-ক্রমে উপরি রোজগারের এবং উপজীবিকার সংস্থানের বিশেষ সহায়ক হইতে পারে। এমন একটি দিক হইতেছে, যেমন 'তা'-কামরার (কৃত্রিম উপায়ে ডিমে তা দেবার যন্ত্র) সাহায্যে হাঁস মুরগীর ডিম ফোটানো এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হাঁস মুরগীর ছানা বিক্রয়ের ব্যবস্থা

করা। ডিম ফোটানোর ব্যবসা একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবসায়। ইহা হাঁস মুরগী পালন সংক্রান্ত ব্যাপার হইতে সম্পূর্ণ একটি পৃথক শিল্প বলিয়া পরিগণিত। এই কারবারের জন্য অধিক মূলধনের বা জমির অথবা কায়িক পরিশ্রমের আদৌ কোন প্রয়োজন নাই।

পুস্তকখানি সময়োপযোগী হইয়াছে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। ১৪।৫১

স্তোত্ররত্নম—শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত (শ্রীযামুনাচার্য-বিরচিতম) প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৸৹ আনা।

যামুনাচার্য বা যামুন মুনি শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 'সন্ত আল ওয়ার' বা 'আল ওয়ান্দর' নামে পরিচিত। বেদান্ত ভাষ্যকার, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রধানত প্রচারক এবং শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গুরু আচার্য রামানুজ এই যামুন মুনিরই শিষ্য ছিলেন। যামুন মুনির রচিত 'স্তোত্ররত্নম্' ভক্তিরসের অমৃতধারা বলিয়া ভারতের সাধক ও ভক্তসমাজে চিরকাল সমাদৃত হইয়া আসিয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থেও স্তোত্ররত্নম হইতে বিভিন্ন শ্লোক উধৃত হইয়াছে দেখা যায়। এই অপূর্ব অধ্যাত্ম সম্পদ বাঙালী সমাজের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক সুপণ্ডিত শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয় প্রকৃতই একটি মহৎ কার্য সম্পাদন করিয়াছেন। 'স্তোত্ররত্নম' মোট ৬৫টি শ্লোকে সমাপ্ত, আলোচ্য গ্রন্থে মূল শ্লোক এবং তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় যামুনাচার্য ও রামানুজাচার্য সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে। ভূমিকাটুকু হইলেও তথ্যবহুল এবং পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। বাঙালী সাধক ও ভক্তসমাজে গ্রন্থখানি বিশেষ সমাদর লাভ করিবে, এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ২৫৮।৫১

জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর—শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট।

জৈনধর্ম ও সংস্কৃতি ভারতের পরম গৌরবের বস্তু। আলোচ্য পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর জীবনী, তাঁহার পরবর্তী জৈনাচার্যগণের বিবরণ এবং সর্বশেষে ভগবান্ মহাবীরের অমূল্য বাণীসমূহ উধৃত করিয়াছেন। তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্তমান জৈন যুগ বা অবসর্পিনীর শেষ তীর্থঙ্কর; পার্শ্বনাথ ইহার পূর্ববর্তী। ভগবান ঋষভদেব প্রথম তীর্থঙ্কর। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের পঞ্চম স্কন্ধের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিষ্ণুর অন্যতম অবতারস্বরূপে ভগবান ঋষভদেবের জীবন-লীলা উপদিষ্ট হইয়াছে। জৈন দর্শনের সম্বন্ধে পরোক্ষভাবে পরিচয় তাহাতে কিছু কিছু পাওয়া যায়; তাহা ছাড়া এত বড় একটা প্রধান ধর্মমতের সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা আমাদের কিছু নাই বলিলেই চলে। সংক্ষেপে হইলেও তীর্থঙ্কর মহাবীরের জীবনী আলোচনার ভিতর দিয়া গ্রন্থকার সেই অভাব অনেকখানি পূর্ণ করিয়াছেন। গান্ধীজীর

অহিংসা-নীতির মূলীভূত দার্শনিকতাকে উপলব্ধি করিতে হইলে জৈনধর্ম এবং দর্শনের সম্বন্ধে আমাদের সমাজ-জীবনে সমধিক আগ্রহ উদ্দীপ্ত হওয়া প্রয়োজন। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি। ২৮৮।৫১

সতি পট্ঠান ভাবনা—(বুদ্ধ বর্ণিত বিমুক্তি মার্গ)। শ্রীপ্রজ্ঞালোক স্থবির প্রণীত। প্রাপ্তি-স্থান—শ্রীঅনোমদর্শী ভিক্ষু, নালন্দা বিদ্যাভবন, ১নং বুদ্ধিস্ট টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—এক টাকা।

ধ্রুবা-স্মৃতির সাহায্যে চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করিয়া সত্যকে উপলব্ধি করিবার সতি পট্ঠান-সুত্ত বা সত্য-প্রস্থান সূত্রে বিবৃত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সেই প্রস্থান বা প্রতিষ্ঠা বা ধারণার প্রণালী সহজভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বৌদ্ধদর্শনের উপদিষ্ট অষ্টাঙ্গ-যোগের সাধনার বৈজ্ঞানিক ধারাগুলি এই সূত্রের মধ্যে পাওয়া যায় এবং এই সাধন-প্রকরণ অবলম্বন করিয়া সাধক সম্যক্ দর্শনের সাহায্যে নির্বাণ-মুক্তি লাভে অধিকারী হন। চিন্তার গাঢ়তা এবং মননের শুদ্ধির পক্ষে এমন আলোচনা যত প্রচারিত হয়, সমাজের পক্ষে ততই মঙ্গল। ১৮৭।৫১

গণেশের কাহিনী—(রূপক) শ্রীশ্রীনূপেন্দ্রনাথ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২।১, কালিদাস পতিতুণ্ডী লেন, কলিকাতা—২৬। মূল্য—দুই টাকা চার আনা।

গ্রন্থকার গণেশ নামক এক রাখাল বালকের জীবনের কথা অবলম্বন করিয়া গল্পের রূপকে উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের নীতি পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গণেশের জীবনে প্রত্যালব্ধ আদেশের ভিতর দিয়া তিনি এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন যে, উচ্চ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইলে (১) সত্যকে বাক্যে, কার্যে ও চিন্তায় আদর করিতে হইবে; (২) সংযমী হইতে হইবে; (৩) জগতের ভোগ-সুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দ-লীলা বা সৌন্দর্যে চিত্তকে নিমগ্ন করিতে হইবে; (৪) ভগবানই সর্বস্ব জানিয়া তাঁহার অনুধ্যান করিতে হইবে; (৫) 'আমি তোমার' এই ধারণা সহ সেবা-বুদ্ধিতে কর্ম করিতে হইবে; (৬) পরনিন্দা ও পরচর্চা পরিত্যাগ করিয়া আত্মানুসন্ধিৎসু হইতে হইবে; (৭) বর্তমানকে সাধুকার্যের দ্বারা সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে; কারণ বর্তমানই ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তোলে; (৮) ঈশ্বর-নির্ভরতায় ভয়-ভাবনার মধ্যেই কল্যাণের উপলব্ধি করিতে হইবে; (৯) আমি ও আমার ভাব ছাড়িতে হইবে; (১০) স্বাস্থ্য-বিধি পালন করিতে হইবে; (১১) সেবাপরায়ণ হইতে হইবে; (১২) অন্তর্জগতে মনোনিবেদন করিতে হইবে।

সমাজের নৈতিক বল সংগঠনে পুস্তকখানি সাহায্য করিবে। সার্বভৌম মানবতা এবং আদর্শের অসাম্প্রদায়িকতা পুস্তকখানির বিশেষত্ব। ২৮৯।৫১

শ্রীসুদর্শন—ত্রৈমাসিক পত্র। রাসপূর্ণিমা সংখ্যা। সম্পাদক—ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার। কার্যালয়—৩নং অন্নদা নিয়োগী লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য— চার টাকা।

ভাবগর্ভ এবং চিন্তাশীলতাপূর্ণ আলোচনার ক্ষেত্রে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মুখপত্র শ্রীসুদর্শন খ্যাতিলাভ করিয়াছে। আলোচ্য সংখ্যাতেও শ্রীসুদর্শনের সেই বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রহিয়াছে। ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরীর "পঞ্চসাধন, প্রপত্তি", স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী লিখিত "তপস্যা", শ্রীমতিলাল রায়ের "গীতার মোক্ষবাদ", ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী লিখিত "গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়", শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য লিখিত "সর্বধর্ম সমন্বয়ে বাঙলা", গঙ্গানন্দ ব্রহ্মচারী লিখিত "কুলদানন্দ", 'দেশ' সম্পাদক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন লিখিত "দয়াভূতেষু" সবগুলি লেখাই সারগর্ভ এবং সুচিন্তিত।

প্রভু অতুলকৃষ্ণ—প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণকিশোর গোস্বামী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা।

প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজের এই জীবনী-গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম উপকৃত হইয়াছি। এইরূপ একজন মহাপুরুষের জীবনী প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার বাঙলা দেশে একটি বিশেষ অভাব পূরণ করিয়াছেন। প্রভুপাদ নিজে গ্রন্থকারকে তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনা লিখিয়া রাখিতে নির্দেশ দিতেন, আলোচ্য গ্রন্থের উপকরণস্বরূপে সেইগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। বর্ণনা মধুর এবং হৃদয়গ্রাহী, অনেক স্থলে উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক। প্রভুপাদের পুণ্য জীবনের আলোচনা সূত্রে মোটামুটি বিগত অর্ধ শতাব্দীর বাঙলার সংস্কৃতির অভিব্যক্তির অধ্যায় উন্মুক্ত হইয়াছে এবং বৈষ্ণব-সাধনা পুনরুজ্জীবন সাধনে অতুলকৃষ্ণের জীবনাদর্শের প্রভাব উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়াছে। এমন পুণ্য জীবনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য। আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি। ছাপা, কাগজ এবং বাঁধাই সুন্দর।

লাল মাটির দেশে

সুশীলকুমার গুপ্ত

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলা ছেড়ে
দ্রুতগতি ট্রেনে এসে পড়ি লাল মাটির দেশে।
বাউল গাছেরা শীর্ণ শাখার আঙুল নেড়ে
বাজায় বায়ুর একতারা দূর আকাশ ঘেঁষে।

উত্তরহীন প্রশ্নের মত রয়েছে লেখা
আঁকাবাঁকা পথ। ওঠে ঘুরে ঘুরে চিলের ঝাঁকে
আকাশ-বাসনা। নীল পাহাড়ের জটিল রেখা
দুর্জ্ঞেয় মহাজীবনের ছবি হঠাৎ আঁকে!

পাথরের নুড়ি শরশয্যায় শুয়ে কোপাই।
সাদা বালুচর-বুকে বিধবার পিপাসা ঝরে।
ধূসর আকাশ মেখে সারা গায়ে মেঘের ছাই—
প্রখর রৌদ্রালোকে চিতা জেলে সাধনা করে।

প্রান্তর-জটাজাল গৈরিক ঘূর্ণি-ধূলি।
ঘুঘুর করুণ সুরে ধরণীর বিরহী কবি
লেখে জীবনের ব্যথার কাব্য। রোদের তুলি
আঁকে বাংলার বৈরাগী ম্লান বিরহী ছবি।

খুব ভালো লাগে শ্যামল সজল বাংলাদেশ।
তবু এ রুক্ষ বাংলার ছবি কাড়ল মন।
জীবন পরেছে ত্যাগ-বিরহের দীপ্ত বেশ,
এইখানে বুঝি আছে কোন সুর চিরন্তন!

ভারতে উদ্ভিদ রোগ ও কীট ধ্বংসের ব্যবস্থা

বাণিজ্যের উন্নতির সংগে সংগে বীজ ও অন্যান্য কৃষি দ্রব্য আমদানী রপ্তানির মাধ্যমে উদ্ভিদ রোগ ও কীট বিস্তারলাভ করিয়াছে। প্যাকিং-এর দ্রব্যাদি যেমন খড়, ঘাস প্রভৃতির সাহায্যেও কীট এক দেশ হইতে অন্য দেশে চলিয়া যায়।

উদ্ভিদ রোগ ও কীট বিস্তারের বিপদ বুঝিয়া ভারত সরকার ১৯১৪ সালেই ক্ষতিকারক পোকামাকড় সংক্রান্ত আইন রচনা করেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও কয়েক রকমের কীট বা পোকামাকড় যেমন, জোলে স্কেল, উলি আপালিন, আলুর মথ প্রভৃতি ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের আরও অনেক রকমের উদ্ভিদ রোগ, কীট প্রভৃতি এখনও ভারতে আসিতে পারে নাই। কিন্তু এখন যে হারে বাণিজ্য বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে এই সব রোগ বা কীটের ভারতে প্রবেশ করিবার যথেণ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। বিদেশের উদ্ভিদ রোগ ও কীট যাহাতে ভারতে না আসে এবং ভারতের উদ্ভিদ রোগ ও কীট যাহাতে বিদেশে না যায় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। এই কারণে উদ্ভিদ রোগ ও কীট বিনাশক ব্যবস্থা অবলম্বন করা অপরিহার্য প্রয়োজন।

উদ্ভিদ রোগ প্রভৃতির বিস্তার রোধ করার গুরুত্ব সকল রাষ্ট্রই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের খাদ্য ও কৃষি সংঘ সম্প্রতি একটি আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ সংরক্ষণ বিধান মানিয়া লইয়াছেন। ভারত এবং অন্যান্য রাষ্ট্রও যত শীঘ্র সম্ভব বিনাশক ব্যবস্থা অবলম্বনে স্বীকৃত হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের সেউড়িতে উদ্ভিদ নিরোগ ও বিনাশক কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। এখানে ১০, ১০০ ও ২০০ বর্গফুট মাপের তিনটি বায়ুশূন্য কক্ষ আছে এবং সেখানে বিভিন্ন আকারের গাছপালা বা শস্যাদির কীট ও রোগমুক্ত করা যাইবে। ইহাতে খুব শক্ত করিয়া প্যাক করা যেমন তুলা, বস্ত্র, তামাক প্রভৃতিও নিঃসন্দেহভাবে কীট-মুক্ত করা চলিবে।

ভারতের অন্যান্য বন্দরেও অনুরূপ বিনাশক কেন্দ্র স্থাপন করা যাইবে।

বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানীর হিসাব

গত ১৯শে ডিসেম্বর আন্তিক সপ্তাহে ভারত বিদেশ হইতে ১,৩৩,১০০ টন খাদ্য-শস্য আমদানী করিয়াছে।

গত ১লা জানুয়ারী (১৯৫১) হইতে এ পর্যন্ত যে পরিমাণ শস্য আমদানী হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইলঃ—

গম	২৮,০২,০৫০ টন
ময়দা	৪৫,২০০ টন
চাউল	৭,৩৭,৭৫০ টন
মাইলো	৯,৫১,৪৫০ টন

ঐ সময়ে এই দেশে মোট ৩৩,৭৬,৭৫০ টন খাদ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে।

রঙ্গজগৎ

মিনার্ভায় "রাজা কৃষ্ণচন্দ্র"

নাটক ব্যাপারে কলকাতার মঞ্চগুলিকে এমন একটা ঔদাস্য পেয়ে বসেছে যে সত্যি দেখাবার মতো উপাদান হাতে পেয়েও অবহেলা করাটা যেনো স্বভাবেরই অংশ দাঁড়িয়ে গিয়েছে। অবশ্য আর্থিক দুরবস্থাই এই স্বভাবটাকে টেনে আনার প্রধান কারণ, তাছাড়াও এমন বহু কিছুই দেখা যায় যে শোভনীয় ও মানানসই করে তুলতে পয়সার প্রশ্ন না থাকলেও উপেক্ষা করে যাওয়া হয়। গত ২১শে ডিসেম্বর মিনার্ভা থিয়েটারে মঞ্চস্থ 'রাজা কৃষ্ণচন্দ্র' এই কথাই মনে করিয়ে দেয় বেশী করে।

বাঙলার এক প্রোজ্বল সাংস্কৃতিক যুগের পট অবলম্বনে 'রাজা কৃষ্ণচন্দ্র' নাটকখানি রচনা করেছেন ইন্দুমাধব ভট্টাচার্য। ব্যক্তিগতভাবে আলাদা করে ধরলে কেবল রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে নিয়েই দুর্দান্ত একটা নাটক গড়ে তোলার মতো মালমসলা হয়তো ততো পাওয়া যাবে না, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারের পারিষদ ও পারিপার্শ্বিক, তৎকালীন বাঙলার সমাজজীবন ইত্যাদি নিয়ে জমকালো নাটক রচনা করা যায়—তার জন্যে ভয়ানক কিছু অনুশীলনের দরকার হয় না, আর খরচের অংকও এমন বিরাট কিছু হয়ে দাঁড়ায় না যা এখনকার অবস্থায় সামলানো অসম্ভব।

আলোচ্য নাটকখানিকে সেদিক দিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়নি। ইতিহাসের সঙ্গে এর যোগসূত্র নিতান্তই সামান্য। কতকগুলি চরিত্রের নামের সঙ্গে মিল, এবং কিংবদন্তী থেকে শোনা কয়েকটি ঘটনা ছাড়া প্রকৃত ইতিহাস এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে সব দিক দিয়েই। সব বিষয়েই কল্পনাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে আগাগোড়া—ঘটনার দিক থেকে, সাজপোষাকে, দৃশ্যপটে সব বিষয়েই। তা ছাড়া বলবার বা শোনাবার মতো এক নির্দিষ্ট প্রতিপাদ্য সামনে তুলে ধরতে না পারলে নাটকের সার্থকতা চমক দেয় না। এখানে নাটকখানিকে কোন বিষয়ে উদ্দীপ্ত করা হবে তা-ই নাট্যকার ঠিক করতে পারেননি। এটা হয়েছে খানিকটা ভক্তিমূলক, খনিকটা গোপালের ভাঁড়ামি খানিকটা অন্ধ প্রণয়। অনেক নাটককে আবহাওয়ার চমৎকারিত্বে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়, এখানে সেদিক থেকেও চেষ্টার কোন পরিচয় নেই।
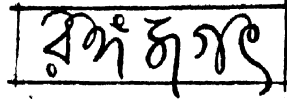
নতুন নাটক এবং কাছাকাছি ইতিহাসের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলেও এমনভাবে নাটকখানিকে সাজানো হয়েছে যাতে স্পষ্টই ধরা পড়ে যায় যে, এর জন্যে দরকার হলেও বিশেষ করে সাজ-পোষাক, পট আসবাব কিছুই তৈরী করা হয়নি, যা হাতের কাছে তৈরী ছিলো তা-ই দিয়েই কাজ চালিয়ে নেবার চেষ্টা করা হয়েছে। দেখে মনে হলো যে মিনার্ভা হিন্দী নাটকের জন্যেই যা-কিছু তৈরী করছে এবং বাঙলা অভিনয়কে হিন্দীর 'বাই প্রডাক্ট' হিসেবেই পরিবেশন করা হচ্ছে। আর তা করতে যাওয়ার ফলে বাঙলা নাটকের রূপ ও প্রকৃতি হয়ে যাচ্ছে হিন্দীর অনুগামী; সব বৈশিষ্ট্য যাচ্ছে হারিয়ে। মিনার্ভায় এর আগের নাটক 'নরমেধ যজ্ঞ' থেকেই এই অবস্থাটা বেশ ফুটে উঠেছে। মিনার্ভায় এখন যারা বাঙলা নাটক পরিবেশনের ভার নিয়ে রয়েছেন সম্ভবত এই অসুবিধের জন্যেই তাদের পক্ষে বিশেষ কিছু দেখানো হয়ে উঠছে না।

নাটকখানিতে দুটো কাহিনী দুদিক দিয়ে নিয়ে গিয়ে শেষে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক হচ্ছে কাঞ্চী রাজকন্যা রাধা ও কামরূপের রাজপুত্র জয়ন্তের পরিণয়; আর অপরটি হচ্ছে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বেতালসিদ্ধির রহস্য। এই দুটি কাহিনীর যোগসূত্র রাখা হয়েছে এইভাবে—কাঞ্চীরাজ কন্যা রাধা সহায়সম্বলহীনা অবস্থায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রিতা হলো। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ওপর গুরুর আদেশ রাধার সঙ্গে কামরূপের রাজপুত্র জয়ন্তের পরিণয় ঘটাতে হবে। গুরু কৃষ্ণচন্দ্রের বেতাল সিদ্ধিরও ব্যবস্থা করলেন, তবে জানালেন যে, রাজা সিদ্ধিলাভ করতে পারবেন যদি তিনি জেনে নিতে পারেন রাধা সতী কি-না। কৃষ্ণচন্দ্র এই প্রমাণ সংগ্রহের জন্য বয়স্য গোপাল ভাঁড়কে নিয়োগ করলেন। এই ব্যাপারে গোপালের অভিযানই নাটকের প্রধান উপাদান। নানা হাস্যকর ঘটনার মধ্যে দিয়ে প্রমাণ দাঁড় করানো হলো যে রাধা সতী। কাজেই রাধার সঙ্গে জয়ন্তর মিলন হলো, আর কৃষ্ণচন্দ্রও বেতালসিদ্ধ হয়ে দেবী জগদ্ধাত্রীকে প্রতিষ্ঠা করলেন।

কাহিনীর উদ্দেশ্য মনে হলো, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক দেবী জগদ্ধাত্রীর পূজা প্রবর্তন নিয়ে। কিন্তু তাই নিয়ে মাঝের আনুষঙ্গিক ঘটনাবলীকে এতো বেশী প্রাধান্য দিয়ে ফেলা হয়েছে যে শেষ পর্যন্ত নাটকখানির ভক্তিমূলক রূপটা ঠিক থাকতে পারেনি। রাধা ও জয়ন্তর প্রণয় কাহিনীর মধ্যেও এতো বেশী ফাঁক যে সেদিক দিয়েও নাটকের আকর্ষণ দৃঢ় নয়। উপভোগ করার জন্যে আছে শুধু গোপালের ভাঁড়ামি কিন্তু তাও এমনি অপ্রতুল এবং এমনি আধাখেচড়াভাবে এনে ফেলা হয়েছে যে গোপালের রঙ্গ-তামাসা সম্পর্কে লোকের ধারণা তেমন তৃপ্তিলাভ করতে পারে না। তবুও গোপালই এই নাটকের যা কিছু রস পরিবেশন করেছে যদিও নাটকখানি শুধু তাকেই নিয়ে নয়।

বিন্যাস ও সাজপটের সঙ্গে সংলাপের দিকও দুর্বল। কোন চরিত্রটিই জোর পায়নি। অথচ, আবার বলতে হয়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে ঘিরে যে সব ঘটনা রয়েছে, কেবল কিংবদন্তীতেই নয়, প্রামাণ্য ইতিহাসের মধ্যেও, নাটকের চেহারাটা তার ওপর পুরোপুরি ভিৎ-গেঁথে গড়তে পারলে একটা অসাধারণ অবদানই হাজির করে দেওয়া যেতো। কিন্তু যারা নাটকখানিকে হাজির করেছেন তারা ইচ্ছে করেই হোক

আর বাধ্য হয়েই হোক, ওদিকের সুযোগ উপেক্ষা করে গিয়েছেন।

নাটকখানি পরিচালনা করছেন রঞ্জিৎ রায়, এবং সুরও দিয়েছেন তিনি। নৃত্য রচনা করেছেন পিটার গোমেস। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শিবকালি চট্টোপাধ্যায়, বিজয় গোস্বামী, বিভূতি দাস, রঞ্জিৎ রায়, তুলসী গোস্বামী, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল রায়, সমর মিত্র, সূর্য সেন, অপর্ণা, উষাবতী, লীলাবতী, বীণা, কৃষ্ণা, মাধুরী প্রভৃতি।

নাটকের কাহিনী ও চরিত্রের সঙ্গে ইতিহাসের কিছুমাত্রও যোগ আছে এই ধারণা আগে মন থেকে সরিয়ে ফেলে দেখতে যেতে পারলে 'রাজা কৃষ্ণচন্দ্র' হিন্দী নাটকের ধারা অনুসৃত হাল্কারসের একখানি ভক্তিমূলক অবদান হিসেবে শেষপর্যন্ত বসে দেখা যায়।

আগামী চলচ্চিত্র মেলা

আগামী ২৪শে জানুয়ারী বম্বেতে এশিয়ার প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলার উদ্বোধন হবে। এই মেলার উদ্যোক্তা হচ্ছেন ভারতীয় ফিল্মস ডিভিসন।

গত সেপ্টেম্বর মাসে সরকারিভাবে এই মেলার কথা প্রথমে ঘোষিত হয় এবং সেই সঙ্গে চিত্রনির্মাণকারী প্রায় অর্ধশতাধিক বিভিন্ন রাষ্ট্রকে যোগদানের জন্যে আমন্ত্রণ পাঠানো হয়। অনেক রাষ্ট্র প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যোগদান করার সম্মতিও পাঠিয়ে দেয়। ঠিক হয় যে, এই মেলাটি হবে প্রতিযোগিতামূলক, অর্থাৎ মেলায় প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে থেকে শ্রেষ্ঠ নির্বাচন করে পুরস্কার দেওয়া হবে।

এই মেলার কথা ঘোষিত হবার পর ইউরোপ থেকে একটা প্রতিবন্ধক দাঁড়িয়ে যায়। সম্প্রতি ইউরোপে পাশ্চাত্যের ভিন্ন ভিন্ন চিত্রনির্মাতাদের নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক প্রযোজক সংঘ গঠিত হয়েছে। এই সংঘ হঠাৎ একটা নিয়ম করে বসেন যে, ১৯৫২ সালে ইতালির ভেনিস এবং ফ্রান্সের ফাঁতে নির্ধারিত চলচ্চিত্র মেলা দুটি ছাড়া আর কোথাও কোন মেলাকে আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিমূলক চলচ্চিত্র মেলা বলে স্বীকার করা হবে না। এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার আগেই যারা ভারতীয় চলচ্চিত্র মেলায় যোগদানে স্বীকৃত হয়েছিলো তাদের মধ্যে অনেকেই নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন, অনেকে পিছিয়েও যান। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তখন আন্তর্জাতিক প্রযোজক সংঘের কাছে আবেদন পাঠানো হলো যাতে মেলাটির আন্তর্জাতিকত্ব স্বীকার করা হয়। শেষপর্যন্ত সে স্বীকৃতি পাওয়া গেলো, অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক প্রযোজক সংঘ ১৯৫২ সালে ভারতের চলচ্চিত্র মেলাটিকে আন্তর্জাতিক পদবাচ্য হবার অনুমতি দিলেন।

তারপর এলো আর এক বাধা। আন্তর্জাতিক প্রযোজক সংঘ জানিয়ে পাঠালেন যে, ভারতীয় মেলাটি প্রতিযোগিতামূলক হতে পারবে না, অর্থাৎ, মেলায় প্রদর্শিত ছবির মধ্যে কোন্ ছবি শ্রেষ্ঠ তা বিচার করে পুরস্কার দেওয়া চলবে না। চাপে পড়ে ফিল্মস ডিভিসনকে এ সর্তটি মেনে নিতে হয়েছে। অনেকে মনে করছেন যে, এই সর্তটির প্ররোচক হচ্ছে হলিউড আর বৃটেনের প্রযোজকরা। কারণ, এখন ভারতের বিদেশী ছবির বাজার ওরা দুজনে দখল করে রেখেছে। এমন একটা আন্তর্জাতিক মেলায় যদি ওদের ছবি শ্রেষ্ঠত্বের আসনলাভে বঞ্চিত হয় তাহলে সে আঘাতটা গিয়ে পড়বে এদেশে ওদের ছবির বাজারের ওপরে। এ নির্ধারণ ভুল নাও হতে পারে।

অনুমিত হয়, মেলাতে মোট প্রায় পঞ্চাশখানি পূর্ণদৈর্ঘ্য এবং নানাপ্রকার মিলিয়ে শতখানেক ছোট ছবি দেখানো হবে। বম্বেতে মেলাটি থাকবে দু সপ্তাহ। আর মাদ্রাজ, দিল্লী ও সর্বশেষে কলকাতায় এক সপ্তাহ করে। বম্বের ওপর এই পক্ষপাতিত্ব কেন জানা নেই। তবে এছাড়াও মেলাটিকে জাঁকিয়ে তোলার জন্যে সরকারি উৎসাহ ও প্রচেষ্টার সবটুকুই প্রায় বম্বেতে নিয়োগ করা হচ্ছে। স্থায়ী চিত্রগৃহের কতকগুলিকে মেলার ছবি দেখাবার জন্যে নিযুক্ত করা ছাড়াও ওখানে দুটি উন্মুক্ত-অঙ্গন প্রেক্ষাস্থান নির্মাণ করা হচ্ছে যাতে যতো বেশী পারা যায় লোকে মেলার ছবিগুলি দেখার সুযোগ পেতে পারে। তা ছাড়া মেলার ব্যাপারে সরকারি তরফের যাবতীয় প্রচার কাজও বলতে গেলে বম্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখে দেওয়া হয়েছে।

মেলা সম্পর্কে মাস দুই আগে কলকাতায় যে প্রথম এবং একমাত্র সাংবাদিক সম্মেলন হয় তাতে স্থানীয় সাংবাদিকদের আগ্রহ দেখে কলকাতাতেও মেলাটি অন্ততঃ দু'সপ্তাহ চালানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু তার পর থেকে যতো সরকারি বিবৃতি বেরিয়েছে তার সবগুলিতেই কলকাতায় একসপ্তাহ হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কলকাতায় মেলার ছবি দেখাবার জন্যে চিত্রগৃহ ঠিক করতে এসে ফিল্মস্ ডিভিসনের জনসংযোগ অফিসার এবং মেলার সংগঠনকারিদের অন্যতম শ্রী জে এন গঙ্গু গত সপ্তাহে এই ব্যাপার সম্পর্কে জানান যে, সরকারীসূত্রে যা-ই ঘোষিত হোক্ কলকাতার লোকে যদি চায় তাহ'লে মেলার স্থায়ীত্ব তিন সপ্তাহ কালও টেনে দেওয়া যেতে পারবে। এবিষয়ে তিনি প্রতিশ্রুতি দান করেন। কাজেই কলকাতায় মেলার অবস্থান কলকাতার চিত্ররসিকদের ওপরেই নির্ভর করছে।

ইতিমধ্যে বেঙ্গল মোসন পিকচার্স এসোসিয়েশন, মেলাটিকে সত্যিকারের একটি জমকালো ব্যাপার করে তোলার জন্যে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান-সূচী পরিকল্পনা করেছেন। কেবলমাত্র নানা দেশের ছবি দেখানোই নয়, সেইসঙ্গে চলচ্চিত্রের প্রতি লোকের মোহ ও আকর্ষণ জাঁকিয়ে তোলার জন্যে এরা তারকাদের নিয়ে নানারকমের খেলাধুলা, চলচ্চিত্রের নানাদিকের নানা বিষয় নিয়ে প্রদর্শনী এবং সমস্ত চিত্রগৃহ, স্টুডিও ও চলচ্চিত্র সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলি আলোকমালায় সাজানো ইত্যাদির ব্যবস্থা করছেন।

দিল্লী এবং মাদ্রাজেও মেলাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্যে নানারকমের আয়োজন করা হচ্ছে। দিল্লীর কমিশনার মেলার ছবিগুলির ওপর থেকে প্রমোদ-কর রেহাই দেবেন বলে জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে অন্যান্য স্থানকে দিল্লী টেক্কা মেরে দিয়েছে।

টেনিস

আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার শেষ নিষ্পত্তির খেলায় অস্ট্রেলিয়া পুনরায় বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়াছে। এইবার লইয়া অস্ট্রেলিয়া উপর্যুপরি দুইবার ডেভিস কাপ বিজয়ী হইল। আমেরিকা ফাইনালে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াও শেষ পর্যন্ত ৩-২ গেমে পরাজিত হইয়াছে। অস্ট্রেলিয়া দুইটি সিঙ্গলস ও ডাবলসে এবং আমেরিকা দুইটি সিঙ্গলসের খেলায় বিজয়ী হইয়াছে। অস্ট্রেলিয়া দলের এই সাফল্য ও গৌরব লাভ বিশ্বখ্যাত ফ্রাঙ্ক সেজম্যানের জন্যই সম্ভব হইয়াছে। তিনি একাই দুইটি সিঙ্গলসে প্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকান খেলোয়াড়দ্বয়কে পরাজিত করিয়াছেন। ডাবলস খেলাতেও কেন ম্যাকগ্রিগারের সহযোগিতায় আমেরিকান জুটিকে পরাজিত করিয়াছেন। ডাবলস খেলায় সেজম্যান ও কেন ম্যাকগ্রিগার এইবার উইম্বলডেন ও আমেরিকার চ্যাম্পিয়ান। তাঁহারা পুনরায় ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় আমেরিকার শ্রেষ্ঠ জুটিদ্বয়কে পরাজিত করিয়া ইহাই প্রমাণিত করিয়াছেন যে, তাঁহাদের সমতুল্য ডাবলস খেলোয়াড় পৃথিবীতে আর নাই।

ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার শেষ নিষ্পত্তির খেলায় অস্ট্রেলিয়া বা আমেরিকা কে বিজয়ীর সম্মান লাভ করিবে এই বিষয় লইয়া এক মাস পূর্বে যখন আলোচনা আরম্ভ হয় তখন একজন আমেরিকান টেনিস বিশেষজ্ঞ বলিয়াছিলেন, "ডাবলসের খেলায় যে বিজয়ী হইবে সেই।" তাঁহার সেই উক্তি যে কতখানি সত্য, তাহা এইবারেই প্রমাণিত হইল। নিম্নে ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার শেষ নিষ্পত্তির খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

ভিক সেক্সাস (আমেরিকা) ৬-৩, ৬-৪, ৯-৭ গেমে মার্ভিন রোজকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

ফ্রাঙ্ক সেজম্যান (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ৬-৩, ৪-৬, ৬-৪ গেমে টেড স্রোভারকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

ফ্রাঙ্ক সেজম্যান ও কেন ম্যাকগ্রিগার (অস্ট্রেলিয়া) ৬-২, ৯-৭, ৬-৩ গেমে টেড স্রোভার ও টনি ট্রাবার্টকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

ফ্রাঙ্ক সেজম্যান (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ৬-২, ৬-২ গেমে ভিক সেক্সাসকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

ট্রেড স্রোভার (আমেরিকা) ৬-৪, ১৩-১১, ৭-৫ গেমে মার্ভিন রোজকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতা

ভারতের জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতা সম্প্রতি কলিকাতার উডবার্ণ পার্কে সাউথ ক্লাবের পরিচালনায় বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে শেষ হইয়াছে। জাপান, সুইডেন, পাকিস্থান প্রভৃতি দেশের খেলোয়াড়গণ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করায় প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলা দর্শনযোগ্য ও উত্তেজনাপূর্ণ হয়। তবে এই কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, খেলা খুব উচ্চাঙ্গের হয় নাই। ইতিপূর্বে কলিকাতায় ঐ উডবার্ণ পার্কেই চেক, আমেরিকান, জাপানী খেলোয়াড়গণ এইবারের টেনিস প্রতিযোগিতা অপেক্ষা উন্নত স্তরের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এই প্রতিযোগিতার মধ্যে দুইটি বিশেষ বিষয় লক্ষ্য করিবার ছিল। যথাঃ—

(১) এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান দিলীপকুমার বসুর অবনতি। ইনি যে শীঘ্রই টেনিস খেলায় গৌরবজনক স্থান হইতে অপসারিত হইবেন ইহার

বাঙলা দলের অধিনায়ক সি এস্ নাইডু ও এম সি সি দলের অধিনায়ক ডি বি কার খেলার পূর্বে "টস্" করিতেছেন।

যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার খেলার মধ্যে মানসিক দৃঢ়তা ও মারের তীব্রতার যথেষ্ট অভাব পাওয়া গিয়াছে। এশিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভের সময় যে শ্রেণীর ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহার কোন নিদর্শনই এই প্রতিযোগিতায় পাওয়া যায় নাই।

(২) স্কুলের ছাত্রী কুমারী ঊর্মিলা থাপ্পারের মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ। ইঁহার খেলা খুব উন্নত স্তরের নহে, তবে খেলার কৌশল শিক্ষা দিলে ভবিষ্যতে ভারতীয় মহিলা টেনিস খেলোয়াড় হিসাবে দেশের গৌরব বৃদ্ধিতে সাহায্য করিতে পারিবে তাহার সামান্য আভাষ পাওয়া গিয়াছে। মহিলা বিভাগে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার মত কোন খেলোয়াড় ছিলেন না, সেইজনাই ইঁহার পক্ষে সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান হওয়া সম্ভব হইয়াছে বলিলে কোনরূপ অন্যায় হইবে না। কুমারী লীলা রাওর অভাব কয়েক বৎসর হইতেই অনুভূত হইতেছিল, কুমারী ঊর্মিলা থাপ্পার সেই স্থান পূর্ণ করিবে এই আশা ও ভরসা করা যাইতে পারে।

লেনার্ট বার্জলীনের ব্যর্থতা

সুইডেন এইবারের ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় আন্তঃআঞ্চলিক ফাইনালে আমেরিকার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার যে অধিকার লাভ করে তাহা একমাত্র লেনার্ট বার্জলীনের জন্যই সম্ভব হইয়াছে। কারণ তিনি কোন সিঙ্গলসের খেলাতেই ইউরোপের কোন খেলোয়াড়ের নিকট পরাজিত হন নাই। এইরূপ একজন কৃতী খেলোয়াড় ভারতের জাতীয় প্রতিযোগিতায় যোগদান করায় খেলোয়াড় বাছাই কমিটি তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলিয়া বাছাই করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তিনি জাপানের এক তরুণ খেলোয়াড় মিয়াগীর নিকট তৃতীয় রাউণ্ডেই পরাজয় বরণ করেন। এই মিয়াগী প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত সেমি-ফাইনালে পাকিস্থানের খেলোয়াড় ইফতিকার আমেদের নিকট পরাজিত হন। তবে সুইডেন দলের সৌভাগ্য যে তাহাদেরই একজন খেলোয়াড় গতবারের ভারতের চ্যাম্পিয়ান এস ডেভিডসন শেষ পর্যন্ত অর্জিত গৌরব অক্ষুন্ন রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। ভারতীয় টেনিসের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন সুমন্ত মিশ্র ও নরেন্দ্রনাথ ডাবলস চ্যাম্পিয়ান হইয়া। ইঁহারা সুইডেন দলের বিরুদ্ধে সত্য সত্যই অপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। ফাইনালে ইঁহাদের দিলীপ বসু ও নরেশকুমারকে পরাজিত করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। নিম্নে জাতীয় টেনিস খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

খেলার ফলাফলঃ—

পুরুষদের সিঙ্গলস

এস ডেভিডসন (সুইডেন) ৬-৩, ৬-৪, ৮-৬ গেমে ইফতিকার আমেদকে (পাকিস্থান) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস

সুমন্ত মিশ্র ও নরেন্দ্রনাথ ৬-১, ৬-৩, ৬-২ গেমে দিলীপ বসু নরেশকুমারকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস

মিস ঊর্মিলা থাপ্পার ৬-০, ৪-৬, ৭-৫ গেমে মিস এল উডব্রিজকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস

ইফতিকার আমেদ (পাকিস্থান) ও মিসেস সি ই কার্গিল ৬-১, ৬-৪ গেমে সুমন্ত মিশ্র ও মিস আর ডেভারকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস

মিস এস উডব্রিজ ও মিসেস এস আর মোডী ৬-৪, ৬-২ গেমে মিস ঊর্মিলা থাপ্পার ও মিস আর ডেভারকে পরাজিত করেন।

জুনিয়ার সিঙ্গলস

আর কৃষ্ণান ৬-৪, ৬-৩ গেমে শেখ কুতুবুদ্দিনকে পরাজিত করেন।

টেবিল টেনিস

বাঙলার টেবিল টেনিস পরিচালকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও বহু অর্থ ব্যয়ের ফলে কলি-

এস ডেভিডসন, লেনার্ট বার্জলীন (সুইডেন), নরেন্দ্রনাথ ও সুমন্ত মিশ্র (ভারত)

কাতায় ন্যাশন্যাল ক্রিকেট ক্লাবের ইনডোর স্টেডিয়ামে ভারতের জাতীয় টেবিল টেনিস ও আন্তঃরাজ্য টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে শেষ হইয়াছে। তবে প্রতিযোগিতার দীর্ঘ তালিকা শেষ করিতে পরিচালকদের সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে হয়। আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতায় বাঙলা পুনরায় বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়াছে। এইবার লইয়া বাঙলা উপর্যুপরি তিনবার আন্তঃরাজ্য চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করিল। ইহা খুবই আনন্দের ও সুখের বিষয়। তবে জাতীয় চ্যাম্পিয়ানশিপে ভারতের এক নম্বর খেলোয়াড় কল্যাণ জয়ন্তের ক্রীড়াকৌশল আমাদের বিশেষভাবেই হতাশ করিয়াছে। তিনি বিদেশে উন্নততর ক্রীড়াকৌশল লাভের জন্য রাজস্থান ক্লাবের অর্থ সাহায্যে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পরিণামে ক্রীড়াকৌশলের অবনতি হইতে দেখিয়াই আমরা আশ্চর্য হইয়াছি। নিম্নে জাতীয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

পুরুষদের সিংগলস্

তিরুভেংগদম্ (মাদ্রাজ) ২১—১৮, ২২—২০ ও ২৩—২১ পয়েণ্টে ভি শিবরামণকে (মাদ্রাজ) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস্

কল্যাণ জয়ন্ত ও আর ভাণ্ডারী (বাঙলা) ২১—১৮, ২১—১৫, ২১—১০ পয়েণ্টে ইউ চন্দ্রাণা ও ডি পি সোম্মায়াকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস্

আর ভাণ্ডারী ও মিস্ সুলতানা ২১—১১, ২১—১২, ২১—১৪ পয়েণ্টে ভি শিবরামণ ও মিস্ রুক্মিণীকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস্

মিস্ সুলতানা (হায়দরাবাদ) ২১—১৪, ২১—১২, ২১—১৩ পয়েণ্টে মিসেস্ নাসিকওয়ালাকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস্

মিস্ সুলতানা ও মিসেস্ রাজগোপালন্ ২১—১৮, ১৮—২১, ২১—১৫, ২১—১১ পয়েণ্টে মিস্ রুক্মিণী ও মিসেস্ পিলাইকে পরাজিত করেন।

বালকদের সিংগলস্

পি নাইডু (হোলকার) ২১—১৪, ১১—২১, ১৩—২১, ২৪—২২, ২১—১৯ পয়েণ্টে এম এ গুল্লাকে (বোম্বাই) পরাজিত করে।

বিশ্ব টেবিল টেনিসে ভারতের প্রতিনিধিগণ

আগামী বৎসরে ফেব্রুয়ারী মাসে বোম্বাইতে বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। এই প্রতিযোগিতায় ভারতের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলী পাঁচজন পুরুষ ও পাঁচজন মহিলাকে মনোনীত করিয়াছেন। অতিরিক্ত হিসাবেও দুইজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। পুরুষ বিভাগের অধিনায়ক হইয়াছেন মাদ্রাজের ভি শিবরামণ ও মহিলা বিভাগের অধিনায়িকা হইয়াছেন দিল্লীর মিসেস্ বিজয়া রাজাগোপালন্। নিম্নে মনোনীত খেলোয়াড়দের নাম প্রদত্ত হইল:—

পুরুষগণ—ভি শিবরামণ (মাদ্রাজ)—অধিনায়ক, কল্যাণ জয়ন্ত (বাঙলা), আর ভাণ্ডারী (বাঙলা), টি তিরুভেংগদম্ (মাদ্রাজ), জয়ন্ত দে (বাঙলা)।

অতিরিক্ত—নাগারাজন (মাদ্রাজ) ও যতীন ভায়েস্ (বোম্বাই)।

মহিলাগণ—মিসেস্ বিজয়া রাজাগোপালন্ (দিল্লী)—অধিনায়িকা, মিস্ সুলতানা (হায়দরাবাদ), মিসেস্ গুল নাশিকওয়ালা (বোম্বাই), মিস্ এ রুক্মিণী (মাদ্রাজ)।

অতিরিক্ত—মিস্ সি ম্যাডান (বাঙলা) ও মিস্ কে জন্ (মাদ্রাজ)।

ক্রিকেট

এম সি সি দল কলিকাতায় ইডেন উদ্যানে সর্বপ্রথম খেলিয়া বাঙলা দলকে শোচনীয়ভাবে এক ইনিংস্ ও ২০ রানে পরাজিত করিয়াছে। বাঙলা দলের এই শোচনীয় পরাজয় দুঃখের সন্দেহ নাই; তবে আশ্চর্যের কিছুই হয় নাই। বাঙলা দলে ব্যাটিং ও বোলিং করিবার লোকের অভাব ছিল না—কেবল অভাব দৃঢ় মনোভাবের। অধিকাংশ খেলোয়াড়ই এম সি সি'র খেলোয়াড়দের দেখিয়াই যেন জড়সড়, সন্ত্রস্ত। খেলার মধ্যে এইজনাই তাঁহাদের পক্ষে রান করা বা উইকেট দখল করা সম্ভব হয় নাই। যে দুইজন খেলোয়াড় দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভাগ্যে রান করাও সম্ভব হইয়াছে। আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়চেতা না হইলে ক্রিকেট খেলায় সাফল্যলাভ করা যায় না—ইহা সকল সময়েই স্মরণ রাখা উচিত।

:: ফলাফল ::

বাঙলা দল : প্রথম ইনিংস্—১৮৮ রান (সি এস্ নাইডু ৫৭ রান, এন চ্যাটার্জি ৩০ রান, পি চ্যাটার্জি ২৪ রান, মণ্টু ব্যানার্জি নট আউট ২৩ রান; আর ট্যাটারসল ৫৮ রানে ৭টি উইকেট, রিজওয়ে ২১ রানে ১টি উইকেট ও ওয়াটকিন্স ১৭ রানে ১টি উইকেট পান)

এম সি সি : প্রথম ইনিংস্—(৮ উইকেট) ৩৪২ রান [ডিক্লেয়ার্ড] (কেনিয়ান ৪২ রান, স্পুনার ৩০ রান, গ্রেভনী ৩২ রান, পুল ৪৫ রান, ওয়াটকিন্স নট আউট ১১৩ রান, হিল্টন ৩৫ রান, রিজওয়ে নট আউট ৯ রান; সি এস নাইডু ১০১ রানে ৪টি উইকেট, এন চৌধুরী ৭৪ রানে ৩টি উইকেট, মণ্টু ব্যানার্জি ৬২ রানে ১টি উইকেট দখল করেন)

বাঙলা দল : দ্বিতীয় ইনিংস্—১৩৪ রান (এন চ্যাটার্জি ৫৯ রান, এস গিরিধারী ৩৯ রান, বি ফ্রাঙ্ক ১১ রান; এফ রিজওয়ে ৪০ রানে ৪টি উইকেট, স্যাকলটন ২০ রানে ৩টি উইকেট, ট্যাটারসল ৩৬ রানে ২টি উইকেট লাভ করেন)

দেশী সংবাদ

২৪শে ডিসেম্বর—শান্তিনিকেতনে আম্রকুঞ্জে প্রশান্ত পরিবেশের মধ্যে বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সমাবর্তন ভাষণ প্রসঙ্গে শ্রী সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তরুণ স্নাতকদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মহান আদর্শ জীবনে স্মরণ রাখিতে বলেন এবং বিশ্বশান্তির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইবার আহ্বান জানান।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজওহরলাল নেহরু আমেদাবাদে প্রায় এক লক্ষ লোকের এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তোলাই তাঁহার এই ভারতব্যাপী সফরের প্রধান লক্ষ্য।

মধ্য নেপালের তরাই অঞ্চলের চিতওয়ানের বনাঞ্চলে নরখাদক একটি বন্যহস্তীর উৎপাতে জনসাধারণের মধ্যে গভীর ত্রাস সৃষ্টি হইয়াছে। উক্ত হস্তীটি এযাবৎ ৮ ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে।

২৫শে ডিসেম্বর—কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজওহরলাল নেহরু বেলগাঁওয়ে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গ বলেন যে, কোন বৈদেশিক শক্তির ভারতের কোন অঞ্চলের উপর শাসন পরিচালনার অধিকার নাই। তিনি জনসাধারণকে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, যথাসময়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে গোয়ার সমস্যার সমাধান হইবে।

লাহোরে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন বলেন যে, কাশ্মীরকে লইয়া পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির ভার স্বহস্তে গ্রহণ করাই নিরাপত্তা পরিষদের কর্তব্য।

২৬শে ডিসেম্বর—অদ্য পাঞ্জাবে সকাল ৮টার সময় ১২টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ২১শে জানুয়ারী পর্যন্ত এই রাজ্যে ভোট গৃহীত হইবে।

গোরক্ষপুর-বারাণসী এলাকার আঞ্চলিক ফুড কন্ট্রোলার ডাঃ রামদাসের এক বিবৃতিতে জানা গিয়াছে যে, উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে ১১টি জেলার প্রায় ৮৯ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ৪০ লক্ষ লোক ভয়াবহ খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হইয়াছে।

শ্রীচক্রপাণি শুক্ল ও শ্রীবাজীরাও বিহারী (কংগ্রেস প্রার্থীদ্বয়) মধ্য প্রদেশের রায়পুর জেলার ভাটাপাড়া-সীতাপাড়া কেন্দ্র হইতে মধ্যপ্রদেশ বিধান সভায় নির্বাচিত হইয়াছেন। মধ্যপ্রদেশে নির্বাচনের ফল এই প্রথম ঘোষিত হইল।

২৭শে ডিসেম্বর—প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু অদ্য রাজামহেন্দ্রীতে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলেন, পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী বা পৃথিবীর যে কোন দেশের প্রধান মন্ত্রী যদি মনে করেন যে, কাশ্মীর সম্পর্কে যে কোন ব্যবস্থা ভারতের উপর চাপাইয়া দেওয়া সম্ভবপর হইবে, তাহা হইলে তাহারা মারাত্মক ভুল করিবেন। পৃথিবীর কোন দেশের অযৌক্তিক মনোভাব বা হুমকি আমরা বরদাস্ত করিব না।

জলপাইগুড়ি অঞ্চলে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যে সীমান্ত বিরোধ চলিতেছিল, উভয় সরকারের নির্দেশক্রমে আপোষে তাহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

কলিকাতায় প্রাপ্ত তিনটি সংবাদে গত কয়েক দিনে ভারতীয় এলাকায় ঢুকিয়া পাকিস্থানী পুলিশ কর্তৃক পাকিস্থানীদিগকে শস্য লুণ্ঠনে সাহায্য, ভারতীয় সীমান্ত হইতে অসহায় লোককে লইয়া পাকিস্থান এলাকায় আটক এবং পাকিস্থান এলাকা হইতে ভারতীয় সীমান্তে গুলী বর্ষণের তিনটি ঘটনার কথা জানা যায়।

২৮শে ডিসেম্বর—হায়দরাবাদ রাজ্যের কম্যুনিস্ট উপদ্রুত অঞ্চলের কেন্দ্র বরংগল নির্বাচন কেন্দ্র হইতে কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীরাজলিংগম বিপুল ভোটাধিক্যে রাজ্য বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

অদ্য কলিকাতা হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরে অবস্থিত আমডাঙ্গা হাটে অনুষ্ঠিত এক নির্বাচনী সভায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ভাষণকালে তথায় কৃষ্ণ পতাকা লইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় এবং উক্ত বিক্ষোভসূত্রে বিবদমান ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে কিছুক্ষণ ধরিয়া ইষ্টক খণ্ড ও ডাব ছোড়াছুড়ি চলে। অনুমান ৬ ব্যক্তি এই ঘটনায় সামান্য আহত হয়।

এর্ণাকুলামের নিকটে পাল্লুরুথি নামক স্থানে শ্রমিকরা একটি কারখানার মালিকানা ও কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে। শিল্প-জগতের ইতিহাসে সম্ভবত এইরূপ ঘটনা এই প্রথম।

২৯শে ডিসেম্বর—পাকিস্থানের গভর্নর জেনারেল সিন্ধুতে গভর্নরের শাসন প্রবর্তনের নির্দেশ দিয়াছেন। এইসংগে গভর্নর জেনারেল এই নির্দেশও দিয়াছেন যে, সিন্ধুতে নূতন করিয়া সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

অদ্য পাটনায় শ্রীঅতুল গুপ্তের সভাপতিত্বে প্রবাসী বংগ সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তবিংশতি অধিবেশন আরম্ভ হয়। দিল্লী, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, পশ্চিমবংগ ও বিহার হইতে মোট প্রায় একশত জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করেন।

হিমাচল প্রদেশে বিধান সভার মোট ৩৬টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২৪টি, কৃষক প্রজা মজদুর দল ৩টি, এস সি এফ ১টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ৮টি আসন লাভ করিয়াছেন। ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রী রাজকুমারী অমৃতকুমারী হিমাচল প্রদেশ হইতে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে লোক সভায় সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজওহরলাল নেহরু অদ্য গৌহাটীতে প্রায় ২৫ হাজার লোকের এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, স্বরাজের প্রাথমিক লক্ষ্য সমগ্র দেশব্যাপী সাধারণ মানুষের বহুবিধ সমস্যার সমাধান—দুঃখ, দারিদ্র্যের বিমোচন, কর্মহীনের কর্মসংস্থান এবং সর্বতোভাবে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

৩০শে ডিসেম্বর—কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজওহরলাল নেহরু অদ্য সকালে ডিব্রুগড়ে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসংগে বলেন যে, ভারতের উন্নতির পথে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক শত্রু হইতেছে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা।

হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বর নির্বাচন কেন্দ্র হইতে রাজ্য বিধান সভায় ফরোয়ার্ড ব্লকের নির্বাচন প্রার্থী শ্রীরাম চ্যাটার্জিকে গত শনিবার রাত্রে ভদ্রেশ্বরে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহার পর চুঁচুড়ায় পুলিশ ও একটি শোভাযাত্রী দলের মধ্যে এক সংঘর্ষ ঘটায় ৭২ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। শ্রীরাম চ্যাটার্জির সমর্থকগণ উক্ত শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিলেন।

বিদেশী সংবাদ

২৪শে ডিসেম্বর—বৃটিশ পররাষ্ট্র অফিস হইতে ঘোষণা করা হয় যে, সাইরেনাইকা ও ত্রিপোলিতানিয়ার বৃটিশ রেসিডেন্টগণ এবং ফেজানস্থ ফরাসী রেসিডেন্ট অদ্য আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁহাদের অবশিষ্ট ক্ষমতা লিবিয়া সরকারের নিকট হস্তান্তরিত করেন। এই কার্যের ফলে সরাসরি লিবিয়া রাষ্ট্র গঠিত হইল এবং সাইরেনাইকার আমীর নবগঠিত লিবিয়ার রাজা হইলেন।

২৫শে ডিসেম্বর—অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিনিধিগণ অভিযোগ করিয়াছেন যে, কম্যুনিস্টরা রাষ্ট্রপুঞ্জের যুদ্ধ-বন্দীদিগকে কোরিয়ার বাহিরে লইয়া গিয়াছে।

২৬শে ডিসেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদ হইতে নির্দেশ প্রাপ্ত হইয়া মিঃ লী কাশ্মীর কমিশনকে 'যুদ্ধ বিরতি' রেখা তত্ত্বাবধান, উহা লঙ্ঘিত হইলে, তৎসম্পর্কে রিপোর্ট দানের জন্য ৬০ জন সামরিক পর্যবেক্ষক নিয়োগের ক্ষমতা দিয়াছেন।

২৭শে ডিসেম্বর—পারস্যের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মহম্মদ মোসাদেক ও তাঁহার সরকারের বিচারের দাবী জানাইবার উদ্দেশ্যে বিরোধী দলের নেতৃগণ ইরান পার্লামেণ্টের বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের জন্য স্পীকারকে অনুরোধ করিয়াছেন।

২৯শে ডিসেম্বর—অদ্য কোরিয়া শান্তি আলোচনায় রাষ্ট্রপুঞ্জ পক্ষ আর একটি ব্যাপারে সুবিধা দিতে সম্মত হয় এবং জানায় যে, তাঁহাদের আর কোনও প্রস্তাব নাই। রাষ্ট্রপুঞ্জ পক্ষের জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, আপোষ মীমাংসার জন্য ইহাই রাষ্ট্রপুঞ্জের শেষ প্রচেষ্টা।

৩০শে ডিসেম্বর—ওয়াশিংটনের ওয়াকিবহাল মহল বলিতেছে যে, মিশর মধ্যপ্রাচ্য প্রতিরক্ষা সংস্থায় যোগদান করিবে, এই সর্তে রাজা ফারুককে সুদানেরও রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইবার অনুরোধ জানানো হইলে বৃটেন নিশ্চয়ই সে অনুরোধ রক্ষা করিবে না। প্রকাশ, মার্কিন রাষ্ট্রদপ্তর বৃটিশ-সরকারী কর্মচারিগণের নিকট এ ধরণের একটি প্রস্তাব ইতঃপূর্বেই উত্থাপন করিয়াছিল।

ভারতীয় মূল্য: প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,
পাকিস্থান মূল্য: প্রতি সংখ্যা (পাক) ।৵০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, (পাক)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

দেশ

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

ঊনবিংশ বর্ষ] শনিবার, ২৭শে পৌষ, ১৩৫৮ সাল। Saturday, 12th January, 1952. [১১শ সংখ্যা

বিজ্ঞান-সাধনার ভবিষ্যৎ

কয়েক দিবসব্যাপী অধিবেশনের পর কলিকাতা শহরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সমাপ্তি হইয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহর্ অধিবেশনের উদ্বোধন করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিকদের কাছে একটি প্রশ্ন উপস্থিত করেন। প্রশ্নটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পণ্ডিতজী বলেন, বিজ্ঞানের তো খুবই উন্নতি হইতেছে, কিন্তু মানুষের কল্যাণ সেই অনুপাতে সাধিত হইয়াছে কি? তাঁহার মতে জড় বিজ্ঞানের চাপে মানুষ আজ প্রায় যন্ত্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে। মানুষের চিত্তবৃত্তির স্বাধীন বিকাশ এবং উদার চেতনা আড়ষ্টপ্রায়। প্রশ্নটি নূতন নয়। ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ বহুবার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং মানুষকে তিনি এ সম্বন্ধে সতর্কও করিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, বিজ্ঞান মানুষের হাতে দেবতার শক্তি দান করিয়াছে, কিন্তু দেবত্ব দিতে পারে নাই। ফলে দেবতার শক্তি কার্যত সমাজ-বিরোধী প্রবৃত্তিনিচয়ের হাতেই ক্রীড়নকে পরিণত হইতেছে। গান্ধীজীও বহুবার এই সমস্যা ও বিপদের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং তাঁহার জীবন-সাধনায় এই দেব-বিরোধী আসুরিকতাকে প্রতিহত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে অতীত ভারতের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে এইখানেই পার্থক্য রহিয়াছে। অতীত ভারত জড় বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়াছে, এ কথা সত্য নয়। কিন্তু ভারতের বিজ্ঞান-সাধনা ভাবের পথ ধরিয়া চলিয়াছে। দেবতাকে সে পীড়ন করে নাই। পক্ষান্তরে আধুনিক বিজ্ঞান দেব-বিরোধী মনোভাব লইয়া দ্বন্দ্ব ও বিরোধ এবং হিংসার বিভীষিকা বিস্তার করিতেছে। মানুষের অন্তর্নিহিত দেবভাবের প্রতি এ বিজ্ঞানের শ্রদ্ধানুভূতি নাই, আছে শুধু জড় প্রয়োজন মিটাইবার জন্যই একটা বিচীকিৎসা। শুধু পশুত্বের দিকটার উপরেই এ বিদ্যা জোর দিতেছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী বিজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে এখন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন কামনা করিয়াছেন এবং তিনি মানুষের সম্বন্ধে বেশী বিবেচনা করিতে বৈজ্ঞানিকদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, জড় বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষায় এই সমস্যাটির সমাধান সম্ভব নয়। পরন্তু একমাত্র ঋষি বা তত্ত্বদর্শীর প্রজ্ঞানই এক্ষেত্রে কার্যকর হইতে পারে। ফলতঃ কোন বৈজ্ঞানিকই আজ পর্যন্ত মানব-প্রকৃতির পরিবর্তন সাধনে সমর্থ হন নাই। ইহার জন্য মানব-সমাজ চিরকালই বুদ্ধ, যীশু, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মহামানবদের শরণার্থী হইয়া আসিয়াছে এবং ধর্ম ও নীতির পথ মানুষকে অনুসরণ করিতে হইয়াছে। সুতরাং শুধু জড় বিজ্ঞানের গর্ব করিলেই মানুষ বাঁচিবে না। জড়-বিজ্ঞান মানুষকে দেবত্ব দিতে পারে নাই, পারিবেও না। সেদিক হইতে সে বিদ্যা, প্রকৃতপক্ষে অবিদ্যা। মানুষকে যদি প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন করিতে হয়, তবে যাঁহারা মানবপ্রেমিক, যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, যাঁহারা সাধক, তাঁহাদিগকে গুরুস্বরূপে গ্রহণ করিয়া বৃহৎ স্বার্থের প্রেরণার এবং চেতনার প্রয়োজনে বিজ্ঞানের সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

বিশ্ব-সভ্যতা ও ভারত

"কংগ্রেস ভারতকে স্বাধীনতা আনিয়া দিয়াছে, একথা সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতার মূলে বাঙলার বিপ্লবী দল এবং বাঙলা দেশের আত্মদাতা সন্তানদের অবদানই মুখ্যভাবে কাজ করিয়াছে"—গত ৫ই জানুয়ারী কলিকাতার ময়দানে জনসভায় বক্তৃতাকালে শ্রীযুক্তা অরুণা আসফ আলী এই কথা বলেন। বস্তুত ভারতের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন বাঙলা দেশ হইতেই প্রথম সুরু হয়। আবার বাঙলার সেই আন্দোলনের বাহ্যরূপটি প্রধানত রাজনীতিক হইলেও তাহার ভিত্তি ছিল আধ্যাত্মিক। ভারত সামান্য নয়, বিশ্ব-জগতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতিতে তাহার একটি বিশেষ অবদান রহিয়াছে, এই আত্মপ্রত্যয়-বোধ বাঙলার অন্তরে বৈপ্লবিক প্রাণশক্তি প্ররোচিত করে এবং বাঙলার সাধক সন্তানের দল অগ্নিময় সাধনায় প্রবৃত্ত হন। প্রকৃতপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো বক্তৃতা সমগ্র ভারতের প্রাণকেন্দ্রে এক নবীন শক্তি জাগাইয়া তুলিয়াছিল। বাঙলার সাহিত্য-সাধনার ভিতর দিয়া তাহার প্রেরণা সম্প্রসারিত হইয়া পড়ে। বিশ্ব-মানব-সভ্যতার ক্ষেত্রে ভারতের এই মর্যাদা-বোধ বাঙলার অন্তরে আজও কাজ করিতেছে। সম্প্রতি পুনা শহরে অনুষ্ঠিত দার্শনিক কংগ্রেসের উদ্বোধন-বক্তৃতায় ডক্টর

জয়াকর বাঙলার অন্তরের বাণীই প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, শুধু বিজ্ঞানের সাধনায় জগৎ রক্ষা পাইবে না। আধ্যাত্মিক সাধনালব্ধ প্রত্যক্ষ সত্যের প্রেরণায় নবসৃষ্টির যে চেতনা জাগিবে, তাহার উপরেই জগতের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। তাঁহার মতে ভারতের সংস্কৃতির মূলীভূত অধ্যাত্ম-সাধনা প্রাণময় এবং অমৃতত্বের অনুভূতির উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত পরন্তু বিশ্বমানবকে আপনার করিবার সংবেদনে ইহা শক্তিশালী। আচার্য যদুনাথ সরকারও ভারতের ঐতিহ্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে এই সত্যেরই স্বরূপ উন্মুক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতের উপর দিয়া বহু বিপর্যয় গিয়াছে, কিন্তু বারংবার বৈদেশিকদের আক্রমণ এবং অভিযান সত্ত্বেও ভারতের প্রাণশক্তি নির্জিত হয় নাই। ভারতের সাধকগণ মনুষ্যত্বের মর্যাদা যুগে যুগে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছেন। আমাদের আশঙ্কা হয়, ভারতের অতীত সংস্কৃতির এইরূপ প্রশস্তি আজকাল অনেকের কাছে হয়ত প্রগতি-বিরোধী বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু তাঁহারা যাহাকে প্রগতি বলিয়া বুঝিতেছেন, তাহাই বা জগৎকে কোন্ পরিণতির দিকে লইয়া চলিয়াছে? বিশ্বমানব-সভ্যতা বর্তমানে এক মহাসঙ্কটের সন্ধিক্ষণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বস্তুনিষ্ঠতার ভ্রান্ত মোহে মানুষের উচ্চ সব মনোবৃত্তি আজ বিলুপ্তপ্রায়। একদিকে বিশ্ব-মৈত্রী এবং বিশ্বশান্তির আমরা স্তস্তিবাচন শুনিতেছি, অন্য দিকে নরঘাতী জিঘাংসায় রক্তস্রোতে পৃথিবীর বুক ভাসিয়া যাইতেছে। অসহায় নরনারীর আর্তনাদে আকাশে আবর্ত উঠিতেছে। কোরিয়ার যুদ্ধে চোখের সম্মুখেই ইহা দেখিতেছি। জগতের গতি এইভাবেই যদি চলিতে থাকে, তবে মানব-সভ্যতার সর্বনাশ সুনিশ্চিত। এরূপ অবস্থায় ভারতের সমন্বয়মূলক সভ্যতা এবং সংস্কৃতিই জগৎকে রক্ষা করিতে পারে, আমাদের ইহাই বিশ্বাস। একথা বলিতে আমাদের নিশ্চয়ই বক্তব্য ইহা নয় যে, অতীতের যুগে আমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমরা এই কথাই বলিতে চাই যে, ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মমূলে সার্বভৌম যে উদার সত্য নিহিত আছে, সেই সূত্র হইতেই আমাদের নবসৃষ্টি প্রেরণা সংগ্রহ করিতে হইবে। বাঙলার ঐতিহ্য এই আদর্শকেই আধুনিক যুগেও উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও বঙ্গ-সংস্কৃতির সেই বাতি নিভিয়া যায় নাই।

পরলোকে শ্রীযুত অনিলচন্দ্র রায়

শ্রীযুত অনিলচন্দ্র রায়ের অকালমৃত্যুতে বাঙলাদেশের একজন শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষের অভাব ঘটিল। যে তরুণদল ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙলার বুকে বৈপ্লবিক কর্মপ্রেরণা উজ্জীবিত রাখিয়াছিলেন, শ্রীযুত রায় তাঁহাদের অন্যতম অগ্রণী ছিলেন। ঢাকার বিখ্যাত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান "শ্রীসঙ্ঘের" নায়ক হিসাবে তিনি জাতির অন্তরে শ্রদ্ধার আসন অধিকার করেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সতীর্থ হিসাবে তাঁহার নিঃস্বার্থ সেবাময় জীবন তরুণ সমাজের আদর্শস্বরূপে পরিণত হইয়াছিল। স্বাধীন ভারতের যে স্বপ্ন তিনি দেখিয়াছিলেন, বঙ্গবিভাগের ফলে তাহা বিলীন হইয়া যায়, কিন্তু বাঙলার এই বিপ্লবী কর্মী তথাপি আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন নাই। সুভাষপন্থী ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতাস্বরূপে তিনি নেতাজী-পতাকা উদ্ভাসিত রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহারই আদর্শে রাজনীতিক সাধনায় ব্রতী ছিলেন। ব্রত অপূর্ণ রাখিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন। বাঙলাদেশের পক্ষে ইহা পরম দুর্ভাগ্যের বিষয়। কেবল রাজনীতিক সাহিত্য ক্ষেত্রেই শ্রীযুত রায়ের প্রতিভা সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি সুগায়ক ছিলেন এবং সঙ্গীতরসজ্ঞ সমাজে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁহার রাজনীতিক জীবনের সঙ্গিনী ও সহধর্মিণী প্রখ্যাত দেশনেত্রী শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের এই অপূরণীয় শোকে সান্ত্বনার ভাষা নাই। আমরা শ্রীযুত রায়ের মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী ও সহকর্মিগণকে এবং শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের এই শোকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি এবং দেশপ্রাণ, ত্যাগনিষ্ঠ বিপ্লবী নায়কের পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

পুনর্বাসনে বৈজ্ঞানিক বিচার

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৯তম অধিবেশনের নৃতত্ত্ব বিভাগের সভাপতি শ্রীযুত রায় চৌধুরী এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে তাহাদের অবস্থা এবং কিরূপ প্রতিবেশ তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইবে সে বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করা দরকার; কারণ, হাজার হইলেও তাহারা মানুষ। নিজেদের উপযোগী সামাজিক প্রতিবেশ ছাড়া মানুষ বাঁচিতে পারে না; অধিকন্তু তাহাদের জীবনের স্বচ্ছন্দ বিকাশও সাধিত হয় না। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্রসঙ্গে আমরা এ কথাটা বার বার বলিয়াছি। এ কথায় কেহ কেহ আপত্তি তোলেন। তাঁহারা বলেন, ভারতীয় চেতনাবোধ লইয়া উদ্বাস্তুদের ভারতের সব প্রদেশকেই আপনার করিয়া লওয়া উচিত এবং বাঙালী হিসাবে নিজেদের বিবেচনা করা তাহাদের পক্ষে ঠিক নয়। বলা বাহুল্য, উপদেশটা দেওয়া খুবেই সোজা; কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা সেইরূপ আত্মীয়তাবোধের উপযোগী কিনা সে বিষয়টি উপদেষ্টাগণ গভীরভাবে তলাইয়া বুঝেন না। বাঙালী কোনদিনই প্রাদেশিকতা বড় করিয়া দেখে নাই; শুধু পাশ্চাত্য রাজনীতির সূত্র ধরিয়াই এই অসাম্প্রদায়িক উদার দৃষ্টি সে লাভ করে নাই। প্রত্যুত বাঙালীর শিক্ষা এবং সংস্কৃতিই বাঙলার জন-মানসে এই উদার বোধ স্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছে। এদেশের ঐতিহ্য সে পক্ষে বড় প্রমাণ। সুদূর অতীতের কথা ছাড়িয়াই দেওয়া গেল, অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেও বাঙালী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক নিবিড় করিয়াই তুলিয়াছে। যে সংস্কৃতি একদিন বিহারকে আপন করিয়া লইয়াছিল, মিথিলার সঙ্গে বাঙলার সম্পর্ক কিরূপ সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল, ঐতিহাসিকমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। বাঙালী উত্তর প্রদেশে ব্রজমণ্ডলকে আত্মীয়তার পাশে আবদ্ধ করিয়াছিল। তাহার সংস্কৃতি একদিকে উড়িষ্যা, অপর দিকে আসামের সুদূর উত্তর এবং পূর্ব সীমান্তের অধিবাসীদিগকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়াছিল। প্রাদেশিকতার কোন প্রশ্নই তো সেদিন দেখা দেয় নাই; অনাত্মীয়তার কোন প্রতিবেশের মধ্যেও বাঙালী গিয়া পড়ে নাই। প্রকৃত-পক্ষে বিদেশীর অধীনতা এই ব্যবধানবোধ বাড়াইয়া তুলিয়াছে। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিবার পর ভারতের প্রদেশসমূহে আত্ম-চেতনার আকারে বিদেশীর উপ্ত সেই ভেদনীতির বীজই অঙ্কুর হইতে উদ্গত হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে উদ্বাস্তু সমস্যা-সমাধানের প্রাদেশিকতা-বোধগত হৃদ্যতার অভাবের এই দিকটাই আমাদের কাছে মর্মান্তিক হইয়া উঠিয়াছে।

কোন্‌-ভিনারের মা

বরদায় চাকরি নেবার কয়েকদিন পরেই ডঃ এর্নস্ট কোন্‌-ভিনারের (অর্থাৎ ভিয়েনার Cohn) সঙ্গে আলাপ হয়। যদিও নাম থেকে বোঝা যায়, 'কোন্' পরিবার এককালে ভিয়েনায় বসবাস করতেন তবু ইনি বার্লিনেই জন্মান, পড়াশুনো করে সেখানে নামজাদা অধ্যাপক হন এবং হিটলার ইহুদীদের উপর চোটপাট আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই সস্ত্রীক লন্ডন চলে যান। বুড়ো মহারাজ তৃতীয় সয়াজীরাও তাঁকে সেখান থেকে পাকড়াও করে নিয়ে এসে বরোদা যাদুঘরের বড়কর্তা বানিয়ে বসিয়ে দেন।

লোকটির পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ এবং তাঁর স্ত্রীও এতখানি লেখাপড়া জানতেন যে তিনি তাঁর স্বামীকে পর্যন্ত কাজকর্মে সাহায্য করতে পারতেন। সয়াজীরাওয়ের পাঠানো 'ভিনাস দি মিলো', মাইকেল এঞ্জেলোর তৈরি 'মোজেস' ও মুমূর্ষু দাসের প্লাস্‌টার-কাস্‌ট যেদিন বার্লিন থেকে বরদা এসে পৌঁছল, সেদিন ফ্রাউ কোন্‌-ভিনারের কী উত্তেজনা-উৎসাহ! স্টেশনে গিয়ে সেই বিরাট বিরাট বাক্স নিজে তদারকি করে নামালেন, আহার-নিদ্রা শিকেয় তুলে দিয়ে কাস্‌ট্‌গুলোকে যাদুঘরে সাজালেন, —সে সময় তিনি যাদুঘরে একটানা চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়েছিলেন,—তারপরে ফোলা ফোলা লাল-লাল চোখ নিয়ে বেরলেন আমাদের খবর দিতে, প্রভুরা বহাল তবিয়তে যাদুঘরে আসন জমিয়ে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। পাছে আমি হুজুরদের কিমৎ ঠিকমত মালুম না করতে পেরে তেনাদের 'তাচ্ছিল্যি' করি, তাই আমাকে তাঁর মোটরে তুলে নিয়ে গিয়ে হুজুরদের সঙ্গে নিজে পরিচয় করিয়ে দিলেন। হুজুরদের নাম-গোত্র, হাল-হকিকৎ, হাড়-হদ্দ এমনি গটগট করে বয়ান করে দিলেন যে, তার থেকেই বুঝতে পারলুম যে, এঁর এলেমের এক কাহন পেলেও আমি সুবে বোম্বাই-বরদা-অহমদাবাদের 'কলা-বাজারে' বাকি জীবন বেপরোয়া হয়ে দাবড়ে বেড়াতে পারব।

আর হ্যার ডক্টর কোন্‌-ভিনারের পাণ্ডিত্য আমাকে ফলিয়ে বলতে হবে না। নন্দন শাস্ত্র এবং বিশ্ব-স্থাপত্যের বিভিন্ন শৈলী সম্বন্ধে তিনি যেসব কেতাব লিখে গিয়েছেন, সেগুলো নাৎসী-পতনের পর ফের ছাপা হতে শুরু হয়েছে।

স্থাপত্যে পণ্ডিত অথচ বাল্যকালে তিনি লেখাপড়া শেখেন রাব্বিদের (ইহুদী পুরুত-পণ্ডিত) টোলে। তাই ইহুদী ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর; অথচ ইহুদীদের আচার-ব্যবহার তাদের কঞ্জুসি নিয়ে তিনি ঠাট্টা-মস্করা করাতে ইহুদীর শত্রু ক্রীশ্চানের চেয়েও ছিলেন বাড়া। সেসব রসিকতা একদিন মোকা-মাফিক ছাড়বার বাসনা আমার আছে।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। পুত্র-কন্যা হয়নি, অথচ দুজনেরই হৃদয় ছিল স্নেহে ভরা। 'দেশের' পাঠক এই ইঙ্গিত থেকেই টক্‌ করে বুঝে যাবেন, আমি তাঁর ন'সিকে সুযোগ নিতে কসুর করিনি। যতদিন কোন্‌-ভিনাররা এদেশে ছিলেন, ততদিন জর্মন বই, মাসিক, খবরের কাগজের জন্য আমাকে কিছুমাত্র দুর্ভাবনা করতে হয়নি।

"সে বছরে ফাঁকা, পেনু কিছু টাকা" ধরণে কিকরে যে কিছু টাকা আমার হাতে '৩৮ ইংরেজিতে জমে গিয়েছিল, সেটা নিতান্ত আমি বলছি বলেই আজ আমার বিশ্বাস হয়—হায়, এখন যা অবস্থা, '৩৮-এর মুজতবা আলিকে পথে পেলে 'দাদা, বাছা' বলে দু-পয়সা হাতিয়ে নিতুম।

তা সে কথা যাকগে। সেই জমানো টাকাটা হাতে বড্ড বেশি চুলকোচ্ছিল বলে বাসনা হল জর্মনিতে গিয়ে সে-টাকাটা পুড়িয়ে আসি। বন্ধুবান্ধব সে দেশে মেলা, ওদিকে হিটলার যা নাচন-কুদন আরম্ভ করেছে, কখন না দুম করে একটা লড়াই লেগে যায়, আর তারাও সেই বেপ্যাঁচে পড়ে প্রাণটা হারান।

বরদা ছোট্ট জায়গা—তাই খাসা জায়গা। তিন দিনের ভিতর পাসপোর্ট হয়ে গেল। বোম্বাই কাছে; ট্রাঙ্ককল করে জাহাজের টিকিট কাটা হয়ে গেল—আর গরম স্যুটমুট তো ছিলই। শিকের হাঁড়ি থেকে নামিয়ে ঝেড়েঝুড়ে তৈরি করে নিলুম।

কোন্‌-ভিনারদের বললুম, জর্মনি যাচ্ছি।

শুনে দুজনেই চমকে উঠলেন। তারপর অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে রইলেন। বুঝলুম, দেশের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠেছে—যে-দেশ আবার দেখবার সৌভাগ্য হয়ত তাঁদের জীবনে আর কখনো আসবে না। আর কিছু বুঝি না বুঝি, বিদেশে দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে বুকটা যে কি রকম তেলে-ফেলা বেগুনের মত ছ্যাঁৎ করে ওঠে, সেটা বিলক্ষণ বুঝি; এবাবতে আমি কিস্তর পোড় খাওয়া পোড়া-গরু। চুপ করে রইলুম।

কোন্‌-ভিনার শুধালেন, "আপনি কি বার্লিন যাবেন?"

আমি বললুম, "এবারে জর্মনি যাচ্ছি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে। তারা তামাম জর্মনি ছড়িয়ে। বন্, কলোন, হানোফার, বার্লিন অনেক জায়গায়ই যেতে হবে।"

কোন্‌-ভিনার বললেন, "আমরা বার্লিন ছাড়ি '৩৩এ। এদেশে আসি '৩৫। এখানে আসার পর আমার পরিচিত কেউ বার্লিন যায় নি; আমার বুড়ী মাকে এই তিন বৎসরের ভিতর কেউ গিয়ে বলতে পারেনি যে সে আমাকে দেখেছে, আমি ভালো আছি। আমি ছাড়া আমার মায়ের এ-সংসারে আর কেউ নেই। আপনি যদি—"

আমি বললুম, "আমি অতি অবশ্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

খানিকটা কিন্তু কিন্তু করে কোন্‌-ভিনার শেষটায় বললেন, "তবে দেখুন, একখানা পোস্টকার্ড লিখে তার পর যাবেন। আমার মার বয়স আশীর কাছাকাছি। আপনি যদি হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হন তবে তিনি জোর শক পাবেন। সেটা সামলাবার জন্য—"

আমি বললুম, "নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমি খবর দিয়েই যাব।"

কোন্‌-ভিনার বললেন, "আর দেখুন, আমার যে হার্ট ট্রাবল সেটা একদম চেপে যাবেন। কি হবে বুড়ীকে জানিয়ে? আমার বাবাও হার্টে মারা যান।"

আমি বললুম, "বুঝিয়ে বলতে হবে না। আমি ঠিক ধরতে পেরেছি। এ-জিনিস সবাই করে থাকে। আমি ওঁকে বলব, আপনারা দুজনেই আরামে দিন কাটাচ্ছেন। এই তো?"

(ক্রমশ)

আমেরিকায় মিঃ চার্চিল

মিঃ চার্চিল ও প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের মধ্যে কী কী বিষয়ে আলোচনা হয় এবং তাহার ফলাফল কী হতে পারে, তাই নিয়ে নানারূপ জল্পনাকল্পনা চলছে। বৃটেনের সামনে বর্তমানে যে অর্থনৈতিক সমস্যা উপস্থিত হয়েছে, সেটা অত্যন্ত কঠিন। এ অবস্থায় অনেকেরই মনে হবে যে, মিঃ চার্চিল আমেরিকার কাছ থেকে আর এক দফা সাহায্য চাইতে যাচ্ছেন। মিঃ চার্চিল কিন্তু আগে থাকতে ঘোষণা করেছিলেন যে, আমেরিকার কাছ থেকে টাকা চাইবার জন্যে তিনি প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন না। টাকা তিনি সোজাসুজি না চাইতে পারেন, কিন্তু সম্ভবত যা যা চাইবেন, সেগুলো পেলে টাকা পাওয়ার কাজটাও অমনি হয়ে যাবে—কান টানলে মাথা আসার মতো।

চার্চিল-ট্রুম্যানের সাক্ষাৎকারের সময়টা এক দিক দিয়ে মিঃ চার্চিলের অনুকূল, আবার যেজন্য অনুকূল, তার জন্যই প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। মিঃ ট্রুম্যান ও তাঁর গভর্নমেণ্ট কিছু বেকায়দায় পড়ে আছেন। কিছুদিন যাবৎ মার্কিন কর আদায় বিভাগের যেসব কেলেঙ্কারি বেরুচ্ছে, তাতে ট্রুম্যান গভর্নমেণ্ট বিশেষ বিব্রত হয়ে পড়েছেন। এটা আবার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের বছর; সুতরাং বিপক্ষ দল রিপাবলিক্যান পার্টির প্রচারকার্যের খুব সুবিধা হয়েছে। এ অবস্থায় প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে কিছুটা দুর্বল বোধ করা স্বাভাবিক। ওদিকে মিঃ চার্চিল যত কম সংখ্যাধিক্যেই হোক, স্বদেশে সাধারণ নির্বাচনে সম্প্রতি জয়ী হয়েছেন। তার উপর গত মহাযুদ্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা হিসাবে তাঁর খ্যাতি রয়েছে। সুতরাং মিঃ চার্চিলের সম্পর্কে মিঃ ট্রুম্যানের, যাকে বলে ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স, সেই রকম একটা ভাব হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স থাকলে সেটা ঢাকবার চেষ্টায় ব্যবহারে অনেক সময়ে উল্টা করে দেখাবার প্রবৃত্তি হয়। তাছাড়া আর একটা মুশকিল আছে মিঃ ট্রুম্যানের। বিপক্ষ দল রিপাবলিক্যান পার্টি সর্বদাই প্রস্তুত আছে, যাই কর না কেন, তারা ধুয়া তুলবে যে, ট্রুম্যান গভর্নমেণ্ট বৃটেনের খপ্পরে পড়ে মার্কিন স্বার্থ বিসর্জন দিলে! পার্টি পলিটিক্সের ধাক্কা সামলাতে এলে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানকে প্রতিক্ষণ এই অভিযোগ থেকে বাঁচার কথা ভাবতে হবে, বিশেষ করে যখন জনসাধারণের মনে এই ধারণা রয়েছে যে, মিঃ ট্রুম্যানের তুলনায় মিঃ চার্চিলের ব্যক্তিত্ব-শক্তি অনেক বেশি। গত মহাযুদ্ধের সময়ে মিঃ চার্চিল কোন কোন বিষয়ে আমেরিকাকে ভুলিয়ে বৃটিশ স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা এবং সতর্কতার জন্য পেরে ওঠেন নি, এই রকম একটা ধারণাও আমেরিকায় প্রচলিত আছে। সেই চার্চিল আবার বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন; এতে কিন্তু 'রিপাবলিক্যান পার্টি' খুব খুশি, কারণ লেবার গভর্নমেণ্টের সোস্যালিজম্ তাদের দুচক্ষের বিষ ছিল, সেই সংগে সঙ্গে তারা কিন্তু এটাও বলবে যে, চার্চিলের পাল্লায় পড়ে দুর্বল, ব্যক্তিত্বহীন ট্রুম্যান মার্কিন স্বার্থ বিকিয়ে দিলেন। সুতরাং ট্রুম্যান কোম্পানী ভিতরে যত দুর্বল বোধ করবেন বাইরে বিপক্ষ দলের আঘাত থেকে বাঁচবার জন্যে তত শক্ত ভাব দেখাবার চেষ্টা করবেন, ভাব দেখাতে হবে যেন মিঃ চার্চিল যেটুকু পেলেন, সেটা খুবই ধস্তাধস্তি করে।

এর মধ্যে মজা হচ্ছে এই যে, আসলে রিপাবলিক্যান পার্টি মিঃ চার্চিলকে যা দিতে প্রস্তুত হবে, তার অর্ধেকও তারা মিঃ এটলীকে দিতে প্রস্তুত ছিল না। পুনরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে আমেরিকার নির্দেশ মিঃ এটলীকে বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয়েছিল। পরে দেখা গেছে যে পরিমাণ পুনরস্ত্রীকরণের দায়িত্ব বৃটেন স্বীকার করে নিয়েছিল, সেটা পালন করা তার অর্থনৈতিক শক্তির বাইরে। কেবল বৃটেন নয়, অতলান্তিক চুক্তির অন্তর্ভুক্ত য়ুরোপের অন্যান্য দেশও পূর্বাঙ্গীকৃত পুনরস্ত্রীকরণের পরিমাণ বহন করতে রাজি নয়—অর্থাৎ আরো মার্কিন সাহায্য না পেলে। মিঃ এটলীর পক্ষে তখন একথা স্পষ্ট করে বলা তো দূরের কথা, তাঁর দলের যাঁরা পুনরস্ত্রীকরণের পরিমাণ সম্বন্ধে আপত্তি তুলেছিলেন, তাঁদের মন্ত্রিসভা ত্যাগ করে যেতে হোল। তাঁদের কথাই এখন ফলেছে। মিঃ চার্চিল সেটা দেখছেন এবং মজা হচ্ছে যে, তিনি আমেরিকাকেও সেটা দেখাতে যাচ্ছেন। তবে মিঃ বিভ্যানের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য হোল এই যে, মিঃ বিভ্যান চেয়েছিলেন পুনরস্ত্রীকরণের পরিমাণ কমিয়ে বৃটেনের সাধ্যের মধ্যে রাখতে, আর মিঃ চার্চিলের কৌশল হচ্ছে পুনরস্ত্রীকরণের পরিমাণ আমেরিকা যা চায়, তাতে আপত্তি না করে আমেরিকাকে প্রকারান্তরে 'ম্যাও ধরতে' বলা।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, আমেরিকা সোস্যালিস্ট বিভ্যানের চেয়ে মিঃ চার্চিলকে বেশি পছন্দ করবে, যদিও মিঃ চার্চিল আরো দু-একটা ব্যাপারের পুনরালোচনা করতে যাচ্ছেন, যেগুলো মিঃ এটলী একরকম মেনে নিয়েছিলেন। অতলান্তিক চুক্তি কাউন্সিলে এক রকম ঠিক হয়ে গিয়েছিল যে, প্রস্তাবিত উত্তর অতলান্তিক নৌ কম্যাণ্ডের মাথায় থাকবেন একজন মার্কিন সেনাপতি। মিঃ চার্চিল তাতে বাধ সেধেছেন। বৃটেনে আমেরিকা যে সকল এ্যাটম বোমার ঘাটি প্রস্তুত করেছে, কার্যকালে সেগুলির ব্যবহার স্রেফ মার্কিন ইচ্ছা ও কর্তৃত্বানুযায়ী হবে; এটাও একরকম যেন ধরে নেওয়াই হয়েছিল। মিঃ চার্চিল এ বিষয়েও কিছু নূতন কথা উত্থাপন হয়ত করবেন। তবে মোটের উপর মিঃ চার্চিলের কৌশল হচ্ছে বৃটেনকে আরো বেশি আমেরিকার গা ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে আমেরিকার শক্তির ভাগ নেওয়া। সে কৌশলের কিছু কিছু ফল ইতিমধ্যেই ফলতে শুরু করেছে বলে মনে হয়। মধ্য প্রাচ্যে মার্কিন নীতি বৃটেনে চার্চিল গভর্নমেণ্ট হবার পর থেকে একটু আলাদা হয়েছে। যেমন ইরানে পূর্বে মার্কিন গভর্নমেণ্ট যতটা নিরপেক্ষতার ভাব দেখাচ্ছিলেন এখন তার পরিবর্তন হয়েছে। ইংরেজদের এখন চেষ্টা হচ্ছে, ইরান গভর্নমেণ্টের আর্থিক অসুবিধা যেমন করে পারা যায় বৃদ্ধি করা, যাতে ইংরেজের সঙ্গে নিষ্পত্তি না করা পর্যন্ত ইরান আর কারো কাছে তেল বেচতে না পারে, তার ব্যবস্থা করা এবং ইতিমধ্যে অন্য কোন উপায়ে যাতে ইরান কোন আর্থিক সাহায্য না পায়, সেটা দেখা। মার্কিন নীতি এ বিষয়ে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সহায়ক হয়েছে। মিশরের সঙ্গে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের বিবাদেও বৃটিশ

গভর্নমেণ্ট কার্যত মার্কিন নীতির সমর্থনই পেয়ে যাচ্ছে। তবে, মধ্য প্রাচ্যে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যা পাচ্ছেন, তার বদলে সুদূর প্রাচ্যে তাঁদের মিঃ ট্রুম্যানকে কিছু দিতে হবে। কিছুদিন হল ফরমোজা থেকে মার্কিন-আশ্রিত চিয়াং-কাইশেকের দল এই বছরেই চীন আক্রমণ করার রব তুলেছে। বর্মা-চীন প্রান্তে বিচরণশীল চিয়াং-কাইশেকপন্থী জেনারেল লীকে মার্কিন কর্তৃপক্ষ সিয়াম ও ইন্দোচীন থেকে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাচ্ছেন, এখবর শোনা যাচ্ছে। অন্যদিকে ইন্দোচীনের চীন সীমান্তে পিকিং গভর্নমেণ্টের সৈন্যও নাকি জমায়েৎ হচ্ছে। মার্কিন কর্তৃপক্ষ-স্থানীয় ব্যক্তিদের সাম্প্রতিক উক্তি থেকে মনে হয় যে, কোরিয়াতে শান্তি স্থাপনের জন্য তাঁদের বিশেষ আগ্রহ নেই। কিন্তু বৃটিশ গভর্নমেণ্টের ইচ্ছা নয় যে, চীনের সঙ্গে বিবাদ বাড়ে, কারণ তাহলে হংকং এবং বৃটিশ বাণিজ্য-স্বার্থ বিপন্ন হবে, বোধ হয়, মালয়েও বৃটিশদের অসুবিধা বাড়বে। কিন্তু মধ্য প্রাচ্যে এবং সুদূরে প্রাচ্যে একসঙ্গে সুবিধা করতে মিঃ চার্চিল পারবেন কি?

৬।১।৫২

ট্রামে-বাসে

নির্বাচনী প্রচারে বিভিন্ন দল যে সমস্ত শ্লোগান ব্যবহার করেন, বিহার সরকার তার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। সংবাদে প্রকাশ, এই সমস্ত শ্লোগানের একটি জবাবের ব্যবস্থাও সরকার করিয়াছেন। —"কিন্তু জবাবের প্রয়োজন নেই, একটি শ্লোগান সঙ্কলনেই ভাষা সরস্বতী সমৃদ্ধা হবেন; তাছাড়া অনাগতকালে নির্বাচনপ্রার্থীরা এটিকে একটি সপ্তকান্ড সচিবায়ন হিসেবেও ব্যবহার করতে পারবেন" —মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

* * * * *

এক সংবাদে জানা গেল, কোন এক ভোট কেন্দ্রে স্ত্রীরা নাকি স্থির করিয়াছেন যে, ভোটের ব্যাপারে তারা স্বামীর মতামতের অপেক্ষা না করিয়া স্বাধীনভাবে ভোটদান করিবেন। —"অত্যন্ত অবান্তর সিদ্ধান্ত। স্বামীর নীতির দিকে তাকিয়ে যাঁরা স্বাধীন মতামত প্রকাশে কুণ্ঠা বোধ করেন, তাঁরা অবলা হতে পারেন, কিন্তু স্ত্রীপদবাচ্যা নন"—বলে শ্যামলাল।

* * * * *

শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন—বামপন্থীদের কর্মসূচী নাই, এই অভিযোগ মিথ্যা। —"তা হতে পারে, কিন্তু সেই সূচীতে উপস্থিত 'রিপুকর্ম' ছাড়া যে কিছু হচ্ছে না, এই তো আমাদের দুঃখ"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

* * * * *

এম সি সি বনাম ভারতের তৃতীয় টেস্ট খেলায় শ্রীযুত নেহরু কলিকাতা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও একদিন খেলা দেখিতে যান নাই দেখিয়া অনেক ক্রীড়া-রসিক দুঃখিত হইয়াছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"তার একমাত্র কারণ এই হতে পারে যে, খেলায় বামপন্থীদের সমাবেশ অনেক হয়েছিল, তার মানে, এম সি সি দলে ন্যাটা ব্যাটসম্যানের ছিল সংখ্যাধিক্য'।
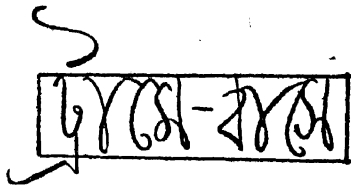
রাজ্যপাল ভবনকে নূতন করিয়া আবার 'রাজভবন' নামে অভিহিত করার কী সার্থকতা আছে, এই প্রশ্ন করেন জনৈক সহযাত্রী। বিশু খুড়োই এই প্রশ্নের উত্তর দেন—"যেহেতু কলিতে নাস্ত্যেব কেবলম্"।

* * * * *

দক্ষিণ ভারতের কোন এক স্থানে স্ত্রীরা স্বামীদের মাহিয়ানা বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন চালাইতে মনস্থ করিয়াছেন। —"অভিপ্রায় সাধু। কিন্তু আন্দোলন ফলপ্রসূ হলে খরচের অধিকার কার হাতে থাকবে, সে খবরটি জানতে পারলে স্বামি-কুল আশ্বস্ত হতে পারতেন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * * * *

ডাঃ ভাটনগর বলিয়াছেন—ভারতের সম্পদে প্রকৃতির দান অজস্র। জনৈক সহযাত্রী মন্তব্য করলেন—"সেই সঙ্গে পুরুষের অপদান অফুরান বলেই তো ভারত এখনো ভারত"।

* * * * *

প্রবাসী সাহিত্য সম্মেলনে শিশু সাহিত্য শাখার সভাপতি মহাশয় যুগোপযোগী শিশু সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজন আছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"আমরা তাঁর সঙ্গে একমত এবং বিশ্বাস করি, টিয়ে পাখীর ঠোঁটটি লালের বদলে এখন—চিত্রতারার ঠোঁটটি লাল, ছাত্রছাত্রীর শুকনো গাল গোছের ছড়ার প্রয়োজন সমুপস্থিত'!!

বিলাতের কোন এক গির্জা হইতে ঘোড়-দৌড়ের টিপ ছাপা হইতেছে শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। জনৈক রেস-রসিক আমাদের স্মরণ করাইয়া দিলেন—"এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, যেহেতু Horse is a noble animal। কালীঘাট থেকে ওরকম একটা ব্যবস্থা করতে পারলে মাকালীর বেশ দুপয়সা আয় হতো।

* * * * *

ঘোড়দৌড়ের অন্য এক সংবাদে প্রকাশ, ভারতের হাজার গিনির বাজি জিতিয়াছে Roman Dancer. এই বাজিতে favourite ছিল Young Sinner নামে ঘোড়া, সে প্লেসে পর্যন্ত ঢোকে নাই। শ্যাম বলিল—"এটা আশার কথা, কিন্তু Young Sinner এখনো favourite হচ্ছে দেখে শঙ্কিত হচ্ছি"।

* * * * *

খেলা প্রসঙ্গে জনৈক সহযাত্রী একটি মজার খবর বলিলেন। তিনি নাকি নিজের কানে শুনিয়াছেন, দুইটি মহিলা মাঠে বসিয়া একজন অন্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"খেইল তো আচ্ছা হো রহা হ্যায়, লেকিন গোল কাঁহা"?

* * * * *

সংবাদপত্রে পড়িলাম একটি ভোট কেন্দ্রে জনৈক বাউল তাঁর ভোট রেকর্ড করিয়া গিয়াছেন। —"রেকর্ডের গানটি খুব সম্ভব তাইরে-নাইরে-নাইরে-না" বলেন বিশু খুড়ো।

* * * * *

পশ্চিমবঙ্গের রাজভবনে কতকদিন আগে একটি দন্ত প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া এক সংবাদ পাঠ করিয়াছিলাম। শ্যামলাল বলিল—দে'তো হাসির প্রদর্শনী গবর্ণমেণ্ট হাউসে চিরকালই হয়ে আসছিল, রাজভবনে তার ব্যতিক্রম হলে এমন কিছু ক্ষতি হতো না"।

কোনরূপ দুর্ঘটনা অথবা অন্য কোন রোগের দরুণ রক্তশূন্যতা হলে রোগীর শরীরে বাইরে থেকে রক্ত অথবা রক্তের প্লাজমা প্রবেশ করান দরকার হয়। এর জন্য আজকাল পৃথিবীর প্রায় সব ছোট বড় হাসপাতালে এই রক্তকে প্রয়োজনের জন্য জমা করে রাখবার ব্যবস্থা আছে। আর এই রক্ত সতেজ রাখবার জন্য অনেক গবেষণা হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। গবেষকরা সব সময়ে চেষ্টা করছেন কত সহজে এবং হাল্কা ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই কাজ করতে পারেন। হারবার্ডের ডাঃ কন্ একটা ছোট

ওপরের ছবিতে রক্তদাতা রক্ত দিচ্ছে; নীচের ছবিতে যন্ত্রের সাহায্যে রক্ত আলাদা করা হচ্ছে

স্যুট্‌কেশের মধ্যে রক্ত পরিস্রুত করবার যন্ত্র তৈরী করছেন। এই যন্ত্রটার সুবিধা এই যে রক্তদাতার শরীর থেকে রক্ত টেনে নেবার সময় এই যন্ত্রের ভেতর দিয়ে যদি রক্তটা পাঠান হয়, তাহলে রক্তের ওপর 'এন্‌জাইমের কোন প্রক্রিয়া হয় না ফলে রক্ত অনেক দিন পর্যন্ত তাজা রাখা সম্ভব হয়। রক্তদাতার শিরা থেকে রক্ত প্রথমে যন্ত্রের ভেতরের একটা নলের মধ্যে যায়, সেখানে প্রথমে রক্তের ভেতরের 'ক্যাল্‌সিয়াম' আলাদা করা হয়। এর পর রক্তকে ঠাণ্ডা করে একটা সেণ্ট্রিফিউজের ভেতর রেখে খুব জোরে সেণ্ট্রিফিউজটা ঘোরান হয়—আর সঙ্গে সঙ্গে রক্ত থেকে লাল রক্ত কণিকা এবং প্লাজমা আলাদা হয়ে যায় এবং তখন এগুলো শোধিত আধারের মধ্যে জমা করে রাখা হয়।

বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

সি এম ইউ একরকম রাসায়নিক পদার্থ, এটি আগাছা ধ্বংস করার পক্ষে বিশেষ কার্যকরী। এই পদার্থটি নানারকম ঘাস এবং চওড়া পাতাবিশিষ্ট আগাছাগুলি বিশেষ করে ধ্বংস করতে পারে। সি এম ইউ আগাছার ওপর ছড়িয়ে দিলে এদের শিকড় সর্বপ্রথম এটা গ্রহণ করে পরে ক্রমশ এটা গাছের ওপরের দিকে এবং গাছের সমস্ত ডাল পালা ও পাতায় ছড়িয়ে পড়ে। সি এম ইউ প্রয়োগের পর তিন দিন থেকে দশ দিনের মধ্যে এর ফল লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে গাছের ডগার পাতাটি শুকিয়ে যেতে আরম্ভ হয়। তারপর পাতার রং বিকৃত হয় এবং গাছের বৃদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়। ক্রমে গাছ একেবারেই মরে যায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, যে সমস্ত আগাছাপূর্ণ জমি বহুকাল ধরে পতিত হয়ে আছে, সি এম ইউ প্রয়োগ করে ঐ সব জমি সম্পূর্ণভাবে আগাছামুক্ত করা যায়। এ ছাড়া রেলের লাইনের ধারে ধারে কিংবা লাইনের মধ্যে যে সব আগাছা জন্মায় এই কেমিক্যালের সাহায্যে সেগুলোকে ধ্বংস করা খুব সহজ হয়ে উঠেছে।

*

ডাঃ মাইকেল নিউটন লক্ষ্য করেছেন যে, আবহাওয়ার তারতম্য অনুসারে রক্তবাহিকা ধমনীর মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে যেতে পারে। মাইকেল নিউটন প্রায় ৬৬টি থ্রম্বসিস রোগ পরিলক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, আবহাওয়ায় যদি আর্দ্রতা বেড়ে যায় এবং বায়ুর চাপ বেড়ে যায় অথবা তাপ কমে যায় তাহ'লেই রক্ত জমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

*

শরীর ধারণের পক্ষে দুধ একটি অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য একথা সকলেই জানি। আজকাল আবার পোড়া ঘায়ের ওষুধ তৈরীর কাজে দুধের ব্যবহার হচ্ছে। দুধের মধ্যে কেসিনই সর্বপ্রধান উপাদান, এর থেকেই দৈ, ছানা ইত্যাদি তৈরী হয়। এই কেসিনের সঙ্গে সোডিয়াম ল্যাকটেট আর সোডিয়াম লরিল সালফেট মিশিয়ে একরকম মলম তৈরী হয়। এই মলমটি শরীরের পোড়া জায়গার ওপরে বেশ পাতলা মত প্রলেপ দিয়ে তারপরে জিঙ্ক এ্যাসিটেটে ডোবানো একটা গজ দিয়ে ঢেকে সেই জায়গাটা ব্যাণ্ডেজ করা হয়। ফলে এই মলমটা জিঙ্ক এ্যাসিটেটের সঙ্গে গিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা পাতলা আবরণের সৃষ্টি হয়। পোড়া ঘা যদি খুব বেশী রকম হয় তাহলে দ্বিতীয় দিনেই ব্যাণ্ডেজটি খুলে ফেলতে হয়। অবশ্য অল্প স্বল্প পোড়া হলে ব্যাণ্ডেজটা সাধারণত দু সপ্তাহ রেখে দেওয়া যায়। এইভাবে ডাক্তার ব্যাতিরেকেও এই মলম দিয়ে পোড়া জায়গাটি বেঁধে রাখা সম্ভব হয়। পোড়া ক্ষত সারানর প্রচেষ্টা চলছে আগামী যুদ্ধের আশঙ্কাতেই। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, আগামী যুদ্ধে আণবিক বোমা অতি অবশ্যই ব্যবহার করা হবে এবং এতে পুড়ে ঝলসে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী থাকবে; সেইজন্যই পোড়া ক্ষত সারানর নতুন ধরণের ওষুধ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা এখন থেকেই চলছে।

*

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে যে ফস্‌ফোনিলিক্ এসিডের যৌগিক পদার্থ যক্ষ্মারোগের জীবাণু নষ্ট করতে পারে। যক্ষ্মারোগের জীবাণু ছাড়াও অন্য জাতীয় বিষাক্ত জীবাণু ফস্‌ফোনিলিক এসিড নষ্ট করতে পারে। এতদিন এই এসিড খুব বেশী পরিমাণে তৈরী করা সম্ভব হয়নি; কিন্তু বর্তমানে দুজন রাসায়নিক চেষ্টা করে এক নতুন উপায় বার করেছেন যার ফলে এখন যথেষ্ট পরিমাণে এই এসিড তৈরী করা সম্ভব হবে।

অবনীন্দ্রনাথ

বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার একটা সর্বতোমুখী ধারা ছিল একথা বোধ হয় তাঁর সম্বন্ধে বলতে গেলে একটা গোড়ার কথা। যাঁরা তাঁকে জানবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা এই প্রতিভার স্বতঃনিঃসারিত সর্বতোমুখী প্রসার নানা দিক্ দিয়ে লক্ষ্য করেছেন। অবনীন্দ্রনাথ সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন—রবীন্দ্রনাথের গানের সুরবিন্যাস যাঁরা অবনীন্দ্রনাথের এস্রাজের সুরজালে অভিব্যক্ত হ'তে শুনেছেন তাঁরা জানেন অবনীন্দ্রনাথ কত বড় সুরশিল্পী ছিলেন। পাকা ঐন্দ্রজালিকের কায়দায় অবনীন্দ্রনাথ বাঙলার ছেলেবুড়োকে যেমন করে ছড়া ও গল্প শুনিয়েছেন তেমন করে আর কে শোনাতে পারল? তাঁর হাতের ইন্দ্রজালের সংস্পর্শে পাথর-নুড়ি, খড়-কুটি ও শুকনো ডালপালা রূপায়িত হয়ে নানা রকম খেলনার রূপ গ্রহণ করল। নোনাধরা দেওয়ালের জীর্ণ স্তরের মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন রূপ থাকতে পারে সেটা ধরা পড়ল এই ক্ষ্যাপা শিল্পীর চোখে—অমনি কয়েকটা রঙের পোঁছ্ দিয়ে কয়েকটা লাইনের গতি আরও একটু বেশী স্পষ্ট করে দিয়ে তিনি সেটা মানুষের চোখে ধরিয়ে দিলেন। এইভাবে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা স্বতঃনিঃসারিত নির্ঝরের মত বেহিসাবী কায়দায় কত নিত্য নূতন আধারের খোঁজে সর্বতোমুখী হয়ে ছোটবার চেষ্টা করেছে।

অথচ ভেবে দেখতে গেলে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার একটা মূল প্রকৃতি ছিল যার অভিব্যক্তি তাঁর সাহিত্য ও শিল্পে সমানভাবেই পাই। তাঁর ছবিতে সংগীত ও কাব্যরসের একত্র সমাবেশ। Nicholas Roerich অবনীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে বলেছেন, "The emotion packed in his paintings, in their imaginative genuine rhythm, is full of poetic symbolism. His paintings seem to say of their master:" "We **are the singing of his hand and** heart." অবনীন্দ্রনাথের চিত্রে কাব্যরসের প্রগাঢ় ভাব জমাট হয়ে আছে—এক একটা ছবি যেন এক একটা নীতি-কবিতার চিত্ররূপ। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভার ক্রমবিকাশ যাঁরা লক্ষ্য করেছেন তাঁরা জানেন যে, পদাবলী, সাহিত্য, পুরাণ, কালিদাসের কাব্য, মহাভারত ইত্যাদির মধ্য থেকে ভাবৈশ্বর্যময় মুহূর্তগুলি বেছে নিয়ে রং ও রেখার মধ্যে সেগুলোকে ধরে দেওয়ার চেষ্টা করাই ছিল অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসাধনার প্রথম সোপান। এই সোপান ধরে তিনি অনেক দূর গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি আসলে কবি ছিলেন বলেই তাঁর চিত্র শেষ পর্যন্ত গীতিকবিতাধর্মী রয়ে গেল। গীতিকবিতার পরিসর অল্প—তাই তার প্রতি কথায় ও ছন্দে বাহুল্য থাকে না—সর্বদাই আঁট-সাঁট, ভাবে ভরপুর। অবনীন্দ্রনাথের ছবিগুলোও ঠিক যেন তাই। রঙের বাহুল্য তাতে পাই না—ধুয়ে মেজে রঙের আতিশয্যটা নষ্ট করে দেওয়াতেই অবনীন্দ্রনাথের বিশেষ হাত যশ ছিল। একটা বিশেষ ধরণের wash তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যা ঠিক জাপানী wash বলা চলে না। আমার মনে হয় এই wash সৃষ্টির মূলে ছিল অবনীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিল্পীধর্ম। তাঁর চিত্রে রেখাপাতের নিপুণতা নেই একথা অনেকে বলে থাকেন। কথাটা মিথ্যে নয়। কিন্তু রেখাকে ঢাকবার চেষ্টা, তার বাহুল্যকে রঙের
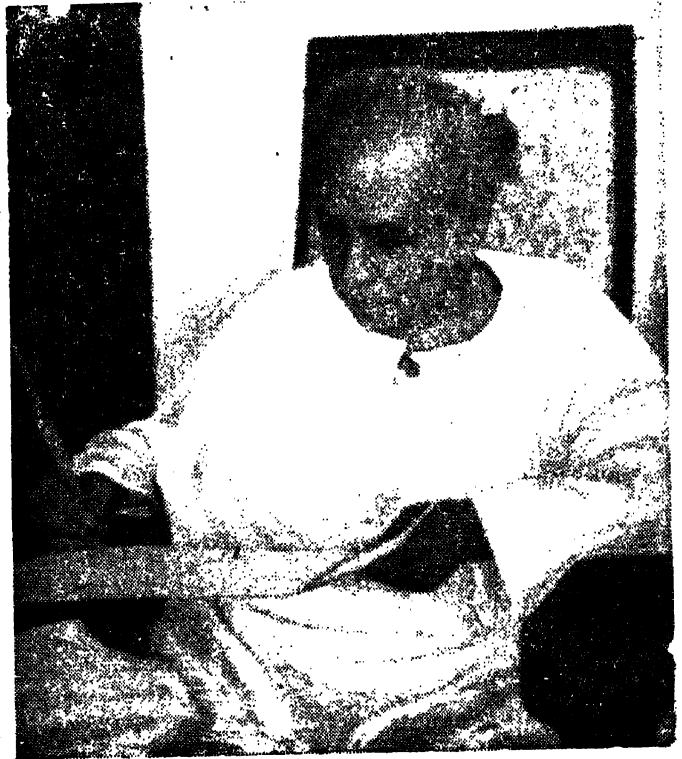
প্রলেপে লঘু করে ফেলবার চেষ্টা অবনীন্দ্রনাথের কবিধর্মের অভিব্যক্তি। ভাবঘন একটি বিরাট মুহূর্তকে কথার ও ছন্দের আতিশয্যে গীতিকবিতায় প্রকাশ করা যায় না। ঠিক তেমনিই রেখা ও রঙের বাহুল্যের মধ্য দিয়ে সেটাকে ছবিতে ফুটিয়ে তোলা যায় না। অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে একটা প্রচ্ছন্ন একক সুর পাওয়া যায়—Roerich সেটা ধরতে পেরেছেন। আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁদের অবনীন্দ্রনাথের অপূর্ব এস্রাজ বাজনা শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিল। যে বাজনাটা ছিল অনেকটা সারেঙ্গির একটানা একক সুরের মত—তাতে কোন বাহুল্য বা গমক ও ঝঙ্কারের চমৎকারিতা ছিল না। অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে তাঁর এস্রাজ বাজনা যেন শুনতে পাই। তাঁর ছবির রং ও রেখা স্পষ্টতা ও আতিশয্য ছেড়ে দিয়ে ঐন্দ্রজালিকের ভেল্কিবাজির উপকরণ হয়ে গিয়েছিল—ছবিগুলি যেন magic casement-এর মত—তার মধ্য দিয়ে কোন্ মায়াবী রাজ্যের সন্ধান মেলে। অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যেও ঠিক এই ধরণের একটা অদ্ভুত ব্যাপার। চিত্রাঙ্কন ক্ষেত্রে তিনি যেমন একটা নিজস্ব বর্ণবিন্যাসরীতি ও রেখাবিন্যাসরীতি তৈরী করে নিয়েছিলেন ঠিক তেমনি করে গল্প বলার মাধ্যম হিসাবে এক অপূর্ব ভাষা বিন্যাসরীতি গঠন করেছিলেন। কথার যে একটা বর্ণবৈচিত্র্য থাকতে পারে সেটা অনুভব করা যায় তাঁর লেখা কাহিনী ও ছড়ার ধরণের আখ্যানে। কথাগুলো অনেক সময়ে আজগুবি শোনায়, কিন্তু কথার ছন্দে ও ধ্বনিতে মিলে একটা সুর সৃষ্টি হয়, সেই সুরের রেশ মিলিয়ে গেলে পর যেন আবার কথা দিয়ে তৈরী ছবি ভেসে ওঠে—এইভাবে ছবি ও গানের মধ্যে মনটা দোলায়িত হয়—যা' থেকে যায় সেটা রসের গভীর অনুভূতি।

অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার একটা অভিনবত্ব আছে তাঁর সম্বন্ধে এইটাই কিন্তু বড় কথা নয়। আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে তাঁর প্রতিভার যে দান সেটা আজকে সকলকে স্মরণ করতে বলি। এটা সকলের জানা নেই যে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসাধনার মূলে দেশবিদেশের শিল্পপদ্ধতিকে জানবার ও বোঝবার বহু বছরের চেষ্টা বিদ্যমান ছিল। যে সময়ে ধনীরা পাশ্চাত্য দেশের কুৎসিৎ তৈলচিত্র, আসবাবপত্র ও মর্মরমূর্তি ক্রয় করে ঘর সাজাতেন সেই যুগে অবনীন্দ্রনাথ ভারত ও এসিয়ার অন্যান্য দেশের শিল্পের নিদর্শন বহু চেষ্টায় সংগ্রহ করেছিলেন। ভারতীয় শিল্পের যে সব নিদর্শন তিনি প্রথম সংগ্রহ করেন তার সাহায্যে তিনি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন যে, ভারতীয় শিল্পের ধারার সহিত চীন ও জাপানের শিল্পধারার যোগ ছিল। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পশালা বহু বছরের চেষ্টায় বহু ব্যয়ে গড়ে উঠেছিল। এ শিল্পসংগ্রহ যাঁদের দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে, এই সংগ্রহই ছিল অবনীন্দ্রনাথের শিল্প প্রেরণার মূল উৎস। দেশীয় ও বৃহত্তর ভারতের শিল্পনিদর্শন সংগ্রহ করার যে রেওয়াজ আজকাল দেখা যায় তার জন্যে অবনীন্দ্রনাথ কতটা দায়ী তা অনেকেই জানেন না। প্রতীচ্যের শিল্পরীতিকে ভালবেসে তাকে বোঝবার চেষ্টায় প্রথম ব্রতী হন অবনীন্দ্রনাথ। তাঁর বাঙলায় লেখা প্রবন্ধ 'শিল্প ত্রিমূর্তি' ভারতের নবজাগরণের ইতিহাসে একটা বড় ঘটনা। এই প্রবন্ধের ইংরাজী অনুবাদ Modern Review-তে প্রকাশিত হবার পর ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকের বাঙলার বিদগ্ধ সমাজ তার প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠলেন—কিন্তু আমাদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর মোড় ফিরল। ভারতের শিল্প সংস্কৃতির দিকে দেশের চোখ ফিরল।

দেশীয় শিল্পপদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ; কিন্তু তাই বলে তিনি প্রাচীন পদ্ধতির গতানুগতিক অন্ধ অনুকরণ করেননি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পদ্ধতি—মুঘল, রাজপুত, চীনা, জাপানী ও পারস্য চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি—এ সকল পদ্ধতির সমন্বয় করার চেষ্টা তিনি করেছিলেন। ক্ষুদ্র পরিসরে সূক্ষ্ম রেখার কারুকার্য, বিষয়বস্তুর বাস্তবতা ও রঙের বাহার—মোগল চিত্রাঙ্কন রীতির এই বিশেষত্ব তাঁর চিত্রে খুবই পাওয়া যায়। জাপানী ও বিলাতী Academic চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির মধ্যেও এই বিশেষত্ব আছে এবং সেটাও অবনীন্দ্রনাথকে প্রভাবান্বিত করেছিল। কিন্তু এই বিশেষত্বটা অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কনপদ্ধতির মধ্যে একটা সবিশেষ রূপ নিয়েছিল। জাপানী ও চীনা শিল্পের রেখার অপূর্ব বিন্যাস অবনীন্দ্রনাথের চিত্রে বেশী পাওয়া যায় না, কিন্তু এই শিল্পের হাল্কা রঙের স্নিগ্ধ কমনীয়তা অবনীন্দ্রনাথের মন ভুলিয়েছিল। এইভাবে নানা পদ্ধতির অল্পবিস্তর প্রভাব অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী মনের উপর ছাপ রেখে গিয়েছিল। কিন্তু যা প্রকাশ পেল সেটা তাঁর নিজস্ব—শুধু তাই নয় বিষয়বস্তু ও ভাব অনুযায়ী তিনি নানা পদ্ধতির নানা উপকরণ ব্যবহার করে গিয়েছেন। তাই একথা বলা ভুল যে, তাঁর শিল্পসৃষ্টি ভারতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী শিল্পপ্রচেষ্টার নিদর্শন। কিন্তু এই যে তিনি পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের বিপথ থেকে স্বাধীন, আত্মস্থ শিল্পপ্রচেষ্টার পথে শিল্পীমনকে চালিত করলেন এতে শুধু তিনি নিজের শিল্পী জীবনকে সার্থক করলেন না—ভারতের সুকুমার শিল্প সার্থকতার এক নূতন পথে চলবার প্রেরণা লাভ করল।

অবনীন্দ্রনাথের একক সাধনা কি করে শিল্পীর মনে এক নবযুগের সূচনা করল এটা একটা অভাবনীয় ব্যাপার। শিল্পজগতে প্রচার জিনিসটা অবনীন্দ্রনাথের সময়ে অভাবনীয় ছিল—এখন পর্যন্তও খবরের কাগজে শিল্পবিচার ব্যাপারটা একটা হাস্যাস্পদ জিনিস। অবনীন্দ্রনাথ সত্যিকারের আচার্য ছিলেন বলেই তাঁর প্রেরণা ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে চিত্রজগতে যুগান্তর উপস্থিত করেছিল। ছাত্রের প্রতিভাকে শিক্ষক হ'য়ে তিনি শ্রদ্ধা করতেন—তাকে স্বাধীনভাবে ভাবতে ও আঁকতে দিতেন। তিনি ছিলেন যাকে বলে 'মুশকিল—আসান'। যেখানে কেউ আটকে গিয়ে পথ চলতে পারছে না সেইখানেই আচার্যের অভয়বাণী ছাত্র শুনতে পেত—কয়েকটা রঙের পোঁচ অথবা কয়েকটা রেখার আঁচড় দিয়ে ছাত্রের ছবি শুধরে দেবার ইন্দ্রজাল তাঁর জানা ছিল। তা' ছাড়া তিনি অফুরন্ত উৎসাহ নিয়ে শিক্ষা দিতেন শুধু চিত্রকরদের নয়, দেশের অজ্ঞ লোককেও। আমার মনে আছে একবার কয়েকজন অর্বাচীন কলেজের ছাত্রের দলে পরম অবিশ্বাস মনে নিয়ে Indian Society of Oriental Art-এর প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলাম। সেকালে অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ প্রদর্শনীর আফিসে দিনের বেশীর ভাগ কাটাতেন। দূর থেকে লোকে তাঁদের দেখত, কাছে যাওয়ার সাহস সকলে সঞ্চয় করতে পারতেন না। আমরা তখন I. A. Class-এ পড়ি Presidency College-এ—ডেঁপোমিতে অগ্রগণ্য হওয়ার দুর্ণাম তখন আমাদের ছিল। পরিচ্ছদে, হাবভাবে ও কথাবার্তায় তখনকার ছেলেদের একটা বেপরোয়া আচরণ দেখা যেত। আমরা

প্রদর্শনীর অফিসে কায়দাকানুন না জেনে ঢুকে পড়লাম। গম্ভীরমূর্তি গগনেন্দ্রনাথ অবাক্ হলেন, কিছু বললেন না। অবনীন্দ্রনাথ জিগ্যেস করলেন, 'কি চাই তোমাদের'? আমরা বল্‌লাম, 'আমরা Presidency College-এর ছাত্র, Indian Art আমরা বুঝি না, আমাদের ভালও লাগে না, আমাদের বুঝিয়ে দিন Indian Art ভাল কেন, যে সব ছবি প্রদর্শনীতে দেখান হচ্ছে সে ছবি প্রদর্শনীতে দেওয়ার উপযুক্ত কেন।' অবনীন্দ্রনাথ ছেলেদের এই ধরণের ডেঁপোমি শুধু পছন্দ করতেন তাই নয়, সব সময়ে প্রশ্রয়ও দিতেন। পরে তাঁর কাছে শুনেছি যে, এর জন্যে বড়দের কাছে তাঁকে কথা শুনতে হয়েছে। সে যাই হোক্, একটা অভাবনীয় ব্যাপার ঘট্‌ল। তিনি বল্লেন, 'চল, তোমাদের ছবি বুঝিয়ে দোব'। এর পর প্রায় চারঘণ্টা ধ'রে একটার পর একটা ছবি আমরা তাঁর সংগে আলোচনা করলাম। ছবিতে perspective ও depth-এর অভাব, রেখাবিন্যাসের অক্ষমতা, অত্যধিক লম্বা হাত-পা আঙুল-চোখ, অত্যধিক সরু বাহু কটিদেশ, আজগুবি রঙের প্রলেপ ইত্যাদি নিয়ে আমরা ছেলেদের দল কঠোর মন্তব্য করে গেলাম। কি অপরিসীম ধৈর্যের সংগে তিনি আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন তা' এখনও মনে আছে। যেখানে শিল্পীর অক্ষমতা সেখানে তিনি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, শিল্পী রঙের পোঁচড়ে কি করে তাঁর অক্ষমতা ঢেকেছেন। একটা ছবির কাছে নিয়ে গিয়ে বল্লেন, 'ওহে এই ছবিটার দাম ধরেছে ২০০্ —তোমরা কত দিতে চা'ও'? আমাদের মধ্যে কেউ বল্ল কম, কেউ বল্ল বেশী। অবনীন্দ্রনাথ সোজা হয়ে, তাঁর মুখটা হাস্যরসিকের কায়দায় বেঁকিয়ে বল্লেন, 'আমাকে বিনি পয়সায় দিলেও এটা আমি নিই না'! আমরা সব হাঁ-হাঁ করে উঠ্‌লাম। তারপর একটার পর একটা দোষ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে লাগলেন। আমরা স্তব্ধ হয়ে শুনে যাচ্ছি। মনে আছে একটা ছবির সামনে এসে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে দেখলেন—ছবিটা কোন অখ্যাত শিল্পীর, দাম খুব কম। আমরা তাতে কোন বৈশিষ্ট্য পেলাম না—দেখি অবনীন্দ্রনাথ কি বলেন। আমাদের কাছে এসে চুপি চুপি বললেন, 'শিল্পী যা চায় তা' দেবার ক্ষমতা যদি আমার থাকে তো তাই দিয়ে এই ছবিটা কিনতে রাজি আছি —এটা অমূল্য। কাউকে বোলো না—নৈলে ছবিটা হাতছাড়া হতে পারে। যখন পাট গোটাব তখন আমরা ছবিটা কম দামে কিনে নিতে পারব এই আশা আছে। কিন্তু মনে কোরো না যে, আমিই ছবির দাম বসাই।' তারপর বিশ্লেষণ করে বোঝালেন ছবিটার বৈশিষ্ট্য কি। অবনীন্দ্রনাথের সব কথা বোঝার ক্ষমতা আমাদের ছিল না—কিন্তু অল্প বয়সে তাঁর কাছে আমাদের কয়েকজনের যে শিল্পশিক্ষা হয়েছিল তার তুলনা নেই—তা পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছিলাম। অবনীন্দ্রনাথ সত্যিকারের শিক্ষক ছিলেন বলেই তাঁর শিল্পসাধনা দেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। আজ তিনরঙা ছাপান ছবির মধ্য দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রের আসল জিনিসটা চাপা পড়েছে। এইটাই দুঃখের বিষয় যে, তাঁর আসল ছবি সংগ্রহ করে একটা জাতীয় প্রদর্শনী গড়ে তোলবার চেষ্টা এখনও হয়নি। সে চেষ্টা যদি না হয় তা'হলে অবনীন্দ্রনাথ শুধু ইতিহাসের পাতায় রয়ে যাবেন—আর বেঁচে থাক্‌বেন বাঙলার শিশুসাহিত্যে।

শিল্পিগুরু

প্রভাত বসু

ঘাসের সবুজ মিলালো আকাশ-নীলে,
স্বর্গ-মর্ত্য একটি রঙীন ছবি।
শ্বেত শতদল ফুটেছিল তিলে তিলে—
আপনার হাতে তুলে নিল তারে রবি।

সৌরভ আর রঙ্ পড়ে' আছে পিছে
স্বপ্নবিহীন ভাঙাচোরা ধরণীতে;
তাই দিয়ে সুর রচি আকাশের নীচে,
মাটির ধরণী ভরে স্বর্গীয় গীতে।

কল্পরাজ্যে আনাগোনা ছিল যার
দেখার অতীতে আজ সে গিয়েছে চলে।
অদৃশ্য ছবি আঁকো প্রিয়, এইবার—
অশ্রুত বাণী আমাদের যাও বলে'।

২

দোতলায় সিঁড়ির ডাইনে বামে তিনখানা ঘর। একখানায় সপরিবারে থাকেন বৈদ্যনাথ। আর পাশাপাশি দু'খানায় থাকেন অবনীমোহন আর তাঁর মেজো ভাই মৃগাঙ্কমোহন। একটু ইতস্তত করে কাকার ঘরেই আগে ঢুকল অরুণ।

গৃহিণী গৃহমুচ্যতে এ কথার আর একবার প্রমাণ পাওয়া যায় মৃগাঙ্কের ঘরে এলে। ঘর আর ঘরণী একাত্ম না হোক, ঘর যে ঘরণীরই প্রতিচ্ছায়া তার শিক্ষা দীক্ষা রুচির ছাপে চিহ্নিত একথা মৃগাঙ্ক আর সুরমার ঘর দেখে বিশেষভাবেই মনে পড়ে।

বাড়ির বৌ-ঝিদের মধ্যে রূপ সুরমার সবচেয়ে কম। দেখতে কালো। ছিপছিপে লম্বা। অবয়বের গঠনভঙ্গিও এমন কিছু সৌন্দর্যব্যঞ্জক নয়। কিন্তু বিদ্যা সবচেয়ে বেশি। আই এ পাশ করে বি এ-তে ভর্তি হয়েছিল তখন সুরমার বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পরেও পরীক্ষার জন্যে দু' দু'বার তৈরী হয়েছিল সুরমা। কিন্তু দু' দু'বারই ঠিক সময় বুঝে ছেলে মেয়ে হোল। পরীক্ষা দেওয়া আর হোল না। সুরমার ছেলেমেয়েরা সহজে আসেনি। ডাক্তারের সাহায্য নিয়ে পরিবারের অনেক টাকা খরচ করিয়ে মায়ের প্রাণসংশয় ঘটিয়ে তবে তারা ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এক একটি হওয়ার পর অনেক ধকল গেছে সুরমার শরীরের ওপর দিয়ে। মা বলেছেন, 'ভগবান করুন, তোর যেন আর না হয়, যারা হয়েছে তারা বেঁচে থাকুক।' কিন্তু সুরমা শুধু ভগবানের ওপরই নির্ভর করে নেই। নিজেরাও সতর্ক হয়েছে। সন্তান সে আর চায় না। যারা এসেছে তাদেরই পেলে পুষে মানুষ করা তার পক্ষে শক্ত, আর সংখ্যা বাড়িয়ে কি হবে।

কলেজের পড়া বন্ধ হলেও বাড়িতে সাধ্যমত পড়াশুনোর অভ্যাসটা রেখেছে সুরমা। মৃগাঙ্ক কাজ করে কলেজ স্ট্রীটের এক নামকরা প্রকাশক আর বিক্রেতার দোকানে। বই শুধু পরের কাছে বিক্রিই করে না, নিজেরও সংগ্রহ করার দিকে ঝোঁক আছে। দু' দুটি কাঁচের আলমারি ভরতি হয়ে সুরমার বই উপচে পড়েছে র‍্যাকে সেলফে। আর একটি আলমারি কিনলে ভালো হয়। কিন্তু ফার্নিচারের দাম চড়ে গেছে। টাকা সংগ্রহ ক'রে নতুন আলমারি আর কেনা হচ্ছে না সুরমাদের।

মৃগাঙ্কের পড়াশুনোর দিকে যে তেমন ঝোঁক আছে তা নয়, বই সংগ্রহ ক'রেই খালাস। এই বইগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে ঝেড়ে পুছে যত্ন করে রাখা সুরমার নিত্যকর্ম। সময় আর আগ্রহের অভাবে পড়াশুনোয় ইদানীং খানিকটা ঘাটতি পড়েছে সুরমার কিন্তু বইয়ের তত্ত্বাবধানে আলস্য আসেনি। এই লাইব্রেরী যেন ওদের তৃতীয় সন্তান। তৃতীয় কিন্তু সর্বজ্যেষ্ঠ।

তক্তপোষের তলায় দু' একটা ট্রাঙ্ক সুটকেস আর জামাকাপড় রাখবার আলনা ছাড়া গৃহস্থালীর অন্য কোন জিনিস এঘরে স্থান পায়নি। সে সব থাকে জা বাসন্তীর ঘরে। এ ঘরে আছে দু' তিনখানা চেয়ার, পড়বার টেবিল, তার ওপর সুরমার নিজের হাতের তৈরী এমব্রয়ডারি করা ঢাকনি। তাকের ওপর দু'টি ফুলদানী। তাতে কখনো ফুল থাকে, কখনো থাকে না। কিন্তু ফুলদানী দুটিই এমন সুন্দর যে, দেখতে সেগুলি প্রায় বড় বড় দুটি ফুলের মত। দেয়ালে গান্ধীজী আর রবীন্দ্রনাথের মাঝারি আকারের দু'খানি ফোটো।

মৃগাঙ্কদের ঘুম ভাঙে একটু দেরিতে। কিন্তু নিচের সোরগোলে অন্যদিনের চেয়ে আজ সকালেই উঠে পড়েছে ওরা।

অরুণ ঘরে ঢুকতেই তক্তপোষ থেকে নেমে এসে দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়াল।

চেহারার দিক থেকে পরস্পরের সঙ্গে আজও মৃগাঙ্ক আর সুরমাকে ঠিক মানায় না। চল্লিশ উৎরে গেলে কি হবে, মৃগাঙ্ককে এখনও বেশ সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবক বলেই মনে হয়। গায়ের রঙ ফর্সা, চোখ মুখের গড়নও মোটামুটি সুন্দর। আর সুরমা সবে তিরিশ পেরিয়েছে। কিন্তু দু' দুটি ছেলেমেয়ের মা হ'তে না হ'তেই ওকে বয়সের চেয়ে বেশি ভারিক্কি দেখায়। বেশি গম্ভীর।

কেবল আকৃতির সঙ্গেই নয়, প্রকৃতিগত অমিলও দু'জনের মধ্যে যথেষ্ট আছে। মৃগাঙ্ক চঞ্চল, স্ফূর্তিবাজ, হৈ হল্লা প্রিয়। আর সুরমা নিরীহ, শান্ত একান্তে শান্তিতে থাকতে ভালোবাসে। কিন্তু তবু দু'জনের মধ্যে মিল আছে বেশ। দাম্পত্য কলহ যে এক আধ সময় না হয় তা নয় কিন্তু তা প্রবচনকে লঙ্ঘন করে না। লঘু ক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। মৃগাঙ্ক নিজে পছন্দ ক'রে দেখে শুনে সুরমাকে বিয়ে করেছে। আর বিয়ের পর সুরমা পছন্দ করেছে মৃগাঙ্ককে। দুজনে দুজনের বৈপরিত্যকে যেন ভালোবেসেছে।

মৃগাঙ্ক বলল, 'ভালো আছিস?'

অরুণ মৃদু হেসে ঘাড় নাড়ল।

পায়ে হাত দিতে যাওয়ায় সুরমা একটু পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'থাক থাক। তারপর খবর কি তোমার।'

অরুণ বলল, 'আমার খবর যে মোটেই সুখবর নয় তাতো আগেই শুনেছেন। চাকরি বাকরি খুইয়ে কাশ্যপ গোত্র হয়ে ফিরে এসেছি। এবার আপনার বিদ্যামন্দিরের একেবারে স্থায়ী সদস্য হয়ে থাকব। চাঁদা-টাঁদা কিন্তু কিছু চাইতে পারবেন না।'

সুরমা কোন জবাব না দিয়ে শুধু একটু হাসল।

কাকার ঘর থেকে বাবার ঘরে এসে ঢুকল অরুণ। মনে মনে ভাবল, খুব প্রীতিকর কর্তব্য নয়, তবু সেরে আসা যাক। হাতমুখ ধুয়ে এসে তক্তপোষের ওপর বসে সকালের কাগজে চোখ বুলাচ্ছিলেন অবনীমোহন। কোঁচার খুঁট গায়ে জড়ানো। ছেলে এসে পায়ে হাত দিতেই চোখ তুলে তাকালেন। বললেন, 'এই যে, শরীর ভালো আছে তো?'

অরুণ বলল, 'হ্যাঁ, আপনার?'

অবনীমোহন ছেলের দিকে তাকিয়ে একটু যেন হাসলেন, 'আমি ভালোই আছি।'

তারপর মিনিট খানেক চুপচাপ কাটল। অবনী কম কথা বলেন। কিন্তু অরুণ তো আর তা নয়। বন্ধুরা তাকে বলে 'বকতিয়ার খিলজী', সে একবার কথা বলতে শুরু করলে আর কারো মুখ খুলবার জো থাকে

না। কিন্তু বাবার কাছে এসে অরুণের নিজের থেকেই ব্যাক্‌সংযম আসে। ভয়ে নয়। আজকাল বাবাকে সে আর ভয় করে না। কিন্তু কেমন একটা দূরত্ব যেন অনুভব করে। যেন অর্ধপরিচিত এক ভদ্রলোক তার সামনে উপস্থিত রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে শুধু সাধারণ কুশল প্রশ্নেরই আদান প্রদান চলে। তার বেশি আলাপ চালানো অশিষ্টতা। অরুণের মনে হয়, বাবা যে তার কাছে শুধু মুখই খোলেন না তা নয়, মনও খোলেন না।

একটু বাদে অবনীমোহন নিজেই কথা বললেন, 'যাও, হাত মুখ টুক ধুয়ে বিশ্রাম করো গিয়ে।'

অরুণ বলল, 'হ্যাঁ যাচ্ছি।'

তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

তেতলার ছাদের লাগা ছোট একখানি ঘর। পাতলা কাঠের পার্টিসনে দ্বিখণ্ডিত। বড় অংশটির মেঝের পাশাপাশি ছোট ছোট দু'টি বিছানা। একটিতে থাকেন মুকুন্দ রায়, অরুণের পিসেমশাই আর একটিতে সরোজ, ছোট কাকা। একজন পঞ্চাশে পা দিয়েছেন আর একজন চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করছেন। একজন দর্শন আর সাহিত্যের ভক্ত আর একজন রাজনৈতিক কর্মী। একজন প্রবাসী স্বামী—স্ত্রীপুত্র সব গাঁয়ের বাড়িতে রেখে এসেছেন, আর একজন এখনও বিয়ে করেন নি। ঘুম ভেঙে যাওয়ায় দু'জনেই বিছানার ওপর উঠে বসেছেন। একজন মোটা চুরুট ধরিয়েছেন আর একজন সিগারেট।

অরুণ কাছে এসে দাঁড়াতেই দু'জনেই বলে উঠলেন, 'আরে এই যে, এসো এসো।'

অরুণ বলল, 'ভালো তো ছোট কাকা? ভালো আছেন পিসেমশাই, My friend, philosopher and guide.'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'একটু বেশি বলে ফেললে। আমি শুধু friend আর philosopher পর্যন্ত। guide উনি।' বলে একটু হেসে সরোজের দিকে তাকালেন মুকুন্দবাবু। সরোজ গম্ভীরভাবে বলল, 'guide আমিও নই। কিন্তু guidanceএর প্রয়োজন স্বীকার করি, তাকে অমন চুরুটের ছাইয়ের মত উড়িয়ে দেই না।'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'আর সিগারেটের ছাই বুঝি কিছু কম ওড়ে সরোজবাবু?'

অরুণ স্মিতমুখে একটুকাল দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু দু'জনেই নিঃশব্দে ধূমপান করতে লাগলেন। শিগ্‌গির কেউ আর কোন কথা বললেন না।

অরুণ সরে গিয়ে ঘরের দ্বিতীয় অংশটুকুর সামনে এসে দাঁড়াল। সারা বাড়ির এই অংশটুকু একান্ত করে তার। চাকরি উপলক্ষে দিল্লীতে যাওয়ার আগে সমস্ত কৈশোর আর যৌবনের প্রারম্ভ সে এই খুপরিটুকুর মধ্যে কাটিয়েছে। বছরের সমস্ত সময়টা বন্ধু মহলে আড্ডা দিয়ে পরীক্ষার আগে আগে বইপত্র নিয়ে এই চিলেকোঠার ঘরে স্বেচ্ছাবন্দী হয়েছে অরুণ। এম এ পর্যন্ত এই ছিল ওর পাঠাভ্যাসের পদ্ধতি। প্রবাসে থেকে যতবার নিজেদের বাড়ির কথা ওর মনে হয়েছে সবচেয়ে আগে চোখের সামনে ভেসে উঠেছে চিলেকোঠার এই ঘরখানি। কিন্তু নিজের ঘরের অবস্থা দেখে অরুণ মুহূর্তকাল স্তম্ভিত হয়ে রইল। বিড়ি আর সিগারেটের টুকরোয় ঘর ভরতি। তারই মধ্যে বিছানা পেতে অরুণেরই সমবয়সী কি দু' এক বছরের বড় একটি যুবক নির্বিকার ঔদাসীন্যে শুয়ে রয়েছে। নিদ্রামগ্ন নয়, ডান হাতের তালুতে মাথা রেখে গভীর চিন্তামগ্ন। কিন্তু কিসের একটা শব্দে তার ধ্যান ভাঙল। অতল সমুদ্রতল থেকে সে যেন ভেসে উঠল। বিছানার ওপর উঠে বসল। তারপর হাসিমুখে মধুর আপ্যায়নের সুরে বলল, 'এই যে আসুন আসুন।'

মামাত বোনের এই স্বামীটির সঙ্গে বেশি আলাপ নেই অরুণের। দেখা সাক্ষাৎ অল্পই হয়েছে। কিন্তু ভদ্রলোকের অতি অন্তরঙ্গতায় অরুণ যেন সর্বাঙ্গে এক অস্বস্তিবোধ করল। মুহূর্তকাল চুপ ক'রে থেকে বলল, 'আপনি আগে বেরিয়ে আসুন। ঘরটা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করাই তারপর আসব। যা অবস্থা ক'রে রেখেছেন, তাতে কোন মানুষে ও ঘরে ঢুকতে পারে না।' সুবিমল কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পিছন থেকে একটি নারীকণ্ঠ শোনা গেল; 'সুবিমল তুমি উঠে আমার ঘরে এসো। ওঘর আমাদের নয়।'

অরুণ মুখ ফিরিয়ে তাকাল, মামীমা।

কনকলতা বললেন, তোমার ঘর আমি এক্ষুনি পরিষ্কার করে দিচ্ছি নান্তু। একটু দাঁড়াও।'

অরুণ বলতে গেল, 'মামীমা—'

কনকলতা জামাইয়ের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'এসো সুবিমল। ঘুম যদি এখনো না ভেঙে থাকে, আমার ঘরে গিয়ে ঘুমোবে এসো।'

সুবিমল এবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর সমস্ত অপমানও যেন গা থেকে ঝেড়ে ফেলেছে, তেমনি ভাব দেখিয়ে একটু হাসল, 'ও, আপনাকে বেদখল করেছিলাম বুঝি, আসুন আসুন দখল নিন দখল নিন। এতক্ষণ বুঝতেই পারিনি।'

কনকলতা বললেন, 'এবার তো বুঝেছ? এসো।'

অরুণ ফের ডাকল, 'মামীমা'।

কিন্তু সাড়া দেওয়ার জন্যে কনকলতা আর দাঁড়ালেন না। জামাইকে সঙ্গে নিয়ে দোতলায় নেমে গেলেন।

কিন্তু দখল বেদখলের পর্ব এখানেই শেষ হোল না। চা-টা খেয়ে সুবিমল প্রায় তখন তখনই বেরিয়ে পড়ল। ফিরে এল এগারটা নাগাদ। নিজের বাক্স বিছানা একটা রিকসায় তুলে অরুণের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলি, কিছু মনে করবেন না। মাঝে মাঝে পায়ের ধুলো দেবেন।'

অরুণ বলল, 'সেকি এই দুপুরে বেলায় না খেয়েদেয়ে কোথায় চললেন।'

সুবিমল বলল, আপাতত এক বন্ধুর মেসে। সেখানে নিমন্ত্রণ পেয়েছি। দেখি কদিন আবার কাকে বেদখল করে রাখতে পারি। ওইতো আমাদের কাজ।

অরুণের আসার সময় যেমন হয়েছিল, সুবিমলের যাওয়ার সময়েও তেমনি বাড়িশুদ্ধ লোক সদরের কাছে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। শুধু পুরুষেরা ছাড়া, তাঁরা সব অফিসে বেরিয়ে গেছেন।

সবচেয়ে আগে এলেন ভুবনময়ী। স্থূল দেহখানাকে তাড়াতাড়ি টেনে আনতে আনতে তিনি প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছেন। ভুবনময়ী বললেন, 'আমার মাথা খাও, আমার মাথা খাও সুবিমল, তুমি এমনভাবে যেয়ো না।'

বাসন্তী বললেন, 'তুমি এসো। আমার ঘর তোমাকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি। জামাই তুমি। তোমার থাকবার জায়গার অভাব হবে এবাড়িতে, তুমি কি বলছ।'

সুবিমল বলল, 'আমি তো তা বলিনি। থাকবার জায়গার কেন অভাব হবে।'

রিকসায় উঠে বসল সুবিমল।

ভুবনময়ী বলতে লাগলেন, 'শালা-ভগ্নিপোতে কত কথা হয়, কত রঙ্গ রসিকতা হয়, তাই বলে কি এমন কাণ্ড করে নাকি মানুষে। আমি তো বাপের জন্মেও দেখিনি এমন। একি কেলেঙ্কারি, একি কেলেঙ্কারি।'

সুবিমল রিকসাওয়ালাকে চলতে হুকুম দিল।

বাসন্তী কনকলতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বউদি আমাদের জব্দ করার জন্যেই তুমি একাজ করেছ। তুমিই এর মূলে। সকাল থেকেই মেস মেস করছিলে। সেই মেসেই পাঠালে জামাইকে। শুধু আমাকে জব্দ করার জন্যে।'

কনকলতা বললেন, 'জব্দ কে কাকে করছে, তা সবাই দেখতে পাচ্ছে। যার জামাই না খেয়েদেয়ে দুপুর বেলায় বাড়ি থেকে রাগ ক'রে চলে গেল, সে জব্দ হোল না, তার দুঃখ হোল না, ব্যথা লাগল পাড়া পড়শীর। কার জন্যে কার যে কতটুকু ব্যথা তা আর জানতে বাকি নেই আমার।'

বাসন্তী বললেন, 'পাড়াপড়শী। হ্যাঁ! এখন তো পাড়াপড়শীই হয়েছি। পাড়া-পড়শীর চেয়েও তুমি আমাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছ।'

অরুণ ধমক দিয়ে বলল, 'মা তুমি কি থামবে না? আমার বাড়ি আসাই অন্যায় হয়েছে দেখছি।'

বাসন্তী বললেন, 'এলি কেন। না এলেই আর পাঁচজনে স্বস্তিতে থাকত।'

খাওয়া দাওয়া আর সংসারের কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে সারাদিন ধরে ননদ ভাজে কথা কাটাকাটি আর ঝগড়া চলতে লাগল। শুনতে শুনতে অরুণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। আসতে না আসতেই একি শুরু হোল বাড়িতে। এখানে সে থাকবে কি করে।

সন্ধ্যার একটু আগে আগে সবাই বাড়ি ফিরলেন। বৈদ্যনাথ কাজ করেন বড়বাজারের এক মাড়োয়ারী মার্চেণ্ট অফিসে। ক্লাইভ রোয়ের ন্যাসনাল ইনসিওরেন্সে অবনী-মোহনের চাকরি। দুজনে একই ট্রামে ফিরলেন। ফিরে এসে যাঁর যাঁর স্ত্রীর মুখে প্রায় একই সময় শুনলেন ঘটনার বিবরণ। অবশ্যই এক কথা শুনলেন না।

কনকলতা বললেন, 'আমি এ বাড়িতে আর থাকব না। তুমি যদি কালই অন্য কোন বাড়ির ব্যবস্থা না করো, আমি যেদিকে দু চোখ যায়, চলে যাব।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'হুঁ এবার সেই ব্যবস্থাই করতে হবে দেখছি। লোকের সহ্য করবার একটি সীমা আছে। কিন্তু সুবিমলেরই বা একেবারে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার কি হোল। বাড়িতে আর কোন ঘর-দোর ছিল না এমন তো নয়। ওপরের ঘরখানার ভাড়াই না হয় অবনীরা দেয়, কিন্তু নিচের দুখানা তো আমাদেরই, তাতে ওর থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেই হোত।'

কনকলতা বললেন, 'আমি তো তাই বলেছিলাম। কিন্তু সুবিমল শুনল কই।'

অণিমা কাছেই ছিল, এবার এসে পাশে দাঁড়াল, 'না মা, তার চলে যাওয়াই ভালো হয়েছে। অন্য কোন ঘরে থাকতে হলে তা নিয়েও গোলমাল হোত। তার চেয়ে এই ভালো। কলকাতা শহরে তার থাকবার জায়গার অভাব কি, আত্মীয় বন্ধু কত আছে। তোমরা বলেছিলে বলেই এতদিন ছিল, না হলে কবে চলে যেত।'

পাশের ঘরে ঠিক এই বিষয় নিয়েই দাম্পত্যালাপ চলল খানিকক্ষণ।

বাসন্তী বললেন, 'আর সহ্য হয় না রোজ রোজ এই কেলেঙ্কারি। এবার তোমরা অন্য বাসা দেখ।'

অবনীমোহন চায়ের কাপে চুমুক দিলেন, 'তা না হয় দেখব। কিন্তু সুবিমল হঠাৎ চলে গেল কেন।'

বাসন্তী কিছুটা অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বললেন, 'গেল কেন তা আমি কি ক'রে জানব।'

অবনীমোহন বললেন, 'বেশ যে জানে, তাকেই জিজ্ঞেস করছি।'

অরুণকে ডেকে পাঠালেন অবনীমোহন। সব শুনে বললেন, 'তুমি অন্যায় করেছ।'

বাসন্তী বললেন, 'নিজের ছেলেমেয়েদের দোষ ছাড়া তো তোমার আর কিছু চোখে পড়ে না।'

অবনীমোহন এবার একটু হাসলেন, 'আর একজনের দোষও চোখে পড়ছে।'

বাসন্তী বললেন, 'তাতো পড়বেই। আমার দোষ তো তুমি চোখ মেলতে না মেলতেই দেখতে পাও। কিন্তু আসল দোষ যে কোথায়, তাই শুধু তোমার নজরে পড়ে না।'

বাসন্তী হয়তো আরো দু একটা কথা বলতেন, কিন্তু ছেলে কাছে আছে বলে থেমে গেলেন।

অবনীমোহন ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার অন্যায় হয়েছে একথা স্বীকার করা ভালো।'

অরুণ একটু অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলল, 'আমি তো তা অস্বীকার করছিনে। ঘরের নোংরা অবস্থা দেখে আমি মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনি।'

অবনীমোহন বললেন, 'মানুষের বাইরের নোংরামিই কি সব? ভিতরের দিকেও তাকাতে হয়। বিশেষ করে নিজের।'

অরুণ একটু কাল চুপ করে থেকে বলল, 'আপনি তাহলে এখন কি করতে বলেন?'

অবনীমোহন বললেন, 'আমি আর কিছুই বলিনে। তোমার বয়স হয়েছে, লেখাপড়া, শিখেছ, তার ফলে বুদ্ধি বিবেচনাও কিছু হয়েছে বলে লোকে আশা করে।' কথা শেষ না ক'রে সেলফ থেকে মেটেরিয়া মেডিকাখানা টেনে নিলেন অবনীমোহন।

অরুণ স্থির হয়ে একটু কাল তাকিয়ে রইল। তারপর মার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'বেশ, কাল সকালে গিয়ে সুবিমলকে পায়ে ধরে সেধে নিয়ে আসব। তা হ'লে তো আর কোন দোষ থাকবে না? আমি আজ রাতে কিছু খাব না মা। ক্ষিদে নেই। আর নীচের বৈঠকখানা ঘরেই আমার বিছানা পেতে দাও। বড্ড ঘুম পেয়েছে।'

অবনীমোহন বই থেকে মুখ তুললেন না।

ফলে নিজের আস্ফালনটা নিজের কাছেই ভারি ছেলেমানুষি বলে মনে হতে লাগল অরুণের।

বাসন্তী ঘরের বাইরে এসে পরম স্নেহে সেই ছেলেমানুষের হাত ধরলেন। তারপর স্নিগ্ধ স্বরে বললেন, 'তুই কি পাগল হলি নাকি। খাবিনে কেন। না খাওয়ার কি হয়েছে এর মধ্যে। উনি তো অমন কতই বলেন। অত ভালো মানুষ বলেই তো এই দশা করে তুলেছেন সংসারের।'

রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে পরিবেশন করে পাতের কাছে বসে ছেলেকে খাওয়ালেন বাসন্তী। নান্তুর ওই এক দোষ। একটু কিছু হলেই যত রাগ যায় ওর খাওয়ার ওপর। 'হ্যাঁরে, এত দেশ-বিদেশ ঘুরলি এখনো কি তেমনি আছিস। কথায় কথায় রাগ হয় তোর? দিল্লীতে রাগ করতি কার ওপর? ঠাকুর চাকরের ওপর? মাসের মধ্যে ক'দিন থাকতি না খেয়ে?' বাসন্তী একটু হাসলেন, তারপর ছেলের পাতের দিকে চোখ পড়তেই ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ওকি, মাছটুকু ফেলে যাচ্ছিস কেন? ওটুকু খেয়ে ফেল্। আমার কথা শোন্। খা। তোমার আর ভদ্রতা করতে হবে না বাপু। সবার জন্যেই আছে। তুমি খাও। না খেয়ে খেয়ে যা চেহারা বানিয়েছ একখানা।'

বৈঠকখানা ঘরে কিছুতেই অরুণের জন্যে বিছানা পাতলেন না বাসন্তী। অত ভিড়ের

মধ্যে ওর ঘুম হবে না। এইটুকুন বয়স থেকে ওর একটু নিরিবিলি থাকা স্বভাব। বাসন্তীর তো কিছু আর জানতে বাকী নেই।

নিজে তোষক বালিস টেনে টেনে ট্রাঙ্ক থেকে ফর্সা চাদর বের করে তেতলার চিলা কোঠায় ছেলের জন্যে বিছানা পেতে দিলেন বাসন্তী। বললেন, 'কাল গাড়িতে ঘুম হয়নি। আজ সকাল সকাল ঘুমো, না হলে শরীর খারাপ হয়ে পড়বে।'

চলে যেতে যেতে আবার একটু ফিরে দাঁড়ালেন, 'পারো তো চাকরি বাকরির কথা ভেবে রাত ভোর কোরো। ও নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে যেয়ো না। মন খারাপ কোরো না। চাকরি গেছে আবার হবে। অকাট মুখ্যু তো নও। গতি একটা হবেই। ঘুমোও এবার। আর আলো জেবলে রেখে কাজ নেই।'

নিজেই স্যুইচটা অফ করে দিয়ে গেলেন বাসন্তী, পায়ের কাছ থেকে পাতলা চাদর-খানা টেনে এনে গায়ে দিল অরুণ। মায়ের পুরোন ট্রাঙ্কের গন্ধ আছে এই চাদরে। মায়ের নিজের গায়ের গন্ধের মত। অদ্ভুত মায়ের স্নেহ। অরুণের সমস্ত অযোগ্যতা, সমস্ত অপরাধ মা আদর দিয়ে ঢেকে রেখেছেন। বাবা তাঁর ঔদার্য নিয়ে দূরে সরে রইলেন। কিন্তু সংকীর্ণ স্বার্থপরতায় ধরা দিলেন মা। মা ছোট, এই চিলে কোঠার মতই স্বল্পপরিসরের। কিন্তু একান্ত নিজস্ব, একান্ত আপন। অরুণ পাশ ফিরল। ঘুম আসছে না। মায়ের হাতের সযত্নে পাতা এমন সুন্দর নরম বিছানাতেও আজ যেন ঘুম আসতে চাইছে না। ঠিক বেছে বেছে আজকেই মা এত আদর না দেখালেও পারতেন। এই স্নেহের দান আর গ্রহণের মধ্যে কিসের যেন একটা লজ্জা জড়িয়ে থাকে। অল্প বয়সে নির্বিচারে মায়ের আদর নেওয়া যায়, কিন্তু বয়স বাড়লে নিজের পৌরুষ দিয়ে না নিলে, যোগ্যতা দিয়ে না নিলে ঠিক যেন নেওয়ার মত নেওয়া হয় না। বাবার চোখের সামনে মামীমার চোখের সামনে, সংসারের আর পাঁচজনের সামনে মার যে অনুদার পক্ষপাত আর স্বার্থপর স্নেহ প্রকাশ হয়ে পড়ল তার জন্যে হঠাৎ যেন ভারি লজ্জা বোধ হোল অরুণের। মার জন্যে লজ্জা, নিজের জন্যে লজ্জা, সকালের কাণ্ডটার কথা মনে পড়ল।

সুবিমল সত্যিই ভারি নোংরাভাবে ছিল। অরুণ নিজেও এমন কিছু গোছাল স্বভাবের নয়। কিন্তু সুবিমল তার চেয়েও বেশি অপরিচ্ছন্ন। মাথায় হাত দিয়ে অমন করে

ভাবছিল কি ও? চাকরি বাকরির কথা? চাকরির কথা তো কাল থেকে অরুণকেও ভাবতে হবে। অবশ্য মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে হবে না। তবু ভাবতে তো হবেই। এতক্ষণ বাদে সুবিমলের জন্যে হঠাৎ কেমন একটু সহানুভূতি হোল অরুণের আর এই মমত্ব বোধ নিজের কাছেই ভালো লাগল। কিন্তু ঘুম বোধহয় আজ আর সহজে আসবে না। আরো কিছুক্ষণ এ পাশ ও পাশ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল অরুণ। এসে দাঁড়াল ছাদে। আস্তে আস্তে পায়চারি করতে করতে আলসের কাছে এসে থেমে দাঁড়ায়। কারা ওখানে। পায়ের শব্দে গলার শব্দে ওরাও ফিরে তাকিয়েছে। প্রীতি এগিয়ে এসে বলল, 'আমরা'।

বিজয় প্রতিধ্বনি করল, 'আমরা'।

অরুণ হেসে বলল, 'ও তোরা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছিস বুঝি?'

প্রীতি বলল, 'হ্যাঁ, ঘুম আসছিল না।'

বিজু বলল, 'আর যা গরম।'

অরুণ হেসে বলল, 'হ্যাঁ সব রকমের গরমই আছে। ঝগড়ার গরমটাও নেহাৎ কম নয়।'

বিজু বলল, 'এরা কথায় কথায় এমন ঝগড়া করে কি যে আনন্দ পায় বুঝিনে।'

অরুণের ভারি ভালো লাগল। এসে অবধি সকাল থেকে দুই পরিবারের মধ্যে কেবল ঝগড়া আর চেঁচামেচি শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। কিন্তু এত বিবাদ বিসংবাদের মধ্যেও দুটি আত্মীয় পরিবারের দুজন প্রতিনিধি দুটি ছেলেমেয়ে তাদের অন্তরঙ্গতার কথা মনে রেখেছে। তারা ভরা একই আকাশের নিচে পাশা পাশি দাঁড়িয়ে গল্প করছে দুজনে।

প্রীতি বলল, 'এবার যাই দাদা, শোয়ার ব্যবস্থা করি গিয়ে।'

অরুণ জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় শোস তুই।' প্রীতি বলল, 'নিচে দিদিমার ঘরে। অণি থাকে আমার সঙ্গে। আজ তো সে রেগে একেবারে টং হয়ে রয়েছে। কিচ্ছু খেল না। তুমি কাজটা ভালো করো নি দাদা।'

অরুণ বলল, 'সত্যি ভারি অন্যায় হয়ে গেছে।'

বিজু বলল, এমন কিছু অন্যায় হয় নি। সামান্য কথা নিয়ে সুবিমলবাবুরই কি অত কাণ্ড করা উচিত হয়েছে?'

বলে বিজু নিচে নেমে গেল।

শান্ত সংযত সাংসারিক ব্যাপারে খানিকটা নির্লিপ্ত ধরণের ছেলে বিজু। পড়াশুনোয় ভালো। অরুণের মত কেবল পরীক্ষার সময়েই বইয়ের খোঁজ করে না। সারা বছর ধরে পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। কুড়ি উৎরে একুশে পড়েছে। অসুখের জন্যে একটা বছর ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিতে দেরি হয়েছিল। না হলে এবার বি কম্ পাশ করে যেত। মামাত ভাইবোনদের মধ্যে ওকে খুব ভালোবাসে অরুণ।

প্রীতি বলল, 'তোমার আর কিছু লাগবে নাকি দাদা? জলটল সব ঠিক আছে তো?'

অরুণ বলল, 'আছে। তুই যা এবার। পতির অপমানে সতী ওদিকে দেহত্যাগ করল কিনা দেখ গিয়ে।'

প্রীতি চলে গেলে অরুণ এসে ফের বিছানায় শুয়ে পড়ল। চোখ বুজতেই এবার একটি মেয়ের মুখের আদল ফুটে উঠল অন্ধকারে। সহকর্মী বন্ধু হিরন্ময় মজুমদারের বোন করবী। বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলেও হয়েছে একটি। বছর তিনেক বয়স। মার মতই বেশ ফুটফুটে সুন্দর চেহারা। সাধারণত ছোট ছেলেকে আদর করতে পারে না অরুণ। কিন্তু করবীর ছেলেকে খুব আদর করেছিল। তা দেখে করবী বলেছিল, 'আপনি তো দেখছি একেবারে বাৎসল্যে ভরপুর। ওর বাবা কিন্তু ওকে দেখতেই পারে না।'

হিরন্ময় জবাব দিয়েছিল, 'রক্ষা যে পারে না। তাহলে পরেশকে কি তুই দেখতে পারতি? বাৎসল্যটা পুরুষের বেশি বয়সে আসে। বেশি বয়সে আসাই ভালো।'

ছুটি না পাওয়ায় পরেশবাবু যেতে পারেন নি। ছেলেকে নিয়ে করবী একাই গিয়েছিল দাদা বাউদির কাছে। হিরন্ময়ই লিখেছিল তাকে যেতে।

'অস্থায়ী চাকরি কবে আছে কবে নেই। এসে একবার বেড়িয়ে যা।'

সবাই মিলে খুব বেড়িয়েছিল যা হোক। শেষের দিকে হিরন্ময়ের স্ত্রী নমিতা আর যেতেন না। পিপলুকে বউদির কাছে গছিয়ে করবী একাই বেরুত তাদের সঙ্গে। মাস-খানেক ছিল খুব হৈ হৈ করে কাটিয়ে এসেছে। আসার সময় করবী ঠিকানা দিয়ে এসেছিল, 'কলকাতায় গিয়ে অবশ্যই যাবেন। ভবানীপুরের শাঁখারী পাড়া লেন চেনেন তো?'

অরুণ অপরিচয়ের ভান করে বলেছিল, 'কই না।'

করবী জবাব দিয়েছিল, 'না চিনলেও চৌরঙ্গী থেকে জিজ্ঞেস করতে করতে যাবেন। আমি যেমন জিজ্ঞেস করতে করতে দিল্লী এসেছি।'

ভারি প্রগলভা। বছর বাইশ তেইশ বয়স। স্বামীপুত্রের সুখে সৌভাগ্যবতী, সেই সমৃদ্ধি নিজের মধ্যে চেপে রাখতে পারে না। আপনা থেকেই উপচে উপচে পড়ে। ঠিকানা দিয়ে বলেছিল, 'যাবেন, আলাপ করে আসবেন বোস মশাইর সঙ্গে। অবশ্য তিনি যা আলাপী—'

বলে মৃদু হেসেছিল করবী।

অরুণ জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন, পরেশ-বাবু আলাপ করতে ভালো বাসেন না বুঝি?'

করবী বলেছিল, 'ভালো ঠিকই বাসেন, ভালো পারেন না। চিঠিপত্রে খুব কলম চলে, কিন্তু আপনার মত অমন মুখ চলে না।' আর একবার অনুরোধ করেছিল করবী, 'যাবেন কিন্তু।'

পথে প্রবাসে অমন কতজনের সঙ্গেই তো আলাপ হয়, কতজনেই তো ঠিকানা দিয়ে ভদ্রতা করে যেতে বলে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে না যাওয়াটাই ভদ্রতা। তাছাড়া গিয়ে কি বলবে? চাকরি গেছে? ছুটিতে আসে নি, একেবারে ছাঁটাই হয়ে এসেছে? করবী হয়তো একটু সহানুভূতি জানাবে। অনু-কম্পা বোধ করবে। সেই অনুকম্পা কুড়োতে গিয়ে লাভ কি।

করবীর দাদা—হিরন্ময়ের চাকরি এখনো অক্ষত আছে। সে অনেক আগে ঢুকেছিল। পদে দু' ধাপ ওপরে। মাইনেও বেশি। তাছাড়া ওপরওয়ালার মন জুগিয়ে চাকরি কি করে রাখতে হয় তা সে জানে। ও চাকরি গেলে অন্য ভালো চাকরি জুটিয়ে নিতে তার দেরি হবে না। বন্ধুর জন্যে খানিকটা ঈর্ষা বোধ করল অরুণ। কিন্তু সেই সঙ্গে বন্ধুর বোনের নিমন্ত্রণের কথাটা আর এক-বার মনে পড়ল। পড়ুক গিয়ে। কাল থেকে শহরের অফিসে অফিসে অরুণকে ধন্না দিয়ে বেড়াতে হবে। অত নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ রাখবার তার সময় কই। ক্রমশ

ভারতে মাউন্টব্যাটেন

অ্যালান ক্যাম্বেল-জনসন

(১৪)

মাউণ্টব্যাটেনের পত্রোত্তরে নেহরু। কাশ্মীর-সংকট সম্পর্কে মাউণ্টব্যাটেন—আলোচনায় কালক্ষেপ করাই মঙ্গলকর। এটলীর কাছে মাউণ্টব্যাটেনের টেলিগ্রাম ভারতে এসে দুই প্রধান মন্ত্রীর সংগে সাক্ষাৎ করুন। ডেলি হেরল্ডের প্রচারিত কাহিনী—মাউণ্টব্যাটেন কাশ্মীর বিভক্ত করতে চাইছেন। নেহরুর প্রতিবাদ। এ কাহিনী "ষোল আনা কল্পনার চেয়েও বেশী কাল্পনিক"। নেহরু বিরক্ত—মন্ত্রিসভার ভেতর থেকেই গোপন সংবাদ বাইরে বের হয়ে যায়। কর্মহীন রাজন্যদের জন্য বিশেষ সুবিধার অধিকার। সম্মেলনে আলোয়ারের উষ্মা ও অভিমান। মাউণ্টব্যাটেনের তীক্ষ্ণ প্রত্যুত্তর। রাজন্যদের কাণ্ডজ্ঞান। একটি অভিনব দৃশ্য—মেননের সংগে ভোপালের কোলাকুলি।

দেশীয় রাজ্যগুলিকে সাধারণ শাসিত অঞ্চলে পরিণত হতে হবে। ইতিহাসের নজীর—নেপোলিয়নের রাইন রাষ্ট্রমণ্ডলী। মাউণ্টব্যাটেনের প্রস্তাবে রাজন্যদের বিমূঢ় ভাব। প্রার্থনা সভায় গান্ধীর ঘোষণা। আগামীকাল হতে গান্ধীর 'আমরণ অনশন' আরম্ভ হইবে। "একমাত্র ঈশ্বরকে উপদেষ্টা বিবেচনা ক'রে এই ব্রত গ্রহণ করেছি।" দিল্লীর শুভবুদ্ধি স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাগ্রত হলে তবেই গান্ধী অনশন ভংগ করবেন। প্রার্থনাসভার পরেই গান্ধী-মাউণ্টব্যাটেন আলোচনা। পঞ্চান্ন কোটি টাকার প্রসঙ্গ। গান্ধীর সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন মাউণ্টব্যাটেন। গান্ধী-প্যাটেল সম্পর্ক কি ক্ষুণ্ণ হয়েছে? নেহরু ও প্যাটেলের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি।

গান্ধীর অনশন আরম্ভ হয়ে গেছে। মাউণ্টব্যাটেনের বিকানীর যাত্রা। বিকানীর মহারাজার ভোজসভা বাতিল। গণ-চিত্ত উদ্বোধনের সার্থক শিল্পী গান্ধী। বিকানীরের শিকার বিলিয়ার্ড ও ককটেল। নেহরু ও প্যাটেল—গান্ধীর অনশনে দুই নেতার মানসিক প্রতিক্রিয়া। বল্লভভাইয়ের প্রতি গান্ধী—'চিরকাল তুমি ও আমি অভিন্ন ছিলাম'। প্যাটেলের- চোখে জল। ভারত গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত—পাকিস্থানকে পঞ্চান্ন কোটি টাকা দিয়ে দেওয়া হবে।

অনশনরত গান্ধীর নিকট মাউণ্টব্যাটেন। গান্ধীর সাত সর্ত। মুসলিম নিরাপত্তার জন্য আন্তরিক উদ্যমের প্রমাণ পেতে চান গান্ধী। প্রসাদ-আজাদের পরিচালনায় শান্তি-কমিটি। এক'শো বাইশ ঘণ্টার অনশনে ক্ষীণদেহ ও বৃদ্ধ মহাত্মার অবস্থা। শান্তি-কমিটির প্রতিশ্রুতি ও গান্ধীর অনশন ভংগ। বিক্ষোভ প্রদর্শনে শিখ। গান্ধীর বাণী—এক'শো পঁচিশ বছর বেঁচে থাকতে চাই যদি সাম্প্রদায়িক প্রীতি অক্ষুণ্ণ থাকে। মার্কিণ সাংবাদিকের গবেষণা—গান্ধীর অনশন ও আবহাওয়া-তত্ত্বের সম্পর্ক। নেহরু-চরিত্রের এক দিক। বিড়লা ভবনের সম্মুখে 'কৃষ্ণ-প্রেরিত মানুষ' লোক চলাচল বন্ধ করে। একটি কাহিনী—নেহরু ও ঘুমন্ত ভৃত্য।

গান্ধীর প্রার্থনা সভায় বোমা বিস্ফোরণ। নির্বিকার গান্ধী ও নিরাতঙ্ক সভা। মাউণ্টব্যাটেন আজই বিকালে দিল্লী ফিরেছেন। ছ'টা বাজতে দশ মিনিট বাকী—গান্ধী-হত্যার সংবাদ। মাউণ্টব্যাটেন আশঙ্কা করছেন—কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সারা ভারতে ভয়ানক ব্যাপার দেখা দেবে। নেহরুর ওপর এখন সব নির্ভর করছে। বিড়লা ভবনের দৃশ্য। 'ঘুমন্ত মহাত্মা'। যেন পরম শান্তির মধ্যে ডুবে রয়েছে গান্ধীর মুখ। "জীবনের সব চেয়ে বেশি বেদনাবিহ্বল অভিজ্ঞতা"। কি শক্তি সৃষ্টি করে রেখে গেলেন গান্ধী? বিড়লা ভবনের ওপর আকুল জনতা ঝাঁপিয়ে এসে পড়ছে। গান্ধীর প্রতি মাউণ্টব্যাটেনের নীরব শ্রদ্ধার অনুষ্ঠান। একটি কক্ষে ভারতের মন্ত্রিগণ। গান্ধীর একটি শেষ ইচ্ছার কথা।

নয়াদিল্লী, শনিবার, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭ সাল। আজ মধ্যাহ্নের কিছুক্ষণ আগে নেহরুর কাছ থেকে মাউণ্টব্যাটেনের চিঠির উত্তর এসেছে। চিঠির উত্তর বটে, কিন্তু মাউণ্টব্যাটেনের প্রত্যেকটি বক্তব্য বিবেচনা করে নেহরু যে তাঁর পক্ষের বক্তব্য এ চিঠিতে জ্ঞাপন করেছেন, তা নয়। বুঝা যায়, গতকাল রাত অনেক হয়ে যাবার পর তিনি এই উত্তর লিখেছেন। নেহরু তাঁর চিঠিতে এই ত্রুটি স্বীকার করেছেন যে, তিনি তাঁর মনের একই কথা অনেক সময় বড় বেশি ক'রে এবং বার বার বলে থাকেন এবং কখনো বা ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলতেই পারেন না। নেহরুর এই উক্তি সত্ত্বেও তাঁর চিঠির তাৎপর্য আমরা খুবই স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারলাম। বুঝলাম, কাশ্মীর সম্বন্ধে এখনো তাঁর মন উত্তেজিত হয়ে রয়েছে। কাশ্মীর আপাততঃ যে সমস্যা নিয়ে তাঁর সম্মুখে দেখা দিয়েছে, সেই সমস্যাকে প্রতিরোধ করার কথাই তিনি চিন্তা করছেন। যাই হোক, এটাও বুঝা গেল যে, লিয়াকৎ আলির কাছ থেকে ভারতীয় অভিযোগ-পত্রের উত্তরের জন্য আর অপেক্ষায় না থেকে তিনি কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে রাষ্ট্রপুঞ্জে আবেদন করবার জন্যই প্রস্তুত হয়েছেন।

লিয়াকৎ আলির উত্তর আসবার আগেই রাষ্ট্রপুঞ্জে আবেদন করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, এটা অবশ্য খুবই দুঃখের বিষয়। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেনের মতে, আর এক দিক দিয়ে এটা ভালই হলো। কাশ্মীরের ব্যাপার নিয়ে বিবেচনা করতে গিয়ে এখন যত বেশী সময় পার ক'রে দেওয়া যায় ততই ভাল। বড়দিনের এই সপ্তাহে কাশ্মীরকে কেন্দ্র ক'রে দুই পক্ষের মনের ভাব যে রকম উত্তেজিত হয়েছে, তা'তে এখন অন্যদিকে মন দেবার দরকার হলে সমস্যা আরও খারাপ পরিণাম থেকে আপাততঃ রক্ষা পেয়ে যাবে। এখন বৃহত্তর বিপর্যয় ঠেকিয়ে রাখার একমাত্র পন্থা হলো, কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টাকেই ঠেকিয়ে রাখা। কাজেই আলোচনায় ও বিবেচনায় এখন কিছুটা সময় কাটিয়ে দেবার সুযোগ যদি পাওয়া যায়, তবে ভবিষ্যতের পক্ষে সেটা কল্যাণকর হবে বলেই মাউণ্টব্যাটেন মনে করছেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে মাউণ্টব্যাটেনও একটা কাজ করেছেন। তিনি এটলীকে টেলিগ্রাম করেছেন। টেলিগ্রাম করার আগে তিনি অবশ্য নেহরুকে জানিয়েছেন এবং

নেহরুর সম্মতিও আদায় করে নিয়েছেন। এটলীর কাছে মাউণ্টব্যাটেন এই অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন যে, এটলী যেন দুই ডোমিনিয়নের দুই প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য অবিলম্বে বিমানযোগে চলে আসেন।

মাউণ্টব্যাটেন অবশ্য খুব বেশি ভরসা করতে পারছেন না যে, তাঁর অনুরোধে সাড়া দিয়ে এটলী এ সময় এখানে আসতে সম্মত হবেন। এই সংকটে যথা-কর্তব্য পালনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মাউণ্টব্যাটেন যতটা সচেতন হয়েছেন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে অন্ততঃ ততটুকু সচেতন করার জন্যই এই অনুরোধ করবার প্রয়োজন ছিল। মাউণ্ট-ব্যাটেন নেহরুকেও এই পরামর্শ দিয়েছেন যে, নেহরু যেন নিজেও ভিন্নভাবে এটলীর সঙ্গে পত্রযোগে আলোচনা করেন।

মাউণ্টব্যাটেন আজ গোয়ালিয়র চলে গেলেন।

নয়াদিল্লী, রবিবার, ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল। আজকের সারা দিনটা বর্মার স্বাধীনতা অনুষ্ঠানের নানা উৎসবের মধ্যে কাটিয়ে দিতে হয়েছে। বর্মী রাষ্ট্রদূতের ভবনে পতাকা উত্তোলনের অনুষ্ঠানে গবর্ণর-জেনারেল মাউণ্টব্যাটেন ও তাঁর সমস্ত ষ্টাফ উপস্থিত ছিলেন। মাউণ্টব্যাটেন ও বর্মী রাষ্ট্রদূতের দুটি বক্তৃতা ছাড়া অনুষ্ঠানের বাকী সময় বর্মী সঙ্গীতে ও নৃত্যেই অতিবাহিত হলো। তারপর দরবার কক্ষের অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে মাউণ্টব্যাটেন বর্মার ঐতিহাসিক সিংহাসন (ভারতে আনীত রাজা থিব'র সিংহাসন) বর্মী রাষ্ট্রদূতকে প্রত্যর্পণ করলেন।

বর্মার সেই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের কথা মনে পড়ছে। আউং সান ও তাঁর মন্ত্রিসভার প্রায় সকলকেই গত জুলাই মাসে হত্যা করায় নতুন বর্মা রাষ্ট্রকে তাঁদের রাজনৈতিক জীবনের আরম্ভেই সাংঘাতিক এক আঘাত পেতে হয়েছিল। এ আঘাত সদ্যঃপ্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্রকে বিনষ্ট করে দেবার মতই আঘাত। কিন্তু বর্মার জাতীয়তাবাদী শক্তি এ আঘাতে পরাভূত ও বিচলিত হয়নি এবং বর্মা তার আত্মশক্তিতেও বিশ্বাস হারায়নি। দেশের অভ্যন্তরে এরকম বিপদের আক্রমণ সত্ত্বেও বর্মা বৃটিশ কমনওয়েলথের সঙ্গে সম্পর্কের শেষ সূত্র ছিন্ন করবার দাবীই জানিয়ে এসেছে। বর্মা রিপাব্লিকের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে।

'রিপাব্লিক' হবার জন্য বর্মার মনে এ আগ্রহ এত প্রবলভাবে দেখা দিল কেন? আমার ধারণা, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রস্তাবেই উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে বর্মা প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছে। ১৯৪৬ সালে ভারতের কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণ করে-ছিলেন যে, ভারতকে প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করাই কংগ্রেসের লক্ষ্য এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই ভারত প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হবে। বর্মী নেতারা কল্পনা করতেও পারেন নি যে, বৃটিশবিরোধী সংগ্রামই যে কংগ্রেসের চিরকালের ইতিহাস, সে কংগ্রেস সংগ্রামে জয়লাভ করার প্রথম মুহূর্তে স্বেচ্ছায় ডোমিনিয়ন স্টেটাস্ স্বীকার করে নেবেন। দিল্লীতে বর্মী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে আমি বুঝেছি যে, এ বিষয়ে তাঁদের মনে একটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কমন-ওয়েলথেরই গঠন পরিবর্তিত হতে চলেছে এবং কমনওয়েলথের সদস্য হওয়া সম্পর্কে যে রীতি-নীতি এতদিন প্রচলিত ছিল, সেগুলিও উদারতর হতে চলেছে। কমন-ওয়েলথের ঐতিহ্যগত রূপ বদলে যাচ্ছে, এদিকে ভারতও ডোমিনয়ন স্টেটাস্ গ্রহণ করেছেন—বর্মী নেতারা এখন তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা চিন্তা করে মনে মনে যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেছেন।

নয়াদিল্লী, সোমবার, ৫ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল। মাউণ্টব্যাটেনের মনের ইচ্ছাটা কি? কাশ্মীর সম্পর্কে কি করতে চাইছেন মাউণ্টব্যাটেন? সংবাদপত্রে খুব জোর জল্পনা ও গবেষণা আরম্ভ হয়ে গেছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট রাষ্ট্রপুঞ্জে আবেদন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং কিছুদিন আগে অনেকেই জানতে পেরেছেন যে, মাউণ্টব্যাটেনই এই ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে কিছুদিন থেকে পরামর্শ দিয়ে আসছেন। সুতরাং মাউণ্টব্যাটেনের উদ্দেশ্য কি?

ডেলি হেরল্ড একটি কাহিনী সৃষ্টি করেছেন, এ কাহিনী ডেলি হেরল্ডের দিল্লী সংবাদদাতা এণ্ড্রু মেলরের রচিত কাহিনী নয়। এ কাহিনী লণ্ডনেই উদ্ভূত। ডেলি হেরল্ড লিখেছেন, মাউণ্ট-ব্যাটেন এখন কাশ্মীর বিভক্ত করার জন্য জেদ ধরেছেন এবং এই বিষয় নিয়ে মাউণ্টব্যাটেন ও নেহরুর মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। মাউণ্টব্যাটেন ভারত গবর্ণমেণ্টকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ভারতে ও পাকিস্থানে যদি সঙ্ঘর্ষ বাধে, তবে তিনি পদত্যাগ করবেন।

ডেলি হেরল্ডের এই কাহিনী পাঠ করার পর আমি নেহরুর প্রাইভেট সেক্রেটারী আয়েঙ্গারের সঙ্গে দেখা করলাম। নেহরু জানিয়েছিলেন যে, তিনি অবিলম্বে প্রতিবাদ করে একটি বিবৃতি দেবেন। নেহরু মন্তব্য করলেন, এ কাহিনী 'ষোল-আনা কল্পনার চেয়েও বেশি কাল্পনিক।'

আর একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে আমেরিকান পত্রিকায়। সংবাদের সূত্র হলো লণ্ডন। এই সংবাদে বলা হয়েছে যে, মাউণ্টব্যাটেন 'কমনওয়েলথেরই প্রকৃতি ও গঠন বদলে দেবার জন্য গোপনে একটা পরিকল্পনা রচনা করছেন, যার ফলে ভারত ইউনিয়ন ডোমিনিয়ন না হয়েও কমনওয়েলথে থাকতে পারবেন।' এটা সত্য যে, এই ধরণের কোন পরিবর্তন সম্ভব-পর কি না, সে প্রশ্ন মাউণ্টব্যাটেনের চিন্তায় দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমেরিকান সংবাদপত্রে মাউণ্টব্যাটেনকে যেভাবে 'গোপন পরিকল্পনার রচয়িতা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সেটা আদৌ সত্য নয়। এর মধ্যে 'গোপনতার' কিছু নেই এবং মাউণ্টব্যাটেন 'রচয়িতার' ভূমিকা গ্রহণ করেননি।

দিল্লী থেকে যদি এই সব জল্পনা-মূলক সংবাদ প্রচারিত হতো, তবে আমার পক্ষে সে সংবাদ খণ্ডন করার চেষ্টাও সম্ভবপর হতো। কিন্তু জল্পনা করছেন বিদেশের সংবাদপত্রগুলি। আমি এখানে বসে কি করে এই বাস্তব সত্যটুকু তাঁদের বোধগম্য করে তুলতে পারি যে, মাউণ্টব্যাটেন ভারতের নিয়মতান্ত্রিক গবর্ণর-জেনারেল ছাড়া আর কিছুই নন? কি করে এঁদের বুঝাই যে, এখানে পরামর্শ দেওয়া ছাড়া আর কিছু করবার 'ক্ষমতা' মাউণ্টব্যাটেনের নেই?

ভারত গবর্ণমেণ্টই-বা এ ধরণের বৈদেশিক কাগজের জল্পনা-কল্পনা প্রতিরোধে কি করতে পারেন? তাঁরা নিজেরাই ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির জল্পনায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে রয়েছেন। নেহরু ইতোমধ্যেই একটি ঘটনায় খুবই বিড়ম্বিত হয়েছেন। কাশ্মীর সম্পর্কে ভারত রাষ্ট্রপুঞ্জে আবেদন করবেন, এ সিদ্ধান্ত গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যে ঘোষণা করবার আগেই ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়ে গেছে। স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, মন্ত্রিসভার ভেতর থেকেই এই সংবাদ বের হয়ে না পড়লে অন্য কোন সূত্রে এ সংবাদ কখনই প্রকাশিত হবার উপায় ছিল না।

আজ সন্ধ্যায় জানতে পেলাম, ভারতের প্রতিনিধি হয়ে কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতীয় বক্তব্য রাষ্ট্রপুঞ্জে উপস্থাপিত করার জন্য গোপালস্বামী আয়েঙ্গার লেক সাকসেসে যাচ্ছেন। সঙ্গে যাচ্ছেন কাশ্মীর নেতা শেখ আবদুল্লা ও কর্ণেল কার্ডল।

নয়াদিল্লী, বুধবার, ৭ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল। প্যাটেলের সম্মতি নিয়েই মাউণ্টব্যাটেন আজ দেশীয় রাজন্যদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। গবর্ণমেণ্ট হাউসেই একটি সভায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দুটি আসর করা হয়েছিল। একটি আসরে সমবেত হয়েছিলেন বড় বড় রাজ্যের রাজন্যেরা, আর একটি আসরে ছোট ছোট রাজ্যের নৃপতিবর্গ। দেশীয় রাজন্যেরা খুবই উৎসাহহীন হয়ে পড়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, নতুন ও স্বাধীন ভারতে তাঁদের শুধু ক্ষমতাহীন নয়, একেবারে কর্মহীনও করে দেওয়া হচ্ছে। এই শোচনীয় উৎসাহহীনতার মূল অবশ্য তাঁদের নিজেদেরই মনের ভেতর রয়েছে। নতুন ভারতের এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে যোগ্য কাজ খুঁজে নেবার আগ্রহ তাঁদের আচরণে একেবারেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। আজকের সম্মেলনের উদ্দেশ্য হলো, রাজন্যদের সঙ্গে আলোচনা করে মাউণ্টব্যাটেন এমন একটা ব্যবস্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা করবেন, যার ফলে রাজন্যেরা একটা উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র লাভ করতে পারবেন। মাউণ্টব্যাটেন প্রস্তাব করলেন, রাজন্যদেরই সুবিধার জন্য এখন একটা 'প্রিভিলেজ কমিটি' গঠন করবার প্রয়োজন হয়েছে, যার দ্বারা তাঁদের ভবিষ্যদ্বংশীয়দের কতগুলি সুবিধার অধিকার ও ব্যবস্থা উদ্ভাবিত, নির্ণীত ও পরিচালিত হতে পারবে।

রাজন্যেরা সকলেই চুপ করে মাউণ্টব্যাটেনের বক্তব্য শুনছিলেন। একমাত্র আলোয়ার হঠাৎ ঝগড়াটে স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—'দরকার নেই। আমরা যদি নরকে থাকতে ইচ্ছা করি, তবে আমাদের স্বর্গে থাকতে বাধ্য করা উচিত নয়।'

মাউণ্টব্যাটেন তবুও ধৈর্য ধরে রাজন্যদের বুঝিয়ে চললেন। প্রিভিলেজ কমিটি এবং রাজন্যদের যথাযোগ্য কর্মক্ষেত্রের প্রসঙ্গ আলোচনা করে মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, ভারতের রাষ্ট্রদূতের পদ, কূটনীতিক দৌত্যকার্য এবং ভারতের বৈদেশিক দূতাবাসের সার্ভিস একটা বিরাট কর্মক্ষেত্ররূপে পড়ে রয়েছে, যেখানে রাজন্যেরা এবং রাজন্যদের আত্মীয়স্বজন ও সন্তানেরা যোগ্য কর্তব্য গ্রহণ করতে পারেন। এ বিষয়ে তাঁদের যেসব সুবিধা দেবার কথা চিন্তা করা হচ্ছে, সেটা রাজন্যদেরও চিন্তা করে দেখবার জন্য মাউণ্টব্যাটেন অনুরোধ করলেন।

আলোয়ার আবার বাধা দিয়ে মন্তব্য করলেন—এটা এমন কি সুবিধা বা অনুগ্রহের প্রস্তাব? কূটনীতিক সার্ভিসের পদ প্রদান করলে রাজন্যদের এমন কিছু সুবিধার অধিকার প্রদান করা হয় না। আমার প্রশ্ন, মেনন যদি দেশীয় রাজ্য দপ্তরের সেক্রেটারী হতে পারেন, তবে বিকানীর কেন সেই পদের অধিকারী হতে পারবেন না?

মাউণ্টব্যাটেন তীক্ষ্মস্বরে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন—'আমি এখানে বসে সুবিধা ও অনুগ্রহ বণ্টন করছি না। বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে একটা কাণ্ডজ্ঞান আপনাদের মনে উদ্রেক করবার চেষ্টা করছি।'

রাজন্যদের কাণ্ডজ্ঞানের একটা লক্ষণ সম্মেলনের শেষে দেখতে পেলাম। ভোপাল অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সুহৃদের মত ভি পি মেননের সঙ্গে কোলাকুলি করলেন। দৃশ্যটা অভিনব বটে। রাজন্যেরা সাধারণ মানুষকে কখনই আলিঙ্গন দান করেন না। রাজন্যদের আলিঙ্গন শুধু রাজন্যদেরই জন্য সংরক্ষিত। সেই রীতির একটা ব্যতিক্রম হতে দেখবার সৌভাগ্য আজ প্রথম লাভ করলাম।

নয়াদিল্লী, শনিবার, ১০ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল। আজ বিকালে দেশীয় রাজন্যদের কাছে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর বক্তব্য জ্ঞাপনের দ্বিতীয় পর্যায় সম্পূর্ণ করলেন। দেশীয় রাজ্যগুলির রাষ্ট্রভুক্তির অধ্যায় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু দেশীয় রাজন্যেরা বোধহয় কল্পনা করতে পারেন নি যে, এর পরে আরও আছে। প্রায় পঞ্চাশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যের নৃপতি ও প্রতিনিধিদের এই সম্মেলনে মাউণ্টব্যাটেন একটা নতুন রাজনৈতিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন। বৃহত্তর রাষ্ট্রিক অঞ্চলের শাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি সম্পূর্ণভাবে সমন্বিত হলে রাজন্যদের পক্ষে এবং দেশ ও জাতির পক্ষে কতখানি সুবিধার বিষয় হবে, মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকে এই আর এক নতুন পরিবর্তন-তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনলেন রাজন্যেরা। ইতিহাসের নজীর দেখালেন মাউণ্টব্যাটেন। জার্মাণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বহুসংখ্যক স্বতন্ত্র জনপদ নেপোলিয়নের রাইন রাষ্ট্রমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। রাষ্ট্রতত্ত্ব এবং ইতিহাস সম্বন্ধে রাজন্যদের যেটুকু জ্ঞান ছিল, তাই দিয়ে মাউণ্টব্যাটেনের যুক্তির বিরুদ্ধে তর্ক করতে রাজন্যদের অবশ্য খুবই বেগ পেতে হলো। যাই হোক, সম্মেলনের শেষে রাজন্যদের মুখের চেহারা থেকে শুধু এইটুকুই বুঝতে পারা যাচ্ছিল যে, মাউণ্টব্যাটেনের এই নতুন প্রস্তাবে তাঁদের চোখের দৃষ্টি যেন ধাঁধিয়ে গেছে। যেন খুব কড়া আলোকের দিকে তাঁরা এতক্ষণ তাকিয়েছিলেন এবং সহ্য করতে না পেরে চোখ মিটমিট করছে। তবুও, অন্ততঃ কয়েকজনকে দেখে বুঝলাম যে, তাঁদের যথোচিত দৃষ্টিশক্তি আছে এবং এ প্রস্তাবের সারবত্তা তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

নয়াদিল্লী, সোমবার, ১২ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। গান্ধী অনশন ব্রত গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেছেন। 'আমরণ অনশন', তাঁর দাবী যদি পূর্ণ না হয়, তবে অনশনও তিনি ভঙ্গ করবেন না এবং এর পরিণাম হলো গান্ধীর মৃত্যু। জিমখানা ক্লাবে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের একটা খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠান ছিল। এই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে এসেই এই সংবাদ প্রথম শুনতে পেলাম। আজকেরই প্রার্থনা-সভায় গান্ধী তাঁর এই সঙ্কল্পের কথা ঘোষণা করে দিয়েছেন। এর আগের ক'দিনে গান্ধীজীর ভাষণে এরকম কোন সংকল্পের আভাস অথবা ইঙ্গিতও পাওয়া যায় নি। তাই এ সংবাদ অত্যন্ত আকস্মিক একটা আঘাতের মত আমাদের সকলের মনের ওপর এসে লাগলো। আমি বিস্মিত হয়েছি সকলের চেয়ে বেশি। কারণ, ঠিক আজই সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে মাউণ্টব্যাটেনের পাঠকক্ষের পাশ দিয়ে যাবার সময় জানালার দিকে চোখ ফেরাতেই দেখতে পেয়েছিলাম, মাউণ্টব্যাটেন ও গান্ধী বসে রয়েছেন। আমি তখন এইটুকু মাত্র শুনেছিলাম যে, প্রায় হঠাৎ, অর্থাৎ অল্পক্ষণ আগে খবর দিয়ে গান্ধীকে গবর্ণমেণ্ট হাউসে আনিয়েছেন মাউণ্টব্যাটেন; এ সাক্ষাতের যে বিশেষ কোন তাৎপর্য থাকতে পারে, এ ধারণা আমার মনে তখন একেবারেই দেখা দেয় নি।

প্রার্থনা-সভা সমাপ্ত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধী মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। প্রার্থনা সভায় গান্ধী বলেছেন যে,—"এই অনশন ব্রত আমি তখনই ভঙ্গ করবো যখন দেখবো যে, সকল সম্প্রদায়ের মন থেকে বিদ্বেষ দূরী-

ভূত হয়ে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বাইরের কোন শাসনের বা ভয়ের চাপে নয়, সকলের মনের ভেতর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যখন এই সৌহার্দ্যের ভাব একটা কর্তব্যবোধের মত জাগ্রত হয়েছে দেখতে পাব, তখনই আমি সন্তুষ্ট হতে পারবো। অন্য কারও পরামর্শে নয়, একমাত্র ঈশ্বরকেই আমার একমাত্র ও পরম উপদেষ্টা বিবেচনা ক'রে আমি এই ব্রত গ্রহণের সঙ্কল্প করেছি।"

গান্ধী ঠিকই বলেছেন। আজ তাঁর মৌনব্রতের দিন। কারও সঙ্গে তিনি কথা বলেন নি, তাই নেহরু এবং প্যাটেল, দু'জনের কেউই আজ গান্ধীর সঙ্গে কোন বিষয়ে আলোচনা করবার জন্যও আসেন নি। ফলে, গান্ধীর এই সঙ্কল্পের কথা নেহরু কিংবা প্যাটেল আগে থেকে জানবার সুযোগ পান নি।

মাউণ্টব্যাটেনের কাছে গান্ধী জানালেন যে, দিল্লীর এই বিরামহীন সাম্প্রদায়িক অশান্তির স্বরূপ দেখে তাঁর মন গভীর বেদনায় ডুবে রয়েছে। নিজেকে তিনি অত্যন্ত অসুখী বোধ করছেন। গান্ধীর ধারণা, সমাজের সকল স্তরে এই বিদ্বেষ এখন ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। এখন তাঁর নিজের বিবেকসম্মত পন্থাতেই প্রায়শ্চিত্ত ক'রে এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিবিধানের চেষ্টা করা ছাড়া তাঁর আর কোন পথ নাই।

আলোচনার সময় গান্ধী হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবেই মাউণ্টব্যাটেনকে জিজ্ঞাসা করলেন—পাকিস্থানের প্রাপ্য পঞ্চান্ন কোটি টাকা প্রদান বন্ধ ক'রে দেবার যে সিদ্ধান্ত গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেছেন, সে সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত?

মাউণ্টব্যাটেন কোন দ্বিধা না ক'রে তাঁর অভিমত সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশ করলেন। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, এ সিদ্ধান্তে শুধু যে মর্যাদাসম্মত রাজনীতিক আচরণের অভাবই প্রমাণিত হয়েছে তা নয়, রাজনীতিক বুদ্ধির অভাবও প্রমাণিত হয়েছে।

গান্ধী মাউণ্টব্যাটেনকে বললেন, তিনি এ বিষয়ে নেহরু এবং প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা করবেন। একথাও গান্ধী জানালেন যে, তিনি নেহরু ও প্যাটেলকে এটা জানিয়ে দিতে অবশ্য ভুলবেন না যে, এ প্রসঙ্গ তিনিই মাউণ্টব্যাটেনের কাছে এখানে উত্থাপন করেছিলেন, মাউণ্টব্যাটেন উত্থাপন করেন নি।

আলোচনার পর মাউণ্টব্যাটেন বুঝলেন যে, গান্ধীকে এ সঙ্কল্প থেকে নিবৃত্ত করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হবে না। গান্ধীর বিবেকসম্মত সিদ্ধান্ত বদলে দেবার ক্ষমতা মাউণ্টব্যাটেনের নেই। শেষ পর্যন্ত মাউণ্টব্যাটেন আর কোন দ্বিধা ও কুণ্ঠার ভাব না দেখিয়ে গান্ধীর এই সৎসাহসপূর্ণ সঙ্কল্পের প্রতি তাঁর সাগ্রহ সমর্থন জ্ঞাপন করলেন। মাউণ্টব্যাটেন এই আশা প্রকাশ করলেন যে, গান্ধীর সঙ্কল্পিত এই ব্রত জনসাধারণের মনে সেই শুভবুদ্ধি ও সৎসাহস অবশ্যই জাগ্রত করবে, যেটা আজকের দিনের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।

মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকে এই শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির প্রমাণ পেয়ে গান্ধী চলে গেলেন। আগামীকাল মধ্যাহ্নের পূর্বেই সাড়ে এগারোটার সময় গান্ধীর অনশন আরম্ভ হবে। আরম্ভ হবে এক মহৎ সঙ্কল্পের অনুষ্ঠান।

জিমখানা ক্লাবের 'পার্টির' অনুষ্ঠান খুব তাড়াতাড়ি সেরে দিয়ে সাংবাদিকেরা বের হয়ে গেলেন। প্রত্যেককে এখন রিপোর্ট সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে উঠতে হবে। গান্ধীর এই অনশনের তাৎপর্য কি এবং এর পরিণামই বা কি হবে? প্রত্যেক সংবাদদাতার মনে এখন এই জিজ্ঞাসাই প্রবল হয়ে উঠেছে।

সাংবাদিকদের ধারণার মোটামুটি পরিচয় আপাততঃ যেটুকু পাওয়া গেল, তাতে বুঝলাম যে, গান্ধীর অনশনের সঙ্কল্প অত্যন্ত সময়োচিত হয়েছে বলে তাঁরা মনে করছেন। কলকাতাতে গান্ধী জনসাধারণের মনের ভাব যতটা উন্নত করে আসতে পেরেছেন, দিল্লীতেও সেই মানসিক সুস্থতা ও শুভবুদ্ধি জাগ্রত করতে হলে এ ধরণের আমরণ অনশন ব্রতের অনুষ্ঠান ছাড়া আর কোন কম কঠোর ব্রতের দ্বারা করা সম্ভবপর হবে না। শিখদের মনোভাবের ওপরেই ভবিষ্যতের অনেকখানি নির্ভর করছে। হিন্দু এবং মুসলমানদের মনের ওপর গান্ধীর আবেদন এ পর্যন্ত যে পরিমাণে ও যতটা সহজে সফলতা লাভ করেছে, শিখদের মনের ওপর ততটা হয়নি।

গান্ধীর অনশনের প্রসঙ্গে আর একটা বিষয়ের আলোচনাও খুব বেশি করে আরম্ভ হয়ে গেছে। গান্ধীর সঙ্গে প্যাটেলের সম্পর্ক কি ক্ষুণ্ণ হয়েছে? নেহরু এবং প্যাটেলের মধ্যেও কি মনের দিক দিয়ে এখন ভাল সম্পর্ক নেই? পাকিস্থানের প্রাপ্য পঞ্চান্ন কোটি টাকা প্রদান বন্ধ করে দেবার প্রস্তাব গান্ধী সমর্থন করতে পারছেন না। এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গান্ধী যে প্রবলভাবেই বাধা দেবেন, এটা স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছে। এর ফলে গবর্ণমেণ্টের মুখ্যেই দুই অভিমতের দ্বন্দ্বও খুব সম্ভব এমনভাবে দেখা দেবে যে, মন্ত্রিসভার মধ্যেই দুরূহ এক সঙ্কটের সূচনা হবে। গান্ধী এ সবই অনুমান করতে পারেন। তাই মনে হয়, তিনি জেনে-শুনেই প্যাটেলের সব বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, নেহরু এবং প্যাটেলের মধ্যে ব্যবধান কিছুদিন থেকে ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ব্যবধান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুই নেতার পিছনে তাঁদের নিজ নিজ সমর্থকদের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ভারতের রাজনীতির আকাশে নেহরু এবং প্যাটেলই হলেন দুই বৃহৎ ও প্রধান নক্ষত্র। এ'দের বিরোধে রাজনীতিক আকাশও দুই ভাগে বিভক্ত হতে চলেছে, কারণ সমগ্র রাজনৈতিক কর্মিসমাজই বিভক্ত হয়ে দুই নেতার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী শিবির সৃষ্টির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠছেন। ভারত রাষ্ট্রের দুই মহান্ ব্যক্তির এই অনৈক্য একমাত্র গান্ধীই দূরীভূত করতে সক্ষম। গান্ধীর ইচ্ছাও তাই। গান্ধী এই বাস্তব সত্য সম্বন্ধেও যথেষ্ট সচেতন আছেন যে, যদি তিনি নেহরু ও প্যাটেলের বিরোধ দূরীভূত করে উভয়কে সৌহার্দ্যপূর্ণ মতৈক্যে যুক্ত করতে না পারেন, তবে শুধু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানই নয়, ভারত রাষ্ট্রই ভয়ানকভাবে বিপন্ন হবে।

বিকানীর, বুধবার, ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল। গান্ধীর অনশন আরম্ভ হয়ে গেছে। মাউণ্টব্যাটেনের বিকানীর যাত্রা স্থগিত রাখা সম্ভবপর হয়নি। দিল্লীতে অনশনরত গান্ধীকে রেখে মাউণ্টব্যাটেনকে পূর্ব-ব্যবস্থা অনুযায়ী বিকানীর আসতে হয়েছে। গবর্ণর জেনারেলকে এই সময় সরকারীভাবে বিকানীর পরিদর্শনে যেতে হবে, এ সিদ্ধান্ত অনেকদিন আগেই গ্রহণ করা হয়েছিল এবং পরিদর্শনের তারিখও নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, বিকানীরে এসে পূর্ব-নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে একটা পরিবর্তন করতে হলো। গান্ধীর অনশন ব্রতের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য ভোজসভায় অনুষ্ঠান বাদ দেওয়া হলো।

গান্ধীর অনশনব্রতের কি বিপুল প্রভাব ও শক্তি আছে, তার পরিচয় পেতে হলে গান্ধীর উপবাসের সময় তাঁর

সান্নিধ্যে থেকে চারদিকের ঘটনার আলোড়ন লক্ষ্য করতে হয়। জনসাধারণের মন অনুপ্রাণিত করবার এক দুর্লভ শিল্পের শিল্পী হলেন গান্ধী। গান্ধীর সমগ্র জীবনই হলো গণচিত্ত উদ্বোধিত করবার এক বিস্ময়কর প্রয়াসের সার্থক নিদর্শন। তিনি এমন এক একটি সরল ও সাধারণ বাণী এবং আচরণের দ্বারা জনমনে আবেদন সৃষ্টির প্রয়াস করেন, যার অর্থ সর্বসাধারণও অতি সহজেই উপলব্ধি করতে পারে। এ প্রতিভায় গান্ধীর সমকক্ষ আর কেউ নেই। জনমন প্রভাবিত করবার শিল্পে গান্ধী-রীতির সাফল্য অতুলনীয়। গণচিত্ত অনুপ্রাণিত করবার শিল্পে গান্ধীর মত শক্তিশালী শিল্পীর কোন দ্বিতীয় উদাহরণ সর্বযুগের ইতিহাসেও খুঁজে পাওয়া যায় না।

দিল্লী থেকে আমাদের বিকানীর রওনা হয়ে যাবার সামান্য কিছুক্ষণ আগে প্যাটেল এবং নেহরু মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁরা একসঙ্গে আসেননি। দুই নেতা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এলেন এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবেই মাউণ্ট-ব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করে চলে গেলেন। দুই নেতাই গান্ধীর অনশন সম্পর্কে তাঁদের মনের ভাব মাউণ্টব্যাটেনের কাছে ব্যক্ত করলেন। কিন্তু দুই নেতার মনোভাবে কত পার্থক্য। চিন্তা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে দুই নেতার মধ্যে কতখানি ব্যবধান দেখা দিয়েছে, তার পরিচয় সুস্পষ্ট ভাবেই পাওয়া গেল গান্ধীর অনশন সম্বন্ধে তাঁদের দুই অভিমতের মধ্যে।

প্যাটেল অভিযোগ করলেন—এই সময়ে অনশন করা গান্ধীর উচিত হয়নি। গান্ধী অত্যন্ত শোচনীয় ও ভুল সময়ে অনশন আরম্ভ করেছেন। এই অনশনের দ্বারা গান্ধী যে পরিবর্তন ঘটানো যাবে ব'লে আশা করছেন, কার্যতঃ ঠিক তার বিপরীত ফল হবে।

নেহরু খুশি হয়েছেন গান্ধীর এই উদ্যম তিনি সপ্রশংসভাবে সমর্থন করলেন। মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনায় নেহরু তাঁর মনের ভাব অকুণ্ঠভাবেই প্রকাশ করলেন।

বিকানীর, শুক্রবার, ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল। এই ক'টা দিন বিকানীরে নানারকম আমোদের মধ্যেই কেটে গেছে। মহারাজার শিকার-অঞ্চল গজনের ঘুরে এসেছি। কৃত্রিম মরুদ্যান দেখলাম। মরুভূমির বালু খুঁড়ে এক মাইল দীর্ঘ হ্রদ তৈরী করা হয়েছে, তা'ও দেখলাম। এ জায়গাটা হলো মহারাজার শিকার-স্বর্গ। রাজা পঞ্চম জর্জ এখানে বেলে-হাঁস শিকার করেছিলেন। দেখলাম লাল-গড় প্রাসাদ ও কার্ণি নিবাস দরবার। দেখলাম বল্লভ বাগিচা। এখানে মহারাজার একটি ছোট ক্লাবঘর আছে। জাহাজের কেবিনের মত ক্লাবঘরের গড়ন, ঘরের জানালাগুলি জাহাজ-কেবিনের গবাক্ষের আকারে তৈরী এবং জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিলেও জল দেখতে পাওয়া যায়; কারণ ক্লাবঘরটা একটি কৃত্রিম হ্রদের কিনারায় অবস্থিত। হ্রদের চারদিকে সারি সারি উইলো তরু বাতাসে চাপা-কান্নার মত শব্দ ছড়াচ্ছে। ককটেল, বিলিয়ার্ড ও নৃত্যে মাঝ রাত্রি এখানেই পার ক'রে দিয়ে লালগড় প্রাসাদে ফিরে গেলাম। সকাল হলে বিকানীরের আর এক স্থান দেখলাম। বিকানীরে ঘোড়-সওয়ার বাহিনী 'গঙ্গা রিসালা', বিখ্যাত উট-সওয়ার বাহিনী বিকানীর ক্যামেল ব্যাটারি এবং ডুঙ্গা লান্সার্স দলের কুচকাওয়াজ, দেখলাম বিকানীরের দুর্গ, নানারকম ঐতিহাসিক নিদর্শন-সামগ্রীতে পরিপূর্ণ, তার মধ্যে বহুসংখ্যক দুর্লভ সংস্কৃত পুঁথি ও উর্দু গ্রন্থ।

মধ্যাহ্ন ভোজনে যোগদানের জন্য যাবার আগে পানিক্করের সঙ্গে আলোচনা করবার সুযোগ পেলাম। পানিক্কর এখানে বিকানীরের দেওয়ানের পদে কাজ করছেন। আলোচনায় গান্ধীর অনশন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতেই পানিক্কর বললেন যে, এর ফল ভালই হবে ব'লে তিনি আশা করছেন। পানিক্করের মতে—গান্ধীর এই অনশনব্রত যে একদিক দিয়ে প্যাটেলের বিরুদ্ধেই গান্ধীর প্রতিবাদ, সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই।

পানিক্কর বললেন, তিন মাস আগে গান্ধী যখন কলকাতা হতে দিল্লীতে ফিরে এলেন, তখনই গান্ধীর সঙ্গে প্যাটেলের মতবিরোধ খুবই স্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছিল। গান্ধী তখন বলেছিলেন—"বল্লভ-ভাই, আমি চিরকালই মনে করে এসেছি যে, তুমি ও আমি অভিন্ন। কিন্তু আজ দেখছি, আমরা আর এক নই, দুই হয়ে গেছি।" বাপুর মুখে একথা শুনে প্যাটেলের দুই চোখ জলে ভরে উঠেছিল।

গান্ধী-প্যাটেল সম্পর্কের বিষয়টি পানিক্কর আরও ব্যাখ্যা ক'রে বললেন, প্যাটেল যদিও কংগ্রেস ও গবর্ণমেণ্টের সকল ব্যবস্থার প্রভুত্ব নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে রেখেছেন, কিন্তু তিনি জানেন যে গান্ধী এখনো ভারতের জনসাধারণের আসল প্রভু। প্যাটেল জানেন, তিনি ইচ্ছে অথবা চেষ্টা করলেও জনসাধারণের ওপর মহাত্মার দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত প্রভাব কোনমতেই খর্ব করতে পারবেন না। গান্ধী নেহরুকেই সাহায্য দিয়ে শক্তিশালী করবার সংকল্প নিয়ে কাজ আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। কিন্তু নেহরুকে শক্তিশালী করতে গিয়ে গান্ধী অবশ্য প্যাটেলকে ভেঙে দিতে ইচ্ছা করেন না। গান্ধী প্যাটেলকে শুধু সমর্থক ও সহকর্মী রূপেই নেহরুর পেছনে দাঁড় করিয়ে দিতে চাইছেন।

গান্ধীর রাজনৈতিক জ্ঞানের গভীরতা ও দূরদর্শিতার অনেক প্রশংসা করলেন পানিক্কর। পানিক্কর বললেন—'প্রায় বিশ বছর আগে গান্ধীর সঙ্গে আমি একবার দেখা করেছিলাম। তারপর মাত্র এই সেদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করবার ও আলোচনা করবার সুযোগ পেয়েছি। দেশীয় রাজ্যের নিয়মতন্ত্রের দ্রুত পরিবর্তন করবার জন্য গান্ধী যেভাবে তাঁর দাবী প্রচার করছেন, সেই সম্বন্ধে গান্ধীর সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে।"

পানিক্কর বললেন, তিনি গান্ধীর কাছে এই অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে, দেশীয় রাজ্যগুলির শাসনতন্ত্র পরিবর্তনে এত তাড়াতাড়ি না ক'রে একটু ধীরে-সুস্থে ব্যবস্থা করাই উচিত। প্রতিবাদ ক'রে গান্ধী বললেন—'প্রগতি-বিরোধী ইচ্ছা এবং শক্তিগুলিকে দানা বাঁধবার মত সুযোগ এবং সময় দিতে হবে, আপনি কি আমাকে তাই করতে অনুরোধ করছেন?'

পানিক্কর আমাকে বললেন, গান্ধীর এই উক্তির জবাব দেবার মত কোন যুক্তি তাঁর ছিল না, এবং তিনি কোন জবাবও দেননি। পানিক্কর বললেন—গান্ধী খাঁটি সত্যি কথাই বলেছেন।

গান্ধীর সম্পর্কে পানিক্কর তাঁর ধারণার আরও অনেক পরিচয় আমার কাছে প্রকাশ করলেন। পানিক্কর বললেন, গান্ধীর একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে—যার দ্বারা তিনি শ্রোতার মনের ভাষায় তাঁর নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারেন। প্রার্থনা-সভায় গান্ধী এমন সরল ভাষায় তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করেন যে, সে ভাষার আবেদন সোজা শ্রোতার মনের গভীরে পৌঁছে যায়। ব্যক্তিগত আলোচনা ও আলাপের সময় অবশ্য গান্ধী তাঁর প্রত্যেকটি কথা অত্যন্ত যুক্তিকঠিন মাত্রার মধ্যে রেখে প্রয়োগ করেন। গান্ধীর এক অসাধারণ তথ্য-সংগ্রহ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করলেন পানিক্কর। ভারতের সকল স্থান হতে গান্ধীর কাছে অজস্রসংখ্যক চিঠি প্রতিদিন এসে থাকে। এই চিঠিগুলিই হলো গান্ধীর তথ্য-দপ্তর। সমগ্র

জাতির সুখ-দুঃখের সমস্যার এবং ঘটনার আধুনিকতম সংবাদ গান্ধী সব চেয়ে আগে পেয়ে থাকেন।

আজই বিকালে খবর পেলাম, ভারত গবর্ণমেন্ট পাকিস্থানের প্রাপ্য পঞ্চান্ন কোটি টাকা পাকিস্থানকে দিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। পাকিস্থানের প্রতি ভারতের 'শুভেচ্ছাপূর্ণ মনোভাবের' একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত হিসাবেই গবর্ণমেন্ট পাকিস্থানকে এই টাকা দিয়ে দিতে রাজী হয়েছেন। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, গত তিন মাসের মধ্যে যত সংবাদ তিনি শুনেছেন, তার মধ্যে আজকের এই সংবাদই হলো সব চেয়ে ভাল সংবাদ। পানিক্কর অবশ্য আমার কাছে এই উদ্বেগ প্রকাশ করলেন যে, এই সিদ্ধান্তের পর প্যাটেলের মনে আবার কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে বলা যায় না।

বিকানীর, শুক্রবার, ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল। আজ বিকালে মাউণ্ট-ব্যাটেন প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল পাণিক্করের সংগে আলোচনা করেছেন। পাণিক্করকে যত বেশী ক'রে চেনবার ও বুঝবার সুযোগ পাচ্ছি, ততই তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে। তাঁর পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, চিন্তাশক্তি এবং রাজনৈতিক বুদ্ধির প্রাখর্য দেখে বিস্মিত হয়েছি। ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান অতি গভীর ও ব্যাপক এবং বর্তমানের ঘটনাবলীকে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সংগে ইতিহাসের অতীত ঘটনাবলী, শিক্ষা ও তত্ত্বের সাহায্যে বিচার করতে পারেন। ভারতের রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতি নির্ণয় করতে এবং সে নীতিকে রূপদান করতে পারেন, বর্তমান ভারতে এইরকম প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাসম্পন্ন পাঁচ-ছয় জনের একজন হলেন পাণিক্কর। আশা করা যায় যে, নতুন ভারতের রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতির সংগঠনে পাণিক্করের প্রভাবের পরিচয় একদিন পাওয়া যাবে। কিন্তু পাণিক্করের শত্রুর অভাব নেই। অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে অনেক অপবাদ রটনা ক'রে থাকেন। অনেকে বলেন, পাণিক্কর শুধু নিজেকে 'বড়' ক'রে তুলবার তালে আছেন। ব্যক্তিগত পদ, প্রাধান্য এবং উন্নতির আকাঙ্ক্ষাই তিনি মনে মনে পোষণ করছেন। কোন কাজ বিশ্বাস ক'রে পাণিক্করের ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। আমার মনে হয়, এসব হলো হিংসুক মনের অভিযোগ। বড় প্রতিভাকে এবং সে প্রতিভার মর্যাদাকে স্বীকার করতে কষ্ট হয়, এমন লোকের অভাব নেই। প্রতিভায় ও বুদ্ধিবৃত্তিতে যাঁরা দুর্বল, তাঁদের মনেই এই ধরণের প্রবল হিংসুটে ভাব দেখা যায়। প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রেই প্রতিভাবান ও যোগ্যতম কর্মীকে এই একটি অভিশাপে ভুগতে হয় যে, প্রতিভায়, যোগ্যতায় ও গুণে নিকৃষ্ট সহকর্মীর দল তাঁকে সহ্য করতে পারেন না। প্রতিভাহীন ও অযোগ্য সহকর্মীর বিদ্বেষে প্রতিভাশালী যোগ্য ব্যক্তির পদচ্যুত হবার ভয় সব সময়েই আছে।

পাণিক্কর আমাকে বললেন, মাউণ্ট-ব্যাটেনের এখন ভারত-ব্রিটিশ সম্পর্কের সমস্যা সম্বন্ধেই বেশী চিন্তা করা উচিত। মাউণ্টব্যাটেন ডোমিনিয়ন স্টেটাসের বিষয় নিয়েই এখন বেশী চিন্তা করছেন। একমাত্র ডোমিনিয়ন স্টেটাসের ভেতর দিয়েই ভারত-ব্রিটিশ সম্পর্ক ভাল-ভাবে রক্ষা করা যাবে, এইভাবে চিন্তা না ক'রে বৃহত্তর এবং প্রকৃত বিষয়টির প্রতিই বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। ভারত-ব্রিটিশ সম্পর্ক উন্নত করার জন্য কি করতে হবে এবং কি করা উচিত? এই হ'লো প্রধান ও প্রথম প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সূত্র ধ'রেই মাউণ্ট-ব্যাটেনের এখন চিন্তা করা উচিত। পাণিক্করের ইচ্ছা, ভারত থেকে যাবার আগেই মাউণ্টব্যাটেন যেন ভারত-ব্রিটিশ সম্পর্করক্ষার মূলনীতিগুলি নির্ণয় ক'রে ফেলেন।

মাউণ্টব্যাটেনও পাণিক্করকে অনুরোধ করেছেন যে, আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে নেহরু যখন লণ্ডন যাবেন, তখন পাণি-ক্করও যেন নেহরুর সংগে যান। মাউণ্টব্যাটেনের ইচ্ছা, এখন ভারতের রাষ্ট্রদূতের কাজ নিয়ে চীনে না গিয়ে পাণিক্করের পক্ষে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের উপদেষ্টা হয়েই কিছুকাল থাকা উচিত। [এই সময় চীনে চিয়াং কাইসেকের গবর্ণমেণ্ট ছিল। পাণিক্কর চিয়াং-গবর্ণমেণ্ট শাসিত চীনে নিযুক্ত ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদূত] কিন্তু পাণিক্কর এখন অন্ততঃ বছর দুই ভারতের বাইরে গিয়ে কোন কাজ নিয়ে থাকতে ইচ্ছা করছেন। ভারতের ভেতরেই কোন কার্যপদে নিযুক্ত থাকলে অভ্যন্তরীণ রাজনীতিক দ্বন্দ্বের সংগে জড়িয়ে পড়তে হবে বলে তিনি আশংকা করছেন। এই কারণে, এখন চীনে চলে যাওয়াই পাণিক্করের ইচ্ছা।

আজ বিকানীরের লালগড় প্রাসাদে ডিনারে যোগদান করার পর আমাদের বিকানীর পর্বের শেষ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলো।

নয়াদিল্লী, শনিবার, ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল। দিল্লী ফিরে এসেছি। দিল্লী পেঁৗছবার কিছুক্ষণ পরেই মাউণ্ট-ব্যাটেন সপরিবারে অনশনরত গান্ধীকে দেখবার জন্য বিড়লা ভবনে চলে গেলেন।

অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছেন গান্ধী। সপরিবারে মাউণ্টব্যাটেন গান্ধীর ঘরে প্রবেশ করতেই গান্ধী হেসে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন—'দেখা যাচ্ছে, আমার কাছে আপনাকে আনাবার উপায় হলো অনশন করা।'

গান্ধীর সংগে অল্পক্ষণ আলোচনা করলেন মাউণ্টব্যাটেন। কিভাবে এবং কি হ'লে গান্ধী অনশন ভংগ করতে পারেন, প্রধানতঃ এই বিষয়েই সংক্ষেপে আলোচনা হ'লো। গান্ধী বললেন যে, তিনি সর্ত হিসাবে সাতটি ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছেন। এই সাতটি ব্যবস্থার সবগুলিই হ'লো দিল্লী এবং সমগ্র ভারতে মুসলমানদের নিরাপত্তা এবং নাগরিক অধিকারের অক্ষুণ্ণতা রক্ষার ব্যবস্থা। এই সাতটি ব্যবস্থা সার্থক ও সফল করবার জন্য যথার্থ আন্তরিক উদ্যম আরম্ভ হয়েছে দেখতে পেলেই তিনি অনশন ভংগ করবেন, নচেৎ নয়।

নয়াদিল্লী, রবিবার, ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল। পাকিস্থানের প্রাপ্য পঞ্চান্ন কোটি টাকা দিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত হয়ে যাবার পর রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং মৌলানা আজাদের উদ্যোগে ও পরি-চালনায় একটি শান্তি-কমিটি স্থাপিত হয়েছে। অত্যন্ত তৎপরতা এবং উৎসাহের সংগে এই কমিটি কাজ আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন।

গান্ধীর অনশন আরম্ভ হবার পর একশো বাইশ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। ক্ষীণদেহ ও বৃদ্ধ মহাত্মার শরীরের ওপর অনশনের আঘাতও খুবেই ক্ষতি করে দিয়ে গেছে। বৃদ্ধের দেহের যেটুকু শক্তি ছিল, সেটুকুরও বেশির ভাগ ক্ষয় হয়ে এসেছে। কিন্তু সুসংবাদ এই যে, আজ সকালে প্রসাদ-আজাদ শান্তি কমিটি গান্ধীর কাছে এসে গান্ধীকে বুঝাতে পেরেছেন যে, দিল্লীর 'হৃদয় পরিবর্তন' হয়েছে।

অনশন ভংগ করেছেন গান্ধী। গান্ধীর অনশন যে মুসলমানদের মনে বিশ্বাস ও আস্থার ভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি করতে পেরেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এক শ্রেণীর শিখের মনের ভাব যে সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়নি, তারও প্রমাণ পাওয়া গেল। এক দল শিখ কালো পতাকা হাতে নিয়ে বিড়লা ভবনের সম্মুখ দিয়ে চীৎকার করতে করতে চলে গেল—'গান্ধীকে মরতে

দাও।' শান্তি কমিটিতে অবশ্য শিখ সমাজের প্রতিনিধিও রয়েছেন এবং তাঁরা শান্তি কমিটির কাজে যথাবিহিত সহযোগিতাও করেছেন।

আজকের সন্ধ্যার প্রার্থনা-সভায় গান্ধী তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠিয়ে দিলেন। এই ভাষণে তিনি বলেছেন যে, শান্তি কমিটির মারফং সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেই প্রতিশ্রুতির মর্যাদা যদি সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়, তবে—"আমি দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনাই করবো যে, তিনি যেন আমাকে পূর্ণ আয়ু (এক শত পঁচিশ বৎসর) দান করেন, এবং আমি যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত রাখতে পারি।"

নয়াদিল্লী, সোমবার, ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল। মার্কিণ সাংবাদিক ভিনসেণ্ট শীন একটা বিশেষ কাজে কিছুদিন হলো দিল্লীতে এসেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য হলো—'আরও বেশি ক'রে ঐতিহাসিক খবর সংগ্রহ করা।' টাইম এণ্ড লাইফের বব নেভিলও এখন দিল্লীতে থেকে সংবাদদাতার কাজ করছেন। আজ এঁদের দুজনের সঙ্গেই এক মধ্যাহ্নভোজনে মিলিত হয়ে আলোচনা করবার সুযোগ পেলাম।

একটা নতুন কিছু বলার দিকে শীনের বিশেষ ঝোঁক আছে। যেকোন ঘটনা সম্বন্ধে একটা নতুন অভিমত, তত্ত্ব ও কাহিনী উদ্ভাবন করতে তিনি অভ্যস্ত। গান্ধীর অনশন সম্বন্ধে শীন তাঁর অভিমত প্রকাশ করলেন। শীন বললেন—'দিল্লীর প্রাকৃতিক আবহাওয়া এখন বদলেছে বলেই গান্ধী অনশন ভঙ্গ করলেন। — প্রত্যহ গায়ে রোদ লাগানো গান্ধীর অভ্যাস। কিন্তু এ ক'দিন দিল্লীতে রোদ ওঠেনি, তাই গান্ধী উপোস ক'রে ঘরের মধ্যে ক'টা দিন পার ক'রে দিয়েছেন। রোদ ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধী অনশন ভঙ্গ ক'রেছেন। এই রোদ ওঠার ব্যাপারটাকেই গান্ধী ঈশ্বরের ইঙ্গিত ব'লে মনে করেছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 'অন্তরের বাণী'র সাহায্যে তিনি বুঝে ফেলেছেন যে, এইবার অনশন ভঙ্গ করতে হবে।'

শীন বললেন—'গান্ধী অবশ্য এটা সজ্ঞানে কখনই স্বীকার করতে চাইবেন না। কিন্তু এটাই হলো আসল ব্যাপার। মিস্টিক মানুষদের মন ও আচরণের সঙ্গে আবহাওয়া-তত্ত্বের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। গান্ধীর অনশন ভঙ্গের কয়েকদিন আগেই আমি এডগার স্নো'কে বলেছিলাম যে, শেষটায় এইরকমই ব্যাপার হবে।'

শীন এবং নেভিল, দু'জনেই বললেন যে, গান্ধীর অনশন সত্যিই একটা অলৌকিক ব্যাপার এবং এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে 'ধর্মের' একটা প্রচণ্ড শক্তি আছে। রুজভেল্টও কিভাবে রাজনীতির মধ্যে ধর্মগত ব্যাপার ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন, সে সম্বন্ধে নেভিলের কাছ থেকে অনেক কথা শুনলাম।

শীন ও নেভিল, দুই মার্কিণ সাংবাদিক সম্প্রতি আরও কয়েকটি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হবার সুযোগ পেয়েছেন, যার ফলে তাঁরা দুজনেই নেহরুর সম্বন্ধেও একটা ধারণা লাভ করেছেন। তাঁদের ধারণা হয়েছে যে, বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে নেহরুই হলেন সব চেয়ে সহজ ও সরল স্বভাবের মানুষ, যাঁর আচরণে কোন গুরুগম্ভীর কাঠিন্যের ভাব দেখা যায় না। তাঁর সঙ্গে ঘরোয়াভাবে মেশা যায়, এবং ঘরোয়াভাবে তাঁকে দেখা যায়। নেভিল তাঁর স্বচক্ষে দেখা একটি ঘটনার কথা বললেন। গান্ধীর অনশনের সময় বিড়লা ভবনের সম্মুখে রাস্তার ওপর একটা লোক শুয়ে পড়ে রাস্তার লোক চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিল। এই ব্যক্তি বলে যে, সে হলো 'ভগবান কৃষ্ণের প্রেরিত', এবং কৃষ্ণের আদেশ জানিয়ে দেবার জন্যই সে এখানে এসেছে। এই সময় নেহরু উপস্থিত হলেন এবং লোকটাকে পথ থেকে সরে যাবার জন্য কিছুক্ষণ বুঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বৃথা, লোকটা পথের ওপর শুয়েই রইল। নেহরু তৎক্ষণাৎ লোকটার দু'পা ধরে হিড়হিড় ক'রে টেনে পথের এক পাশে সরিয়ে দিলেন। পর মুহূর্তে হাতের ধুলো ঝেড়ে ফেলে নেহরু স্বচ্ছন্দে সোজা চলে গেলেন, যেন কোন ব্যাপারই হয়নি।

শীন বললেন যে, তিনি নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর ভবনে গিয়েছিলেন। গল্প করতে করতে নেহরু শীনকে একটি চীনা অঙ্কিত-চিত্র দেখাবার জন্য তাঁর খাবার ঘরের ভেতরে নিয়ে গেলেন। ঘরে আলো ছিল না। সুইচ খুঁজবার জন্য দেয়াল হাতড়িয়ে অগ্রসর হতেই নেহরু হঠাৎ একটা হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়েই সামলে নিলেন। নেহরু বললেন—'মেজের ওপর কে যেন ঘুমিয়ে রয়েছে।' তার পরেই আলো জ্বাললেন নেহরু এবং এই ঘরের ভেতর যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ নেহরু গলার স্বর চেপে ফিস্‌ফিস্ ক'রে আমার সঙ্গে কথা বললেন। বুঝলাম, মেজের ওপর ঘুমন্ত ভৃত্যটির ঘুম যেন ভেঙে না যায়, প্রধানমন্ত্রী তাই এত সাবধানে ও চাপা-স্বরে কথা বলছেন।

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ২০শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল। এই অনশনে গান্ধী যেন তাঁর প্রাণ অগ্নিশুদ্ধ করে আবার উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর শরীর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে। ব্রতী গান্ধী এক কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। এ ঘটনায় চারদিকে বেশ একটা আনন্দের সাড়াই জেগে উঠেছিল। সে আনন্দ আজ হঠাৎ ক্ষুণ্ণ হয়ে গেল একটি ঘটনায়।

গান্ধীর প্রার্থনা-সভায় আজ একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। অনশনের পর গান্ধী আজ এই প্রথম প্রার্থনা-সভায় উপস্থিত হয়েছেন। এ বিস্ফোরণে সভার লোকজনের কারও প্রাণহানি হয়নি, কারণ নিকটের একটা প্রাচীরের গায়ের ওপর দিয়েই বোমার আঘাত পার হয়ে গেছে। বিস্ফোরণে শুধু প্রাচীরের সামান্য ক্ষতি হয়েছে। কেহ জখম হয়নি, কেউ আতঙ্কিতও হয়নি এবং বিস্ফোরণের শব্দ শুনেও গান্ধী স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে ও অবিচলিতভাবে তাঁর ভাষণ শুনিয়ে চললেন। একটা যে খারাপ ব্যাপার ঘটে গেল, এরকম কোন ধারণাই গান্ধীর মনে হয়নি এবং তাঁর আচরণেও এরকম কোন চিন্তার বিন্দুমাত্র প্রমাণ পাওয়া গেল না।

ঘটনার সংবাদ শুনে লেডী মাউণ্টব্যাটেন তৎক্ষণাৎ গিয়ে গান্ধীর সঙ্গে দেখা করলেন। লেডী মাউণ্টব্যাটেনও দেখে বুঝলেন যে, গান্ধী এ ঘটনাকে একেবারে গ্রাহ্যই করেননি। সম্পূর্ণ শান্ত ও নির্বিকার গান্ধী বসে রয়েছেন। লেডী মাউণ্টব্যাটেনের প্রশ্নের পর গান্ধী বললেন, যে, নিকটে কোথাও নিশ্চয় সৈনিকদের যুদ্ধশিক্ষার মহড়া চলছে। ঘটনার প্রকৃত সংবাদ শোনার পর গান্ধী বললেন—আমার ধারণা হয়েছিল, সৈনিকদের এই মহড়াতে গোলাগুলী ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এ শব্দ তারই বিস্ফোরণের শব্দ।

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল। এর মধ্যে একবার আগ্রা

ঘুরে এসেছি, সঙ্গে ছিলেন নিউ ষ্টেটসম্যান এণ্ড নেশন পত্রিকার সম্পাদক কিংসলি মার্টিন। মার্টিন নেহরুর বহু দিনের পরিচিত বন্ধু এবং এই প্রথম ভারতে এসে তিনি নেহরুরই অতিথি হয়েছেন।

দেখলাম আগ্রার তাজ। এর আগে বিমানযাত্রী হয়ে যাবার সময় আকাশের ঊর্ধ্বস্তর থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে তাজ দেখবার সুযোগ একবার পেয়েছিলাম। দেখেছিলাম ধবধবে সাদা চিনির খেলনার মত ছোট্ট তাজ ঘোর সবুজের মধ্যে বসে রয়েছে। এবার তাজের দুটি নতুন রূপ দেখলাম। অপরাহ্ণের রক্তিম আলোকে প্রলিপ্ত তাজ এবং পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় স্নাত শুভ্রদেহ তাজ। পূর্ণিমা রাত্রির তাজ একটা স্বপ্নময় আবেশ সৃষ্টি করে ঠিকই, কিন্তু তাজ-দেহের গঠনসুষমা দিনের আলোকেই দর্শকের চোখে একটা মধুরতার যাদু সৃষ্টি করে।

আজ বিকালে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর দুই কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে মাদ্রাজ থেকে দিল্লী ফিরেছেন। লেডী মাউণ্টব্যাটেন

মাদ্রাজেই থেকে গেছেন, কারণ সেখানে তাঁর অনেকগুলি কাজ ও অনুষ্ঠান এখনো বাকি রয়ে গেছে। মাদ্রাজ সফরও মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে খুবই পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। বহু বহু সম্বর্ধনার অনুষ্ঠান তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করতে হয়েছে এবং পথের দু'পাশে কাতারে কাতারে জনতা এক ব্রিটিশ গবর্ণর জেনারেলকে দেখবার জন্য এসে দাঁড়িয়েছে।

ছ'টা বাজতে তখন মাত্র দশ মিনিট বাকী, এ কী সংবাদ শুনতে পেলাম। এক দৌড়ে গিয়ে মাউণ্টব্যাটেনের ডেপুটি প্রাইভেট সেক্রেটারী জর্জ নিকলসের ঘরে ঢুকলাম। নিকলস বললেন, গান্ধীকে হত্যা করার জন্য একটা চেষ্টা হয়েছে। গান্ধীর শরীরের তিন স্থানে গুলীর আঘাত লেগেছে।

আধ ঘণ্টা পরে মাউণ্টব্যাটেনের গাড়ীর ড্রাইভার পিয়ার্স বললেন—গান্ধী আর নেই, গান্ধী মারা গেছেন।

পিয়ার্স তাঁর গাড়ীর রেডিও থেকে এই সংবাদ শুনতে পেয়েছেন। পিয়ার্স বললেন, হিজ এক্সেলেন্সি এক্ষুণি বিড়লা হাউসে যাবেন।

মাউণ্টব্যাটেনের গাড়ীর কাছে গিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। ঘরের ভেতর থেকে মাউণ্টব্যাটেন বের হয়েই আমাকে দেখতে পেয়ে ইসারায় জানালেন—আপনিও চলুন। মাউণ্টব্যাটেনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, মুখের ভাব অত্যন্ত গম্ভীর ও কঠিন। বেশি কথা বলছিলেন না মাউণ্টব্যাটেন এবং যা বলছিলেন তার ভাষাও কেমন যেন কাটা কাটা ও খাপছাড়া।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন, এইমাত্র কলকাতা থেকে রাজগোপালাচারী টেলিফোন করেছিলেন। নেহরুর নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন রাজগোপালাচারী। মাত্র দুইদিন আগে অমৃতসরে এক জনসভায় নেহরু যখন বক্তৃতা করছিলেন, তখন দুটো লোককে সভার মধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়। লোক দুটোর সংগে হাতবোমা ছিল।

মাউণ্টব্যাটেনের ধারণা, এইবার ভারতজীবনের সব চেয়ে বেশি ভয়ানক ঘটনা ও তার প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হলো। নেহরু এইবার সম্পূর্ণভাবেই একা পড়ে গেলেন, অথচ এ ঘটনার সমগ্র রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার চাপ তাঁরই ওপর এসে পড়বে। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভারতের সর্বত্র কি যে ভয়ানক ব্যাপার হয়ে যাবে, তা বলা যায় না। এখন সব কিছু নির্ভর করছে নেহরুর ওপর। আর কয়েক ঘণ্টার মত সমগ্র ভারতকে যদি এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া থেকে নেহরু বলিষ্ঠভাবে রক্ষা করতে পারেন, তবেই মঙ্গল।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন, এখন সব চেয়ে বেশি এবং সবার আগের প্রয়োজন হলো, সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে নেহরুর একটি ঘোষণা। এবিষয়ে আর এক মুহূর্ত দেরী করা উচিত হবে না। কিন্তু নেহরুরও যে চিন্তা করবার জন্য একটু সময় চাই। জাতিকে উদ্দেশ করে নেহরু কি বলবেন, সেটা নেহরুকে একবার ভেবে নিতে হবে। কারণ, সমগ্র জাতি এখন নেহরুর কাছ থেকেই কয়েকটি কথা শোনার প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। নেহরুও এখন যা বলবেন, জাতি তাই মেনে নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

বিড়লা ভবনে পৌঁছলাম। ভবনের সম্মুখে ভীড় জমে উঠেছে। জনতা আমাদের দিকে তাকিয়ে বুঝবার চেষ্টা করছিল—কে এরা? জনতার ভেতর দু'একজন ছাড়া, এ অন্ধকারে মাউণ্টব্যাটেনকে কেউ চিনতে পারলো না। জনতার মধ্যে ভয়ানক একটা উতলা ভাব ও অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। জনতার পর জনতা স্রোতের মত এসে বিড়লা ভবনের ওপর যেন আছড়ে পড়ছে। বিড়লা ভবনের দেয়ালের গায়ে কয়েকটি জানালার দিকেই সমগ্র জনতার সাগ্রহ দৃষ্টি নিবদ্ধ।

বিড়লা ভবনের নীচের তলার একটি কক্ষের অভ্যন্তরে ভারতের সকল মন্ত্রী এবং বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতারা সকলেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। নিষ্পলক তাঁদের চোখের দৃষ্টি। বেদনার আঘাতে যেন স্তব্ধ হয়ে গেছেন তাঁরা।

আমরা এগিয়ে যেয়ে গান্ধীর শয়নকক্ষের ভেতরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম জন চল্লিশ ব্যক্তি এই ঘরের ভেতর রয়েছেন। তার মধ্যে রয়েছেন নেহরু ও প্যাটেল। প্রত্যেকের চোখে জল। ঘরে ধূপের গন্ধ।

ঘরের এক কোণে গান্ধীর দেহ পড়ে রয়েছে। দশ-বারজন মহিলা গান্ধীর মৃতদেহের কাছে বসে রয়েছেন। এ'দের মধ্যে একজন মহিলা গান্ধীর মাথার নীচে হাত দিয়ে গান্ধীর মুখ একটু উঁচু করে তুলে ধ'রে রেখেছেন। বড় একটা কম্বলে গান্ধীর দেহ আবৃত। মহিলাদের মধ্যে কয়েকজন আস্তে আস্তে স্তোত্র আবৃত্তি করছিলেন এবং কেউ কেউ ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন।

যেন পরম শান্তির মধ্যে ডুবে রয়েছে গান্ধীর মুখ। ঐ মুখের ওপর এখন আর সেই সাদা ইস্পাতের ফ্রেমের চশমাটি নেই, যে বহু-ব্যবহৃত পুরানো চশমাটি গান্ধীর চোখ-মুখের প্রায় অঙ্গীভূত হয়েই গিয়েছিল। বাতাসে ধূপের গন্ধ, মেয়েদের করুণ কণ্ঠস্বরের কান্না ও প্রার্থনা, বৃদ্ধ মহাত্মার ক্ষুদ্র এবং শীর্ণ একটি নিষ্প্রাণ দেহ, অথচ ঘুমন্ত মানুষের মুখের মত শান্ত একটি মুখ এবং এতগুলি নীরব নরনারীর নিষ্পন্দ-দৃষ্টি—মনের সকল অনুভূতি মুহ্যমান করে দেবার মত এমন বেদনাভিভূত মুহূর্ত আমার জীবনে আর কখনো দেখা দেয়নি। মনের এমন আবেগ-ব্যাকুল অবস্থাও আমার জীবনে খুব কমই ঘটেছে।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম ভবিষ্যতের কথা এবং ভাবতে গিয়ে শঙ্কিতও হয়ে উঠছিলাম। চিন্তাগুলি বিমূঢ় এবং দিশেহারার মতই হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে মনের গভীরের এই সত্যও উপলব্ধি করছিলাম—এটা পরাভবের ঘটনা নয়, জয়ের ঘটনা। এই ক্ষুদ্রকায় মানুষটীর চিন্তা আশা ও আদর্শের শক্তিই জয়ী হয়েছে। যে শুদ্ধ আগ্রহ ও নিষ্ঠার সংগে এই বৃদ্ধ নিঃশ্বাসের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর আদর্শের সেবা করেছেন, সেই শুদ্ধতা ও নিষ্ঠা এমনই এক শক্তি সৃষ্টি করে দিয়ে গেল যে, কোন হত্যাকারীর উদ্দেশ্য ও বুলেট সে শক্তিকে ছিন্ন করতে পারবে না।

গান্ধীর দেহের নিকটে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমরা আমাদের নীরব শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। তারপর এ ঘর থেকে চলে গিয়ে বড় হল ঘরের ভেতরে ঢুকলাম। সন্ধ্যা যত গভীর হচ্ছে, ভীড়ও ততই বেড়ে উঠছে। জানালার ওপর শত শত মুখ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। বন্ধ জানালাগুলির শার্সি অনবরত ঝনঝন ক'রে বাজছিল জনতার ব্যাকুল করাঘাতে। ভারত গবর্ণমেন্টের মন্ত্রীরা অন্য একটি কক্ষে বসে রয়েছেন। মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য হলঘর থেকে মাউণ্টব্যাটেন এইবার সেই কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

আমি চুপ করে শুনছি। মাউণ্টব্যাটেন বলছেন—"গান্ধীর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাতের সময় গান্ধী

আমাকে বলেছিলেন যে, নেহরু এবং প্যাটেলের মধ্যে সম্পূর্ণ মিল করিয়ে দেওয়াই এখন তাঁর মনের সব চেয়ে বড় সাধের ইচ্ছা।”

মাউণ্টব্যাটেনের কথা শেষ হওয়া মাত্র নেহরু ও প্যাটেল দু'জনই হঠাৎ উঠে পরস্পরের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং দু'জনেই পরস্পরকে নিবিড়ভাবে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

সফল হলো গান্ধীর ইচ্ছা। গান্ধীর দুই প্রিয়শিষ্য আজকের এই শোকাক্রান্ত সন্ধ্যায় প্রীতির বন্ধনে যুক্ত হয়ে গেলেন। এই দৃশ্যও দেখলাম।

বিড়লা ভবনের কক্ষে সমবেত মন্ত্রীদের সঙ্গে কয়েক মিনিট আলোচনা করেই বের হয়ে এলেন মাউণ্টব্যাটেন। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, প্যাটেলকেও রাজী করিয়েছি। আজ রাত্রে নেহরু ও প্যাটেল উভয়ে একই সময়ে বেতারে দেশবাসীর উদ্দেশে বলবেন। মাউণ্টব্যাটেনের মতে, এই ব্যবস্থা করতে পেরে তিনি খুব বড় একটা 'সাফল্য' লাভ করতে পেরেছেন। বর্তমান অবস্থায় রাজনৈতিক প্রয়োজনের দিক দিয়ে নেহরু ও প্যাটেলের এইভাবে 'একসঙ্গে' উদ্যোগী হবার প্রমাণ দেশবাসীর সমক্ষে প্রচারিত করা জাতীয় ঐক্যের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাউণ্টব্যাটেন আবার বললেন, বর্তমান অবস্থার সকল ঘটনা ও প্রতিক্রিয়াকে নেহরু যদি অবিলম্বে আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারেন, তবেই মঙ্গল। এ বিষয়ে নেহরুর সাফল্যের ওপরেই ভবিষ্যতের সব কিছু নির্ভর করছে।

এখন দেশের সর্বত্র লোকের মনের ভাব এই শোকের আঘাত সত্ত্বেও এমন এক উত্তেজনায় কম্পিত হচ্ছে যে, সামান্য একটি কথার ভুলে, অথবা একটি গুজবে এই উত্তেজনা দাবাগ্নির মত জ্বলে উঠে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে। কিছুক্ষণ আগে বিড়লা ভবনের সম্মুখে যখন আমরা পৌঁছেছিলাম, তখনই ভীড়ের ভেতর থেকে একটা গুজববাজ লোক মাউণ্টব্যাটেনের কাছে এসে বলে উঠলো— 'একটা মুসলমান এই কাণ্ড করেছে।' মাউণ্টব্যাটেন এবং আমাদের মধ্যে কেউই তখন জানতেন না যে, কে হত্যা করেছে গান্ধীকে। হত্যাকারীর নাম কি, কোন্ ধর্মের লোক—এসব তখনো কিছুই আমরা শুনিনি। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন এটা ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, হত্যাকারী যদি মুসলমান হয়, তবে এ ঘটনার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া রুদ্ধ করবার ভরসা আর নেই, সর্বনাশা গৃহযুদ্ধ নিরোধ করাও কিছুতেই সম্ভবপর হবে না। গুজববাজ লোকটার কথা শুনে মাউণ্টব্যাটেন একটা বেপরোয়া আন্দাজের জোরে তৎক্ষণাৎ ধমক দিলেন—বেকুব কোথাকার! হত্যাকারী যে একজন হিন্দু, এটুকুও এখনো শোননি।

কয়েক মিনিট পরে ভি পি মেননের কাছ থেকে আমি জানতে পেলাম যে, হত্যাকারী হলো জনৈক মারাঠা। গান্ধী যখন তাঁর প্রার্থনা সভার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখনই খুব নিকট স্থান থেকে হত্যাকারী তাঁর ওপর তিনবার গুলী নিক্ষেপ করেছে। ডাক্তার ভদ্রলোকের সঙ্গেও আমি আলাপ করলাম। গান্ধীর অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত এই ডাক্তার গান্ধীকে ঔষধ দিয়ে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। ডাক্তার অভিযোগ করলেন যে, বিড়লা ভবনে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র কিছুই ছিল না। তিনি অবশ্য একথাও স্বীকার করলেন যে, ঔষধপত্র থাকলেও কিছু হতো না। গুলীবিদ্ধ হবার পর মাত্র কয়েক মুহূর্ত গান্ধী বেঁচেছিলেন। সামান্য একটু জল পান করতে পেরেছিলেন গান্ধী এবং তার পরেই চেতনা হারিয়ে ফেললেন। সে চেতনা আর ফিরে এল না।

গান্ধীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে ব্যবস্থার কথা নিয়ে অনেক কথা উঠলো এবং আলোচনা হলো। পিয়ারীলাল বললেন—গান্ধীর মরদেহ কোনরকম রাসায়নিক ব্যবস্থার দ্বারা দর্শনীয় বস্তুর মত রক্ষা করা উচিত হবে না, কারণ স্বয়ং গান্ধীই একাজ করতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করে দিয়ে গেছেন। গান্ধী পূর্বেই তাঁর এই ইচ্ছা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে, মৃত্যুর পর তাঁর দেহ যেন বিশুদ্ধ হিন্দু প্রথা অনুযায়ী দাহ করা হয়।

মাউণ্টব্যাটেন ও নেহরু পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্ত করলেন যে, আগামী কাল গান্ধীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে। কিন্তু এই অনুষ্ঠানে যে কল্পনাতীত জনসমাগম হবে, তার মধ্যে শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখা এক দিল্লীর বেসামরিক কর্তৃপক্ষের সাধ্য ও শক্তিতে সম্ভবপর হবে না। দেশরক্ষা বিভাগের ওপরেই কাজের ভার দেওয়া হলো। দিল্লীর এরিয়া কম্যান্ডার সকল বিভাগের সৈন্য নিয়ে অন্ত্যেষ্টির শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করলেন।

মহাত্মাকে শেষবারের মত দেখবার জন্য বিড়লা ভবনের ওপর এই সন্ধ্যাতেই জনতার অভিযান প্রবল হয়ে উঠতে দেখে আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। জানালাগুলি জনতার চাপ সহ্য করতে না পেরে ভেঙে পড়বে বলেই মনে হচ্ছে। নেহরুকে এই আশঙ্কার কথাও বললাম।

নেহরুর সে বিষণ্ণ ও বেদনাপীড়িত মূর্তির করুণতা বর্ণনা করা যায় না। অবসন্ন ও ক্লান্ত স্বরে তিনি আমার সঙ্গে কথা বললেন। কিন্তু বিস্মিত হয়ে দেখলাম, এই অবস্থার মধ্যে তিনি কিভাবে নিজেকে সংযত করে রেখেছেন। নেহরু বললেন—সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে। গান্ধীর দেহ আজ রাত্রের মত ঘরের বাইরে নিয়ে এসে একটা উঁচু স্থানে রাখা হবে, যার ফলে জনতা এক লাইন ধরে শৃঙ্খলার সঙ্গে এগিয়ে এসে মহাত্মার শেষ 'দর্শন' লাভ করে চলে যেতে পারবে।

বাইরের জনতা অস্থির হয়ে উঠছিল। মহাত্মার দর্শন লাভের জন্য জনতার চীৎকারও বাড়ছিল। নেহরু ঘরের ভেতর থেকে বের হয়ে সোজা সেই জনতার মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন। নেহরুর সঙ্গে যে কোন দেহরক্ষী নেই, একথা ভুলেও একবার মনে হলো না নেহরুর। জনতার সঙ্গে কথা বলে নেহরু আবার ফিরে এলেন।

রাত্রি আটটার সময় আমরা বিড়লা ভবন ছেড়ে গবর্ণমেণ্ট হাউসে ফিরে এলাম। দেবদাস গান্ধী এবং মৌলানা আজাদকেও সঙ্গে নিয়ে এলেন মাউণ্টব্যাটেন।

দেবদাস বললেন,—পাগলের কাণ্ড! পাগল ছাড়া এমন কাজ কেউ করতে পারে না।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন—এটা যদি সত্যিই পাগলের কাণ্ড হতো, তবে আমি অন্ততঃ বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা করতাম না। কিন্তু এটা মোটেই পাগলের কাণ্ড নয়। যথেষ্ট পরিকল্পনা করে, ষড়যন্ত্র করে এবং ব্যবস্থা করেই যে এ কাণ্ড করা হয়েছে, তার প্রমাণ ও লক্ষণ খুব বেশি করেই দেখতে পাচ্ছি।

মৌলানা আজাদ ইংরাজীতে কথা বলেন না, যদিও তিনি ইংরাজী বলতে পারেন। মৌলানা নিঃশব্দে মাথা নেড়ে মাউণ্টব্যাটেনের মন্তব্যই সমর্থন করলেন।

গবর্ণমেণ্ট হাউসের এ ডি সি কক্ষে ফিরে এসে দেখতে পেলাম, ভি পি মেনন, কিংসলি মার্টিন এবং গর্ডন

ওয়াকার বসে রয়েছেন। মাত্র গত কাল দিল্লী পৌঁছেছেন গর্ডন ওয়াকার। ভাবতে আরও কষ্ট হচ্ছে যে, আমি আজই সকালে পিয়ারীলালের সঙ্গে কথাবার্তা বলে গান্ধীর সঙ্গে গর্ডন ওয়াকারের একটা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছি। আগামীকাল সন্ধ্যায় গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে গর্ডন ওয়াকার প্রস্তুত হয়েছিলেন। হঠাৎ জামসাহেব ঘরে ঢুকলেন। জামসাহেব বললেন, আজ সন্ধ্যা ছ'টার সময় গান্ধীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ করবার কথা ছিল এবং শুধু এই উদ্দেশ্যেই তিনি আজ বিমানযোগে দিল্লীতে এসে পৌঁছেছেন।

নয়াদিল্লী, শনিবার, ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ সাল। বিড়লা ভবন থেকে যমুনার রাজঘাট—ছয় মাইল দীর্ঘ পথ। জল, স্থল ও বিমান বাহিনীর সৈনিকেরা পথের স্থানে স্থানে ডিউটি নিয়ে দাঁড়িয়েছে।

একটি উদ্বেগের ভার আমাদের চিন্তা থেকে নেমে গেছে, কারণ হত্যাকারীর নাম ও পরিচয় জানতে পেরেছি। হত্যাকাণ্ডের পর অল্পক্ষণের মধ্যেই এই তথ্য অতি দ্রুত ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে যে, হত্যাকারী হলো হিন্দু মহাসভার জনৈক মারাঠা সদস্য, নাম গড়সে।

আজ আবার বিড়লা ভবনের সম্মুখে আমরা উপস্থিত হলাম। গত রাত্রের জনতার তুলনায় অনেক বড় এক জনতার চাপে আমাদের পথ পাওয়া দুরূহ হয়ে উঠলো। দেখলাম, মহাত্মার শবাধার পুষ্প ও কংগ্রেস পতাকায় আবৃত করা হয়েছে। একটি গাড়ীর ওপর শবাধার রাখা হয়েছে। একদল ভারতীয় নৌ-সৈনিক গাড়ী ঠেলে নিয়ে চললো। গবর্ণর জেনারেলের বডিগার্ড দল চললো আগে আগে। সঙ্গে সঙ্গে শবানুগামী জনতা যার মধ্যে মন্ত্রী ও সেনাপতির দল ভারতের দীনতম সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে জায়গা নেবার চেষ্টা করছেন, যাতে মহাত্মার মুখ আর একবার ভাল করে দেখে নিতে পারা যায়। ভারতীয় মহাত্মার শবাধারের সঙ্গে, সম্মুখে ও পিছনে চলেছে সৈনিকের দল। তা ছাড়া, গান্ধীরই বহু সংগ্রামে যে সৈন্যদল তাঁর সঙ্গে চিরকাল কাজ করেছে, সেই 'চার-আনা' কংগ্রেসীও হাজারে হাজারে চলেছেন।

আর একবার গান্ধীর মুখ দেখতে পেলাম এবং আগের মতই আর একবার বিস্মিত হলাম সেই মুখের প্রশান্ত রূপ দেখে। ফুলের স্তবকের ওপর মাথা রেখে শুয়ে আছেন গান্ধী। তাঁর দেহের চারদিক ঘিরে বসে রয়েছেন গান্ধীর পুত্রেরা এবং নাতি-নাতনীর দল। প্যাটেলও বসেছেন গান্ধীর দেহের পাশে। বিষণ্ণ, ক্লিষ্ট ও অবসন্ন একটি মূর্তি—উদাস ও শূন্য দৃষ্টি তুলে প্যাটেল লক্ষ্যহীনভাবে যেন দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন।

গান্ধীর মৃত্যুতে প্যাটেলের যে ব্যক্তিগত ক্ষতি হয়ে গেল, সে কথা ছেড়ে দিই। এই ঘটনা প্যাটেলের মনের ওপর যে বিশেষ আঘাত এবং খুবই কঠোর আঘাত দিয়েছে, সেই কথাই ভাবছি। এরকম হবার বিশেষ কতকগুলি কারণও রয়েছে। প্রথমতঃ, গান্ধীর সঙ্গে প্যাটেলের বনিবনা যে হচ্ছে না, এ খবর কিছুদিন থেকে প্রায়ই শোনা যাচ্ছিল। দ্বিতীয়তঃ, প্যাটেলই হলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার সকল কর্তৃত্ব তাঁরই হাতে। সুতরাং গান্ধীর নিরাপত্তার জন্য তিনিই সরকারীভাবে দায়ী। এটা অবশ্য সত্য যে, দশ দিন আগে প্রার্থনা-সভায় বোমা বিস্ফোরিত হবার পরেও গান্ধী নিজেই বিশেষভাবে এবং সুস্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তাঁকে রক্ষা করার জন্য কোন পুলিশ নিযুক্ত করতে হবে না। কিন্তু এটাও স্পষ্ট করেই বুঝা যাচ্ছে যে, দশদিনের আগের বোমা বিস্ফোরণ এবং গতকালের আক্রমণ, উভয়ই একই ষড়যন্ত্রের ব্যাপার। আর একটি শোচনীয় সত্য এই যে, দশদিন আগের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা লক্ষ্য ক'রেও পুলিশ এই দশদিনের মধ্যে অপরাধীদের সন্ধান ক'রে ধরে ফেলতে পারেনি। নেতাদের মধ্যে প্যাটেলের সঙ্গেই গান্ধীর শেষ দেখা ও আলাপ হয়েছে। সেদিন অপরাহ্নে প্যাটেলেরই সঙ্গে কথা বলতে বলতে কয়েক মিনিট দেরী হয়ে গিয়েছিল গান্ধীর। প্যাটেলকে বিদায় দিয়ে তাড়াতাড়ি প্রার্থনাসভার কাছে যেই মাত্র এগিয়ে এলেন গান্ধী, তখুনী হত্যাকারী তাঁর পথরোধ করে দাঁড়ালো। সুতরাং, এটা খুবই স্বাভাবিক যে, এ ঘটনায় প্যাটেলেরই মন সব চেয়ে বেশি যন্ত্রণায় পুড়ে যাচ্ছে। গান্ধীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য নানারকম উদ্যোগে, ব্যবস্থায় ও আয়োজনে মাউণ্টব্যাটেন এবং নেহরু তবুও ঘুরে-ফিরে কাজ করতে পারছেন, কিন্তু প্যাটেল যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছেন। বিড়লা ভবন থেকে রাজঘাট পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় মাইল পথ শবাধারের সঙ্গে সঙ্গে চললেন প্যাটেল, প্যাটেলের বয়সও বাহাত্তর বছর পার হতে চলেছে এবং এই বয়সের এক বৃদ্ধের পক্ষে এতটা শারীরিক ক্লেশ সহ্য করাও কত কঠিন! কিন্তু প্যাটেল যেন ইচ্ছে ক'রেই এই ক্লেশ ও কষ্ট আজ গ্রহণ করতে চাইছেন।

এগারটা বেজে গেছে, ধীরে ধীরে গান্ধীর শবাধার এগিয়ে চলেছে। জনতার শেষ নেই, সীমা নেই। গবর্ণমেণ্ট হাউসের কাছে এসে আমরা এ দৃশ্য ভাল ক'রে দেখবার জন্য দরবার হলের গম্বুজের ওপরে উঠে দাঁড়ালাম। দেখলাম, এখান থেকে প্রায় দু' মাইল দূরে গান্ধীর শবাধার জনসমুদ্রের তরঙ্গে ধীরে ধীরে ভেসে চলেছে। আমাদের সম্মুখের এই সুদীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত সড়কের নাম কিংস্‌ওয়ে ('Kingsway')। এই 'রাজার সড়ক' ধরে চলে যাচ্ছেন সেই গান্ধী, যিনি সত্যিই রাজা ছিলেন না। যাচ্ছেন সেই গান্ধী, যিনি এই পথ থেকে ব্রিটিশ রাজকে সরিয়ে দিয়েছেন। ব্রিটিশ রাজকে অপসারিত ক'রে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যিনি সব চেয়ে বেশি চেষ্টা করেছেন, সেই মানুষটিই এই রাজার সড়কে প্রথম ও শেষ দর্শন দিয়ে চলে যাচ্ছেন। সেই মানুষটিই আজ তাঁর মৃত্যুতে যে বিরাট শ্রদ্ধার ঐশ্বর্য তাঁর সঙ্গে নিয়ে চলেছেন, সে শ্রদ্ধা এই রাজার সড়কে ভ্রমণকারী কোন ভাইসরয়ের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

যমুনার ঘাটে পৌঁছলাম। গবর্ণর-জেনারেলের সঙ্গে সব সমেত আমরা বিশ জন এগিয়ে চললাম। আমাদের পেছনে পাঁচলক্ষ লোকের ভীড়। সম্মুখে ও পার্শ্বে, ভীড় যেন আকাশপ্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। একটি ক্ষুদ্র ইষ্টকনির্মিত বেদিকার ওপর কাষ্ঠখণ্ডে সজ্জিত চিতার কাছাকাছি গিয়ে আমরা দাঁড়ালাম। পেছন থেকে পাঁচলক্ষ লোকের ভিড় আমাদের ওপর প্রপাতের মত এসে পড়ছে। মাউণ্টব্যাটেনের নির্দেশে আমরা সেখানেই ধুলোর ওপর বসে পড়লাম।

চিতামঞ্চ লক্ষ্য ক'রে চারিদিক থেকে জনতার পর জনতা এগিয়ে আসতে আরম্ভ করলো। কম ক'রেও সাত লক্ষ লোক হবে। রাজনীতিক নেতা ও মেথর, গবর্ণর ও চাষী নারী—প্রত্যেকেই ফুল দেবার জন্য ঠেলাঠেলি ক'রে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করছে।

চিতামঞ্চে অগ্নিশিখা দেখা দিল। সংগে সংগে বাতাস কাঁপিয়ে লক্ষকণ্ঠে একটি বিরাট ও গম্ভীর বাণী ধ্বনিত হলো—গান্ধী অমর!

নয়াদিল্লী, সোমবার, ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ সাল। আজ বিকালে বব স্টিমসন আমার সংগে দেখা করতে এলেন। সেদিনের প্রার্থনাসভায় বব উপস্থিত ছিলেন। হত্যাকাণ্ডের মাত্র পঁচিশ মিনিট পরে স্টিমসন বি-বি-সির এক ঘটিকার প্রোগ্রামে ঘটনার প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিবরণ প্রথম প্রচার করে সমস্ত পৃথিবীতে সাংবাদিক দ্রুততার রেকর্ড অতিক্রম ক'রে গেছেন।

বব বললেন, সেদিন তাঁর প্রার্থনা-সভায় যাবার কোন কথা ছিল না। গান্ধীর প্রার্থনা-সভা একবার স্বচক্ষে দেখবার বিশেষ ইচ্ছে হয়েছিল ভিনসেণ্ট শীয়ানের। শীয়ানকে যেতে দেখে ববও সংগে সংগে চললেন। শীয়ান এই নিদারুণ ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছিলেন। কিন্তু শীয়ান এত বেশি মর্মাহত ও অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি আমেরিকাতে সংবাদ প্রেরণের জন্য কিছুই ক'রে উঠতে পারেননি।

বব বললেন যে, গান্ধীর হত্যাকারীকে যে ব্যক্তি প্রথম গিয়ে আঁকড়ে ধরেছিল, তার নাম কেউ করছে না। প্রার্থনা-সভায় উপস্থিত মার্কিণ রাষ্ট্রদূত অফিসের জনৈক কর্মচারীই হলেন এই 'অখ্যাত হিরো'। সবচেয়ে আগে তিনিই বুঝতে পেরেছিলেন, কি ভয়ানক ব্যাপার হয়ে গেল। তিনিই সবার আগে এক লাফে উঠে এবং এগিয়ে গিয়ে হত্যাকারীকে চেপে ধরেছিলেন। বব বললেন, ঘটনার সময় কোন ব্যক্তিই সভা ছেড়ে পালিয়ে যায়নি, এবং প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উন্মত্ত হয়েও ওঠেনি। সকলেই বৃদ্ধ মহাত্মাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

নতুন ভারতের প্রথম গবর্ণর-সম্মেলনও হয়ে গেল। সম্মেলনের দিন পূর্বেই নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। মহাত্মার হত্যায় দেশের এই বেদনাভিভূত অবস্থায় সম্মেলনের আয়োজন করতেও কেউ বিশেষ উৎসাহ বোধ করছিলেন না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত মাউণ্টব্যাটেন সম্মেলন আহ্বান করারই সিদ্ধান্ত করলেন। গবর্ণরেরা সকলেই সাম্প্রদায়িক হিংসা দমনের সংকল্প প্রকাশ করলেন। পশ্চিমবঙ্গের গবর্ণর রাজগোপালাচারী দেশের সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে চালিত সকল রাজনৈতিক সংঘগুলিকে অবিলম্বে দমন করবার প্রস্তাব করলেন। রাজগোপালাচারী বিশেষভাবে হিন্দুমহাসভা ও হিন্দুমহাসভারই সংগ্রামতৎপর শাখা-প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে দমনের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন।

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ সাল। গান্ধীর মৃত্যুতে সারা পৃথিবীর মনে যে এত বড় প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, এটা আমি কল্পনাই করতে পারিনি। যতটা হবে ব'লে মনে করেছিলাম, বস্তুতঃ তার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে। পৃথিবীর প্রত্যেক স্থান থেকে গান্ধীর উদ্দেশে যে পরিমাণ শ্রদ্ধার ও শোকবেদনার বাণী আসছে, তা থেকে এই সত্যই উপলব্ধি করতে পারছি যে, গান্ধীর ব্যক্তিত্বের প্রভাব ভারতের সীমা ছাড়িয়ে পৃথিবীর সর্বত্র কতদূর বিস্তৃত হয়ে গেছে। গান্ধীজীবনের বাণী ও কর্মের পূর্ণ তাৎপর্য হয়তো অনেকেই উপলব্ধি করতে পারেন না, কিন্তু এটা একেবারে প্রত্যক্ষ সত্য যে, তাঁর চরিত্রের মহিমা সর্বত্র স্বীকৃত হয়ে গেছে।

কিংস্লি মার্টিন বললেন—গান্ধী মানবজাতির বিবেক জাগিয়ে দিয়ে গেছেন। জড়বাদে এবং রাজনৈতিক শক্তির দ্বন্দ্বে মত্ত হয়ে পৃথিবীর যে বিশেষ ভাল কিছু হচ্ছে না, এটা আধুনিক কালের মানুষ দেখতেই পাচ্ছে। গান্ধী নতুন একটা পথের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি মানবজীবনের আত্মিক সত্য ও মূল্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেছেন। আমার মনে হয়, সম্ভবতঃ এই পথই মানুষের পক্ষে বেশি কল্যাণকর পথ।

নিউ ইয়র্ক টাইমস্ লিখেছেন—নিউ টেস্টামেণ্টের বাণীমূর্তি ছিলেন গান্ধী। তিনি শত্রুকেও ভালবাসবার প্রয়াস ক'রে গেছেন। তিনি এখন মানুষের সর্বকালের সম্পদ হয়ে গেলেন।

এটলি বেতারে ব্রিটিশ জাতির উদ্দেশ্যে গান্ধীর নামে শ্রদ্ধা-ভাষণ প্রচার করেছেন। ট্রুম্যান বলেছেন—সমস্ত পৃথিবীর ক্ষতি হলো। স্মাট্স্ বলেছেন—'মানুষের রাজা' তিরোহিত হয়েছেন। জিন্না বলেছেন,—গান্ধী হিন্দু-সমাজের সকলের শ্রদ্ধাভাজন ও আস্থাভাজন নেতা ছিলেন এবং এ পর্যন্ত হিন্দু সমাজ হতে যেসব অতি মহৎ ব্যক্তি আবির্ভূত হয়েছেন, গান্ধী তাঁদেরই অন্যতম ছিলেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, জিন্নার উক্তির মধ্যে একটা ভুল রয়ে গেছে। গান্ধী যদি সত্য সত্যই হিন্দু-সমাজেরই প্রত্যেকের আস্থাভাজন ও শ্রদ্ধাভাজন হতেন তবে এই শোচনীয় ঘটনা আজ পৃথিবীতে দেখা দিত না। গান্ধীর প্রতি হিন্দু-সমাজের শ্রদ্ধা ও আস্থা 'সর্বব্যাপী' হয়নি বলেই তাঁর প্রাণ হরণ করা হয়েছে।

গান্ধীমৃত্যুর সংগে সংগে ভারতের প্রত্যেক সংবাদপত্রের বিশেষ স্মরণ-সংখ্যাগুলি লক্ষ্য করলেই বুঝা যায়, দেশের মানুষ এই ঘটনায় কি তীব্র আত্মগ্লানি, অনুশোচনা ও লজ্জা বোধ করছেন। প্রত্যেক ভারতীয় সংবাদপত্র যেসব গান্ধী-স্মরণ-সংখ্যা প্রকাশ করেছেন তাদের অনেকগুলির মধ্যে উচ্চস্তরের সাংবাদিক রুচি ও মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছে 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার গান্ধী-স্মরণ সংখ্যা। 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' তিনটি পৃষ্ঠা পূর্ণ করে গান্ধীর তিনটি প্রতিকৃতি মুদ্রিত করেছেন। প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধের স্থানটি প্রায় সম্পূর্ণ শূন্য রেখে তার মধ্যে বোল্ড টাইপে ক্ষুদ্র একটি প্যারাগ্রাফে অল্প কয়েকটি কথার মধ্যে গান্ধীর উদ্দেশ্যে 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' বলেছেন—"গান্ধী তাঁর স্বজাতির মুক্তির জন্য বেঁচেছিলেন এবং স্বজাতির লোকই তাঁকে হত্যা করেছে। ক্রুশবিদ্ধ সেই মহামানবের প্রাণবলির মত পৃথিবীর ইতিহাসে মহামানবের দ্বিতীয় প্রাণবলির ঘটনা একটি শুক্রবারেই ঘটেছে, সেই একই শুক্রবার, আজ থেকে এক হাজার নয় শত পনর বৎসর পূর্বে যেদিনে যীশুখৃষ্টের প্রাণ হরণ করা হয়েছিল। পিতা, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো।"

(ক্রমশঃ)

ভারত-শিল্প

বিমলকুমার দত্ত

বাঙলার পাল ও সেন যুগ

(৭৫০—১১৫৫ ও ১০৯৫—১২২৫)

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রায় শতবর্ষব্যাপী মাৎস্যন্যায়ে বা অরাজকতায় ও বহিঃশত্রুর পুনঃ পুনঃ আক্রমণে বাঙলার রাজশক্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। এই অরাজকতা দূর করিবার অভিপ্রায়ে দেশের তদানীন্তন গণ্যমান্য জনসাধারণ দয়িতবিষ্ণুর পৌত্র ও বপ্যটের পুত্র নরপাল কুলচূড়ামণি গোপালকে আনুমানিক ৭৫০ খৃষ্টাব্দে বাঙলার রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। জনসাধারণ কর্তৃক (প্রকৃতিভিঃ) নির্বাচিত বরেন্দ্রভূমি নিবাসী অশেষ গুণসম্পন্ন রাজা গোপাল দেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ও ঐক্য ফিরাইয়া আনার ফলে বাঙালীর জাতীয় জীবনে এক নূতন গৌরবময় যুগের সূচনা হয়। গোপালদেব প্রতিষ্ঠিত পালবংশের ১৭ জন নৃপতি প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব-ভারতে রাজত্ব করেন। ইঁহাদিগের মধ্যে গোপালদেবের পুত্র ধর্মপাল ও পৌত্র দেবপালের রাজত্বকালই সর্বাপেক্ষা গৌরবময়। এই সময় পালরাজগণ উত্তর ভারতের গুর্জর-প্রতীহার ও দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রত ছিলেন।

দীর্ঘকাল শাসনকার্যের পর যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে পালবংশ ক্রমশঃই হীনবল হইয়া পড়ে। পালরাজ্যলক্ষ্মীর বার্ধক্যদশার সুযোগ লইয়া ও ব্রাহ্মণদিগের সাহায্যে কর্ণাটদেশবাসী হেমন্ত সেন বাঙলাদেশে সেন রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন কিন্তু সেন রাজত্ব সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার সম্পূর্ণ গৌরব হেমন্ত সেনের পুত্র মহারাজাধিরাজ বিজয় সেনের (১০৯৫-১১৫৮) প্রাপ্য। সেনরাজগণ অধিককাল রাজত্ব করিতে পারেন নাই। বল্লাল সেনের (১১৫৮-১১৭৯) পুত্র লক্ষ্মণ সেনই (১১৭৯-১২০৫) এই বংশের শেষ নরপতি। তাঁহার রাজত্বকালে সুন্দরবন অঞ্চলে শ্রীডোম্মন পাল ও ত্রিপুরায় হরিকাল দেব যথাক্রমে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা এবং ভাগ্যান্বেষী মহম্মদ বখ্‌-তিয়ার সসৈন্যে নদীয়া আক্রমণ করেন। লক্ষ্মণ সেনের পর তাঁহার দুই পুত্র বিশ্বরূপ ও কেশব পূর্ব-বঙ্গে কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু বখ্‌-তিয়ারের আক্রমণকাল হইতেই বাঙলাদেশের হিন্দুরাজলক্ষ্মীর ভাগ্যসূর্য চিরতরে অস্তমিত হইল।
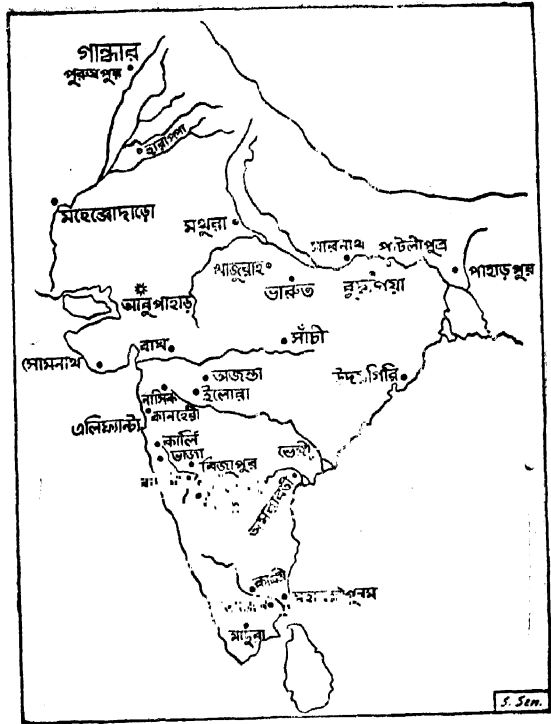
বাঙলার ও বাঙালীর ইতিহাসে পাল-যুগই সর্বাপেক্ষা গৌরবময়। পালরাজগণ ছিলেন খাঁটি বাঙালী—সেকারণ পালযুগের ইতিহাস বাঙালী জাতির একান্ত নিজস্বতায় চিরউজ্জ্বল এবং পালরাজগণই বাঙলার শেষ খাঁটি বাঙালী রাজশক্তি। "কবি উমাপতি ধর কিম্বা শ্রীহর্ষ বিজয় সেনের কিম্বা পরবর্তী সভাকবিরা সেনরাজাদের স্তুতি ও চাটুবাদে যতই উচ্ছ্বসিত হউক না কেন সমসাময়িক বাঙালী জনসাধারণ এই রাজবংশকে আপনার জন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন—একথা মনে করা কঠিন।" কর্ণাট দেশ হইতে আগত এই ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী রাজবংশলব্ধ যশ বা অপযশ আদৌ বাঙলার বা বাঙালীর প্রাপ্য নহে।

ভারত ইতিহাসে গুপ্তযুগের ন্যায় বাঙলাদেশের পালযুগ ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ। পালযুগের তাম্রশাসন সমূহের শ্লোক হইতে (সংস্কৃত ভাষায় লিখিত) জানা যায় যে, এ সময়ে বাঙলায় সংস্কৃত চর্চা বিশেষ প্রসার লাভ করে ও ব্রাহ্মণগণ বেদের বিভিন্ন শাখায় এবং বৈদিক ক্রিয়াকার্যে সবিশেষ বিজ্ঞ ও পারদর্শী ছিলেন।

বাঙলা দেশের এই সুবর্ণযুগে একাধারে 'রামচরিত' কাব্যরচয়িতা সন্ধ্যাকর নন্দী; ন্যায়কন্দলী, অদ্বয়সিদ্ধি প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীধর ভট্ট; বিবরণ-পঞ্জিকা, তন্ত্রপ্রদীপ, ধাতুপ্রদীপ প্রভৃতি পুস্তকের লেখক প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ জিনেন্দ্রবুদ্ধি ও মৈত্রেয়-রক্ষিত; সর্ব-ভারতীয় খ্যাতি সম্পন্ন বৈদ্যক গ্রন্থকার চক্রপাণি দত্ত, সুরেশ্বর, বঙ্গসেন প্রভৃতি; ধর্মশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থ প্রণেতা জিতেন্দ্রিয়,

বালক ও যোগেশ্লোক এবং বিখ্যাত জ্যোতিষ-গ্রন্থ 'সারাবলীর' রচক কল্যাণবর্মা প্রভৃতি পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙলা দেশকে গৌরবান্বিত করেন। পরবর্তীকালে সেন যুগেও বিখ্যাত গীতগোবিন্দের রচয়িতা জয়দেব এবং ধোয়ী, হলায়ুধ, শ্রীধর দাস, উমাপতিধর প্রভৃতি কবিগণ আবির্ভূত হন।

হিউ-এন-সাঙএর বিবরণী হইতে জানা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীতে বাঙ্গলা ও বিহারে বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত সম্প্রদায় বিশেষ প্রধান ছিলেন। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। এই সময়ে ভারতের সর্বত্র ক্রমক্ষয়িষ্ণু এই ধর্ম পালরাজলক্ষ্মীর আশ্রয়ে পূর্ব ভারতেই একমাত্র প্রবল ছিল। পাল-রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় এ অঞ্চলে বৌদ্ধ-ধর্ম যে কিরূপ মর্যাদাসম্পন্ন ও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল......তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ বিক্রমশীলা, সোমপুর, ওদন্তপুরী ও নালন্দা প্রভৃতি মহাবিহারের; দীপঙ্কর ও ধর্মপাল প্রভৃতি আচার্যগণ কর্তৃক তিব্বত, ব্রহ্ম, মালয় প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারের এবং সুদূর যবদ্বীপের অধিপতি কর্তৃক সম্রাট দেবপালের অনুগ্রহে নালন্দায় সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিতই যথেষ্ট নয় কি? পালরাজগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইলেও তাম্রশাসন লিপিগুলি হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহারা অত্যন্ত উদার মতাবলম্বী ও হিন্দুধর্মের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে ধর্মেরও পরিবর্তন হয়। পালযুগের বৌদ্ধধর্ম প্রাচীন সর্বাস্তিবাদ, সম্মিতীয় এমন কি মহাযানকেও অতিক্রম করিয়া বজ্রযান ও

রজতনির্মিত বিষ্ণুমূর্তি

মন্ত্রযানের মারফতে সহজযান স্তরে উপনীত। এই সহজযান বাঙ্গলার স্বাধীন বৈপ্লবিক চিন্তার ফল। এই ধর্মের আচার্যগণ সিদ্ধাচার্য নামে পরিচিত এবং তাহাদের রচিত চর্যাপদসকল প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। পরবর্তীকালে এই সহজযান ও তান্ত্রিক সাধনা অন্যান্য প্রচলিত লৌকিক ধর্মমতের সহিত হাতে হাত মিলাইয়া বৌদ্ধধর্মকে এক বীভৎসতার মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিক ধ্বংসের পথে নামাইয়া আনিল এবং তাহার ফলে নূতন নূতন সম্প্রদায় যথা, কৌল, নাথপন্থী, অবধূত, বাউল, সহজিয়া ইত্যাদির সৃষ্টি হইল। সেকারণ দৃঢ়তার সহিত বলা চলে যে, বাঙ্গলা দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম বিনষ্ট হয় নাই—কালের স্রোতে রূপ পরিবর্তন করিয়া আত্মগোপন করিল মাত্র।

মধ্যযুগীয় ভারত শিল্পের বিভিন্ন প্রাদেশিক প্রকাশের মধ্যে বঙ্গ ও মগধের পালরাজাদের রাজত্বকালীন শিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহার অপর নাম গৌড়ের পাল শিল্প। ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈন এই ত্রিবিধ ধর্মের দেবদেবীর বিভিন্ন ও অসংখ্য প্রকাশ পালশিল্পে দেখা যায়।

গুপ্তযুগ হইতে ভারতের মূর্তিসমূহে যে আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ চেষ্টা চলিয়া আসিতেছিল, এ যুগে বাঙ্গলার শিল্পে সেই সর্বভারতীয় স্রোতের এক অভিনব বিবর্তন চোখে পড়ে। শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে ও রাজনীতিতে সুপ্রাচীনকাল হইতে পূর্বভারত তাহার স্বকীয়তা বজায় রাখিয়াছে। পালযুগের শিল্পে ও অন্যান্য চারুকলায় সেই নিজস্বতা ও বৈশিষ্ট্য বিশেষ লক্ষ্য করিবার। বাঙ্গালী শিল্পী ও ধর্মসেবকগণ যোগাসনে উপবিষ্ট ধ্যানমগ্ন অমানবীয় ভাবময় দেবদেবীর মূর্তি আরাধনা অপেক্ষা মানবীয় ভঙ্গিতে ও ভাবে গঠিত মূর্তি পূজায় অধিকতর আগ্রহ-শীল। এ যুগের প্রাপ্ত অসংখ্য দেবদেবীর

অষ্টাদশ শতকের বিষ্ণুপুরের রাস (টেরাকোটা)

মূর্তির মধ্যে উক্ত মানবীয় ভাব প্রকাশচেষ্টা সবিশেষ পরিস্ফুট। স্ত্রী মূর্তিগুলিতে যুবতী নারীর ন্যায় গুরুনিতম্ব, ক্ষীণকটি ও সম্পূর্ণ মাংসল স্তনযুগল এবং দেব-মূর্তিতে বৃষস্কন্ধ, কপাটবক্ষ ও পৌরুষ পরিচায়ক সুগঠিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষ-ভাবে লক্ষ্যণীয়।

এ যুগে ধর্মগ্রন্থাদিতে লিখিত দেবদেবীর ধ্যানানুযায়ী শিল্পীকে মূর্তি নির্মাণ করিতে হইত। এই কঠিন বাঁধাধরা

পালযুগের তারামূর্তি

শাস্ত্রানুশাসনের মধ্যে শিল্পীর স্বাধীন সত্তা প্রকাশ করিবার সুযোগ কোথায়? কিন্তু এই নাগপাশের বাঁধনসত্ত্বেও পাল-শিল্পীরা যে অপূর্ব কলানৈপুণ্য ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ও রুচিবোধের পরিচয় দিয়াছেন —তাহা অসীম কৃতিত্ব ও নৈপুণ্যের পরিচায়ক।

পাল ও সেনযুগে প্রাপ্ত মূর্তির মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর (নটরাজ, উমামহেশ্বর, কল্যাণসুন্দর, অর্ধনারীশ্বর, লিঙ্গ), শক্তি (দুর্গা, সপ্তমাতৃকা, চামুণ্ডা, মহিষমর্দিনী, মহালক্ষ্মী), সূর্য ও নবগ্রহ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ দেবদেবীর; ধ্যানীবুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী, তারা, জম্ভল, হেরুক, হেবজ্র ও শক্তি প্রভৃতি বৌদ্ধ দেবদেবীর ও জৈন তীর্থঙ্করদিগের প্রস্তর ও ধাতু নির্মিত প্রতিমাই অধিক উল্লেখযোগ্য। এই সকল মূর্তি অধিকাংশই কাল কষ্ঠি পাথরের এবং বাঙলা-বিহার সীমান্তস্থিত রাজমহল পাহাড় হইতে এই সকল প্রস্তর আনা হইত।

প্রস্তর মূর্তি নির্মাণ অধিকতর ব্যয়সাধ্য হওয়ার জন্য সাধারণ লোকের মধ্যে মৃৎশিল্পের বহুল প্রচলন ছিল। পাহাড়পুর ও ময়নামতী হইতে আবিষ্কৃত মৃৎশিল্পের নিদর্শনসমূহ প্রাচীন বাঙলার সুন্দর ও সহজ প্রতিচ্ছবি। মৃৎশিল্পের ধারা আজিও বাঙলার গ্রামে গ্রামে সাধারণের তুষ্টিসাধনার্থ জীবিত কিন্তু অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্থ। নালন্দায় ও অন্যান্য স্থানে ধাতুচর্চার প্রাথর্যের ফলে জড় ধাতুপিণ্ডে (স্বর্ণ, রৌপ্য ও অষ্টধাতু) যে সকল সুন্দর ও নিখুঁত দেবদেবীর কমনীয় মূর্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পণ্ডিতপ্রবর ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় মহাশয় পালযুগের চারিশত বৎসরের শিল্প-বিবর্তনের মধ্যে যেভাবে স্তরবিন্যাস করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ—"১০ম শতকে বাঙলা প্রতিমা শিল্পের সুবর্ণযুগ। ৮ম শতকে প্রতিমাশৈলী কেন্দ্রবিচ্যুত, কর্দমশিথিল, কিন্তু তাহাকে রেখার সীমানায় বাঁধিবার একটা চেষ্টা প্রত্যক্ষ। ১০ম শতকে কেন্দ্রচেতনায় সমগ্র দৃষ্টি জাগ্রত, শিথিল মাংসল দেহে শক্তির আবির্ভাব, চারিত্রিক দৃঢ়তা ব্যঞ্জিত। ১১শ শতকে দৃঢ় শক্তিগর্ভ দেহে লাগিল স্পর্শ, কিছু সৌষ্ঠবের চেতনা। দেহরূপের ক্ষীণতার দিকেও প্রবণতা গেল বাড়িয়া।" এই দেহরূপের ক্ষীণতা ও অধিকতর আলঙ্কারিক পরিবেশ সেনযুগের শিল্পে প্রকটভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

ধীমান, বীতপাল, শূলপাণি, শিল্পী কর্ণভদ্র, তথাগতসার, শশিদেব প্রভৃতি এ যুগের সামান্য কয়েকজন খ্যাতনামা শিল্পীর নাম জানা যায়। ধীমান ও তাঁহার পুত্র বীতপাল ভাস্কর্যে ও চিত্রকলায় পূর্ব ভারতে এক বিভিন্ন শিল্পরীতির প্রবর্তন করেন এবং নেপাল, তিব্বত ও ব্রহ্মদেশের শিল্পে ইহার প্রভাব সুস্পষ্ট। রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, কলিকাতাস্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ প্রত্নশালা ও আমেরিকার বোস্টন যাদুঘরে পাল ও সেন যুগের বিশিষ্ট নিদর্শনসমূহ রক্ষিত আছে।

ইলোরার আট শতকের প্রাচীর চিত্রের পর আমরা অজন্তাধারার ছায়ায় অঙ্কিত চিত্রের নমুনা পাই ৮—১২ শতকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গ ও মগধের পালরাজদের আমলে অঙ্কিত বৌদ্ধ পুঁথির চিত্রশিল্প। ইহারা অধিকাংশ তালপাতার পুঁথির উপর অঙ্কিত। পালরাজদের রাজ্যাঙ্ক তারিখ সমেত যে সকল পুঁথিপত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে রামপালের রাজত্বের ৩৯শ বর্ষে ও হরিবর্মার ১৯শ বর্ষে লিখিত অষ্ট সাহস্রিকা ও হরিবর্মার ৮ম বর্ষের পঞ্চ-

বানগড়ে আবিষ্কৃত প্রস্তরনির্মিত চৌকাট

বিংশতি সাহস্রিকা প্রাজ্ঞপারমিতার পুঁথি উল্লেখযোগ্য। ইহাদিগের মধ্যে প্রথমোক্ত পুঁথিখানিতে অঙ্কিত চিত্র বাঙলার চিত্র-শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রেখা চিত্রের উৎকর্ষতার প্রমাণস্বরূপ সুন্দরবনে (২৪ পরগণা) প্রাপ্ত ডোম্মনপালদেবের তাম্রশাসনে অঙ্কিত উৎকীর্ণ বিষ্ণুর চিত্রখানির নাম করা যায়। মুসলমান আক্রমণের পর এদেশের বহু শিল্পী নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করেন; সেকারণ দ্বাদশ শতাব্দীর পর হইতে নেপালের চিত্রশিল্প পালশিল্পের ধারায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া নূতন রূপ ধারণ করে।

ফাহিয়ান, হিঙ-এন-সাং প্রভৃতি চৈনিক লেখকের ভ্রমণকাহিনী হইতে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে বাঙলা দেশে অসংখ্য আকাশচুম্বী মন্দির ও বিহার প্রভৃতি

বিদ্যমান ছিল কিন্তু বর্তমানে অতি সামান্য কয়েকটি ছাড়া অধিকাংশই প্রকৃতি, কাল ও বিধর্মীর কবলে পড়িয়া ধ্বংসীভূত।

এদেশে প্রস্তর নির্মিত মন্দির নির্মাণ ব্যয়সাধ্য সেকারণ অধিকাংশ মন্দিরই ইষ্টক নির্মিত। তবে প্রস্তর-মন্দির আদৌ যে নাই তাহা নহে। বাঙলা দেশের পশ্চিম প্রান্তীয় জেলাসমূহে (যথা বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম) কিছু কিছু প্রস্তর নির্মিত মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়। এ যুগের মূর্তির ও চিত্রের গাত্রে খোদিত ও অঙ্কিত চিত্র হইতে মন্দিরের নানাবিধ আকারের ও প্রকারের সন্ধান পাওয়া যায়। তাহাদিগের মধ্যে উত্তর ভারতীয় শিখর, উড়িষ্যার পীঢ় দেউল ও রথের আকারে গঠিত তিন, পাঁচ বা ততোধিক চূড়াযুক্ত মন্দিরই অধিক। ইহা ব্যতীত নানাপ্রকার প্রস্তর ও কাষ্ঠ-নির্মিত স্তম্ভেরও সন্ধান পাওয়া যায় (যথা দিনাজপুরের কৈবর্ত স্তম্ভ, গরুড় স্তম্ভ। ইত্যাদি)। মন্দিরগুলির মধ্যে বর্ধমানের বরাকর, ইছাই ঘোষের দেউল, ২৪ পরগণা সুন্দরবনের জটার দেউল প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত সর্বতোভদ্র ধরণের মন্দিরের ছাপ বহির্ভারতের পাগান, লোয়াজোংরা প্রভৃতি স্থানে পাওয়া গিয়াছে।

পরবর্তী যুগে প্রাচীন ধারার অনুসরণে দুইদিক ঢালু চালাঘরের আকারে বাঙলা দেশের সর্বত্র অসংখ্য ইষ্টক নির্মিত মন্দির গড়িয়া উঠে। এই সকল মন্দিরের সূক্ষ্ম, অপূর্ব কারুকার্য ও বিভিন্ন আকারের পার্থক্য বিচার সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণার প্রয়োজন।

সমাপ্ত

সাহিত্য প্রসঙ্গ

শাক্ত পদাবলী

শ্রীসত্যজিৎ চৌধুরী

পৃথিবীর সব প্রাচীন সাহিত্যেই যুক্ত ছিল ধর্ম; বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক (কদর্থে নয়) ধর্মের সঙ্গে। গ্রীক সাহিত্যের প্রাচীন রূপের পরিচয় সন্ধান করতে গিয়ে দেখি—গ্রীক নাটক ছিল ধর্ম অনুষ্ঠানের অঙ্গবিশেষ এবং ধর্মের আওতায় নাটক এবং সাহিত্য পরিপুষ্টি লাভ করেছে। আমাদের সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন যা পাওয়া গেছে, সেই বৌদ্ধ-গানও দোঁহা', তার বিষয়বস্তু একান্ত করেই ধর্ম সম্প্রদায় বিশেষের। বাঙলাদেশে সাহিত্য আত্মনির্ভরতা লাভ করেছে অনেক অর্বাচীন-কালে। 'শাক্ত-পদাবলী'র নাম থেকেই অনুমিত হচ্ছে এ সাহিত্য শক্তি সাধক সম্প্রদায়ের সাধক কবিদেরই সৃষ্টি এবং এর উদ্দেশ্য প্রধানত ধর্মমত প্রচার হওয়াই স্বাভাবিক। যে সমস্ত শাক্ত-পদ পাওয়া গেছে, তার অধিকাংশই ধর্মের নীরস তত্ত্ব ব্যাখ্যান মাত্র, রূপক অলঙ্কারের সাহায্যে তাকে সরস করতে গিয়ে অপটু স্রষ্টা তাকে দুর্বোধ্যই করে তুলেছেন। কিন্তু শাক্ত-পদাবলীর মূলে যে দুরূহ তত্ত্বই থাক, তার অভিব্যক্তি হয়েছে বাঙালীর এক সহজ হৃদয়বৃত্তির পথে।

বাঙলাদেশের লৌকিক সাধনার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। বাঙালী দেবতাকে কখনও দূরে বসিয়ে পাদ্যঅর্ঘ্য জোগায় নি। দেবতাকে সে পেতে চেয়েছে মানব সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহজভাবে। বাঙালী সাধন প্রকৃতিতে সহজিয়া, তার প্রকৃতি বাউলের প্রকৃতি। শাক্ত-সাধনা শক্তিরই আরাধনা। কিন্তু শাক্ত-বাঙালী শক্তিরূপাকে দেবীর আসনে বসিয়ে রাখে নি, রেখে তৃপ্তি পায় নি। দেবীর সঙ্গে তার মাতা-পুত্রের সম্পর্ক—স্নেহের সম্বন্ধ। অনুষ্ঠানের দিক থেকে তন্ত্র-সাধনার ভয়াবহ দুরূহতার অখ্যাতি আছে, কিন্তু বাঙালীর জীবনক্ষেত্রে সেই সাধনা এক সহজ রূপ গ্রহণ করেছে। শাক্ত-কবি সেখানেই সার্থক, যেখানে দেবীর সঙ্গে মানব সম্পর্কে যুক্ত হয়ে মনের আকুতি প্রাণের নিরাবিল সহজ ভাষায় জানাতে সক্ষম হয়েছেন। পরম তৃপ্তির সঙ্গে বাঙালী শক্তিস্বরূপিণীকে মা বলে ডেকেছে, কন্যা বলে স্নেহ করেছে। শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেনের ভাষায় "প্রেম মাত্র সম্বল করে বাঙলা-দেশকে ধন্য করতে গিয়ে দেবী এখানে শুধু মা হয়ে তৃপ্ত হন নি, তিনি প্রণয়িনী হয়েও বাঙলাদেশকে ধন্য করে গেছেন। সাধক দ্বিজদেব তাঁকে পেলেন কন্যারূপে, রাঘবানন্দ পেলেন পত্নীরূপে।"

বৈষ্ণব-সাহিত্যে বাঙলার ভাবলোকের কথা, কিন্তু শাক্ত-পদাবলীতে বাঙালী কবি প্রতিফলিত করেছেন বাঙলার দৈনন্দিন সংসার যাত্রার ছোটখাট সুখ-দুঃখকেই। দেবীকে বাঙালী কন্যারূপে গৃহে আহ্বান করেছে আগমনী গানে। আগমনী গানে সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে সাধারণ বাঙালীর সংসারের চিত্র, তাদের সমাজজীবনের সহজাত সংস্কার। জামাতার দারিদ্র্যকে উপলক্ষ্য করে কন্যার দুঃখের প্রতি সমব্যথী মাতৃহৃদয়ের আকুল সমবেদনা আগমনী সংগীতের বাৎসল্যরসকে নিবিড় করে তুলেছে। বাঙলার লোকসাহিত্যের অধিকাংশের সঙ্গেই আজ আমাদের পরিচয় ছাপার অক্ষরের মাধ্যমে। সংগীতের প্রাণস্বরূপ যে সুর, সেই সুরকে বাদ দিয়ে সংগীতের কঙ্কালস্বরূপ কথা ক'টি নিয়েই আজ আমাদের কারবার। সুরবিবর্জিত কথাগুলির মূল্য বিচার, তাই কখনও সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু কাব্য হিসাবেও এ পদাবলীর মূল্য নগণ্য নয়। অনেক দোষ-ত্রুটি আছে স্বীকার করি, শব্দ-চয়নে অনেক সময় অমার্জিত মনের পরিচয় রীতিমতোই বেদনাদায়ক; কিন্তু তারও মাঝে এমন দু-একজন কবি আছেন, যাঁদের পদরচনা সত্যিই সার্থক, আজকার আধুনিক মানদণ্ডের বিচারেও তাদের পদ উৎরে যেতে পারে।

শাক্ত-পদাবলীর চেয়ে বৈষ্ণব-পদাবলী—বিশুদ্ধ সাহিত্যিক বিচারে অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বৈষ্ণব-পদাবলী সৃষ্টি হয়েছিল অন্য পরিপ্রেক্ষিতে। বাঙলার সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক ছিল এক সময়ে এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়, তাদের মাঝে শিক্ষার প্রসার ছিল, মন ছিল তাদের মার্জিত। অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ পদকর্তাদের পদেই সেই মার্জিতমনা বৈদগ্ধ্যের পরিচয় সুস্পষ্ট। কিন্তু শাক্ত-পদাবলীর জন্ম সমাজের নীচু স্তরে। সাধারণত অশিক্ষিত গ্রাম্য-কবিরই সৃষ্টি এ সাহিত্য। তাই বৈষ্ণব পদাবলীতে ভাবের যে উৎকর্ষ এবং বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়, শাক্ত-কবির কাছে তা

প্রত্যাশা করা অবান্তর। বাঙালীর সহজ হৃদয়বৃত্তির পরেই শাক্ত-কবির নির্ভরতা। ছোট ছোট সুখ-দুঃখে ভরা বাঙলার যে সংসার জীবন তারই প্রতিফলন শাক্ত-পদাবলীতে। শাক্ত-কবি, কল্পনায় কালিন্দী জলকল্লোল-মুখরিত বৃন্দাবনের নীপনিকুঞ্জের রোমাণ্টিক পরিবেশে বিচরণ করেন নি, প্রাত্যহিক পরিবেশে সাংসারিক জীবনের ঘটনাবলী তার হৃদয়ে যে ছোট সুখ-দুঃখের তরঙ্গ তুলেছে, তাকেই শিব-সতী, গিরিরাজ মেনকারাণীর জবানীতে প্রকাশ করেছেন, কখনো বা কবি নিজেই বলেছেন, তাঁর অভিযোগ অনুযোগের কথা সহজ গ্রাম্য ভাষায় গ্রাম্য উপমা প্রয়োগ করে।

সমস্ত শাক্ত-পদাবলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ অংশ এর আগমনী ও বিজয়ার গানগুলি। এখানেই কবি তাঁর নিজ হৃদয়ের। বেদনা বিমণ্ডিত করে সাধনার অঙ্গস্বরূপ যে সংগীত, তাকে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করতে পেরেছেন। মানবহৃদয়ের স্পর্শ এই গানগুলিকে সাহিত্যের মর্যাদা দিয়েছে। গানের মাঝ দিয়ে বাঙালীর হৃদয়কে যেন এখানে স্পর্শ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"হর-গৌরীর কথা আমাদের ঘরের কথা। সেই হর-গৌরীর কথায় আমাদের বাঙলাদেশের একটা বড় মর্মের কথা আছে।" নাবালিকা কন্যাকে অযোগ্য স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে বাঙালী মায়ের হৃদয়ে যে ব্যথা বাজে, অন্য দেশের কেউ তা বুঝবে না। প্রতিদিন এ ব্যথা বাঙলার ঘরে ঘরে নূতন হয়ে বাজছে—নূতন করে সেই বেদনায় বাঙলার মাতৃহৃদয় স্পন্দিত হচ্ছে। সেই অব্যক্ত, নিদারুণ বেদনাই আগমনী বিজয়া সংগীতের মাঝ দিয়ে অভিব্যক্ত হতে পেরেছিল। বাঙালীর মর্মের কথা বলেই বাঙালী এ গানকে জীবনের সঙ্গী করে নিয়েছে, শুধু সাধন পদরূপেই দেখে নি। বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে আজও এ গান সমাদৃত।

আগমনী বিজয়া ভিন্ন আর যে শাক্ত-পদ আছে, সে সমস্ত পদে সাধনার কথাই প্রধান। অনেক পদের রূপকের জালাবরণ থেকে অর্থ বুঝে নেওয়া প্রায় অসাধ্য। কিন্তু প্রসাদ গুণসম্পন্ন পদও ছড়িয়ে আছে ইতস্তত।

এ ধরণের গান রচনা সম্ভবত প্রথমে রামপ্রসাদই করেছেন। রামপ্রসাদ প্রথমে কবি-জীবন শুরু করেছিলেন। প্রথা অনুসারে মঙ্গল-কাব্য রচনায়, কিন্তু কল্পনা তার গীতিধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রসাদী-সংগীত সৃষ্টি করল। বাঙলা সাহিত্যে ধর্ম-সংগীতের এক নব-পর্যায়ের সূচনা হল এই শক্তিমান সাধকের দিব্য কবি-কল্পনার স্পর্শে। ভক্ত সাধকের অন্তরে যে প্রসুপ্ত কবি ছিল, মাতৃমন্ত্রে হ'ল তার উদ্বোধন। রামপ্রসাদ বাঙালীর এক সহজ সার্বজনীন ভাবের মধ্যেই আবিষ্কার করলেন শাশ্বতী সত্যের স্বরূপ। সাধক-জীবনে আর পারিবারিক জীবনের ভেদ রেখা ঘুচে গেল তার কাছে। মাতা-পুত্রের স্নেহ-সম্পর্ক—এরই মধ্যে রয়েছে জীবন-রহস্যের চরম এবং পরম কথাটি। সাধক জীবনের গভীর তত্ত্ব—অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা প্রকাশ করলেন রামপ্রসাদ বাঙালীর অতিপরিচিত এই হৃদয়-ধর্মেরই সহায়তায়। বাৎসল্যরস নূতনরূপে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল এই সাধক-কবির রচনায়। রামপ্রসাদ যে পথ প্রদর্শন করলেন—তার উত্তরসূরী অনেকে সেই পথে এগিয়ে গেছেন এবং শাক্ত-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁদের সবারই উপরে রামপ্রসাদের প্রভাব গভীরভাবেই পড়েছে। মায়ের কাছে সন্তানের প্রাণের আকুতি এ গানের প্রায় সর্বত্রই প্রকাশিত। কোথাও তীব্র অভিমান, কোথাও কবির উচ্ছ্বসিত কান্না, কখনও বা জীবনে মাতৃস্বরূপাকে না পেয়ে নিজেকেই ধিক্কার দিয়েছেন কবি। ভক্তকবির সহজ আত্মনিবেদনও উপভোগ্য—

> মানা করি নির্বাণে আশ,
> না চাহি স্বর্গাদি বাস,
> নিরখি চরণ দুটি হৃদয়ে রাখিয়ে॥
> (কমলাকান্ত)

শাক্ত কবিরা রূপকের ধূম্রাবরণ ত্যাগ করে যখন সহজ ভাষায় অন্তরের ভক্তি নিবেদন করেছেন,—অভিমান জ্ঞাপন করেছেন, তখনই উপভোগ্য হয়ে উঠেছে পদগুলি। মুক্তির পথ-নির্দেশ পাননি বলে শাক্ত কবির অভিমানের আর অন্ত নেই। কোথাওবা সমস্ত কিছুর জন্যেই দায়ী করেছেন এ'রা দেবীকে —কারণ তিনিই তো জগতের কারণ স্বরূপা। ভক্তের প্রতি এতটুকু করুণা প্রকাশেও যেন তার কৃপণতা—
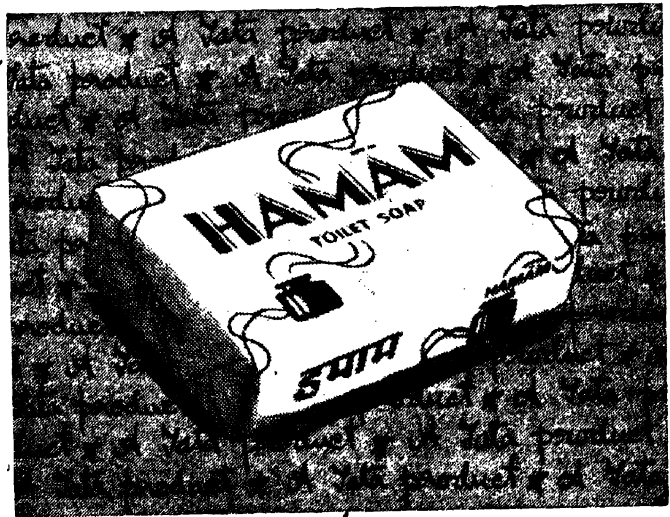
"প্রকাশিয়া ভূমণ্ডলে কারে কি দিয়েছ বলো
দেবার মধ্যে মায়াজালে বন্ধ করে দাও যাতনা।
প্রেমিক বলে—ও মা কালী—
অনেক দুঃখে এসব বলি
টাকাকড়ি চাইনা কালী—
দেখা দিতে তাও পারো না।"

এখানে কবি ধর্মতত্ত্বের জটিল গ্রন্থি উন্মোচন করতে বসেন নি,—যুক্তিনিষ্ঠ দার্শনিকের রচনা নয়, এ কাব্য বুদ্ধির পরম প্রাখর্য কিম্বা যুক্তির চমক এর কোথাও নেই। সাধক কবির সহজ হৃদয়ে নিবিড়ভাবে, গভীর হয়ে যে সত্য ধরা দিয়েছে তার সঙ্গীতে রয়েছে সেই সত্যানুভূতিরই অনুরণনা। গভীর মনের সহজ সত্যজ্ঞান সুর-তরঙ্গে লীলায়িত হয়ে উঠেছে। সাধনমার্গের ক্রমোন্নতির পথে বিভিন্ন বিচিত্র অনুভূতি সাধককে বিস্মিত, মুগ্ধ এবং উৎকণ্ঠিত করেছে। সেই নিত্যনব অভিজ্ঞতার অভিবিকাশ দেখতে পাই এই ধর্মসঙ্গীতে। এর মাঝে কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায় নিষ্ঠার উগ্রতা নাই—প্রচারকের মনোবৃত্তিজনিত নয় এ কবিতা। ঐশীশক্তির সহজ দান কবি পূর্ণ করে নিয়েছেন তাঁর প্রাণপাত্রে, ভেদাভেদ দৃষ্টি হয়েছে লুপ্ত—প্রাণের আনন্দে মিথ্যা গোঁড়ামির প্রাচীর ভেঙ্গে কবি কালী আর কৃষ্ণকে একাকার করে ফেলেছেন। তার উচ্ছ্বসিত সঙ্গীতধারার উৎস এক দিব্য চেতনা, দিব্য উন্মাদনা। পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালবর্তী অনিত্যবস্তুর আবরণে আবৃত নিত্য শাশ্বত সত্যের উপলব্ধির আনন্দই কবি হৃদয়ের সঙ্গীতস্রোতকে এমন অবারিত করে দিতে পেরেছে। কৃত্রিমতার স্পর্শলেশ-শূন্য সাধকের এই স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্গীত অকৃত্রিম ভক্ত হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি। শাক্তসঙ্গীত তাই এত আকর্ষণীয়,—মনোহারী। এই অকৃত্রিমতাই আমাদের মনে সহজে ভক্তিরস সঞ্চার করতে সক্ষম হয়। মানবিক সম্পর্কের অবতারণা কল্পনাকে উদ্বোধিত করেছে, সাধকজীবনে এনেছে রূপ রসের স্পর্শ। হৃদয়ের বর্ণালিম্পন সাধনাকে করে তুলেছে সহজ সুন্দর। রামপ্রসাদের উত্তরসাধকেরা তাঁর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বুদ্ধি নয়, হৃদয়ের আলোকেই সত্যকে উপলব্ধি করতে শিখেছেন। রামপ্রসাদের রচনা—জীবননিরপেক্ষ ধর্মের নীরস উপদেশ নয়, সাধক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, সুখ দুঃখ মিশে গেছে, একটি সজীব মানুষকেই যেন স্পর্শ করতে পারি গানের মাঝে। এই জীবনের স্পর্শ, রসের স্পর্শই শাক্ত-সাহিত্যকে একান্ত জনপ্রিয় করে তুলেছে।

শাক্ত পদাবলীর প্রায় সমস্ত পদেই একটা তীব্র নৈরাশ্যের ভাব আছে। ভোগ বাসনা কবিমনে সদা জাগ্রত রয়েছে। অতৃপ্ত বাসনার জন্যে একটা বুকভাঙ্গা কান্না যেন বার বার গুমরে গুমরে উঠেছে পদাবলীতে। শুধু ভোগবাসনাই নয় জীবনে আরাধ্যার স্বরূপ উপলব্ধি ঘটেনি, মায়ের করুণা লাভ হল না—এ বেদনাও মিশে আছে সেই বেদনার সঙ্গে। সব মিলে পৃথিবীর দুঃখের রূপটাই কবির কাছে বড় হয়ে উঠেছে। এই পৃথিবীকে আনন্দস্বরূপ বলে স্বীকার করতে পারেননি শাক্ত কবি, তাই পৃথিবীকে উত্তীর্ণ হয়ে যাবার বাসনা তার উগ্র। কিন্তু এত নিরাশা, এত দুঃখ—এরও মাঝে একটি ভরসাস্থল আছে কবির। সমস্ত সুখদুঃখের কারণস্বরূপা যিনি তাঁর চরণাশ্রিত হয়ে জীবনের পরম অর্থ খুঁজে পাবেন, এ ভরসা কবির আছে। তাই ব্রহ্মময়ীর চরণপদ্মে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে জীবনসাধনা করে গেছেন এই সাধক কবিকুল।

বাঙলার অসংখ্য পল্লীগ্রামের জীবনে লোকসাহিত্যের এই বিশেষ ধারাটি দীর্ঘদিন ধরে প্রবাহিত হয়েছে এবং বাঙ্গালী জীবনের সুখ দুঃখের গাঁথা রচনাকালে এই শাক্ত কবিসম্প্রদায় পল্লীজীবনে রসের জোগান দিয়েছেন। বিশ্বসাহিত্যের মণিকুট্টিমে শাক্ত পদাবলীর স্থান হবে না জানি, বিশুদ্ধ সাহিত্যের মানদণ্ডের বিচারে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত সমাদর পাবেন না, কিন্তু বাঙ্গালীর হৃদয়মন্দিরে এদের স্থান অক্ষয় হয়ে আছে।

কঁঠালপোতার বাড়ী

শ্রীসরলাবালা সরকার

গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরে কাঁঠালপোতা নামক পল্লী আমার জন্মস্থান।

কাঁঠালপোতার বাড়ি আমার জ্যাঠা-মহাশয়ের বাড়ি। জ্যাঠামহাশয় নদীয়ার ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন, আর কাঁঠাল-পোতাতেই বাড়ি করিয়া সেখানে বাস করিয়াছিলেন।

তখনকার দিনের একান্নবর্তী পরিবার; ভাইয়েরা কার্যগতিকে নানাস্থানে বাস করিতেন বটে, কিন্তু আলাদা বলিয়া কিছু ছিল না। আমার ঠাকুরমা ও পিসিমা অনেক সময় কাঁঠালপোতাতে থাকিতেন, মা ও ছোট খুড়িমা উভয়েই মাঝে মাঝে সেখানে থাকিতেন।

জ্যাঠামহাশয়ের বাড়িটিতে জায়গা খুব বেশী ছিল বটে, কিন্তু ঘরদুয়ার তত বেশী ছিল না। বাহিরের প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড। ফটক দিয়া ভিতরে কম্পাউণ্ডে ঢুকিলেই প্রথমে চোখে পড়িত, একটি চেঁচাড়ি দিয়া গোল করিয়া ঘেরা জায়গায় এক ফুলের বাগান। বেল, যুঁই, নানা জাতির গোলাপ, পাতাবাহারের গাছ ও মরসুমী ফুলে বাগানটি জম্ জম্ করিত। লতানো একটি সাদা গোলাপের গাছ বেড়াটির চারিধারে ঘিরিয়া সব ঋতুতেই অজস্র ফুল ফুটাইত। জ্যাঠামহাশয় কাঁচি হাতে নিয়া নিজে এই ফুলবাগানের তত্ত্বাবধান করিতেন।

ইহার পর কম্পাউণ্ডের দক্ষিণ দিকে এক অতি প্রকাণ্ড আটচালা ঘর। এই ঘরে বহু-লোকের আস্তানা ছিল। আত্মীয়, কুটুম্ব, কর্মচারিগণ, পরিচিত ও অপরিচিত, স্বগ্রামস্থ ও বিদেশাগত কত লোকই যে এই আটচালার স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন তাহার সংখ্যা গণিয়া বলা দুরূহ ব্যাপার। আমি ছোটবেলায় দেখিয়াছি সেই আটচালায় দাবাখেলার আড্ডার কি সমারোহ! আবার ঘরে ঘরে দশ পঁচিশ খেলার ছক আঁকাও ছিল।

—আটচালার একটু দূরে বাহির মহলের রান্নাঘর ও চাকরদের থাকিবার কয়েকখানি ঘর। একজন পশ্চিমা ব্রাহ্মণ রন্ধনকার্যের জন্য ছিল, তাহাকে সকলে তেওয়ারী বলিত। রান্না হইত ডাল, ভাত ও একটি তরকারী, কখনও ভাজাভুজিও হইত। বাহিরের সকলেরই খাইবার ব্যবস্থা ছিল এই রান্না ঘরে। এক একবার একসারি কুশাসন ও কলাপাতা পড়িত, তেওয়ারী পরিবেশন করিত, চাকরেরা সকলের নিজের নিজের গ্লাসে জল দিয়া যাইত। এক সারির খাওয়া হইয়া গেলে স্থান পরিষ্কার করিয়া আবার আর এক সারির জন্য জায়গা করিতে হইত। ইহার পর তেওয়ারী প্রকাণ্ড দুটি পিতলের গামলায় ডাল ও ভাত এবং একটি বড় থালায় তরকারী নিয়া দেউড়ী পার হইয়া বাড়ির ভিতরের কাছাকাছি একটি উঠানে দাঁড়াইয়া 'বিশু ঝি, বিশু ঝি' বলিয়া হাঁক দিত। এই উঠানে লিচুগাছ ছিল বলিয়া উঠানটির নাম ছিল লিচুতলার উঠান। জ্যাঠামহাশয় অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিলেন এবং তিনি অবরোধ প্রথাকে বিশেষভাবে মর্যাদা দিতেন, তাই সেকালে তাঁহার কাঁঠাল-পোতার বাড়িতে কোন চাকর বা ব্রাহ্মণ পাচকের বাড়ির ভিতর যাইবার হুকুম ছিল না। এমন কি তিনি নিজেও যখন বাহির হইতে বাড়ির ভিতর যাইতেন তখন 'বুড়ি! বুড়ি! আমি আস্‌ছি, আস্‌ছি' বলিয়া সাড়া দিতে দিতে অগ্রসর হইতেন, পাছে সহসা তাঁহার কোন কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়ে। অবশ্য ইহার পরে তিনি যখন ঢেঙ্কানল স্টেটে ইঞ্জিনীয়ার হইয়া উড়িষ্যা দেশে যান, তখন অবশ্য এ ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল।

দেউড়ীর ঘর ছিল বাহিরের কম্পাউণ্ডের উত্তর দিকে। পাশাপাশি দুটি ঘর ও তাহার ভিতর একটি ছাদ দিয়া ঢাকা চলন-ঘর বা ভিতরে যাইবার পথ। এই পথ দিয়াই লিচুতলার উঠানে যাইতে হইত।

পাশাপাশি দুটি দেউড়ীর ঘরের একটি জ্যাঠামহাশয়ের অফিস ঘর; সেই ঘরেই তাঁহার পোষাক ও কাপড় প্রভৃতির জন্য একটি কাঠের আলমারী ছিল এবং তাঁহার পড়িবার বই ও নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসও সেই ঘরেই থাকিত।

আর একটি ঘরের একপাশে বাতিদান ও অন্যান্য টুকিটাকি জিনিস থাকিত, অন্য-পাশে একটি সতরঞ্চি বিছাইয়া বসিয়া খলিফাসাহেব সমস্তদিন সেলাই করিতেন।

আমরা তাঁহাকে বলিতাম, 'খলিফা সাহেব' আবার কেহ কেহ ওস্তাগরও বলিত। কিন্তু দেখিতাম যে, তিনি আমাদেরই মত একজন বাঙ্গালী, কথাবার্তাও বলিতেন আমাদেরই মতন, তবুও কেন যে তাঁহাকে 'সাহেব' বলা হইত তাহা ভাবিয়া পাইতাম না। তিনি আমাকে জামার ও কাপড়ের ছাট দিয়া অনেক পুতুলের পোষাক তৈরী করিয়া দিয়াছিলেন। একদিন মহরমের সময় আর একজন পাড়ার মুসলমান আসিয়া তাঁহাকে টানাটানি করিতেছিল মহরমে যোগ দিতে যাইবার জন্য। আমার মনে আছে, সে বার বার বলিতেছিল, 'আমাদের বাপ্‌দাদা চিরকাল যা করে এসেছেন, তা যদি না করি সেটা কি গুণা হবে না!' কিন্তু খলিফা সাহেব বলিলেন, 'না ভাই আমাকে দিয়ে ও হবে না। হিঁদুদের যখন কাফের বলে নাক সিঁটকাও তখন তো ভাব না যে তোমরাও কাফেরের মতই পুতুল পুজো কর মহরমের সময়। তারা না হয় মন্দির গড়ে, তোমরা নাহয় কাগজের তাজিয়া বানাও, এইটুকু কেবল তফাৎ।'

এইসব কথার কিযে মর্ম আমি তখন কিছুই বুঝি নাই, জ্যাঠামহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, 'ওরা আর একদল। ওরা মহরম করা পছন্দ করে না।'

জ্যাঠামহাশয় নিজে কিন্তু মহরমের এক-জন পাণ্ডা ছিলেন, পাড়ার মুসলমানেরা তাঁহার কাছে মোটা টাকা চাঁদা আদায় করিত, আর তিন দিন ধরিয়া দলের পর দল বাহিরের উঠানে খেলা দেখাইতে আসিত। বাড়ির মেয়েরা দেউড়ীঘরে আসিয়া চিক ফেলা জানালার ভিতর দিয়া খেলা দেখিতেন।

বড় উঠানের অর্থাৎ বাহিরের কম্পাউণ্ডের একপাশে একটা আস্তাবলও ছিল, সেখানে কখনও একটি কখনও বা দুইটি ঘোড়া থাকিত আর জ্যোঠামহাশয়ের ফিটান গাড়ীও থাকিত। জ্যাঠামহাশয় নিজেই গাড়ী হাঁকাইয়া আফিসে যাইতেন, সহিস সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া চলিত।

জ্যাঠামহাশয় খুব রাশভারী লোক ছিলেন। এদিকে মিষ্টভাষী ও সদাপ্রসন্ন, কিন্তু আবার যখন রাগিয়া যাইতেন ও গলা

কাঁপাইয়া ধমকের পর ধমক দিতেন তখন কাহার সাধ্য তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়ায়। আমাকে জ্যাঠামহাশয় খুবই ভালবাসিতেন, 'বুড়ি' বলিয়া ডাকিতেন, কখনও বা বলিতেন 'বুড়ি মাইয়া', কিন্তু আমিও তাঁহার রাগের সময় সম্মুখে যাইতে সাহস করিতাম না। তবে একবার প্রাণের দায়ে গিয়াছিলাম। জ্যাঠামহাশয় সেবার তাঁর হান্টার চাবুক দিয়া ঘোড়ার সহিসকে এলোপাথাড়ি চাবকাইতে চাবকাইতে গলা কাঁপাইয়া গর্জন করিতেছিলেন, আর সহিস আর্তনাদ করিতেছিল। বাড়ির সকলেই ভয়ে তটস্থ কাহারও কিছু বলিবার সাহস নাই। আমার তখন মনে হইল সহিস বুঝি মরিয়া গেল। আমি এলোচুলে কাঁদিতে কাঁদিতে 'ও জ্যাঠামশাই, ও জ্যাঠামশাই' বলিয়া ছুটিয়া গিয়া যখন তাঁহার হাত ধরিলাম তখন জ্যাঠামহাশয় চাবুক মারা বন্ধ করিয়া একবার আমার দিকে চাহিলেন, ধমকের সুরে কি যে বলিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমার সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছে মনে হইল বুঝি পড়িয়া যাই। কিন্তু সহিসকে মারা বন্ধ হইয়াছে দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়া বাড়ির ভিতর চলিয়া আসিলাম।

জ্যাঠামহাশয়ের উপর ভয়ানক রাগ হইয়াছে, মনে হইতেছিল তিনি কেন এত নিষ্ঠুর হইলেন। বেচারি সহিস, গরীব মানুষ, তাহাকে এভাবে মারা কি ভয়ানক অন্যায়! কিছুক্ষণ পরে জ্যাঠামহাশয় প্রতিদিনের মত জলখাবার খাইবার জন্য 'বুড়ি, বুড়ি' বলিয়া হাঁক দিতে দিতে যখন বাড়ির ভিতর আসিলেন তখন আমি প্রতিদিনের মত ছুটিয়া গিয়া তাঁহার হাত ধরিলাম না, ঘরের ভিতর লুকাইয়া রহিলাম।

জ্যাঠামহাশয় যখন বার বার ডাকিতে লাগিলেন তখন ঘাড় হেঁট করিয়া তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম, তখনই তিনি আমার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। আমার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'মাইয়ার যে কেঁদে কেঁদে চোখ লাল হয়েছে দেখ্‌ছি। সহিসের উপর খুব মায়া, না? আর বেচারি ঘোড়াটা সে যে না খেতে পেয়ে মর মর হয়েছে, সহিস রোজ তার দানা চুরি করে বিক্রি করে দিচ্ছে তার উপর তো বুড়ি মার একটুও মায়া নেই। সে যে নালিস করতে পারে না, চেঁচাতে পারে না, সেইজন্য সে বাতিল হয়ে গিয়েছে নয় কি? রোজ, খাবার কম করে দিয়ে দিয়ে সহিস যে ঘোড়াটাকে মেরেই ফেল্‌ছিল। আমি দেখি দিনে দিনে তার হাড় সার হয়ে যাচ্ছে, কি হল তার কিছুই বুঝ্‌তে পারি না। শেষে ঘোড়ার ডাক্তারকে দিয়ে দেখালাম, সে বল্‌লে ঘোড়ার কোন অসুখ নয়, না খেয়ে তার এই অবস্থা হয়েছে। তখন খোঁজ নিয়ে জান্‌তে পারলাম দুষ্টু সহিস রোজ ওর দানা বিক্রি করে ওকে সিকি পেটা খাইয়ে রাখ্‌ছে।'

এই কথা বলিতে বলিতে মনে হইল জ্যাঠামহাশয় যেন আবার রাগিয়া যাইতেছেন, তখন আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম সহিস কেন মার খাইয়াছে।

জ্যাঠামহাশয় আয়ব্যয়ের কোন হিসাব রাখিতেন না। প্রতি মাসেই তাঁহার ঋণের পরিমাণ বাড়িয়া যাইত, কিন্তু কিছুতেই খরচ কমাইতে পারিতেন না। আর একটা ব্যাপার এই যে, যাহাদের কাছে তাঁহার ধার তাহারা তাঁহাকে এত ভয় করিত যে, সাহস করিয়া তাগাদা করিতে পারিত না। আমার মনে আছে যে গোয়াড়ির এক কাপড়ের দোকানদার একদিন সকাল বেলায় আসিয়া আটচালার বারান্দায় বসিয়াছিল, দুপুর হইয়া গেল তবু সে সাহস করিয়া জ্যাঠামহাশয়ের সম্মুখে আসিতে পারিল না। অবশেষে যখন 'কাল না হয় আসবো' বলিয়া ফিরিয়া যাইতেছে তখন জ্যাঠামহাশয় নিজেই তাহাকে ডাকিলেন। জ্যাঠামহাশয় দেউড়ির ঘর হইতে লোকটি যে অনেকক্ষণ বসিয়া আছে তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার কাছে সর্দসবাদাই অনেক প্রার্থী আসিত, পারতপক্ষে তিনি কাহাকেও ফিরাইতেন না। এ লোকটিকেও তাহাদেরই একজন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন যে, তাহার নিশ্চয়ই বিশেষ অভাব, কিন্তু সাহস করিয়া কিছু চাহিতে পারিল না তাই এতক্ষণ বসিয়া থাকার পর ফিরিয়া যাইতেছে।

কিন্তু লোকটি যখন হাত কচলাইতে কচলাইতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল তখন তিনি তাহাকে চিনিতে পারিলেন, বলিলেন, 'কাপড়ের দোকানের তাগাদা বুঝি?'

লোকটি বলিল, 'হুজুর, প্রায় ৮।৯ শো টাকা বাকী পড়ে গিয়েছে তাই একবার জানাতে এসেছি।'

এত বাকি শুনিয়া জ্যাঠামহাশয় যেন একটু আশ্চর্য হইলেন। তাঁহার এক সম্পর্কিত আত্মীয় হরিবাবুর উপর হিসাব রাখিবার ভার ছিল। তাঁহাকে ডাকাইয়া যখন 'কাপড়ের দোকানে এত বাকি হইল কেন' জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন হরিবাবু বলিলেন, 'হুজুর, আটচালা ঘরের সব বাসিন্দাই হুজুরের নামে স্লিপ দিয়ে কাপড় আনায়, বরাবরই এইরকম চলে আসছে, তাই আমি এ বিষয়ে আপনাকে কিছু জানাইনি।'

জ্যাঠামহাশয় শুনিয়া হাসিলেন, বলিলেন, 'গেল মাসে আপনার নামে স্লিপে কত কাপড় এসেছে তার হিসাব আছে তো!' হরিবাবু নির্বাক রহিলেন দেখিয়া দোকানদার তাঁহার স্বাক্ষরিত স্লিপটি জ্যাঠামহাশয়ের সম্মুখে মেলিয়া ধরিল। তাহাতে দেখা গেল হরিবাবু সে মাসে একজোড়া সাড়ী ও ছোট ছেলেদের কয়েকটি জামা আনাইয়াছেন।

জ্যাঠামহাশয় হরিবাবুর দিকে একবার মাত্র চাহিলেন, এবং দোকানদারকে বলিলেন, 'এ মাসে সব শোধ হবে না, তবে কিছু দিচ্ছি। আর এর পর থেকে আমার নিজের হাতের সই ছাড়া কোনও কাপড় কি জামা যেন দেওয়া না হয়।'

জ্যাঠামহাশয়ের ধারের কথা সকলের মুখে শুনিয়া শুনিয়া আমি একদিন তাঁহাকে বলিলাম, 'জ্যাঠামহাশয়, আপনার এত ধার হয় কেন?' তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'বেশতো বুড়ি মাইয়া, এবার থেকে তোমার হাতেই মাহিনার টাকা এনে দেব। যা খরচ লাগে তুমিই সব করবে।'

শুনিয়া আমি আর একটিও কথা বলিলাম না। মনে হইল জ্যাঠামহাশয় আমার কাছে যদি সব টাকা দেন তাহা হইলে একদিনেই হয়তো সমস্ত খরচ হইয়া যাইবে, না হয় হারাইয়া যাইবে।

জ্যাঠামহাশয়ের বাড়ির ভিতরের দিকে আরও তিনটি উঠান ছিল, একটির নাম বেলতলার উঠান। এই উঠানের ঠিক মধ্যস্থানে একটি বড় বেলগাছ ছিল। খুব বড় বড় বেল, তাহাতে বিচি থাকিত খুব কম। সেই বেল এত মিষ্ট যে, সরবৎ করিতে হইলে সামান্য মিষ্ট দিলেই চলিত। এই বেলতলার কাছে একটি ছোট দালান ছিল, সারি সারি তিনখানি ঘর, ঘরের সম্মুখে ও পিছনে দুটি রোয়াক। এই তিনটি ঘরের একটি ছিল হবিষ্যান্ন রান্নার ঘর, একটি ভাণ্ডার ও সব শেষেরটি পূজার ঘর। মদনগোপাল রামদিয়ায় আছেন, তাই এখানে একটি ছোট পিতলের মদনগোপাল ও রাধারাণী সিংহাসনে থাকিতেন।

বাড়ির ভিতরেও আর একটি রান্নার জন্য চালাঘর ছিল, সেখানে আমিষ রান্না হইত।

জ্যাঠামহাশয় সারাদিনের মধ্যে বাড়ির ভিতরে আসিতেন মাত্র তিনবার। সকালে জলখাবারের সময়, দ্বিপ্রহরে ভাত খাইবার সময় এবং আর একবার অনেক রাত্রে যখন আসিতেন তখন আমি ঘুমাইয়া পড়িতাম এবং ভোরে কখন যে তিনি বাহির হইয়া যাইতেন তাহাও জানিতে পারিতাম না।

বাড়ির সম্মুখ দিয়া যে রাস্তাটি গিয়াছিল সেই রাস্তার ওপারে ছিল এক মুন্সেফ বাবুর বাড়ি। বাড়িটি তখন একতলা ছিল, (বাড়ির পরবর্তী মালিক তাহার উপর পরে দোতলা তুলিয়াছিলেন) কিন্তু সেই একতলা বাড়ি এত সুন্দর করিয়া সাজানো যে, তাহা চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। বাড়ির সম্মুখে সবুজ ঘাসের লন, বাড়ির পাশে ফুলের বাগান ও বাগানের ভিতর একটি সিঁড়ি বাঁধানো পুকুর। পুকুরের জল অতি পরিস্কার। সমস্ত বাড়িটিই পরিচ্ছন্ন, যেন তক্ তক্ করিতেছে।

বাড়ির মালিক ভগবানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হিন্দুর সন্তান কিন্তু খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। খৃষ্টান হইয়াও তিনি পূর্বের বংশগৌরব ভুলিতে পারেন নাই, অনেক সময় বলিতেন 'আমাদের বংশ কি যে সে বংশ, গুপ্তিপাড়ার চাটুয্যে বংশ। ফুলের মুখুটি, বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান।' তাঁহার অনেকগুলি মেয়ে ছিল ও তিনটি ছেলেও ছিল। বড় দুটি মেয়ে তখন কলিকাতায় বেথুন কলেজে পড়িত। তাহাদের নাম সুশীলা ও সরলা; অন্য মেয়েগুলির নাম যথাক্রমে বিমলা, অমলা, কমলা প্রভৃতি।

সুশীলা, সরলার মা অতি ভালমানুষ, কর্মিষ্ঠা ও সুগৃহিণী ছিলেন। আমাদের বাড়ির সহিত তাঁহার খুবই আত্মীয়তা ছিল, মা, জ্যাঠাইমা ও ছোট খুড়িমাও রাত্রে লুকাইয়া তাঁহাদের বাড়ি যাইতেন। লুকাইয়া যাইতেন এইজন্য যে, জ্যাঠামহাশয়ের বড় ছেলে (আমার বড়দাদা) অল্প বয়সেই ঘোরতর শুদ্ধাচারী হিন্দু হইয়া উঠিয়াছিলেন। বড়দাদার বয়স তখন ১৩।১৪ বৎসরের বেশী নয়, কিন্তু তিনি মাছমাংসের সংস্পর্শের খাদ্যও গ্রহণ করিতেন না, তাই পিসিমার কাছে হবিষ্যঘরে তাঁহার খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তিনি গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত পড়িতেন, বিছানাপত্র অশুচি হইয়াছে বলিয়া মনে হইলে দড়ি বাঁধিয়া বাড়ির ভিতরের পাতকুয়ায় ডুবাইয়া লইতেন, কেননা কাছাকাছি যে সব পুকুর ছিল সেগুলিতে কাপড় কাচা নিষিদ্ধ ছল এবং বাহিরের ইঁদারার জল পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইত সেজন্য ইঁদারাতেও বিছানাপত্র ডুবাইতে পারিতেন না। বড়দাদা পরে এম এ এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই শুদ্ধাচার বরাবরই পূর্ণমাত্রায় না হউক আংশিকভাবে বজায় রাখিয়াছিলেন।

খৃষ্টান পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতা বড়দাদা একেবারেই পছন্দ করিতেন না, তাই এ বাড়ির মেয়েদের কেহ তাঁহার ভয়ে রাত্রি ভিন্ন অন্য সময় ভগবানবাবুর বাড়ি যাইতে সাহস করিতেন না। একদিন ঘটনাক্রমে বড়দাদা জানিতে পারিলেন যে, মা ও জ্যাঠাইমা ভগবানবাবুর বাড়ি গিয়াছেন। ভগবানবাবুর বড় মেয়ে সুশীলার তখন বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে, এক ব্রাহ্মণগৃহের খৃষ্টধর্মাবলম্বী পরিবারের ছেলের সহিত। তাই ভগবানবাবুর স্ত্রী মা ও জ্যাঠাইমাকে সুশীলার পোষাক ও গহনা প্রভৃতি দেখিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

এখানে একটি বিশেষ কথা এই যে, ভগবানবাবু তাঁহার সবগুলি মেয়েকেই খৃষ্টধর্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ পরিবারেই পরে বিবাহ দিয়াছিলেন, অন্য কোন জাতির খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী পরিবারের সহিত কুটুম্বিতা করেন নাই, কেবল তাঁহার ছোট ছেলে যতীশ তাঁহার অমতে এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ভগবানবাবু তখন আরায় বদলী হইয়াছেন ও সাবজজ হইয়াছেন আমার তখন বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং আমার শ্বশুর মহাশয়ও আরায় প্রথম মুন্সেফ হইয়া বদলী হইয়া গিয়াছেন। ভগবানবাবুর সহিত শ্বশুরের আলাপ হইলে তিনি যখনই জানিতে পারিলেন আমি আরায় আছি এবং এখানে আমার শ্বশুরবাড়ি, তখনই তিনি আমাকে তাঁহার বাড়িতে লইয়া যাইতে চাহিলেন এবং দাবী জানাইলেন যে, এক হিসাবে তিনিও আমার জ্যাঠামহাশয় এবং আমি তাঁহাদেরই ঘরের মেয়ে। আমার শ্বশুর তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়া আমাকে তাঁহার বাড়ি পাঠাইয়াছিলেন। আর আমি ইহাতে খুবই খুসী হইয়াছিলাম, কেননা সেকালের বধুরা কাকের মুখেও পিত্রালয়ের বার্তা পাইলে খুসী হইত। আর তাঁহাদের সঙ্গে তো এককালে বিশেষ আত্মীয়তা ছিল এবং ভগবানবাবুর একটি মেয়ে আমারই বয়সী ও আমার বন্ধু ছিল। সেখানে গিয়া নতুন জেঠিমার কাছে আদর পাইয়াছিলাম, অনেক দিনের পর মেয়ে বাপের বাড়ি আসিলে যেমন আন্তরিক আদর পায় ঠিক সেইরকম আদর।

সে বছর অ্যানি বেসান্ত আরায় আসিয়াছিলেন, তাঁহার অনুরক্ত ভক্তগণ তাঁহার নাম দিয়াছিল "আন্না-বাসন্তী দেবী"। তিনি যে সভায় হিন্দুধর্মের মহিমা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন আরার সমস্ত বাঙালী ও অবাঙালীগণ সেই সভায় সমবেত হইয়া ছিলেন। আমার শ্বশুর ও ভগবানবাবু উভয়েই সেই সভায় শ্রোতা ছিলেন। আমার শ্বশুর আসিয়া বলিলেন, ভগবানবাবু নাকি খৃষ্টান মহিলার মুখে হিন্দুধর্মের মহিমা শুনিয়া সভাস্থলেই সগর্জনে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ও আবার মহাহিন্দু হয়ে পড়ল দেখ্‌ছি। যত সব বোগাস্। আমি এর প্রতিবাদ কোর্‌বো।" তিনি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন কিনা এবং যদি করিয়া থাকেন তবে সেই প্রতবাদের মর্মার্থ কি, তাহা আমার জানা নাই। বাস্তবিক, মনস্তত্ত্বের গতি কত যে জটিল তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না।

যাহা হউক, এবার আরা হইতে আবার সেই কাঁঠালপোতার বাড়িতেই ফিরিয়া যাইতেছি।

সে রাত্রে বড়দাদা গেটের কাছে পাহারা দিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার হাতে এক ঘটী গোবরগোলা জল। তখন আটচালা ঘর নিস্তব্ধ, চাকররাও রান্নাঘরের বারান্দায় আত্মগোপন করিয়াছে, কেবল বিশু ঝি দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া মা ও জ্যাঠাইমার অপেক্ষা করিতেছিল এবং বড়দাদাকে নানাভাবে বুঝাইতেছিল। বড়দাদা কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, গোবরজল খাওয়াইয়া শুদ্ধি করিয়া তবে মা ও ফুলখুড়িমাকে ভিতরে যাইতে দিবেন। অগত্যা তাঁহারা যখন আসিলেন তখন নিরুপায় হইয়া ইঁদারার পাড়ে গিয়া বসিলেন এবং গোবরজলের ঘটিটি ধরিয়া আস্তে আস্তে নর্দমায় ঢালিতে ঢালিতে "হোয়্যাক, হোয়্যাক" করিয়া বমি করিবার মত শব্দ করিতে লাগিলেন। তখন বড়দাদা আবার ব্যস্ত হইয়া নিজেই এক ঘটি মুখ ধুইবার জল আনিয়া দিলেন। ঘটনাটি পরে আমি বিশু ঝির মুখে শুনিয়াছি।

যাহা হউক, খুব ঘটা করিয়া সুশীলার বিবাহ হইয়া গেল। এই বিবাহে একটি পদ্য ছাপা হইয়াছিল এবং সেটি গানও করা হইয়াছিল। সেটির প্রথম দিকটা এইরূপঃ—

ক্যান্‌রে সুশী যাচ্ছিস্ চলে
ওরে আমার সুশীরে!
মা বলিয়া ডাক্‌রে সুশী
জুড়ায়ে মায়ের প্রাণ!
এতদিন সযতনে রেখেছিনু প্রাণপণে
বিদায় দিব কেমনে হৃদয় বিদরে রে।
রাখুন যীশু সুশীধনে,
কল্যাণে নিয়ত রে!

এই খৃষ্টান পরিবারের সহিত আমাদের এত আত্মীয়তা হইয়াছিল যে, এখনও তাঁহাদের কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে।

পূজার সময় কৃষ্ণনগরে খুব ঘটা হইত। ঘূর্ণির প্রতিমা নির্মাণকারী কারিকরগণ প্রতিমা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করিতেন। একজন বিশেষ বিচারকও এই প্রতিযোগিতার বিচারের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে বিচারের ভার গ্রহণ করিতেন। রাজবাড়ির দেবী প্রতিমার নাম ছিল রাজরাজেশ্বরী। হীরা মুক্তার গহনা দিয়া তাঁহাকে সাজানো হইত। অন্যান্য প্রতিমা ডাকের সাজে সজ্জিতা হইতেন। ভাসানের দিন আমরা গোয়াড়ি গিয়া এক উকীলবাবুর রাস্তার ধারের বাড়ির ছাদ হইতে ঠাকুর দেখিতাম।

বাড়ির মেয়েরা সকলেই মহাষ্টমীর উপবাস করিতেন। মাঝে মাঝে পূজার অষ্টমীর দিন সন্ধিপূজা মধ্যরাত্রে অথবা তাহার পরেও শেষ হইত। সন্ধিপূজা শেষ হইলে রাজবাড়িতে তোপ পড়িত। তোপের শব্দ শুনিয়া উপবাসকারিনীগণ জলগ্রহণ করিতেন।

শান্তিপুরে রাসের সময় এত ঘটা হইত যে, বহুদূর হইতেও অনেকে রাস দেখিতে শান্তিপুরে যাইতেন। সে সময় আবার চিত্রেশ্বরী প্রতিমারও পূজা হইত। সেই সব প্রতিমা প্রায় দোতলার সমান উঁচু, কাজেই পূজা অন্তে তাঁহাদের আর বিসর্জন দেওয়া হইত না। এই প্রতিমার সম্বন্ধেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পরিষদ রসসাগর "গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর" এই পদটির এইভাবে পূরণ করিয়াছিলেন,—

কৃষ্ণনগর ধাম নগর বাহির,
বারোয়ারী মা ফেটে হইলেন চৌচির।
ক্রমে ক্রমে খড়দড়ি হইল বাহির,
গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর।

আমার কাঁঠালপোতার বাড়ির স্মৃতির সহিত শান্তিপুরের রাসের সঙের সম্বন্ধে তাড়কা রাক্ষসীর মূর্তির কথাই বিশেষ করিয়া জড়িত রহিয়াছে।

বারদোলের মেলাও আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ সেন মহাশয় এই কৃষ্ণনগরে মুন্সেফ ছিলেন তাই তাঁহার রচিত অনেক পুস্তক জ্যাঠামহাশয়ের দেউড়ীর ঘরে পাইয়াছিলাম। আর একখানি বই পাইয়াছিলাম, সেখানির নাম ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত। এখানি কৃষ্ণনগরের রাজবংশের ইতিহাস। রাজবাড়ির নিয়মকানুন সম্বন্ধে লোকের মুখে মুখে কত কি কাহিনী শুনিতাম। যখন শুনিতাম, রাণী যখন নববধূরূপে রাজবাড়িতে প্রবেশ করেন তখন সেই মখমলমণ্ডিত মহাপায়া একেবারে এমনভাবে ছুতার মিস্ত্রি পেরেক দিয়া আঁটিয়া দিত যে, যতক্ষণ না অন্তঃপুরের অংগনে অতিবৃদ্ধ এক ছুতার সেই পেরেক খুলিয়া দিত ততক্ষণ বধূকে একেবারেই অসূর্যম্পশ্যা হইয়া থাকিতে হইত এবং জীবনে তিনি আর রাজবাড়ি ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইতে পারিতেন না, তখন সেই বধূটির জন্য কতই না মমতা ও দুর্ভাবনা হইত।

তখনকার দিনে "বগুলা" নামক এক স্টেশনে গিয়া কৃষ্ণনগর হইতে অন্য স্থানে যাইবার সময় রেলগাড়িতে উঠিতে হইত, এবং আবার অন্য স্থান হইতে আসিবার সময় সেই স্টেশনেই নামিয়া ঘোড়ার গাড়ি করিয়া কৃষ্ণনগরে পৌঁছিতে হইত। কৃষ্ণনগর হইতে বগুলা যদিও অনেকটা দূর, তবু দুই পাশের শিশুগাছের সারি দেওয়া এই পথে আসিতে যাইতে খুব ভাল লাগিত। শীতের সময় মনে হইত, শিশুগাছের ছোট ছোট পাতাগুলি রৌদ্রে গা মেলিয়া দিয়া যেন রোদ পোহাইতেছে। আবার গ্রীষ্মকালে বাতাসে যখন সেই পাতাগুলি দুলিয়া দুলিয়া লাখো লাখো মৌমাছির গুণ্ গুণ্ শব্দের মত এমন এক ঝঙ্কার আর মিষ্টি হাওয়া বহিয়া আনিত যে, চোখে যেন ঘুম আসিয়া যাইত। আর গাছের পাতার আড়ালে কত রকমের কত পাখী, আর কতরকম সুরে তাদের কলকাকলী শোনা যাইত।

দেপাড়া (দেবপল্লী) কৃষ্ণনগর থেকে খুব বেশী দূর নয়। এখানে নৃসিংহদেবের মন্দির আছে আর মন্দিরের কাছে ছিল একটি পুরানো তেঁতুল গাছ। গাছটি এখনও আছে কিনা জানি না। সেই গাছে অসংখ্য দড়ি বা সুতায় বাঁধা ঢিল ঝুলিত। নৃসিংহের নিকট পুত্রকামনা করিয়া পুত্রার্থিনীগণ সেই ঢিল বাঁধিতেন এবং সেই সংগে ভোগ দিবার জন্য সংকল্প করিয়াও আসিতেন। এক মণ দুধের পায়স করিয়া ভোগ দিব বলিয়া কামনা করিলে দুই মণ দুধের ভোগ দিতে হইবে এইরূপ নিয়ম ছিল। সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে ছয় মাসে তাহার অন্নপ্রাসনের সময় এখানে আসিয়া নৃসিংহদেবের ভোগ দিয়া সেই প্রসাদ তাহার মুখে দেওয়া হইত।

আমার জাঠতুতো বোন শৈলবালার অন্নপ্রাসন এই নৃসিংহতলাতে যখন হয় তখনকার কথা মনে আছে। মাঠের মধ্যে বড় বড় তাম্বু খাটানো হইয়াছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উনান কাটা হইয়াছে, বারো মণ দুধের পায়েস ও সেই সংগে লুচি নৃসিংহদেবের ভোগ হইল। আমি সে সময় ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছি, প্রসাদের লুচি ও পায়েস খাইতে পাইব মনে করিয়া যতটা আনন্দ হইয়াছিল কম্প দিয়া জ্বর আসিয়া পড়িল বলিয়া শেষ পর্যন্ত সে আনন্দ আর ফলপ্রদ হইল না।

ম্যালেরিয়া তখনও খুবই ছিল। কালীতনু লাহিড়ী মহাশয় ছিলেন বাড়ির ডাক্তার ও হাসপাতালের ডাক্তার। ইনি সুবিখ্যাত ব্রাহ্ম আচার্য স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের ছোট ভাই, কিন্তু ইনি ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। প্রসন্ন মূর্তি, অতি মিষ্টভাষী এবং রোগীদের জন্য বিশেষ যত্ন লইতেন।

স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের বাড়িও কাঁঠালপোতার বাড়ির খুব কাছেই ছিল, তাহারই সন্নিকটে ছিল একটি পুরাতন গোরস্থান।

আমি বড় হইয়াও অনেকবার কাঁঠালপোতার বাড়ি গিয়াছি, ১৩০৩ কি ১৩০৪ সালে যখন যাই তখন ঠাকুরমা পা ভাঙিয়া শয্যাগতা ছিলেন। শেষবার যখন যাই, সম্ভবত সেটি ১৯১৫ সাল। সেইবার লর্ড কারমাইকেল কৃষ্ণনগরে যান ও এক দরবার করেন। সেই সময় শিকারপুরের জমিদার বাড়িতে স্বদেশী ছেলেরা ডাকাতি করে। আমার দাদা স্বর্গীয় সরসীলাল সরকার তখন কৃষ্ণনগর হাসপাতালে অ্যাসিস্টান্ট সার্জন ছিলেন এবং কবি বিনয়কুমারীর স্বামী ডাক্তার ভরত ধর ছিলেন সিভিল সার্জন। রাশি রাশি আহত গরুর গাড়ি করিয়া হাসপাতালে আসিতেছিল, দাদার মুখে শুনিয়াছি জমিদার বাড়ির আহত লোকগুলি কেবল পায়েই আহত হইয়াছিল এবং ছররা গুলীতে আহত হইয়াছিল।

সেই বারের আর একটি বিশেষ ঘটনা, বালেশ্বরে বুড়িবালাম নদীর ধারে এক পাহাড়ের কাছে একটি অসম যুদ্ধের ফলা-

ফল। এই যুদ্ধে এক পক্ষে ছিল কয়েকটি বাঙালীর ছেলে, তাহাদের নেতা ছিলেন স্বানামধন্য স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যিনি 'বাঘা যতীন' নামে বন্ধু মহলে পরিচিত ছিলেন। কৃষ্ণনগরে যতীন্দ্রনাথের মামার বাড়ি, ছেলেবেলা হইতে তিনি কৃষ্ণনগরেই বাস করিয়াছিলেন, এক হিসাবে তিনি কৃষ্ণনগরেরই ছেলে। তাঁহাদের পৈত্রিক বাড়ি যশোহর জেলার কোন এক স্থানে ছিল।

যতীন্দ্রনাথের বিপ্লবের প্রস্তুতির ইতিহাস এখানে অবান্তর। আমি তাঁহাকে বিশেষ করিয়া জানিতাম এবং তাঁহার দলস্থ কয়েকটি ছেলেকেও জানিতাম। তাই যখন সংবাদ পাইলাম যে, একপক্ষে সশস্ত্র পুলিস বাহিনী ও অপর পক্ষে মাত্র কয়েকটি ছেলে,—যাহাদের যুদ্ধের গোলা-বারুদ খুব সামান্য,—তাহারাই বীরের মত প্রাণপণে লড়িয়া প্রাণ দিয়াছে ও বন্দী হইয়াছে, তখন মনের যে কী অবস্থা হইল, আজ তাহা বর্ণনা দিয়া বুঝানো সম্ভব নয়। যে দেশের স্বাধীনতার জন্য এই বীর-তরুণ দলের এই অপূর্ব আত্মোৎসর্গ, সেই দেশের অধিবাসীরাই তাঁহাদের বিপক্ষে পুলিসের সাহায্য করিয়াছিল অথবা করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

কাঁঠালপোতার সেই বাড়ি, সেই পথ, সেই নির্কিরিপাড়া, সেই বৈষ্ণবপাড়া, ভাদ্র ও আশ্বিনে সেই পাণিফলের ঝুড়ি মাথায় নির্কিরি মেয়ের দল, সেই সরপুরিয়া, সর-ভাজা ও কাঁচাগোল্লার হাঁড়ি লইয়া ময়রাদের বাড়ি বাড়ি ফিরি করা, এখন সে যেন এক স্বপ্নের স্মৃতি।

চিত্রপ্রদর্শনী

ইন্দুরাণী সিংহ

মহিলা শিল্পীর সংখ্যা আমাদের দেশে খুব বেশী নয়। এদের মধ্যে যাঁরা ছবি আঁকার দিকে ঝোকেন অনেক সময়েই সে উৎসাহ উদ্দেশ্যগত কিন্তু সংসারী হওয়ার সংগে সংগে তাঁরা পুরোপুরি গৃহিণী হয়ে ছবি আঁকা ছেড়ে দেন একেবারেই। কচিৎ অনুরোধে উপরোধে এক আধটা যদিও বা আঁকেন তাও সাধারণের দৃষ্টির অগোচরেই রয়ে যায়। কিন্তু এমন ক'একজন শিল্পী আছেন চিত্ররচনা যাঁদের প্রতিদিনকার কাজ-কর্মের অংগীভূত হয়ে যায় এবং সংসারের নানান্ কাজ কর্মের মধ্যেই তাঁরা শিল্প রচনা করে চলেন। শ্রীমতী ইন্দুরাণী সিংহ ঠিক এই পর্যায়ের একজন শিল্পী। সংসারের নানান্ সুবিধা অসুবিধা এবং ছেলেপুলেদের প্রতিপালন করে তাঁর থেকে সময় বাঁচিয়ে যে তিনি আজও ছবি এ'কে চলেছেন কেবল এই ব্যাপারটাই এত উল্লেখ-যোগ্য যে শুধু সেজন্যেই তাঁকে ধন্যবাদ জানানো উচিত। কোন শিল্পবিদ্যায়তনে নিয়মিত এবং নির্দিষ্ট শিক্ষালাভ তিনি কোন দিনই করেন নি। বিশিষ্ট শিল্পী সতীশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের পত্নী হিসেবে তাঁর মন ছবি আঁকার দিকে ঝুঁকেছে। গত বার বৎসর ধরে তিনি প্রতিনিয়তই ছবি আঁকার কাজে রত থেকেছেন এবং এই দীর্ঘ সময় ধরে যথেষ্ট কুশলতা অর্জন করার পর তিনি একক প্রদর্শনী করতে ব্রতী হয়েছেন।

তাঁর দু' চারটে কাজের সংগে অবশ্য অনেক আগেই বিভিন্ন প্রদর্শনীতে—বিশেষ করে একাডেমি অব ফাইন আর্টসের প্রদর্নীতে পরিচিত হবার সুযোগ কলকাতার রসিক-সমাজের হয়েছে। কিন্তু তাঁর একক প্রদর্শনী এই প্রথম।

প্রায় একশত তেল রঙ, জল রঙ, প্যাস্টেল এবং পেন্সিল-এর কাজ নিয়ে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়েছে ক'একদিন আগে আর্টিস্ট্রি হাউসে। প্রদর্শনীটি এক নজরে দেখে এটা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে তাঁর স্বামী শিল্পী সিংহ মহাশয়ের কাজই তাঁকে প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত করেছে। এমন কি কোন কোন কাজে তাঁর

গ্রামের ঘরকন্না

বিশ্রাম
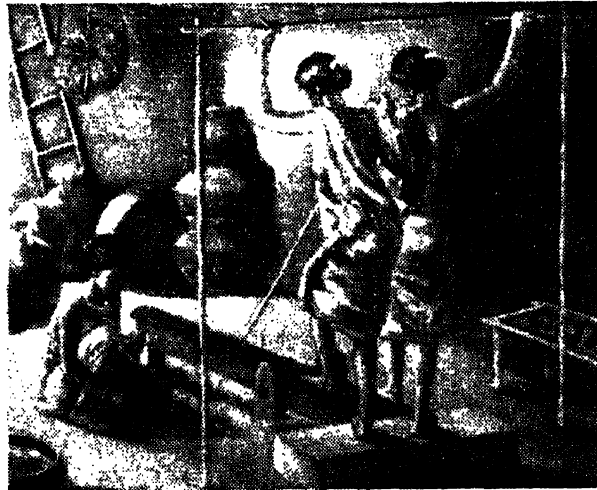
সত্তা এমন হারিয়ে গেছে যে শিল্পী সিংহর কাজ বলেই সেগুলোকে মনে হয়। সংসারের আবেষ্টনীতে থেকে তিনি বাইরের কোন শিল্পীর কাজের ধারাকেই কোথাও এতটুকুও গ্রহণ করতে পারেন নি, তাই শিল্পী সিংহ মহাশয়ের কাজের ধারার সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত তাঁরা শ্রীমতী সিংহের কাজে তেমন নতুন রসের সন্ধান হয়ত পাবেন না। উজ্জ্বল রঙ ব্যবহারে শ্রীমতী সিংহও খুব সাবধানী, প্রায় ছবিই হাল্কা রঙে আঁকা কিন্তু এর ফলে একটা দোষ প্রায় সব ছবিতেই বিশেষ করে দৃশ্যচিত্রে সংক্রামিত হয়েছেঃ পশ্চাদপট ও সম্মুখপটের রঙ সর্বত্র একই মানের—সেজন্য গভীরতার (depth) অভাবে ছবিগুলো একাকার হয়ে গেছে—কাছের এবং দূরের জিনিসে কোন তফাতই পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গতঃ ৮, ১৭, ৩২, ৩৩, ৩৭, ৩৯, ৫৬, ৬৩ প্রভৃতি সংখ্যার ছবিগুলোর উল্লেখ করা যেতে পারে; এদের মধ্যে কতগুলি রচনা আবার দর্শককে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। তেল রঙের কাজের মধ্যে ঢেঁকি-পাড় (নং ১১) যদিও পশ্চাদপট সম্মুখপট অত্যন্ত বেশী সাজানো মনে হয়, এইজন্য এবং গ্রাম্য কুঁড়ে ঘরের ভাবটি ঠিক না ফুটলেও মন্দ লাগে না। এ তুলনায় 'গ্রামের ঘরকন্না' (১নং) একই বিষয় নিয়ে আঁকা হলেও পূর্বোক্ত ১১নং ছবির চেয়ে আরও সুন্দর রচনা—পরিবেশটিও গ্রাম্য এবং মধুর। পুরীর সমুদ্রতীরে (৬নং), গাছের ছায়ায় (নং ৩) প্রভৃতি রচনার গুণে সার্থক হয়েছে। দৃশ্য চিত্রগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সার্থক সৃষ্টি ১৯ নম্বর ছবিটি। ছবিটির পরিবেশ মধুর এবং খানিকটে অলংকরণধর্মী হওয়ার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্যাস্টেলের কতকগুলি অতিসুন্দর কাজের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভাল হয়েছে বিশ্রাম (নং ৫৪) এই রচনাটির কল্পনাময় রঙ ও শান্ত আবহাওয়াটি মুগ্ধ করে। অন্যান্যগুলির মধ্যে ৬৭ নম্বর ছবিটি উল্লেখযোগ্য। পেন্সিল ও ক্রেঅন-এ আঁকা নানান্ ধরণের 'স্টাডি'গুলি এই প্রদর্শনীর আর একটি আকর্ষণ এবং প্রায় প্রত্যেকটিতেই শিক্ষার দক্ষতা ফুটেছে। এদের মধ্যে ৭১নং, ৪৩নং, ৮৮নং প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জল রঙের কাজ খুবই কম এবং তা তেমন উল্লেখযোগ্যও নয়।

পরিশেষে শিল্পীর এই প্রচেষ্টাকে আমরা অভিনন্দন জানাই এবং আশা করি ভবিষ্যতে তাঁর শিল্পসাধনা আরও পূর্ণতর পরিচয় নিয়ে আমাদের আনন্দ দান করবে।

মুখোমুখী

অরুণবরণ চক্রবর্তী

বন্ধ্যা রমণীর মত কোন এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায়—
—গোধূলির রক্ত-শিখা যেদিন হঠাৎ নিবে যায়,
আর পাখীদের গান অহল্যার মত
হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে নীরব অশ্রুর মত ঝরে
মুহ্যমানা ধরিত্রীর অঙ্গের উপরে,
আর বাতাসের বুকে চাপা হাহাকার অবিরত,—
তেমনি সন্ধ্যায় এক আমি ও সে
মুখোমুখী বসে
কাটালাম এক যুগ। নীরব নিস্তব্ধ বাক্যহীন।
অলিখিত এক মহাকাব্য হলো সৃষ্টি সেই দিন।

বেদনায় ভারাক্রান্ত সেই যুগ অনন্ত-অশেষ।
বন-মর্মরের ব্যথা গুমরে সজল দুটি মনে,
রৌদ্র-ক্লান্ত বলাকার পক্ষধ্বনি রক্ত-সঞ্চরণে,
দু'জোড়া নীরব চোখে কাঁপে শান্ত আলোকের রেশ।

সে শান্ত আলোক
পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে আজো আমাদের বিশ্বলোক।
একটি পৃথিবী জোড়া যদিও নকল ব্যবধান,
এপারে যায় না শোনা ওপারের কান্না হাসি গান,
তবুও সে শান্ত আলো
কী আশ্চর্য, ঢেকে রাখে আড়ালের কালো।
সেই যুগ অনন্ত অশেষ। আর
যখনি স্মরণ করি—যতবার—
দেখি চেয়েঃ আজো যেন আমি ও সে
মুখোমুখী বসে।

সাহেব বিবির দেশে

নরেন্দ্র দেব

(ফ্রান্স—৫)

প্রায় এক ঘণ্টা আমরা সেখানে ছিলাম। গাইড তাড়া না দিলে হয়ত আরও অনেকক্ষণ থাকতাম। এল খঞ্জনী বাজিয়ে নাচতে নাচতে আমাদের টেবিলের ধারে গোলাপ ফুলের কুঁড়ির মতো জিপ্‌সী এক নর্তকী মেয়ে। লঘুভার তনুদেহ নিয়ে উঠে পড়লো সে টুক্‌ করে টেবিলের উপর। ক'রে নিল সেইটেকেই তার নৃত্য-মঞ্চ। নাচের যে কতরকম কৌশল সে দেখালে সেই স্বল্পপরিসর টেবিলের উপর, তা কল্পনা করা যায় না। যেন শোলার তৈরি জীবন্ত পুতুল। উল্টে পাল্টে ডিগবাজী খেয়ে, শুয়ে বসে হাঁটুগেড়ে ঘুরে ফিরে খঞ্জনী বাজিয়ে তার সে নাচ যথার্থই উপভোগ্য। চোখে মুখে সর্বাঙ্গে প্রাণ উচ্ছল হয়ে উপচে পড়ছে। সোমের মুখে লাফ দিয়ে পড়ল সে টেবিল থেকে, কিন্তু ভূমিস্পর্শ করবার আগেই লুফে নিল তাকে একটি ছেলে, সম্ভবত তার দলেরই কেউ হবে হয়ত বা। সমবেত করতালির মধ্যে মেয়েটি সবার দিকে ফিরে ফিরে অভিবাদন জানিয়ে তার তাম্বুরীনটি উল্টে নিয়ে চাইল ইনাম। অগণিত ফ্রাঙ্ক নোটের বৃষ্টি হয়ে গেল তার সেই ছোট্ট বাদ্যযন্ত্রটির মধ্যে। যে কিছু দেয়, তারই উদ্দেশে মেয়েটি হেসে একটি চুমু ছুঁড়ে দেয় অধরাঙ্গুলির ইশারায়!

ঘণ্টাখানেক সময় যে কোথা দিয়ে কেটে গেল কিছুই বোঝা গেল না। আলোকে পুলকে দ্যুলোকে ভূলোকে যেন এক হয়ে গেছে এখানে। সুরের সুরধ্বনির সঙ্গে বাদ্যের ঝঙ্কার আর নৃত্যের তাল, জীবনের আনন্দলোকে যে কলকল্লোল জাগিয়ে তুলেছিল, ঢেউ তার ছড়িয়ে গিয়েছিল যেন দিক্‌দিগন্তে। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো আমরা উঠে এলাম গাইডের ইঙ্গিতে।

এখান থেকে বেরিয়ে আমরা গেলাম বাস্তিল আর টেম্পেল অঞ্চলে। প্যারিসের অধঃপতিত সমাজের বে-পরোয়া উচ্ছৃঙ্খল জীবনের উদ্দাম নগ্ন চিত্র প্রত্যক্ষ করা যায় এখানে এলে। এখানকার নরনারীদের মনে হ'ল যেন অন্য জগতের জীব। এদের নিশীথের রূপ কি সত্যই এই রকম? না, আমাদের মতো মূঢ় বিদেশীদের ভোলাবার জন্য এরা এই ধরণের অভিনয় করছে?...ধরা গেল না। অভিনয় যদি হয় তবে স্বীকার করতেই হবে এদের চেয়ে বড় অভিনেতৃ পৃথিবীর আর কোথাও নেই!

আমরা যখন সেখানে গেলাম তখন রাত্রি এগারটা বেজে গেছে। সুরার প্রভাবে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে জনতা। 'আপাশে' নাচ হচ্ছিল ঘরে। সে কি নাচ? নাচ তো নয় যেন মল্লযুদ্ধ! ভয় করে তাদের সে নাচের কাণ্ডকারখানা দেখে! শেষ পর্যন্ত খুনোখুনী ব্যাপার। সেই চিরন্তন ত্রিভুজ সমস্যা! একটি তরুণীকে নিয়ে নাচছিল একটি যুবক মনের আনন্দে। এল আর একটি যুবক সেখানে। নাচ দেখে তারও নাচতে ইচ্ছা হ'ল। মেয়েটিকেও মনে ধরে গেল। নৃত্যরোগটা দেখা যাচ্ছে ছোঁয়াচে। তরুণীকে ছিনিয়ে নিলে সে আগের যুবকের আলিঙ্গন থেকে। নাচতে শুরু করে দিলে সে মেয়েটির কটি বেষ্টন করে। তরুণীর মন চায় না নবাগতের সঙ্গে নাচতে। কাতরভাবে সে তার সহচরের দিকে তাকায়। যুবক রুখে ওঠে তখন নবাগতের উপর। বেধে যায় উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ। নবাগত যুবক বলিষ্ঠতর। তার নিষ্ঠুর ছুরিকাঘাতে ছিন্নমূল তরুর মতো মূর্ছিত হ'য়ে পড়ে আগের যুবকটি। ঝাঁপ দিয়ে পড়ে মেয়েটি তার সেই ভূপাতিত প্রিয়তমের বুকে। জয়গর্বে উল্লসিত মল্লবীর কঠিন আকর্ষণে টেনে নেয় মেয়েটিকে আহত প্রতিদ্বন্দ্বীর বুক থেকে নিজের বুকে। চলে তার বিজয়োল্লাসে নৃত্য। দেহে মনে ক্লান্ত যুবতী বাসিফুলের মতো এলিয়ে পড়ে নিষ্ঠুর বিজয়ীর বাহুবন্ধনের মধ্যে। সে তখন মেয়েটিকে দু'হাতে পাঁজা কোলা করে তুলে নিয়ে চলে যায় আপন পথে। মুমূর্ষু প্রতিদ্বন্দ্বী তাকে বাধা দেবার জন্য দু' একবার উঠে দাঁড়াবার প্রাণপণ চেষ্টায় ব্যর্থ হ'য়ে অবশেষে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। এইখানে নৃত্যের

মালমেঁজো দুর্গ

ভের্সাই রাজপ্রাসাদ

সমাপ্তি। এই নাচের সঙ্গে যে অর্কেস্ট্রা বাজল, সেরকম বাজনা আর কখনও শুনিনি! নাচিয়েরা কেউ কোনও কথা বলছে না শুধু তাদের চোখ-মুখ—হাত-পা সর্বাঙ্গই তাদের মনোভাব প্রকাশ করছিল, কিন্তু বাজনার সুর তাদের প্রত্যেকের মনের কথাগুলো যেন সুস্পষ্ট বলে দিচ্ছিল! অদ্ভুত এ নৃত্যের সঙ্গত্‌!

এখান থেকে বেরিয়ে আমরা এলাম পারিসের য়ুরোপ-বিশ্রুত নর্ম-প্রমোদাগার 'বাল তাবারাঁয়'। (ট্যাভার্ন্‌) দূরে কোথায় ঢং ঢং করে রাত্রি বারোটা বাজার ঘণ্টা শোনা গেল। এখানে আনন্দ উপভোগ করেন পারিসের যত অভিজাত সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খল নরনারীরা। আগে হ'তে এখানে আসন রিজার্ভ করে না রাখলে কোনও টেবিলেই স্থান হবে না। ট্যুরিস্ট কোম্পানী-দের বরাবরই নিজস্ব টেবিল রিজার্ভ থাকে, আমাদের মতো সব আনাড়ী হঠাৎ যাত্রীদের জন্য। এখানে 'ভ্যারাইটি-এণ্টার-টেনমেণ্টের' ব্যবস্থা। বড়লোকদের তো এক জিনিস রোজ ভাল লাগে না। নিত্যনূতন চাই। আমরা গিয়ে দেখলাম সেখানে 'মৃগ-মিথুনের' নৃত্য হচ্ছে। হরিণ ও হরিণীর সে যে কী সুন্দর ভঙ্গীতে অদ্ভুত নৃত্য, কত যে ভাল লাগলো তা বলতে পারবো না! সঙ্গীতের সুরের মধ্যে, বিচিত্রবর্ণের আলোকের অদ্ভুত ইন্দ্রজালের আবরণে সম্পূর্ণ নগ্ন দুটি নরনারী বনের হরিণ-হরিণীর অনুকরণে পরস্পরের প্রতি অনুরাগী হয়ে প্রেমনিবেদনের নৃত্য করছে। নাচটির শেষে চোখের জল মুছতে মুছতে অনেকেই উঠে এলো। কারণ, কোন এক অলক্ষ্য শিকারীর নিক্ষিপ্ত শর সন্ধানে সহসা বাণবিদ্ধ হয়ে হরিণ যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করলে। হরিণীর তখন সে কি ব্যাকুলতা! আহত মৃগের শোকে অভিভূতা হরিণী প্রিয়তমের মৃতদেহের পার্শ্বে ঘুরে ঘুরে অনাহারে তিলে তিলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে। বড় করুণ, বড় মর্মস্পর্শী! এ উচ্চাঙ্গের নৃত্যাভিনয় দেখে মনে হয় এক-মাত্র পারিসের অতুলনীয় নৃত্যশিল্পীদের পক্ষেই এই আশ্চর্য অভিব্যক্তি সম্ভব! যৌন আবেদনের কোনও অবকাশই নেই এর মধ্যে!

রাত্রি একটা বেজে গেছে। আমরা উঠে পড়লাম। যথারীতি সুরা ও কিছু হালকা ভোজ্য দিয়ে গিয়েছিল আমাদের টেবিলে। সিংহলী ছেলেটি সামান্য কিছু খেলেন। মার্কিন দম্পতী ও ইটালিয়ান শিল্পী নিজে-দের মধ্যে সুরাপাত্রটি নিঃশেষ করে ফেললেন। আর মিনিট পনেরো পরেই 'তাবাঁরার' দরজা বন্ধ হবে। ঘণ্টা বেজে উঠে সে কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলে। রাত্রি একটা পনেরো মিনিট পর্যন্ত খুলে রাখার এঁদের লাইসেন্স আছে। আমরা উঠে পড়লাম। এতক্ষণ যেকথা একেবারেই মনে ছিল না—অর্থাৎ বাড়ী ফেরার কথা—সেই কথা এবার আশঙ্কা নিয়ে জেগে উঠলো মনে। পারিসের মতো শহরের কুখ্যাত পাড়া থেকে এত রাত্রে নিয়ে গিয়ে যদি সেই নির্জন অপেরার পাশে ছেড়ে দেয়, সেখান থেকে একলা বিদেশী মানুষ বাড়ী ফিরবো কেমন করে। সিংহলী ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলাম —'আপনি থাকেন কোন দিকে?' বললে—বুলেভার রাঁয়ে।' যাক বাবা! বাঁচা গেল! আমাদের হোটেল পাড়া। তবু একটা সঙ্গী পাবো। উৎসাহিত হয়ে বললাম—যাবেন কেমন করে? বললে—'কেন? এই কোম্পানীর গাড়িই তো আমাদের প্রত্যেককে যার যার হোটেলে পৌঁছে দেবে? 'ও! তাই নাকি? ধন্যবাদ! আমি এটা জানতাম না। আপনার কোন্‌ হোটেল?' ছেলেটি বললে—'হোটেল দ্য'লা, আক্রোপোল!' এযে আমাদেরই হোটেল! আশ্চর্য এই পৃথিবী! গাইড বোধহয় আমাদের কথা শুনতে পেয়েছিল—বললে, আপনারা তো সজ্ঞানে আছেন ম্যাশেঁ, কিন্তু, অনেকের এমন অবস্থা হয় যে, তাঁরা ঠিক বাড়ী চিনে যেতে পারেন না! তাই প্রত্যেককেই বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসার ব্যবস্থা আছে। নিশীথ পারিসের নর্ম জীবন—বার বার মনের মধ্যে গুঞ্জরণ তুলছিল পারস্যের অমর কবি ওমর খৈয়ামের সেই বাণী—

"Ah my Beloved, fill the Cup that clears
Today of past regrets and future fears—
Tomorrow? Why Tomorrow?—I may be
Myself with yesterday's Seven Thousand years."
(Edward Fitzgerald)

নিশীথ-অভিসারিকা পারির উদ্দাম উন্মত্ত আবেষ্টনী থেকে গভীর রাত্রে হোটেলে ফিরে নিঃশব্দ পদে নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ

করলাম। বিজলী বাতির মৃদু নীলাভ আলোকে সন্তান-পার্শ্ববর্তিনী নিদ্রালসা পত্নীর স্নিগ্ধ প্রশান্ত মুখের পানে তাকিয়ে মনে হ'ল, পৃথিবীতে এ অন্য এক স্বর্গ। ভিন্ন এর পরিবেশ, ভিন্ন এর আশ্চর্য আকর্ষণী ও উপলব্ধি। যুগে যুগে চিরকাল এরা কত বিচিত্র রূপেই না পুরুষের হৃদয় জয় করে চলেছে। কোথাও হাস্যে লাস্যে সংগীতে সুরায় আনন্দের উন্মত্ত উচ্ছল ফেনিলতায়—কোথাও সংযমে সেবায় আত্মত্যাগে প্রেমে—জীবনের গভীরতম উপলব্ধির পরম প্রগাঢ়তায়। বিজয়িনী ওরা চিরদিনই। যে শুচিশুভ্র শ্বেত পুণ্ডরীক রূপেই হোক, আর ভোগ-রক্তিম রক্ত-গোলাপ রূপেই হোক।

পরের দিন আমাদের তীর্থযাত্রা হ'ল ভের্সাই প্রাসাদের দিকে। নানা কারণে ভের্সাই ফ্রান্সের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। কিন্তু বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের পর, পরাজিত এ্যাক্সিসদের সঙ্গে বিজয়ী এ্যালিজদের যে সন্ধি হয় 'ভের্সাই-সন্ধি' নামে তা পৃথিবীর চারিদিকে খ্যাতিলাভ করেছিল, কারণ এই ভের্সাই প্রাসাদে বসেই সেই সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সেই থেকে ভের্সাইয়ের নামও বিশ্বের লোকের কাছে পরিচিত হয়ে গেছে। নৃপতি ত্রয়োদশ লুই প্রথম এখানে একটি আস্তানা শুরু করেছিলেন বটে; কিন্তু সে অত্যন্ত সামান্য ধরণের। ফ্রান্সের সৌন্দর্য সাধক ও রূপধ্যানী নৃপতি চতুর্দশ লুই—ভের্সাইয়ের এই রাজপ্রাসাদোচিত বিরাট রূপের পরিকল্পনা করেছিলেন। দেশবিদেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের এনে একে মনের মতো করে সাজিয়ে ছিলেন। এই শিল্পানুরাগী ও রম্যকলার প্রণয়ী রাজাকে ঘিরে সেদিন যে প্রতিভাবান শিল্পীগোষ্ঠী এখানে সমবেত হয়েছিলেন, তাঁদের হাতের অদ্ভুত ও অনুপম কলানৈপুণ্যের পরিচয় এই ভের্সাই প্রাসাদের সর্বত্র তাঁরা রেখে গেছেন।

'ভের্সাই' দেখতে যাবার পথেই পড়ে 'মালমেজোঁ' দুর্গ। শহরের কলকোলাহলের বাইরে এই শান্ত সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে পালিয়ে এসে বীরশ্রেষ্ঠ নেপলিয়ঁ মাঝে মাঝে এই দুর্গে নির্জন বাস করতেন। এই সময় তিনি প্রজাশাসিত ফ্রান্সের প্রথম 'কনস্যুল' বা 'প্রধান পরিচালক' নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি ফ্রান্সের সম্রাট পদে অভিষিক্ত হবার পরও এই মালমেঁজো ছিল তাঁর একমাত্র শান্তিপূর্ণ বিরামকুঞ্জ। ভাইকাউণ্ট বোহার্নের সুন্দরী বিধবা যোসেফাইনের প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে নেপলিয়ঁ তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। যোসেফাইনের সঙ্গে নেপলিয়ঁর সুখ-মিলনের মধুযামিনীগুলি স্বপ্নের মতো কেটে গিয়েছিল এই মালমেজোঁ প্রাসাদের সুরম্য ভবনে। এই বিবাহের ফলেই সৌভাগ্যবতী বিধবা কাউণ্টেস অদূর ভবিষ্যতে একদা ফ্রান্সের

স্তম্ভ চক্রের একাংশ (কলোনেড)

মহিমময়ী সম্রাজ্ঞীর আসনে অধিষ্ঠিতা হয়েছিলেন।

বীর প্রণয়িনী যোসেফাইন নেপলিয়ঁর সঙ্গে বিবাহের দিন দুই পরেই স্বামীর অনুগামিনী হয়ে ইটালি অভিযানে গিয়েছিলেন, কিন্তু যুদ্ধের আবহাওয়ায় এবং শিবির জীবনের নিরানন্দ পরিবেশে ক্লান্ত হয়ে অল্প দিন পরেই পারিসে পালিয়ে আসেন। আনন্দ মধুর পরিবেশ ও রূপরসের আকর্ষণে যোসেফাইনের চার পাশে জড় হয়েছিল সেদিন ফরাসী সমাজের বিভিন্ন দিকের সব সেরা মানুষগুলি। নেপলিয়ঁর দৃষ্টি ও শক্তি বৃদ্ধির দিক দিয়ে যোসেফাইনের প্রভাব খুব বেশী কাজ করেছিল। নেপলিয়ঁর নিজেকে ফ্রান্সের সম্রাট বলে ঘোষণা করতে পারা সম্ভব হয়েছিল শুধু এই উচ্চাভিলাষিণীর দুঃসাহসের জোরেই। কিন্তু সম্রাজ্ঞী হলে কি হবে, জোসেফাইন 'মা' হতে পারলেন না। নেপলিয়ঁ তাঁর বংশের ধারা রক্ষা করে যেতে চান। জোসেফাইন এতে বাধা দিলেন না। তিনি নেপলিয়ঁকে চিনতেন। তিনি যা ধরবেন তা করবেনই। তখন, নেপলিয়ঁর সঙ্গে চুক্তি করে, নিজের সম্রাজ্ঞীপদ অক্ষুণ্ণ থাকবে এই সর্তে নেপলিয়ঁকে তিনি মুক্তি দিতে সম্মত হলেন। জোসেফাইনের সঙ্গে নেপলিয়ঁর বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হ'ল। নেপলিয়ঁ এবার অস্ট্রিয়ার রাজকুমারী মারিয়া লুইসাকে বিবাহ করলেন। এঁরই গর্ভে নেপলিয়ঁর প্রথম সন্তানের জন্ম হয়, কিন্তু অভাগিনী মারিয়া লুইসা! পাঁচটা বছরও নিশ্চিন্ত আরামে রাজরাণী হয়ে কাটাতে পারেননি। যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে নেপলিয়ঁ এই সময় অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েন। ১৮১০ খৃঃ অব্দে নেপলিয়ঁর সঙ্গে মারিয়ার বিবাহ হয়, আর ১৮১৫ খৃঃ অব্দেই নেপলিয়ঁ ওয়াটার্লু যুদ্ধে পরাস্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে সাম্রাজ্য ও সিংহাসন হারিয়ে সেণ্ট্ হেলেনায় নির্বাসিত হন। নেপলিয়ঁর পরাজয় ও পতনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় জোসেফাইনের মৃত্যু হয়। সম্রাট পরিত্যক্ত এই সম্রাজ্ঞীর শেষ জীবনের করুণ দিনগুলি এই মালমেঁজো দুর্গেই কেটেছিল এবং এইখানেই পড়েছিল তাঁর সম্রাজ্ঞী জীবনের শেষ নিঃশ্বাস।

এই মালমেজোঁ প্রাসাদ আর তার অধীশ্বরী সুন্দরী যোসেফাইনের রোমাঞ্চকর কাহিনী ফ্রান্সের ইতিহাসের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। বীরশ্রেষ্ঠ নেপলিয়ঁর হৃদয়বিজয়িনী এই সম্রাজ্ঞী যোসেফাইন নিজগুণে মালমেজোঁ দুর্গকে এমন একটা মর্যাদা দিয়ে গেছেন যে ফ্রান্সের মাটিতে এসে যারা পা দেবে তাদের একবার এখানে এসে মাথা নুইয়ে যেতেই হবে। এখানে এলে মনে হয় এ যেন আমাদের কতদিনের চেনা জানা প্রাসাদ। একদা তরুণ বয়সে ইতিহাসে আমরা যাঁদের কথা পড়েছি, পড়ে মুগ্ধ হয়েছি; তাঁরা ছিলেন এই মালমেজোঁ দুর্গে—দিগ্বিজয়ী নেপলিয়ঁ আর বীর চিত্ত বিজয়িনী যোসেফাইন! পুরুষশ্রেষ্ঠ নেপলিয়ঁর পদরজরঞ্জিত এ প্রাসাদ, সুন্দরী যোসেফাইনের কলকণ্ঠ

নিঃসৃত হাসি-গানের প্রাণস্পন্দনে আলোড়িত এ রাজভবন। সম্রাজ্ঞী য়ুজেনীরও প্রিয় প্রাসাদ এই মালমেজোঁ। এর বাগানে যে অজস্র গোলাপ ফুটে রয়েছে আজও, কে জানে একদিন এ গোলাপ ফরাসী সম্রাজ্ঞী-দের আসরের ও বাসরের শোভাবর্ধন করেছিল কি না? সমস্ত অন্তর স্বপ্নে ও সম্ভ্রমে ভরে ওঠে। এখানে ছোট একটি যাদুঘরে নেপোলিয়ঁর আমলের অনেক কিছু জিনিস সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। এগুলির যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

পারিস থেকে মাত্র অল্প কয়েক মাইল দূরে এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ মালমেজোঁ দুর্গ। এর নীচের তলায় রয়েছে দেখলাম গ্রন্থ-শালা, মন্ত্রণাকক্ষ ও ভোজনাগার। গ্রন্থ-শালার বইগুলি ঝক্‌ঝক্‌ করছে। মন্ত্রণা-কক্ষের আসবাবগুলি সুদৃশ্য; ভোজনাগারের টেবিলখানি রৌপ্যনির্মিত এবং কারুকার্য খচিত। এ ছাড়া দরবার কক্ষ, ক্রীড়া-কৌতুকের আসর এবং অভ্যর্থনা গৃহও রয়েছে নীচের তলায়। দ্বিতলে উঠে প্রথমেই রাজা যোসেফের শয়নঘর। ইনি নেপোলিয়ঁর ভাই। নেপোলিয়ঁ একবার এই ভাইকে সিংহাসনে বসিয়ে ফ্রান্সে রাজতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ফরাসী জনসাধারণ এটা মেনে নিতে অস্বীকার করলে। তারা রাজা যোসেফের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে। রাজা তারা চায় না। অগত্যা রাজা যোসেফের রাজ্যলীলা অংকুরেই নির্মূল হয়েছিল। রাজা যোসেফের শয়নকক্ষের পরই নেপোলিয়ঁর নিজের বসার ঘর। এ ঘরে নেপোলিয়ঁর ব্যবহৃত ও কীর্তিজড়িত এত রকম জিনিস রাখা হয়েছে যে এটিও একটি যাদুঘর হয়ে উঠেছে! তারপর আমরা গেলাম নেপোলিয়ঁ ও যোসেফাইনের শয়ন-ঘরে। যে ঘরে একদিন যোসেফাইন তার বিশ্ববিজয়ী প্রণয়ীর গলায় প্রেমপুষ্পের বরমাল্য দিয়ে আপনার বাসর শয্যা রচনা করেছিল, সেই ঘরেই দেখে এলাম পর-লোকগতা যোসেফাইনের শেষশয্যাও সযত্নে সাজানো রয়েছে। মালমেজোঁ দুর্গের একটি ঘরকে এঁরা 'সেণ্ট হেলেনা হল' বলেন। এ ঘরে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপ থেকে নেপোলিয়ঁর বন্দীজীবনের ব্যবহৃত সমস্ত জিনিস সংগ্রহ করে এনে সযত্নে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বড় করুণ এর আবেদন!

মালমেজোঁ প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানের মধ্যে ফরাসী মূর্তিশিল্পী লা' মাটের নিপুণ হাতের তৈরী মহাবীর নেপোলিয়ঁর একটি প্রতিমূর্তি রয়েছে। আর আছে ভাস্কর্য শিল্পী পুজেটের তৈরী একটি 'নেপচ্যুনের' মূর্তি। ১৮০৯ খৃঃ অব্দে নেপোলিয়ঁর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের পর সম্রাজ্ঞী জোসেফাইন ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিষণ্ণমুখে যে 'ওপাল' গাড়ীতে মালমেজোঁয় ফিরে এসেছিলেন সেই গাড়ীখানিকেও এঁরা আমাদের দেখাবার জন্য আজ এই একশ' চল্লিশ বছর ধরে ঝেড়েমুছে সাজিয়ে রেখেছেন। আশ্চর্য এঁদের এই প্রত্ন-প্রীতি!

এখান থেকে বেরিয়ে আমরা ভের্সাই প্রাসাদে এলাম। এই দুটি 'শাটো' বা 'প্রাসাদ' দেখবার জন্য আমরা আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানীর মোটর কোচের টিকিট নিয়ে-ছিলাম। বলা বাহুল্য আমাদের সঙ্গে আরও অনেক যাত্রী ছিলেন। তাঁরা য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের মানুষ। তবে, অধিকাংশই আমেরিকান। পরের দিন আমরা ফতে'রোয়া প্রাসাদ দেখে আসবার ব্যবস্থাও এঁদের সঙ্গেই করে রেখেছি। ভের্সাই পারিস থেকে ১১ মাইল দূরে; আর ফতে'রোয়া ৩৮ মাইল। এ সব দূর পাল্লার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখতে অবশ্য ট্রেনেও আসা যায়, তাতে খরচা কম পড়ে, কিন্তু স্টেশনে নেমে সেখান থেকে গন্তব্যস্থানে যাবার জন্য অনেকটা পথ হাঁটতে হবে শুনে আমরা আর সে পথে পা বাড়াইনি।

ভের্সাই প্রাসাদ নির্মাণের পরিকল্পনা যে রাজার মাথায় এসেছিল তিনি যে একজন বড় শিল্পী একথা স্বীকার করতেই হবে। বিরাট এই রাজপ্রাসাদ। অতি সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ নির্বাচন করা হয়েছিল এটি স্থাপনের জন্য। ফ্রান্সের রাজাদের সঙ্গে তাঁদের রাজ্যপাট উঠে গেছে আজ প্রায় একশ' বছরের উপর হবে। কিন্তু এই ভের্সাই প্রাসাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয়নি আজও। ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আজও এইখানেই হয়। শাসন বিধির কোনও অত্যাবশ্যকীয় পরিবর্তন বা সংশোধন প্রয়োজন হলে এই-খানে বসে তার মন্ত্রণা সভা। গণতান্ত্রিক ফ্রান্সের রাষ্ট্রনেতা নির্বাচনের ব্যাপারটাও এখনও এইখানেই সম্পন্ন হয়।

১৮৭১ খৃঃ অব্দে জার্মান আক্রমণে পরাস্ত ফ্রান্স যখন সন্ধির প্রস্তাব করে জার্মানরা সেটা বিবেচনা করবার জন্য এই ভের্সাই প্রাসাদের শিশমহলটাই বেছে নিয়েছিল তাদের বিজয়োৎসবের জন্য এবং জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপনার শুভ সংবাদটা ঘোষণা করবার জন্য। অপমানে আরক্তমুখ পরাজিত ফ্রান্স নতশিরেই বিজয়ী জার্মান-দের এ জুলুম মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল সেদিন। তারপর, এল ১৯১৪ খৃঃ অব্দের প্রথম মহাযুদ্ধ। চাকা ঘুরে গেল। এবার জার্মানরা হল মিত্রশক্তির কাছে পরাস্ত। যথারীতি পরাজিত শত্রুর নিকট হতে এল সন্ধির প্রস্তাব। ফরাসীরা তার সুযোগ নিলে। সেই ১৮৭১ খৃ অব্দে জার্মানদের হাতের অবমাননার প্রতিশোধ তুললে ফরাসীরা এই ভের্সাই প্রাসাদের শিশমহলেই সে আলোচনার আয়োজন করে।

এই সুন্দর স্থানটিরও নাম ভের্সাই। তাই, এখানে রচিত এই প্রাসাদেরও নাম হয়েছে 'ভের্সাই প্রাসাদ।' এতখানি স্থান জুড়ে এত বড় বিরাট অথচ সুন্দর একটি প্রাসাদ বোধ করি পৃথিবীর আর কোনও দেশে নেই। তিনটি প্রশস্ত রাজপথের সংযোগ ঘটেছে এই প্রাসাদের তোরণদ্বারের সম্মুখে। প্রাসাদের বিশাল বহিপ্রাঙ্গণেই স্থাপিত রয়েছে নৃপতি চতুর্দশ লুইয়ের একটি সুন্দর সুবৃহৎ অশ্বারোহী প্রতি-মূর্তি। এই চতুর্দশ লুইকে ফ্রান্সের জন-সাধারণ তাদের ভক্তি প্রীতির আতিশয্যে বলতো সেদিন আমাদের 'সূর্যপতি' বা 'আদিত্যনাথ!' (দি সান্ কিং)

প্রাসাদ প্রবেশ-পথেই প্রতীক্ষা করছিলেন যাত্রীদের অপেক্ষায় পথপ্রদর্শকেরা। আমরা ইংরাজী জানা একজন গাইডের অনুসরণ করলাম। তিনি বলতে বলতে চললেন— "এই যে বিরাট প্রাসাদ আপনাদের সামনে দেখতে পাচ্ছেন এ একদিনে বা এক রাজার জীবনে তৈরী হয়নি। ১৬২৪ খৃঃ অব্দে ত্রয়োদশ লুইয়ের নির্মিত একটি ছোট্ট শিকারের বাংলোকে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি চতুর্দশ লুই এই প্রাসাদে রূপান্তরিত করেন বটে, কিন্তু নির্মাণ কার্য সেইখানেই শেষ হয়নি। সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় ভাগেও এই প্রাসাদের প্রসারিত নব নব মহলের নির্মাণ কার্য চলেছিল। কালে কালে এর একটি মহলের পর আরও একটি মহল এমনি করে আজ এক বিপুল প্রাসাদ হয়ে উঠেছে। সুতরাং অসংকোচে একথা বলা যেতে পারে ফ্রান্সের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর

স্থাপত্যকলার নানা পর্যায়ের পরিচয় এই ভের্সাই প্রাসাদের চতুর্দিকে দেখতে পাওয়া যায়। নৃপতি চতুর্দশ লুইয়ের অনুকরণে নেপলিয় ভের্সাইয়ের আর একটি মহল নির্মাণ করাতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু, শেষ করে যেতে পারেননি। ১৮২০ খৃঃ অব্দে সুবুদ্ধির তাড়নায় ফরাসী সরকার সেই অসমাপ্ত অংশটুকু সমাপ্ত করেছিলেন।

যতদূর সম্ভব ভের্সাইয়ের একটা সম্পূর্ণ বিবরণ দেশের পাঠক-পাঠিকাদের দেবার চেষ্টা করছি, অবশ্য সংক্ষেপেই বলবো। এয়োদশ লুই যখন ভের্সাইয়ে এসে বাস করতেন তখনও প্রাসাদ হয়নি। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ লুইয়ের পর ষোড়শ লুই হলেন শেষ রাজা যিনি ভের্সাই প্রাসাদে সর্বশেষ বাস করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। নেপোলিয় সম্রাট হবার পর ভের্সাই প্রাসাদ ভোগ করার বিশেষ সুযোগ পাননি। অষ্টাদশ লুইয়েরও অভিলাষ ছিল ভের্সাইকে আবার ফ্রান্সের রাজবাটি করে তোলবার, কিন্তু পারিস ছেড়ে এ'রা কেউই ভের্সাইয়ে এসে বাস করবার অবসর পাননি। ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে দ্বিতীয়বার ফরাসী বিদ্রোহের পর থেকে 'ভের্সাই প্রাসাদ' প্রায় যাদুঘর রূপেই এর অস্তিত্ব বজায় রেখে এসেছে। যাদুঘর হিসাবে ভের্সাইকে বহু অর্থব্যয়ে বড় করে তুলেছিলেন ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সের গণতন্ত্র প্রেমিক রাজা লুই-ফিলিপ। ইতিহাস বলে ইনি তাঁর রাজা উপাধি ও রাজবংশের পরিচয় ত্যাগ করে 'এগলাইতে' নাম গ্রহণ করেছিলেন। সে যাই হোক। এ'র চেষ্টায় 'ভের্সাই' ফ্রান্সের জাতীয় সম্পদরূপে স্বীকৃত হওয়ায় রাজসিংহাসন লোভী দেশীয় শত্রু ও সাম্রাজ্য লোভী বিদেশী শত্রুর অত্যাচারের হাত থেকে ভের্সাই রক্ষা পেয়েছে।

ভাস্কর্য ও চিত্র সংগ্রহ এখানে যা আছে তার সংখ্যা প্রায় আট হাজারের উপর। এর অধিকাংশই কি ইতিহাসের দিক থেকে, কি শিল্পকলার দিক থেকে অত্যন্ত মূল্যবান বলে গণ্য। এদের সম্বন্ধে বিশদভাবে কিছু বলবার চেষ্টা করা মূঢ়তা মাত্র! ক'খানি ছবির বর্ণনা দেওয়া সম্ভব লেখনীর সাহায্যে? ক'টিই বা মূর্তি ও ভাস্কর্যকলার পরিচয় দেওয়া সম্ভব কেবল ভাষার দ্বারা? একমাত্র আলোক চিত্রে ও প্রতিলিপির সাহায্যে কতকটা বোঝানো সম্ভব বটে। যে বর্ণনা দিলাম আশা করি তা থেকে ভের্সাই প্রাসাদের বিরাট সৌন্দর্যের কিছুটা ধারণা হ'তে পারবে শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে প্রগতিশীল পাঠকদের। শিল্পকলা, স্থাপত্যকলা ও বাস্তু শোভার দিক থেকে এই অনবদ্য প্রাসাদের যে যে অংশ অতি অপূর্ব বলে মনে হয়েছে, আমি কেবল সেইগুলিরই উল্লেখ করছি কিন্তু।

প্রাসাদের উত্তর মহলে যে উপাসনা গৃহ আছে তার নির্মাণ কৌশলের মধ্যে শিল্পী

প্রেমের দেউল (টেম্পেল অফ্ লাভ্)

মাজার্টের যে আশ্চর্য পরিকল্পনা দেখলাম তা যথার্থই অতুলনীয়। এইদিকের একটি 'হল', যাকে বলে 'ফরাসী ইতিহাসের চিত্রশালা', এর মধ্যে যে সব সুন্দর চিত্র রয়েছে তার অধিকাংশই দো'গ্রস্, রেঁনো, হোরেস ভার্ন প্রভৃতি বিশিষ্ট ফরাসী শিল্পাচার্যদের আঁকা। ফ্রান্সের জাতীয় ঐশ্বর্যের অন্তর্ভুক্ত এ চিত্রগুলি। প্রাসাদের মধ্যে যে সুন্দর একটি রাজকীয় নাট্যশালা রয়েছে সেটি নাকি ফ্রান্সের রাজা পঞ্চদশ লুইয়ের অনুরোধে প্রসিদ্ধ শিল্পী গ্রেবিয়েল্ নিজ তত্ত্বাবধানে নির্মাণ করেছিলেন।

প্রাসাদের মাঝের মহলের সুসজ্জিত কক্ষগুলি ছিল একদা ফ্রান্সের একাধিক রাজা রাণী ও রাজকুমারীদের লীলাক্ষেত্র। এই মাঝের মহল পার হয়েই পাওয়া গেল ভের্সাইয়ের সেই অতিবিখ্যাত শিশমহল (গ্যালারিদ্য' গ্লাসে) এই আয়নাখানা বা দর্পণ মহলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করেছি। প্রাসাদের দ্বিতলে যাবার মর্মর সোপানটিও উল্লেখযোগ্য। উপরে রাজরাণী মারী আঁতয়েঁতের ব্যবহারের ছোট ছোট ঘরগুলি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ঘরের প্রত্যেকটি জিনিসই বলা যায় অপূর্ব সুন্দর আসবাবপত্র। এ ঘর রাণীর নিজের সংগৃহীত বিবিধ সূক্ষ্ম শিল্পকলাসম্মত দুর্লভ সামগ্রীসমূহে সজ্জিত। গৃহের ছাদতলে যেসব অপরূপ সুন্দর চিত্র অঙ্কিত রয়েছে, সেগুলি বিশেষভাবে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু একটা সংশয় জেগে ওঠে এইসঙ্গে। ইতিহাস বলে ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সে যে গণ-বিদ্রোহ হয় তাতে বিপ্লবীরা ভের্সাই প্রাসাদের কোনও ক্ষতি করেনি বটে, কিন্তু প্রাসাদের ভিতরের সমস্ত মূল্যবান আসবাবপত্র নীলাম ক'রে বেচে দিয়েছিল। এটা যদি ঐতিহাসিক সত্য হয় তাহলে ফ্রান্সের অভাগিনী রাণী মারী আঁতয়েঁৎ, ১৭৭০ খৃঃ অব্দে মাত্র সতেরো বছর বয়সে, হাবাগোবা রাজা ষোড়শ লুই যখন যুবরাজ তখন তার সঙ্গে যাঁর বিবাহ হয় এবং ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে বিপ্লবীরা যাঁকে সাধারণ অপরাধীর ন্যায় কারাগারের অসম্মান ও অমর্যাদার মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে শেষে 'গিলটিনে' হত্যা করে, তাঁর সংগৃহীত দ্রব্যাদি কি তবে বিদ্রোহীরা কেড়ে নিয়ে ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে নীলাম ক'রে বে'চে দেয়নি? ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেল না।

এইবার দক্ষিণের মহলে এসে পড়লাম। এখানে যে দরবার কক্ষ বা সভাগৃহ রয়েছে, এ'রা যেটিকে বলেন 'কংগ্রেস হল'—সেটি আকারে ও ঐশ্বর্যে রাজোচিতই বটে। এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল 'সমরালেখ্য ভবন' (গ্যালারি দা বাতায়েলস্) ফ্রান্সের প্রায় সব কটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ যুদ্ধের বড় বড় চিত্র অঙ্কিত রয়েছে এখানে। একটি রাজকীয় চিত্র সংগ্রহশালাও আছে দেখলাম। ফ্রান্সের রাজন্যবর্গ যেসব প্রতিভাবান চিত্রশিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তাঁদের আঁকা ছবি মাঝে মাঝে কিনতেন বা প্রসন্ন মেজাজে হুকুম দিয়ে আঁকিয়ে নিতেন সেগুলি সব এখানে সংগ্রহ করা রয়েছে। এর প্রত্যেকখানিকেই 'মাস্টার পীস' বলা যেতে পারে। প্রাসাদের পশ্চিম মহলের দিকে উল্লেখযোগ্য কিছু দেখলাম না। খুব সাদাসিধা এর গঠনশিল্প। এদিকের গাড়ী-বারান্দা বা খোলা ছাদের উপর থেকে ভের্সাই প্রাসাদের উদ্যানটি বড় সুন্দর দেখায়। ঠিক যেন ছবির মতো! এমন অপূর্ব ও মনোরম উদ্যান আমরা য়ুরোপে আর কোথাও দেখিনি। সোয়েডেনে

রাজোদ্যান দেখেছি, স্কটল্যান্ডে এণ্ড্রিউ কার্নেগীর বাগান দেখেছি কিন্তু এর সঙ্গে যেন কোনওটারই তুলনা হয় না। দেখে মনে হয় ওতো রঙীন ফুল নয়, ওতো সবুজ ঘাস নয়, ও যেন কোনও শক্তিশালী শিল্পীর হাতের তুলি বিচিত্র বর্ণে ও রেখায় অপরূপ এই ছবি এঁকে রেখেছে বিস্তৃত প্রাসাদ প্রাঙ্গণ জুড়ে। নেমে এলাম আমরা এই বাগানের মধ্যে। কত যে ভাল লাগছিল ভের্সাইয়ের এই রাজোদ্যানে ঘুরে বেড়াতে, এর মখমলের মতো মোলায়েম শ্যাম তৃণাস্তরণের উপর দিয়ে ধীর মৃদু পদ-সঞ্চারণে চলতে। দু'তিন শতাব্দী ধ'রে ফ্রান্সের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বরেণ্য রাজা রাণীরা একদা এই উদ্যানে আনন্দে বিহার করে-ছিলেন। সেদিন আমাদের মতো জনসাধারণের পক্ষে এই প্রাসাদে, এই রাজ-উদ্যানে প্রবেশ করা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। একথা ভেবে সমীহ জেগে ওঠে মনের মধ্যে। বাগানের ভিতর যেসব স্ফটিকনির্মল জলের শিলা-বেষ্টিত জলাশয় রয়েছে, যেসব অসংখ্য সুন্দর মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেগুলিকে ফরাসী স্থাপত্য ও ভাস্কর্যকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা চলে। ভের্সাই প্রাসাদ দর্শকদের সামনে অতীত ফ্রান্সের যে রূপ উদ্ভাসিত ক'রে তোলে—সে তার বল-বাণিজ্য বৈভবে সুসমৃদ্ধ যুগের ঐশ্বর্যদীপ্ত ছবি—বিলাস ব্যসনাসক্ত সৌখীন নৃপ-সমাজের বিপুল বাদশাহী সম্ভোগের বিস্ময়কর চিত্র।

প্রাসাদের 'গ্রাঁদেয়ু' উৎসটি সেদিন খোলা ছিল। এটি নাকি কোনও কোনও বিশেষ বিশেষ রবিবার ছাড়া খোলা হয় না। যে দেশে রাজা নেই, সে দেশে রাজপ্রাসাদেরও প্রয়োজন নেই, তাই বোধ করি এই রাজকীয় ফোয়ারাটি প্রত্নতত্ত্বেরই সামিল হয়ে পড়েছে এখন। পুরানো ঘড়িতে যেমন মাঝে মাঝে দম দিয়ে চালু রাখতে হয়, এ ফোয়ারা-গুলিকেও বোধহয় সেই রকম মাঝে মাঝে চালিয়ে দিয়ে একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করা হয়। 'গ্রাঁদেয়ু' অন্য কিছুই নয়—'গ্রান্ড ইয়ু' অর্থাৎ প্রকান্ড একটা 'ভেড়া' বলবো না—প্রকান্ড এক লড়াইয়ে মেড়া—তার মস্ত বাঁকা শিঙ, ব্রোঞ্জ না পাথরের তৈরী ঠিক বোঝা গেল না। এরই নাক মুখ দিয়ে ফোয়ারার মতো জলধারা বেগে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে।

বিবিধ বিচিত্র বর্ণের ফুলের বিস্তীর্ণ ও বিশাল ফুলকারীর দক্ষিণে আছে একটি পাথরে বাঁধা সুদৃশ্য সুন্দর জলাশয়। এটির নাম শোনা গেল 'নেপচ্যুনস্ বেসিন' —বা 'বরুণ কুন্ড'। জলাশয়ের ধারে জল-দেবতা নেপচ্যুনের বিরাট প্রতিমূর্তি স্থাপিত রয়েছে। উদ্যান-শিল্পীর নিপুণ হাতে বোনা সেই সবুজ সজীব সুরঙ্গীন কার্পেটের বামে বাস্তুশিল্পী মাঁজার্টের তৈরী সুদৃশ্য 'স্তম্ভ-গোলকের' অর্থাৎ চক্রাকারে খিলানযুক্ত অথচ ছত্রহীন স্তম্ভ-শ্রেণী নির্মিত আছে, সেটি দেখে মনে হ'ল এখানেও একদা একটি কুন্ড বা সরোবর ছিল, যাতে এখন আর জল নেই কিন্তু জলে নেমে যাবার সোপানশ্রেণী রয়েছে। এই গোলাকার জলাশয়ের তীরটি ঘিরেই এই চক্রাকার স্তম্ভশ্রেণী নির্মিত হয়েছিল। এই স্তম্ভশ্রেণীকে ভের্সাই প্রাসাদ ও উদ্যানের একটি বিশেষ শোভা বা অলঙ্কারস্বরূপ বলা যেতে পারে।

'নেপচ্যুন বেসিনের' পর সেই ফুলের কার্পেটের একেবারে শেষ প্রান্তে আছে 'এ্যাপোলো বেসিন' বা 'সূর্যকুন্ড'। সুদীর্ঘ শ্যামল যে তৃণাস্তরণের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি তার প্রস্থের পরিমাপ পাওয়া গেল পুরো ৯০০ ফিট। এর শেষ প্রান্ত দেখা যায় না। মনে হয় যেন কোন অজ্ঞাত অনন্তলোকে গিয়ে মিশেছে। কাজেই শেষ-পর্যন্ত যাবার চেষ্টা করিনি। এইতেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম, সূর্যকুন্ডের পর বেশ একটি ছোটখাট সাদাসিধা বাড়ি আছে। শুনলাম এটিও নাকি চতুর্দশ লুই স্থপতি-শ্রেষ্ঠ মাঁজার্টকে দিয়ে তৈরী করিয়ে নিয়ে-ছিলেন। ভের্সাই প্রাসাদের নিত্য অনুষ্ঠিত রাজকীয় উৎসব আড়ম্বর হতে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি পাবার আশায় তিনি এখানে পালিয়ে আসতেন। এটিকে বলা হয় 'বড় ত্রিয়াঁনো'। শোনা গেল বীরবর নেপোলিয়নও নাকি মাঝে মাঝে এখানে এসে বিশ্রাম করতেন।

সবুজ ও গোলাপী রংয়ের চমৎকার ইটালিয়ান মার্বেল পাথরের থামে ঘেরা একটি সুন্দর চত্বরের ভিতর দিয়ে এই শান্তিকুঞ্জে প্রবেশ করলাম আমরা। সম্রাটের ব্যবহৃত মূল্যবান আসবাবপত্র কিছু কিছু সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে এখানে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৯ খৃঃ অব্দে হাঙ্গেরীর সঙ্গে ফ্রান্সের যে সন্ধি হয়েছিল তা এই শান্তিকুঞ্জের বড় হলটিতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শান্তিকুঞ্জের পিছন দিকে বোধকরি রাজন্যগণের 'আস্তাবল' বা অশ্ব ও রথশালা ছিল। সেটি এখন রাজকীয় যানবাহনের মিউজিয়মে পরিণত হয়েছে। রাজন্যগণের রাজ্যাভিষেকের সময় ব্যবহার করা স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণিমুক্তাখচিত গাড়ীর সঙ্গে রাজ্ঞীদের নিত্য ব্যবহারের যে প্রিয় যানাদি তাও সযত্নে রক্ষিত আছে।

এখান থেকে বেরিয়ে বাগানের শেষে একটি সুদৃশ্য সেতু পার হয়ে আমরা আর একটি চমৎকার ছোট বাড়ীর সামনে এসে পড়লাম। এ বাড়িটির নাম ছোট 'ত্রিয়াঁনো'। আঠারো উনিশ বছরের মেয়ে মারী আঁতোয়েৎ ফ্রান্সের রাণী হলেন যখন মন তাঁর তখনও কিশোরীর মতো অস্থির ও চঞ্চল। লঘু আমোদ প্রমোদে আসক্ত ছিলেন তিনি বরাবর। রাজপ্রাসাদ ও রাজসভার কেতাদুরস্ত আড়ষ্ট আবহাওয়ায় তিনি হাঁফিয়ে উঠতেন। রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুভারে তাঁর ক্লান্তি আসতো। ষোড়শ লুই নিতান্ত হাবাগোবা রাজা ছিলেন বলে রাজকার্য সব কিছুই করতে হ'ত এই তরুণী রাজ্ঞীকে। কিন্তু, এসব তাঁর ভাল লাগত না। রাজসভার সুপুরুষ যুবক কর্মচারীদের প্রতি তাঁর একটা অহেতুক অনুরাগ ছিল। তিনি ছদ্ম-বেশে প্রাসাদের বাইরের আমোদ প্রমোদেও যোগ দিতেন। চরিত্রহীনা বলে রাণীর বড় দুর্নাম রটেছিল। কিন্তু তিনি তা গ্রাহ্য করতেন না। ছুটে পালিয়ে আসতেন এই ছোট বাড়িটিতে সাধারণ মেয়ের মতো থাকবার লোভে। এ বাড়ির সংলগ্ন উদ্যানটি ইংরাজী ফ্যাসনে তৈরী। এই বাগানের মধ্যে ছোট একটি 'প্রেমের দেউল' (টেম্পল অফ লাভ) আছে, যদিও প্রণয়-দেবতা এর মধ্যে নেই। বোধকরি এটি এই প্রেমপাগলিনী তরুণী রাণীরই কীর্তি। যাই হোক। ভের্সাই প্রাসাদ আমরা খুঁটিয়ে দেখে যখন পারিসে ফিরে এলাম, তখন সান্ধ্যভোজের সময় হয়েছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীসন্মথনাথ ঘোষ

আকাশের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ও হাহুতাশ করা শেষ হয়ে গিয়েছে। নির্দয়, নিষ্ঠুর প্রকৃতিকে দু'বেলা অভিসম্পাত দিয়ে দিয়েও ক্লান্ত শহরের লোক! চৈত্র গিয়েছে, বৈশাখ গিয়েছে, জ্যৈষ্ঠেরও মাঝামাঝি হতে চললো, তবু এক ফোঁটা জল নেই আকাশে। তাপের মাত্রা বেড়েই চলে একশো ছয়-সাত-আট-দশ! শহরের রাস্তাগুলোতে যেন পিচ ফুটে টগবগ করে! কংক্রিটের বড় বড় ইমারতগুলোর দেওয়াল থেকে একটা আগুনের ঝাঁজ বেরোয়—সকলের মুখে শুধু এক কথা, 'বাপ্ কি গরম! আর পারি না!'

এমন সময় একদিন বিকেলে হঠাৎ সমস্ত আকাশখানা কালো ক'রে বৃষ্টি এলো! রিমঝিম্...রিমঝিম্...ঝমাঝম্... ঝমাঝম্... ঝমাঝম্...সঙ্গে সঙ্গে ফট্‌ফট্ ফটাফট্ শব্দে গৃহস্থদের বাড়ির সব জানলা দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ছোট বড় অট্টালিকা—একতালা, দোতালা, থেকে চারতালা, পাঁচ-তালা, ছ'তালা...কেউ বাদ গেল না। যে বৃষ্টির জন্যে এতদিন লোকের সাধ্য-সাধনার অন্ত ছিল না, তাকে পেয়ে কিন্তু লোক ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠলো।

বাইরে বৃষ্টির ধারা সমান বর্ষণ করে চলে। পদাতিকরা যে যেদিকে পারলে ছুটে পালাল। রাস্তার ধারের দোকানগুলো পর্যন্ত ঝাঁপ বন্ধ করে দিলে। রিক্স পর্দা মুড়ী দিয়ে ছুটলো, ট্রাম বাস সব সার্শি খড়খড়ি বন্ধ অবস্থায় ছুটতে লাগল।

ঝমাঝম্...ঝমাঝম্ করতে করতে বাদলের ধারা যেন নৃত্যে উন্মত্ত হয়ে ওঠে! আমি মেসের তিনতালার ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে চেয়েছিলুম বড় রাস্তার দিকে। কতদিন পরে বর্ষা এসেছে, দু'চোখ ভরে তার রূপ দেখছিলুম। চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর চওড়া রাস্তাটার অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায় সেখান থেকে। বৃষ্টির ধারা নয় যেন মুক্তার ধারা! সেই কঠিন সিমেণ্টের পথের ওপর আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা যেন শত খণ্ডে টুকরো টুকরো হয়ে রেণু-গুলোকে ছড়িয়ে দিচ্ছিল চারিদিকে। ঘোলাটে বৃষ্টি! কখনো বা ধূমেল অন্ধকার কিছু দেখা যায়, কিছু দেখা যায় না—কখনো বা শিকরকণায় বাড়িঘর পথঘাট সব অবলুপ্ত হয়ে যায়। হঠাৎ ছুটে আসে একটা বড় মোটর গাড়ি হেড লাইট জ্বালিয়ে, তারি আলোতে ঝকমকিয়ে ওঠে চারিদিক জরির পর্দার মত। চলন্ত গাড়ির জলকাটার শব্দ একটা অদ্ভুত রাগিণীর সৃষ্টি করে মনের মধ্যে আবার মিলিয়ে যায়।

হঠাৎ পাশের বাড়ির দোতালা থেকে ক্ষান্ত পিসীর কণ্ঠস্বর তীব্র হয়ে ওঠে—ওরে ও পটলি পোড়ামুখি ছাত থেকে গুলগুলো তুলে এনেছিস্ত, না এখনো বসে বসে ঘুটি খেলছিস্—যেটি না বলবো সে আর এ বাড়ির কারো মনে পড়বে না। ধিঙ্গী মেয়ে দিনরাত খেলা আর খেলা! আজ আসুক তোর বাপ অপিস থেকে! এদিকে কয়লা ফুরিয়েছে বললেই ত সে মুখ ঝমটা দেবে আমায়। বলবে, গুল দিয়ে চালাতে পারো না। এই গুলের অভাবে কত লোকের উনুনে আগুন পর্যন্ত পড়ে না, আর তোমরা সব নবাব হয়েছো! এই বলে গজ গজ করতে করতে বুড়ী যেন তার মনের সকল ঝাল ঝাড়তে থাকে সেই বারো বছরের মেয়েটার ওপর!

ক্ষান্তপিসীর কথা কানে আসতেই আমি তাড়াতাড়ি উঠে সে দিকের জানালা বন্ধ করে দিলুম। আঃ জ্বালালে দেখছি—নিশ্চিন্ত হয়ে যদি একটু বর্ষাটা উপভোগ করবার উপায় আছে!

বলতে বলতে যেমন বিছানায় এসে বসেছি, অমনি অমল এসে ঘরে ঢুকলো। মেয়েদের মত তার মাথায় বড় বড় চুল,

তাতে তেল মাখে না বলে একেই রুক্ষ—তায় কবিতার মিল খুঁজে না পেয়ে অনবরত বাঁহাতটা চুলের মধ্যে গুঁজে গুঁজে তাকে যেন বিপর্যস্ত করে তুলেছে। একটা রঙীন প্যাড্ ও সোনার কলম হাতে করে এসে সে বললে, ঘোষদা তোমার ঘরটা বেশ নির্জন, এইখানে বসে একটু লিখবো?

বললুম, কেন তোমার ঘরে কি হলো? সে দোতালায় থাকে।

কি আবার হবে! আমার ঘরে হরিশদা গান ধরেছেন হারমোনিয়ম-এ 'নাচো নাচো পিয়ারে মন্ কি মোর্'। ওর মধ্যে তুমি কবিতা লেখার কথা ভাবতে পারো!

বললুম, না, অসম্ভব। তবে এখন লেখবার কি দরকার—পরে লিখলেই হয়?

অমল যেন এবার আমায় মারতে উঠলো, বারে—এখন লিখবো না কবিতা—কতদিন পরে মেঘদূত এলো প্রিয়ার বার্তা নিয়ে—এখন তুমি চুপ করে থাকতে বলো। বলেই সে শুরু করলে, শোনো দিখিনি কেমন আরম্ভ করেছি। আবেগে তার গলা থর থর করে কাঁপছে!

আমার আকাশে বৃষ্টি নেমেছে আজ
তোমার চোখের কাজল অশ্রু সম

বা বেশ হয়েছে। ভারী সুন্দর 'আইডিয়া'। বলে অমলের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। মনে করেছিলুম, চুপি চুপি চিলে-কোঠায় উঠে বর্ষার রূপ দেখবো। কিন্তু তা আর হলো না। যেমন সিঁড়ির কাছে গিয়েছি, অমনি পাশের ঘর থেকে একসঙ্গে দু'তিনজন চেঁচিয়ে উঠলো, এই যে, ঘোষদা এসে গেছে—আমরা তোমার ঘরে যাবো ভাবছিলুম।

বললুম, কেন, কি সংবাদ? ঝমাঝম্—ঝমাঝম্ শব্দে বৃষ্টির ধারা আছড়ে পড়ছিল বন্ধ জানলার কবাটগুলোর ওপর। সেই ঘরটা সবচেয়ে বড়, তাতে ছ'টা সিট্। বিজনের তক্তপোষের ওপর সতরঞ্চিটা বিছানো ছিল, সেখানে গিয়ে বসতেই কোণের সিট্ থেকে অখিলেশ বলে উঠ্লো, কেন, আবার জিজ্ঞেস করছেন?

রমানাথ তার পাশের সিটে চিৎ হয়ে শুয়ে মাথার কাছে টেবিল লাইট্টা জ্বালিয়ে 'সঞ্চয়িতা' পড়ছিল। চেঁচিয়ে 'এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘন ঘোর বরিষায়'—

এইবার পরমানন্দবাবু এক চিলতে কাগজ আমার সামনে ধরে বললেন, আজ ফিস্ট হবে মেসে—খিচুড়ী আর চপ্—সকলকে সেইজন্যে আট আনা করে চাঁদা দিতে হবে।

মেসের সবচেয়ে পেটরোগা লোক হলেন পুলিনবাবু। মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন চিঁড়ে ভিজিয়ে লেবু ও দৈ দিয়ে খেয়ে অফিসে যান। যেমন রোগা একহারা কঞ্চির মত চেহারা, তেমনি খিট্খিটে মেজাজ। তিনি সুটকেশ খুলে একটা গরম গায়ের কাপড় বার করে গায়ে ও গলায় বেশ করে জড়াতে জড়াতে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর একগাল হেসে বললেন, এমন বর্ষাটা পুরো 'এনজয়' করতে হলে কেবল চপ্ হলে চলবে না—তার সঙ্গে ইলিশমাছ চাই। অন্তত দু'খানা করে ভাজা—বেশী নয় কি বলো হে! বলে তিনি সর্বাগ্রে পরমানন্দবাবুর মুখের দিকে তাকালেন।

বলা বাহুল্য মেসের খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে এই পরমানন্দবাবুর উৎসাহ-ই বরাবর সবচেয়ে বেশী। ভোজনরসিক বা ভোজনবিলাসী বলে নয় বরং ঠিক তার বিপরীত, অর্থাৎ ঔদরিক বলা যেতে পারে। ভাল-মন্দ খাওয়ার সুযোগ তিনি সর্বদাই খুঁজে বেড়ান। কাজেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি পুলিনবাবুর সেই প্রস্তাবটা সমর্থন করলেন। তবে তার জন্যে যখন আবার 'এক্সট্রা' কিছু দেওয়ার কথা উঠলো, তখন রমানাথ বলে উঠলো, তার চেয়ে চপ্টা ড্রপ্ করুন—খিচুড়ীর সঙ্গে ইলিশমাছ ভাজা, এর চেয়ে আর্টিস্টিক আর কি হতে পারে! তখনি ডাক পড়লো ঠাকুরের। একসঙ্গে দু'তিনজন চেঁচিয়ে উঠলো, ঠাকুর ঠাকুর বলে। কিন্তু ঠাকুরের সাড়া শব্দ নেই। বৃষ্টি পড়ছে ঝম্‌ঝম্—ঝম্‌ঝম্ শব্দে মেসের ওপর নীচে সব ঘরে তার সঙ্গীত ভরে উঠেছে।

লুঙ্গির ওপর স্যানডো গেঞ্জি চড়িয়ে সুরেশ ভিজতে গিয়েছিল নীচের তলায়। হ্যাঁচ্-চো, হ্যাঁচ্-চো করে হাঁচতে হাঁচতে সে ওপরে উঠে এসে বললে, এমন বর্ষায় কি ঠাকুরকে ডাকলেই দর্শন পাওয়া যায়? দেখো গে সে এখন অন্নপূর্ণার মন্দিরে।

অন্নপূর্ণা মেসের ঝি। সত্যি সেই উৎকল-বাসী ঠাকুর তখন তার সিঁড়ির তলার ঘরে বসে অন্নপূর্ণার হাতে সাজা পান 'গুন্ডি' সহযোগে খাচ্ছিল। বাবুদের ডাক তার কানে এসে তখনো পৌঁছয় নি। শেষে বারবেল ভাঁজা মোটা গলায় সুরেশ একটা হাঁক পাড়তেই ঠাকুরের সাড়া মিললো।

একটু পরে ঠাকুর ওপরে আসতেই সুরেশ একটা 'ফ্লাস্ক' ও ছ'আনা পয়সা তার হাতে দিয়ে বললে, বাজার থেকে আসবার সময় তার জন্য এক কাপ কফি আনবার জন্য। বৃষ্টিতে ভিজে সর্দি লেগে গিয়েছিল তার।

সুরেশের ঘরের অপর সিটে আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে থার্ড ইয়ারের ছাত্র কমলাক্ষ এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিল। কফির নাম কানে যেতেই যেন তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চাদরটা মুখ থেকে সরিয়ে বলে উঠলো, সুরেশদা আমার জন্যেও একটু কফি আনতে দিয়ো ভাই—আর এক প্যাকেট সিগারেট—উড্‌বাইন। পকেট থেকে একটা টাকা নিয়ে ঠাকুরকে দাও না ভাই।

বর্ষার ছোঁয়াচ কার মনে কিভাবে লাগে তা কে জানে!

সামনের বাড়ির স্কুলেপড়া মেয়েটা জানলার পাশে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে হাঁ করে চেয়ে ছিল সুরেশের বারবেল্ ভাঁজা জলসিক্ত দেহটার দিকে। হঠাৎ তার মা ঘরে ঢুকে বলে উঠলো, ওমা বিম্‌লি তুই এখানে? আমি যে ওপর নীচ তোকে খুঁজে খুঁজে মরছি। তা এখানে অমন করে দাঁড়িয়ে কি করছিস?

খপ্ করে মায়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বিমলা বললে, দেখো না জানলটা দিয়ে কি রকম জলের ছাঁট্ আসছে তাই বন্ধ করে দেবো মনে করছি!

বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে মা বলে উঠলেন, মনে করছি! এতে আবার মনে করবার আছে কি? এতবড় মেয়ের যদি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান থাকে! বলতে বলতে তিনি নিজেই এসে জানলাটা সশব্দে বন্ধ করে দিলেন। আর সেই অবসরে বিমলা দ্রুত ঘর ছেড়ে পালালো। বর্ষার সেই সুরেলা আব-হাওয়ায় বে-সুরো আওয়াজ মারছিল কেবল অন্নপূর্ণা। জলে ভিজতে ভিজতে যত সে কাজ করে, তত যেন তার মুখের ঝাঁজও বেড়ে চলে—ভিজে কাপড় পরে মানুষ কতক্ষণ কাজ করতে পারে—বাবুদের কাছে কাপড় চেয়ে চেয়ে আমার মুখ ব্যথা হয়ে গেছে—আমিও ত মানুষ! এভাবে আর আমি কাজ করতে পারবো না! এই ত সবে বর্ষার শুরু—মুখপোড়া বৃষ্টি এখন তিন মাস জ্বালাবে। বাবুদের আর কি—ঘরে বসে বসে ফরমাজ করবে—মরবে যত ঝি-চাকর বর্ষায়।

এইভাবে যখন সে গজগজ করছে তখন গাড়ু হাতে করে শ্যামবাবু সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছিলেন, এক কলি গান ভাঁজতে ভাঁজতে—'বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখি পাতে, তুমিও একাকী, আমিও একাকী এঘোর বাদল রাতে।'

তাঁর গলা পেয়ে অন্নপূর্ণা চুপ করে গেল কেন তা কে জানে!

আমি আবার নিজের ঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম সেই জানালার ধারে। শূন্য ঘর। কবি তার কবিতা লেখা শেষ করে চলে গিয়েছে। নিজের ঘরে গিয়ে হয়ত সে এতক্ষণ সকলকে তা আবৃত্তি ক'রে শোনাচ্ছে। আমার চোখের সামনে তেমনি দেখা যাচ্ছে চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর প্রশস্ত সড়ক। রিমঝিম্ ঝমাঝম্ ঝম্‌ঝম্ শব্দে তখনো তেমনি বৃষ্টি পড়েই চলেছে সমান বেগে। রাস্তায় লোকজন নেই। দু'-পাশের দোকানগুলোর সামনে ঝাঁপ খোলা। বড় বড় অট্টালিকার ওপর নীচের ঘরগুলোও তেমনি বন্ধ। বৃষ্টির হাত থেকে সবাই যেন নিজেকে প্রাণপণে বাঁচাতে ব্যস্ত। বোরখা-মুড়ি দিয়া হয়ত কদাচিৎ একটা রিক্সা বা একটা মোটরগাড়ী হুঁস্ করে ছুটে চলে যায়।

আমি অপলক দৃষ্টে চেয়ে আছি—নব-বর্ষার সুরের ছোঁয়াচ বুঝি লেগেছে তখন আমার মনে। ভাবছি মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতের কয়েকটা শ্লোক! এমন সময় হঠাৎ দেখি একটা ঠেলাগাড়ি—তাতে বোঝাই লোহার সিক। একটা হিন্দুস্থানী যুবক সেটা ঠেলতে ঠেলতে চলেছে, জলে তার সর্বাঙ্গ ভিজে। শুধু তার পরনে ছোট একটা কাপড়, তাছাড়া তার দেহের কোথাও আর কোন আবরণ নেই। তার পেশীবহুল দেহটা যেন বৃষ্টির জলে ধুয়ে আরো সতেজ ও সবল বলে মনে হচ্ছে। বর্ষার ছোঁয়াচ বুঝি সত্যি সত্যি লেগেছে তার মনে। তাই হাতে যেমন গাড়ি ঠেলছে, মুখে তেমনি গান ধরেছে দুর্বোধ্য সুরে। গানের ভাষাও তেমনি কিছু বুঝি না। তবে এইটুকু মাত্র আমার কানে এলো—'আরে শ্যামসখি চলে যমুনায়'—অন্তরের সমস্ত আবেগ, সমস্ত সুর যেন নিঃশেষে সে ঢেলে দিয়েছিল ভাবের সেই বাণীতে। বৃষ্টির ধারা তার মাথা দিয়ে, চোখ দিয়ে, মুখ দিয়ে, গা দিয়ে, সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন ঝরে পড়ছিল সঙ্গীতের ধারা হয়ে। ঝম্‌ঝম্—ঝম্‌ঝম্—ঝম্‌ঝম্। বৃষ্টির এই সুরের সঙ্গে তার কণ্ঠের সুর যেন কোথায় একটা মিল খুঁজে চলেছে।

একটু পরে দেখি একটা হিন্দুস্থানী ঘাগরাপরা যুবতী সামনের গলি থেকে বেরিয়ে এলো। সে আমাদের গলিতে কিছুক্ষণ আগেই হেঁকে গিয়েছিল—'মাটি চাইগো—মাটি' বলে। মাটির ঝুড়িটা তখনো তার মাথায় রয়েছে। সে সেটাকে মাথায় নিয়ে তার পাশে পাশে চলছে। ঠেলাওলার গান শুনে সে হাসছে। তার মুখে, চোখে, দেহের রেখায় রেখায় সে হাসি যেন উথ্‌লে পড়ছে বৃষ্টির ধারার সঙ্গে। ঝম্‌ঝম্ ঝম্‌ঝম্ শব্দের সঙ্গে তাদের সে গান ও হাসি মিলে মিশে গিয়ে যে ঐক্যতানের সৃষ্টি করলে তার তুলনা বুঝি মেলে না এ পৃথিবীর কোথাও।

তারা দুজনে চলেছে—চলেছে—চলেছে। কোথায় চলেছে! কোন সৌন্দর্যের অমরা-পুরীতে জানি না। শুধু তারা চলেছে অনন্তকালের নর ও নারী! আমার চোখের সামনে থেকে নিমেষে যেন অন্তর্হিত হলো সেই বাড়িঘর, সেই রাস্তা, অট্টালিকা, শহর, সভ্যতা। সব যেন মিলিয়ে গেল সেই শিশিরকণার আবৃত এক অদ্ভুত অস্পষ্ট সোনালী কুহেলিকাচ্ছন্ন জগতে। শুধু সেই গানের অনুরণন তখনো ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আমার কানে বাজতে লাগল—'আরে শ্যামসখি চলে যমুনায়।' যমুনা কখনো চোখে দেখিনি, বৃন্দাবন কোথায় জানি না, কিন্তু সেই পরম ক্ষণটিতে সেসব কথা কে যেন আমায় ভুলিয়ে দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো আমার চোখের সামনে ওই ত বইছে যমুনা, ওই ত তার বংশীবট, ওই ত তার বালুময় বেলাভূমি ধরে চলেছে অভিসারিকা শ্রীরাধা, ঝড় জল বৃষ্টি সব তুচ্ছ করে।

চাই!

শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

চাই চাই চাই,
চাই চাল, চাই বস্ত্র, চাই অর্থ চাই বহু চাই।
মনের মাঠের বুকে শুকনা ঘাসের মত চাওয়ার মিছিল,
মেঘ ঢাকা আকাশেতে বিজলী ঝিলিক সম ওঠে প্রতিধ্বনি—
নাই নাই নাই।

চাই চাই চাই।
বালক কিশোর হয়ে যায় সে বুড়িয়ে
যৌবন চাওয়ার চাপে যায় যে গুঁড়িয়ে।
ঢোকা চোখে পুরু লেন্স্ চশমাখানি দিয়ে
সবিস্ময়ে পৃথিবীকে দেখি—
চাওয়া আর পাওয়া সেথা পাঞ্জা লড়ে যেন।
মুকুরেতে হেরি নিজ মুখ
মুখ মোর হয়ে গেল লড়িয়ে পৃথিবী।
প্রিয়া এসে কাঁধে দেয় হাত
সচকিত হয়ে ঘুরি প্রিয়া নয় মূর্তিমতী চাই
চাই চাই চাই।

আর্তনাদে ঢাকা পড়ে জীবনের গান—
চাওয়ার তাগিদে সত্য মিথ্যা ঘায়ে হ'ল খান্‌খান।
বেঁচে থেকে কেন দুঃখ পাওয়া
নদী আজ পাঁকে ভরা হবে নাতো তরী মোর বাওয়া।
কেন কেন কেন?
এ প্রশ্নের কে দিবে উত্তর!
সহসা প্রিয়া মোর ভাঙ্গা মুখে আঁকিল চুম্বন—
চাওয়ার পাওয়ার সাথে হল আলিঙ্গন।
প্রশ্নের পেলেম উত্তর,
ওই ভাঙ্গা পৃথিবীর বুকে
আমি যেন চুম্বনের মত
ক্ষণ তরে জেগে আছি তবু শাশ্বত।
মনে হয় তাই
আঁধার আকাশ মাঝে লক্ষ তারার মতন—
চাই চাই চাই।

স্মৃতিকথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

৭৪

যতদূর মনে পড়ে, যোগীন্দ্রনাথের মৃত্যুর মাস পাঁচ-ছয় পরে তাঁর পুত্রগণ, তাঁদের পিতা যে-বাসনা অপূর্ণ রেখে পরলোকগমন করেছিলেন, তা বাস্তবে পরিণত করবার জন্য আগ্রহান্বিত হলেন। ভাগলপুরে আমার কাছে তাঁদের অনুরোধ-পত্র এসে পৌঁছল।

যে প্রস্তাব যোগীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় আমাকে দ্বিধাগ্রস্ত করে রাখতে পেরেছিল, মৃত্যুর মহনীয়তা তাকে আর নির্বর্তিত হতে দিলে না। পূর্বে যা ছিল বাইরের লাভ-লোকসানের বিবেচনা, এখন তা কতকটা হ'ল অন্তরের কর্তব্য-অকর্তব্যের কথা। হৃদয়-বৃত্তির কাছে বিষয়বুদ্ধি অনেকটা নতি স্বীকার করলে।

মাসিক পত্র প্রকাশ করা স্থির হয়ে গেল।

যোগীন্দ্রনাথের দুটি ইচ্ছা আমি পূর্ণ করেছিলাম। মাসিক-পত্র প্রকাশের প্রথম ইচ্ছা তিনি আমাদের কাছে নিজেই ব্যক্ত করেছিলেন; দ্বিতীয় ইচ্ছার কথা তিনি ডায়রীতে লিখে রেখে গেছলেন, যা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ডায়রি পাঠকালে জানা যায়। ডায়রির এক স্থানে পাওয়া গিয়েছিল, 'উপেনবাবুর দ্বিতীয়া কন্যাটিকেও আমি পুত্রবধূ ক'রে নিয়ে আসব।' তদনুযায়ী উভয়পক্ষের, বিশেষত স্বয়ং পাত্রের ইচ্ছা এবং আগ্রহ ক্রমে যোগীন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র কৃষ্ণকুমারের সহিত আমার দ্বিতীয়া কন্যা নীলিমার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

বিচিত্রা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ সালের পয়লা আষাঢ়; নীলিমার বিবাহ হয় ঠিক তার এক বৎসর পরে ১৩৩৫ সালের আষাঢ় মাসে। কিছুকাল বিচিত্রায় বিজ্ঞাপনাদির নিম্নে যে কৃষ্ণকুমার মুখোপাধ্যায় কর্মাধ্যক্ষের নাম প্রকাশিত হ'ত, তিনিই যোগীন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র।

মাসিক-পত্র প্রকাশ করা স্থির হওয়া মাত্র আমার নিরবসর ধ্যান-জ্ঞান-চিন্তা হ'ল কি ক'রে সে পত্রকে অনন্যসাধারণ করে তোলা যাবে। সেই যখন জীবনের দীর্ঘ-অনুসৃত অধ্যায়ে ছেদ বসিয়ে সম্পূর্ণ পৃথক্ অধ্যায়ে প্রবেশ করতে উদ্যত হয়েছি, তখন সহজে সন্তুষ্ট হওয়া হবে না। আমার কল্পনার কাগজকে একান্তই যদি বাঙলা দেশের প্রথম কাগজ না করতে পারি, অন্তত প্রথম শ্রেণীর করতেই হবে।

তা করতে হলে সে কাগজের উপর তখনকার বঙ্গ সাহিত্য-গগনের সূর্য-চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের রশ্মিপাতের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের কথাটাই ভাবতে লাগলাম বেশি;—শরৎচন্দ্র ত ঘরের মানুষ,—তাঁর সহায়তা শুধু চাইবার ওয়াস্তা। কিন্তু হায়! তখন কি জানি, কখন্ ঘরের মানুষ নিঃশব্দে বিনা নোটিশে দারুণ পরের মানুষ হয়ে বসে আছেন। সেই অতিশয় দুঃখের এবং নিরতিশয় কৌতুকের কাহিনী যথাসময়ে বলব, আপাতত রবীন্দ্রনাথের কথা বলি।

তখন প্রেমসুন্দর বসু শান্তিনিকেতন কলেজের অধ্যক্ষ। প্রেমসুন্দরের নিবাস ভাগলপুরে। তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর সত্যসুন্দর আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। প্রেমবাবুর মধ্যস্থতায় আমি রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎকারের দিন এবং সময় স্থির করলাম এবং নির্দিষ্ট তারিখের পূর্ব দিনে সকালের ট্রেনে ভাগলপুর থেকে যাত্রা করে অপরাহ্নে শান্তিনিকেতনে উপনীত হলাম।

পরদিন সকাল আটটায় রবীন্দ্রনাথের সহিত দেখা করবার সময়। চা-পানের পর প্রেমবাবুর সঙ্গে জমিয়ে বসে গল্প আরম্ভ করলাম; ভাগলপুরের গল্প, শান্তিনিকেতনের গল্প, রবীন্দ্রনাথের গল্প, আমার উদয়োদ্যত মাসিকপত্রের গল্প।

প্রেমবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার মাসিকপত্রের নাম কিছু ঠিক করেছ উপেন?"

বললাম, "কতকগুলো ভেবে রেখেছি,—তার মধ্যে একটা প্রায় স্থির করে ফেলেছি।"

ঔৎসুক্যসহকারে প্রেমবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কি বল ত?"

বললাম, "সবিতা।"*

মনে মনে একটু ভেবে দেখে প্রেমবাবু বললেন, "ভাল নাম। বড়ও নয়, শুনতেও মিষ্টি।"

বললাম, "অনেক নাম ভেবে-চিন্তে বার করেছি প্রেমবাবু,—গোটা কুড়িকের কম হবে না। তিন অক্ষর নামের মধ্যে সবিতাই শ্রেষ্ঠ। একটা চার অক্ষর নামও আমার পছন্দ।"

"কি?"

"হিমালয়।"

প্রেমবাবু বললেন, "সবিতা আর হিমালয়ের মধ্যে সবিতাই ভাল।"

বললাম, "হ্যাঁ, সবিতার মধ্যে তেজ আর দীপ্তি দুই-ই আছে। আমাদের নির্জীব আর বিমর্ষ বাঙলাদেশে এই দুটি জিনিসের বিশেষ দরকার। পারুক, আর নাই পারুক, মাসিক সবিতা যদি এ দুটি জিনিস বাড়িয়ে তোলবার কিছু চেষ্টা করে, তাও ভাল।"

প্রেমবাবু হাসতে লাগলেন।

পরদিন প্রাতে চা-পানের পর আটটার কিছু পূর্বে আমরা দুজনে রবীন্দ্রনাথের গৃহের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। আটটার সময়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রত্যাশা করবেন।

পথ চলতে চলতে প্রেমবাবু এক সময়ে আমাকে বললেন, "দেখ উপেন, কবির সময়ের মূল্য অত্যন্ত বেশি। যতটুকু তোমার কাজের কথা, তা বলা হয়ে গেলেই উঠে পড়বে।"

আমি বললাম, "একথা মনে করিয়ে দিয়ে ভালই করেছেন। কিন্তু না মনে করিয়ে দিলেও আমার ভুল হ'ত না। আমি অকারণ কবির এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করব না। তাঁর সময় নষ্ট করার মানেই ত' আমাদের নিজেদের বঞ্চিত করা।"

রবীন্দ্রনাথ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমরা উভয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে প্রণাম করে উপবেশন করলাম।

সাধারণভাবে দু-চার মিনিট আলাপ-আলোচনার পর কাজের কথা আরম্ভ হ'ল। আমার যা বক্তব্য এবং প্রার্থনা তা ত তিনি মোটামুটি পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন; তদতিরিক্ত যা দু-চার কথা তাঁর জানবার ছিল, প্রশ্ন করে করে জেনে নিলেন। মনে হ'ল, আমার উত্তরের সুস্পষ্ট এবং অনাবৃত ব্যঞ্জনায় তিনি সন্তুষ্ট হলেন। বললাম, "আপনার কাছ থেকে যে দান আমরা পাব, তা আমাদের কাগজের শিরায়-উপশিরায়

প্রবাহিত হবে; কিন্তু এ ভরসাও আপনার কাছে ক'রে যাচ্ছি, যে উৎসাহের সঙ্গে আমরা সে দানের দক্ষিণা নিবেদন করব, সে উৎসাহ আপনাকে অপ্রসন্ন করবে না। কারণ আমরা জানি, আপনাকে দেওয়ার মানে শান্তিনিকেতনকে দেওয়া, আর শান্তিনিকেতনকে দেওয়ার মানেই নিজেদের তা ফিরে পাওয়া।"

রবীন্দ্রনাথের মুখে-চক্ষে প্রসন্নতার সুস্পষ্ট দীপ্তি ফুটে উঠল; তিনি আমাকে অকুণ্ঠিত সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিলেন। উত্তরে আমি আমার অন্তরের প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম।

রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কাগজের নাম কিছু ঠিক করেছ না কি?"

বললাম, "পাকাভাবে এখনও কিছু ঠিক করিনি,—তবে আপাতত ভাবছি সবিতা রাখলে হয়।"

স্মিতমুখে প্রেমবাবু বললেন, "সবিতা ছাড়া উপেন আরও একটা নাম ভাবছে।"

আমি রবীন্দ্রনাথের সামনা-সামনি বসেছিলাম; প্রেমবাবু বসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের বাঁ পাশে একটু পিছন দিকে হ'টে। ঘাড় ঈষৎ বেঁকিয়ে প্রেমবাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত করবার চেষ্টা ক'রে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "সবিতা ত বেশ নাম। আবার কি নাম হে?"

প্রেমবাবু বললেন, "হিমালয়।"

কুণ্ঠিতস্মিত চক্ষে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "সবিতা, অথবা হিমালয়? নাঃ, তোমার পছন্দ যে উঁচু স্তরের, তা স্বীকার করতেই হল।"

কবির এই সরস বাক্যভঙ্গীতে খুশি হ'য়ে প্রেমবাবু আর আমি হাসতে লাগলাম।

রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "ওকালতি ছেড়ে দেবেই ত'?"

বললাম, "এক-একবার মনে করি, আলিপুরের আদালতে না-হয় নামটা জিইয়ে রাখলে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোধ হয় ছেড়েই দিতে হবে।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "হ্যাঁ, এক নৌকাতেই দু পা রাখা ভাল,—তা সে যে-নৌকোই হোক।"

সাধারণভাবে কথোপকথন পুনরায় চল্‌তে আরম্ভ করল।

রবীন্দ্রনাথের নিকট হ'তে লেখা পাওয়ার প্রতিশ্রুতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমবাবু ধ'রে নিয়েছিলেন, কাজের কথা শেষ হয়েছে;—তারপরও ব'সে থেকে কথা চালানোর অর্থ কবির অমূল্য সময় নষ্ট করা ভিন্ন আর কিছুই নয়। সেই বিষয়ে সচেতন ক'রে দেবার উদ্দেশ্যে তিনি ভ্রূ-আকুঞ্চন এবং শিরঃ সঞ্চালনের বিশেষ এক কৌশলের সাহায্যে আমার প্রতি ঘন ঘন নিঃশব্দ ইঙ্গিত ছাড়তে লাগলেন। আমি পড়লাম বিপদে। প্রেমবাবুর ইঙ্গিতের ফলে অনিবার্যভাবে আমার মুখে-চক্ষে-দেহে, যত সামান্যই হোক, উঠে পড়বার একটা অভিপ্রায়ের ছাপ পড়তে লাগল, অথচ রবীন্দ্রনাথের অসমাপ্ত বাক্যের মধ্যে উঠে দাঁড়াবার ধৃষ্টতা এবং প্রবৃত্তি উভয়েরই অভাববোধ করতে লাগলাম। প্রেমবাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত না ক'রে রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে যাব, তা-ও কঠিন ব্যাপার। কেবলই ঔৎসুক্য হয়, দেখি এখনও প্রেমবাবু ইঙ্গিত ছাড়ছেন কি-না; আর দেখেছি কি না দেখেছি, অমনি কি তিনি ভ্রূ নেড়েছেন!

প্রখর বুদ্ধিশালী মানুষ রবীন্দ্রনাথ। আমার দেহের উপর দুর্নিরীক্ষ্য লক্ষণ দেখে বুঝেছেন পিছন দিক থেকে নির্বাক সিগনালিং চল্‌ছে। স্মিতমুখে বললেন, "ওহে প্রেমসুন্দর!"

ব্যস্ত হ'য়ে চেয়ার ছেড়ে সামনে এসে দাঁড়িয়ে প্রেমসুন্দর বললেন, "আজ্ঞে?"

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "শহর থেকে দূরে মাঠের মধ্যে আমরা বাস করি। এখানে না আছে বাজার, না আছে দোকান। অতিথি এলে আমরা খুশি হই বটে, কিন্তু অতিথি সৎকার কি ক'রে করা যাবে, সে কথা ভেবে চিন্তিতও কম হইনে। তখন এ বাড়ি থেকে একটু ভাজা মুগের ডাল, ও বাড়ি থেকে কিছু আচার, সে বাড়ি থেকে গাছের একটা তাজা লাউ,—এইভাবে উপকরণ সংগ্রহ ক'রে আমরা অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা করি। তোমার বাড়িতে অতিথি এসেছেন, তোমাকেও তাই করতে হবে। তুমি না-হয় সেই সব ব্যবস্থা দেখগে, ইনি আমার কাছে একটু বসুন"

এ কথার পর আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করাও চলে না, আমাকে তুলে নিয়ে যাওয়াও যায় না;—"যে আজ্ঞে" ব'লে প্রেমবাবু সরে পড়লেন, আমিও চেপে বসলাম।

সঙ্গে সঙ্গে আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হবার জন্য এক প্রস্তাব করলাম; বললাম, "আমার একটা নিবেদন আছে।"

কৌতূহলী হ'য়ে রবীন্দ্রনাথ বল্‌লেন, "কি বল ত'?"

বললাম, "কাগজের সম্পর্কে এখন থেকে ত আমাকে সর্বদাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে হবে?"

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "তা ত' হবেই।"

বললাম, "আপনার সঙ্গে দেখা করতে গেলে শুধু কাজের কথাটুকু শেষ ক'রে তৎক্ষণাৎ উঠে পড়তে হয়ত অনেক সময়েই পেরে উঠ্‌ব না। আপনার সঙ্গ আর কথাবার্তা থেকে যে আনন্দ পাব, তার আকর্ষণে উঠ্‌তে উঠ্‌তে হয়ত দেরি হ'য়ে যাবে। অথচ, আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করছি, সেই চিন্তা সেই আনন্দের মধ্যে কাঁটার মতো খচ্‌খচ্‌ করবে।"

কুণ্ঠিত নেত্রে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "এ কঠিন সমস্যার সমাধান কি?"

বললাম, "আপনি যদি আমাকে আশ্বাস দেন, যখনই আপনার মনে হবে আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, আর আমার না থাকলেই ভাল হয়, তখনি আমাকে বলবেন, 'আচ্ছা, আর একদিন না-হয় এসো, আজ তুমি যাও',—তা হলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আপনার কাছে বসতে পারব।"

আমার কথা শুনে রবীন্দ্রনাথের মুখে মৃদু হাস্য ফুটে উঠল; মনে-মনে একটু কি

চিন্তা ক'রে বললেন, "আচ্ছা, সে আশ্বাস তোমাকে আমি দিলাম। কিন্তু তুমি যে কথা বললে, এমন কথা আমাদের দেশে খুব বেশি লোক বলে না। নিজের সময় আমরা নষ্ট করি,—তার না হয় একদিক থেকে কতকটা মার্জনা থাকতে পারে; কিন্তু পরের সময় আমরা এমন নির্লজ্জভাবে নষ্ট করতে জানি, যার কোনো দিক থেকেই কোনো মার্জনা নেই। চার পাঁচ দিন আগে একটি লোক কিভাবে আমার সময় নষ্ট করেছিল, তার গল্প বলি শোন।"

গল্প শোনবার জন্য উৎসুক হ'য়ে বসলাম।

রবীন্দ্রনাথ বলতে আরম্ভ করলেন।

চার পাঁচ দিন আগের কথা। সকালে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই মনের মধ্যে একটা ভাব উঁকিঝুঁকি মারতে আরম্ভ করেছে। তার মুখখানা স্পষ্ট মালুম হচ্ছে, কিন্তু আর সব অঙ্গ তখনো অস্পষ্ট। মনে-মনে সঙ্কল্প করলাম, তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে প্রাতরাশ সেরে খাতা কলম নিয়ে ব'সে তাকে বন্দী করে ফেলতে হবে।

কাজকর্ম সারতে যতই ঘোরাফেরা করছি, মনের মধ্যে ভাবটা ততই বেশি-বেশি ধরা দিতে আরম্ভ করেছে। অবশেষে ঘণ্টাখানিক পরে খাতা খুলে কলম নিয়ে যখন বসলাম, তখন সে আত্মসমর্পণ করবার জন্য প্রস্তুত।

ভাষার জালে তাকে আবন্ধ করতে উদ্যত হয়েছি, এমন সময়ে ভৃত্য এসে এক খণ্ড কাগজ দিলে, তাতে এমন এক নাম লেখা যাতে মনে হয়, আগন্তুক ভারতবর্ষের কোনো সুদূর প্রদেশের অধিবাসী। নামের উপরে ইংরাজিতে লেখা পাঁচ মিনিটের দর্শনপ্রার্থী।

সমস্যা দেখা দিলে। কি করা যায় এখন? কবিতা শেষ ক'রে যদি দেখা করতে যাই তা হলে দীর্ঘ সময়ের জন্য ভদ্রলোককে অপেক্ষা করিয়ে রাখা হ'তে পারে। সেরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষের এক প্রান্তে দুর্নাম রটে যাবে যে, বাঙলা দেশে রবি ঠাকুর নামে এমন এক অশিষ্ট মানুষ আছে, যার কাছে পাঁচ মিনিটের জন্যে দর্শনপ্রার্থী হ'লে এক ঘণ্টা পাঁচ মিনিট পরে দেখা দেয়। তা ছাড়া, একজন পাঁচ মিনিটের দর্শনপ্রার্থী বাইরে ব'সে অপেক্ষা করতে করতে ক্রমশ অধীর হয়ে উঠছে, এমন একটা উদ্বেগ মনের মধ্যে সজাগ থাকলে কবিতার পথ অবাধ হবে না। তার চেয়ে দর্শন দেওয়া সেরে এসে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসাই ভাল। পাঁচ মিনিট বই ত নয়। না হয় দশ কিম্বা পনের মিনিট;—বড় জোর আধ ঘণ্টা।

খাতার মধ্যে কলম রেখে বাইরে এসে দেখি, একটি তরুণ যুবক। আমাকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তাকে বসতে বলে আমি উপবেশন করলাম।

আমার সামনে একটা চেয়ারে কুণ্ঠিতভাবে ব'সে সে বললে, "আজ আমার সুপ্রভাত! আজ আমার জীবনের শুভদিন! আজ আমি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পুরুষের দর্শন পেলাম!"

খুসি হলাম। হিসেব মতো খুশি হওয়াই উচিত। এমন সুন্দর কথা শুনে যে খুশি না হয়, সে জড় পদার্থ। জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় থাক? কি কর? বাঙলা দেশে কবে এলে?

এ সকল প্রশ্নের অতিশয় দ্রুতগতিতে আর অতি সংক্ষেপে উত্তর শেষ ক'রে সে আবার বলতে লাগ্‌ল, "আজ আমি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পুরুষের দেখা পেলাম! আজ আমার জীবন সার্থক। আজ আমার জীবনের সুপ্রভাত!"

এবারও খুশি হ'লাম। বস্তুত কথাগুলি এতই আনন্দদায়ক যে, পুনরুক্তির প্রত্যাশায় কান খাড়া ক'রে থাকলেও দোষ দেওয়া যায় না। আমার পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, কতদিন এ অঞ্চলে থাকবে? কি উদ্দেশ্যে এ অঞ্চলে এসেছ? শান্তিনিকেতন তোমার কেমন লাগ্‌ল?

এবারও প্রথমবারের ন্যায় যত শীঘ্র এবং যত সংক্ষেপে সম্ভব আমার প্রশ্নগুলো সেরে ফেলে সে পুনরায় সেই পুরুষ আর সুপ্রভাতের অবতারণা করলে। এবার কিন্তু তেমন আর ভাল লাগল না। আমি অপরাপর প্রসঙ্গ চালাবার আর বাড়াবার চেষ্টা করি, সে কিন্তু কিছুতেই বাগ মানে না; থেকে থেকে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পুরুষকে নিয়ে টানাটানি করে।

আধ ঘণ্টা আগে 'পাঁচ মিনিট' হয়ে গেছে; অবশেষে এক ঘণ্টাও হ'তে চল্‌ল। যে কথা কিছু আগে মধু হয়ে কানে প্রবেশ করছিল, এখন তা ফুটন্ত মধু হয়ে কানকে পীড়িত করছে।

অবশেষে ঘণ্টা দেড়েক পরে সে যখন উঠে দাঁড়িয়ে আর একবার সুপ্রভাতের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করলে তখন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পুরুষের দেহের রক্ত নিশ্চয় টগবগিয়ে ফুটছিল, নইলে মাথা অমন গরম হবে কেন?

ভিতরে প্রবেশ ক'রে মুখে-চোখে মাথায় জল দিয়ে যখন খাতা নিয়ে আর একবার বসলাম তখন 'সুপ্রভাতের' উৎপীড়নে ভাব বেচারা এমন অন্ধকার রাত্রির মধ্যে আত্মগোপন করেছে যে, তার টিকিও আর দেখা গেল না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্প শেষ করলেন। শুনে কিছু হয়ত' কৌতুক বোধ করলাম;—কিন্তু দুঃখই পেলাম বেশি। পাঁচ মিনিটের দর্শনপ্রার্থীর জন্যে সেদিন হয়ত' বাঙলা সাহিত্য একটা বহুমূল্য রত্ন হতে বঞ্চিত হ'ল।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে অতিবাহিত করে প্রসন্ন মনে পরিতৃপ্ত চিত্তে প্রেমবাবুর গৃহের দিকে অগ্রসর হলাম।

(ক্রমশ)

৩৯শ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন অধিবেশনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু বক্তৃতা দিচ্ছেন

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

শ্রীঅমরেন্দ্রকুমার সেন

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু গত ৩রা জানুয়ারী কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে এক নবনির্মিত মণ্ডপে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সপ্তদিবসব্যাপী ৩৯তম অধিবেশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রসঙ্গে মানবকল্যাণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অধিকতর প্রয়োগের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি তাঁর অর্ধঘণ্টাস্থায়ী আবেগপূর্ণ ভাষণে ভারতের অগ্রগতির পথে বিজ্ঞানের অপরিহার্য সহায়তার উল্লেখ করে বলেন যে, দুঃখ দুর্গতির হাত থেকে ভারতের অধিবাসীদের নিষ্কৃতি এবং দেশের বিবিধ সমস্যার সমাধান করতে হলে বিজ্ঞানীদের এগিয়ে আসা অবিলম্বে প্রয়োজন। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী আরও বলেন যে, ঐ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানীদের আজ সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে, বিজ্ঞানীরূপে নয় মানবরূপে প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে অহঙ্কার ও অভিমান ত্যাগ করে। আজ পৃথিবীতে বহু ঘটনা ঘটছে যা প্রশংসার যোগ্য নয়, অথচ জগতে অগ্রগতির সামর্থ্যও বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানের ঘাতপ্রতিঘাত ও বিপদ-সঙ্কুল পৃথিবীতে বুদ্ধিজীবীদের যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে সে সকলের মীমাংসা করবার ক্ষমতা মানবসমাজের আছে কিনা সে প্রশ্ন আজ দেখা দিয়েছে। আজ ধ্বংসের জন্য মানুষের মধ্যে যেন একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞানের উন্নতি অনুপাতে 'মানুষ'এর উন্নতি কেন এত পশ্চাতে পড়ে রয়েছে? বস্তুজগতে প্রকৃতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞান যে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে, মানুষের মানসিক ক্ষেত্রে তদনুরূপ কোনও সাফল্যই তো বিজ্ঞান আজও দাবী করতে পারে না—কেন এবং কি কারণে? মানুষের বিজ্ঞান মানুষকে এমনভাবে ছাড়িয়ে গেছে যে মানুষ আজ মেসিন-এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়েছে। শ্রী নেহরু এই কথা বলে তাঁর অভিভাষণ শেষ করেন যে, যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষের সৃজনী শক্তিকে পরিণামে নষ্ট করে দেবে কিনা, এই জন্য তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। হয়তো বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে যান্ত্রিক সভ্যতার এ রকম কোনও আঘাত আসবে না। কিন্তু প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সে বিষয়ে গভীরভাবে সকলেরই চিন্তা করে দেখা উচিত।

সভাপতির ভাষণ

এবার বিজ্ঞান কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করলেন ডক্টর জে এন মুখার্জি। বর্তমানে তাঁর বয়স ৫৮। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এম এস-সি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎকালীন পালিত-অধ্যাপক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সহকারী নিযুক্ত হন। ১৯২১ সালে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর উপাধি দ্বারা ভূষিত হন এবং সেই বৎসরই কলকাতা বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। দিল্লীতে অবস্থিত ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ

প্রাক্তন সভাপতি অধ্যাপক ভাবার নেতৃত্বে বিজ্ঞানীদের সভামণ্ডপে গমনের দৃশ্য

ইনস্টিটিউটের তিনি পাঁচ বৎসর অধ্যক্ষ ছিলেন। বর্তমানে তিনি রুড়কিতে সেণ্ট্রাল বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ। ডক্টর মুখার্জি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন বিজ্ঞানী। এদেশে রসায়নশাস্ত্রের কলয়েড নামক বিজ্ঞান এবং মৃত্তিকা বিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণা তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন।

সভাপতির অভিভাষণে তিনি প্রস্তাব করেন যে, শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন সম্পর্কিত সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য বিজ্ঞান ও শিল্প-বিজ্ঞান (টেক্‌-নোলজি) কিরূপে প্রকৃষ্টভাবে উন্নত ও ব্যবহৃত হতে পারে, ভারতীয় বিজ্ঞানীদের চিন্তায় ও আলোচনায় তার স্থান থাকা উচিত। তিনি আরও বলেন যে, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও স্থানীয় পরিবেশ থেকে গৃহীত উদাহরণের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা বিদ্যালয়সমূহে এবং বয়স্ক শিক্ষণ পরিকল্পনায় পাঠ্য বিষয়সমূহের অংশ হওয়া উচিত। শিক্ষা বিভাগসমূহের এইরূপ শিক্ষার জন্য উপকরণ সরবরাহ করা উচিত এবং স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষকদের বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত। বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য প্রচারের জন্য পুরস্কার প্রদান, বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িক পত্রিকাসমূহকে অর্থ সাহায্য প্রদান এবং বিদেশী ভাষাসমূহে প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ

সাধারণ সভাপতি
ডক্টর জে এন মুখার্জি

বা পুস্তকের অনুবাদ দ্বারা বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধ রচনায় উৎসাহ দেওয়া উচিত। সমস্ত ভারতীয় ভাষায় যাতে একই বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহৃত হয়, সেজন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। ডক্টর মুখার্জি জমি ও চাষ সম্বন্ধে নানা বিষয়ে আলোচনা করে এই বলে তাঁর অভিভাষণ শেষ করেন যে, বিজ্ঞানের সাহায্যে যদি দেশের সমস্যার দ্রুত সমাধান করতে হয়, তাহলে বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা সম্প্রসারিত করতে হবে। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন খুব অল্প সময়ের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ব্যতীত, পশ্চিম-বঙ্গের রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও অভি-ভাষণ প্রদান করেন।

পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতি

এবার পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতি ছিলেন, বাঙ্গালোর সেণ্ট্রাল কলেজের অধ্যাপক ডক্টর এস রামচন্দ্র রাও। বর্তমানে তাঁর বয়স ৫২ বৎসর। একদা তিনি কলকাতায় সি ভি রমণের অধীনে আলোক বিচ্ছুরণ সম্বন্ধে গবেষণা করে-ছিলেন। ১৯৩০ সালে তিনি লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পি এইচ ডি উপাধি লাভ করেন। বর্তমান পদ-প্রাপ্তির পূর্বে তিনি আন্নামালাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন। লণ্ডন ইন-স্টিটিউট অফ ফিজিক্সের তিনি একজন ফেলো। তিনি তাঁর অভিভাষণে স্ফটিকের চুম্বকত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

ডাঃ এস রামচন্দ্র রাও

রসায়ন শাখার সভাপতি

রসায়ন শাখায় সভা-পতিত্ব করলেন ডক্টর আর ডি দেশাই। সুরাটে ১৮৯৭ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। লণ্ডনে ইম্পিরিয়াল কলেজ অফ সায়েন্স অ্যাণ্ড টেক্‌নোলজিতে গবেষণা করে তিনি ডি এস-সি উপাধি লাভ করেন। দেশে ফিরে এসে কিছুকাল তিনি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যান্য স্থানে অধ্যাপনা করেন। বর্তমানে তিনি আমেদাবাদে এল ডি আর্টস কলেজের অধ্যক্ষ। রসায়নের জটিল বিষয়ে তিনি বহু গবেষণা এবং মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ডক্টর রামচন্দ্রের ন্যায়

ডাঃ আর ডি দেশাই

তিনিও রসায়নের একটি জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর অভিভাষণের বিষয় ছিল "বায়ারের স্ট্রেন থিওরি"।

গণিতশাস্ত্র শাখার সভাপতি

ডাঃ বি বি সেন

হুগলী মহসিন কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর বি বি সেন গণিতশাস্ত্র শাখায় সভাপতিত্ব করেন। মিশ্র গণিতে এম এস-সি পরীক্ষায় তিনি ১৯২১ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। বাগেরহাট কলেজ, আগ্রা কলেজ, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেছেন। দেশে ও বিদেশে বহু পত্রিকায় তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি তাঁর অভিভাষণে শিল্প-বিজ্ঞানে গণিতের সহায়তা, বিশেষ করে সাম্য ও স্পন্দন সংক্রান্ত সমস্যার উল্লেখ করেন। পূর্ত-বিজ্ঞানে গণিতের গুরুত্বের ওপর তিনি বিশেষ জোর দেন।

উদ্ভিদবিদ্যা শাখার সভাপতি

উদ্ভিদবিদ্যা শাখার সভাপতি ছিলেন ডক্টর এস্ রামানুজম। তাঁর জন্ম এবং ছাত্র জীবন মাদ্রাজে। তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন এবং বর্তমানে কটকে সেন্ট্রাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন। উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ে তাঁর বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ উচ্চশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তাঁর বয়স ৪৮ বৎসর।

অসংখ্য কোষ অথবা সেল্ দ্বারা জীব ও উদ্ভিদ দেহ গঠিত। এই কোষের বিশেষ যে বিজ্ঞান তার নাম কোষবিজ্ঞান অথবা সাইটোলজি। সাইটোলজি বৃক্ষবিজ্ঞানের উন্নতিসাধন করে মানুষেরও যে উপকার সাধন করতে পারে, ডাঃ রামানুজন তাঁর অভিভাষণে তারই আভাষ দেন। বর্তমানে কোষবিজ্ঞানের প্রচুর উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং ভারতে তার প্রয়োগ করা হয়েছে; এ বিষয়েও তিনি উল্লেখ করেন।

নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব শাখার সভাপতি

বাহান্ন বৎসর বয়স্ক অধ্যাপক তারকচন্দ্র রায়চৌধুরীর জন্মস্থান ফরিদপুর। ১৯২২ সালে তিনি নৃতত্ত্বে এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন। ১৯২৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

ডাঃ টি সি রায়চৌধুরী

রাঢ়ী, বারেন্দ্র, দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থ, পোদ, নমঃ-শূদ্র ও বাগদী প্রভৃতি জাতির ও শাখা জাতির লোকদের দেহ, মস্তক ও নাকের গঠন সম্পর্কে আলোচনা করে ডক্টর রায়চৌধুরী তাঁর ভাষণে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, বাঙলাদেশের অধিবাসীদের সঙ্গে বাঙলাদেশে পরবর্তী সময়ে আগত লোকদের পার্থক্য ছিল। বাগদী ও নমঃশূদ্রের মধ্যে এখনও এই পার্থক্যের চিহ্ন লক্ষিত হয়। এই লক্ষণ প্রাক্ দ্রাবীড় বা নিষাদ আমলের পরিচায়ক। তিনি মনে করেন যে, এক জাতিকে তপশীলী জাতি বলে মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। মাদ্রাজে যেমন তপশীলী জাতি দেখা যায়, বাঙলা দেশে সে রকম কোনো জাতি নেই। অবশ্য বাঙলা দেশে শিক্ষা অথবা আর্থিক দিক দিয়ে অনগ্রসর লোক আছে, কিন্তু রাষ্ট্রের কর্তব্য তাদের উন্নতি সাধন করা। তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করলে সমস্যা সমাধান হবে না। ফলে তারা বরাবর পঙ্গু হয়ে যাবে। এই ব্যবস্থা গণতন্ত্র, ঐক্য ও স্থিতি বিরোধী।

প্রাণিবিদ্যা শাখার সভাপতি

বাঙ্গালোর সেন্ট্রাল কলেজের প্রাণিবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক ডক্টর বি আর শেষাচার এই বৎসর প্রাণিবিদ্যা শাখার সভাপতি। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এস-সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন। তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি এস-সি। কিছুদিন পূর্বে তিনি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ও ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে এসেছেন।

ডাঃ বি আর শেষাচার

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন তিনি যে গবেষণা করেছিলেন, তার স্বীকৃতিস্বরূপ নিউ ইয়র্কের রকফেলার ফাউণ্ডেসন বাঙ্গালোর সেন্ট্রাল কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগকে যন্ত্রপাতি কেনবার জন্য প্রচুর অর্থ দান করেন। তিনি তাঁর অভিভাষণে নিউ-ক্লিক অ্যাসিডের গুরুত্ব স্বীকার করে বলেন যে, আমাদের শরীরে অভ্যন্তরে যতরকম রসায়ন আছে তার মধ্যে নিউক্লিক অ্যাসিডই বোধহয় সর্বাধিক প্রয়োজনীয়। নতুন জীবসৃষ্টিতে এর দান অতুলনীয়।

ভূগোল ও ভূবিদ্যা শাখার সভাপতি

উক্ত শাখার সভাপতিত্ব করেন ডক্টর এল এন আয়ার। ১৯১৫ সালে মাদ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে ভূগোল বিজ্ঞানে এম এ পাশ করেন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি কিছুকাল অধ্যাপনাও করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি বিলাতেও গিয়েছিলেন এবং সেখানে ইম্পিরিয়াল কলেজ অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেক্নোলজিতে অধ্যয়ন করেন এবং পি এইচ ডি লাভ করেন। পরে তিনি ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষাতে যোগদান করেন এবং বিভিন্ন কাজে পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম হন। তিনি কিছুকাল কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজেও অধ্যাপনা করেছিলেন। তিনি তাঁর অভিভাষণে ভারতের অভ্রশিল্পের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, ভারতীয় অভ্র বিনা আজ পৃথিবীর বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি নির্মাণ কতদূর সাফল্য লাভ করত তা বলা শক্ত। ভারতের এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পটির উন্নতির জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করা আশু প্রয়োজন; একথাও ডক্টর আয়ার বলেন।

ডাঃ এল এন আয়ার

শারীর বিজ্ঞান শাখার সভাপতি

এবার শাখা সভাপতিদের মধ্যে বয়ো-কনিষ্ঠ হলেন ডক্টর সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বয়স ৪১ বৎসর কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি ডায়াবেটিস

রোগের গবেষণায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম-বি। বর্তমানে তিনি প্রেসি-ডেন্সী কলেজের শারীর বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতির সর্বপ্রথম ভারতীয় ফেলো। তিনি তাঁর অভি-ভাষণে বলেন যে, শরীরে ভিটামিন সি'এর অভাব হলে অ্যালোক্স্যান নামক রসায়ন উৎপন্ন হয় যা ইনস্যুলিনকে নষ্ট করে দেয়, ফলে ডায়াবেটিস নামে রোগ হয়।

ডাঃ এস ব্যানার্জি

ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতু নিষ্কাসন বিজ্ঞান শাখার সভাপতি

ডক্টর জে এন বসু উক্ত শাখায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি বিদেশে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন এবং বার্লিনে ডক্টরেট লাভ করেন। তিনি একদা বার্লিন ও অন্যান্য স্থানের সাতটি কারখানার সহিত যুক্ত ছিলেন এবং পরে বৃটেন ও ইয়োরোপে ৩০টি কার-খানায় কাজ করেন। তিনি যাদপুর কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজিতে অধ্যাপনা করেন। ভারতবর্ষের বহু প্রতি-ষ্ঠানে তিনি উপদেষ্টারূপে কাজ করেছেন। দেশে ও বিদেশের বহু বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত আছেন। দেশের উন্নতিকল্পে কিরূপ শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন তিনি তাঁর অভিভাষণে সেই বিষয়ে বিশদ আলেচনা করেন। দেশের উন্নতির জন্য তিনি ইঞ্জিনিয়ারদের নিস্বার্থ-ভাবে আত্মনিয়োগ করতে অনুরোধ জানান।

ডাঃ জে এন বসু

পরিসংখ্যান শাখার সভাপতি

পরিসংখ্যান শাখার সভাপতির নাম হল ডক্টর এন এস আর শাস্ত্রী। তিনি ১৯৩৪ সালে গবেষণামূলক প্রবন্ধ পেশ করে এম এস-সি উপাধি লাভ করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি লণ্ডন গমন করেন এবং পি এইচ-ডি লাভ করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব পরিসংখ্যান কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেন। তিনি তিনি তাঁর অভিভাষণে বলেন যে, উপযুক্ত পরিসংখ্যান প্রয়োগের অভাবে বহু তথ্য ভুল সংগৃহীত হয়। এজন্য পরিসংখ্যানের প্রয়োজন। কিন্তু উপযুক্ত সংখ্যক পরিসংখ্যানবিদের অভাব মেটাতে পারে যথোপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা। অবশ্য সে সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

ডাঃ এন এস আর শাস্ত্রী

মনোবিদ্যা ও শিক্ষা-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি

অধ্যাপক পরশুরাম ১৯০৫ সালে পাঞ্জাবের ফতেগড়ে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২১ সালে অসহ-যোগ আন্দোলনে তিনি যোগদান করেন। মালাবারের অনুন্নত হিন্দুদের মধ্যে কাজ করবার সময় তিনি মনোবিদ্যা অধ্যয়ন করতে শুরু করেন এবং ১৯৩০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ পাশ করেন। মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি বহু মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

অধ্যাপক পরশুরাম

চিকিৎসা ও পশু চিকিৎসা শাখার সভাপতি

ডাঃ খানোলকারের জন্ম ১৮৯৫ সালে। ১৯২৩ সালে তিনি প্যাথলজিতে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এবং সেই বৎসরে এক-মাত্র তিনিই কৃতকার্য হন। তাঁর পূর্বে দু' বছর কেউ ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। ভারতবর্ষে আধুনিক প্যাথলজি সম্পর্কে শিক্ষাদান ব্যবস্থার তিনি একজন প্রবর্তক। বর্তমানে তিনি ভারতীয় ক্যান্সার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ। বিদেশে তিনি প্রচুর সমাদর লাভ করেছেন।

ডাঃ ভি আর খানোলকর

অন্যান্যবারের মতো এবারেও বিদেশ থেকে প্রায় চল্লিশজন স্বনামধন্য বিজ্ঞানী এসেছেন। তবে এবারের বিশেষত্ব হল, জাপানী বিজ্ঞানীদের নিমন্ত্রণ এবং তাঁদের আগমন। যে সকল বিজ্ঞানী এসেছেন, তাঁদের মধ্যে আমাদের দেশে অধ্যাপক জে বি এস হলডেন, তাঁর লেখার মাধ্যমে আমাদের কাছে পরিচিত। ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পশ্চিম জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং ইংলণ্ড থেকেই বিজ্ঞানীরা এসেছেন।

ঠিক হয়েছে যে অগামীবারে বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন লক্ষ্ণৌ শহরে বসবে। সভাপতি মনোনীত হয়েছেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যক্ষ ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বসু। বিভাগীয় সভাপতিরাও মনোনীত হয়েছেন এবং নীচে তাঁদের নাম দেওয়া হলঃ—

গণিত-বিদ্যা—অধ্যাপক ভি ভি নার্লিকর (বারানসী), পরিসংখ্যান—ডক্টর এইচ সি সিংহ (কলিকাতা), পদার্থ-বিদ্যা—ডক্টর এন আর তওদে (বোম্বাই), রসায়ন—ডক্টর ইউ পি বসু (কলিকাতা), ভূতত্ত্ব ও ভূগোল —অধ্যাপক এন এল শর্মা (ধানবাদ), উদ্ভিদ-বিজ্ঞান—আর কে শকসেনা (এলাহাবাদ), প্রাণি-বিজ্ঞান ও কীটতত্ত্ব—ডক্টর এন আর পানিক্কর (মণ্ডপম্), নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব—শ্রী এম এস ভাট (নয়াদিল্লী), চিকিৎসা ও পশুবিজ্ঞান—ডক্টর এস সি এ দত্ত (আইজট-নগর), কৃষিবিজ্ঞান— ডক্টর এন পার্থসারথি (নয়াদিল্লী), শারীর-বিজ্ঞান—ডক্টর এন ডি কাহার (আইজটনগর), মনোবিদ্যা ও শিক্ষণ-বিদ্যা—অধ্যাপক যমুনাপ্রসাদ (রাঁচী), পূর্ত ও ধাতু নিষ্কাশন বিজ্ঞান—শ্রী এস কে সরকার (মানভূম)।

বেতারে নবাগত রবীন্দ্র-সংগীতের শিল্পী

কিছুকাল থেকে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গানের যে একটি বিশেষ আদর হয়েছে, তা সকলেই লক্ষ্য করে আসছি। প্রায় প্রত্যেক শহরেই অল্পবিস্তর রবীন্দ্র-সংগীতের চর্চা ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। তবে কলকাতাই হচ্ছে রবীন্দ্র-সংগীত চর্চার বড় কেন্দ্র। কলকাতায় সংগীত বিদ্যালয়ের সংখ্যা আজকাল যথেষ্ট বেড়েছে, সেই সঙ্গে প্রায় প্রত্যেক কেন্দ্রেই রবীন্দ্র-সংগীতের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এর মধ্যে কতগুলি সংগীত বিদ্যালয় কেবল-মাত্র রবীন্দ্র-সংগীতের শিক্ষার জন্যেই প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ এক ধরণের সংগীত-শিক্ষার ব্যবস্থা সত্ত্বেও বিদ্যালয়গুলি ভাল-ভাবেই চলেছে। কিন্তু একটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করেছি তা হল এই যে, রবীন্দ্র-সংগীতের প্রসারের সঙ্গে দলগত ভেদবুদ্ধিও এতে ভালভাবেই দেখা দিয়েছে। এই ভেদবাদীরা কথা তুলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথের গায়কী এমন একটি ব্যাপার যাকে ঠিক মত আয়ত্ত না করতে পারলে রবীন্দ্র-সংগীত গাওয়া যায় না। অথচ সেই গায়কীটি যে ঠিক কি, সেকথা পরিষ্কার করে কাউকে ব্যক্ত করে বলতে শুনি নি। যাক্ এই কথা নিয়ে একে অন্যকে যে ছোট করবার চেষ্টা করে, তাও লক্ষ্য করেছি এবং এও দেখেছি যে, খাঁটি গায়কীর কথা তুলে নিজেদের সংগীত-কৌলিন্যকে বড় করে দেখাবার জন্যে অনেকে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যেভাবেই হোক একটা যোগাযোগ রচনা করবার চেষ্টা করেন। তাকেই মূলধন করে শান্তিনিকেতনের বাইরে তারাই যে একমাত্র রবীন্দ্র-গায়কীর ধারক একথা প্রাণপণে প্রচার করেন। তাঁরা বলেন যে, খাঁটি রবীন্দ্র-সংগীতের গায়কী যদি কেউ শিখতে চান, তবে তাঁদের কাছেই আসা উচিত, কারণ তাঁদের দলের শিল্পী ছাড়া আর সকলেই রবীন্দ্রনাথের গানকে বিকৃত করে গাইছেন। এইভাবে রবীন্দ্র-সংগীতের মধ্যে একটা উচ্চ-নীচ ভেদাভেদের ঝগড়া ভিতরে ভিতরে বেশ জমে উঠেছে ও সর্বজন-ভোগ্য রবীন্দ্র-সংগীতের উপর একাধিক দল এই উপায়ে নিজেদের প্রাধান্য রাখবার প্রবল চেষ্টা করছে। এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে মন-কষাকষিও প্রবল। ফুটবল খেলোয়াড়দের মত এ প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে সুবিধামত দলত্যাগ করার অভ্যাসও কোন কোন শিল্পীর মধ্যে দেখা দিয়েছে। এক প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে গিয়ে স্বতন্ত্র দল রচনাও হচ্ছে মাঝে মাঝে। শান্তিনিকেতন-প্রত্যাগত একদল ছাত্র-ছাত্রীও যে এই আন্দোলনের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে, তা-ও আমাদের গোচরে এসেছে। এইরূপ ভেদাভেদের প্রভাব কল্‌কাতার বেতার-কেন্দ্রকেও কিভাবে আচ্ছন্ন করেছে, সেই কথাই আমরা বলবো।

রবীন্দ্র-সংগীতে কৌলীন্য-প্রচারের প্রভাবে এঁরাও ধরা প'ড়ে গেছেন এবং যে শিল্পীরা প্রচারের দ্বারা অন্যদের থেকে উপরে উঠ্‌তে পেরেছেন, বেতারে রবীন্দ্র-সংগীত গাইবার একমাত্র উপযুক্ত বলে তাঁরাই নির্বাচিত হচ্ছেন। বেতারের স্নেহ একমাত্র তাদের উপরেই অকাতরে বর্ষিত হচ্ছে। অন্যান্যদের কোন উপায় নেই সেখানে প্রবেশের। কারণ প্রচারের সুবিধায় তারা অন্যদের নীচে পড়ে আছে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে দু-একটি ছাড়া আর কাউকে রবীন্দ্র সংগীতের আসরে আজকাল আর ডাকা হচ্ছে না। অথচ আমরা জানি, কলকাতা শহরে আরো কয়েকটি সংগীত প্রতিষ্ঠানে রবীন্দ্র-সংগীতের চর্চা সুষ্ঠুভাবেই হচ্ছে। এ ছাড়া এই দলগত প্রাধান্যের প্রভাবে বেতারে কিছু নবাগতের আবির্ভাব লক্ষ্য করে আসছি বেশ কিছুকাল থেকে, যাদের গান আমাদের কানে মোটেই সুখকর মনে হয় না। এর একটা বড় কারণ হ'ল তাদের কণ্ঠস্বর মার্জিত হয়নি এখনো। শোনা যায়, এর মধ্যে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রী অথবা শান্তি-নিকেতনের আশীর্বাদপুষ্ট কলকাতার শিল্পীও কিছু আছেন। এই সব নবাগতদের কণ্ঠস্বরে শিল্পনৈপুণ্য নেই, অথচ তাঁরা কৌলিন্যের নামে বেতারে মাসের পর মাস গান গেয়ে যাচ্ছেন। এঁদের বেলায় বেতার পরিচালকদের কোন চেতনা নেই। শুনি, কণ্ঠ পরীক্ষা করা বেতারের বিশেষ নিয়ম। এই সব নবাগতেরা সেই নিয়মে কি করে পাশ করে যাচ্ছে, তাও বুঝি না।

এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আমরা বেতার পরিচালকদের সচেতন করছি মাত্র। কারণ আমরা বেশ বুঝতে পারছি যে, দলগত প্রচারের মোহে তাঁরা বেশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। নিরপেক্ষ হয়ে, মনে সাহস রেখে এই দুর্বলতাকে পরিহার করুন। বেতারকে দলগত প্রাধান্যের অন্ধকার থেকে বাইরে এনে আলোর মুখ দেখ্‌তে দিন।

বিভিন্ন রাজ্যের খাদ্যাবস্থা

গত ২৬শে ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের খাদ্যাবস্থা কিরূপ ছিল তাহা নিম্নে বিবৃত করা হইতেছে:—

বোম্বাই

গত সপ্তাহে বোম্বাই পশু চিকিৎসা কলেজের হীরক জয়ন্তী উদ্বোধন করিয়া ভারতের খাদ্য ও কৃষি সচিব শ্রী কে এম মুন্সী বলেন যে, ভারত কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ায় বন, কৃষি ও পশু পালন ভারতীয় অর্থনীতির প্রধান অঙ্গ হইয়া থাকিবে। কিন্তু ভারতে পশু পালনের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। শুধু সরকারী অর্থের অভাব নহে, জনসাধারণের পশুপ্রীতির অভাবও ইহার কারণ হইয়া আছে।

সামুদ্রিক মৎস্য শিকার শিল্পের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সালে বোম্বাইতে একটি কেন্দ্র খোলা হইয়াছিল। এই কেন্দ্রটির যথাযথ পরিচালনায় সরকারকে পরামর্শ দিবার জন্য সম্প্রতি উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করা হইয়াছে।

দিল্লী

ভারত সরকার দিল্লী রাজ্যে বেসরকারীভাবে বার্লি আমদানীর সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এখন বার্লি আমদানী, বিক্রয় ও চলাচল সম্পর্কে কোনরূপ বাধা—নিষেধ থাকিবে না। তবে রাজ্যের বাহিরে চালান দিতে হইলে জন সংভরণ বিভাগের ডাইরেক্টারের অনুমতি লইতে হইবে।

কাশ্মীর

ব্যাপকভাবে উন্নত ধরণের পশু উৎপাদনের জন্য কাশ্মীর সরকার দুইটি কেন্দ্রীয় প্রজনন কেন্দ্র এবং ৮টি জেলা প্রজনন কেন্দ্র স্থাপনের এক পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় প্রজনন কেন্দ্রগুলি প্রথমে উন্নত ষাঁড় উৎপাদন করিবে এবং তাহাদের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্যাদি সম্বন্ধে গবেষণা চালাইবে।

পাঞ্জাব

রাষ্ট্রপতি সম্প্রতি প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন করিয়া অস্থায়ী প্রজাদের নিম্নতম স্থায়িত্বের মেয়াদ ৪ বৎসর হইতে বাড়াইয়া ৫ বৎসর করিয়া দিয়াছেন। এই আইনের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংশোধন করিয়া প্রজার স্বার্থরক্ষা করা হইয়াছে।

বাগদাদ (গোল্ডেন পিকচার্স—ইন্দ্রপুরী স্টুডিও)—কাহিনী, চিত্রনাট্য, গীত ও পরিচালনা—শ্যাম চক্রবর্তী; আলোকচিত্র ঃ জয়ন্তজানী, শব্দযোজনা ঃ শিশির চট্টোপাধ্যায়, সংগীত পরিচালনা ঃ রবি রায় চৌধুরী ও শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়; শিল্প-নির্দেশ ঃ বটু সেন; ভূমিকায় ঃ বিকাশ রায়, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, হরিধন, প্রীতি মজুমদার, সন্তোষ সিংহ, শ্যাম লাহা, প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়, নবদ্বীপ, তুলসী চক্রবর্তী, আশু বোস, বেগমপারা, নীলিমা দাস, রেবা বোস, পদ্মা, বেলা বোস প্রভৃতি। মল্লিক ডিস্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনে ৪ঠা ডিসেম্বর মিনার, বিজলী ও ছবিঘরে মুক্তিলাভ করেছে।

এ-ই তো বেশ ভালো—

বাস্তব জীবনের কথা নয়, ইতিহাস-ভূগোলের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। কৃষ্টি সংস্কৃতি, আচার বিচার, হাবভাব চালচলন, ভাষা গান, সাজ আসবাব, কিছুর সঙ্গে স্থান কালের কোনরকম মিলের কোন প্রশ্ন নেই। নিছক কাল্পনিক ব্যাপার, সুতরাং কোন কৈফিয়ৎ দেবারও পরোয়া নেই। খানিকটা হাসি, খানিকটা গান আর ঐ সবকে বাহন করে নিয়ে একটা সোজা সহজ শাশ্বত প্রণয় কাহিনী—ক্লান্ত মনে আয়েস নিয়ে আসতে তা-ই যথেষ্ট। 'বাগদাদ' ঠিক এমনই একখানি ছবি—প্রত্যক্ষ জীবনের আসল চেহারা ফুটিয়ে তোলায় অপারগ মনের পলায়নপরতার বেশ একখানি আমুদে নিদর্শন।

অনেক দিকের অনেক রকম দুর্বিপাকের মধ্যে পড়ে বাঙলা ছবির আয়ুর খাতে টান পড়েছে। সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে বাঙলা ছবি দেখিয়ে পয়সা আমদানী করানো নিয়ে। কোন পথে যে সে সম্ভাবনা ওঁত পেতে রয়েছে তারও কোন হদিস নেই। তাই পরীক্ষা চলেছে নানা দিক দিয়েই। বম্বের ছবি বাঙলা দেশেও প্রভূত সমাদৃত, অনেকে সে কারণে বাঙলা ছবিতে বম্বাই ছবির চেহারা ও স্বভাব নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। অনেকে, সে-দিক দিয়েও সুবিধে হচ্ছে না ধরে নিয়ে পলায়নপরতার চূড়ান্ত পরিচয়ের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন 'বাগদাদ' প্রভৃতি আগাগোড়া কল্পনার ছাঁচে অবাস্তবতার ওপরে। এরা আমোদ বিতরণে কতখানি সাফল্য অর্জন করতে পারবেন, অথবা আদপেই সফল হতে পারবেন কি-না সেটা এখনই বলে দেওয়া সম্ভবপর নয়, কারণ কালের গতিতে বাঙলা ছবির দর্শকদের মন এখন কোন্ রুচির ভক্ত হয়েছে তার কোন পাত্তা জানতে পারা যায় নি। কিন্তু এটা বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, বাঙলা ছবি বলতেই সারা ভারতের লোকে যে একটি বিশেষ চারিত্রিক ও প্রকৃতিগত গুণসম্পন্ন ছবির কথা মনে করতো সে বৈশিষ্ট্য নিয়ে বড়াই করার আর কিছু থাকতে দেওয়া হচ্ছে না।
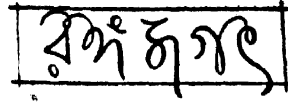
'বাগদাদ'-দের মতো রূপক ছবির আঙ্গিক জৌলুষটাই হচ্ছে আকর্ষণের বড়ো কথা। কিন্তু বাঙলা ছবির দৌড় কতদূর পর্যন্ত হতে পারে? এ সব ছবির সম্পদই হচ্ছে সাজসজ্জা ও শোভার প্রাচুর্য যা সাধারণের কল্পনাকেও স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু সে রকমটি ফুটিয়ে তুলতে বাঙলা ছবির ক্ষমতা তো নেহাৎই সীমাবদ্ধ। বম্বের বা অন্যান্য জায়গার ছবির যাদের প্রশস্ততর বাজার তাদেরই পোষায় ঐ সব ধরণের ছবি তোলা। বাঙলাতে তা তুললে তা বাঙালী দর্শকদের কাছে কেবল বাঙলা ছবি হিসেবেই হয়তো খানিকটা বৈচিত্র্য নিয়ে আসতে সক্ষম হবে, কিন্তু মনকে তৃপ্তিতে ভরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আর পাঁচ রকমের ব্যর্থ প্রয়াসের চেয়ে খুবই সামান্য বেশী সম্মান লাভ করতে পারবে।

ছবি হিসেবে 'বাগদাদ' সত্যিই বাঙলা ছবির ক্ষেত্রে বেশ একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ সৃষ্টি। একেবারে হালকা জিনিসের মধ্যে দিয়ে মনে খানিকটা গুরুত্ববিহীন আমোদ সঞ্চার করার কৃতিত্ব ছবিখানিতে ফুটে উঠতে পেরেছে। বাঙলা ছবির প্রকৃতিগত ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এতে নেই, আবার অন্য দেশের এই ধরণের রূপক শ্রেণীর চিত্র রূপায়নের তুলনায় যথেষ্ট দীনতাও এতে স্পষ্ট হয়েই ধরা পড়ে, কিন্তু তবুও মনকে গুরুগম্ভীর পরিবেশ ও চিন্তাধারা থেকে রেহাই দেওয়ার পক্ষে ছবিখানি আদরণীয়।

গল্প হচ্ছে আরব্য রজনীর চিরাচরিত চরিত্র আবু হোসেনকে নিয়ে। বাদশা হারুণ চিরাগ হাতে মুশকিল-আসানের বেশ ধরে রাজ্য পরিক্রমায় বের হয়ে আবু হোসেনের সঙ্গে দেখা করলেন। আবুর মধ্যে বাদশাহ প্রকৃত মনুষ্যত্বের সন্ধান পেলেন। বাদশাহ জানালেন রাজ্যের দরিদ্র ও দুঃস্থের উপকার

রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চে'র নায়িকা সরলা। আই এন এ পিকচার্স নির্মিত চিত্রে প্রণতি ঘোষ

করার জন্য এবং অত্যাচারিত মহাজনদের শায়েস্তা করার জন্য আবুর বড়ো অভিলাষ একদিনের জন্যও বাগদাদের সিংহাসনে বসে। কৌশলে সুরায় বেহুঁশ করে বাদশাহ আবুকে প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। সকালে জ্ঞান ফিরে পেয়ে আবু নিজেকে বাদশাহরূপে পেলে। বাদশাহ হয়ে সিংহাসনে বসে সে রাজকার্য পরিচালনায় এমন বিচক্ষণতা, মনুষ্যত্ব ও বিচার ক্ষমতার পরিচয় দিলে যাতে শাহজাদী বুলবুল আবুর প্রেমে পড়ে গেলো। সে প্রেম দৃঢ়তর হলো সাময়িক বাদশাহরূপী আবুর নৈশ প্রমোদ কালে হারেমে বুলবুলের সাক্ষাৎ পাওয়ার পর। সে রাতের শেষে আবার আবুকে বসরাই সুরায় বেহুঁশ করে তার নিজ আলয়ে রেখে আসা হলো। জ্ঞান ফিরে পেয়ে আবু বুলবুলের বিরহে আত্মহারা হলো। ওদিকে ক্ষণিকের মিলনে বিভোরা বুলবুলও আবুকে না পাওয়ায় চঞ্চল হয়ে উঠলো। সখী তোফার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আবুকে ডেকে নিয়ে এলো প্রাসাদে। সারারাত গোপন অভিসারের পর সকালে আবু ধরা পড়লো। হারেমের পবিত্রতা নষ্ট করার অপরাধে আবুর বিচার হলো। আবুর যুক্তির কাছে বাদশাহ হার মানলেন। তবুও তিনি জানালেন, আবু যদি এক মাসের মধ্যে লক্ষ আশরফি অর্জন করে আনতে পারে তাহলেই তিনি বুলবুলের সঙ্গে তার বিবাহ দেবেন, না হলে আবুর মৃত্যু। নিরুপায় আবু সে অর্থ সংগ্রহ করলে দামাস্কাসের এক বণিকের কাছ থেকে। আবুকে ধরা হলো ডাকাতির অপরাধে। বাদশা তার বিচারে বসলেন। আবু অর্থ সংগ্রহের কোন রহস্যই প্রকাশ করতে চাইলে না। ডাকাতি ও সত্য গোপনের অপরাধে আবুর ওপর শাস্তি বিধানের হুকুম হবার মুহূর্তে সেই বণিক এসে জানায় যে আবু আশরফি তারই কাছ থেকে কর্জ হিসেবে গ্রহণ করেছিলো। বণিক বাদশাহকে একথাও স্মরণ করিয়ে দিলে যে তিনি আবুকে লক্ষ আশরফি অর্জন করতে বলেছিলেন, কিন্তু কি উপায়ে সে নির্দেশ দেন নি। একজন সামান্য ব্যক্তির পক্ষে মাত্র একটি মাসের মধ্যে লক্ষ আশরফি পরিমাণ অর্থ উপার্জন কি উপায়ে সম্ভবপর বাদশাহ সে কথাটা ভেবে দেখেন নি। বাদশাহ নিজের ভুল বুঝলেন এবং আবুর প্রেমনিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে বুলবুলের সঙ্গেই তার বিবাহ দিলেন।

আরব্য রজনীর আবু হোসেন সম্পর্কে রূপকথার সঙ্গে এ ছবির গল্পের মিল অনেক। কয়েকটি মাত্র ঘটনার যে তফাৎ সে-সবও গ্রহণ করা হয়েছে আরব্য রজনীরই অন্যান্য অংশ থেকেই। কিন্তু বিন্যাসটা এলোপাথারি নয়। একটা নির্দিষ্ট পথ ধরে একেবারে হালকা থেকে বেশ ভারী একটা নাটকীয় পরিস্থিতি গড়ে তোলার কৃতিত্ব দেখা গিয়েছে। ছবিখানি শেষ পর্যন্ত এক রকম অসার হয়ে দাঁড়ালেও কোন নিরস মুহূর্ত এসে পড়তে দেওয়া হয় নি, যেভাবেই হোক লোকে যাতে আমোদ পায় সেই দিকটাতেই নজর দেওয়া হয়েছে এবং সেবিষয়ে বিন্যাসচাতুর্য সাফল্যও লাভ করতে পেরেছে। সবটুকুই কাল্পনিক রূপক বলে সামঞ্জস্য অসামঞ্জস্য নিয়ে বিচার করার অবকাশ এতে নেই। যে সমতাটুকু ছবিকে মোটামুটি উপভোগ্য করে তোলায় যথেষ্ট সেগুণটা আছে।

জাঁক আর জৌলুষই ফুটিয়ে তোলাই হচ্ছে এ ধরণের রূপকথা নিয়ে তোলা ছবির আসল দিক। জৌলুষ ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে অসাধারণ জমকালো না হলেও বাঙলা ছবির বিচারে নিতান্ত নিন্দনীয় প্রচেষ্টা বলা যায় না। সাজসজ্জা ও দৃশ্য-পটের দিক থেকে রূপকথার বৈভবকে অনেকখানি দাঁড় করিয়ে দিতে পেরেছে। জাঁকের দিক থেকে প্রধান আকর্ষণ সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছে বম্বের শিল্পী বেগম
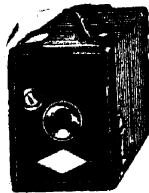
ভিনাস প্রডাকসন্সের "রঘু ডাকাত" চিত্রে চন্দ্রাবতী

পারাকে নিয়ে। তাকে অবতরণ করানো হয়েছে বাদশাহের পালিতা কন্যা এবং আবু হোসেনের প্রেমিকা বুলবুলের চরিত্রে। দেখা গেলো তিনি কেবল বিজ্ঞাপনের আকর্ষণ হিসেবেই কাজে লেগেছেন, পর্দার ছবিতে তিনি এমন কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি যাতে তাকে বম্বে থেকে পাকড়াও করে নামানোর মধ্যে কোন বিশেষ সার্থকতা দেখা দিতে পেরেছে বলা যায়। চরিত্র মতো অভিনয় তিনি দেখাতে পেরেছেন এবং বেশ মানানসই করেই তবে সেজন্যে এখানেও শিল্পী ছিলো।

অভিনয়ে আর সকলে সাফল্য অর্জনই করেছেন। আবু হোসেনের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বিকাশ রায়। এ ধরণের চরিত্রে তাঁকে কিছুটা বেমানান দেখালেও অভিনয়ের দিক থেকে তিনি কাজ চালিয়ে দিয়েছেন। বাদশাহ হারুণের ভূমিকায় নীতীশ মুখোপাধ্যায়ই অভিনয়ে সবচেয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মুশকিল-আসান, বসরাই সওদাগর ও ফকিরের তিন রকমের বিভিন্ন ছদ্মবেশ

বাদশাহকে গ্রহণ করতে হয়েছে আবু হোসেনকে পরীক্ষা করার জন্য এবং নীতীশ মুখোপাধ্যায় বাদশাহ চরিত্রের চেয়ে ছদ্মবেশী ঐ তিনটি চরিত্রে বেশী মানিয়েছেন এবং অভিনয়ও ভালো করেছেন। আবুর সহচর আহমদরূপী হরিধন মুখোপাধ্যায় এবং খলিফের বান্দা মশরুরের ভূমিকায় প্রীতি মজুমদার হাসির হুল্লোড় সৃষ্টি করায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বুলবুলের সহচরী তোফার ভূমিকায় নীলিমা দাস, আবুর মার ভূমিকায় রেবা বোস, উজীরের ভূমিকায় শ্যাম লাহা, বাদশাহ মহিষীর ভূমিকায় পদ্মা প্রভৃতিও চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন। মাদারির খেলায় গানের সঙ্গে নাচে তুলসী চক্রবর্তীও একটি উপভোগ্য দৃশ্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

সঙ্গীতের দিকটা জমাটি তবে কোন মৌলিকত্ব নেই, অধিকাংশই বম্বের ছবির নকল। আলোকচিত্রের কৃতিত্ব চলনসই পর্যায়ের; শব্দগ্রহণ বেশীর ভাগ অংশেই খারাপ।

ক্রিকেট

ভারত ও ইংলণ্ড দলের তৃতীয় ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ কলিকাতার ইডেন উদ্যানস্থ ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাবের রনজি স্টেডিয়ামে অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। দিল্লী ও বোম্বাইতে প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচও অনুরূপভাবে শেষ হইয়াছে। এইরূপভাবে উপর্যুপরি তিনটি টেস্ট ম্যাচের খেলায় জয়পরাজয় নিষ্পত্তি না হওয়ায় সকল ক্রীড়ামোদীই একরূপ বদ্ধমূল ধারণা করিয়া লইয়াছেন যে, অবশিষ্ট দুইটি খেলাতেও কোন ফলাফল হইবে না। এম সি সি ভ্রমণকারী দলের বৈদেশিক ক্রীড়াসমালোচক মিঃ লেসলী স্মিথেরও ধারণা ঐরূপ। কারণ তিনি খেলার শেষ দিনে তাঁহার অভিমতের মধ্যে লিখিয়াছেন—"তিনটি টেস্ট ম্যাচ খেলা হইল; তিনটিই অমীমাংসিতভাবে শেষ হইল। ভারতের কোন একজন নামকরা ক্রিকেট পরিচালক আমার সহিত বাজী রাখিয়াছেন এই বলিয়া যে, অবশিষ্ট দুইটি টেস্ট ম্যাচও অমীমাংসিতভাবে শেষ হইবে। ক্রিকেট খেলার কী পরিণাম!" ক্রিকেট খেলা কেন কোন খেলার ফলাফল সম্পর্কে পূর্ব হইতে নিশ্চিত করিয়া কিছু কেহ বলিতে পারে না। সুতরাং যিনি মিঃ লেসলী স্মিথের সহিত বাজী রাখিয়াছেন, তিনি যে জয়ী হইবেনই বলা যায় না। তবে অবশিষ্ট খেলা দুইটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হইলে কোনরূপ আশ্চর্য হইবার কারণ থাকিবে না। কারণ কলিকাতার মাঠের টেস্ট ম্যাচ যাঁহারাই দেখিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের সহিত একমত হইবেন যে, খেলায় নিষ্পত্তি করিবার মনোভাব উভয় দলের মধ্যেই ছিল না। এই মনোভাব পরিবর্তন না হইলে ফলাফল আশা করা যাইতে পারে না। ভারতীয় দলের খেলোয়াড়গণ ধুরন্ধর ব্যাটস্ম্যানদের দ্রুত পতন দেখিয়া দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া মন্থর গতিতে রান তুলিলে যতখানি অন্যায় করুন না কেন, তাহা ক্ষমা করা চলে; কিন্তু এম সি সি দলের দ্বিতীয় ইনিংসে মন্থর গতিতে খেলার কোনই যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিশেষ করিয়া শেষ দিনে মধ্যাহ্ন ভোজের পরও ধীরগতিতে খেলিয়া রান তুলিবার প্রচেষ্টার প্রশংসা করা চলে না। তাঁহারাই খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হউক—ইহাই যেন মনে মনে ধারণা করিয়া লইয়া খেলিয়াছেন—ইহা অস্বীকার করিতে পারেন না। মিঃ লেসলী স্মিথ ইডেন উদ্যানের পিচকে খেলার ফলাফলের জন্য দোষী করিয়াছেন। তাঁহার মতে, পিচই ব্যাটস্ম্যান ও বোলারদের কোনরূপ সাহায্য করে নাই। তাহাই যদি সত্য হইবে, তাহা হইলে ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসে ৯০ মিনিটে ১০৩ রান কি করিয়া করিতে পারিলেন, সেই কথাই আমরা তাঁহাকে চিন্তা করিতে বলি। খেলার নিষ্পত্তি করিবই—এই মনোভাব লইয়া যদি কোন খেলোয়াড় খেলেন, তাহাতে রান উঠিতে বাধ্য; ইহা আমরা না বলিয়া পারি না। প্রথম ইনিংস্ ইংলণ্ড দলই খেলিবার সুযোগ পান এবং তাঁহারা মন্থর গতিতে খেলিয়া রান তুলিয়া যে আবহাওয়া সৃষ্টি করেন, ভারতীয় দলকে বাধ্য হইয়াই তাহার অনুসরণ করিতে হইয়াছে। একটা দল দ্রুত রান তুলিলে অপর দল দ্রুত রান তুলিতে বাধ্য। কিন্তু তাহার পরিবর্তে প্রথম দলই যদি মন্থর গতিতে খেলে, তাহা হইলে পরবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বী দলও মন্থর গতিতে খেলিবে—ইহাতে আর আশ্চর্য কি? এই টেস্ট ম্যাচের সম্পর্কে লণ্ডনের একজন ক্রীড়াসমালোচক ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডকে দায়ী করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "এইরূপ পিচ যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহারাই খেলার সকল উৎসাহ নষ্টের জন্য দায়ী।" এই সমালোচক পরের মুখের ঝাল খাইয়া কয়েক সহস্র মাইল দূর হইতে কটূক্তি করিয়াছেন—ইহার প্রতিবাদ করিবার আমাদের ইচ্ছা নাই। পরের কথার উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা কটূক্তি করেন, তাঁহারা যে কি শ্রেণীর লোক, তাহা না বলাই ভাল। আমাদের জিজ্ঞাস্য—মিঃ এন ডি হাউওয়ার্ড পিচ দেখিয়া অথবা প্রথম দিনেই ইহার প্রতিবাদ কেন করেন নাই? তিনি ইংলণ্ডের একটা নামজাদা ক্লাবের অধিনায়ক ও পরিচালক। তাঁহার পিচ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা যখন আছে, তখন পিচ দেখিয়াই তাঁহার পূর্ব হইতে বলা উচিত ছিল যে, পিচ "প্রাণহীন"। কিন্তু তিনি শেষ দিনে অভ্যর্থনার পূর্বে তাহা বলিতে কেন সাহসী হন নাই? বাঙলায় একটি প্রবাদ বাক্য আছে—"নাচতে না জানলে উঠানের দোষ।" এই ক্ষেত্রে তাহা এম সি সি দলের অধিনায়ক ও খেলোয়াড়দের প্রতি প্রয়োগ করা হইলে কি খুব অবিবেচকের কার্য করা হইবে?

:: ফলাফল ::

ইংলণ্ড দল : প্রথম ইনিংস্—৩৪২ রান (স্পুনার ৭১ রান, ওয়াটকিন্স ৬৮ রান, পুলে ৫৫ রান, লীডবিটার ৩৮ রান, গ্রেভনী ২৪ রান, রিজওয়ে ২৪ রান; মানকড় ৮৯ রানে ৪টি উইকেট, ফাদকার ৮৯ রানে ৩টি উইকেট ও আর ডিভেচা ৬০ রানে ২টি উইকেট পান)

ভারত : প্রথম ইনিংস্—৩৪৪ রান (ডি ফাদকার ১১৫ রান, পি রায় ৪২ রান, বিনু মানকড় ৫৯ রান, ডি মাঞ্জরেকার ৪৮, আর

ডিভেচা ২৬ রান, গোপীনাথ ১৯ রান; রিজওয়ে ৮৩ রানে ৪টি উইকেট, স্ট্যাটারসল ১০৪ রানে ৪টি উইকেট, স্ট্যাথাম ৪৬ রানে ১টি উইকেট ও লীডবিটার ৬৪ রানে ১টি উইকেট পান)

ইংলণ্ড দল : দ্বিতীয় ইনিংস—(৫ উইকেট) ২৫২ রানে ডিক্লেয়ার্ড (রবার্টসন ২২ রান, স্পুনার ৯২ রান, গ্রেভনী ২১ রান, পুল নট আউট ৬৯ রান ও এন ডি হাউওয়ার্ড ২০ রান নট আউট; আর ডিভেচা ৫৫ রানে ২টি উইকেট, বিনু মানকড় ৬৪ রানে ২টি ও ফাদকার ২৭ রানে ১টি উইকেট পান)

ভারত : দ্বিতীয় ইনিংস—(কেহ আউট না হইয়া) ১০৩ রান (বিনু মানকড় ৭১ রান নট আউট ও পি রায় ৩১ রান নট আউট)

ভারতীয় চতুর্থ টেস্ট দল

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলী চতুর্থ টেস্ট খেলার জন্য ভারতীয় দল গঠন করিয়াছেন। এই দল তৃতীয় টেস্টে পাঁচজন খেলোয়াড়কে বাদ দিয়া নূতন পাঁচজন খেলোয়াড় দ্বারা পূরণ করা হইয়াছে। যে সকল খেলোয়াড়দের দলভুক্ত করা হইয়াছে, তাঁহাদের বিষয় আমরা কিছুই বলিতে চাই না। কেবল রমেশ ডিভেচাকে দল হইতে বাদ দিয়া একেবারেই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছেন—ইহা না বলিয়া পারি না। আক্রমণ-কারী বোলার হিসাবে ইঁহাকে দলে রাখা উচিত ছিল। নিম্নে চতুর্থ টেস্ট দলের মনোনীত খেলোয়াড়দের নাম প্রদত্ত হইল:—

(১) বিজয় হাজারে (অধিনায়ক), (২) বিনু মানকড়, (৩) ডি জি ফাদকার, (৪) পি জি যোশী (উইকেটরক্ষক), (৫) ডি এল মঞ্জরেকার, (৬) এস জে সিন্ধে, (৭) সি এস নাইডু, (৮) পঙ্কজ রায়, (৯) গোলাম আমেদ, (১০) এইচ অধিকারী, (১১) উমরিগর।

দ্বাদশ ব্যক্তি—ডি কে গাইকোয়াড়।

অতিরিক্ত—রমেশ ডিভেচা ও রাজিন্দ্রনাথ।

অস্ট্রেলিয়া "রবার" বিজয়ী

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল টেস্ট পর্যায়ের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে ৩—১ খেলায় পরাজিত করিয়া "রবার" বা টেস্ট পর্যায়ের বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে পরাজিত করে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল তৃতীয় টেস্ট খেলায় বিজয়ী হওয়ায় সকলেই কল্পনা করিতে থাকেন যে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ চতুর্থ টেস্ট খেলায় জয়ী হইবে ও পঞ্চম টেস্ট খেলায় "রবার" বিজয়ীর সিদ্ধান্ত হইবে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া দল চতুর্থ টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে ১ উইকেটে পরাজিত করিয়া টেস্ট পর্যায় খেলার জয়পরাজয় নিষ্পত্তি করিয়াছে। পঞ্চম টেস্ট ম্যাচ একেবারেই মূল্য-হীন হইয়া পড়িল।

চতুর্থ টেস্ট ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া যেভাবে বিজয়ী হইয়াছে, তাহা ক্রিকেট ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। খেলার ফলাফল চতুর্থ দিনেই নিষ্পত্তি হইয়াছে প্রবল উত্তেজনা ও উন্মাদনার মধ্যে। অস্ট্রেলিয়া দল একরূপ পরাজয়ের সম্মুখীন হইয়া অপূর্ব দৃঢ়তার জন্যই জয়ী হইতে সক্ষম হইয়াছে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম টসে জয়ী হইয়া ব্যাটিং গ্রহণ করে। প্রথম দিনেই ২৭২ রানে ইনিংস শেষ করে। মিলারের মারাত্মক বোলিং ইহা সম্ভব করে। পরের দিন অস্ট্রেলিয়া দল খেলা আরম্ভ করিয়া দিনের নির্দিষ্ট সময়ের ২৫ মিনিট পূর্বে ২১৬ রানে ইনিংস শেষ করে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলও দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করিয়া দিনের শেষে ২ উইকেটে ২০ রান করিতে সক্ষম হয়। তৃতীয় দিনে ২০৩ রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে। অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে ২৬০ রান করিলে বিজয়ী হইবে এইরূপ অবস্থায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। দিনের শেষে ১ উইকেটে ৬৮ রান করিতে সক্ষম হয়। চতুর্থ দিনে খেলা আরম্ভ করিয়াই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ৫ উইকেটে ১৪৭ রান হয়। দলের অধিনায়ক হ্যাসেট ১০২ রান করিয়া আউট হইলে অস্ট্রেলিয়ার ৬ উইকেটে ২০৪ রান হয়। ইহাতে সকলেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল বিজয়ী হইবে বলিয়াই কল্পনা করিতে থাকেন। কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইবার সম্ভাবনাও দেখা দেয়—৯ উইকেটে ২২২ রান হয়। শেষ খেলায়াও জনস্টন যোগদান করিলে প্রতি বলই জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তিকারী বলিয়া সকলের ধারণা হয়। কিন্তু শেষ দুইজন খেলোয়াড় বিশেষ করিয়া ডি রিং অপূর্ব দৃঢ়তার পরিচয় দেন। তিনি ঐ শোচনীয় অবস্থার পূর্বেও বেপরোয়া ব্যাটিং করিয়া একাই ৩২ রান সংগ্রহ করেন। অপর দিকে জনস্টন ৭ রান করিয়া নট আউট থাকেন। অস্ট্রেলিয়া দল খেলায় ১ উইকেটে বিজয়ী হয়। এই রূপ উত্তেজনাপূর্ণ পরি-সমাপ্তি ইতিপূর্বে কখনও পরিলক্ষিত হইয়াছে বলিয়া কেহ বলিতে পারেন না।

খেলার ফলাফল :—

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংস:—২৭২ রান (ওরেল ১০৮, গোমেজ ৩৭, ক্রিশ্চিয়ানী ৩৭, গডার্ড ২১, গুইলেন নট আউট ২২, মিলার ৬০ রানে ৫টি, বিল জনস্টন ৫৯ রানে ২টি, লিণ্ডওয়াল ৭২ রানে ১টি উইকেট পান।)

অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস:—২১৬ রান (মোরোনে ১৬, হ্যাসেট ১৫, নীল হার্ভে ৮৩, মিলার ৪৭, লিণ্ডওয়াল ১৩, ট্রিম ৩৪ রানে ৫টি, রামাধীন ৬৩ রানে ২টি, গোমেজ ২৫ রানে ১টি, ভ্যালেণ্টাইন ৫০ রানে ১টি উইকেট পান।)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস:—২০৩ রান (স্টোলমিয়ার ৫৪, রিকার্ডস ২০, ক্রিশ্চিয়ানী ৩৩, গোমেজ ৫২, ওরেল ৩০, লিণ্ডওয়াল ৫৯ রানে ২টি, মিলার ৪৯ রানে ২টি, বিল জনস্টন ৫১ রানে ৩টি, রিং ১৭ রানে ১টি, আইয়েন জনসন ১৮ রানে ১টি উইকেট পান।)

অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস:—৯ উই: ২৬০ রান (হ্যাসেট ১০২, নীল হার্ভে ৩৩, লিণ্ডওয়াল ২৯, ডি রিং নট আউট ৩২, জনস্টন নট আউট ৭, রামাধীন ৯৩ রানে ৩টি, ভ্যালেণ্টাইন ৮৮ রানে ৫টি উইকেট পান।)

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৩১শে ডিসেম্বর—কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজওহরলাল নেহরু পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী পরিক্রমার প্রথম দিবসে খড়্গপুর, আসানসোল, বর্ধমান, চুঁচুড়া ও শ্রীরামপুরে মোট পাঁচটি জনসভায় ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন যে, এই নির্বাচনের ফলে দেশের শাসনভার যদি কংগ্রেসের হাতে ন্যস্ত না হয় এবং উহা যদি অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের করায়ত্ত হয়, তাহা হইলে দেশ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে।

অদ্য প্রত্যুষে দমদম বিমান ঘাটির সন্নিকটে গৌরীপুর ফাঁড়ি এলাকায় আগরতলাগামী একখানি মালবাহী বিমান ভূপতিত হওয়ায় উক্ত বিমানের পাইলট অফিসার এবং অপর দুইজন কর্মচারী নিহত হন।

১লা জানুয়ারী—অদ্য কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজওহরলাল নেহরু তাঁহার পশ্চিমবঙ্গ পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবসে কলিকাতা গড়ের মাঠে ৫ লক্ষাধিক নরনারীর এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে সমবেত শক্তি ও পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া ভারতে সুসমৃদ্ধ শক্তিশালী জাতি গঠনের গুরুদায়িত্ব বহনের জন্য দেশবাসীর নিকট ঐকান্তিক আবেদন জ্ঞাপন করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রী নেহরু প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার তীব্র সমালোচনা করেন।

কোমাগাটামারুর বীর শহিদগণ অশ্বেতকায় এশিয়াবাসীদের উপর বিদেশীদের অন্যায় আচরণের প্রতিকারার্থ অভিযান করিয়া কলিকাতা হইতে ১৪ মাইল দূরবর্তী বজবজের যে স্থানে বৃটিশ পুলিশের গুলীর মুখে আত্মাহুতি দিয়াছিলেন, শ্রীজওহরলাল নেহরু অদ্য সেই স্থলে উক্ত শহিদগণের উদ্দেশ্যে নির্মিত শহীদ স্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করেন। কোমাগাটামারু বীরগণের নেতা ৯১ বৎসরের বৃদ্ধ বাবা গুরুদিৎ সিং এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

২রা জানুয়ারী—ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু অদ্য কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সপ্ত দিবসস্থায়ী ৩৯তম অধিবেশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রসঙ্গে মানবকল্যাণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অধিকতর প্রয়োগের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ডাঃ জে এন মুখার্জি অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

জামসেদপুরে এক জনসভায় ভারতীয় জনসঙ্ঘের সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি শ্রী নেহরুর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেন যে, ১৯৪৬ সালে বড়লাটের শাসন পরিষদের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট থাকাকালে শ্রী নেহরু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে দ্বিতীয়বার নির্বাচনের আদেশ দিয়াছিলেন। ডাঃ খান সাহেবের সুনিশ্চিত জয়কে তিনি ব্যর্থ করিয়া দিয়া মিঃ জিন্নার সীমান্ত প্রদেশকে পাকিস্থানের অন্তর্গত করার স্বপ্নকে সার্থক করিয়াছিলেন।

৩রা জানুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা ও রাজ্য বিধান সভার ঐতিহাসিক সাধারণ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। এই দিবস সমগ্র রাজ্যে বিধান সভার নির্বাচনে মোট ১৮৭টি কেন্দ্রের মধ্যে ২২টি কেন্দ্রে ভোট গৃহীত হয়। উহার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল কেন্দ্রের সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন লোক সভার কেন্দ্রেও যুগপৎ ভোট গৃহীত হয়।

অদ্য বোম্বাই রাজ্যে সাধারণ নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণ আরম্ভ হইয়াছে। বোম্বাই রাজ্যের মোট ১ কোটি ৬৫ লক্ষ ভোটারের মধ্যে অদ্য প্রায় ৭০ লক্ষ ভোটার ভোট দিয়াছেন। রাজ্যের অবশিষ্ট স্থানগুলিতে ৭ই ও ১১ই জানুয়ারী ভোট গৃহীত হইবে।

মধ্যভারতে ৫টি কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ আরম্ভ হইয়াছে। ইহা লইয়া বর্তমানে ভারতের ১০টি রাজ্যে ভোট গ্রহণ চলিতেছে এবং হিমাচল প্রদেশে ভোট গ্রহণ সমাপ্ত হইয়াছে।

অদ্য কলিকাতায় ল্যান্সডাউন রোডে এক সশস্ত্র ডাকাতি হয় এবং দুর্বৃত্তদের গুলীতে পথচারী এক ব্যক্তি নিহত ও অপর দুই ব্যক্তি আহত হয়।

৪ঠা জানুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচনে রাজ্য বিধান সভার মাত্র ২টি কেন্দ্রে ভোট গৃহীত হয়। তন্মধ্যে একটি বর্ধমান জেলার আসানসোল কেন্দ্র এবং অপরটি বাঁকুড়া জেলার ছাতনা কেন্দ্র।

অদ্য বিহারের সর্বত্র রাজ্য বিধান সভার ২৫৫টি এবং লোক সভার ৫২টি নির্বাচন কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ আরম্ভ হয়। বোম্বাই বিধান সভার নির্বাচনে যে ১৯টি আসনের ফল ঘোষিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৮টি আসনই কংগ্রেস লাভ করিয়াছে।

মাদ্রাজের নেলোর জেলার উদয়গিরি নির্বাচন-কেন্দ্রে কিষাণ মজদুর প্রজা দলের প্রার্থী শ্রীকবিরামিয়া চৌধুরী কংগ্রেসপ্রার্থী মন্ত্রী শ্রীগোপাল রেড্ডীকে ২,৩৬৮ ভোটে পরাজিত করিয়া রাজ্য বিধান সভায় নির্বাচিত হইয়াছেন।

৫ই জানুয়ারী—নয়াদিল্লীতে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তির সর্তে প্রকাশ, বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা দ্রুত কার্যে পরিণত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে আর্থিক সাহায্য করিবে।

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচনে রাজ্য বিধান-সভার ৫টি কেন্দ্রে ভোট গৃহীত হইয়াছে। এই পাঁচটি কেন্দ্র হইতেছে মুর্শিদাবাদের সূতী ও কান্দী, ২৪ পরগণার বারাসত ও বসিরহাট এবং বর্ধমানের রাণীগঞ্জ কেন্দ্র।

আসামের কাছাড় ও লুসাই পাহাড় অঞ্চলে ভোট গ্রহণ সমাপ্ত হইয়াছে। সমগ্র আসামের এখানেই প্রথম ভোট গৃহীত হইয়াছে।

গত রবিবার কলিকাতা হইতে প্রায় ২৪ মাইল দূরে ভাটপাড়ায় এক নির্বাচনী শোভাযাত্রা পরিচালনার সূত্র ধরিয়া যে গোলযোগ হয়, তৎসম্পর্কে পুলিশ এযাবৎ ২২ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

কয়েকটি ব্যাঙ্কে ধর্মঘট চালানো নিষিদ্ধ করিয়া দিয়া ভারত সরকার শিল্পবিরোধ সংক্রান্ত আইন অনুসারে এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

৬ই জানুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় রাজ্য বিধান সভার ২০টি কেন্দ্রে ভোট গৃহীত হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

৩১শে ডিসেম্বর—বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল অদ্য জাহাজযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রওনা হইয়াছেন।

১লা জানুয়ারী—কম্যুনিষ্টরা অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জকে কোরিয়ায় নিরুদ্দিষ্ট মিত্রপক্ষের প্রায় ৫০ হাজার সৈন্যের সংবাদ দিতে সম্মত হইয়াছে।

২রা জানুয়ারী—মস্কো রেডিও অদ্য ভূতপূর্ব সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ লিটভিনফের মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করিয়াছে।

অদ্য পানমুনজনে যুদ্ধবন্দী সাব-কমিটির বৈঠকে রাষ্ট্রপুঞ্জ পক্ষ কোরিয়ার সকল যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের এবং অসামরিক বন্দিগণকে তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী নিজ নিজ দেশে প্রেরণের একটি পরিকল্পনা পেশ করিয়াছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণের প্রতি আচরণ সম্পর্কে ভারতবর্ষ যে অভিযোগ জানাইয়াছে, অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জ এড হক রাজনতিক কমিটিতে সে সম্পর্কে পুনরায় বিতর্ক আরম্ভ হয়।

৩রা জানুয়ারী—মিশরের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, অদ্য সুয়েজ রেলওয়ে কারখানার এক সংঘর্ষের ফলে ১৫ জন বৃটিশ অফিসার এবং ১৪ জন মিশরী নিহত হইয়াছে।

৫ই জানুয়ারী—দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি ব্যবহারের প্রশ্নে যে বিরোধ দেখা দিয়াছে, উহার সমাধান চেষ্টায় ভারত, পাকিস্থান ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে সাহায্য করার জন্য তিনজন সদস্য লইয়া একটি কমিশন গঠনের প্রস্তাব অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জ এড-হক রাজনৈতিক কমিটিতে গৃহীত হইয়াছে।

চীনা কম্যুনিস্ট জেনারেল সী কেং অদ্য আমেরিকানদের বিরুদ্ধে চীনের সাংহাই, মুকদেন ও সিংতাও নগরীতে বোমা বর্ষণের অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে।

৬ই জানুয়ারী—হোয়াইট হাউস হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আগামী সপ্তাহে অন্তর্জাতিক সমর-নীতি সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও মিঃ চার্চিলের মধ্যে যে আলোচনা হইবে, উহার প্রস্তুতি সমাপ্ত হইয়াছে।

ভারতীয় মূল্য: প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,
পাকিস্তান মূল্য: প্রতি সংখ্যা (পাক) ।৵০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০ (পাক)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
এবং [illegible] প্রেস, কলিকাতা [illegible] প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।